সূচি পত্র

বিষয়	লেখকগণের নাম	পৃষ্ঠা
রার পথে	শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়	৬৫, ৫২০
্যামি এবং সাহেবিআনা	„ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৪১
লখা	„ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়	৩৮৬
লা ও ছায়া	„ সীতানাথ নন্দী B. A.	৪৫৮
হাস	„ প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়	১২১, ১৮৩
জ মহিলার শিক্ষা ও নতার গতি	শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস	১৯৩
জ সমাজ	ঐ	২৯
বীর্য	শ্রীযুক্ত মুন্সী কায়কোবাদ	৬২
ান্নবর্ত্তী পরিবার	শ্রীযুক্ত সীতানাথ নন্দী B. A.	৫৭৬
বতা মালা	শ্রীমতী বিনয়কুমারী বসু, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, „ মুন্সী কায়কোবাদ, „ শরচ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী, শ্রীমতী সরলাবালা সরকার, শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	২৮৬, ৩৮২, ৪৪৪, ৫৫৯
বির আত্মবর্ষ	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন	৫২৬
ণ্ডার গার্টেন শিক্ষাপ্রণালী	শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস	৪৩৫
ড়ান		২৮৭
কফিয়ৎ	শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৩১
ন শিক্ষা	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	৩৬৮
ত মালা	শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, „ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী, „ প্রমীলা বসু	৭৭
[illegible]	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী M.	৯৭
[illegible]	শ্রীযুক্ত —— মিত্র	৩৭৮
[illegible]	শ্রীমতী [illegible]	৫৩৭

বিষয়	লেখকগণের নাম	
[illegible]নেট	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন	
দেপাড়ার মেলা	,, দীনেন্দ্রকুমার রায়	
দুইটি	,, দেবেন্দ্রনাথ সেন শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী }	
দুষন্ত	শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	
নব বর্ষ	শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী	
নব যুগ	,, হিরণ্ময়ী দেবী	
পত্র	শ্রী ঘোঃ—	
পালিতা	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৫৩, ১৪৭, ২০৪, ৪৬৯, ৬০০, ৬৪[illegible]
প্রতিদান	শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত	
প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভার আবশ্যকতা	ঐ	
প্রাচীন সংস্কৃত দৃশ্য কাব্য	,, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়	৮[illegible]
প্রাপ্তি স্বীকার		
প্রেম। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	
প্লেটো টিমীয়স	" ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় B. Sc. L[illegible]	
বর্ষা সঙ্গীত	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী শ্রী——দেবী }	
বাঙ্গলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু B. Sc. Lond. F[illegible]	
বিবিধ প্রসঙ্গ	... ...	
বিশেষ্য ও বিশেষণ	,, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী	
বে[illegible]	,, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	
ভারতে স্ত্রীশিক্ষার ফল	,, নেপালচন্দ্র রায় B. A.	
ভৌগোলিক প্রশ্ন	... ...	
মন্তব্য	,, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় M. A.	
মন্ত্রী অভিষেক	,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
মহাযজ্ঞের নিমন্ত্রণ	উদাসীন	
[illegible]	শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত	
মানুষের ধর্ম কি	শ্রীমতী [illegible] দাস	
[illegible]	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন	

বিষয়	লেখকগণের নাম	পৃষ্ঠা
শোদা	শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪২১
রমণীর শিক্ষা ও কার্য্য	„ সীতানাথ নন্দী B. A.	৫০১
রাধা	„ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২১৬
রূপসী	শ্রীঃ—	৯৬
রৌপ্য	শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় B. Sc. Lond.	৬৮১
লিচ্ছবি রাজগণ	শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ	৩৫২, ৪৪৭
শরৎ ও বসন্ত	„ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৭৯
শাপাবসান নাটকাভিনয়		৪৬৬
শিবনারায়ণ দেবের জীবন চরিত	...	১৩৪, ২৭১, ৪০৫, ৪৮৬, ৫৯৫, ৬৩
ষ্টার থিয়েটার	... ...	২৯৭
সখ্য	শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৪২
সন্ধ্যা বায়ু	শ্রীমতী বিনয়কুমারী বসু	৬৮৪
সমাজ ও সমাজ সংস্কার	শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস	৪৯৪
সমারোহের ফল	„ হিরণ্ময়ী দেবী	৬৯৩
সুরধুনী	শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ ভূক্তি	৩০১
সূর্য্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়	„ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬০
স্ত্রী ও পুরুষ	ঐ	৩৬
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	... ...	১৬৬, ২৯৮, ৫৬।
হত্যাকারী কে	শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়	১৫
হরশিঙ্গার	„ দেবেন্দ্রনাথ সেন	৩৮৫
হেঁয়ালি নাট্য	শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী	৫১
ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, অশ্ব ও তরবারি	„ স্বর্ণকুমারী দেবী	৮২

ভারতী ও বালক।

মন্ত্রি অভিষেক। *

আমি যে বিষয় উত্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহা আপনা হইতেই অনেক র পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে এমন কেহই নাই যাঁহাকে এ সম্বন্ধে ছু নূতন কথা বলিতে পারি বা যাঁহাকে প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক কিছু বুঝান আবশ্যক। মরা সকলেই এক মত। আমার কর্ত্তব্য কেবল উপস্থিত সকলের হইয়া সেই ত ব্যক্ত করা; সেই জন্যই সাহস-পূর্ব্বক আমি এখানে দণ্ডায়মান হইতেছি। নতুবা টিল রাজনৈতিক অরণ্যের মধ্যে সরল পথ কাটিয়া বাহির করা আমার মত নিরাস্ত্র ব্যবসায়ী লোকের ক্ষুদ্র ক্ষমতার অতীত।

বিষয়টা আপাতত যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে তাহা আমার নিকটেও তেমন র্ব্বোধ ঠেকিতেছে না। আমাদের শাসনকর্ত্তারা স্থির করিয়াছেন মন্ত্রীসভায় আরো টিকতক ভারতবর্ষীয় লোক নিযুক্ত করা যাইতে পারে। এখন কথাটা কেবল এই াড়াইতেছে, নির্ব্বাচন কে করিবে? গবর্ণমেণ্ট করিবেন, না আমরা করিব?

মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে সহজ-বুদ্ধিতে এই প্রশ্ন উদয় হয়, কাহার সুবিধার জন্য এই নির্ব্বাচনের আবশ্যক হইয়াছে?

আমাদেরই সুবিধার জন্য। কারণ ভরসা করিয়া বলিতে পারি এমন অবশ্যই এ সভায় কেহই নাই যিনি বলিবেন ভারতের উন্নতিই ভারতশাসনের মুখ্য লক্ষ্য হে। অবশ্য ইংরাজের ইহাতে আনুষঙ্গিক লাভ নাই এমন কথাও বলা যায় না। কিন্তু নিজের স্বার্থকেই যদি ইংরাজ ভারতশাসনের প্রধান উদ্দেশ্য করিতেন তবে আমাদের এমন দুর্দ্দশা হইত যে ক্রন্দন করিবারও অবসর থাকিত না। তবে কি আশা লইয়া আজ আমরা এখানে সমবেত হইতাম! তবে আকাঙ্খার লেশমাত্র আমাদের মনে উদয় হইবার বহু পূর্ব্বেই বিলাতের নির্ম্মিত কঠিন পাদুকার তলে তাহা নিরঙ্কুর হইয়া লোপ পাইত।

এ পর্য্যন্ত কখনো কখনো দৈববশতঃ দুর্ঘটনাক্রমে উক্ত মর্ম্মঘাতী চর্ম্মখণ্ডের তাড়নে আমাদের জীর্ণ প্লীহা বিদীর্ণ হইয়াছে মাত্র কিন্তু আমাদের শীর্ণ আশালতা ক্রমশঃ জীব হইয়া উন্নতি-দণ্ড আশ্রয়পূর্ব্বক সফলতালাভের দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহার তি ইহার আক্রোশ কার্য্যে স্পষ্টতঃ প্রকাশ পায় নাই।

---

* এমারল্ড্ নাট্যশালায় লর্ড্ ক্রসের বিলের বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ উপলক্ষে বিরাটসভা আহূত হয় এই প্রবন্ধ সেই সভাস্থলে পঠিত হয়।

উপস্থিতক্ষেত্রে আমার এই প্রবন্ধে বিদীর্ণ প্লীহার উল্লেখ করা কালোচিত স্থানোচিত বিজ্ঞোচিত হয় নাই এইরূপ অনেকেরই ধারণা হইতে পারে। বিষয়টা সাধারণতঃ মনোরঞ্জক নহে, এবং ইহার উল্লেখ আমাদের কর্তৃপুরুষদের কর্ণে শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিয়া আঘাত করিতে পারে।

কিন্তু কথাটা পাড়িবার একটু তাৎপর্য্য আছে। ইংরাজের সাংঘাতিক সংঘর্ষে মাঝে মাঝে আমাদের দুর্ব্বল প্লীহা এবং অনাথ মানসম্ভ্রম শতধা বিদার্ণ হইয়া গিয়াছে এ কথাটা গোপন করিয়া রাখা সহজ হইতে পারে কিন্তু বিস্মৃত হওয়া সহজ নহে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতবর্ষীয় ইংরাজের এই স্বাভাবিক রূঢ়তা আমরা যদি চর্ম্মের উপরে ও মর্ম্মের মধ্যে একান্ত প্রাণান্তিকরূপে অনুভব না করিতাম তবে ইংরাজ গবর্মেণ্টের উদারতা ও উপকারিতা-সম্বন্ধে বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কত সহজ হইত!

মনুষ্যের স্বভাব এই, অপরাধীর প্রতি রাগ করিয়া তাহার সম্পূর্ণ নিরপরাধী ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের প্রতি কাল্পনিক কলঙ্ক আরোপ করিয়া কিয়ৎ-পরিমাণে সান্তনা অনুভব করে। তেমনি আমরা অনেক সময়ে দলিত প্লীহা যন্ত্রের যন্ত্রণায় কোন বিশেষ ইংরাজ কাপুরুষের প্রতি রাগ করিয়া গবর্মেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হই। কারণ গবর্মেণ্টকে আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি না, অনেকটা শিক্ষা ও কল্পনার সাহায্যে মনের মধ্যে খাড়া করিয়া লইতে হয়। কিন্তু যাহাতে করিয়া জিহ্বা এবং জীবাত্মার অধি-কাংশই বাহির হইয়া পড়ে অথবা অপমানশেল হৃৎপিণ্ডের শোণিত শোষণ করিতে থাকে তাহা অত্যন্ত নিকটে অনুভব না করিয়া থাকা যায় না।

অতএব ভ্রমের কারণ মন হইতে দূর করিয়া সেই ব্যক্তিগত অপমানজ্বালা বিস্মৃত হইয়া আমরা যদি স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখি তবে ইহা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে যে ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট হইতে আমরা এত বহুল সুফল লাভ করিয়াছি যে তাহার নিঃস্বার্থ উপকারিতাসম্বন্ধে অবিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কৃতঘ্নতা মাত্র।

অতএব সকলেই বলিবেন ভারতশাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতবর্ষেরই উন্নতি। আমাদেরই সুবিধা, আমাদেরই কাজ। সেই আমাদের কাজের জন্য আমাদের লোকের সাহায্য প্রার্থনীয় হইয়াছে। সহজেই মনে হয় আমরা বাছিয়া দিলে কাজটাও ভাল হইবে আমাদের মনেরও সন্তোষ হইবে।

এই সন্তোষ পদার্থটি কিছু উপেক্ষার যোগ্য নহে। ইহাতে কাজ যেমন অগ্রসর করিয়া দেয় এমন আর কিছুতে নহে। রুচিপূর্ব্বক আহার করিলে তবে পরিপাকের সহায়তা হয়। কার্য্যসাধনের সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষ সাধনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আব-শ্যক, নতুবা উপকারের গ্রাসও গলাধঃকরণ করা কঠিন হইয়া উঠে এবং তাহা অন্তরে অন্তরে অন্তর্দংশ বেদনা আনয়ন করে।

কিন্তু আমাদের বিরোধী পক্ষীয় ইংরাজি সম্পাদকেরা অতিরিক্ত বুদ্ধি প্রভাবে বলি-

তেছেন যে, ভারতবর্ষীয়েরা প্রাচ্য জাতীয় অতএব তাহাদের হস্তে মন্ত্রি অভিষেকের ভার দিলে তাহারা নিজেই অসন্তুষ্ট হইবে।

আমাদের ইংরাজি সম্পাদক মহাশয় যদি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন ত নির্ভয় হইয়া একটা কথা বলি। আমার বিশ্বাস আছে হাস্যরসকুতূহলী ইংরাজ জাতি হাস্যাস্পদ হইতে একান্ত ডরাইয়া থাকেন। কিন্তু উপস্থিতক্ষেত্রে তাহার আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। যখন সমস্ত ভারতবর্ষ কন্‌গ্রেসযোগে ইংলণ্ডের নিকটে নিবেদন করিতেছেন যে স্বাধীন মন্ত্রিনিয়োগের অধিকারই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান প্রার্থনা এবং সেই অধিকার প্রাপ্ত হইলেই তাঁহাদের প্রধান অসন্তোষের কারণ দূর হইবে তখন কোন্ লজ্জায় হাস্যরসতত্ত্বের সমুদয় নিয়ম বিস্মৃত হইয়া ইংলণ্ডবাসী সম্পাদক এ কথা বলেন যে এই গৌরবজনক অধিকার লাভে সফল হইলেই প্রাচ্য ভারতবর্ষ অসন্তুষ্ট হইবে! এ বিষয়ে পূর্ব্ব পশ্চিমের কোন মতভেদ থাকিতে পারে না যে, ব্যথিত ব্যক্তি নিজের বেদনা যতটা বোঝে, স্বয়ং ইংরাজ সম্পাদকও এতটা বোঝেন না।

অতএব আমাদের সন্তোষ অসন্তোষের সম্বন্ধে আমরাই প্রামাণ্য সাক্ষী; ইংরাজ সম্পাদকের প্রতিবাদ এস্থলে কিঞ্চিৎ অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বলেন যুদ্ধপ্রিয় জাতিরা এই মন্ত্রিঅভিষেকপ্রথায় ক্ষুব্ধ হইবেন। কেন হইবেন? তাঁহাদের অধিক পরিমাণে তেজ আছে বলিয়াই কি তাঁহারা রাজনীতি-ক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতা চাহেন না? স্বাধীন অধিকার কি তবে কেবল যুদ্ধপ্রিয় জাতির পক্ষেই অরুচিকর? আমরা যুদ্ধপ্রিয় নহি কিন্তু অনুমান করি যোদ্ধৃজাতির প্রতি এরূপ কলঙ্ক আরোপ করা সম্পূর্ণ অমূলক ও অন্যায়।

তবে যদি এ কথা বল, আমাদের যোদ্ধৃজাতীয়েরা এখনো এতটা দূর বাক্‌পটুতা লাভ করেন নাই যাহাতে করিয়া মন্ত্রিসভায় বসিয়া পরামর্শ দান করিতে পারেন, সুতরাং সেখানে আসন অধিকার করিতে তাঁহারা সক্ষম হইবেন না, এবং সক্ষমশ্রেণীয়দের প্রতি তাঁহাদের অসূয়ার উদ্রেক হইবে; তাহার আর কি প্রতিবাদ করিব? একথা কতকগুলি সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের ক্ষুদ্র কল্পনাপ্রসূত। ইহাতে আমাদের বীরজাতিদিগকে অপমান করা হয়। তাঁহাদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি নাই এবং তাঁহাদের জাতীয়েরা যোগ্যব্যক্তিকে চিনিতে পারে না, দুই চারিজন ইংরাজের মুখের কথাকে ইহার প্রমাণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে না।

আরেকটা কথা জিজ্ঞাসা করি ইংরাজের সুশাসনে আমাদের যোদ্ধৃবর্গের যুদ্ধ করিবার অবসর কোথায়? অতএব যখন যুদ্ধগৌরবের দ্বার রুদ্ধ, তখন কি স্বভাবতঃই জাতীয় রাজনৈতিক গৌরবের প্রতি তাঁহাদের হৃদয় আকৃষ্ট হইবে না? যদি স্বতঃ না হয় তবে যে কোন উপায়ে হৌক্ জাতিস্বভাবসুলভ যুদ্ধলালসা হইতে তাঁহাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া রাজ্যচালন ও শান্তিকার্য্যের মধ্যে তাঁহাদের

গৌরব-স্পৃহা চরিতার্থ করিতে দিবার চেষ্টা করা কি রাজপুরুষেরা উচিত জ্ঞান করেন না ?

পূর্ব্ব এবং পশ্চিম যদিও বিপরীত দিক্ তথাপি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য মানবপ্রকৃতি সম্পূর্ণ বিরোধীধর্ম্মাবলম্বী নহে। তাহা যদি হইত তবে ইংরাজি শিক্ষা, ইংরাজি শাসন-প্রণালি এদেশে মরুভূমিতে বীজ বপনের ন্যায় আদ্যোপান্ত নিষ্ফল হইত। বিরোধী-পক্ষীয়েরা হয়ত অবিশ্বাস করিবার মৌখিক ভান করিবেন তথাপি এ কথা আমরা বলিব, যে, যদিও আমরা প্রাচ্য এবং তোমাদের সাহায্যব্যতীত জাতীয়গৌরব উপার্জ্জন করিতে অক্ষম হইয়াছি তথাপি কোন্ অধিকার গৌরবের এবং কোন্ নিষেধ অপমানের তাহা আমাদের প্রাচ্য হৃদয়েও অনুভব করিতে পারি। আমাদের মানবপ্রকৃতির এতদূর পর্য্যন্ত বিকার হয় নাই যে, তোমরা যখন মহৎ অধিকার আমাদের হস্তে তুলিয়া দিবে তখন আমরা অসন্তুষ্ট হইব! আমাদের জাতিধর্ম্ম সহিষ্ণুতাকে তোমরা সম্যক্ অসাড়তা বলিয়া ভ্রম কর, তাহার কারণ তোমরা আমাদের সুখদুঃখবিরাগঅনুরাগপূর্ণ অন্তঃকরণের মধ্যে প্রবেশ করা অনাবশ্যক জ্ঞান করিয়া আসিতেছ। যদিও আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে চিরকাল যথেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্রের মধ্যে বাস করিয়া আসিতেছি; তথাপি মানবসাধারণের অন্তর্নিহিত স্বাধীনতাপ্রীতির মৃত্যুঞ্জয়ী বীজ আমাদের হৃদয়ে এখনো সম্পূর্ণ নির্জ্জীব হয় নাই।

আর কিছু না হৌক তোমাদের নিকটে আমাদের বেদনা, আমাদের অভাব জানাইবার অধিকার আমাদের হস্তে সমর্পণ করিলে অধিকতর সুখ-সন্তোষের কারণ হইবে এটুকু আমরা পূর্ব্বদিকে বাস করিয়াও এক রকম বুঝিতে পারি। অপেক্ষাকৃত পশ্চিমবাসী যোদ্ধৃজাতীয়দের মানসিক প্রকৃতি যে এ বিষয়ে আমাদের হইতে কিছুমাত্র পৃথক্ তাহাও মনে করিতে পারি না। অতএব দুঃখ নিবেদনের স্বাধীন অধিকার পাইলে ভারতবর্ষ যে অসন্তুষ্ট হইবে ইংলণ্ডবাসী ভারতহিতৈষীগণকে এরূপ গুরুতর দুশ্চিন্তা হইতে ক্ষান্ত থাকিতে অনুরোধ করিতে পারি!

অথচ সন্তোষ উদ্রেকের জন্য বেশি যে কিছু করিতে হইবে তাহাও নহে। যদি কর্ত্তৃপক্ষেরা বলিতেন 'তোমরা মন্ত্রিসভায় বসিবার একেবারেই যোগ্য নও, অতএব মিছে কানের কাছে বকিয়ো না।' তাহা হইলে আমরা ধমকটি খাইয়া শুষ্কমুখে আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরিয়া যাইতাম।

কিন্তু গোড়াকার প্রধান কঠিন সমস্যার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে; তোমাদের রাজতন্ত্রের পার্শ্বে আমাদিগকে স্থান দিয়া সম্মানিত করিয়াছ; আরো লোক বাড়াইতে চাও। তোমাদের শাসনতন্ত্রের মধ্যে অনেক বড় বড় পদেও আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। আমাদের যোগ্যতার প্রতি যে তোমাদের আন্তরিক বিশ্বাস আছে তাহার সহস্র পরিচয় দিয়াছ। তোমরা আপনা হইতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাদিগকে যে সকল

উচ্চ অধিকার দিয়াছ যে উন্নতিমঞ্চে আরোপন করিয়াছ তাহা আমাদের পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেকার স্বপ্নেরও অগম্য। আজ আমরা অন্তরের মধ্যে আত্মগৌরব অনুভব করিয়া আত্মবিশ্বাসের সহিত আমাদের লব্ধ অধিকার ঈষৎ বিস্তৃত করিবার প্রার্থনা করিতেছি বলিয়া কেন বিমুখ হইতেছ?

আমাদের মধ্যে যে যোগ্যতা আছে তাহা প্রমাণ করিবার অবসর ত তোমরাই দিয়াছ। আমাদের প্রতি তোমরা যখন জেলা শাসনের ভার দিলে তখনই আমরা নিজে জানিলাম যে আমরা শাসনভার লইবার যোগ্য, তোমরা যখন আমাদিগকে সর্ব্বোচ্চ বিচারাসনে স্থান দিলে তখন আমরা আপনারাই দেখিলাম আমরা সে গুরুতর কার্য্য-ভার ও উচ্চতর সম্মানের অধিকারী; তোমরা যখন ভারতীয় রাজকার্য্যের পরামর্শের জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিলে তখন আমরা প্রমাণ পাইলাম এই বিপুল রাজ্য-চালনকার্য্যে আমাদের অভিজ্ঞতাও উপেক্ষণীয় নহে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমাদের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করিয়া, আমাদের আশা উদ্রেক করিয়া আজ আমাদের শিক্ষা, আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহকে কোন্ মুখে নিস্ফল করিবে?

যখন প্রার্থনা করি নাই, এবং রাজশক্তির নিকট প্রার্থনা করিবার উপায় মাত্র জানিতাম না তখন তোমরা আমাদের উচ্চ অধিকারের ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছ। কিন্তু তদনুরূপ কার্য্য হয় নাই, তাহা তোমরাও স্বীকার করিতেছ এবং আমরাও অনুভব করিতেছি। এক প্রকার উচ্ছৃঙ্খল বদান্যতা আছে যাহা সহসা স্বতঃ উৎসারিত উচ্ছাস-প্রাচুর্য্যে মুক্তহস্ত হইয়া উঠে, কিন্তু স্বহস্তরচিত ঋণপত্র বা প্রতিশ্রুতি লিপি দেখিলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূর্ত্তি ধারণ করে। যাহা আকস্মিক আবেগে বৃহৎ অঙ্গীকারে জড়িত হয় এবং অবশেষে ন্যায়্য উপায়ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার ছলে বলে সেই স্বেচ্ছাকৃত অঙ্গীকারপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে চেষ্টা করে।

দেখা যাইতেছে, তোমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাদিগকে বৃহৎ অধিকার দিতে স্বীকার করিয়াছ এবং কিছু কিছু দিয়াছ। কিন্তু তোমাদের প্রতিজ্ঞাপত্রের আশ্বাস অনুসারিণী অধিকারপ্রার্থনাকে তোমরা রাজভক্তির অভাব বলিয়া অত্যন্ত উষ্ণতা প্রকাশ কর। কিন্তু মনে মনে কি জাননা ইহাতেই যথার্থ রাজভক্তি প্রকাশ পায়?

তোমাদের নিকটে যাহা প্রার্থনা করিতেছি তাহা কোন বিজিত জাতি কোন জেতৃ-জাতির নিকট বিশ্বাসপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতে পারিত না। ইহাই তোমাদের প্রতি যথার্থ ভক্তি, সেলাম করা বা জুতা খোলা নহে।

আমাদের মধ্যে কেহ কেহ মুখে যাহাই বলি, যখনি তোমাদের নিকট উন্নত অধিকার প্রত্যাশা করি তখনি তোমাদের মহৎ মনুষ্যত্বের প্রতি কি সুগভীর আন্তরিক ভক্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে! তোমরা আপন রক্তপাত করিয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছ এবং আপন প্রচণ্ড বলে এই আসমুদ্র আহিমাচল বিপুল ভারত-ভূমিকে করতলন্যস্ত

আমলকের ন্যায় আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছ আমাদের মনে এ আশা কোথা হইতে জন্মিল যে তোমাদের ঐ মহিমান্বিত রাজপ্রাসাদের উচ্চ সোপান আমাদের পক্ষে অনধিগম্য নহে। অবশ্যই, তোমাদের খাপের মধ্য হইতে যেমন তরবারী মধ্যে মধ্যে মহেন্দ্রের বজ্রের ন্যায় আপন বিদ্যুৎ আভা প্রকাশ করিয়াছে তেমনি তোমাদের অন্তরের মধ্যে যে দীপ্ত মনুষ্যত্বের মহিমা বিরাজ করিতেছে তাহাও প্রবল শাসনের মধ্য হইতে মাভৈঃ শব্দে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। নিম্নে ভূমিতলে দ্বারের নিকট যে প্রহরী বন্দুকের উপরে সঙ্গীন্ চড়াইয়া দাঁড়াইয়া থাকে তাহার অপ্রসন্ন মুখে নিষেধের ভাব দেখা যায়, কিন্তু যে জ্যোতিষ্মান পুরুষ প্রাসাদের শিখর দেশে দাঁড়াইয়া আছে সে আমাদিগকে অভয়দান করিয়া আহ্বান করিতেছে। ঐ দুর্ম্মুখ প্রহরীটাকে আমরা ভয় করি এবং মাঝে মাঝে সুযোগ পাইলেই তাহার শক্তিশেলের লক্ষ্য এড়াইয়া তাহার প্রতি নিষ্ফল কটুকাটব্যও প্রয়োগ করিয়া থাকি কিন্তু সেই প্রসন্নমূর্ত্তি মহাপুরুষের মুখের দিকে আমরা আশান্বিত চিত্তে চাহিয়া আছি। ইহাকেই কি ভক্তির অভাব বলে!

এক ইংরাজ আমাদের প্রতি কট্মট্ করিয়া তাকায়। আর এক ইংরাজ উপর হইতে আপন মহত্ত্বের প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করে। এই জন্য ভয়ের অপেক্ষা ভক্তিই প্রবল হয়। আশঙ্কার উপরে আশাই জয়লাভ করে। এবং আমাদের এই আশাই যথার্থ রাজভক্তি।

দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, আমাদের মধ্যে ক্ষুদ্র এক দল আছেন ইংরাজবিদ্বেষ তাঁহাদের মনে এতই বলবান যে কন্‌গ্রেসের প্রতি কিছুতেই তাঁহারা প্রসন্ন দৃষ্টিক্ষেপ করিতে পারেন না। তাঁহারা নীরবে রাজবিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান, ইংরাজের নিকট উপকার প্রত্যাশা করে বলিয়াই তাঁহারা কন্‌গ্রেসের প্রতি বিমুখ। ইহাঁদের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই কন্‌গ্রেসের যথার্থ ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

ইহাঁরা বলেন ইংরাজ কি তেমনি পাত্র! এতকাল যাহারা তোমাদিগকে কথায় ভুলাইয়া আসিয়াছে তাহারা কি আজ তোমাদের কথায় ভুলিবে! তোমরা এ বিদ্যা কত দিনই বা শিখিয়াছ! উহাদের কথার সহিত কাজের মিল করাইবার জন্য দাবী করিয়া বসিলে লাভে হইতে ফল হইবে এই যে, মিষ্ট কথাটুকু হইতেও বঞ্চিত হইবে। তাহার প্রমাণ হাতে হাতে দেখ। যে অবধি তোমরা উক্ত দেশহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ সেই অবধি পায়োনিয়র প্রমুখ দেশের ইংরাজি কাগজ খৃষ্টানজনোচিত ভাব সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছে। স্বয়ং বড়কর্ত্তা সালিস্‌বারি আর থাকিতে পারিলেন না, প্রকাশ্যে তোমাদের কালামুখের উপর মুখনাড়া দিলেন। মিষ্টবাক্য মধুর আশ্বাস এ সকল সভ্যতার ভূষণ—এগুলোকে তোমরা এত বেশি খাঁটি বলিয়া ধরিয়া লইতেছ যে দায়ে ফেলিয়া অবশেষে ইংরাজের মধুর সভ্যতা এবং শোভন ভদ্রতা-

কুও তাড়াইবে। একদিন দেখিবে মিষ্টান্নও নাই মিষ্ট বচনও নাই। দেখ না কেন র্ত্তৃজাতীয়দের কেহ কেহ এতদূর পর্য্যন্ত স্পষ্টবক্তা হইয়াছেন যে এই উনবিংশ খৃষ্ট-তাব্দীর অপরাহ্ণ ভাগে তাঁহারা অসঙ্কোচে এমন কথা বলিতেছেন যে "তরবারি দ্বারা আমরা জয় করিয়াছি তরবারি দ্বারা আমরা রক্ষা করিব।" অর্থাৎ মানবপ্রেম নিঃস্বার্থ উপচিকীর্ষা এ সকল ধর্ম্মবচন কেবল নিজের উপরেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে তরবারীলব্ধ ভারতবর্ষের প্রতি এসকল খৃষ্টীয় বিধান খাটে না। দেখ একবার কি কাণ্ডটা করিয়াছ! স্বয়ং উনবিংশ শতাব্দীর বোল ফিরাইয়া দিয়াছ! তবে আর তাহার অবশিষ্ট কি রাখিলে! তাহার তরবারী এবং জিহ্বা দুটোই সমান প্রখর হইয়া উঠিল, ধর্ম্মনীতি কোথাও স্থান পাইল না!

কিন্তু কন্‌গ্রেসের ভিত্তি ইংরাজবিশ্বাসের উপর স্থাপিত। কন্‌গ্রেস্ বলে, অবশ্য মনুষ্যচরিত্র একেবারে দেবতুল্য নহে। ক্ষমতা-লালসা, প্রভুত্বপ্রিয়তা, স্বার্থপরতা ইংরাজের হৃদয়েও আছে কিন্তু তাহা ছাড়া আরো এমন কিছু আছে যাহাতে করিয়া ইংরাজের প্রতি আমাদের বিশ্বাস হ্রাস হয় না। প্রতিদিন গালি খাইতেছি, লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছি তবুও কোথা হইতে অন্তরের মধ্যে অভয় প্রাপ্ত হইতেছি।

ইংরাজি সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী "ষড়যন্ত্রকারী বাবু সম্প্রদায়," 'মুখসর্ব্বস্ব বাক্যবীর" ইত্যাদি বিশেষণের মধ্যে আপন গাত্রজ্বালা নিহিত করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে সশব্দে আমাদের প্রতি নিক্ষেপ করিতেছেন। আমরা হাসিয়া বলিতেছি, কথা তোমরাও কিছু কম বল না! তোমরা যদি আরম্ভ কর ত আমরা কি তোমাদের সঙ্গে কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারি! তোমাদের কাছেই আমাদের শিক্ষা। কথার বারব-শক্তিতেই ত তোমাদের এত বড় রাজনৈতিক যন্ত্রটা চলিতেছে। কথাভরাভরা রাশি রাশি পুঁথি জাহাজে করিয়া প্রতিনিয়ত আমাদের নিকট প্রেরণ করিতেছ এত দিন মুখস্থ করিয়াও যদি দুটো কথা কহিতে না শিখিলাম তবে আর কি শিখিলাম! তোমা-দের নিকট হইতে শিখিয়াছি কথাই তোমাদের উনবিংশ শতাব্দীর ব্রহ্মাস্ত্র। কামান বন্দুক ক্রমশঃ নীরব হইয়া আসিতেছে।

অবশ্য ভাল কথা এবং মন্দ কথা দুইই আছে। আমরা যে সব সময়ে মিষ্ট কথাই বলি তাহা নহে। কিন্তু তোমরাও যে বল তাহাও সত্যের অনুরোধে বলিতে পারি না।

সকলেই স্বীকার করিবেন নির্ব্বাপিত জঠরানলে সার্ব্বভৌমিক প্রেম অত্যন্ত সহজ হইয়া আসে। তোমরা প্রভু, তোমরা কর্ত্তা তোমরা বিজেতা, তোমরা স্বাধীন, আমাদের তুলনায় সর্ব্বতোভাবে সকল প্রকার সুবিধাই তোমাদের আছে, তোমাদের পক্ষে সহিষ্ণু হওয়া উদার হওয়া ক্ষমাপরায়ণ হওয়া কত অনায়াসসাধ্য। আমাদের মনে স্বভাবতঃ অনেক সময়ে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়, আমরা তোমাদের অপেক্ষা দুর্ভাগ্য, দরিদ্র এবং অসহায়, আমাদের স্বজাতীয়ের প্রতি তোমাদের বিজা-

তীয় ঘৃণা অথবা কৃপাদৃষ্টি অনেক সময়ে পরিস্ফুট আকারে প্রকাশ পায় আমরা সে ঘৃণার যোগ্য পাত্র হই বা না হই তাহার অপমানবিষ অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি না; অতএব আমরা যদি অসহিষ্ণু হইয়া কখনো অসংযত কথা বলিয়া ফেলি, অথবা ক্ষুব্ধ অভিমানকে সান্ত্বনা করিবার আশায় মুখে তোমাদিগকে লঙ্ঘন করিবার ভাণ করি তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তোমাদের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে, ক্ষমতার মধ্যে, সৌভাগ্যসুখের মধ্যে থাকিয়াও অসম্বৃত হইয়া তোমরা আমাদের প্রতি এমন রূঢ়ভাষা প্রয়োগ কর যাহাতে তোমাদের আন্তরিক দৈন্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। তোমরা নিজের রসনাকে যখনি সংযত করিতে পার না তখনি আমাদিগকে বল বাক্যবাগীশ। আমাদের আবার এমনি দুর্ভাগ্য তোমাদের ভাষা লইয়াই তোমাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয় সুতরাং তাহাতেও হার মানিয়া আছি।

আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই বাক্যকেই আমরা একমাত্র সম্বল করিতেছি বলিয়া তোমরা এত বিরক্ত হও কেন? আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের মধ্যে একদল আছেন, তাঁহারা কথা কহিতে চান না, যেটুকু কহেন তাহাতে এত অতিমাত্রায় রাজভক্তির আড়ম্বর যে তাহাতে তোমরাও ভোল না আমরাও ভুলি না; তাঁহারা ইংরাজি শিক্ষার নিকটেও অধিক পরিমাণে ঋণী নহেন, ইংরাজের রাজত্ব আসিয়াও তাঁহাদের গৌরব বা সুখ-সমৃদ্ধির বৃদ্ধি করে নাই—সামান্য অধিকার এবং সামান্য সম্মানকে তাঁহারা স্বভাবতই উপহাসযোগ্য মনে করেন; তাঁহারা যেরূপ সাবধান চোরা মৌনভাব অবলম্বন করিতে চাহেন, তাঁহারা যেরূপ গবর্মেণ্টের সকল কথাতেই অতিরিক্ত পরিমাণে স্কন্ধ আন্দোলন করিয়া রাজভক্তির প্রচুর আস্ফালন করেন সেইরূপ ভাবই কি তোমরা প্রার্থনীয় জ্ঞান কর?

আমাদের একমাত্র বিশ্বাস কথার উপরে; হয়ত আমাদের কোন কোন মুসলমান ভ্রাতার তাহা নাই, এ জন্য বরং তোমাদের নিকট হইতেও আমরা বাক্যবাগীশ নামে অভিহিত হইতে রাজি আছি তথাপি কন্‌গ্রেসের বিরোধী পক্ষে যোগ দিতে পারিব না। তোমাদের প্রতি ভক্তি আছে বলিয়াই কথা কহি, নহিলে নীরব হইয়া থাকিতাম তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব তোমরা কন্‌গ্রেসের প্রতি সন্দিগ্ধ ভাব দূর করিয়া কন্‌গ্রেসের চতুর মৌনী বিরোধী পক্ষের প্রতি সন্দেহ স্থাপন কর।

কন্‌গ্রেস্ আর এক উপায়ে রাজভক্তি শিক্ষা দিতেছে।

ইংরাজেরই মহিমা কন্‌গ্রেসের অস্থিমজ্জার মধ্যে জীবন সঞ্চার করিতেছে। ইংরাজেরই মহৎ উজ্জ্বল অপূর্ব্ব নিঃস্বার্থ প্রীতি কন্‌গ্রেসের মর্ম্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠা-স্থাপন করিয়া তাহাকে অলৌকিক বলে বলীয়ান্ করিতেছে। বাহিরে পায়োনিয়রের স্তম্ভে, রাজকর্ম্মচারীদের প্রকাশ্য ও গোপন কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে ইংরাজের যে অনুদারতার পরিচয় পাইতেছি এদিকে দুর্ভগা দরিদ্র জাতির জন্য হিউমের সম্পূর্ণ আত্ম

সর্জ্জন, ইউল ও বেডারবর্ণের জ্যোতির্ম্ময় সহৃদয়তা আমাদের অত্যন্ত নিকটে থাকিয়া আমাদের অন্তরের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতেছে।

ইংরাজ জাতি যে কত মহৎ কন্‌গ্রেস্ না থাকিলে তাহার এমন নিকট প্রমাণ পাইবার আমাদের অবসর হইত না। সেই প্রমাণ পাইবার অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ইংরাজে এবং ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ স্বার্থের সংঘর্ষ, এবং ইংরাজ এখানে প্রভুপদে প্রতিষ্ঠিত, ক্ষমতামদে মত্ত, সুতরাং স্বভাবতঃ ইংরাজের ব্যক্তিগত মহত্ত্ব ভারতবর্ষে তেমন স্ফূর্ত্তি পায় না, বরঞ্চ তাহার ক্ষুদ্রতা নিষ্ঠুরতা দানবভাব অনেক সময়ে সজাগ হইয়া উঠে।

এদিকে ইংরাজি সাহিত্যে আমরা ইংরাজি চরিত্রের উচ্চ আদর্শ দেখিতে পাই, অথচ প্রত্যক্ষ সম্পর্কে ইংরাজের মধ্যে তাহার পরিচয় পাই না—এইরূপে য়ুরোপীয় সভ্যতার উপর আমাদের অবিশ্বাস ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছিল। আমাদের শিক্ষিত লোকের মনে অল্পদিন হইল ইংরাজের ঊনবিংশ শতাব্দীর স্পর্দ্ধিত সভ্যতার উপর এইরূপ একটা ঘোরতর সংশয় জন্মিয়াছে। সমস্ত ফাঁকি বলিয়া মনে হইতেছে। সকলে ভীত হইয়া মনে করিতেছেন আমাদের প্রাচীন রীতিনীতির জীর্ণ দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। ইংরাজি সভ্যতার মধ্যে সহৃদয়তা ও অকৃত্রিমতা নাই।

ইহার প্রধান কারণ ইংরাজের নিকট হইতে সহৃদয়তা প্রত্যাশা করিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি, এবং আমাদের আহত হৃদয়ের বেদনায় ইংরাজি সভ্যতাকে আমরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিতেছি। এমন সময়ে হিউম্, ইউল্, বেডর্‌বর্ণ কন্‌গ্রেস্‌কে অবলম্বন করিয়া আমাদের সেই নষ্ট বিশ্বাস উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাতে যে কেবল আমাদের রাজনৈতিক উন্নতি হইবে তাহা নহে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা যে নূতন শিক্ষা নূতন সভ্যতার আশ্রয়ে আনীত হইয়াছি তাহার প্রতি বিশ্বাস বলিষ্ঠ হইয়া তাহার সুফল সকল স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিব এবং এইরূপে আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইবে। আমরা ইতিহাসে ও সাহিত্যে ইংরাজের যে মহৎ আদর্শ লাভ করিয়াছি সেই আদর্শ মূর্ত্তিমান ও জীবন্ত হইয়া আমাদিগকে মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর করিয়া দিবে।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে যতই সাধু-প্রসঙ্গ ও সৎশিক্ষা থাক্ তাহা এক হিসাবে মৃত, কারণ যে সকল মহাপুরুষেরা সেই সাধুভাবসকলকে প্রাণদান করিয়াছিলেন এবং যাহা হইতে পুনশ্চ প্রাণলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আর বর্ত্তমান নাই; কেবল শুষ্ক উপদেশ আমাদের অসাড় জীবনকে চৈতন্যদান করিতে পারে না। আমরা মানুষ চাই। বর্ত্তমান সভ্যতা যাঁহাদিগকে মহৎজীবন দান করিয়াছে, এবং যাঁহারা বর্ত্তমান সভ্যতাকে সেই জীবন প্রত্যর্পণ করিয়া সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন সেই সকল মহাপুরুষের মহৎ প্রভাব প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে চাই তবে আমাদের শিক্ষা ও চরিত্র সম্পূর্ণতা

লাভ করিবে। হিউমকে নিকটে পাইয়া আমাদের ইংরাজি ইতিহাসশিক্ষার ফল সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে—নতুবা আমরা যে সকল উদাহরণ দেখিয়াছি ও দেখিতেছি তাহাতে সে শিক্ষা অনেক পরিমাণে নিস্ফল হইয়া যাইতেছিল।

অতএব কন্‌গ্রেসের দ্বারায় উত্তরোত্তর আমাদের যথার্থ রাজভক্তি বৃদ্ধি হইতেছে এবং মহৎ মনুষ্যত্বের নিকটসংস্পর্শ লাভ করিয়া আমাদের জীবনের মধ্যে অলক্ষিতভাবে মহত্ব সঞ্চারিত হইতেছে!

আমরা কথা কহি বলিয়া যে ইংরাজি সম্পাদকেরা আমাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন তাঁহাদের মনের ভাব যে কি তাহা ঠিক জানি না। বোধ করি তাঁহারা বলিতে চান তোমরা কাজ কর।

ঠিক সেই কথাটাই হইতেছে! কাজ করিতেই চাই। সেই জন্যই আগমন! যখন আমরা কাজ চাহিতেছি তখন তোমরা বলিতেছ, কথা কহিতেছ কেন! আচ্ছা দাও কাজ!

অমনি তোমরা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিবে, "না না সে কাজের কথা হইতেছে না, তোমরা আপন সমাজের কাজ কর!"

আমরা সমাজের কাজ করি কি না করি সে খবর তোমরা রাখ কি? যখনি কাজ চাহিলাম অমনি আমাদের সমাজের প্রতি তোমাদের সহসা একান্ত অনুরাগ জন্মিল। আমাদের সমাজের কাজে যদি আমরা কোন শৈথিল্য করি আমাদেরও চৈতন্য করাইবার লোক আছে; জানইত বাক্‌শক্তিতে আমরা দুর্ব্বল নহি; অতএব পরামর্শ বিলাত হইতে আমদানী করা নিতান্ত বাহুল্য।

যাঁহারা রাজনীতিকে সমাজনীতির অপেক্ষা প্রাধান্য দিয়া থাকেন, যাঁহারা রাজপুরুষদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি উদ্রেক করাইতে নিরতিশয় ব্যাপৃত থাকিয়া নিজের কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলা করেন তাঁহারা অন্যায় করেন, এবং সে সম্বন্ধে আমাদের স্বজাতীয়দিগকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য আমরা মাঝে মাঝে চেষ্টার ত্রুটি করি না। শ্রোতৃবর্গ বোধ করি বিস্মৃত হইবেন না, বর্ত্তমান বক্তাও ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও ক্ষুদ্রশক্তি অনুসারে মধ্যে মধ্যে অগত্যা এইরূপ অপ্রীতিকর চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কর্ত্তব্যের আপেক্ষিক গুরুলঘুতা সকল সময়ে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া চলা কোন জাতির নিকট হইতেই আশা করা যাইতে পারে না। অন্ধতা, হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা বা কৃত্রিম প্রথা দ্বারা নীত হইয়া তোমাদের স্বজাতীয়েরা যখনি যথার্থ পথ পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং অপ্রকৃতকে প্রকৃতের অপেক্ষা অধিকতর সম্মান দিয়াছে, তখনি তোমাদের চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ, তোমাদের কার্লাইল, ম্যাথ্যু আর্নল্ড, রস্কিন্, স্বজাতিকে সতর্ক করিতে ভূয়োভূয়ঃ চেষ্টা করিয়াছেন।

তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হইতেছে কি না বলা কঠিন। কারণ সামাজিক সংস্কার-

কার্য্য অপেক্ষাকৃত নিঃশব্দে নিগূঢ় অলক্ষিতভাবে সাধিত হইয়া থাকে। নৈসর্গিক জীবন্তশক্তির ন্যায় সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখে। তাহার প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ হিসাব পাওয়া দুঃসাধ্য।

আমাদের সমাজেও সেইরূপ জীবনের কার্য্য চলিতেছে, তাহা বিদেশীয়দৃষ্টিগোচর নহে। এমন কি স্বদেশীয়ের পক্ষেও সমাজের পরিবর্ত্তন প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভবযোগ্য হইতে পারে না।

অতএব আমাদের সমাজের ভার আমাদের দেশের চিন্তাশীল লোকদের প্রতি অর্পণ করিয়া যে কথাটা তোমাদের কাছে উঠিয়াছে আপাততঃ তাহারই উপযুক্ত যুক্তি দ্বারা তাহার বিচার কর। বল যে তোমরা অযোগ্য অথবা বল যে আমাদের ইচ্ছা নাই— কিন্তু "তোমাদের বাল্য বিবাহ আছে" বা "বিধবা বিবাহ নাই" একথাটা নিতান্তই অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। সামাজিক অসম্পূর্ণতা তোমাদের দেশেও আছে এবং পূর্ব্বে হয়ত আরো অনেক ছিল কিন্তু সে কথা বলিয়া তোমাদের বক্তৃতা কেহ বন্ধ করে নাই তোমাদের রাজনৈতিক প্রার্থনা কেহ নিরাশ করে নাই।

তোমরা এমন কথাও বলিতে পারিতে যে তোমাদের দেশে আমাদের মত এমন সঙ্গীতচর্চ্চা ও চিত্রশিল্পের আদর এখনো হয় নাই অতএব তোমাদের কোন কথাই শুনিতে চাহি না। ইহা অপেক্ষা বলা ভাল "আমার ইচ্ছা আমি শুনিব না।" তাহাতে তোমাদেরও কথা অনেকটা সংক্ষেপ হইয়া আসে। কিন্তু তোমাদের জাতির মধ্যেই তোমাদের অপেক্ষা আরো উচ্চ বিচারশালা আছে সেই জন্যই আমরা আশা ত্যাগ করি নাই এবং সেই জন্যই আমাদের কন্‌গ্রেস্‌।

যদিও আমার এ সকল কথা তোমাদের কর্ণগোচর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই; কারণ আমাদের সমাজের মঙ্গলের প্রতি তোমাদের অত্যন্ত প্রচুর অনুরাগ সত্বেও আমাদের ভাষা তোমরা জান না; জানিতে ইচ্ছাও কর না; তথাপি দুরাশায় ভর করিয়া আমাদের কন্‌গ্রেসের প্রতি তোমাদের অকারণ অবিশ্বাস দূর করিবার জন্য মাঝে হইতে তৎসম্বন্ধে এতটা কথা বলিলাম। দেখাইলাম তোমাদের প্রতি ভক্তিই কন্‌গ্রেসের একমাত্র আশা ও সম্বল।

অতএব কন্‌গ্রেসের নিকট হইতে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইতেছে তাহার প্রতি এমন ভ্রূকুটি করিয়া থাকা তোমাদের বিবেচনার ভুল। তাহার প্রতি প্রসন্ন কর্ণপাত করা রাজনৈতিক ধর্ম্মনৈতিক সকল প্রকার কারণে তোমাদের কর্ত্তব্য। কারণ কন্‌গ্রেস্‌ জেতৃ ও জিতজাতির মধ্যে সেতুবন্ধন করিয়া দিতেছে।

গবর্মেণ্টের দ্বারা মন্ত্রি নিয়োগ অপেক্ষা সাধারণ লোকের দ্বারা মন্ত্রি অভিষেক অনেক কারণে আমাদের নিকটে প্রার্থনীয় মনে হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সন্তোষ একটি প্রধান কারণ। আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী এই

অধিকার প্রার্থনা করিতেছে। যদি ইহা দান করিলে গবর্মেণ্টের কোন ক্ষতি না হয় ত প্রজারঞ্জন একটা মহৎলাভ।

গবর্ণমেণ্ট শব্দটা শুনিবামাত্র হঠাৎ ভ্রম হয় যেন তাহা মানবধর্ম্মবিবর্জ্জিত নির্গুণ পদার্থ। যেন তাহা রাগদ্বেষবিহীন; যেন তাহা স্তবে বিচলিত হয় না, বাহ্য চাক্‌চিক্যে ভোলে না, যেন তাহার আত্মপর বিচার নাই, যেন তাহা নিরপেক্ষ কটাক্ষের দ্বারা মন্ত্রবলে মানব চরিত্রের রহস্য ভেদ করিতে পারে। অতএব এরূপ অপক্ষপাতী সর্ব্বদর্শী অলৌকিক পুরুষের হস্তেই নির্ব্বাচনের ভার থাকিলেই যেন ভাল হয়।

কিন্তু আমরা নিশ্চয় জানি গবর্ণমেণ্ট আমাদেরি ন্যায় অনেকটা রক্তে মাংসে গঠিত। উক্ত গবর্ণমেণ্ট নিমন্ত্রণে যান, বিনীত সম্ভাষণে আপ্যায়িত হন, লন্‌টেনিস্‌ খেলেন, মহিলাদের সহিত মধুরালাপ করেন এবং অধম আমাদেরি মত সামাজিক স্তুতিনিন্দায় বহুল পরিমাণে বিচলিত হইয়া থাকেন।

অতএব এস্থলে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নির্ব্বাচনের অর্থ আর কিছুই নয়, একটি বা দুইটি বা অল্প সংখ্যক ইংরাজের দ্বারা নির্ব্বাচন।

কিন্তু আমরা পদে পদে প্রমাণ পাইয়াছি ভারতবর্ষীয় ইংরাজেরা নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি একান্ত অনুরক্ত নহেন। কারণ নব্যরুচিঅনুসারে ইঁহারা চষ্‌মা ব্যবহার করেন, দাড়ি রাখেন, ইংরাজি জুতা পরেন, এবং সে জুতা সহজে খুলিতে চাহেন না। তদ্ভিন্ন ইঁহাদের স্বাতন্ত্র্য প্রিয়তা, ইঁহাদের ঔদ্ধত্য, ইঁহাদের বক্তৃতাশক্তি প্রভৃতি নানা কারণে তাঁহারা একান্ত উদ্বেজিত হইয়া আছেন। অতএব তাঁহাদের হস্তে নির্ব্বাচনের ভার থাকিলে এই শিক্ষিত দলের পক্ষে বড় আশার কারণ নাই। ইঁহাদের দর্প চূর্ণ করা তাঁহারা রাজনৈতিক কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন। অতএব শিক্ষিত লোকেরা তাঁহাদের দ্বারে প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলে কেবল যে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবেন তাহা নহে উপরন্তু সাহেবের নিকট দুটো শ্রুতিপরুষ অথচ বাৎসল্যগর্ভ উপদেশ শুনিয়া এবং প্রবেশাধিকারের মূল্যস্বরূপ দ্বারীকে কিঞ্চিৎ দণ্ড দিয়া আসিতে হইবে।

কিন্তু ইংরাজিশিক্ষা কিছু এমনি বিড়ম্বনা নহে যে কেবল শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সকল প্রকার যোগ্যতা লাভে অক্ষম হইয়াছেন। অতএব শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতি ভারতবর্ষীয় ইংরাজের এই যে বিরাগ তাহা কেবল ব্যক্তিগত রুচিবিকার মাত্র, তাহা যুক্তিসঙ্গত ন্যায়সঙ্গত নহে।

তদ্ভিন্ন তাঁহারা কয় জন দেশীয় উপযুক্ত লোককে রীতিমত জানেন? তাঁহাদের নির্ব্বাচনক্ষেত্রের পরিধি কতই সঙ্কীর্ণ। উপাধিবান রাজা উপরাজার সহিতই তাঁহাদের কিয়ৎপরিমাণ মৌখিক আলাপ আছে মাত্র। মন্ত্রিসভায় আসন পাওয়া যাঁহারা কেবলমাত্র সম্মান বলিয়া জ্ঞান করেন জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেন না তাঁহারাই অধিকাংশ সময়ে সেখানে স্থান পাইয়া থাকেন।

অবশ্য, সময়ে সময়ে ইহার ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছে। অনেক যোগ্য ব্যক্তিও স্থান পাইয়াছেন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো সহিত বর্ত্তমান বক্তার পরম গৌরবের আত্মীয়তা সম্পর্ক আছে। কিন্তু সে সকল যোগ্য ব্যক্তি সাধারণের অপরিচিত নহেন। সাধারণের দ্বারা তাঁহাদের নির্ব্বাচিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল।

আমার জিজ্ঞাস্য কেবল এই যে, আমাদের অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের অর্থাৎ দুই চারি জন ইংরাজের এবিষয়ে অধিক অভিজ্ঞতা কোথায়? আমাদের শিক্ষিতসাধারণে যাঁহাদিগকে বড়লোক বলিয়া জানেন তাঁহাদের অবশ্য কিছু না কিছু যোগ্যতা আছেই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যাঁহাদিগকে বড় লোক বলিয়া জানেন, তাঁহাদের বিপুল ঐশ্বর্য্য, বৃহৎ শিরোপা, বা অতিবিনীত সেলামের ক্ষমতা থাকিতে পারে কিন্তু যথার্থ যোগ্যতা না থাকিতেও পারে।

আমরা যতদূর দেখিতে পাই তাহাতে আমাদের বিশ্বাস, মন্ত্রিসভায় দেশীয় মন্ত্রী নিয়োগ গবর্ণমেণ্ট তেমন অত্যাবশ্যক মনে করেন না, সুতরাং নির্ব্বাচনের সময় যথেষ্ট সাবধান ও বিবেচনার সহিত কাজ করা তাঁহারা অনেকটা বাহুল্য বোধ করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের ভাব ঠিক তাহার বিপরীত। গবর্ণমেণ্টকে বাস্তবিক সুপরামর্শ দিয়া দেশের হিতসাধন করিতে হইবে এবং স্বজাতির যোগ্যতা প্রমাণ করিয়া গৌরব লাভ করিব, এই আমাদের উদ্দেশ্য, কেবলমাত্র সভাগৃহের শোভাসম্পাদনে আমাদের কোন ফল নাই স্বার্থ নাই। সুতরাং নির্ব্বাচনের সময় আমাদিগকে সবিশেষ বিবেচনার সহিত কাজ করিতে হইবে।

পুনশ্চ, গবর্ণমেণ্ট যাঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন তাঁহারা গবর্ণণ্টের অনুগ্রহআশ্রয়ে নির্ভয়ে থাকিতে পারেন, আমাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির সে আশা নাই, সুতরাং খুব মজবুৎ দেখিয়াই লোক বাছিতে হইবে। অতএব আমাদের হাতে যোগ্য লোক বাছাই হইবার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

অর্থাৎ গ্রাম্য ভাষায় যাহাকে "গরজ" বলে তাহার দ্বারা সংসারের অধিকাংশ কাজ হইয়া থাকে। মন্ত্রিসভায় দেশীয় লোক নির্ব্বাচন করিতে গবর্ণমেণ্টের কোন গরজ দেখা যাইতেছে না। অর্দ্ধ অনিচ্ছার সহিত তাঁহারা একটা আপোষে মীমাংসা করিতে চাহেন। লর্ড্ ক্রস্ বলেন যদি ভারত শাসনকর্ত্তারা ইচ্ছা করেন ত নিজে গুটিকতক দেশীয় লোক নির্ব্বাচন করিয়া মন্ত্রীসংখ্যা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে পারেন। আমাদের ভারত রাজকর্ম্মচারীগণও এবিষয়ে যে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন তাহা বলিতে পারি না।

অতএব যখন দেশীয় মন্ত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে গবর্ণমেণ্টের কিছুমাত্র গরজ নাই, অর্থাৎ তাঁহাদের মতে দুই চারিটা দেশী লোককে ডাকিলেও চলে, না ডাকিলে হয়ত আরো

ভালো চলে তখন তাঁহাদের হাতে নির্ব্বাচনের ভার কোন্ সাহসে দিই। গরজ আমাদেরই। অতএব আমরাই যথার্থ নির্ব্বাচনের অধিকারী।

এমন দুরাশাও আমরা করিতেছি না যে আমাদের প্রতিনিধিদের হস্তে রাজক্ষমতা থাকিবে। তাঁহারা কেবল নিবেদন করিবেন মাত্র, বিচারের ভার কার্য্যের ভার তোমাদের। আমরা কেবল জানাইতে চাহি ও জানিতে চাহি। তোমরা আমাদের উপর আইন খাটাইবে। আমরা আমাদের গায়ের মাপ দিতে চাহি। দেখাইতে চাহি কোথায় কষাকষি করিলে আমাদের নিঃশ্বাস রোধ হইয়া আসে, এবং কোথায় ঢিলা হইলে আমাদের অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্য ও আরামের ব্যাঘাৎ হয়।

অতএব আমাদেরই লোক যদি না পাঠাইলাম তবে আমাদের আবশ্যক কে জানাইবে? তোমরা যাহাকে নির্ব্বাচন করিয়া সম্মানিত কর সে স্বভাবতই কিয়ৎ পরিমাণে তোমাদের অঙ্গভঙ্গীর অনুকরণ করে ও তোমাদেরই ধ্বনিকে প্রতিধ্বনিত করে মাত্র। তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা জানাইতে সহজে তাহার প্রবৃত্তি হইতেই পারে না।

এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে একটি প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক। তোমরা যে অতিরিক্ত আরো গুটিকতক দেশীয় লোক মন্ত্রিসভায় আহ্বান করিতেছ তাহার উদ্দেশ্য কি? আমাদের অভাব আমাদের আবশ্যক আমাদের লোকের মুখে আরো ভাল করিয়া জানিতে চাও। ইহা ছাড়া দেশীয় মন্ত্রিবৃদ্ধির আর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। যদি বাস্তবিক সেই উদ্দেশ্যই থাকে তবে সহজেই বুঝিতে পারিবে তোমাদের নির্ব্বাচনে তাহা সম্পূর্ণ সাধিত হইবার সম্ভাবনা অল্প, এবং আমাদের নির্ব্বাচনেই সেই উদ্দেশ্য বাস্তবিক সফল হইবে। আগে একটা উদ্দেশ্য পরিষ্কাররূপে স্থির কর, তার পরে সে উদ্দেশ্য কিসে সিদ্ধ হইবে বিবেচনা করিয়া দেখ।

যদি বল উদ্দেশ্য বিশেষ কিছুই নাই, আমরা দেশীয় মন্ত্রীর কোন আবশ্যক বোধ করিতেছি না; কেবল, তোমরা কিছুদিন হইতে বড় বিরক্ত করিতেছ তাই অল্পস্বল্প খোরাক দিয়া তোমাদের মুখ বন্ধ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তবে সে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই আজই তাহার প্রমাণ। আজ আমরা এই সহরের যত বক্তা এবং যত শ্রোতা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাশয্যা হইতে কায়ক্লেশে গাত্রোত্থান করিয়া ভগ্নক্ষীণকণ্ঠে আপত্তি উত্থাপন করিতে আসিয়াছি; শরীর যতই সুস্থ ও কণ্ঠস্বর যতই সবল হইতে থাকিবে আমাদের আপত্তি ততই অধিকতর তেজ ও বায়ুবল লাভ করিতে থাকিবে সন্দেহ নাই।

আমাদের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধিগণের মধ্যে অনেকেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতরাজ্যতন্ত্রে প্রজাসাধারণের দ্বারা মন্ত্রী নির্ব্বাচন কোন না কোন উপায়ে প্রবর্ত্তিত করা যুক্তিসঙ্গত। এ সম্বন্ধে লর্ড্ নর্থব্রুক্, লর্ড্ রিপন্, লর্ড্ ডফারিন্, স্যর্

রিচার্ড টেম্পল্ প্রভৃতির কথা কতদূর শ্রদ্ধার যোগ্য তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহাদের উপরে আমাদের আর নূতন যুক্তি দেখাইবার আবশ্যক করে না।

আমরা কেবল এই বলিয়া আক্ষেপ করিব যে, যুক্তি আমাদের পক্ষে, অভিজ্ঞতা আমাদের পক্ষে, সহৃদয়তা আমাদের পক্ষে, বড় বড় সুযোগ্য লোকের মত আমাদের পক্ষে তথাপি কেন আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না? আমাদের এই দুর্দ্দশা দেখিয়াই আমরা আরো অধিকতর আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করিব যে, যে রাজকীয় রহস্যধামে আমাদের ভাগ্য স্থির হয় সেখানে আমাদের আপনার লোক যেন পাঠাইতে পারি, তাহা হইলে যদি কোন প্রার্থনায় নিষ্ফলকাম হই, তবে আর কিছু না হৌক তাহার একটা যুক্তিসঙ্গত উত্তর শুনিবার স্বল্প সুখ হইতে বঞ্চিত হইব না।

এইখানেই আমি ক্ষান্ত হইতে চাহি। আলোচ্য প্রস্তাব সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ, অনেক তর্ক, এবং অনেক ইতিহাস আছে। আমি একান্ত সসঙ্কোচে তাহার প্রতি হস্তক্ষেপ করি নাই। অভ্যাস, অনুরাগ ও চর্চ্চা অনুসারে রাজনীতি আমার অধিকার-বহির্ভূত। কেবল মনে মনে ঈষৎ ভরসা আছে যে, রাজনৈতিক প্রসঙ্গও সম্ভবতঃ যুক্তি-শাস্ত্রের বিধানের মধ্যে ধরা দেয়, অর্থাৎ সত্যের নিয়ম হয়ত এখানেও খাটে; এই জন্য সহজ বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া লর্ড ক্রসের রচিত বিধির বিরুদ্ধে আমার আপত্তি ব্যক্ত করিয়াছি। অনভিজ্ঞতা বশতঃ যদি কোন ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায় তবে আমার পরবর্ত্তী যোগ্যতর বক্তা মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা সংশোধন ও সম্পূরণ করিয়া লইবেন। যদি কোন অন্যায় অবিবেচনার কথা বলিয়া থাকি, তবে তাহার পাপের ভার শ্রোতৃবর্গ অনুগ্রহপূর্ব্বক বক্তার নিজের শিরে চাপাইবেন, কোন সম্প্রদায় বা সভার স্কন্ধে আরোপ করিবেন না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হত্যাকারী কে?

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে যে সময় আমি পশ্চিমে ছিলাম একটী লোমহর্ষণ ঘটনা আমার চক্ষের উপর ঘটিয়াছিল। আজও তাহা স্মৃতিপথে জাগরূক হইলে শরীরের

আমূল কম্পিত হয়—তাহার প্রত্যেক ঘটনা—প্রত্যেক কার্য্য—অতীতে কুক্ষিগত হইলেও আজও তাহা আমার নিকট জাগ্রত প্রত্যক্ষ বলিয়া বোধ হয়। সেই ভীষণ নিশীথে, সেই বন্ধুবান্ধব হীন বিদেশে ; যে ভয়ানক ঘটনা—আমার চক্ষের সম্মুখে অভিনীত হইয়াছিল তাহাই অদ্য বিবৃত করিব।

কোন কার্য্যোপলক্ষে ঐ সময়ে আমরা পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময়ে আমরা এলাহাবাদে ছিলাম। এলাহাবাদে কৃত্তিবাস চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণের বাটীতে আমাদের বাসা হইয়াছিল। কীর্ত্তিবাসের বাটী এই সময়ে এলাহাবাদে বিদেশী বাঙ্গালীর নিকট বিশেষ পরিচিত ছিল। যাহাদের থাকিবার অন্য কোন আড্ডা নাই তাহারা স্বল্প মুদ্রা ব্যয় করিলে কৃত্তিবাসের আশ্রমে সুখে কাটাইতে পারিত। কীর্ত্তিবাস বিদেশে আশ্রয়হীন বাঙ্গালীর জন্য এই আশ্রম স্থাপন করিয়া বিশেষ যশোপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রকৃতপক্ষে হোটেল-কিপার নহেন। তাঁহার একটু বিশেষ পরিচয় আবশ্যক। তিনি দেখিতে স্থূলকায় শ্যামবর্ণ ; মুখমণ্ডল বসন্ত চিহ্নে চিহ্নিত—ললাটটী ক্ষুদ্র—তাহার উপর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল আসিয়া পড়িয়াছে। সেই ক্ষুদ্র ললাটের নিম্নে রক্তবর্ণ দুইটী চক্ষু সর্ব্বদাই চঞ্চল ভাবে ঘুরিতেছে,—লোমরাজি-পূর্ণ, বহ্বায়ত বক্ষের উপর শুভ্র পৈতার গোছা—ও কটিদেশে একতাড়া চাবি সর্ব্বদাই বিরাজমান। কিন্তু এই বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া ইনি কি প্রকারের লোক ঠিক করা বড়ই দুরূহ। সহসা ইহাকে ভীমাকৃতি দুষ্ট লোক বলিয়া বোধ হইলেও—আলাপে সেই ভ্রম ঘুচিয়া যায়। কথায় ইনি মিষ্টভাষী ব্যবহারে ভারি সামাজিক—লোক বশীকরণ ক্ষমতায় অদ্বিতীয়। অনেকবার লোকের বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া চরিত্র নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া আমি ঠকিয়াছি এবারও তাহাই হইয়াছে।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান—সংসারে আর কেহ নাই—বাসস্থান হুগলী জেলা। বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে এলাহাবাদে অনেক দিন ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছেন। প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া সরকারী-চাকরীতে ইস্তফা দিয়া সঞ্চিত বিত্তের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। তাঁহার বাটীতে তাহার একমাত্র প্রাপ্ত বয়স্ক ভ্রাতষ্পুত্র ভিন্ন আর কেহই ছিল না। এলাহাবাদে অনেক দিন থাকিয়া স্থানটার উপর তাঁহার বড়ই মায়া বসিয়াছিল। অন্যকোন উপজীবিকা নাই বলিয়া বিশেষ লাভকর না হইলেও তিনি বর্ত্তমান উপজীবিকাকে লক্ষ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। আগন্তুক বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসিলেই তাঁহার বাটীতে বাসা পাইত। বাঙ্গালী ভিন্ন আর কোন আগন্তুক হইলে স্থান পাইত না। আর একটী কথা বলিয়া রাখি—চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অতি নিষ্ঠাবৃত্তি-সম্পন্ন ! প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দনাদি না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এলাহাবাদে আমাদের চারি পাঁচ দিন কাটিয়া গেল —গ্রীষ্মকাল, কার সাধ্য রৌদ্রের উত্তাপে গৃহের বাহির হয়? সন্ধ্যার প্রাক্কালে (আন্দাজ ঘণ্টাদেড়েক বেলা আছে) আমরা দুই জনে বাহিরের বারান্দায় পায়চারি করিতেছি এমন সময়ে একখানি গাড়ি আসিয়া দরজার কাছে থামিল। গাড়ীর ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়! এই কি কৃত্তিবাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসাবাড়ী—গৃহস্বামী কি বাড়ীতে আছেন?" আমি উপর হইতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ডাকিয়া দিলাম—তিনি সেই বাবুটীকে সঙ্গে করিয়া বাটীর মধ্যে আনিলেন।

বাবুর সঙ্গে যে চাকর ছিল সে জিনিস পত্র সমস্ত নামাইয়া লইয়া গাড়োয়ানকে বিদায় করিয়া দিয়া বাটীর মধ্যে ঢুকিল; দুইজন আগন্তুক দেখিয়া আমরাও নীচে নামিয়া আসিলাম। বাবুটী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিতেছেন, "এখানে দুই একদিন থাকিবার উপযুক্ত বাসা পাইতে পারি? আমার নিজের জন্য একটী নির্জ্জন কক্ষ চাই তাহার নিকটে আর একটী গৃহে আমার এই চাকরটী থাকিবে।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—"এখানে আপনার সকল সুবিধাই হইবে, একদিন দুইদিন কেন ছয়মাস ধরিয়া থাকুন না। অনেক স্বদেশীয় লোক আমার বাটীতে বাসা লইয়া থাকেন—এই দুইটী বাবু আজ পাঁচ ছয় দিন আসিয়াছেন চলুন আপনাকে উপরে ঘর দেখাইয়া আনি।"

এই কথা বলিয়া কৃত্তিবাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নবাগত বাবুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন এবং তাঁহার গৃহাদি সমস্ত ঠিক করিয়া দিলেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে—সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু শীতল হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা দুইজনে ছাদের উপর বসিয়া নানাবিধ গল্প করিতেছিলাম, কিন্তু সহসা শৈত্যানুভব হওয়ায় নীচে নামিয়া আসিলাম। দেখিলাম, করালীবাবু একখানি সতরঞ্চের উপর বালিশ ঠেশ্ দিয়া আড় হইয়া তামাক টানিতেছেন;—ভৃত্য গৃহমধ্যে জিনিস পত্র সাজাইয়া রাখিতেছে। করালী বাবু আমাদের আসিতে দেখিয়া—অতি সহৃদয়তার সহিত সম্ভাষণ করিলেন।

আমাদের পরস্পরের আলাপ পরিচয় হইল—তাঁহার পরিচয়ে জানিলাম—তিনি আমার অগ্রজের সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু। ভ্রাতৃ বন্ধুর সহিত পরিচিত হইয়া বড়ই আপ্যায়িত বোধ করিলাম, বিশেষতঃ—করালী বাবু অতি ভদ্র অতি সামাজিক, ও অতি মধুর প্রকৃতির লোক। আরও জানিলাম, তিনি সেই সময়ে কলিকাতার কোন আদালতে ওকালতি করেন—পশারও বিলক্ষণ, পশ্চিম বেড়াইতে সখ্ হইয়াছে—তাই এলাহাবাদে

আসিয়াছেন—ইহার পূর্ব্বে আর কখনও এখানে আসেন নাই—পঞ্জাব পর্য্যন্ত যাইবার ইচ্ছা আছে।

করালী বাবু দেখিতে অতি সুশ্রী পুরুষ; রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে—মুখে সরলতা বিরাজ করিতেছে—ওষ্ঠাধরে সর্ব্বদাই মৃদুহাস্য বিরাজমান, উন্নত ললাট ও নেত্রদ্বয়ের তেজস্বিতা দেখিলে বিশেষ বুদ্ধিমান বলিয়াই বোধ হয়। মুখ মণ্ডলে, মনের ভাব সকল স্ফূর্ত্তি পায় শুনিয়াছি—একথা যদি সত্য হয়—তবে করালী বাবু অতি সরল প্রকৃতির লোক।

সেই রাত্রে আমরা তিনজনে একত্রে আহারাদি করিলাম। আহারান্তে আমরা দুই জনে করালী বাবুর নিকট বিদায় লইয়া শয়ন করিতে গেলাম।

বিছানায় শুইয়াই সহসা নিদ্রা আসিল না—আমাদের ঘরের সম্মুখের দালানের পরই করালী বাবুর ঘর—বোধ হইল কে যেন দ্বার ঠেলিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার কথার আওয়াজে বুঝিলাম—সে পরাণ, করালী বাবুর চাকর—পরাণ গৃহে প্রবেশ করিয়াই বলিল—"ব্রাহ্মণ ঠাকুর একটী টাকা চাহিতেছেন এইরাত্রে তাঁহার বিশেষ দরকার, আমায় দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন।"

করালী বাবু বলিলেন—ক্যাস বাক্সের চাবি নাও—সঙ্গে খুচরা টাকা নাই—ক্যাস বাক্স হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া দাও।" বাবু ঝনাৎ করিয়া চাবি ফেলিয়া দিলেন—শব্দে টের পাইলাম।

এই সময়ে সিঁড়িতে পদশব্দ হইতে লাগিল। কথার আওয়াজে বোধ হইল—কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাস আসিয়া বাবুর গৃহে প্রবেশ করিলেন। কেননা আমি দ্বার ঠেলার শব্দ পাইলাম।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—"এত রাত্রে আপনাকে ত্যক্ত করিতেছি অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন—বিশেষ প্রয়োজন,—নচেৎ"—করালী বাবু বাধা দিয়া বলিলেন—"অত সংকুচিত হইতেছেন কেন?—পরাণ, টাকাটি ঠাকুর মশায়কে দে"? কিছু পরে আবার পদ-শব্দ হইল—বুঝিলাম তিনি টাকা লইয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

পরাণ তখন বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"বাবু! আজ রাত্রে ব্রাহ্মণকে টাকা না দিলেই হইত—একে বিদেশ বিভূঁই তাহাতে আবার রাত্রিকাল—এই অপরিচিত ব্রাহ্মণকে টাকা কড়ি সব দেখাইলেন—আর এতরাত্রে ইহারই বা এক টাকার এত কি প্রয়োজন হইয়া পড়িল—ইচ্ছা করিলে অপর কাহারও নিকট ত লইতে পারিত।"

করালী বাবু মৃদুস্বরে বলিলেন—"চুপ চুপ পরাণ, ও কথা মুখে আনিস না—ব্রাহ্মণ এখনও বোধ হয় নীচে যায় নাই—আর বিশেষ প্রয়োজন না হইলেই বা আমার কাছে আসিবে কেন? তোর যদি এতই ভয় হইয়া থাকে—তবে টাকার বাক্সটা পোর্টমাণ্টো হইতে বাহির করিয়া আমার বালিসের নীচে রাখিয়া যা। আমার সজাগ ঘুম—এতে তো তোর ভয় ঘুচিবে"।

ইহার পর কড়াৎ করিয়া চাবি খোলার শব্দ হইল—অনুভবে বুঝিলাম পরাণ প্রভুর আদেশ মতে বাক্স বাহির করিল। নানা বিষয় ভাবিতে ভাবিতে ইহার পর আমার তন্দ্রা আসিল আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম বলিতে পারি না—কিন্তু নিদ্রা যে বড় ভাল হয় নাই এরূপ বোধ হইল। ঘরের জানালা খোলা ছিল—অনুভবে বুঝিলাম রাত্রি এক প্রহর হইয়াছে। এমন সময়ে আমার ঘরের পাশে—পূর্ব্ব কথিত দালানে যেন কাহার ধীর বিক্ষিপ্ত পদশব্দ পাইলাম—এতরাত্রে পা টিপিয়া, এপ্রকার সন্তর্পনে কে দালানে বেড়াইতেছে ভাবিয়া বড় সন্দেহ হইল—কিয়ৎকালের জন্য শব্দটা থামিল—মনে করিলাম আমার ভ্রম। এবার একটু অবশভাব আসিয়া আমার নেত্রদ্বয়কে বুজাইয়া দিল—আমি সুষুপ্তি ও সজাগভাব দুইএর মধ্যবর্ত্তী হইয়া রহিলাম—কিয়ৎক্ষণ পরে সহসা এক ঘোর যাতনাব্যঞ্জক, কঠোর গোঁয়ানী শব্দ আমার কাণে লাগিল! সেই কাতর শব্দে আমার অন্তরাত্মা যেন কাঁপিয়া উঠিল—আমি তড়িৎবেগে বিছানায় উঠিয়া বসিলাম—আবার ভাল করিয়া কাণ পাতিয়া শুনিলাম—আবার সেই—হৃদয়ভেদী, যাতনা ব্যঞ্জক কঠোর গোঁয়ানি! কি সর্ব্বনাশ? গতিক বড় ভাল বোধ হইল না—করালী বাবুর ঘর হইতে বোধ হইল যেন শব্দটা আসিতেছে। আমি তাড়াতাড়ি আমার সহচরকে জাগাইলাম—বালিসের নীচে দেশালাই ছিল—আলো জালিয়া লইলাম—গৃহ মধ্যে এক গাছি বৃহৎ যষ্ঠি ছিল—আবশ্যক বোধে তাহাও সঙ্গে লইলাম—দুইজনে ধীরে ধীরে পা টিপিয়া ঘরের বাহির হইলাম—দালান পার হইয়াই দেখি করালী বাবুর ঘরের দ্বার ঈষৎ খোলা রহিয়াছে—গৃহ মধ্যে একটী ক্ষীণ বর্ত্তিকা হস্তে তাঁহার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এক ভীষণ যমদূতাকৃতি মুর্ত্তি!! আমি আমার সঙ্গীকে পশ্চাতে করিয়া দ্বারের দিকে পা বাড়াইলাম যাহা দেখিলাম—তাহাতে আমার ব্রহ্মরন্ধ্র কাঁপিয়া উঠিল—শরীর লোমাঞ্চ হইল—কি ভয়ানক ব্যাপার! কি সর্ব্বনাশ?

করালী বাবুর মশারির দ্বার সম্পূর্ণ রূপে খোলা—সেই দুগ্ধফেননিভ শয্যা প্লাবিত করিয়া প্রস্রবণ ধারার ন্যায় রক্তোচ্ছাস মাটীতে পড়িতেছে—আর কাছে দাঁড়াইয়া এক যমদূতাকৃতি নর পিশাচ। তাহার এক হস্তে ক্ষীণ বর্ত্তিকা—অন্য হস্তে সুশানিত তীক্ষ্ণাগ্রভাগ-বিশিষ্ট সুদীর্ঘ ছোরা—তাহার হাতের আলোতেই তাহার মুখ দেখিয়া চিনিতে পারিলাম—সেই নৃশংস নরঘাতী আর কেহই নহে স্বয়ং কৃত্তিবাস চট্টোপাধ্যায়। সে পিশাচ সেই অর্দ্ধোন্মোচিত মশারির ধারে দাঁড়াইয়া—ঈষৎ অবনত হইয়া শয্যাতলস্থ শোনিতোচ্ছাস দেখিতেছে।

আমি করালী বাবুর এই শোচনীয় পরিণামে বৎপরোনাস্তি মর্ম্ম পীড়া পাইলাম—

তাঁহার এই লোমহর্ষক পরিণামে—আমার হৃদয়তন্ত্রী বড়ই আলোড়িত হইল! কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে আত্মসংযম করিয়া আমার সঙ্গীর হাত হইতে লাঠি কাড়িয়া লইলাম। উন্মত্ত ব্যাঘ্রবৎ বিদ্যুদ্বেগে এক লম্ফে সেই গৃহ মধ্যগত হইয়া সেই দুরাত্মার পৃষ্ঠে সজোরে আঘাত করিলাম। সেই আঘাতেই সে একবারে ভূপতিত হইল। তাহার হাত হইতে ছোরাখানা ঝনাৎ করিয়া ঠিক্‌রিয়া পড়িল—দুরাত্মা উঠিবার চেষ্টা করিতেছে এমন সময়ে আমার বন্ধু আসিয়া তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিলেন—তাঁহার ভয়ে সেই নরহন্তা বিকট শব্দ করিয়া সেই রক্তাক্ত মেঝের উপর পড়িয়া গেল। আমি আন্‌লা হইতে একখানি চাদর লইয়া তড়িদ্বৎ তাহার হাত পা বাঁধিয়া ফেলিলাম—আমার হাত পা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল—মাথা ঘুরিতেছিল—চারিদিক হরিৎবর্ণ দেখিতেছিলাম—সেই রাক্ষস বলধারী দুরাত্মাকে যে এত শীঘ্র এত অনায়াসে আয়ত্তাধীন করিব ইহা আদৌ ভাবি নাই।

বন্ধু সেই দুরাত্মার নিকট রহিলেন—আমি পরাণ পরাণ করিয়া চেঁচাইতে লাগিলাম। হায়! হতভাগ্য পরাণ অকাতরে ঘুমাইতেছিল—সে জানে না দুরাত্মা কৃত্তিবাস চট্টোপাধ্যায় তাহার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে! আমার হাঁকাহাকিতে পরাণ চোক্ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া আসিল—গৃহে প্রবেশ করিয়া সে যাহা দেখিল—তাহাতে তাহার মূর্চ্ছা হইবার মত হইল—আমি তাহাকে সহসা ধরিয়া ফেলিলাম।

পরাণকে বলিলাম—তোরা দুজনে এই দুরাত্মা ব্রাহ্মণকে চাপিয়া ধরিয়া রাখ্—আমি পুলিসে সংবাদ দিই"।

পরাণ এ সংবাদে মৃতের ন্যায় মলিন হইয়া গেল—থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল—আমি বলিলাম—এত ভয় পাইলে চলিবে না—তুই প্রাণপণে এই দুরাত্মাকে ধরিয়া থাক্—যে প্রকার বাঁধা হইয়াছে—উহার আর নড়িবার সামর্থ্য নাই—" পরাণ সাহসাবলম্বনে—কৃত্তিবাসের বন্ধন রজ্জু সবলে ধারণ করিল।

আমার নিদারুণ আঘাতে বোধ হয় কৃত্তিবাস মূর্চ্ছিত হইয়াছিল—এক্ষণে বোধ হয় তাহার প্রথম সংজ্ঞা হইয়াছে—সে কাতর কণ্ঠে গোঁয়াইতে গোঁয়াইতে বলিল—"ওগো! আমায় তোমরা মারিও না—আমি নির্দ্দোষী আমায় ছাড়িয়া দাও, আমার প্রাণটা"—আমার বন্ধু কৃত্তিবাসের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছিলেন—তিনি সেই দুরাত্মাকে এ প্রকার ভাবে কথা কহিতে দেখিয়া তাহার ভণ্ডামি সহিতে না পারিয়া তাঁহার মুখে সবলে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন—আমি বলিলাম—"নরঘাতক! বদ্‌মায়েস তুই নির্দ্দোষী! তোমার যেন কিছু দোষ নাই! না, এই জন্যই তোমার এতরাত্রে একটী টাকার দরকার হইয়াছিল নয়? ফাঁসিকাষ্ঠে তোমার নির্দ্দোষীতা বাহির হইবে।"

কৃত্তিবাস পুনরায় কথা কহিতে যাইতেছিল—আমার বন্ধু পুনরায় সবলে তাহার

মস্তকে দৃঢ় মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন—"চুপ রও" এবারকার দৃঢ় আঘাতে কৃত্তিবাস চুপ করিল।

আমি একবার করালী বাবুর বিছানার দিকে গেলাম। ভীষণ ছুরিকার আঘাতে, গলদেশ হইতে অজস্র রক্ত স্রোত বাহির হইতেছে—দুরাত্মা বোধ হয় বক্ষস্থলেও ছুরিকা বসাইয়া দিয়াছিল। সেখান হইতেও তখন উৎসধারার ন্যায় রক্তস্রোত গড়াইয়া পড়িতেছে। গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম গাত্র হিম্—নেত্রদ্বয় উন্মীলিত, সেই সুন্দর মুখে তখনও প্রসন্নতা বিরাজমান, দেখিয়া বোধ হইল যেন শান্তি ও বিভীষিকা আসিয়া একত্রে ক্রীড়া করিতেছে।

করালী বাবুর রক্তাপ্লুত, নিস্পন্দ, ও শোচনীয় ভাবপূর্ণ শরীর দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম—গলার কাছে প্রায় দুইইঞ্চি পরিমাণে কাটা। আমার বন্ধুকেও পরাণকে সেই গৃহে রাখিয়া আমি পুলিসে খপর দিতে দৌড়িলাম। নিকটেই কোতোয়ালি ছিল উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া তথায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলাম।

এই সমস্ত কার্য্য করিতে আমার পাঁচ মিনিটের অধিক সময় লাগে নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমি যখন কোতোয়ালিতে পৌঁছিলাম—তখন রাত্রি দুইটা বাজিয়াছে—পৌঁছিয়াই দেখিলাম ইন্‌স্পেক্টার শিবসহায় সিংহ রোঁদে বাহির হইবার জন্য পোষাক পরিতেছেন – আমার মুখে আদ্যোপান্ত ঘটনা শুনিয়া তিনি প্রথমতঃ শিহরিয়া উঠিলেন—পরে একটু বিমর্ষ হইলেন। বক্সী মিটু জমাদার কাছে বসিয়াছিল—তাহাকে বলিলেন "বাবুর বয়নামা অনুযায়ী সমস্ত ঘটনা রিপোর্ট বহিতে লিখিয়া লও"। ইহার পর আমরা চারি জনে কৃত্তিবাসের বাটীতে উপস্থিত হইলাম।

আমরা চারি জনে একবারে উপরের ঘরে উঠিয়া গেলাম। গৃহমধ্যে আর একটী লোক দাঁড়াইয়া—তাহাকে পূর্ব্বে দেখি নাই—পরে জানিলাম,সে কৃত্তিবাস চট্টোপাধ্যায়ের পূর্ব্ব কথিত ভ্রাতষ্পুত্র। সে জমাদার সাহেবকে দেখিয়াই সম্বোধন করিয়া বলিল—"দোহাই, জমাদার সাহেব—আমার খুড়াকে ইহারা মারিয়া ফেলিল"।

জমাদার "চুপ রও" বলিয়া তাহাকে ধাক্কা দিলেন সে সেই ধাক্কা খাইয়া পলাইয়া গেল।

শিবসহায় সিংহ প্রথমে ঘরের দ্বার জানালা উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন পরে সিঁড়ির দ্বার দেখিলেন, শয্যার আশ্‌পাশ্ দেখিলেন, লাশের অবস্থা তদারক করিলেন করিয়া জমাদারকে বলিলেন "কৃত্তিবাসকে হাতকড়ি লাগাও, ও উঠিয়া বসিতে দাও"। তাহাই করা হইল

কৃত্তিবাস উঠিয়া বসিল কাতরকণ্ঠে বলিল "মাগো! প্রাণ যায়! আমায় একটু জল দাও।"

শিবসহায় সিংহ তাহাকে জল দিতে আদেশ করিলেন।

প্রথমতঃ তাহার এজাহার লওয়া হইল। শিবসহায় জিজ্ঞাসা করিলেন "যা জিজ্ঞাসা করিব যদি সমস্ত সত্য করিয়া বল তোমার সুরাহা করিব—নচেৎ তোমার পরিণাম বড় শোচনীয়। বল এখন এ নৃশংস কার্য্য কেন করিলে।"

কৃত্তিবাস দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল "দোহাই পরমেশ্বর! আজ কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম জানিনা, দোহাই জমাদার সাহেব! আমি ইহার কিছুই জানি না।"

বক্সী জমাদার আর সহ্য করিতে পারিল না তাহার হাতে আর একটী হাতকড়ি ছিল সে সেই হাতকড়ির বাড়ি কৃত্তিবাসের মাথায় ঝনাৎ করিয়া আঘাত করিল সেই আঘাতে সে হতভাগ্যের মাথা দিয়া রক্ত বহিতে লাগিল।

কৃত্তিবাস বলিল "প্রাণ যায়! জল দাও, সব কথা বলিতেছি" সে আবার জল খাইল।

শিবসহায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন এ কার্য্য করিলি।"

কৃত্তিবাস আবার দৃঢ়তার সহিত বলিল "দোহাই সাহেব! আমি এর কিছুই জানি না সত্য মিথ্যা পরমেশ্বর জানেন তিনিই এর বিচার করিবেন।" আমি মনে ভাবিলাম দুরাত্মা পবিত্রময় পরমেশ্বরের নাম পুনঃ পুনঃ গ্রহণে তাহা কলঙ্কিত করিতেছে।

কৃত্তিবাস বলিতে লাগিল "আহারাদি করিয়া ইহারা সকলে শুইয়া পড়িলেন আমার একটী টাকার প্রয়োজন হইয়াছিল আমি বাবুর চাকরকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলাম—বিলম্ব দেখিয়া নিজে টাকাটী লইতে উপরে আসিলাম।"

শিবসহায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত রাত্রে তোমার এক টাকার কি প্রয়োজন?"

কৃত্তিবাস বলিল "তহবিলে একটী পয়সাও নাই একজন পাওনাদার আসিয়া একটী টাকার জন্য বড় বিরক্ত করিতে লাগিল, বাবুর চাকর পরাণ তাহাকে দেখিয়াছে,—সত্য মিথ্যা তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

শিবসহায় বলিলেন "তার পর বলিয়া যাও।"

কৃত্তিবাস বলিল "আমি টাকা লইয়া নীচে আসিলাম তখন রাত্রি এগারটা হইবে পাওনাদারকে বিদায় করিয়া দিলাম। আমার আহারাদি তখনও হয় নাই আহারাদি করিতে দুই প্রহর হইল। উপরে সিঁড়ির পার্শ্বে আমার শয়ন ঘর, আমি আসিয়া শয়ন করিলাম।

"আসিবার সময় সিড়ির দ্বার বন্ধ করিয়াছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"তারপর?"

"তারপর আমি নিজের ঘরে আসিয়া শুইলাম। একটু তন্দ্রা আসিতেছে এমন সময়ে কঠোর গোঁয়াণী শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল—আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম রাত্রে শুইবার পরও প্রতিদিন আমার ঘরে আলো জ্বালা থাকে। আমি সেই আলোটি ও এই ছুরিকা খানি হাতে করিয়া ব্যাপারটা কি দেখিবার জন্য দ্বার খুলিয়া বাহির হইলাম। ইহার পূর্ব্বে আর একবার এই প্রকারে একদল গুণ্ডা আসিয়া এবাটীতে উপদ্রব করিয়াছিল। আমি গৃহের বাহির হইয়া করালী বাবুর ঘরের কাছে গেলাম, দেখি সেই ঘর হইতেই শব্দ আসিতেছে—আমার বড় ভয় হইল—আমি বাবুর চাকরকে দুইবার পরাণ পরাণ করিয়া ডাকিলাম—পরাণ তখন অঘোরে ঘুমাইতেছে—আমি সুতরাং সাহসে ভর করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিলাম।

ঘরের দ্বার খোলা দেখিয়া আমার মনে যে সন্দেহ হইয়াছিল—পরিশেষে তাহাই সত্য ঘটনা হইয়া দাঁড়াইল—আমি ঘরের মধ্যে যাহা দেখিলাম, তাহাতে অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ! করালী বাবুকে কে খুন করিয়াছে! দেখিয়া আমার শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল—ছুরী খানি হাত হইতে হঠাৎ রক্তাপ্লুত মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

এখনও বোধ হয় সেই হত্যাকারী গৃহমধ্যে লুক্কায়িত আছে হয়ত সে এখনই আমারও এই দুর্দ্দশা করিতে পারে, এই ভাবিয়া ছোরা খানি কুড়াইয়া লইলাম ইহা যে রক্তমাখা হইয়াছিল লক্ষ্য করি নাই। আলো লইয়া বিছানার কাছে গিয়া দেখিলাম—বাবুর কণ্ঠনালী সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন—বক্ষঃস্থলেও আঘাত চিহ্ন। আমি যেমন হেঁট হইয়া অর্দ্ধ বক্রভাবে আহত ব্যক্তির আপাদ মস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম, সেই সময়ে ইঁহারা দুইজনে সহসা আসিয়া আমায় ভূপতিত করিলেন। পরমেশ্বর জানেন আমি নির্দ্দোষী! আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন—যদি উপরে এক জগদীশ্বর থাকেন ত আমার পক্ষে সুবিচার হইবেই হইবে।"

হতভাগ্য এই কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইয়া জল চাহিল আমি জল দিলাম। কথাগুলি যেন তাহার প্রাণের ভিতর হইতে বাহির হইয়াছিল। আমার এক এক বার বোধ হইতে লাগিল হয়ত এ ব্যক্তি নির্দ্দোষী। আবার মনে হইল স্বচক্ষে যাহা দেখিলাম, তাহার উপর ইহাকে নির্দ্দোষী ভাবিতেছি! নিজের চক্ষুকে অবিশ্বাস? না নিশ্চয়ই এ হত্যাকারী। প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এরূপ বলিতেছে।

সেই ক্ষেত্রে শিবসহায় সিংহ, আমাদের দুইজনের, পরাণ চাকরের ও কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রের জবানবন্দী লইল। আমরা যাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলাম তাহাই জবানবন্দীতে দিলাম। পরাণ চাকর বেশীর মধ্যে বলিল—আমি যখন ক্যাশ বাক্স খুলিয়া ব্রাহ্মণকে টাকা বাহির করিয়া দিই তখন সে লোলুপ দৃষ্টিতে নোটের তাড়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল! শুইবার পূর্ব্বে আমি বাবুকে একথা জানাইতেছিলাম—কিন্তু তিনি সরল

লোক—সহসা বামুনকে অবিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু তার ফল হাতে হাতে পাইলেন। নিশ্চয়ই এই ব্রাহ্মণ টাকার লোভে আমার মনিবকে খুন করিয়াছে।"

পরাণ এই বলিয়া মনিবের পূর্ব্ব গুণ কীর্ত্তন করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের কাছে উঠিল। তিনি আদ্যোপান্ত প্রমাণ পাইয়া আসামীকে সেসন সোপরদ্দ করিলেন। কৃত্তিবাসকে অনেকে চিনিত অনেকে তাহাকে ভালও বাসিত। সকলেই তাহার অদৃষ্টে কি ঘটে দেখিতে আসিয়াছিল। আদালত লোকে লোকারণ্য। কীর্ত্তিবাসের জোবানবন্দী পূর্ব্ববৎ। এবারেও সে খুন সম্বন্ধে সমস্ত কথা একেবারে অস্বীকার করিল। আমাদের সাক্ষ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান দাঁড়াইল—মাজিষ্ট্রেট আসামীকে হাজতে রাখিবার হুকুম দিলেন।

হাতকড়ি বদ্ধ হইয়া পুলিসের ধাক্কা খাইতে খাইতে সেই জনস্রোতের মধ্য দিয়া কীর্ত্তিবাস অশ্রুপূর্ণ নয়নে, নত মুখে ধীরে ধীরে চলিল। তাহার দশা দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইল। কেহ বলিতে লাগিল—বামুনের কিছুই হইবে না খালাস পাইবে। তাহার বন্ধুরা তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। আমি হলপ করিয়া বলিতে পারি চট্টোপাধ্যায় নির্দ্দোষী। আর কেহ বলিল—লোক চেনা ভার—এই চাটুয্যে বড় ভাল মানুষ কিন্তু এর পেটে পেটে এত ছিল তাহা কে জানে বল? বাছাধন! এইবারে মজাটা টের পাবেন।

হতভাগ্য কীর্ত্তিবাস এই সব শুনিতে শুনিতে অবনত মস্তকে কয়েদীর গাড়ীতে উঠিল- আমি সেই জনতার মধ্যে একটী মর্ম্মভেদী শ্বাস শুনিতে পাইলাম—কৃর্ত্তিবাস দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "হা পরমেশ্বর! নির্দ্দোষীর এত দণ্ড কেন!"

এই শ্বাস ও এই কথা চিরকাল আমার মনে থাকিবে।

তাহার পর দিন আমি কীর্ত্তিবাসের বাসা ত্যাগ করিলাম। ইহার পরের ঘটনা পুলিসের দারোগার মুখে আপনারা শুনিতে পাইবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(শিবসহায় সিংহের কথা)

পুলিশ লাইনে অনেক দিন দক্ষতার সহিত চাকরী করিয়া আসিতেছি—কত বড় বড় সঙ্গীন মোকদ্দমা জলের ন্যায় সরল করিয়াছি—কিন্তু করালী বাবুর খুনের মোকদ্দমা আরক করিয়া আমার মনের খট্কা ঘুচিল না—কি একটা সন্দেহের ঘন ছায়া আমার মনের মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। মাজিষ্ট্রেটের কাছারি ভাঙ্গিবা মাত্রই আমি বড় সাহেবের আফিসে গেলাম। বড় সাহেব উপরে বসিয়া বই পড়িতেছিলেন- আমি

গিয়া দেখা দিলাম। সাহেব বলিলেন; "আজকের খুনের মোকদ্দমার কি হইল?" আমি সে সম্বন্ধে যাহা বলিবার ছিল বলিয়া, কহিলাম—"সমস্ত দেখিয়া কৃত্তিবাস্ অপেক্ষা পরাণ চাকরকে আমার অধিক সন্দেহ হয়"।

আরো বলিলাম—"থানাতল্লাসীতে কেবল করালী বাবুর জামার পকেট হইতে কয়েকখানি নম্বরী নোটের নম্বর পাইয়াছি। এ ভিন্ন আর ত কিছু সূত্র পাইতেছি না। খুচরা নোটের আশা ছাড়িয়া দিতেছি একখানি নম্বরী নোট পাইলেই সকল বিষয় পরিষ্কার হয়। সেজন্য পরাণকে একবার থানাতল্লাসী করিতে চাই"।

সাহেব আমার মতে মত প্রদান করায় আমি সেই দিন হইতে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। অল্প দিনের মধ্যেই জানিতে পারিলাম সে কাশীতে আছে।

সন্ধ্যা হইয়াছে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে—চারিদিক অন্ধকারে ব্যাপিয়াছে—রাস্তা ঘাট সকলই কর্দ্দমময়—রাস্তার ক্ষীণালোকে গলির অন্ধকার আরও ভয়ানক দেখাইতেছে—এমন সময়ে এক দিন আমি বেনারসে পরাণের বাটীর কাছে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম পরাণ ও আর একটা লোক হন্ হন্ করিয়া সেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কেদারেশ্বরের মন্দিরের দিকে চলিল। পরাণের পরিধানে ফিন্ ফিনে ধুতি, পায়ে ইংরাজি জুতা, মাথায় টেরি, গায়ে ধোপদস্ত পিরান, কাঁধে কোঁচান চাদর, সঙ্গের লোকটীর অপেক্ষাকৃত হীন বেশ। তাহারা দুজনে—সন্দিগ্ধ মনে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে কেদারের মন্দিরের পার্শ্বে একটী বটগাছের তলায় গিয়া দাঁড়াইল—সঙ্গের লোকটী—তাহার কথা বার্ত্তার ভাবেই বুঝিলাম—হিন্দুস্থানী প্রেমারার দালাল—পরাণ আবার প্রেমারায় মাতিয়াছে। আমার বড়ই আপশোষ হইল—মনে ভাবিলাম কি কষ্ট! এত প্রমাণ পাইতেছি তবু ইহাকে ধরিতে সাহস করিতেছি না!

তাহারা সেই নির্জ্জন বটতলায় দাঁড়াইয়া যে সকল কথা কহিতে লাগিল তাহার অনেক আমি শুনিতে পাইলাম—তাহাতে বুঝিলাম গত রাত্রে পরাণ, প্রেমারা খেলার ১০০ টাকা হারিয়া আসিয়াছে। আজ সে আড্ডায় যাইতে চাহিতেছে না—এই ব্যক্তি নয় আড্ডাধারী—না হয় দালাল, সে তাহাকে প্রলোভন দেখাইয়া আড্ডায় লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে।

তাহারা সেই বট্ বৃক্ষতল ত্যাগ করিল, আমিও সঙ্গে চলিলাম। তাহারা নিঃশব্দে পাঁচ সাতটী গলি পার হইল, আমিও তদ্রূপ করিলাম। এতক্ষণ তাহারা চওড়া গলিতে চলিতেছিল, সে সব গলিতে অনেক লোক চলে, কেহ কাহারও তথ্য লয় না—কিন্তু এক্ষণে একটা সরু গলিতে প্রবেশ করিল। গলিটী এত অপ্রশস্ত, ও অপরিষ্কার যে দুই জন লোক পাশাপাশি চলিতে পারে না। আমার পদশব্দে তাহারা চমকিত হইল—ফিরিয়া দাঁড়াইল—সেই হিন্দুস্থানীটা কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কোন হ্যায় রে!" আমি বাঙ্গালিভাষায় বলিলাম—"খেলোয়াড়"। সে নিকটে আসিয়া

আমার হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল "কে তুই ঠিক্ বল, কিসের খেলা, আর আজকের সঙ্কেত কি।"

আমি হাতের চাপনে, সেই দুর্দ্দান্তের পরাক্রম অনুভব করিলাম। মনে ভাবিলাম একা আসিয়া বড়ই কুকর্ম্ম করিয়াছি। হয়ত সবই পণ্ড হইবে। কিন্তু সে সময়ে ভাবিবার সময় পাইলাম না। মুহূর্ত্তের মধ্যে নূতন বুদ্ধি যোগাইল, সেই ব্যক্তি অশ্বথ গাছের তলায় পরাণকে একটী কথা মুখস্থ করিতে বলিতেছিল, সে কথাটী আমি শুনিয়াছিলাম। আমি বলিয়া উঠিলাম—"জিমিয়া"। সে আর কথা কহিল না— আমায় সাদরে আলিঙ্গন করিয়া, আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। আরো বলিল "ভাই আমরা এত সতর্ক কেন জান কোতোয়ালি আমাদের বড়ই উত্যক্ত করিয়াছে। তাই এ সঙ্কেত শব্দের সৃষ্টি। সে দিন দুটা পুলিসের লোক আড্ডায় আসিয়া ঢুকিয়াছিল, তার পরদিন আমারা আড্ডা বদল করিলাম"।

আমি বলিলাম—"ভাই খেলোয়াড় দেখিলে চিনিতে পার না?" কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়া সেই হিন্দুস্থানী একটী ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটীর দ্বারে আঘাত করিল, একটী বৃদ্ধা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, আমরা বরাবর উপরে উঠিলাম।

আড্ডাটী বেশ জমকালো। একটী প্রশস্ত মেজ তাহার উপর কয়েকখানি তাস্ ছড়ান। ঘরটী অতি অপরিষ্কার, দেয়ালগুলি ঝুল ও পাণের পিকে চিত্রিত। দুইটী প্রদীপ উজ্জল ভাবে সেই মেজের উপর জ্বলিতেছে, আট দশ জন লোক সেই ঘরের মধ্যে বসিয়া হাস্য পরিহাস্ করিতেছে। কেহবা মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া চীৎকার করিতেছে কেহবা ধূলায় পড়িয়া রহিয়াছে। কেহবা গান ধরিয়াছে আবার কোথাও বা খেলা দেখিতে সকলে ঝুঁকিতেছে। ইহাই প্রেমারার আড্ডাঘর।

খেলা আরম্ভ হইল, পরাণ এ দিন সত্য সত্যই বাজী জিতিল। পাঁচবার খেলা হইল, পরাণ চারিবার জিতিল, একবার হারিল, একবারের হারেই তাহার সমস্ত সম্বল নষ্ট হইল, উলটিয়া আরও তাহার ৫০ টাকা দেনা দাঁড়াইল। সে টাকার জন্য অপমানিত হয় দেখিয়া আমি তৎক্ষণাৎ পঞ্চাশ টাকা দিয়া তাহাকে রক্ষা করিলাম। পরাণ সেই মুহূর্ত্ত অবধি আমার বন্ধু হইল। আমার সহিত তাহার আত্মীয়তা বাড়িয়া উঠিল।

এই আলাপের তৃতীয় দিনে আমি ও পরাণ একত্রে আড্ডায় গেলাম। খেলা আরম্ভ হইল—পরাণ প্রথমেই দশ টাকা বাজি হারিল। সে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, আমায় একখানি ১০০ টাকার এক কেতা নোট দিয়া বলিল "ভাই! এই নোটখানি শীঘ্র ভাগিয়ে আন্ন খুচরা টাকা আমার কাছে নাই। এই গলির বাহিরে পূর্ব্বধারের রাস্তা ধরিয়া গেলেই—মোড়ের মাথায় বেনিয়ার দোকান দেখিতে পাইবে। সেইখানে চারি আনা বাটা দিলেই টাকা পাইবে, যাও শীঘ্র যাও।"

আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া নোট লইয়া বাহিরে আসিলাম। পূর্ব্ব রাস্তা ধরিয়া সেই দোকানে গেলাম। নোট না ভাঙ্গাইয়া আবার ফিরিলাম। নিকটে একটী আলো জ্বলিতেছিল, ত্বরিত গতিতে নোটের নম্বর পড়িয়া দেখিয়া আমার খাতায় করালী বাবুর নোটের নম্বরের সহিত মিলাইলাম। একখানি মিলিয়া গেল। আমি ফিরিয়া আসিলাম; মনে স্থির নিশ্চয় হইল পরাণই করালী বাবুর সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। আজই তাহাকে ধরিব এই আশায় মন বড়ই উৎসাহিত হইল আমি আড্ডায় ফিরিয়া আসিলাম।

দেখিলাম মদ্যপানে পরাণের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে। আর এক পাত্র খাইবার জন্য ঢালিয়া রাখিয়াছে, আমায় দেখিয়া সে পাত্র ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিল— আমি চুপে চুপে বলিলাম, "তোমার সহিত বিশেষ কথা আছে। একটু নির্জ্জনে আইস।" পরাণ আমার সঙ্গে আসিতে উদ্যত হইল, আমি বলিলাম—"এ পাত্রটা শেষ করিয়া আইস" সে তাহাই করিল।

সেই দালানের পাশে একটী বারান্দা। সেখানে আর কেউ নাই দেখিয়া আমি সেইখানেই তাহাকে লইয়া গেলাম। "বলিলাম সর্ব্বনাশ ঘটে যে। এ নোট তুমি কোথায় পাইয়াছ বল দেখি?" এই কথা শুনিয়া পরাণের মুখ শুকাইয়া শবাকৃতি হইল। কে যেন তাহার মুখে কালি ঢালিয়া দিল; কে যেন তাহার পূর্ব্ব স্মৃতি জাগাইয়া দিয়া তাহাকে যাতনা দিতে লাগিল। পরাণ রুদ্ধ স্বরে আমার হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল— "কেন, কেন? কি হয়েছে, শীঘ্র বল। নোট ভাঙ্গাতে দিলুম তাতে আবার হল কি?"

আমি বলিলাম—"হল কি নয়! ব্যাপার বড় সঙ্গীন, যে খানে নোটের টাকা আনিতে গেলাম, তাহারা ত কোন মতেই টাকা দিতে চায় না। বলে এ চোরাই নোট। তাহাদের বই খুলিয়া তোমার নোটের নম্বরের সঙ্গে মিলাইল। শেষে বলিল 'এ নোটের নম্বর আমাদের লেখা আছে। এলাহাবাদে করালী বাবু বলিয়া এক বাঙ্গালী খুন হইয়াছে। তাহার কতকগুলি নোট খোয়া গিয়াছে। পুলিস সাহেবের হুকুম অনুসারে আমরা সেই চোরাই নোটের নম্বর পাইয়াছি চারিখানি ১০০ টাকা নোটের মধ্যে ইহাও একখানি।" কথা শুনিয়া পরাণের মুখ আরও শুখাইয়া গেল। মদিরার তেজে তাহার মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইয়াছিল, আমার কথায় সে আরও ভ্যাবা চ্যাকা খাইয়া গেল। প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া এই দম্‌বাজির দ্বারা আমি যে এরূপ আশাতীত ফল পাইব তাহা আমি জানিতাম না, আমি পুনরায় বলিলাম—"পরাণ কি করি বল দেখি? তারা ত সেখানে আমায় ছাড়িতে চাহে না—বলে তোমায় পুলিসে দিব—আমি বলিয়াছি এ নোট আমার নয়—যাহার নোট তাহাকে দেখাইয়া দিব আমার সঙ্গে লোক দাও। ওই দেখ তাদের লোক বাহিরে দাঁড়িয়ে। আমি ত বাঁচিলাম—এখন তোমাকে বাঁচাই কিরূপে? এখনি পুলিস আসিয়া ধরিয়া ফেলিবে।"

সুরাতেজ এইবার পূর্ণ প্রভাবে পরাণের মস্তিষ্কের বিকৃতি সম্পাদন করিয়াছিল। সে এই ঘটনায় ক্রমশঃ আত্মহারা হইতেছিল—তাহার মনের শক্তি কমিয়া গিয়া ঘটনা গোপনের ক্ষমতা লোপ হইতেছিল ইহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। আমার কথায় উত্তর না দিয়া সহসা সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমিই খুনী, আমিই মনিবকে মারিয়াছি, আমিই নোট লইয়াছি। আমার নামই পরাণ চাকর, ধর আমায় ফাঁসি দাও।" কথা শেষ না হইতে হইতেই সে কাঁপিতে কাঁপিতে দড়াম করিয়া মেঝার উপর পড়িয়া গেল।

ইহার পর পাঁচদিন পরাণ অজ্ঞানাবস্থায় কাটাইল। ঘোরতর বিকারে প্রলাপ বকিতে লাগিল, প্রলাপের মধ্যে করালী বাবুর কথাই অধিক। সেই ভয়ানক রাত্রে সে যে নৃশংস লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় করিয়াছিল, অজ্ঞানাবস্থায় তাহারই পুনরাভিনয় দেখাইতে লাগিল। তাহার এই অজ্ঞানাবস্থায় তাহার পকেট হইতে করালী বাবুর দুই কেতা ১০০ টাকার নোটও পাওয়া গেল।

বলা বাহুল্য কীর্ত্তিবাস চট্টোপাধ্যায় সেসনের বিচারে বিনা আপত্তিতে খালাস পাইল। কীর্ত্তিবাসের মুখে আর আনন্দ ধরে না, সে আমায় দেখিয়া বলিল "মহাশয় কেন ব্রাহ্মণকে এত কষ্ট দিলেন পরমেশ্বর নির্দ্দোষীকে রক্ষা করিলেন কি না এখন দেখিলেন ত।" আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম।

ইহার পর ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে একদিন তাহার বাটীতে গিয়াছিলাম। তাহার আবাসবাটী জনশূন্য। একজন লোক বলিল—কীর্ত্তিবাস চট্টোপাধ্যায় বাটী বিক্রয় করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সেই দিন হইতে এলাহাবাদে কীর্ত্তিবাসের আশ্রমের নাম লোপ।

নববর্ষ।

কিসের হরষ কোলাহল ?
কেন সুখে হেসে গেয়ে
ছুটে সব ছেলে মেয়ে
মুছিয়া প্রাণের অশ্রু জল ?
কেন এত হাসি খেলা
কিসের সঙ্গীত-মেলা
আবার কে এসেছে নিখিলে ?

সমীর পাগল পারা
কুসুমে আপনা হারা,
কুসুমিত লতা ধীরে দুলে!
সুদুর কানন তলে
পাপিয়া মধুরে বোলে
ফুলে ফুলে গীত ধ্বনি ভাসে।
কেন গো ধরার মাঝ
এতই হরষ আজ
কিসের উৎসবে সবে আসে?
বুঝি গো বরষ পরে
এল খেলিবার তরে
নূতন বরষ পুনরায়
নবীন রবির কর,
বরষে নিখিল পর
দিগঙ্গনা পুলকেতে চায়।
আন মুখে হাসি রাশি,
পরাণে উঠুক ভাসি
জগতের সঙ্গীত মহান।
পরাণে পরাণ ভোরে
ডাকিছে আকুল করে
ওই শোন মধুর বিষাণ।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

ইংরেজ সমাজ।

আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় একটী পুরাণ কথা আছে, 'যার হাতে খাইনি সে বড় রাঁধুনী, যার সঙ্গে ঘর করিনি সে বড় ঘরুণী';—বাস্তবিক এ কথাটা যে কতদূর সত্য তাহা আমি এখন স্পষ্ট বুঝিতেছি। কোন ব্যক্তি বা জাতির সঙ্গে ঘর না করিলে তাহার উপরভিতর ভালমন্দ কখন সম্যকরূপে বুঝা যায় না। মানবচরিত্র সকল স্থানেই এরূপ বিচিত্র যে, লোকে সর্ব্বদাই অপরিচিত বা পরের কাছে যেন একটা মুখোস পরিয়া পরস্পরের সঙ্গে আলাপাদি করিয়া থাকে। ঐ মুখোস খুলিয়া প্রতি ব্যক্তি বা প্রতি জাতির আসলমুখ দেখিবার ইচ্ছা হইলে,

ঠাকুরের আসল মুখ দর্শনের ন্যায়—স্নধু প্রণামি দিয়া ঐ আশা পুরাইবার যো নাই; উহার জন্য তাহাদিগের সহিত ঘর করিয়া রাতদিন তাহাদের কাছে থাকা আবশ্যক, তাহা হইলে আমরা সময়ে মুখোস ভেদ করিয়া আসল মুখের সহিত প্রকৃতরূপে পরিচিত হইতে পারি। সেইরূপ কোন দেশের অবস্থা ভাল করিয়া জানিতে বাসনা হইলে, তাহার অধিবাসীর সহিত সকল বিষয়ে মিশিয়া একত্র বাস না করিলে উহার বাহির ভিতর পর্য্যালোচনা ও পরীক্ষা করা একেবারে অসম্ভব।

'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা'য় আমি ইংরেজ জাতির গার্হস্থ্য ও দৈনিক জীবন প্রভৃতি সাধ্যমত আঁকিয়া দেশীয় ভ্রাতাভগিনীদিগের সম্মুখে ধরিয়াছিলাম; কিন্তু তখন ইংলণ্ডের আসল মুখ অর্থাৎ সমাজের সহিত আমার উত্তমরূপে পরিচয় না হওয়ায়, উহা তাঁহাদিগকে দেখাইতে পারি নাই। স্নতরাং এই প্রস্তাবে সেই চিত্রটী তাঁহাদের নিকট পাঠাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। কোন অপরিচিত দেশে আসিলে, প্রথম প্রথম তাহার সকল দ্রব্যই ভাল কিম্বা মন্দ বলিয়া আমাদিগের মনে হয়। বিশেষ, কোন দেশ সভ্য বা অসভ্য এই জ্ঞানানুসারে আমরা সেই স্থানের সকল বিষয়ের ভাল বা মন্দ কেবল এক পাশ হইতেই দেখিতে পাই। আমরা যদি আফ্রিকার কোন অসভ্যজাতির মধ্যে বেড়াইতে যাই, তাহাহইলে হয়ত অভ্যাসসিদ্ধ জ্ঞানানুসারে আমরা তাহাদের 'সকল বিষয়ই মন্দ'—অনায়াসে এইরূপ ধারণা করিয়া থাকি। আর ইউরোপের কোন দেশে ভ্রমণ করিলে হয় ত কোন কোন স্থানের বাহ্যিক চাকচিক্য দেখিয়া, 'তাহার সমস্তই ভাল'—এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই। কিন্তু ঐ উভয় দেশে উহার অধিবাসীদিগের সঙ্গে কিছু দিন বাস করিলে, আমরা অসভ্য কুলুদিগের সমাজ ও জীবনে যেরূপ অনেক ভাল ব্যবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হই, সেইরূপ ইউরোপীয় সভ্য জাতিদের মধ্যেও নানা প্রকার বীভৎস আচার ব্যবহার দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন ও দুঃখিত হই। বিশেষ, কোন সভ্য লোকদের সমাজে কোন প্রকার মন্দ রীতি নীতি প্রচলিত থাকিলে, তাহারা ঐ সকল বিকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ঢাকিয়া, সোনার শালগ্রামের ন্যায় অপরিচিতদিগের নিকট সমাজের স্বাভাবিক মুখ মুখোসে বা খোলে আবৃত রাখিবার প্রয়াস পায়। কিন্তু যদি কেহ নাছোড়বান্দা হইয়া দিন রাত তাহাদের দ্বারে ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে অন্ততঃ স্নানে বা উৎসবের সময়, ঐ আসল প্রতিমূর্ত্তি দর্শন তাহার অদৃষ্টে ঘটে। পাঠক পাঠিকারা মনে করিবেন না, যে, আমি ইংরেজসমাজকে একটী কাল পাথরের নোড়ার মত বর্ণনা করিতেছি, উহার গায়ে সাদা বা লাল কোন উজ্জ্বল বর্ণের রেখা নাই। তবে আমার এ সকল লিখিবার কারণ এই যে সাত বৎসর ইংলণ্ডে 'হত্যা' দিয়া এত দিনের পর আমি উহার আসল মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাইয়াছি, আর ঐ প্রকৃত মুখ হইতে যাহা কিছু ফুল চন্দন পাইয়াছি তাহাই কুড়াইয়া, দেশে লইয়া যাইবার জন্য, থলিতে পুরিয়া রাখিয়াছি

কিন্তু পাঠকেরা যদি আবার জিজ্ঞাসা করেন, যে 'ইংরেজ সমাজ কি সুধুই ফুল চন্দনময়?' তাহা হইলে আমার উত্তর এই—যে, রোগীরা যখন বিশ্বেশ্বরের নিকটে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকে, তখন জাগিয়া ও স্বপ্নে ঔষধের সঙ্গে তাহারা কত প্রকার ভয়ঙ্কর ও বীভৎসজনক দ্রব্য দেখিতে পায়, কিন্তু ঐ সব কাদা মাটী, আল্‌কাতরা প্রভৃতি হইতে বাছিয়া তাহারা কেবল ধন্বন্তরী ঔষধটী লইয়াই ঘরে ফিরিয়া আইসে ও উহা সেবনে স্বাস্থ্য লাভ করে। সুতরাং আমাদের এ পীড়িত ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়, এখন সাধ্য-মতে অন্য জাতির পীড়ার কারণগুলি ত্যাগ করিয়া তাহাদের ঔষধগুলি আহরণ করা কি আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে? আর উহাই আমার উদ্দেশ্য। তথাচ, আমরা মানবজাতি এরূপ জঞ্জালপ্রিয় যে, ইংরেজ সমাজের কেবল ফুলচন্দন সংগ্রহের বাসনা থাকিলেও আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে দু একটা কাঁটাঘাসও কুড়াইয়াছি, আশা করি, উহা পাঠক-পাঠিকাদের হাতে ফুটিবে না।

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে যেরূপ অসীম প্রভেদ, হিন্দু ও ইংরেজ সমাজও সেইরূপ মহা-সাগরের দুই সীমার দুইটী দেশের ন্যায় সম্পূর্ণরূপ পৃথক। আমাদের দেশে জাতি অনুসারে সমাজ গঠিত হয়, আর এদেশে ধন ও পদের দ্বারা উহা বিভক্ত হইয়া থাকে। গড়ে ইংলণ্ডে তিনটী সমাজ প্রচলিত। 'অ্যারিষ্টক্র্যাটিক সোসাইটী' অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত সমাজ, 'মিড্‌ল ক্লাস্' বা মধ্যশ্রেণীয় ও 'লোয়ার ক্লাস্' অর্থাৎ নিম্ন শ্রেণীয় সমাজ। কিন্তু "সোসা-ইটী" বা সমাজ বলিলে এদেশে প্রায় সম্ভ্রান্ত সমাজই বোঝায়। কেননা, মধ্যশ্রেণীর লোকেরা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইলেও তাহারা ঐ উচ্চ সমাজেরই অনুকরণ করিয়া চলে। আর নিম্ন শ্রেণীদের মধ্যে আমাদের দেশের ধোবা, নাপিত, তাঁতি, গোয়ালা প্রভৃতির ন্যায় অতি অল্পই সমাজের রীতি নীতির পালন, বা নির্দ্দিষ্ট সামাজিক জীবন দেখা যায়। ঐ তিন সমাজই সচরাচর নিজ নিজ শ্রেণী বা দলের মধ্য হইতে স্বামী বা স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকে।

যুবরাজ, যুবরাণী প্রভৃতি মহারাণীর পরিবার সম্ভ্রান্ত সমাজের প্রধান সভ্য, তাঁহাদের পর যত ডিউক, মার্কুইস, আর্ল পদধারী "লর্ডেরা।" ইহাদিগের পরে বিদেশীয় দূত, পার্লমেণ্টের সভ্য প্রভৃতি বিখ্যাত লোকেরা সমাজের আসন গ্রহণ করেন। মধ্যশ্রেণীদের সমাজ অতি বিস্তৃত; দেশের যত বড় বড় ব্যবসায়ী, কর্ম্মচারী, অধ্যাপক, সম্পাদক, ব্যারিষ্টার, এটর্ণী প্রভৃতি লোকেরা—অর্থাৎ যে লোকেদের মাসে তিন চারি হাজার হইতে কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকা আয়—তাহারা সকলে মধ্যশ্রেণীর সমাজের সভ্য। আর ঐরূপ ধনী লোক ইংলণ্ডে যে কত আছে, তাহার ঠিক নাই। ঐ দুই সমাজ বাদে অবশিষ্ট প্রায় সমস্ত অধিবাসীরা নিম্ন সমাজের মধ্যে পরিগণিত। আমা-দের দেশের ন্যায় বিবাহ, শ্রাদ্ধ বা উৎসবাদির সময়ে সমাজের লোকদিগকে কেবল খাও-য়ালেই এদেশের সামাজিক প্রথা পালন করা হয় না। এখানে প্রতি সমাজ একতার সূত্রে

এরূপ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ যে একজন সভ্যকে আঘাত করিলে, অন্যান্য সভ্যেরা পর্য্যন্ত গায়ে ব্যথা পায়, একজনের মিথ্যা নিন্দা করিলে অন্যেরা কষ্ট অনুভব করে, এবং একজনের অনিষ্ট সাধন করিলে সকলে একত্র মিলিত হইয়া তাহার প্রতিশোধ দেয়। ইংলণ্ডের যে এত তেজ, বল ও কার্য্যশক্তি, সে সমুদায় প্রধানতঃ উহার উৎকৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থার ফল। আমরা জগৎ সংসারের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই যে, যতদিন কোন জাতির সমাজ পুরাতন ও অনিষ্টকারী রীতিনীতি সকল সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া ক্রমে উন্নত হইতে থাকে, ততদিন সেই জাতির শ্রীবৃদ্ধি ও বিক্রমের পথ সম্পূর্ণ নিরাপদ। আর যেই উহার সমাজ অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, অম্নি সে জাতিও অধোগতি প্রাপ্ত হয়। গ্রীস, রোম ও স্পেনের প্রাচীন ইতিহাস হইতে আমরা উহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাই। আবার ফরাসীজাতির প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাস ও রাজবিপ্লবেও উহা স্পষ্ট দেখা যায়।

ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুইর পিতা, পিতামহ ও তাঁহার নিজের রাজ্যেও ঐ দেশের সমাজ এরূপ অলস ও ঘৃণিত হইয়া পড়ে যে সমস্ত ইউরোপের মধ্যে উহা কলঙ্ক-স্বরূপ দাঁড়ায়। রাজপরিবার ও সম্ভ্রান্ত লোকের নিজেদের উন্নতি ও ধর্ম্মালোচনা ত্যাগ-করিয়া কেবল ইন্দ্রিয় ভোগ ও বিলাসে রত থাকে, রাজা ও ডিউকেরা প্রজা ও সাধারণ লোকদের প্রতি নানা অত্যাচার পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজেদের বাসনা পরিতৃপ্ত করে। আর ফরাসী সম্ভ্রান্ত-সমাজ হিংসা, আড়ম্বর পরনিন্দা, অহঙ্কার ও ব্যাভিচার প্রভৃতি যত ঘৃণিত রিপু ও অভ্যাসে পূর্ণ হইয়া উঠে। ক্রমে দেশ ধারকর্জ্জ, আলস্য ও বিবাদে অধঃপাতে যাইবার যো হয়। কিন্তু সাধারণ ফরাসীদের কার্য্যক্ষমতা ও চঞ্চল স্বভাব দ্বারা ফ্রান্স ঐ মহা পতন হইতে রক্ষা পায়। তত্রাচ ঐ উদ্ধারের জন্য সে দেশে যে কত রক্তপাত ও ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইয়া গিয়াছে তাহা মনে করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। যখন বিলাস মগ্ন সম্ভ্রান্তদের উৎপীড়ন সহিয়া নিশ্চিন্তভাবে জীবন কাটান অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন যত শ্রমজীবী ও কৃষকেরা মিলিত হইয়া রাজবিদ্রোহী হইল ; ও যত সম্ভ্রান্তদের ও রাজপরিবারের বিনাশ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। কত পরিশ্রম, রক্তপাত, হত্যা ও যন্ত্রণা দ্বারা ফরাসীরা যে তাহাদের দেশকে ঘৃণিত সমাজের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়া উহাতে সাধারণতন্ত্রপ্রণালী ও ভিন্নরূপ সংশোধিত সাধারণ সমাজের ব্যবস্থা স্থাপন করে, তাহা, যাঁহারা ফরাসী রাজবিপ্লবের ইতিহাস পড়িয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন। ঐ মহা বিপ্লবে রাজা রাণী ও রাজপরিবারের যত প্রধান প্রধান সভ্যেরা নিজেদের আলস্য, অপব্যয় ও স্বেচ্ছাচারিতার দণ্ডস্বরূপ সাধারণদিগের হাতে প্রাণ হারায়। তা ছাড়া কত অসংখ্য সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবার যে সমূলে বিনষ্ট হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। যদিও ঐ লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড ও বীভৎস ঘটনা অতি দুঃখের বিষয় তথাপি সমস্ত জীবন ঘৃণা ও কলঙ্কের বোঝা মাথায় বহিয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা ওরূপ মৃত্যু শতাংশে

শ্রেয়। বিশেষ, কোন সমাজ বা জাতিকে গোড়া হইতে সংশোধন ও উন্নত করা যে রূপ মহৎ ব্যাপার, সেইরূপ নানা মহৎকাণ্ড সাধন ব্যতীত উহাতে সম্পূর্ণরূপে সফল হওয়া অসম্ভব।

ইংলণ্ডের কি ধনী, কি দরিদ্র সকল সমাজই ক্রমাগত উহার অন্তর্গত যত পুরাণ ও অনিষ্টকারী রীতিনীতি সংশোধন করিয়া আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ ও অপেক্ষাকৃত উন্নত করিবার প্রয়াস পায়। প্রধান মন্ত্রী হইতে সামান্য মুটে পর্য্যন্ত সকলেই আপনাকে আরো অধিক উন্নত, সমাজকে আরো দলবদ্ধ ও দেশকে আরো ধন পূর্ণ ও ক্ষমতাশালী দেখিবার ইচ্ছা করে। অবশ্য আমাদের দেশেরও প্রায় সকলেই আপনাদিগকে আরো উন্নত ও ধনী দেখিবার বাসনা করেন। কিন্তু ভারতবাসী ও ইংলণ্ডবাসীতে এই প্রভেদ যে, আমরা কেবল ইচ্ছা করিয়াই সমস্ত অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি; আর ব্রিটনবাসীরা যতক্ষণ না সেই বাসনা পরিতৃপ্ত হয়, ততক্ষণ প্রাণপণে খাটিতে এক দণ্ডের জন্য ক্ষান্ত হয় না। কাজেই ইংলণ্ডের প্রধান সমাজে প্রতি বৎসর যে সব সভ্য অলস, বিলাসী বা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, নিম্নশ্রেণীয় সমাজ হইতে তাহার দ্বিগুণ লোক পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে উহাতে প্রবেশ করিয়া ঐ অকর্ম্মণ্য সভ্যদিগকে পদচ্যুত করে। সুতরাং সমাজ সর্ব্বদাই কার্য্যক্ষম, পরিশ্রমী, সৎ ও অধ্যবসায়ী সভ্যে পূর্ণ হইয়া ক্রমে উন্নত ও মার্জ্জিত হইতে থাকে।

আসিয়া ও ইউরোপের অনেক জাতিরা কিছুদিনের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও জগদ্বিখ্যাত হইয়া আবার অবনত হইয়া পড়িয়াছে, সেজন্য সকলে এরূপ মনে করেন যে ইংলণ্ড এখন যেরূপ প্রসিদ্ধ ও গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে উহারও শীঘ্র অধোগতি হইবে। সময়ে যে ইংলণ্ডও অন্যান্য জাতিদের ন্যায় নীচে নামিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংলণ্ডের সমাজ-ব্যবস্থা উহাকে অবিলম্বে পদচ্যুত হইতে দিবে না। যতদিন ব্রিটন সমাজে বর্ত্তমান কার্য্যশক্তি, মানের ভয় ও মনের তেজ থাকিবে ততদিন ব্রিটনের ক্ষমতা অটল রহিবে। কিন্তু যে দিন উহার ঐ উচ্চ গতি থামিবে, সেই দিন উহা নীচেরদিকে নামিবে। কেন না, স্বভাবের নিয়মানুসারে এ জগতের কোন বস্তু বা বিষয় কখন স্থির থাকে না।

আরো স্ত্রীলোক ও পুরুষের মিশ্রিত সমাজ দ্বারা ইংলণ্ড যে কত উপকার পায়, তার শেষ নাই। উভয়জাতি একত্র মিশামিশি, আলাপ ও কার্য্য করাতে সমাজের রীতিনীতি ও চালচলন সুমার্জ্জিত হইয়া থাকে। ব্যভিচার ও পাপের প্রতি দুই জাতিরই সমান ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মায়। সর্ব্বদা মাতা ভগিনীর নিকট থাকাতে বাল্যকাল হইতে পুরুষদের স্বভাব যেমন ধর্ম্মশীল ও নম্র হইয়া আসে, সেইরূপ পিতা ভ্রাতার সহিত সর্ব্বদা অবস্থিতির দরুণ স্ত্রীলোকেরা অন্য দিকে তেজ, সাহস ও নির্ভয়তা শিক্ষা পায়। পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে শুধু খেলিবার দ্রব্যের ন্যায় ভাবে না, সুতরাং ইংরেজ মহি-

লারা আত্মাভিমান বুঝিয়া যাহাতে বিদ্যা, জ্ঞান ও কথাবার্ত্তায় পুরুষ জাতির আদরণীয় হইতে পারে, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করে। আর নিজ নিজ পরিবার ও সমাজে এই প্রকার সুখ পাওয়াতে এদেশের শিক্ষিত লোকেরা আমোদ বা বিলাসের জন্য গৃহ ত্যাগ করিয়া কখন অন্যত্র যায় না।

উচ্চশ্রেণীর সমাজে প্রতি বালক ও বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে—অর্থাৎ পুরুষ বাইশ বৎসর ও স্ত্রীলোক আঠার বৎসরের সময়—তাহাদের পিতামাতা ও আত্মীয়েরা মহা আনন্দে যত বন্ধুবান্ধবের সম্মুখে মহারাণী ও রাজপরিবারের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় করাইয়া দেয়। উহাকে ইংরেজীতে "প্রেজেণ্টেসন্ ইন সোসাইটী" বলে। ঐ সাধারণ পরিচয়ের পর তাহারা সমাজভুক্ত হয় ও সামাজিক সকল কাজে অধিকার পায়।

সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকেরা মাঝে মাঝে নাচ গান ও ভোজ দিয়া থাকেন। ঐ সকল নাচ ও ভোজে স্ত্রীপুরুষ সকলে একত্র মিশিয়া আলাপ পরিচয় ও গানবাজনা করে। আমাদের দেশের অন্যান্য আচার ব্যবহারের স্যায় এদেশের নাচ ও ভোজও ভারতবর্ষীয় নাচ ও ভোজ হইতে একেবারে ভিন্ন। এখানে বাই বা খেম্‌টা নাচের প্রথা নাই। আর এদেশের ভোজে কদাচ পাঁচ শত লোকের অধিক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি একত্র হয়। আমাদের দেশের মত পাড়াসুদ্ধ বা গ্রামসুদ্ধ লোক নিমন্ত্রণ, ও ছোট বড় সকল ব্যক্তিকে মুক্ত হস্তে খাওয়ানর রীতি ইংলণ্ডে দেখা যায় না। স্বার্থপর ইংরেজদিগের অন্যান্য কাজের ন্যায় নাচগান ও ভোজেও কেবল আত্মতুষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। সচরাচর বিশেষ আলাপী বন্ধু ও আত্মীয়েরা ভিন্ন কোন বাহিরের বা অজানা লোক উহাদের আমোদ আহ্লাদ ও ভোজনে যোগ দিতে পারে না। আর নিম্নশ্রেণীর সমাজের লোকেরা উহাদের গৃহে উঁকি মারিতে পর্য্যন্ত ভয় পায়। যত নিমন্ত্রিত ব্যক্তি, বিশেষ যুবক যুবতীরা এক এক জোড়া, পরস্পরের কোমরে হাত দিয়া নিজেরাই নাচিয়া থাকে ও দুই চারি জনে বাজনা বাজায় ও গান করে। আপনাদিগের মধ্যে এইরূপ নাচ গানে পরস্পরের সঙ্গে অধিক মিশামিশি হয়, ও উহারা অনলস ও কার্য্যতৎপর থাকে। কিন্তু ঐ নাচের একটী বিষয় আমাদের চক্ষে অতি লজ্জাস্কর ও নিন্দনীয় বোধ হয়; ঐ সব 'বল' বা নাচের জন্য ইংরেজ মহিলারা যেরূপ পরিচ্ছদ পরে, তাহা অতি অসভ্য ও সুরুচি বিরুদ্ধ। এত সভ্যতার গৌরব করিয়া উহারা যে কি প্রকারে ওরূপ নির্লজ্জভাবে সজ্জিত হয়, তাহা বলা যায় না। কিন্তু সুখের বিষয় আজকাল শিক্ষিত ইংরেজদের মধ্যে ঐ ঘৃণিত পোষাকের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ দেখা যায়, সে জন্য আশা হয়" সময়ে অন্যান্য অনেক মন্দরীতির ন্যায় উহাও ইংরেজ সমাজ হইতে উঠিয়া যাইবে।

ইংরেজ সমাজের আর একটী দোষ, উহা মানুষকে বাহ্যাড়ম্বর, অহঙ্কার, বিলাস দম্ভ প্রভৃতি অনেক মন্দগুণ শিক্ষা দেয়। সকলের চেয়ে বেশী ধনী বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য অনেকে আয়ের অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিয়া জাঁকজমক দেখায়, অব-

শেষে আর আড়াআড়ি করিতে না পারিয়া দেউলে হইয়া পড়ে। নাচগান দেবার সময় উহারা অত্যন্ত অপব্যয় করে; শুনিয়াছি একজন লোক কেবল ফুলে বাড়ী সাজাইয়া কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিল। অবশ্য, আমাদের দেশের ধনী লোকেরাও পূজা ও যাত্রা ইত্যাদিতে হাজার হাজার টাকা জলে ফেলিয়া দেন; কিন্তু ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের ভোজ ও নাচগানে এই প্রভেদ যে সেখানে একজন ধনী-লোকের কল্যাণে কত গরীব দুঃখীরা খাদ্য ও আনন্দ পায়, আর এখানে একলষেঁড়ে ইংরেজরা আপনাদের লইয়াই ব্যস্ত। আর ধনী মহিলাদের ত কথাই নাই,—কিসে সর্ব্বাপেক্ষা দামী ও সুন্দর পোষাক ও গহনা পরিয়া সকলের চক্ষু আকর্ষণ করিবেন, কেবল মাত্র এই চিন্তাই যেন নিরন্তর তাঁহাদের মনে জাগরুক। নাচগান করা, থিয়েটরে যাওয়া, ঘোড়া বা গাড়ী চড়িয়া বেড়ান ও পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করাতেই তাঁহা-দের সমস্ত জীবন ও সময় অতিবাহিত হয়। কিন্তু পাঠক পাঠিকারা ইহা পড়িয়া ভাবি-বেন না যে সমগ্র ইংরেজ সমাজই ঐরূপ আড়ম্বর ও বিলাসের আকর; কেবল সম্ভ্রান্ত সমাজকেই ঐরূপ বিনাকর্ম্মে জীবন কাটাইতে দেখা যায়। এদেশের মধ্যবিত্ত ও গৃহস্থ লোকদের পরিশ্রম পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করা যেরূপ প্রধান কাজ, ঐসব ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিরা আমোদ আহ্লাদে অর্থব্যয় করা সেইরূপ প্রয়োজনীয় ভাবে। কাজেই এক দল যেমন অপচয় করে, অন্যদল তেমনি সঞ্চয় করে, সেজন্য দেশ বা সমাজের উহাতে কোন অপকার হয় না। বিশেষ, ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদের এদেশে এই একটী গুণ দেখা যায়, তাহারা জীবিকা ইত্যাদির জন্য না খাটিলেও একেবারে নিষ্কর্ম্মা হইয়া জীবন কাটায় না। কোন না কোন বিষয়ে মন ও শরীরকে সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখায় উহারা কার্য্যক্ষম হয়, ও সময়ে সময়ে ঐ কার্য্য শক্তির উদাহরণ দেয়। আপনারা আমোদ আহ্লাদে ব্যস্ত থাকিলেও স্বদেশের প্রতি তাহাদের কোন অবহেলা নাই। সাম্রাজ্যের কোথায় কি হইতেছে, উহাতে কখন্ কি চলিতেছে, সে সব বিষয়ে তাহারা সর্ব্বদা চোক রাখে। আর দেশের শাসন বা সামাজিক রীতিতে কোন দোষ দেখিলে উহারা তাহা দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পায়।

সবদিক দেখিলে ইংরেজ সমাজে দু একটী মন্দ রীতি নীতি চলিত থাকিলেও উহা অন্যান্য সকল সমাজেরই শ্রদ্ধার পাত্র।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

স্ত্রী ও পুরুষ

(১)

স্ত্রী এবং পুরুষের সমন্ধ, ক্ষমতা ও অধিকার লইয়া কিছুদিন হইতে নব্য বঙ্গে একটা আন্দোলন উঠিয়াছে। এ আন্দোলনের আরম্ভ আমাদের দেশে নহে; পাশ্চাত্য দেশেই স্ত্রী পুরুষের ক্ষমতা ও অধিকার লইয়া প্রথম তর্ক উঠে। তাহারই দু'একটী ক্ষীণ তরঙ্গ বঙ্গোপকূলে আসিয়া আঘাত করিয়াছে। এখন এক দল লোক বলিতেছেন যে, স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই যখন বিধাতার সৃষ্টি তখন উভয়ের মধ্যে ক্ষমতা ও অধিকার ভেদ থাকিতে পারে না। কারণ, তাঁহারা বলেন, একজনকে ক্ষমতাশালী এবং অপরকে দুর্ব্বল করিয়া গড়িলে ঈশ্বরের ন্যায়দণ্ডের কলঙ্ক রটে। আর একদল বলেন, সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষার্থে স্ত্রী এবং পুরুষের ক্ষমতা ও অধিকার ভেদ আবশ্যক, মঙ্গলময় বিশ্বপিতার ইহাতে পূর্ণ মঙ্গল ভাবই প্রকাশ পায়। শেষ পক্ষের মতে, উভয়ের ক্ষমতা ও অধিকার সম্পূর্ণ এক হইলে ধারাবাহিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসারে সুশৃঙ্খলাপেক্ষা বিশৃঙ্খলারই প্রাদুর্ভাব হইত। এক পক্ষ স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণের উল্লেখ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতাপ্রসূত বিশৃঙ্খলার অমূলকত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান; অপর পক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বাভাবিক আকর্ষণের পবিত্রতা লোপের আশঙ্কা করেন। সম্প্রতি মহিলারাও এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন, এবং পুরুষজাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বিস্তর সন্দেহ প্রকাশ করিয়া স্বজাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব এবং জয়গর্ব্ব অনুভব করিতেছেন। পুরুষজাতির পক্ষেও কোন কোন পাশ্চাত্য মহিলা দুই চারি কথা বলিয়াছেন স্বীকার করি, তেমন অনেক পুরুষও স্ত্রীজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,কিন্তু তাহাতে যুক্তি এবং সত্যের উপর নির্ভর ছাড়িয়া মত বিশেষের পক্ষপাতিতা করিবার কোনও কারণ নাই। আসল কথা, স্ত্রী এবং পুরুষের কতকগুলি অধিকার, কতকগুলি ক্ষমতা যেমন সাধারণ, সেইরূপ কতকগুলি আবার স্বতন্ত্র। পুরুষ অথবা স্ত্রী কেহই একেবারে সকল বিষয়ে বঞ্চিত নহে। পুরুষ জাতির অনেক গুণ আছে যাহা স্ত্রীজাতির মধ্যে সহজে মিলে না; স্ত্রী জাতিরও এমন গুণ আছে যাহা পুরুষ জাতির মধ্যে দুর্লভ। কিন্তু ক্ষমতাবিশেষের মায়ায় পড়িয়া স্ত্রী কন্যাদিগকে অথবা স্বামী পুত্রকে হীন প্রতিপন্ন করিতে চাহে কে? শ্রেষ্ঠত্ব লাভের কি উপায় এই? তর্ক করিয়া বা প্রবন্ধ লিখিয়া কেহ কাহাকেও স্বাভাবিক ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। যেখানে যাহার যতটুকু শ্রেষ্ঠত্ব অল্পদিন মধ্যেই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

কূট তর্কে অবশ্য প্রমাণ করা যায় না যে, কোথায় কাহার কতটুকু শ্রেষ্ঠত্ব; কিন্তু হাতে কলমে এবং অপক্ষপাতী যুক্তির সাহায্যে উভয় জাতিরই গুণাগুণ বুঝা যায়। যদি এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যে বিদ্যা বহুদিন হইতে বহু সংখ্যক স্ত্রী অথবা পুরু-

ষের মধ্যে অনুশীলিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতেও পুরুষ অথবা স্ত্রীলোকেরা সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাহা হইলে কাল, সংখ্যা এবং পারদর্শিতা তুলনা করিয়া উক্ত বিদ্যা-বিষয়ে পুরুষ অথবা স্ত্রীর ক্ষমতাসম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যাইতে পারে। নহিলে, অভিমান, তার-কণ্ঠ অথবা কষ্টলব্ধ দু'একটী ব্যতিক্রমের উদাহরণ হইতে কিছুই প্রমাণ হয় না। আর মস্তিষ্কের ভার, পায়ের গড়ন, স্বরের গাম্ভীর্য্য অথবা তাহার অভাব কোনও বিশেষ শক্তির প্রমাণ কি না বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে স্থিরীকৃত না হইলে আপাততঃ এই সকল লক্ষণ বিচার করিয়া স্ত্রী পুরুষের কাহারও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা অসম্ভব। তবে কোন কোন বিজ্ঞানবিদ্ বিদেশীয় পণ্ডিত বিস্তর পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বটে যে, সাধারণতঃ স্ত্রী এবং পুরুষের মস্তকের গঠন বিভিন্ন, এবং পুরুষ-প্রকৃতি স্ত্রী বা স্ত্রী-প্রকৃতি পুরুষের মস্তক প্রায় পুরুষ বা স্ত্রীর মত হইয়া থাকে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত হইতেও যে স্ত্রী পুরুষের ক্ষমতা সম্বন্ধে একেবারে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে এমন বোধ হয় না। সুতরাং ফল দেখিয়া বিচার করাই যুক্তিসঙ্গত। তবে আমরা যে এবিষয়ে একেবারে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব এরূপ ভরসা নাই, সত্য এবং যুক্তির অনুসরণ করিয়া যথাসাধ্য স্থির সিদ্ধান্তে আসিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে মাত্র। বিষয়বিশেষে স্ত্রী এবং পুরুষের কাহারও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হইলে অপরের ক্ষুব্ধ হইবার কারণ নাই। কারণ, এ সংসারে সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বলাভ কাহারও কপালে প্রায় ঘটে না।

হৃদয়ের স্নেহ দয়া প্রভৃতি বৃত্তি বিষয়ে স্ত্রীজাতিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। অনেকে বলেন, বহির্জ্জগতের সহিত তেমন সংঘর্ষে আসিতে হয় না বলিয়া স্ত্রীজাতির মধ্যে এই গুণগুলি সমধিক পরিস্ফুট, পুরুষের মত বাহিরের সহিত ক্রমাগত সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইলে স্ত্রীলোকের কোমল বৃত্তি গুলি এতদিনে কঠিন হইয়া আসিত। ধারাবাহিক সংগ্রাম-সংঘাতে কোমল বৃত্তিগুলি যে কঠিনতা প্রাপ্ত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া যে নারীজাতি স্নেহ দয়া প্রভৃতি বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা অশ্রেষ্ঠ এমন বিশ্বাস হয় না। প্রকৃতি রমণীর হস্তে গুরুতর সন্তানপালন ভার অর্পণ করিয়াই নারী হৃদয়ে স্নেহের উৎস স্থাপন করিয়াছে। তবে অবশ্য সকল রমণী সমান স্নেহময়ী নহে; কোমল হৃদয়ের মধ্যেও মধ্যে মধ্যে পাষাণের পরিচয় পাওয়া যায়। পতিঘাতিনী সন্তানত্যাগিনীও সংসারে মিলে ত। কিন্তু সাধারণতঃ রমণী স্নেহময়ী। পুরুষ-হৃদয়ে স্নেহ দয়া এসকল আছে বটে, তবে নানাকারণে তাহার হৃদয় রমণীর তুলনায় কঠিন। কিন্তু কঠিন বলিয়া নিষ্ঠুরতাই তাহার প্রাণ নহে। বাহিরের সহিত সংঘাতে পুরুষ জাতির সমস্ত মনোবৃত্তির চর্চ্চা হয়, বুদ্ধি বিবেচনাশক্তি পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, রমণীর মত গুটিকত কোমল বৃত্তিই বিশেষ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে না, সেই জন্য তাহার প্রকৃতি বিশেষরূপে কোমল ঠেকে না। শৈশবের খেলাধূলা হইতেই রমণী-হৃদয়ের স্নেহবৃত্তি

বিকশিত হইতে থাকে। যে ভালবাসার ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা সন্তানে, তাহার সূচনা সামান্য মৃৎপুত্তলিকায়। কেহ কেহ বলেন, ইহা সামাজিক শিক্ষার ফল, বালক বালিকার প্রকৃতি আসলে এক। কিন্তু আমার বোধ হয়, প্রকৃতি এক হইলে যুগযুগান্তর হইতে বালক বালিকার মধ্যে স্বতন্ত্র বৃত্তি-উত্তেজক খেলা চলিয়া আসিতে পারিত না।

বিশেষ যত্নের সহিত পৌরুষিক শিক্ষা দিয়া আসিলে রমণীকে কালে অসম্পূর্ণ পুরুষ করিয়া তোলা যাইতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবই ত প্রকৃতি। শিক্ষার প্রণালী-অনুসারে প্রকৃতির উৎকর্ষ অপকর্ষ সাধিত হয় মাত্র। প্রথমেই কিছু আর এইরূপ সমাজ-বন্ধন ছিল না, দেশ বিশেষের অবরোধ প্রথাও ছিল না, আধুনিক শিক্ষা দীক্ষাও ছিল না; কিন্তু পুরুষ-প্রকৃতি হইতে স্ত্রীপ্রকৃতি বোধ করি আস্পষ্ট স্বতন্ত্র। তাহার মূল কারণ স্পষ্টই পড়িয়া আছে—সন্তানগর্ভে ধারণ। সন্তান যেমন রমণী-হৃদয়ের স্নেহ-বৃত্তির পুষ্টিসাধন করে, সেইরূপ আপনার দিকে বিশেষরূপে টানিয়া রাখিয়া সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে রমণীকে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইতে দেয় না। শারীরিক দুর্ব্বলতা যেমন রমণীর পুরুষের সমকক্ষ হইবার এক বিঘ্ন, সন্তানপালনও সেইরূপ। সন্তানের জন্য জননীকে বাঁধা পড়িতেই হইয়াছে। তর্ক করিয়া ত আর প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করা যায় না। সমস্ত জীবজগতে প্রকৃতির এই নিয়ম।

কোমল বৃত্তিগুলিই প্রবলা বলিয়া রমণীর স্থান পুরুষের পার্শ্বে। শারীরিক বলে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ত কাহারও সন্দেহই নাই, মানসিক শক্তিতেও রমণী পুরুষের নিম্নে। মানসিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ হইলে স্ত্রীজাতি পুরুষের সহধর্ম্মিণী ও অনুবর্ত্তিনী না হইয়া পুরুষই স্ত্রীর অনুবর্ত্তী হইত। আমার বোধ হয়, শরীরের ন্যায় স্ত্রীজাতির মনও দ্রুত বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পুরুষের মনের মত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স পর্য্যন্ত বালক অপেক্ষা বালিকার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখা যায়। খানিকদূর গিয়া কিন্তু রমণীর প্রাখর্য্য প্রশমিত হইয়া আসে, আর ধীর দৃঢ়পদবিক্ষেপে পুরুষ অগ্রসর হইতে থাকে। প্রকৃতির নিয়মই এই যে, দ্রুত গতির সহিত বলক্ষয়ে শ্রান্তি অনিবার্য্য। কদলীবৃক্ষের মত স্ত্রী আগেভাগে বাড়িয়া উঠে, প্রথমে হয়ত পুরুষকে ছাড়াইয়াও যায়, তাই বলিয়া চিরদিন আগে আগে চলিতে পারে না। প্রকৃতিই স্ত্রীকে সে বল হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বা পুরুষের অনুকরণে কোন বিশেষ কার্য্য করিয়া এ স্বাভাবিক শক্তি উপার্জ্জন করা চলে না।

তাই বলিয়া কি স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে? বিদ্যাচর্চ্চায় অসম্পূর্ণ স্ত্রী কালে সম্পূর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। কেবল মাত্র দুইচারিখানি জ্যামিতি এবং ইংরাজী ভাষার গ্রন্থ পাঠেই অবশ্য বিদ্যাচর্চ্চা হয় না। যাহাতে হৃদয়ের সম্যক স্ফূর্ত্তি হয় এরূপ শিক্ষা পুরুষের মত স্ত্রীরও আবশ্যক। স্বাভাবিক শক্তির তাহাতে উৎকর্ষ সাধিত হয়। মানসিক শক্তিতে স্বভাবতই পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্ত্রীজাতির

হৃদয়-বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন অনাবশ্যক নহে। বরঞ্চ শিক্ষার সহিত নারীজাতি পুরুষের যথার্থ সহধর্ম্মিণী হইবার যোগ্যতা লাভ করে। স্ত্রীর ও ত পুরুষের মত হৃদয় আছে, মস্তিষ্ক আছে, কেবলমাত্র প্রভেদ কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতায় বৈ ত নয়। সে জন্য একজনকে ক্রমাগত চাপিয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে। উভয়ের মধ্যে একেবারে আকাশ পাতাল প্রভেদ জন্মাইলে পরস্পরকে না বুঝিবার জন্য সাংসারিক অসুখ অশান্তি ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এবিষয়ে অধিক কথা বলা বাহুল্য।

কিন্তু মানসিক শক্তি সম্বন্ধে পুরুষের স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ কি? উদ্ভাবনী শক্তিতেই বোধ করি পুরুষ জাতির এ ক্ষমতা বিশেষ প্রকাশ পায়। উদ্ভাবনী শক্তি যে নিতান্তই শিক্ষার উপর নির্ভর করে না, তাহার প্রমাণ সেক্সপীয়র, বার্ণ্‌স্‌, কিট্‌স্‌, ফ্যারাডে এবং অন্যান্য আরও অনেক মিলে। তবে পুরুষপরম্পরাগত জাতীয় শিক্ষার ফল বলিলে নাচার। কিন্তু এ যুক্তি দ্বারাও স্ত্রীজাতিকে কতদূর উর্দ্ধে উঠান যায় সন্দেহ। মার্কিন মহিলাই ত দুঃখ করিয়াছেন যে, রমণীগণ কত দিন হইতে পিয়ানো টুং টাং করিয়া আসিতেছেন, সুগায়িকারও অভাব নাই, এতদিনেও ত কৈ একজন মোজার্ট বিটোভেনের আবির্ভাব হইল না। য়ুরোপ আমেরিকায় বহুসংখ্যক রমণী চিত্রবিদ্যা বা ভাস্করবিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন; কিন্তু র‍্যাফেল্‌, টিশিয়ান্‌, থরওয়াল্‌ড্‌সেন অথবা বর্ত্তমান কালের সুবিখ্যাত চিত্রকর এবং ভাস্করদিগের ন্যায় রচনা কয়জনের? মার্কিন গ্রন্থকর্ত্রী দেখাইয়াছেন, পাচিকা অপেক্ষা পাচক রন্ধন-বিদ্যায় নিপুণ, প্রথমশ্রেণীর স্ত্রী-দরজী অপেক্ষা পুরুষ-দরজী পোষাকের গঠনাদি সুন্দর করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ নানা উদাহরণ হইতে সহজেই মনে হয় যে, "সহকারিণীরূপে স্ত্রীজাতির যতই ক্ষমতা প্রকাশ পাক্ না কেন, হৃদয়ের শক্তির এবং মৌলকতার যেখানে আবশ্যক সেখানে নেতৃত্বভার গ্রহণ করিতে রমণী অক্ষম।" দু'একটী জর্জ এলিয়ট বা সমর্ভিলের উদাহরণ হইতে স্ত্রীজাতির শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হয় না।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, আমরা স্ত্রীজাতিকে বুদ্ধিহীনা প্রতিপন্ন করিতে চাহি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। রমণীর দ্রুত-ধারণা-শক্তির পরিচয় যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারা তাহার বুদ্ধির অভাব স্বীকার করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরুষের সহিত সমকক্ষতা করিয়া রমণী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, অন্যান্য অনেক কার্য্যেও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছে; কেমন করিয়া বলি স্ত্রীজাতি বুদ্ধিহীনা? রমণীর বুদ্ধি অস্বীকার করা অসম্ভব, কিন্তু মস্তিষ্কের শক্তি পুরুষের মত নহে। এই শক্তি অভাবেই স্ত্রীপ্রকৃতি পুরুষের তুলনায় লঘু। এই শক্তি অভাবে স্ত্রীজাতির মধ্যে সাধারণতঃ সূক্ষ্ম বিবেচনা, গভীর চিন্তা, উদার কল্পনা, সৌন্দর্য্যের গভীর রহস্যে নিমজ্জন-শক্তি দেখা যায় না। স্ত্রীজাতির সাজসজ্জার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া অনেকে আমাদি-

গন্ধে এখানে অন্ধ ঠাহরাইতে পারেন, কিন্তু সাজসজ্জার পরিপাট্যের সহিত সৌন্দর্য্য আবিষ্করণ বা উপভোগশক্তির সম্বন্ধ অল্পই। আবিষ্করণ অপেক্ষা তবে যে উপভোগ শক্তি রমণীর প্রবলা তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরুষের মত গভীরতায় ডুবিতে রমণী প্রায় পারে না। জ্যোৎস্না, নদী, কুসুম, মলয় স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই ভাল লাগে, তাই বলিয়া উভয়ে ঠিক সমান উপভোগ করে কিনা সন্দেহ। বিশেষতঃ দিগন্ত বিস্তৃত সাগরহৃদয়ের উচ্ছ্বসিত গভীর চাঞ্চল্য, বজ্রবিদ্যুন্ময়ী ঝটিকার উন্মত্ত প্রলয়-গাম্ভীর্য্য, এই আসৃষ্টি জগতের প্রবল চিরসংগ্রাম, এ সকল রুদ্রসৌন্দর্য্য রমণী সম্যক্ উপভোগ করিতে অক্ষম। পুরুষের সৌন্দর্য্যোপভোগে যে একটা গভীরতা এবং বিস্তৃতি লক্ষিত হয়, তাহা রমণীর অভাব।

মহিলারা কেহ কেহ আমাদের কথা অস্বীকার করিয়া বলেন যে, ইহা কেবল কথার কথা মাত্র, এ কথার মূলে সত্য নাই। গায়ের জোরে অবশ্য এ বিষয়ে তেমন প্রমাণ দেওয়া যায় না, কিন্তু আমাদের কথার বিরুদ্ধে কেহ যে বিশেষ উদাহরণ সংগ্রহ করিতে পারেন এমন ভরসা অল্পই। মহিলারা শুধু আমাদের কথা অস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, স্ত্রীলোকেরা যে শারীরিক এবং সামাজিক নানা অসুবিধার মধ্য হইতেও মাথা তুলিয়া মানব জীবনের সমস্ত কার্য্যে, সংসারের সমস্ত কঠোর পরীক্ষায় পুরুষের সমান হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের সংশয় নাই। দেশবিশেষে কোন মহিলা পুরুষ জাতির অনুকরণে কোন বিশেষ কার্য্য করিয়াছেন, এইরূপ দুই চারিটী বিক্ষিপ্ত উদাহরণের উপরেই বোধ করি এই অকাট্য সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং ইহার প্রতিবাদ অনাবশ্যক। রমণীর সমাজ-গঠন, ধর্ম্ম সংস্থাপন ত পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। সহধর্ম্মিণী রূপে, সহকারিণী রূপে স্ত্রীর পুরুষের কার্য্যে সহায়তা স্বীকার্য্য বটে। তবে বলবান্ পুরুষজাতি দুর্ব্বল বলিয়া বহুদিন হইতে স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। তাহা হইতে বোধ করি পুরুষজাতির অনুদারতা বা অশ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয় না।

সত্য বলিতে কি, স্ত্রীজাতিকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে পুরুষই। কিন্তু ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার উপর ত আর পুরুষের হাত নাই। প্রকৃতি রমণীকে যে শক্তি দেয় নাই, যত বড় লোকই হোক্ না, মানবে তাহার করিবে কি? বাস্তবিক, সেই জন্য সম্মানাদি প্রদর্শন দ্বারা উর্দ্ধে উঠাইলেও স্ত্রী পুরুষের আশ্রিত। আশ্রিত বলিতে অবশ্য দাসী বুঝায় না। প্রকৃতির নিয়মানুসারে পুরুষের রমণীকে আশ্রয়দানবৃত্তি স্বাভাবিক। আশ্রয় দিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হয় না—আপনাকে অসম্পূর্ণ ঠেকে। স্ত্রীরও পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ স্বাভাবিক। এই আশ্রয়দানগ্রহণের মধ্যে প্রভু দাসী ভাব নাই—কেবল প্রেমের নির্ভরের ভাব। বহির্জগতে ইহার তুলনা এক তরুলতার ভাবে দেখা যায়। খেয়াল, অভিমান, অথবা তৃপ্তিলাভেচ্ছাবশতঃ কোন রমণী যদি পুরুষজাতিকে স্ত্রীজাতির

আশ্রয় বলিয়া না মনে করেন, নাচার। প্রেমের অটল নির্ভরের ভাব ত আর মুখে গুঁজিয়া দিয়া বুঝান যায় না। কিন্তু সংসারের রাজপথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিপুলশক্তি পুরুষকে আঁটিয়া উঠা কোমলাঙ্গিনীদিগের অসাধ্য। রমণী-বিশেষ পুরুষজাতির আশ্রয় অস্বীকার করায় প্রকৃতি ত স্ত্রীজাতিকে পুরুষ অপেক্ষা শক্তিবিশিষ্টা করিবে না। শক্তি—দেহের বলমাত্র নহে—আভ্যন্তরীণ শক্তিই সংসারের কঠিন কার্য্যক্ষেত্রে পুরুষজাতির পারদর্শিতার কারণ। সে শক্তির প্রকাশ তাহার সৃজন কার্য্যে, উদার সার্ব্বজনীনতায়, পুরুষজাতির স্বভাবসিদ্ধ অতৃপ্তিতে। প্রথম দৃষ্টিতে এ কথাগুলি রহস্য ঠেকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। গভীরতা এবং বিস্তৃতির মূলে শক্তি চাহি। এ শক্তি অবশ্য এক প্রকার দ্রুতগ্রহণীমাত্র নহে—ইহার উপরে উদার মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা।

সৃজনকার্য্যে আমরা পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু এই সৃজনকার্য্যের হৃদয়ে বিস্তৃত গভীর প্রেম প্রচ্ছন্ন। পুরুষের প্রেম সহসা তেমন বিশ্বাস করিতে ভাল লাগে না বটে, কিন্তু তাহা সত্য। নহিলে, তাহার মধ্য হইতে বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্যের আবির্ভাব হইবে কেন? বিশ্বজনীনতার এইখানেই ত পরিচয়। প্রেমে রমণী পুরুষ হইতে হীন নহে, কিন্তু রমণীর প্রেমে কি বিশ্বজনীনতা তেমন দেখা যায়? পাশ্চাত্য দেশে আজি কালি অনেক কুমারী রোগীর সেবাশুশ্রূষায় জীবন অতিবাহিত করেন। এখানে প্রেমের বিশ্বজনীন ভাব অস্বীকার করিবার যো নাই। কিন্তু পুরুষের সহিত রমণীর বিশ্বজনীনতাপ্রসূত কার্য্যেও কেমন একটা প্রভেদ দেখা যায়। পুরুষের বিশ্বজনীনতার মধ্যে একটা বৃহৎ গঠন-কার্য্য সম্পন্ন হয়। বুদ্ধ, খৃষ্টের বিশ্বজনীনতার গঠন-ফল পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক আজিও ভোগ করিতেছে। রমণীর বিশ্বজনীন সহানুভূতি এরূপ আধ্যাত্মিক বা সামাজিক বৃহদনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিতে পারে না। কিন্তু তথাপি বলি, তীব্র রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী রমণীর মত সেবাশুশ্রূষা করিতে বৃহদনুষ্ঠানরত কোন পুরুষই পারে না। আর সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে রমণীর সহিত পুরুষ কতদূর আঁটিয়া উঠিতে পারে সন্দেহ।

প্রেমের কথাই যদি উঠিল, স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ সম্বন্ধে দুই চারি কথা আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অনেকে পুরুষজাতির প্রেমে গুণের প্রতি অনুরাগের বিশেষ অভাব অনুভব করেন। তাঁহারা বলেন, রমণীর প্রেম গুণমূলক, আর পুরুষের প্রেম রূপমূলক। কিন্তু তাঁহাদের কথার সমূলকত্ব সম্বন্ধে কতদূর নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় বলা সহজ নহে। আমার বোধ হয়, উভয়েরই প্রেম রূপ এবং গুণ উভয়-মূলক। পুরুষ যে নির্গুণ রূপে অনুরক্ত, বা স্ত্রী যে রূপের দিকে চাহেই না, ইহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। আসল কথা, বাহ্য রূপের মায়ায় আন্তরিক গুণের অভাব অনেক সময়ে বুঝা কঠিন। নহিলে, রূপসী মুখরা কর্কশস্বভাবা

হইলে পুরুষ স্বভাবতই রূপের উপরে বিরক্ত হইয়া যায়। গুণের আত্যন্তিক অভাব জানিয়া আকৃষ্ট হয় অল্প লোকেই। তবে রমণী অপেক্ষা পুরুষের পক্ষে নির্গুণ রূপের উপাসক হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হয় বটে। কিন্তু বাস্তবিক, নির্গুণ রূপের পক্ষপাতী কেহই নহে। এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বৃথা তর্ক বিতর্কের কিছুই নাই।

আর শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া স্ত্রী পুরুষের ক্ষুদ্র অভিমান-তৃপ্তিকর বিরোধই বা কেন? উভয়ের ক্ষমতা ও অধিকার ত সম্পূর্ণ এক নহে। কোন পক্ষ অপর পক্ষের দুর্লভ্য অধিকারের প্রতি হস্ত প্রসারণ না করিয়া আপন আপন জাতীয় সম্পূর্ণতা লাভের প্রতি মনোনিবেশ করিলেই সকল গোলযোগ মিটিয়া যায়। কারণ, স্ত্রী কোনও কালে সম্পূর্ণ পুরুষ বা পুরুষ সম্পূর্ণ স্ত্রী হইতেই পারে না। মানবজাতির পূর্ণতা সাধন পক্ষে উভয়েরই আবশ্যক। দুই চারি জন বিদ্রোহী রমণী পুরুষজাতিকে হীন প্রতিপন্ন করিতে চাহিলে বা সঙ্কীর্ণ-হৃদয় গুটিকতক পুরুষ স্ত্রীজাতিকে নীচ ভাবিলে কিছুই হইবে না। প্রকৃতির নিয়মানুসারে দুই জাতীয় স্বতন্ত্র এবং মিলনোপযোগী ক্ষমতার সম্মিলনে শুভফলই উৎপন্ন হয়। ব্যক্তি বিশেষের অশান্ত বিদ্রোহে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন অসম্ভব। অভিমান এবং বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া সমাজের হিতসাধন চেষ্টায় স্ব স্ব ক্ষমতা নিয়োজিত করিলেই যথার্থ ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধিত হয়। অহঙ্কারবশতঃ বৃথা শক্তিক্ষয় করিলে ত আর মহত্ব লাভ হয় না।

স্ত্রীলোকেরা যে পুরুষোচিত কার্য্য একেবারেই করিতে পারে না, বা পুরুষেরা স্ত্রীলোকের কার্য্য করিতে পারে না এমন নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিশেষ শিক্ষায় স্ত্রীকে অসম্পূর্ণ পুরুষ এবং পুরুষকে অসম্পূর্ণ স্ত্রী গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। স্পার্টান রমণী পুরুষের মত ত সমরক্ষেত্রে প্রাণ বলি দিয়াছে। কিন্তু বিখ্যাত স্পার্টান সেনাপতিদিগের ন্যায় অভিজ্ঞতা কয়জন রমণীর? আমেরিকায় মল্লবিদ্যানিপুণা স্ত্রী অনেক মিলে শুনা যায়, তাহা হইতে শারীরিক বলে স্ত্রীজাতির পুরুষের সমকক্ষতা প্রমাণ হয় না। পুরুষ এবং স্ত্রীর ক্ষমতা ও অধিকার যে বিশেষ স্বতন্ত্র তাহার প্রমাণ পথে হাটে অজস্র। জগতে সংগ্রাম-প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব নাই; ইহার উপর স্ত্রী এবং পুরুষের ধারাবাহিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শুভ ফল আশা করা নিতান্তই বিকৃত কাল্পনিকতা। উদরের সহিত করদ্বয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মস্তকের সহিত গ্রীবাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি স্বাস্থ্য সম্পাদনের অনুকূল? বাহিরের সংগ্রামের উপর গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইলে দুর্ব্বল ত টি`কেই না, বলবানেরও ক্ষতি সহিতে হয়।

কিন্তু স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে দেশ এবং সমাজভেদে যে কতকগুলি সমাজিক নিয়ম গঠিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। জাতির অবস্থার সহিত এ সকল নিয়মের পরিবর্ত্তনও হইয়া থাকে। আমাদের অবরোধ প্রথা যেমন। অবরোধ-বাস কিছু আর নারীজাতির স্বভাব নহে। প্রহরীবেষ্টিত অবরোধে শিক্ষার ব্যাঘাত হয়, হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি হয় না;

সুতরাং দর্শন-বিহীন শিক্ষা এবং অস্ফূর্ত্ত হৃদয় লইয়া সুসন্তান-গঠন অসম্ভব হইয়া পড়ে। এককালে দায়ে পড়িয়া আমাদিগকে এ প্রথা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এখন যাঁহারা বহুদিন হইতে অবরোধের রুদ্ধ দ্বারের মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে একপ্রকার জড়-জীবন বহিয়া আসিতেছে, অনভ্যাসবশতঃ প্রকাশ্য রাজপথে বাহির হইলে তাহারা অসুবিধার কারণ হইয়া উঠে; লোকে অবরোধবাস স্ত্রীর স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম ঠাহরাইয়া লয়। তাই বলিয়া এ প্রথার সহিত স্ত্রী-স্বভাবের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা অবশ্য নাই। শিক্ষার সহিত স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দিলে অশুভ ফল দেখা যায় না। কিন্তু অবরোধ প্রথা থাক্ বা না থাক্, স্বাধীনতা থাক্ বা না থাক্, স্ত্রীজাতির পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র যে ক্ষমতা বা গুণ দেখা যায়, সেইগুলি তাহার স্বভাবসিদ্ধ—স্বাভাবিক ক্ষমতা বা গুণ। তবে কর্ষণাভাবে গুণ ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যায় বটে।

সামাজিক রীতি নীতি নিয়ম অবশ্য সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় নহে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তন বা সংস্কার চলে। তাহা হইতে সমগ্র মানবজাতির অর্দ্ধাঙ্গের অধিকার স্থির করা যায় না। স্বাভাবিক ক্ষমতা আলোচনা দ্বারাই তাহা বুঝা যায়। দেশভেদে, জল বায়ুভেদে, সামাজিক অবস্থাভেদে খুঁটিনাটি কার্য্যের বিভিন্নতা হইয়াই থাকে—তাহা অনিবার্য্য। তেমন, পরিবার বিশেষের বিশেষ বিশেষ ভাব এবং লক্ষণ দেখা যায়, ব্যক্তিবিশেষের আবার স্বতন্ত্র দোষগুণ থাকে। স্ত্রী এবং পুরুষের ক্ষমতা আলোচনা করিয়া আমরা সহজে বুঝিতে পারি, যে, বাহিরের সহিত সংগ্রাম-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুরুষই পারদর্শী। নারীজাতির কার্য্যক্ষেত্র গৃহ। তাই বলিয়া এমন হৃদয়হীন কে আছে যে বলিবে, গৃহিণী রমণীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লোপ করা আবশ্যক? কে বলিবে, প্রবল-পরাক্রম পুরুষজাতির রমণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন শোভা পায় না? স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পরকে সম্মান করে—একের অভাব অন্যে পূর্ণ করে বলিয়া। এ সম্মান প্রেমপ্রসূত—ভাবিয়া চিন্তিয়া তর্ক করিয়া মতলব আঁটিয়া ইহার অভ্যুদয় নহে। হৃদয়হীন তর্কের মুখে খাড়া করিয়া সহজ কথাকে জটিল করিয়া তুলিতে অধিক সময় লাগে না, কিন্তু তর্কে সত্য কিছু আর মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায় না। নারীর কার্য্যক্ষেত্র গৃহ শুনিয়া কুটিল-হৃদয় পুরুষজাতিকে স্ত্রীবঞ্চন-প্রয়াসী ঠাহরাইতে পারে, তাই বলিয়া কি পুরুষজাতি সত্যই রমণীকে অধিকার-ভ্রষ্টা করিতে চাহে?

এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার ছিল না। কিন্তু অতি ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে আপন স্বাভাবিক অধিকারে অসন্তুষ্টা দুই চারিটী রমণী-রসনা পুরুষজাতির বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ উত্থাপন করিতেছে। রমণীরা কেহ কেহ বলেন, ক্ষমতা লোপাশঙ্কায় পুরুষজাতি স্ত্রীদিগকে বাহিরের কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে চাহে না। কথাটা মিথ্যা না হইতে পারে, কিন্তু যে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। ক্ষমতালোপের আশঙ্কা স্ত্রীজাতির ক্ষমতা বা অধিকারের প্রতি কখনও কটাক্ষ করে নাই। সমাজের

সুশৃঙ্খলা-স্থাপনের জন্যই স্ত্রী পুরুষের কার্য্যক্ষেত্র স্বতন্ত্র। প্রকৃতির নিয়মানুসারে সন্তানবতী রমণীর গৃহ ছাড়িয়া বাহিরের কার্য্যে পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভব হয় কিরূপে? প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমকক্ষতালাভের শক্তি থাকিলেও জননীর কর্ত্তব্য ত আর অবহেলা করা যায় না। পুরুষজাতি বাহিরের রণক্ষেত্রে রমণীর হইয়া তাই খাটিয়া মরে। কারণ, পরস্পর পরস্পরের সুবিধা অসুবিধা অনুসারে কার্য্য ভাগ করিয়া না লইলে সংসার যাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা অসম্ভব। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে, এ প্রবন্ধেও আমরা সংক্ষেপে দুই চারি কথা বলিয়াছি। সত্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পুরুষজাতির উপর অভিমানবশতঃ দোষারোপ করিলে সে নিরুপায়। অভিমানের ত আর প্রতিবাদ শোভা পায় না। ভ্রম এবং মিথ্যা নিরাকরণ করিয়া যথা সাধ্য স্ত্রী এবং পুরুষের ক্ষমতা ও অধিকার নির্ণয়ই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমাদিগকে সে জন্য অনেক পুরাতন কথার পুনরুল্লেখ করিতে হইয়াছে। বারবার পুরাতন কথা এবং পুরাতন যুক্তির উত্থাপনে পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা। ভরসা করি, তাঁহারা ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য, স্ত্রী অথবা পুরুষের সম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই আমাদের উদ্দেশ্য নহে। মানসিক শক্তির প্রভাবে নেতৃত্বভার পুরুষেরই হস্তে পড়িয়াছে বটে, তাই বলিয়া তাহার সহকারিণীর নিকৃষ্ট হীনতা প্রতিপন্ন হয় না। বিষয় বিশেষেই উভয়ের কাহারও কাহারও শ্রেষ্ঠত্ব দেখা যায়। সাধারণতঃ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে রমণীর এবং বিস্তৃত ক্ষেত্রে পুরুষের ক্ষমতা প্রকাশ পায়। পরস্পরকে অতিক্রম করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন ক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধনই প্রকৃত উন্নতি লাভের উপায়। আপাততঃ এইখানেই বিদায় গ্রহণ করি। আবশ্যক হইলে অবসরক্রমে এবিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

পত্র।

স্ত্রী পুরুষ।

আজকাল ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রীজাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। তাঁহারা পুরুষের সহিত সমভাবে শিক্ষা পাইতে চান; তাঁহাদের ন্যায় ডাক্তার, উকীল, জজ, মাজিষ্ট্রেট হইবার বাসনা করেন; আর তাঁহাদের সহিত সমভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করিবার নিমিত্তও বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যদিচ এ পর্য্যন্ত সকল বিষয়ে তাঁহারা পুরুষের

তুল্য ক্ষমতা লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, যদিচ কতক বিষয়ে তাঁহারা এখনও অবরূদ্ধ, যদিচ তাঁহাদের সম্বন্ধে আইনগত অনেক অক্ষমতা এখনও লক্ষিত হয়; তথাপি সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাদের প্রভাব অনুভূত হইতেছে। এই কারণে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের জাতিগত প্রাকৃতিক পার্থক্য সম্বন্ধে নানা কথা উঠিতেছে, এমন কি, উহার প্রবল তরঙ্গ কত দেশ নদী সাগর পার হইয়া দূর প্রাচ্য ভারতের উপকূলেও আসিয়া লাগিয়াছে। নিতান্ত যাহার মানস চক্ষু অন্ধ তিনি ব্যতীত আর কেহই এ বিষয়টি সহজে উড়াইয়া দিতে চাহিবেন না। যাঁহারা কালের লক্ষণ নিচয়ের প্রকৃত অর্থ আহরণে কিছুমাত্র ক্ষমবান, তাঁহারা নিঃসন্দেহ এই শক্তিকে দেশের উপযোগীরূপে গঠন ও উন্নতি অভিমুখী করিয়া ব্যবহার করিবার নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল হইবেন। এ বিষয়ে আমাদেরও যে একদিন মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে, এ প্রশ্নের মীমাংসায় যে এক দিন আমাদিগকেও আসিতে হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ করা নিতান্ত বাতুলের কাজ। পূর্ব্ব হইতে সে বিষয়ের সম্যক আলোচনা করিলে সুফল ফলিবারই সম্ভাবনা, তাহা হইলে আর বজ্র অকস্মাৎ আমাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে না। আমরা সে কালের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিব; উপযুক্তরূপ লৌহ শলাকা দ্বারা গৃহ অট্টালিকা সংরক্ষিত করিয়া তাহার ক্ষতিকারিণী গতির অবরোধ ও সুফলদায়িনী গতির সংবর্দ্ধন করিতে সক্ষম হইব। এ সম্বন্ধে আমার মত কি দুই এক কথায় বলিতেছি।

স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ সম্পর্কে সাধারণত তিনটী মত প্রচলিত আছে।

প্রথম, যে, পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং চিরকাল তাহাই থাকিবে। যতই হাঁকড় পাঁকড় করিয়া মরুক না কেন পুরুষের উচ্চাসন অধিকার করিতে রমণীরা কখনই সক্ষম হইবে না—পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব-মণ্ডিত সিংহাসন হিমাচলের ন্যায় চিরকালই অটল রহিবে। তাঁহারা বলেন, স্ত্রী জাতি যে এতদিন পুরুষের অধীন রহিয়াছে ইহাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ইহা ব্যতীত অপর প্রমাণের প্রয়োজন করে না। এখন যদি রমণীরা পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জয়লাভের আশা করেন তবে সে নিতান্ত দুরাশা; তাহাতে লাভের মধ্যে তাহাদের অবস্থা আরও নিকৃষ্ট হইবে। এইরূপ যে কেবল মাত্র যুক্তি ও ঐহিক ভয় দেখাইয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত তাহা নহে,—তাঁহাদের মতে পতিসেবা ও সন্তানপালনই রমণীর ধর্ম্ম; এ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পুরুষের সমকক্ষতা লাভের প্রয়াস সয়তানের স্বর্গ সিংহাসন অধিকারের প্রয়াস মাত্র। তাহাতে সমস্ত নারীকুল মহা পাপে পড়িবে এবং তাহাদের এই কলুষিত প্রয়াস স্বর্গের দ্বারের অর্গল স্বরূপ হইবে। এই অভিসম্পাতপূর্ণ বজ্রধ্বনিও মাঝে মাঝে আমাদের কর্ণকুহর বিকম্পিত করে।

দ্বিতীয়, স্ত্রীজাতির মুখপত্র মহিলাগণ তাঁহাদের পক্ষ হইতে বলেন আমরা তোমাদের সমান। তোমরা আমাদের হইতে শ্রেষ্ঠ কিসে? শারীরিক বলাধিক্যবশতই যে

আমাদিগকে চিরকাল হীনাবস্থায় রাখিতে পারিবে এ কথা মনেও স্থান দিও না। দেখিব, আর কতকাল সে অবস্থায় রাখিতে পার। আমরা শিক্ষাদি লাভ করিয়া আপনাদের ভরণপোষণ আপনারাই চালাইব।

অবলা নারী-জাতির দুরবস্থা দেখিয়া কোন কোন উদারচিত পুরুষেরাও না কি নারীপতাকার নিম্নে আসিয়া দণ্ডায়মান হইতেছেন। স্ত্রী-স্বাধীনতা-প্রচারিণী কোন কোন রমণী আজ কাল স্বামীর নাম পরিগ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, আমরা আপনাদের নামেই আপনারা ধন্যা হইব। যেন কালের চক্রে পুরাতন ব্রাহ্মণ-বাক্য পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে নির্গত হইতেছে।

তৃতীয়,যে, পুরুষেরা কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এবং রমণীরা কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ; তবে সাধারণ পক্ষে অবশ্য পুরুষকেই শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। ইহাই এক প্রকার সাধারণ-পরিগৃহীত মত বলা যাইতে পারে।

এ বিষয়ে মীমাংসা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে দেখা আবশ্যক যে কি প্রকারে এক বস্তু হইতে অপর বস্তুর শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ হইতে পারে।

(ক) কোন বস্তু "পূর্ণ" হইলে তাহাকে অপর সকল অপূর্ণ পদার্থ হইতেই শ্রেষ্ঠ বলা যায়।

(খ) উভয় বস্তুই এক জাতীয় হইলে (অর্থাৎ যদি উভয়ের মধ্যে গুণের প্রভেদ কিছু মাত্র না থাকে) তবে পরিমাণের ন্যূনাধিক্য দ্বারাই বস্তুর শ্রেষ্ঠতা বা হীনতা প্রতিপাদিত হয়।

(গ) দুই বস্তু ভিন্ন-জাতীয় হইলে (অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে এক না হইয়া বিভিন্ন প্রকারের হইলে) তাহাদের উভয়ের কার্য্যকারী ক্ষমতার প্রসরণ দ্বারাই শ্রেষ্ঠতা নির্ণীত হয়। যেমন মনুষ্য যে পশুদের হইতে শ্রেষ্ঠ তাহা এইরূপে প্রতিপাদিত হইয়া থাকে যে, পশুরা যে সকল কার্য্য করে মনুষ্য প্রায় সে সমস্ত গুলিই সম্পাদনে সক্ষম কিন্তু এতদ্ব্যতীত অপর কতকগুলি শক্তি মনুষ্যের আছে যাহা পশুতে দেখা যায় না—এমন কতকগুলি কাজ আছে যাহা পশুদের সম্পূর্ণ অসাধ্য। পশুরাজ পৃথিবীর সকল সম্রাট সাম্রাজ্ঞী অপেক্ষা তর্জ্জন গর্জ্জন ও বলে শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। কিন্তু মনুষ্যাধিপতি কৌশলে নগরী নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদের পশুরাজ-ভ্রাতা হইতে দূরে বাস করেন। যদি নিতান্তই দর্শন বাসনা জন্মে তবে দূত প্রেরণ পূর্ব্বক মানব-বুদ্ধি-কৌশলে তাঁহাকে সন্তর্পণে আনয়ন পূর্ব্বক পশুশালা নামক রাজ্যের "সিংহগড়" নামক প্রস্তর-নির্ম্মিত লৌহ-অর্গল-সম্বলিত রাজদুর্গে রক্ষিত পশুরাজের সম্মুখীন হইয়া সসম্ভ্রম অভিবাদনেই পরিতৃপ্ত হন। এই কৌশল-উদ্ভাবিনী বুদ্ধি শক্তির দ্বারাই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়। আমরা যখন বলি যে বিশেষ কোন গুণের স্থিতিবশতঃ বস্তুর শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হইতেছে তখন এই কথাই বলা হয় যে, যে সকল গুণ অথবা কার্য্যকারী

শক্তি একে অবস্থিত সে সমস্ত গুলিই অপরে বর্ত্তমান এবং তদ্ভিন্ন আরও কোন গুণ বা শক্তি তাহাতে আছে যাহা প্রথমের নাই। দার্শনিকেরা বলেন যে, হিতাহিত জ্ঞান মনুষ্যের আছে কিন্তু তাহা পশুদের নাই; এবং ইহার দ্বারাই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। কিন্তু সে কথার বাহুল্য উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন, অতএব তাহাতে বিরত হইলাম। এই তিনটী মাত্র প্রকৃত শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের উপায়। এতদ্ব্যতীত শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের যে সকল উপায়ের উল্লেখ করা হয়, তাহা আংশিক ও কৃত্রিম—তাহার প্রকৃত মূল্য যে বিশেষ কিছু আছে তাহা ত মনে হয় না।

এখন, পুরুষ অথবা স্ত্রী কেহই যে "পূর্ণ" পদার্থ এ কথা বোধ করি কেহই বলিতে সাহসী হইবেন না। অতএব প্রথম প্রণালী দ্বারা এ বিষয়ের কোন মীমাংসা হওয়া সম্ভবপর নহে।

স্ত্রী পুরুষের মধ্যে শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক গুণের যে রূপ বিভিন্নতা স্পষ্ট প্রতীয়মান, তাহাতে উভয়কে পূর্ব্বোক্ত অর্থে এক "জাতীয়" পদার্থ বলা চলে না। স্ত্রীজাতির সকল গুণ যে পুরুষে আছে এবং পুরুষের সকল গুণ যে স্ত্রীর মধ্যে বিদ্যমান একথা কেহ স্বীকার করিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না। অতএব দ্বিতীয় প্রণালীও এখানে প্রয়োগ হইতে পারে না বলিয়া ত্যজ্য।

তৃতীয় প্রণালীর দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে হইলে এমন বিশেষ গুণের উল্লেখ করা প্রয়োজন যাহা পুরুষে আছে এবং স্ত্রীতে নাই, যদ্দ্বারা পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে।

এই গুণ কেহ বলেন "উদ্ভাবনী শক্তি বা সৃজন শক্তি," কেহ বলেন "ন্যায়-বিচার শক্তি"। কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা পুরুষের প্রাধান্য সপ্রমাণ করিতে হইলে অগ্রে প্রমাণ করা আবশ্যক যে উহা পুরুষের নিজস্ব ধন এবং ঐ শক্তি বুদ্ধিগত সকল গুণ হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা বলেন, উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা যখন পুরাতন উপাদান হইতে একটি নুতন পদার্থের সৃষ্টি হয়, তখন উহাকে বুদ্ধিগত সকল শক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। এই মহান বিশ্বসৃষ্টি হইতে ইহাই শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বরের সৃজন গুণই সর্ব্বপ্রধান। এই শক্তির অস্তিত্ব বশতই মনুষ্য তাঁহার অনুরূপ; স্ত্রীতে যখন এই শক্তিরই অভাব দেখিতেছি, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে পুরুষ সৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ। এ কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে দেখা যায় যে এস্থলে উপরোক্ত প্রমাণ্য বিষয় দুই-টিই পূর্ব্বে হইতে সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। স্ত্রীজাতির মধ্যে যে উদ্ভাবনী শক্তির একেবারে সম্পূর্ণ অভাব তাহা মানিয়া লইতে আমি প্রস্তুত নহি। তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে অনেক পদার্থ ত তাঁহাদেরই সৃষ্ট। নূতন যন্ত্রাদিও অনেক তো স্ত্রীজাতির সৃষ্ট। পেটেণ্ট সম্বন্ধীয় ইতিহাসাদিতে এ সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। আজ কাল আমেরিকায় অধিকাংশ নূতন যন্ত্রাদির স্রষ্টা রমণী। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে স্ত্রী-জাতি অপেক্ষা

পুরুষেতেই এই শক্তির বিশেষ বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তির প্রাধর্য্য দ্বারা পুরুষের বুদ্ধিগত শ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ হয় কি প্রকারে ? শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে হইলে পূর্ব্বে দেখান আবশ্যক যে এই শক্তি বুদ্ধিগত-অপর সকল শক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কে এমন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক আছেন যিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে লোন্‌তা গুণ হইতে মিষ্টতা গুণ শ্রেষ্ঠ, ধারণা শক্তি হইতে সৃজন শক্তি শ্রেষ্ঠ! ধারণা শক্তি ব্যতীত উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাব কোথায় ? যদি কেবল মাত্র উদ্ভাবন কার্য্যই সম্পাদিত হয় কিন্তু তাহা ধারণা বা সংরক্ষণ করার ক্ষমতা জগতে না থাকে তবে তাহার ফল কি দাঁড়ায় ? উৎপত্তিতেই লয় ব্যতীত আর কোনও ফল দেখা যায় না। কেহ বলিবেন যে পুরুষের কি সংরক্ষিণী শক্তি নাই ? অবশ্য আছে। কিন্তু সাধারণ পক্ষে বলা যাইতে পারে যে স্ত্রী জাতির মধ্যেই ঐ শক্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তি দেখা যায়। রোমানিস প্রভৃতি অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরাও এই কথা স্বীকার করেন। মাতৃদুগ্ধের সহিত আমরা যে সকল ভাবের দ্বারা পরিপুষ্ট হইতে থাকি তাহা আজীবন আমাদের উপর যেরূপ প্রভাব সংস্থাপন করে এরূপ আর কিসের দ্বারা সাধিত হয়! আমরা দেখিতে পাই কোন নূতন ভাব কোন জ্ঞানীর মস্তক হইতে প্রকাশ পাইয়া ক্রমশঃ তাহা বিস্তৃতি লাভ করিয়া কালে সমগ্র দেশ বা জাতির সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়ে। ইহার জন্য কি আমরা অধিকাংশে স্ত্রী জাতীর নিকট ঋণী নহি ? তবে কি করিয়া বলা যায় যে বুদ্ধিগত কার্য্য সম্পাদনেও পুরুষ হইতে স্ত্রী ন্যূন।

ন্যায়-বিচার শক্তি সম্বন্ধেও সেই কথাই বলা চলে। স্ত্রী জাতির মধ্যে যে সম্পূর্ণ এই শক্তির অভাব তাহা নহে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই এই শক্তি আছে কিন্তু পুরুষের মধেই এই শক্তি অধিক কার্য্যকারী, স্ত্রীজাতি দয়া-প্রধান বলিয়া তাহারা অনেক সময়ে ন্যায়কে সরাইয়া দয়াকেই বিচারের ভার দিয়া থাকে। আর বহির্জগতের সহিত তাহাদের পুরুষ হইতে অল্প সংঘর্ষণ বলিয়া এইরূপ হওয়াই সম্ভব—যেহেতু যে সমস্ত ঘটনাবলীর দ্বারা প্রকৃত পক্ষে ন্যায় বিচার হওয়া সম্ভব তাহা স্ত্রী জাতির নিকট অল্পই পরিজ্ঞাত। কিন্তু ইহা দ্বারা পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে কি রূপে ? সমস্ত ঘটনাবলী ত' পুরুষেরও জ্ঞানায়ত্ব নহে। তাহার ঘটনাবলীর জ্ঞান স্ত্রী হইতে অধিক, এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে। অতএব যখন পূর্ণ ন্যায়-বিচার মনুষ্যের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব তখন ইহা দ্বারাও পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ হয় না। দয়া-বৃত্তি দ্বারা পরিমার্জ্জিত ন্যায়-বিচারই সংসারের পক্ষে অধিক উপকার-জনক, এতদ্ব্যতীত এ সংসারে সুবিচারের আর অন্য উপায় নাই। অতএব পূর্ণ ন্যায় বিচারের ক্ষমতা মনুষ্যের থাকিলে যে কি হইত এ ভাবনায় বৃথা কাল অপহরণ না করিয়া মনুষ্যজাতি যেরূপে গঠিত তাহা ভাল করিয়া দেখিলে বুঝা যাইতে পারে যে দয়া ন্যায়-বিচারকে সহায়তা করে এবং ন্যায় বিচারও দয়া-বৃত্তিকে সহায়তা করে।

এইরূপে আমাদের অনেক মহৎ সংস্কারের জন্য আমরা আমাদের স্ত্রীজাতীয় আত্মীয়-বর্গের নিকট ঋণী। জগদ্বিখ্যাত অনেক মহাত্মাগণের জীবন-চরিত পাঠে দেখিতে পাওয়া যায় যে সন্তানের উপর মাতার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব কিরূপ বলবান। ইহা হইতে বুঝা যায় যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই জগতসম্পর্কে বিশেষ বিশেষ কার্য্য আছে। তবে, স্ত্রী জাতির কার্য্য অকারণে নীচ বলিয়া তাহা-দের মর্ম্মে আঘাত করার প্রয়োজন কি? যদি বা সত্যের খাতিরে সে কথা বলিতে হইত তাহা হইলেও বুঝিতে পারিতাম। তবে কৃত্রিম একটা মাপ-কাটি বাহির করিয়া বৃথা দ্বন্দ্ব দ্বারা দুর্ব্বল রমণীকুলের কোমল অন্তঃকরণে অকারণ আঘাত করা কেন? ইহা কি পুরুষোচিত! না ধর্ম্মসঙ্গত! তাহারা অনেক কাল হইতে পুরুষের শারীরিক বলের অধীন সত্য; কিন্তু এখন পর্য্যন্তও কি নৈতিক বলের প্রভাব আমাদের মনে এতদূর প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই, যে আমরা শারীরিক বলকে নৈতিক বলের অধীন করিতে পারি? যদি এখনও তাহাতে অক্ষম হই, তবে লজ্জায় ঘৃণায় আমা-দের হেঁট-মস্তক হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা না করিয়া যে আমরা বৃষের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াস পাই, তাহাতে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত না হইয়া বরং আমরা যে সেই স্বরে ডাকিবারই উপযুক্ত তাহাই সপ্রমাণ করি।

জগতে দেখা যায় সকল বস্তুই অপূর্ণ ও সীমাবদ্ধ। আমরা যে আমাদের কল্পনা-গঠিত মহৎ মনুষ্যের মধ্যে এক প্রকার সম্পূর্ণতা দেখিতে পাই তাহা একের সহিত অপরের জোড়া দিয়া। একের মধ্যে যে কোন মহৎ গুণের সম্যক উৎকর্ষ হয় নাই এবং অপরের মধ্যে হইয়াছে, তাহা হইতে সেইটি বাছিয়া লইয়া অপর গুণগুলির সহিত সামঞ্জস্যরূপে সংমিশ্রণ দ্বারাই তাহা সম্পাদিত হইয়া থাকে। সংসারেও সেইরূপই দেখা যায়। স্ত্রীর মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ পরিস্ফুটভাবে বিদ্যমান যে গুলি পুরুষের মধ্যে লুক্কায়িত; সেইগুলি দ্বারা আমরা আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হই। পুরুষের মধ্যেও সেইরূপ কতকগুলি সৎগুণ সম্যক বিকশিত দেখা যায় যেগুলি স্ত্রীজাতি মূল্যবান বুঝিয়া পুরুষের উপর নির্ভর করিতে চাহে। এইরূপ মানসিক আদান প্রদান দ্বারা আমাদের মনের উৎকর্ষ সাধিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কল্পনাও উন্নতি লাভ করিতে থাকে। কিন্তু স্ত্রী পুরুষ উভয়ের উভয়ের প্রতি সম্মান ও প্রীতির ভাব থাকা একান্ত প্রয়োজন, তদ্ব্যতীত কখনই আদান প্রদান চলিতে পারে না। মানুষের স্বভাব এমনি যে, যাহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির অভাব তাহার নিকট সহস্র বহুমূল্য শিখিবার বিষয় থাকিলেও আমরা কিছুই শিখিতে পারি না। সকলেই জানেন যে সমান সমানের মধ্যে শিক্ষা লাভ করিতে হইলে একপ্রকার সম্মান শ্রদ্ধা ও প্রীতির বন্ধন থাকা আবশ্যক। এই ত্রিদণ্ডি বন্ধনের অভাব হইলে এ কার্য্য কখনই সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দররূপে সম্পাদিত হইতে পারে না। আমরা স্ত্রীজাতির নিকট হইতে যাহা শিক্ষা পাই

তাহা তাঁহারা আমাদের কাণে ধরিয়া শিক্ষা দেন না—স্রোতস্বিনী আমাদের যেরূপে ধর্ম্মশিক্ষা দেয় রমণীর শিক্ষাও কতক পরিমাণে সেইরূপ। আমরা স্ত্রীলোকদের যে শিক্ষা দিই সেটা কতক পরিমাণে কালেজের অধ্যাপকের ছাত্রকে শিক্ষাদানের ন্যায়। অতএব সহজেই আমাদের মনে হওয়া সম্ভব যে আমরা বড়, কেননা এত কথা আমরা অধ্যাপকের ন্যায় তাহাদের কাণের মধ্যে গুঁজিয়া দিতে পারি। কিন্তু একটু স্থির চিত্তে শিক্ষাপ্রবণভাবে যদি স্ত্রীজাতির প্রতি লক্ষ্য করি, তবে তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অল্প হইলেও দেখিতে পাই যে, তাহাদের নিকট হইতে আমাদের কত শিক্ষালাভের বিষয় আছে। তাহারা আপনার কাজ করিয়া চলে আমরা পাশে দাঁড়াইয়া শিখিতে থাকি। তাঁহারা অবশ্য আমাদের দাঁড় করিয়া বলেন না "থাম, কি করিতেছ! দেখ—এই কথাটা মন দিয়া শুনিয়া রাখ, ভাল করিয়া শিখিলে পরে অনেক কাজে লাগিবে।" এইরূপ করিয়া না শিখাইলে কি আর শিখান হয় না? এ শিক্ষা যাঁহারা তুচ্ছ জ্ঞান করেন তাঁহাদের বিশ্ব বিদ্যালয়ের সহস্র উপাধি থাকিলেও তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে নিতান্তই অশিক্ষিত। স্ত্রী পুরুষকে শ্রেষ্ঠতা লইয়া ঝগড়া করিতে দেখিলে আমার বাল্যকালের উদর ও অন্যান্য অবয়বের গল্প মনে পড়ে।

আমার মনে হয় স্ত্রী পুরুষের মধ্যে একটা পরস্পর আপেক্ষিক সম্বন্ধ আছে। উভয়ের সম্পূর্ণতা মিশিয়া এক পূর্ণ পদার্থের নির্দ্দেশ করে। খনি হইতে যাহারা বহুমূল্য হীরকাদি খনন করিয়া তুলে তাহারা আর কিছু সে গুলি পরিষ্কার করিয়া অলঙ্কার নির্ম্মাণ করে না, কিন্তু সমাজ তাহাদের 'মজুর' বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখে,অপরকে জহুরী বলিয়া উপযুক্তরূপ সম্মান ও আদর করে। ইহাই পাশ্চাত্য শ্রমজীবীদের অসন্তুষ্টির মূলস্বরূপ এবং ইহাই স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বর্ত্তমান আন্দোলনেরও প্রকৃত কারণ। এই কৃত্রিম সামাজিক শ্রেষ্ঠতা কি আমরা প্রকৃত জাতিগত শ্রেষ্ঠতা বলিয়া মানিয়া লইব? বুদ্ধির রাজত্বেও এই কৃত্রিম অসত্য ভাব আসিলে সত্যের রাজত্ব একেবারে লোপ পাইবার সম্ভাবনা। এইরূপ ঘটিতে দেওয়া শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই অনুচিত কার্য্য। প্রকৃতিও আমাদের এই কথাই বলিয়া দিতেছেন। বৃক্ষের উৎপত্তির জন্য বীজেরও আবশ্যক রসেরও প্রয়োজন; কিন্তু কে এমন বৈজ্ঞানিক আছেন যিনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে দিতে পারেন, যে বৃক্ষোৎপত্তিরূপ-কার্য্য কয় আনা পরিমাণ বীজ দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং কয় আনাই বা রস দ্বারা সম্পাদিত হয়—এ সম্বন্ধে কে শ্রেষ্ঠ কে নিকৃষ্ট?

স্ত্রী পুরুষের জাতিগত পার্থক্য দেখিয়া মনে হয় পুরুষেরা বহির্মুখী শক্তি, স্ত্রীরা আত্মমুখী শক্তি। পৃথিবীর সম্পর্কে যেমন কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ এই দুই শক্তি পৃথিবীকে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করায় এবং এই ভ্রমণ কার্য্যের নিমিত্ত যেমন উভয় শক্তিরই একান্ত প্রয়োজন; সেইরূপ সংসার ও সমাজের স্থিতি ও উন্নতির পক্ষে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজন। পুরুষের মধ্যে কেমন এক উদ্দাম অতৃপ্ত

ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, সে যেন কিছুতেই তৃপ্ত নহে, আস্তাকুঁড় হইতেও সে আহা-রীয় খুঁজিয়া বাহির করে। স্ত্রীর ভিতর কেমন এক মধুর কোমল শান্ত তৃপ্তভাব লক্ষিত হয় যাহাতে পুরুষের রুক্ষ উদ্দাম অতৃপ্ত ভাবকে আকর্ষণ করিয়া মধ্য এক পথের অনুমুখী করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। স্ত্রী analytic পুরুষ synthetic। পুরুষ সংগঠনী শক্তি স্ত্রী বিশ্লেষণী শক্তি। পুরুষ কিছু নূতন সৃষ্টি করিলে স্ত্রী তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝায়। পুরুষ নূতন কিছু উদ্ভাবন করিলে স্ত্রী তাহা আপনার মধ্যে সংরক্ষণ করে। অন্য কথায় বলা যাইতে পারে পুরুষ যেমন নানান স্থান হইতে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনে স্ত্রী তাহা লইয়া গৃহাদি সুসজ্জিত করে। এইরূপে উভয়েই উভয়ের কার্য্যের পোষকতা করিয়া থাকে। সংসারের এই নিয়ম যেরূপ সর্ব্বত্র বিদ্যমান প্রকৃতির এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি নর নারীর মধ্যেও সেই একই নিয়মের কার্য্যকারিতা দেখা যায়। এবার এইখানেই শেষ করি এ সম্বন্ধে আর দুই এক কথা যাহা বলিবার আছে অবসরক্রমে পরে বলিব।

শ্রীযোঃ –

হেঁয়ালিনাট্য।

প্রথম দৃশ্য।

গবর্ণমেণ্ট আফিস।

কর্ত্তা সাহেব ও কেরাণী শ্যামবাবু।

সাহেব। বাবু তুমি দশদিনের ছুটীর জন্য দরখাস্ত করিয়াছ কেন?

শ্যামবাবু। আমি এবার বোম্বাইএর জাতীয় সমিতিতে যাইব।

সাহেব। তুমি কি একজন প্রতিনিধি?

শ্যাম। (সদর্পে) হাঁ আমাদের সভা থেকে আমাকেই এই মাননীয় পদে নির্ব্বাচন করা হয়েছে।

সাহেব। কংগ্রেসে যাইয়া তোমার কি লাভ হইবে?

শ্যাম। কি লাভ? মায়ের দুঃখ সন্তান নহিলে কে বুঝে? দুঃখিনী ভারত মাতাকে অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিতে,—পীড়িত ভ্রাতাদের মুক্তির উপায় করিতে আমরা যদি সমুদয় স্বার্থ বিসর্জ্জন না দিব—প্রাণ দান না করিব ত কে করিবে?

সাহেব। তাত খুব ভালই। দেশের জন্য কাজ করা অতি গৌরবের বিষয়।

শ্যাম। (আনন্দে) তাতে আর কি সন্দেহ আছে?

সাহেব। দেশের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য সকলে মিলিয়া প্রাণপণ করিতেছে এ কি মহান দৃশ্য!

শ্যাম। (উৎসাহ সহকারে) নিশ্চয়ই।

সাহেব। ক্রমে ভারতবাসীরা মেম্বর নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে তুমিই হয়ত একজন অনারেবল মেম্বর হইবে।

শ্যাম। (বিনয় সহকারে মৃদু হাস্য।)

সাহেব। সম্ভবতঃ তার পর ইংলণ্ডে যাইয়া সেখানে পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর হইয়া একদিন সম্মানের চরম সীমায় উঠিবে।

শ্যাম। তা হতেও পারে।

সাহেব। দেশের জন্য চাকরী হারান—দারিদ্র্যে জীবন যাপন করা—স্বার্থপরতা ত্যাগ করা কি মহান।

শ্যাম। (ভীতভাবে সাহেবের প্রতি দৃষ্টি)

সাহেব। সমস্ত দিন উপবাসে কাটিতেছে—অন্নের সংস্থান নেই কিন্তু তবু দেশের জন্য কাজ করা,—কি ঔদার্য্য! কি বীর্য্য!

শ্যাম। (শুষ্ক মুখে কাতর দৃষ্টি)

সাহেব। স্ত্রী পুত্র চোখের উপরে অনাহারে একে একে প্রাণ ত্যাগ করছে কিন্তু সে ত দেশের জন্য। তাহাতে কি সুখ! কি স্বদেশপ্রেম! তোমার দেশহিতৈষিতা দেখে আমি মোহিত হয়েছি।

শ্যাম। (কথা কহিবার চেষ্টা—কিন্তু কহিতে অপারগ)।

সাহেব। রাজবিদ্রোহী বলিয়া তোমাকে কয়েদে রাখিয়াছে—কয়েদের যন্ত্রণায়—উৎকট পরিশ্রমে ক্ষুধা তৃষ্ণায় বেত্রাঘাতে প্রাণান্তপ্রায় কিন্তু সেত দেশের জন্য। তাতে কি কষ্ট! কি ধৈর্য্য!

শ্যাম। (নিরুত্তরে দ্রুতবেগে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সভা গৃহ।

বাগবাজার দেশহিতৈষী সভার সভ্যগণ আসীন।

১ম সভ্য। সভ্যেরা ত সকলেই প্রায় এসেছেন এবার মিটিং আরম্ভ করা যাক। সে দিন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হয়েছে এখন তাঁর যাবার কি বন্দোবস্ত হবে।

২য় সভ্য। কই প্রতিনিধি শ্যাম বাবু ত এখনও আসেন নাই—একটু থাক্।

শ্যাম বাবুর ভ্রাতা রাম বাবুর প্রবেশ।

৩য় সভ্য। এই যে রাম বাবু—আপনার দাদা কোথায়? তাঁর জন্য আমরা অপেক্ষা করছি।

রাম বাবু। দাদা আসেন নাই এই চিঠি দিয়েছেন—(একজন সভ্যের পত্র লইয়া পাঠ)

সবিনয় নিবেদন

মহাশয়! এবার জাতীয় সমিতিতে আমার আপনাদের প্রতিনিধি রূপে যাইবার সুবিধা হইবে না। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার স্থানে আর কাহাকেও প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন। ইতি।

নিবেদক

শ্রীশ্যামাচরণ বসু।

সকলে। (ম্লান মুখে মাথায় হাত দিয়া) তাইত—এ সভা থেকে তবে কে বোম্বাই যায়? একমাত্র শ্যাম বাবুই যা বম্বে যাবার খরচটা গায়ে করতে পারতেন!

পালিতা।*

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

চারু বলিল "জীবন দা রাগ করিবেন না, আসলে কিন্তু আপনার জন্যই এরূপ ঘটিয়াছে, আপনি যে পশ্চিম যাচ্ছেন সভায় কি সে খবরটা পাঠাতে নেই?—আচ্ছা সে যেন কিশোরীদার দোষ, কিন্তু আপনি টাকা গুলো ত দিয়ে গেলেই পারতেন।"

জীবন রাগিয়া বলিল—"টাকাগুলা! আমি ত দিয়েই গিয়াছিলাম—কিশোরী কেন যে সে কথা বলে নাই সেই আশ্চর্য্য!"

চারু। হ্যাঁ হ্যাঁ তিনি টাকা দিতে যাচ্ছিলেন যেন, বল্লেন—টাকা দিতে তিনি প্রস্তুত—এই রকম কি একটা, কিন্তু তখন এমন গোলযোগ যে কে কার কথা শোনে? —তবে তিনি নিশ্চয়ই বলেছিলেন, বুঝলেন জীবন দা;—আমার বোঝার ভুল হয়েছিল, এখন মনে পড়ছে। তিনি কেবল গণেশ বাবুকে টাকা দিতে আপত্তি করেন।

জীবন। কিন্তু তোমার যেমন বোঝার ভুল হয়েছে সকলেরই ত সেইরূপ হয়েছে? আমি যে টাকা দিয়ে গেছি সেটা স্পষ্ট করে বল্লে ত কেউ ভুল বুঝত না।

চারু। সেটা কি জানেন—সব সময় সব কথা ঠিক যুগিয়ে ওঠে না। সে জন্য জীবন

---

* সম্প্রতি আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস্ হইতে "স্নেহলতা" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে ভারতী ও বালকে "স্নেহলতা" শীর্ষক যে উপন্যাসটি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে এই পুস্তকখানি সেই একই উপন্যাস। এটি তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। এই নব প্রকাশিত স্নেহলতা ভারতীর স্নেহলতা এক নহে এবং একজনের লেখাও নহে। এই গোলযোগের জন্য ভারতীর উপন্যাসটির নাম স্নেহলতার পরিবর্ত্তে "পালিতা" দেওয়া হইল।

দা রাগ করা উচিত নয়—বিশেষ আপনাকে defend করতে গিয়েই কিশোরীদার মেজাজ অমন বিগড়ে গিয়েছিল!

জীবন। আমাকে defend! কে তা করতে বলেছিল? তার ত কোন আবশ্যকই ছিল না।

এই কথায় চারু বড় রাগিয়া গেল। যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর! জীবন এমন অকৃতজ্ঞ! সে বলিল—"আমি হলে করিতাম না—কিশোরী দা কেন করিয়াছেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন!

জীবন দেখিল,—বাস্তবিক চারুর সহিত এবিষয়ে তর্ক বিতর্ক করা বৃথা। তাহার মনে যে সন্দেহ হইয়াছিল তাহা চাপিয়া বলিল—"আমি এখনি সেখানে যাইতেছি—তবে তুমি জগৎ বাবুকে বলিও মোদন দা বেশ সারিয়াছেন। আমি ত তাঁর দেখা পাইলাম না, কাল পরশু আবার একদিন শীঘ্রই আসিব।"

জীবন চলিয়া গেল, একটা সন্দেহ ভাব একটা কষ্টের ভাব একটা বিরক্তির ভাব হৃদয়ে লইয়া চলিয়া গেল। জীবন আজ সকালে সবেমাত্র পশ্চিম হইতে আসিয়াছে। আজ প্রভাতে প্রভাত আলোকের মতই হৃদয়-পূর্ণ বিমল আনন্দালোক লইয়া আজ সে স্বদেশে পদার্পণ করিয়াছিল—সন্ধ্যার অন্ধকার না আসিতে আসিতে হঠাৎ তাহার হৃদয় অশান্তির অন্ধকারে পূর্ণ হইল। তাহার আশা ছিল—সভা হইতে দেশের একটা কাজ হইবে। যৌবনের এই নিস্বার্থ উদ্যমময় আশায় আঘাত পড়িলে হৃদয় বড় আহত হয়।

জীবনের আর কিশোরীর বাড়ী পর্য্যন্ত যাইতে হইল না। বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে কিশোরীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল—কিশোরী আর একটি ছোকরার সহিত হাস্যালাপ করিতে করিতে চলিয়াছিল। জীবন যখন সহসা নিকটে আসিয়া গম্ভীর মুখে গম্ভীর স্বরে বলিল—"কিশোরি, একটা কথা আছে শোন" তখন তাহার বুকের রক্ত যেন হঠাৎ উছলিয়া উঠিল, মুখ বিবর্ণ হইয়া পড়িল। কিছু কথা না কহিয়া সে জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বাগানের একটি নির্জ্জন প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল; অন্য ছোকরাটি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বাগানে প্রবেশ করিয়া দূরের একটি বেঞ্চে বসিল।

জীবন বলিল—"কিশোরী তুমি আমার টাকা খরচ করিয়াছ?"

কিশোরীর উত্তর দিতে সাহস নাই, মৌন বিবর্ণ আনত মুখে সে দাঁড়াইয়া রহিল। জীবন বড় রাগ করিয়া আসিয়াছিল কিন্তু কিশোরীর এই দীন কাতর ভাব দেখিয়া তাহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইল, ধীর করুণ কণ্ঠে বলিল "তোমার যদি টাকার আবশ্যক ছিল তখন তুমি কেন আমার কাছে চাহিয়া লইলে না? যদি বা খরচ করিয়া ফেলিয়াছিলে—সে কথা তখন সভায় বলিলে না কেন; তাহা লুকাইয়া তুমি সত্যের অপমান করিলে, আমাকে প্রতারক করিয়া তুলিলে, আর সেই সঙ্গে আমাদের সমস্ত আশা ভরসা ভাঙ্গিলে!"

কিশোরী কাতর কণ্ঠে বলিল—"দাদা আমি বুঝিয়াছি আমি অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছি—কিন্তু কি করিব ?

জীবন। কি করিবে ? যাহা সত্য খুলিয়া বল, এখনো তাহা হইলে—

কিশোরী। দাদা ক্ষমা কর—আমি এরূপ আর কখনো করিব না।

জীবন। কিন্তু যাহা করিয়াছ তাহার ত প্রতিকার চাই, খুলিয়া বলিলে তুমিও মার্জ্জনা পাইবে—এবং আবার সভা হইবার সম্ভাবনা আছে।

কিশোরীর চক্ষু দিয়া জল পড়িল, কাঁদিয়া কহিল "দাদা খুলিয়া বলিলে আমাকে সকলে ঘৃণা করিবে, চিরকালের জন্য আমি দোষী—চোর হইয়া থাকিব আমাকে কেহ বিশ্বাস করিবে না—আমাকে ক্ষমা কর, যাহা হইয়াগিয়াছে ভুলিয়া যাও, আমি আর এমন কাজ করিব না।"

তাহার কাতরতা জীবনের হৃদয়ে পৌঁছিল, জীবন ক্ষণকাল নীরব রহিয়া বলিল—"তবে তাহাই হউক।"

কিশোরী আনন্দে হাত বাড়াইয়া বলিল—"বল তুমি ক্ষমা করিলে, কাহাকেও বলিবে না, দাদা।"

জীবন তাহার হাতের উপর হাত রাখিয়া বিষণ্ণ মুখে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আমি ক্ষমা করিলাম কিশোরী—যেন এই ক্ষমা ভবিষ্যতে তোমার জীবনকে অন্যায় হইতে বিরত রাখে।"

তাহার কথা শেষ না হইতে হইতে দূর হইতে এক জন বলিল—"হ্যালো জীবন যে!" কিশোরী জীবন দুই জনেই সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল নবীন আসিতেছে। কিশোরী তাড়াতাড়ি বলিল "তবে জীবন দা এখন আমি যাই"—কিশোরীর কোনমতে এখন নবীনের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা নাই—সে সরিয়া পড়িল। কিশোরী চলিয়া গেল—জীবন নবীনের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল "এই যে নবীনদা আস্তে আজ্ঞা হোক।"

নবীন। এমনি করেই কি একেবারে নিরুদ্দেশ হতে হয় হে ?

জীবন বলিল—"হ্যাঁ ভাই মোহন দার অসুখ শুনে তাড়াতাড়ি যেতে হয়েছিল, তা সভা—

নবীন। একতা দৃঢ়তা, কার্য্য তৎপরতা! ওসব ভাই তুমিই শিক্ষা দিতে পার—ওসব কি আমাদের কর্ম্ম ?" এই বিদ্রূপ জীবনের মর্ম্মে লাগিল, কিন্তু সে কি উত্তর করিবে ? তাহাদের নিকট সত্যই জীবন দোষী।

সে বলিল "নবীন দা, এক আধবার চুক হয়ে গেলে কি আর মার্জ্জনা নেই ?

নবীন হাসি ছাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—"চুক ত সহস্রবার সকলেরি হয়ে থাকে তার মার্জ্জনা অমার্জ্জনা কি আমার হাতে ? তা নয় ভাই। আমরা যে কাজে

চুল আঁচড়াইতেছিল তিনি ভিজা গামছা দিয়া মুখের ধোতাবশিষ্ট তৈল মুছিতেছিলেন। মুছা হইয়া গেলে আয়নার থোপ হইতে সিন্দুরের কৌটা বাহির করিয়া অঙ্গুলির আগায় কপালে একটি মস্ত টিপ পরিলেন পরে চিরুণীর অগ্রভাগে সিন্দুর লইয়া কেশবিহীন সীমন্তে প্রচুর পরিমাণে লেপিয়া দিলেন। টগর এতক্ষণ মায়ের কাছে বসিয়া এক পয়সার একখানি ছোট আয়না মুখের কাছে ধরিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে মাঝে মাঝে লাল জিভ বাহির করিয়া দেখিতেছিল। মাকে সিন্দুর পরিতে দেখিয়া বলিল—"মা আমি পরব"

গৃহিণী বলিলেন। "ছেলে মানুষ সিন্দুর পরে না ছিঃ।"

না। "দিদি কেন পরে, আমি পরব—"

দাসী বলিল—"ন্যাকা আর কি! দিদির যে বিয়ে হয়েছে—

টগর। "তুই থাম—হ্যাঁ মা পরব—"

মা রাগ করিয়া বলিলেন—'এমন মেয়ে দেখিনি—আজ বাদে কাল বিয়ে হবে—এখনো জ্ঞান বুদ্ধি হোল না! এই পর"—

বলিয়া কপালে একটা টিপ দিয়া দিলেন।

টগর বলিল—"না মাথায় দেব। দিদি দেয়—বেশ দেখায়"

বলিয়া সিন্দুর কৌটাটা দখলের চেষ্টা করিল।

মা বলিলেন—"মেরে ফেলব বলছি, উঠে যা পোড়ারমুখি"

দাসী বলিল—"হবে গো হবে শীঘ্রই সাধ মিটবে। ঐ যে শ্বশুর বাড়ীর ঝিও আসছে।"

শ্বশুর বাড়ীর নাম শুনিয়া টগর দৌড় মারিল, ভবি দাসী ডালি হাতে হেলিতে দুলিতে আসিয়া দেখা দিলেন, তাপর ডালি নামাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—"দাদা বাবু এসেছেন গো—এই সব নিয়ে এসেছেন, তাই মা পাঠালেন,—আর বল্লেন—একদিন যেন আপুনি শীগ্রির যেও"

গৃহিণীও অনেক দিন হইতে ভাবিতেছেন একদিন জীবনের মার বাড়ী যাইবেন; গিয়া বিবাহের সব পাকাপাকি বন্দবস্ত করিয়া আসিবেন। জীবন আসিয়াছে শুনিয়া তিনি আজই সেখানে যাইবেন স্থির করিয়া বলিলেন "তা জীবনের মাকে বলিস আমি আজই যাব"

দাসী। তা মেয়েদেরও নিয়ে যেও, মা বলেছেন।

কমলি বলিল—"তা কি হয়? বিয়ের আগে কি শ্বশুর বাড়ী যেতে আছে, দিনে ক্ষেণে একেবারে ঘরে পা দেবে?

ভবি। তা বাপু আমাকে মা যা বল্লে তাই বল্লু। এত আর পরের ঘর নয়, আপন ঘরেই বিয়ে, না নিয়ে গেলে মা কিন্তু দুঃখু করবে। তা বড় বৌমাকে নিয়ে যেতে ত দোষ নেই তাকে নিয়ে যেও।"

দাসীর বড় বৌমার প্রতি কিছু বেশী টান সুতরাং গৃহিণী যখন তাহাতে সম্মত হইলেন, তখন সে আর অন্য অনুরোধ করা আবশ্যক বিবেচনা করিল না।

গৃহিণী যে সেই দিনই বিকালে স্নেহলতাকে লইয়া জীবনের মার বাড়ী গিয়াছিলেন তাহা পাঠক জানেন। খানিকক্ষণ স্নেহলতা তাঁহাদের সহিত একত্র বসিয়া রহিল কিন্তু তাঁহাদের দুজনের গল্প কতক্ষণ সে নীরবে বসিয়া শুনিবে? তাঁহারা দু জনে গল্প করিতে লাগিলেন—খানিক পরে সে উঠিয়া খানিকটা এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইল। অবশেষে পাশের ঘরে জীবনের টেবিলের উপর কতকগুলো বই দেখিয়া সেখানে আড্ডা লইয়া একখানি চৌকিতে বসিল, টেবিলে বাঙ্গালা বই একখানিও খুঁজিয়া মিলিল না, Lamb's Tales একখানি পাইয়া তাহাই পড়িতে আরম্ভ করিল, বাড়ীতে সে এ বই পড়িত। সন্ধ্যা হইয়া আসিল আর অক্ষর স্পষ্ট দেখা যায় না। কিন্তু তাহার এত ভাল লাগিয়াছে যে জানালার কাছে বই হাতে লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, যখন একটুও আর দেখা গেল না, তখন বইখানি ছাড়িয়া জীবনের মার ঘরের দিকে ফিরিল, গৃহে প্রবেশ করিতে গিয়া জীবনকে দেখিতে পাইল, সুতরাং আবার ফিরিয়া পূর্ব্বোক্ত গৃহে আসিয়া বসিল। ইতি মধ্যে চাকর দীপ রাখিয়া গিয়াছিল—টেবিলের কাছে বসিয়া আবার সে পড়িতে আরম্ভ করিল, সুতরাং জীবন যখন নিঃশব্দে গৃহে আসিয়া দাঁড়াইল সে জানিতেও পারিল না।

কতক্ষণ ধরিয়া জীবন এইরূপে এইখানে দাঁড়াইয়া এই জীবন্ত কবিতার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতেছিল—সে জানে না, সহসা সন্ধ্যাতারার আলোক পূর্ণ দুই চঞ্চল আঁখিতারা তাহার নয়নের উপর সন্নিবিষ্ট হইল, সহসা নয়ন উঠাইয়া জীবনকে দেখিয়া বালিকা সলজ্জে উঠিয়া দাঁড়াইল, অতি ধীর মধুর লজ্জার হাসি হাসিয়া চঞ্চল পদে ঘর হইতে পলাইয়া গেল, সে হাসিতে জীবনের হৃদয়ে কি যেন এক অপূর্ব্ব আনন্দ সিঞ্চিত করিয়া গেল। বালিকা চলিয়া গেল, জীবন ধীরে ধীরে তাহার পরিত্যক্ত চৌকিতে আসিয়া বসিয়া দেখিল বালিকা কি বই পড়িতেছিল। দেখিতে দেখিতে আপন মনে বলিল—

"A thing of beauty is a joy for ever:
Its loveliness increases, it will never
Pass into nothingness; but still will keep
A bower quiet for us, and a sleep
Full of sweet dreams, and health, and quiet breathing."

এখন পাঠক বুঝিলেন কাহাকে ভাবিয়া জীবন তাহার পর মায়ের কথায় বিনা আপত্তিতে বিবাহে সম্মত হইল।

"এক বর্ষ।"*

১

একটী বৎসর হায়, কালের সাগরে
দেখিতে দেখিতে অই গড়ায়ে পড়িল!
রাখিয়া স্মৃতির চিহ্ন ভবিষ্যৎ স্তরে
জলের বুদ্বুদ আহা, জলে মিশাইল!

২

সম্মুখে নূতন ঢেউ তীর বেগ ধরি
অই দেখ হুহু ক'রে আসিছে ছুটিয়া!
কে জানে জন্মের মত এই স্রোতে পড়ি,
কত প্রাণ হাহাকারে যাইবে ডুবিয়া!

৩

পশ্চাতে ভীষণ দৃশ্য, ভয়ে কাঁপে প্রাণ,
কত দেশ, কত রাজ্য, লণ্ড ভণ্ড করি,
ক'রেছে মানব শূন্য গভীর শ্মশান,
জাগিছে ত্রিশূল † হস্তে নীরব-প্রহরী!

৪

অই দেখ মহা নদী গভীর গর্জ্জনে,
গ্রাসিয়াছে কত চিত্র নয়ন-রঞ্জন!
মিশিয়া অনন্ত নীল আকাশের সনে,
গর্জ্জিছে বিপুল বেগে তরঙ্গ ভীষণ!

৫

কত সম্রাটের আহা অতুল বৈভব,
গ্রাসিয়াছে এই নদী করি হুহুঙ্কার!
চূর্ণ চূর্ণ করি শেষে অট্টালিকা সব
রাখিয়াছে অভাগার কপ্নী মাত্র সার!

৬

কত বালিকারে হায় কাঙ্গালিনী করি,
অসময়ে মাতৃস্নেহে করিল বঞ্চিৎ!
দুঃখিনীর সেই অশ্রু মুহূর্ত্তেক হেরি
পাষাণ সদৃশ হৃদি হয় বিচলিত!

৭

কত সাধ্বী রমণীর সতীত্ব রতন,
খসিয়া পড়িল এই তরঙ্গের ঘায়!
অভাগীর মর্ম্মভেদী করুণ রোদন,
মুহূর্ত্তের তরে কেহ শুনিল কি হায়!

৮

শুনিল কি হায় সেই করুণ চীৎকার!
সুষুপ্ত ভারতে যেন নাহিরে জীবন!
নির্ব্বাণ অনল-কুণ্ডে বিফল ফুৎকার,
নহিলে ভারত-বক্ষে কেন এ প্লাবন?

৯

অই দেখ কোটি কোটি মানব-কঙ্কাল,
ভাসিছে দক্ষিণে বামে রক্তের সাগরে!
যন্ত্রণার দুর্ব্বিসহ তরঙ্গ উত্তাল
উঠিছে গর্জ্জিয়া বেগে গগন উপরে!

---

* কবিতাটি একজন মুসলমানের লেখা বোধে আমরা ইহা ভারতীতে প্রকাশ করিলাম। মুসলমানের লেখনীতে এরূপ পরিষ্কার বাঙ্গলা ভাষা বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। ভাং সং।

† ত্রিশূল অর্থে সমগ্র কালকে অর্থাৎ ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

১০

সাহিত্যের স্বর্ণাকাশে নক্ষত্র নিচয়,
শোভিত যা অবিরাম উজ্জ্বল বরণে!
আঁধারি জগত, সেই রত্ন জ্যোতির্ম্ময়
ডুবিয়াছে অতীতের অনন্ত জীবনে!

১১

দু একটী তারা এবে গগনের তলে,
জ্বলিতেছে মৃদু মৃদু উল্কার মতন!
ভবিষ্যের নব স্রোতে, এই নদী জলে
বুঝিবা জন্মের মত হয় নিমগন!

১২

পড়ি এই ঘূর্ণ পাকে ডুবিয়া ভাসিয়া,
এ'সেছি পদ্মার এই ভীষণ সৈকতে!
অবস্থার অন্য-স্রোতে লইবে টানিয়া
কে জানে কোথায়, হায় পাতালে মরতে!

১৩

কাঁদাইয়া চিরতরে জননী আমার!
ডুবিয়াছে এ অনন্ত কাল সিন্ধু জলে!
এ জীবনে সেই মুখ না দেখিনু আর,
যে মূর্ত্তি রাখিয়াছিনু হৃদয়ের তলে!

১৪

কত আশা, কত যত্ন এ ঘোর প্লাবনে,
এ জন্মের মত হায়, গিয়াছে ভাসিয়া!
নিরাশার তীব্রতর ঘোর নিষ্পেষণে
হৃদয়ের কক্ষগুলি প'ড়েছে ভাঙ্গিয়া!

১৫

তাহে দারিদ্র্যের দায় নিত্য উপবাসে
হইয়াছে দেহখানি অস্থিমাত্র সার!
শিশুগুলি কেঁদে মরে দারুণ পিয়াসে
লজ্জায় সে কথা মুখে নাহি আসে তার!

১৬

সম্মুখে অনন্ত, হায়, অনন্ত পশ্চাতে,
অনন্তে অনন্তে মরি যুদ্ধ ভয়ঙ্কর!
ভবিষ্যে ঠেলিয়া দূরে তীব্র কষাঘাতে,
অতীত টানিয়া নিল একটী বৎসর!

১৭

দারুণ সংযোগ স্থলে আবর্ত্তের পাকে,
কত মানবের প্রাণ হইল সংহার!
অদূরে দুর্ভিক্ষ পেঁচা অমঙ্গল ডাকে,
এবার অদৃষ্টে বুঝি নাহিরে নিস্তার!

১৮

অই শোন চারিদিকে ভীম কোলাহল
ছু'টেছে ত্রিদিব-পথে ভেদিয়া গগন!
এইবার বুঝি পৃথ্বী যাবে রসাতল,
ভয়ে সশঙ্কিত স্বর্গে দেব সেনাগণ!

১৯

একটী বৎসরে হায় এ জন্মের মত
আকুল পরাণে করি শেষ সম্ভাষণ!
প্রকৃতির প্রিয় কার্য্যে হইয়া বিরত.
বিষাদে মলিন মুখে ডুবিল তপন!

২০

আজি এ পদ্মার তীরে বিষণ্ণ হৃদয়ে
জীবনের এক ঢেউ ফেলিলাম পাছে!
পড়িলাম অন্য স্রোতে, হায় অসময়ে,
নাহি জানি এ অদৃষ্টে আরো কত আছে!

শ্রীকায়কোবাদ।

"এক বর্ষ।"*

১

একটী বৎসর হায়, কালের সাগরে
দেখিতে দেখিতে অই গড়ায়ে পড়িল!
রাখিয়া স্মৃতির চিহ্ন ভবিষ্যৎ স্তরে
জলের বুদ্বুদ আহা, জলে মিশাইল!

২

সম্মুখে নূতন ঢেউ তীব্র বেগ ধরি
অই দেখ হুহু ক'রে আসিছে ছুটিয়া!
কে জানে জন্মের মত এই স্রোতে পড়ি,
কত প্রাণ হাহাকারে যাইবে ডুবিয়া!

৩

পশ্চাতে ভীষণ দৃশ্য, ভয়ে কাঁপে প্রাণ,
কত দেশ, কত রাজ্য, লণ্ড ভণ্ড করি,
ক'রেছে মানব শূন্য গভীর শ্মশান,
জাগিছে ত্রিশূল † হস্তে নীরব-প্রহরী!

৪

অই দেখ মহা নদী গভীর গর্জ্জনে,
গ্রাসিয়াছে কত চিত্র নয়ন-রঞ্জন!
মিশিয়া অনন্ত নীল আকাশের সনে,
গর্জ্জিছে বিপুল বেগে তরঙ্গ ভীষণ!

৫

কত সম্রাটের আহা অতুল বৈভব,
গ্রাসিয়াছে এই নদী করি হুহুঙ্কার!
চূর্ণ চূর্ণ করি শেষে অট্টালিকা সব
রাখিয়াছে অভাগার কপ্নী মাত্র সার!

৬

কত বালিকারে হায় কাঙ্গালিনী করি,
অসময়ে মাতৃস্নেহে করিল বঞ্চিৎ!
দুঃখিনীর সেই অশ্রু মুহূর্ত্তেক হেরি
পাষাণ সদৃশ হৃদি হয় বিচলিত!

৭

কত সাধ্বী রমণীর সতীত্ব রতন,
খসিয়া পড়িল এই তরঙ্গের ঘায়!
অভাগীর মর্ম্মভেদী করুণ রোদন,
মুহূর্ত্তের তরে কেহ শুনিল কি হায়!

৮

শুনিল কি হায় সেই করুণ চীৎকার!
সুষুপ্ত ভারতে যেন নাহিরে জীবন!
নির্ব্বাণ অনল-কুণ্ডে বিফল ফুৎকার,
নহিলে ভারত-বক্ষে কেন এ প্লাবন?

৯

অই দেখ কোটি কোটি মানব-কঙ্কাল,
ভাসিছে দক্ষিণে বামে রক্তের সাগরে!
যন্ত্রণার দুর্ব্বিসহ তরঙ্গ উত্তাল
উঠিছে গর্জ্জিয়া বেগে গগন উপরে!

---

* কবিতাটি একজন মুসলমানের লেখা বোধে আমরা ইহা ভারতীতে প্রকাশ করিলাম। মুসলমানের লেখনীতে এরূপ পরিষ্কার বাঙ্গলা ভাষা বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। ভাং সং।

† ত্রিশূল অর্থে সমগ্র কালকে অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

১০

সাহিত্যের স্বর্ণাকাশে নক্ষত্র নিচয়,
শোভিত যা অবিরাম উজ্জ্বল বরণে!
আঁধারি জগত, সেই রত্ন জ্যোতির্ম্ময়
ডুবিয়াছে অতীতের অনন্ত জীবনে!

১১

দু একটী তারা এবে গগনের তলে,
জ্বলিতেছে মৃদু মৃদু উল্কার মতন!
ভবিষ্যের নব স্রোতে, এই নদী জলে
বুঝিবা জন্মের মত হয় নিমগন!

১২

পড়ি এই ঘূর্ণ পাকে ডুবিয়া ভাসিয়া,
এ'সেছি পদ্মার এই ভীষণ সৈকতে!
অবস্থার অন্য·স্রোতে লইবে টানিয়া
কে জানে কোথায়, হায় পাতালে মরতে!

১৩

কাঁদাইয়া চিরতরে জননী আমার!
ডুবিয়াছে এ অনন্ত কাল সিন্ধু জলে!
এ জীবনে সেই মুখ না দেখিনু আর,
যে মূর্ত্তি রাখিয়াছিনু হৃদয়ের তলে!

১৪

কত আশা, কত যত্ন এ ঘোর প্লাবনে,
এ জন্মের মত হায়, গিয়াছে ভাসিয়া!
নিরাশার তীব্রতর ঘোর নিষ্পেষণে
হৃদয়ের কক্ষগুলি প'ড়েছে ভাঙ্গিয়া!

১৫

তাহে দারিদ্র্যের দায় নিত্য উপবাসে
হইয়াছে দেহখানি অস্থিমাত্র সার!
শিশুগুলি কেঁদে মরে দারুণ পিয়াসে
লজ্জায় সে কথা মুখে নাহি আসে আর!

১৬

সম্মুখে অনন্ত, হায়, অনন্ত পশ্চাতে,
অনন্তে অনন্তে মরি যুদ্ধ ভয়ঙ্কর!
ভবিষ্যে ঠেলিয়া দূরে তীব্র কষাঘাতে,
অতীত টানিয়া নিল একটী বৎসর!

১৭

দারুণ সংযোগ স্থলে আবর্ত্তের পাকে,
কত মানবের প্রাণ হইল সংহার!
অদূরে দুর্ভিক্ষ পেঁচা অমঙ্গল ডাকে,
এবার অদৃষ্টে বুঝি নাহিরে নিস্তার!

১৮

অই শোন চারিদিকে ভীম কোলাহল
ছু'টেছে ত্রিদিব-পথে ভেদিয়া গগন!
এইবার বুঝি পৃথ্বী যাবে রসাতল,
ভয়ে সশঙ্কিত স্বর্গে দেব সেনাগণ!

১৯

একটী বৎসরে হায় এ জন্মের মত
আকুল পরাণে করি শেষ সম্ভাষণ!
প্রকৃতির প্রিয় কার্য্যে হইয়া বিরত,
বিষাদে মলিন মুখে ডুবিল তপন!

২০

আজি এ পদ্মার তীরে বিষণ্ণ হৃদয়ে
জীবনের এক ঢেউ ফেলিলাম পাছে!
পড়িলাম অন্য স্রোতে, হায় অসময়ে,
নাহি জানি এ অদৃষ্টে আরো কত আছে!

শ্রীকায়কোবাদ।

১২৯৬ সালের মহিলা শিল্পমেলার

আয় ও ব্যয় নাং ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ সাল।

গত ফাল্গুন চৈত্র সংখ্যক "ভারতী ও বালকে" স্বীকৃত দান প্রাপ্তি			১০৩২৲
মিশেস চন্দ্রমাধব ঘোষ	কলিকাতা	...	১৬৲
,, এল, ঘোষ	ঐ	...	১০৲
,, কে, জি, গুপ্ত	ঐ	...	২০৲
শ্রীমতী জগৎমোহিনী দাসী	ঐ	...	১০৲
,, সুবোধবালা দাসী	ঐ	...	২৲
,, ক্ষীরোদমোহিনী দাসী	ঐ	...	১৲
মিশেস আর, এন, রায়	ঐ	...	৫৲
,, বি, দে	খুলনা	...	২৫৲
শ্রীমতী ক্ষীরোদবাসিনী ঘোষ	কলিকাতা	...	৫৲
	মোট		১১২৬৲

আয়।

দান খাতে নগদ

১১২৬৲

মেলার আয় অর্থাৎ বিবিধ জিনিস বিক্রীর মূল্য, কমিশন, টিকিট-বিক্রয়, থিয়েটারের আয় ইত্যাদি—

১৫১৩৸৵০

মোট	২৬৩৯৸৵০
বাদ খরচ	৯৯০৵১৫
লাভ	১৬৪৯৷৶৫

ব্যয়।

মেলার মোট ব্যয়

৯৯০৵১৫

গ্রাহকগণের প্রতি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—প্রেসম্যান ও কম্পোজিটরদিগের পীড়াবশতঃ গত সংখ্যক "ভারতী" নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত হয় নাই। বর্ত্তমান সংখ্যক "ভারতী ও বালক" প্রকাশিত হইতে যে বিলম্ব হইল, ইহাও সেই অনিয়মের ফল। পাঠকগণ তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। এই বিলম্ব পূরণ করিয়া লইবার নিমিত্ত বর্ত্তমান জ্যৈষ্ঠ ও আগামী আষাঢ় দুই মাসের পত্রিকা আষাঢ় মাসের মধ্যে একত্রে প্রকাশিত হইবে।

"ভারতী ও বালক" কার্য্যাধ্যক্ষ।

আগরার-পথে।

কোন ভাবুক বলিয়াছেন—বাঙ্গালী ও মার্জ্জার, উভয়েরই হৃদয়ের প্রকৃতি সমসূত্র ভাবে সন্নিবিষ্ট। মার্জ্জারশ্রেষ্ঠ একবার যে গৃহে আসিয়া আপনার অধিকার সাব্যস্ত করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সনন্দের সূত্রপাত করেন—সেই গৃহ হইতে তাঁহাকে সহজে বহিষ্কৃত করা যেমন আয়াসসাধ্য বলিয়া উপলব্ধি হয়—বাঙ্গালীও সেইরূপ—যে স্থানকে তাহার নিজের বলিয়া ভাবে—যাহার মধ্যে থাকিয়া লালিত পালিত, শিক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়—সেই স্থান সহজে বা বিশেষ কারণের অভাবে পরিত্যাগ করিতে পারে না। চিরকালের জন্য ত দূরের কথা—দুচার দিনের জন্য পরিত্যাগ করিতেও তাহার মন আন্দোলিত হইতে থাকে। জাতি সাধারণের স্বাভাবিক গুণবশতঃ এই প্রকার মার্জ্জার প্রকৃতি বিশিষ্ট বলিয়াই বোধ করি দেশ ভ্রমণে একটা বিশেষ আনন্দ লাভের পুরস্কারের প্রলোভন থাকিলেও বাড়ী ছাড়িবার সময়—গাড়ি ছাড়িবার সময়ের কথাটা ভুলিয়া গেলাম। কাজেই শেষ মুহূর্ত্তে তাড়াতাড়ি ষ্টেসনে আসিয়া দেখিলাম, ডাকগাড়ী প্লাটফর্ম্মে আসিয়া সদম্ভে ফুৎকার ছাড়িতেছে মধ্যে মধ্যে শ্বাস পরিত্যাগের ন্যায়—সশব্দে ঘনকৃষ্ণ ধূমমালা উদ্গারিত করিয়া সেই জনসঙ্কুল ক্ষুদ্র বাণিজ্য-নগরী-প্রতিম ষ্টেসন বক্ষ আরও কোলাহলময় ও বিকম্পিত করিয়া তুলিতেছে। অসংখ্য লোকজনের জনতা। সৌভাগ্যের প্রিয়-সন্তান শ্বেতপুরুষদিগেরই দলাধিক্য—সকলেরই মুখে মহা ব্যস্ততা—কেহবা চুরুট ধরাইতে ব্যস্ত, কেহবা কুলির প্রতি, বজ্রমুষ্টি প্রদর্শনে ও অভদ্রোজনোচিত বাক্য প্রয়োগে ব্যস্ত,—কেহবা প্রণয়িনী বা স্নেহাস্পদা-দিগের সহিত নিঃশব্দ কথোপকথনে ও কর-কম্পনে সময়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন। এই সব ব্যস্ততার বিরাট ভাব দেখিয়া আমরাও ব্যস্ততার বিরাট সমুদ্রে ভাসিলাম। যাত্রী আমি ও আমার একজন বন্ধু।

আমাদের এবারকার গন্তব্য পথ একবারে নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত ছিল না। স্থির করা গেল যাইব "সাজাঁহাপুর"। সাজাঁহাপুর রোহিল্লার দেশ। খাস রোহিল খণ্ডে হিমালয়-পদ প্রান্তবর্ত্তী নেপালের সীমান্ত প্রদেশ। কেননা এখান হইতে পিলভীট বড় বেশী দূরে নয়—পিলভীট পার হইলেই নেপালের সীমা। কোথায় শস্যশ্যামলা, ফলজলপূর্ণা বঙ্গভূমি, কোথায় কঙ্করময়ী, মরুভূমিসম উত্তর পশ্চিম প্রদেশ আর কোথায় বা শৈলবেষ্টিত হিমানীপূর্ণ হিমালয়ের সীমান্ত প্রদেশ। বেনারসে বিশ্রামের বন্দোবস্ত ছিল—সুতরাং এই খান হইতে বুদ্ধিমানের ন্যায় "শয়নে পদ্মলাভের" আয়োজন করিয়া লইলাম। উপরের দুইটি দোদুল্যমান শয্যা তৎক্ষণাৎ বিনাবাক্য ব্যয়ে অধিকৃত হইল।

বন্ধু ত চুরুট ধরাইয়া বই খুলিয়া গাম্ভীর্য্য ভাবের অবতারণা করিয়া পাঠ আরম্ভ করি-লেন। আমি অন্য পন্থানুবর্ত্তী হইলাম।

কোন পাশ্চাত্য লেখক, ইংরাজ ও ফরাসী জাতির প্রকৃতির সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন—(লেখক অবশ্য ইংরাজ !) যে—ইংরাজ ও ফরাসী উভয়ের মধ্যে ফরাসি অধিক সামাজিক। এমন কি—লোকের সহিত আলাপ-পটুতায় অপরিচিতের মনোরঞ্জনে ইহাদের ন্যায় অন্য কোন জাতিই ইউরোপে নাই। দুইজন ইংরাজকে এক গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখ—দেখিবে তাহারা কেহ কাহারও সহিত অগ্রে কথা কহিবে না—পাছে গাম্ভীর্য্যের অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয়। সমস্ত দিন রাত্রি কাটিয়া যাইবে দুইজনে দুইদিকে পড়িয়া ঘুমাইবে তবু বিশেষ কারণ না হইলে গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ করিবে না। কিন্তু দুই জন খোলা-প্রাণ ফরাসী এক গৃহে থাকিলে ত কথাই নাই—একজন ইংরাজের সঙ্গেও নিভৃতে একজন ফরাসী থাকিলে—সেই গৃহ উভয়ের হাস্যে ধ্বনিত হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু লেখক বোধ হয় বাঙ্গালীকে জানেন না জানিলে ফরাসিদিগকে অতটা প্রধান্য দিতেন না। আমার মতে বোধ হয়—কোমল ভাবময়ী প্রকৃতির মধ্যে যাহারা লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত—তাহারাই বেশী সামাজিক হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডের প্রকৃতির সহিত ফরাসী নৈসর্গের তুলনা ও তাহার সহিত শষ্যশ্যামলা বঙ্গভূমির তুলনায় ইহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হইতে পারে।

আমাদের কক্ষে বেশী লোক ছিল না দুইজন বাঙ্গালী ছিলেন—তাঁহারা হুগলীতে নামিয়া গেলেন। থাকিবার মধ্যে রহিলাম আমরা দুইজন ও একটী সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ ও এক মুসলমান যুবক।

মুসলমান যুবকটী কিছু গম্ভীর প্রকৃতি বিশিষ্ট। হিন্দুস্থানিটী কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। নিবাস জম্বু সহর। আসিয়াছিলেন কলিকাতায় বিশেষ প্রয়োজনে—যাইবেন লক্ষৌ। লোকটী বয়স্থ ও সুশিক্ষিত। সংস্কৃতে বিশেষ দক্ষ। ইংরাজিও ভাঙ্গা ভাঙ্গা বলেন, যাহা বলেন তাহাতে বেশ কথা বার্ত্তা চলে। আমার সঙ্গে ইঁহার বড় বনিয়া গেল।

কিন্তু প্রকোষ্ঠ মধ্যে যবনাধিকার হওয়াতে, পণ্ডিত ঠাকুর বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তাহার সজ্জিত তাম্বুলাধার হাতেই রহিয়া গেল। তাহার সহিত আমাদের আসিবার পূর্ব্ব হইতেই—তাঁহারও বনিবনাও হয় নাই—সে নামিয়া গেলেই যেন পণ্ডিতজির প্রাণের একটা ভার কমিয়া যায়। কিন্তু সন্ধানে জানিলাম, মুসলমান যুবকটী এলাহাবাদ পর্য্যন্ত যাইবেন। ভাবিলাম হিন্দুর যবন-বিরাগ আজ হইতে নহে।

যাহা হুউক পণ্ডিতজিকে প্রফুল্ল করিয়া লইলাম। কথাবার্ত্তা কখন হিন্দিতে কখন ইংরাজীতে হইতে লাগিল। যখন হিন্দী বুঝিতে পারি না তখন ইংরাজীতে ধরি। পণ্ডিতজির ইংরাজী বড় মজার—এই স্থানে আমাদের কথোপকথনের একাংশ তুলিয়া দিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কলিকাতা ভাল না কাশ্মীর ভাল" ? পণ্ডিতজি ইংরাজীতে উত্তর করিলেন—

Some toim (sometimes) I sty (stay) in Calcutta; not much good climate—too much people, roads much mnd—no vontilaition (ventilation) ইত্যাদি।

দুই চারিদিন থাকিয়াই পণ্ডিতজি কলিকাতার এই প্রকার অনুমান করিয়াছেন। আর কিছুদিন থাকিলে বোধ হয় কলিকাতা সম্বন্ধে তাঁহার একটা বড় বেশী কুসংস্কার জন্মিত। বস্তুতঃ ভূস্বর্গ কাশ্মীরে বাস করিয়া কলিকাতা সম্বন্ধে এরূপ ধারণা আমার পক্ষে বড় অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইল না। বাঙ্গালী জাতির সম্বন্ধে তাঁহার কি ধারণা জিজ্ঞাসা করিলাম তদুত্তরে তিনি বলিলেন—

Bengalees are very good people in heart like us. In Guzrat, in Ajmere, in Kasmere,—in all part of Aryavurta they are. But they love slavery not commerce.

বস্তুতঃ একথা অপ্রকৃত নহে।

ইহার পর তাহার সঙ্গে কাশ্মীররাজ স্বর্গীয় মহারাজ রণবীর সিংহের ও পদচ্যুত হতভাগ্য মহারাজ প্রতাপসিংহের সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। নীলাম্বর বাবুরও অনেক কথা উঠিল। তিনি মহারাজ প্রতাপ সিংহকে আদর্শ রাজা বলিয়া বর্ণনা করিলেন। আমি প্রতাপসিংহের উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি, মদ্য ও ক্রীড়াসক্তির কথা উল্লেখ করিলে তিনি কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া বলিলেন—"বাবু! ও সব কথা বলিলে মহারাজের অপমান করা হয়! আমি মহারাজের সহিত বিশেষ পরিচিত। অমন নির্দ্দোষ চরিত্র, নিস্পৃহ, পরোপকারী ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা কলিতে দেখি নাই। প্রতাপ সিংহকে দেখিয়া আমাদের মনে হইত, বোধ হয় পর্ব্বতের দুর্ভেদ্য আবরণ-থাকাতে কাল কাশ্মীরের সীমায় প্রবেশ করিতে না পারিয়া মহারাজকে সত্যযুগের সীমায় রাখিয়া গিয়াছে।"

আমি পূর্ব্বে যে শয্যা রচনা করিয়াছিলাম—তাহার একাংশ পণ্ডিতজিকে ছাড়িয়া দিলাম। আমরা তখন মধুপুর ছাড়াইয়াছি। রাত্রি ও গভীর হইয়াছে দেখিয়া আমরা শয়ন করিলাম।

দানাপুরে গিয়া যখন গাড়ি থামিল তখন আমরা শয্যা হইতে উঠিলাম। পণ্ডিতজি তখন স্তব আওড়াইতেছেন। দানাপুরে আমরা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া পিত্তরক্ষা করিলাম। পণ্ডিতজিকে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি বলিলেন বিশ্বেশ্বরের পুরী না দেখিয়া তিনি জল গ্রহণ করিবেন না। বিশেষতঃ যবন যখন এই কক্ষ মধ্যে।

আমি আবার গিয়া পণ্ডিতজির সঙ্গে মিশিলাম। এবার লেখাপড়ার কথা আরম্ভ হইল। রাজতরঙ্গিণীর সম্বন্ধে কতক কথা হইল—কাশ্মীরের ইতিহাস ও ভূগোল লইয়া অনেক কথা হইল। কথায় কথায় আমার বন্ধু কাশ্মীরী স্ত্রীলোকদিগের অসামান্য সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়া কাশ্মীরকেই পুরাণকথিত অপ্সর কিন্নর রাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিলেন। পণ্ডিতজি এতৎপ্রসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—

হস্তে লীলা কমলমলকে, বালকুন্দানু বিদ্ধং
নীতা লোধ্র প্রসব রজসা, পাণ্ডতামাননে শ্রীঃ,
চূড়া পাশে নব কুরবকং চারু কর্ণে শিরীষং,
সীমন্তে চ তদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥ *
যত্রোন্মত্ত ভ্রমর মুখরাঃ পাদপা নিত্য পুষ্পাঃ
হংসশ্রেণী রচিত রসনা, নিত্য পদ্মা নলিন্যঃ ॥
কেকোৎ কণ্ঠা ভবন শিখিনো নিত্যভাস্বৎ কলাপা,
নিত্য জ্যোৎস্নাঃ প্রতিহত তমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ ।*

*   *   *   *   *   *   *   *

পণ্ডিতজি বস্তুতঃই ঠিক বলিয়াছেন—কারণ কাশ্মীর সম্বন্ধে একটী পারসী প্রবাদ আছে—

"হরশোকতা যানে কেব কাশ্মীর দরায়দ
গর মুরগে কাবাব অস্ত্ কেবা বলোপর
[আয়েদ"

"অর্থাৎ যদি কোন দগ্ধীভূত জীব কাশ্মীরে আসে তাহা হইলে জীবন প্রাপ্ত হয়। অধিক কি বলিব কাবাকের শল্য মাংস এখানে আনিলে তাহার পক্ষোদ্গম হইয়া শীঘ্রই পক্ষীর আকার ধারণ করিয়া সজীব হইয়া উঠে।" কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য এমনই বটে!

কলিকাতার ডাক-রেলগাড়ী দুইটার পর মোগল সরাই পৌঁছিল। মোগল সরাই এ অযোধ্যা রোহিলখণ্ড-শাখার ডাকগাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। পণ্ডিতজি সেইদিন বেনারসে থাকিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহার সঙ্গহীন হইবার জন্য যত না দুঃখিত হইয়াছিলাম তিনি সেই যবনটীর হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াছেন দেখিয়া তদোধিক সুখী হইলাম। এইখান হইতে আমরা বিছিন্ন হইলাম। পণ্ডিতজি সেই এক গাড়ীতে গেলেন বটে—কিন্তু অন্য এক কামরায় গিয়া আসন অধিকার করিলেন।

---

* ইহার অর্থ এই "হে! মেঘ, অলকাতে প্রবেশ করিয়াই দেখিবে তত্রত্য কামিনীদিগের হস্তে শরৎসম্ভূত লীলাকমল, অলকাবলীতে হেমন্ত সম্ভূত অভিনব কুন্দ পুষ্প গ্রথিত, মুখে শিশির সম্ভূত লোধ্র কুসুম-রজঃদ্বারা পাণ্ডুবর্ণতা, কেশপাশে বসন্ত কাল সম্ভূত নব কুরবক পুষ্প, শ্রবণযুগলে গ্রীষ্ম সম্ভূত শিরীষ কুসুম, এবং সীমন্তে বর্ষাকালীন কদম্ব পুষ্প নিয়ত শোভা পাইতেছে। (১) আরও সেই স্থানে সমুদায় ঋতুতেই ফুল ফুটিয়া থাকে, মধুমত্ত, মধুব্রতগণ সর্ব্বদাই তথায় শ্রবণ মনোহর রব করে। সে খানে সকল কালেই সরোবরে পদ্ম ফুল ফুটিয়া থাকে এবং হংসকুল তাহা বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে থাকে। সেখানে গৃহপালিত ময়ূরগণ সর্ব্বদাই আনন্দভরে কেকারব করে। তাহাদের বর্ণ চিরকালই নয়ন বর্দ্ধন শোভা বিস্তার করে। এবং সেই স্থানে নিয়ত জ্যোৎস্না থাকাতে রাত্রে অন্ধকারের আবির্ভাব দেখা যায় না।

বেলা তিন ঘটিকার সময় আমরা মোগলসরাইয়ে গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম—এবং রাত্রি একটার সময় লক্ষ্ণৌএ উপস্থিত হইলাম। লক্ষ্ণৌএ গাড়ী প্রায় এক ঘণ্টা থামে। এখান হইতে মুরাদাবাদ সাহারণপুর ও বেরিলিতে অনেক যাত্রী উঠে। সাহেব সুবার যাত্রীই এখানে বেশী। অনেক দিনের পর চিরপরিচিত ও চিরপ্রিয় লক্ষ্ণৌ দেখিয়া আমাদের মনে শরদাকাশের ক্ষণ পরিবর্ত্তনীয় মেঘাবলীর ন্যায় নানাবিধ চিন্তা তরঙ্গের স্রোত বহিতে লাগিল। কত কথাই ভাবিতেছি—কল্পনার সঙ্গে কত মধুরভাবে ক্রীড়া করিতেছি, কতই সুখের স্বপ্ন দেখিতেছি কিন্তু সহসা John Bull এর কঠোর দ্বারাঘাতে সেই সমস্ত চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল।

যে জনবুলটী আমাদের কক্ষে উঠিলেন তিনি সর্ব্ব প্রথমেই আমাদের গন্তব্য পথের পরিচয় লইলেন। আমরা কলিকাতা হইতে আসিতেছি শুনিয়া মনটা একটু নরম হইল। সেই কক্ষে ইতিপূর্ব্বে আমরা দুই জন ছাড়া অন্য কেহ ছিল না—সাহেবকে লইয়া তিন জন হইলাম। সাহেব বেরিলি কাণ্টনমেণ্টে যাইবেন, ইহার বেশী আমরা কিছুই সন্ধান পাইলাম না—ও পাইবার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করিলাম না। বোধ হইল সাহেব এক জন মিলিটারি। গাড়ী ছাড়িয়া দিবার পর তিনি আমাদের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। আজ কাল সাহেব ও বাঙ্গালী গাড়ীতে একত্র হইলেই সর্ব্ব প্রথমে যে কথা উঠে তাহাই উঠিল। কথাটা অবশ্য Congress লইয়া। এংলো ইণ্ডিয়ান মহোদয়েরা এ পর্য্যন্ত কনগ্রেস্ সম্বন্ধে যাহা কিছু কঠোর বাক্য বাণ বর্ষণ করিয়া আসিতেছেন আমাদের কক্ষস্থ জনবুল তাহার পুনরাবৃত্তির সূত্রপাত করায় এবং এ সম্বন্ধে তাহার নানাবিধ অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। অনেকটা তর্ক বিতর্কও চলিল। কিন্তু তত্রাচ তাঁহার মন অদম্য প্রস্তরের ন্যায়। কাজেই আমরা এ প্রসঙ্গ ছাড়িয়া অন্য কাজে মনোনিবেশ করিলাম।

মোগলসরাই হইতে রেলপথে লক্ষ্ণৌএর দূরত্ব ২০৯ মাইল—এবং তথা হইতে সাজাঁহাপুর এক শত মাইলের উপর পথ। পাঁচটার পূর্ব্বে আমাদের গাড়ী আসিয়া সাহজাঁহাপুরে পৌছিল। এতক্ষণে আমরা খাস্ রোহিল্লা দেশের সীমার মধ্যে আসিলাম। ষ্টেসনের বাহিরে একা সমূহ নীরবে শিশির পাত সহ্য করিতেছিল। যদিও এখানে লক্ষ্ণৌএর মত পাল্কী গাড়ী পাওয়া যায় কিন্তু ষ্টেসনে ত এক খানিও দেখিলাম না। অগত্যা সেই কুব্জপৃষ্ঠ, ন্যুব্জ দেহ বিকৃতাকার রথের শরণ লইতে হইল।

বাহাদুরগঞ্জ আমাদের পরমাত্মীয় পূজনীয় শ্রীযুক্ত পু—বাবুর বাড়ী। তাঁহার নাম এখানে অনেকেই জানে সুতরাং বাড়ী খুঁজিতে আমাদের বড় কষ্ট হইল না। কিন্তু বাড়ীর দ্বারের সিংহ দরজা দেখিয়াই আত্মাপুরুষ চমকিল। বাড়ীটী যত বড় ফটকটী তাহার অপেক্ষা দশ গুণ বৃহৎ। ঠিক যেন একটা কেল্লার প্রবেশ দ্বার। এখানে সকল বাড়ীরই কাণ্ড এইরূপ। আর কিছু থাক না থাক দিগগজ প্রমাণ একটী প্রবেশ দ্বার তাহাতে থাকি-

প্রথানুসারে উক্ত সভায় যে সকল লোক নিয়োজিত হইয়া থাকেন তাঁহারা অযোগ্য ব্যক্তি, আমি একথা বলিতে চাই না যে তাহাদের দ্বারা দেশের কোন উপকার সাধিত হয় নাই; পক্ষান্তরে আমি একথা অবশ্য স্বীকার করিব যে সময়ে সময়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া উহাতে অনেক সুযোগ্য লোকও নিযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাদের দ্বারা আশানুরূপ মঙ্গল লাভের কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই। প্রথমতঃ তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প; দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা ভারতবর্ষের কোটি কোটি নির্ব্বাক প্রজাগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন না, সুতরাং কোন ক্রমেই তাহাদের প্রতিনিধি স্থানীয় নহেন; তৃতীয়তঃ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দরিদ্র ভারতবাসিগণের প্রকৃত অবস্থা অবগত নহেন, সুতরাং কোটি কোটি দরিদ্র প্রজার অভাব বিষয়ে তাঁহাদের সহানুভূতি থাকিলেও তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা কোন কথা বলিতে সাহস করেন না। কোটি কোটি দরিদ্র প্রজার হৃদয়ের শোণিত শোষণ পূর্ব্বক বিবিধ কর গৃহীত হইতেছে অথচ তাহাদের অনুকূলে দুইটি কথা বলে এমন লোকের সংখ্যা ব্যবস্থাপক সভায় নিতান্ত অল্প। যত দিন তাহাদের প্রাণের আশা ও অভাবের বিষয় গভর্ণমেন্টের গোচর করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভা সমূহে নিয়মিত রূপে প্রচুর পরিমাণে তাহাদের নির্ব্বাচিত সুদক্ষ প্রতিনিধি নিযুক্ত না হইবেন, ততদিন ব্যবস্থাপক সভা সুসংস্কৃত ও সম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য গভর্ণমেন্ট নির্ব্বাচনপ্রথানুসারে স্থানীয় সুদক্ষ লোকদিগকে আপন আপন ব্যবস্থাপক সভায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের সমস্ত উপনিবেশ গুলিতেও তত্রত্য স্থানীয় সুযোগ্য লোক করদাতৃ-প্রজাগণের প্রতিনিধি স্বরূপে ব্যবস্থাপক সভায় নিয়োজিত হইয়া রাজপুরুষদিগের সহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক দেশের হিতকর ব্যবস্থা ও বিধানাদি প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে আমরা হতভাগ্য বিজিত জাতি বলিয়া আমাদের ঘরের উপযুক্ত লোকদিগকে ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবার অধিকার হইতে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত!

নির্ব্বাচন-প্রথার অভাবে বিশেষতঃ আমাদের প্রতিনিধি স্থানীয় উপযুক্ত লোক ব্যবস্থাপক সভায় অধিক পরিমাণে বিদ্যমান না থাকা হেতু দেশের যে কি ঘোরতর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করা আমার সাধ্যের অতীত। দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে আপনারা সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে ব্যবস্থাপক সভা গুলির বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন একান্ত প্রার্থনীয়, এবং যত শীঘ্র উক্ত পরিবর্ত্তন সংসাধিত এবং ব্যবস্থাপক সভা গুলি অভিনব সুসংস্কৃত ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ততই মঙ্গলের বিষয়। কে না জানে গভর্ণমেন্টের দিন দিন আয় অপেক্ষা ব্যয় বাড়িয়া যাইতেছে। এই অনিয়মিত ব্যয় সঙ্কোচ করিবার জন্য কয় জন সভ্যের অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়? ব্যয়ভার সঙ্কুলানের অন্য উপায় না দেখিয়া গভর্ণমেন্টে দিন দিন নূতন নূতন কর ধার্য্য হইতেছে। লাইসেন্স ট্যাক্স, ইন্‌কম ট্যাক্স, সল্‌ট্ ট্যাক্স, পিট্রোলিয়ম ডিউটি প্রভৃতি নূতন নূতন

করভারে দরিদ্র প্রজাবর্গ দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। কে তাহাদের কাতর-ক্রন্দনে কর্ণপাত করে? বিদেশের প্রবল পরাক্রমশালী রাজগণের আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষ সুরক্ষিত রাখিবার জন্য বিশেষতঃ অসভ্য দুর্দ্দান্ত রুসিয়ার করাল গ্রাস হইতে ভারতবর্ষ রক্ষার উদ্দেশে সীমান্ত প্রদেশে রাশি রাশি সৈন্য স্থাপন, দুর্গ নির্ম্মাণ প্রভৃতি সাময়িক ব্যাপারের আয়োজনে গভর্ণমেণ্টের করপ্রাপ্ত আয়ের অধিকাংশ নিঃশেষিত হইতেছে। রুসভীতিবিহ্বল ব্যক্তিগণের মন্ত্রণায় গভর্ণমেণ্ট সৈনিক বিভাগে এই অপরিমিত ব্যয় ক্ষণ কালের জন্য অন্যায় বিবেচনা করেন না। যৎকালে এই সকল কর স্থাপিত ও বিধিবদ্ধ হইয়াছিল তখন কয়জন সভ্য এদেশবাসীগণের স্বপক্ষে একটি কথা বলিতে সাহসী হইয়াছিলেন? কয়জন লোক এদেশের কোটী কোটী বাক্-শক্তি-রহিত প্রজার দুরবস্থার বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক ঐ সকল কর স্থাপনের ঔচিত্য অনৌচিত্য আলোচনা পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টকে ধীরভাবে সুপরামর্শ দান করিয়াছিলেন?

যেদিন লবণ কর বিধিবদ্ধ হয়, সেদিন ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয় কতিপয় সুদক্ষ কৃতবিদ্য লোক সভ্য স্বরূপে উপস্থিত ছিলেন; তাঁহারা সকলেই গবর্ণমেণ্টের মনোনীত সভ্য—দরিদ্র প্রজা বর্গের প্রতিনিধি নহেন। তাঁহারা সকলেই এই কর সংস্থাপনে অভিমত দান করিয়াছিলেন—তাঁহারা যদি এদেশের কোটি কোটি দরিদ্র শ্রমজীবি প্রজার প্রকৃত অবস্থা জানিতেন এবং এই কর দ্বারা তাহাদের যে কি ভীষণ কষ্ট উপস্থিত হইবে তাহা যদি অনুভব করিতে পারিতেন তাহা হইলে তাঁহারা এই করের অযোগ্যতা প্রদর্শন পূর্ব্বক গভর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন যে এরূপ কর-স্থাপন সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অযশস্কর, কারণ উহা দরিদ্র প্রজাগণের মর্ম্মভেদী। যাঁহাদের পরামর্শ ও অনুমোদন অনুসারে এই অন্যায় কর ধার্য্য হইয়াছিল তাঁহারা সকলেই বিপুল ধনশালী—তাঁহারা রাজপ্রাসাদ সদৃশ সুদৃশ্য সুশোভিত বিশাল অট্টালিকায় বাস করেন, শত শত দাস দাসী তাঁহাদের ভোগ বিলাসের আয়োজনে সর্ব্বক্ষণ রত, প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহারা সুদৃশ্য বহুমূল্য অশ্বযানে উপবিষ্ট হইয়া রাজ পথে, উদ্যানে অথবা পার্কে সুস্নিগ্ধ সুশীতল সমীরণ সেবনে রত; তাঁহারা হতভাগ্য দরিদ্র প্রজার কষ্ট কিরূপে অনুভব করিবেন? লবণ করের ন্যায় শত শত কর স্থাপিত হইলেও তাঁহাদের কিছুই কষ্ট নাই, কিন্তু যে জীর্ণ কুটিরবাসী দরিদ্র সারাদিন ঘোরতর পরিশ্রমে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর ও একান্ত অবসন্ন হইয়া স্বীয় জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য কদাচিৎ দশ বার পয়সার সংস্থান করে, মাসে যাহার ছয় টাকা হইতে দশ টাকার ঊর্দ্ধ আয় নহে, যাহার উপর অনেকগুলি অপগণ্ডের ভরণ পোষণের ভার ন্যস্ত এবং যে অতিকষ্টে আপনার এবং অধীনস্থ স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতির জন্য কদর্য্য শাকান্ন সংস্থানেও কাতর, তাহার পক্ষে এই ঘৃণিত কর যে কি ভয়ানক ক্লেশপ্রদ, তাহা তাহার সমদশাগ্রস্ত হতভাগ্য ব্যক্তি ভিন্ন আর কে সম্যক্ রূপে অনুভব করিতে সক্ষম? এইরূপ কত সহস্র হতভাগ্য দরিদ্র প্রজা এই করের

উৎপীড়নে অবসন্ন তাহা কি তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন? অনেক দরিদ্রের অর্দ্ধ পয়সা দিয়াও লবন ক্রয়ের ক্ষমতা নাই, তাহারা এই লবণ করের প্রভাবে লবণ বিনা স্বীয় মুখের অন্ন কষ্টে গলাধঃকরণ করে, ইহাদের মধ্যে অনেকে কৃত্রিম উপায়ে লবণ প্রস্তুত করিতে ধৃত হইয়া কতই লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া থাকে! দরিদ্র প্রজার প্রতিনিধি স্থানীয় সভ্য অধিক পরিমাণে ব্যবস্থাপক সভায় নিযুক্ত থাকিলে এই অন্যায় কর বিধিবদ্ধ হইতে পারিতনা।

প্রজাবর্গের হিতৈষী অধিকসংখ্যক বে-সরকারী সভ্য এবং তাহাদের প্রতিনিধি স্থানীয় সভ্য ব্যবস্থাপক সভায় না থাকায় অবাধে কতই অন্যায় কার্য্য সাধিত হইতেছে। আমাদের দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণোদ্দেশে বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষকালে অর্থ অথবা অন্নদানে বিপন্নের অন্নকষ্ট নিবারণ ও শত শত দুরবস্থাগ্রস্ত পরিবারকে মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষার জন্য একটি দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল;—প্রজাবর্গের প্রদত্ত করে উহা পরিপুষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধের আয়োজন ও সৈনিক বিভাগের ব্যয় সম্পাদনে উক্ত ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। দুর্ভিক্ষের সময় যে অর্থের সদ্ব্যয় হইবে বলিয়া উহা গৃহীত ও সঞ্চিত হইয়াছিল, যুদ্ধের আয়োজন ও অতিরিক্ত সৈন্যসংখ্যাবর্দ্ধন জনিত অপব্যয়ে তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে! কিলজ্জা, কি পরিতাপের বিষয়!! ব্যবস্থাপক সভার অবস্থা সুসংস্কৃত হইলে কখনই এরূপ অন্যায় কার্য্য সাধিত হইতনা! এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

মহাশয় গণ, আর একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যবস্থাপক সভার সংস্কারের একান্ত আবশ্যকতা প্রদর্শন করিব। সার হেণরী হ্যারিসন্ সাহেবের নূতন মিউনিসিপ্যাল আইনে কলিকাতার অধিবাসী এবং প্রবাসী গণের কি কষ্টই উপস্থিত হইয়াছে! যেদিন এই কলঙ্কিত আইন বিধিবদ্ধ হইবার জন্য প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইয়াছিল, সেদিন যদি এদেশের প্রতিনিধি স্থানীয় কতিপয় সুদক্ষ সভ্য উক্ত সভায় বিদ্যমান থাকিতেন তাহাহইলে তাঁহারা তীব্র গম্ভীর স্বরে এই দূষিত আইনের ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেন। সার হেনরীর সাধের আইন কলিকাতাবাসিগণের পক্ষে যে কি বিষময় ফল প্রসব করিবে তাহা পূর্ব্বে কয় জন লোক বুঝিতে পারিয়াছিলেন? আজি এই ঘৃণিত আইনের অত্যাচার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। কলিকাতার প্রত্যেক গলিতে গমন করিলে কত শত দুরবস্থাগ্রস্ত পরিবারের সকাতর হাহাকারধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইবে। একদিন যে সকল পরিবার ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছিল, এখন দুর্দ্দিন বশে যাহাদের পূর্ব্বসুখের স্মৃতি মাত্র অবশিষ্ট আছে—একমাত্র ভদ্রাসন বাটী যাহাদের সম্বল, অত্যল্প আয়ে যাহাদের অতিকষ্টে দিনপাত হইতেছে, এইরূপ শত শত পরিবারের কত যুবক, বৃদ্ধ এবং স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত এই কঠোর আইনের পীড়নে নিষ্পেষিত হইতেছে, কত অনাথা বিধবার কাতর ক্রন্দন শূন্যে বিলীন হইতেছে! সেদিন টাউন্ হলের বিরাট সভাস্থলে দেশের কত শত মান্য গণ্য সুশিক্ষিত ও সমৃদ্ধিশালী লোক একত্র সম্মিলিত হইয়া এই কুৎসিৎ আইনের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন; ঐ

বিরাট সভাই আমার সাক্ষী—উহাই আমার কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করিবে। ব্যবস্থাপক সভা আমাদের আশানুরূপে সুসংস্কৃত হইলে এই ঘৃণিত মিউনিসিপাল্ আইন কখনই বিধিবদ্ধ হইত না। অতঃপর আর দুই একটি কথার উল্লেখ করিয়াই আমার বক্তব্য বিষয়ের উপসংহার করিব। মহাত্মা ব্র্যাড্‌ল সাহেবের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইবার পরেই লর্ড ক্রশ আর একখানি বিলের অবতারণা করিয়াছেন, এবং উহা যাহাতে বিধিবদ্ধ-হয় তদ্বিষয়ে তিনি তাঁহার পৃষ্ঠ পোষক ব্যক্তিগণের সহায়তার সাধ্যমত চেষ্টা পাইতেছেন। ব্র্যাড্‌ল প্রণীত পাণ্ডুলিপি ব্যর্থ করিবার উদ্দেশেই উক্ত দ্বিতীয় বিলের সৃষ্টি—উহাতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রদত্ত হইবার ব্যবস্থা নাই, মনোনয়ন প্রথার প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে সুযুক্তি আছে। উহা বিধিবদ্ধ হইলে আমাদের প্রাণের আশা পূর্ণ হইবেনা—ভারত শাসন বিষয়ক সংস্কার চিরদিন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকিবে। আমাদের পরম হিতৈষী, জাতীয় মহা সমিতির প্রধা-নতম নেতা শ্রদ্ধাস্পদ হিউম ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে গমনের পূর্ব্বে এই অসম্পূর্ণ ব্যবস্থার পাণ্ডুলিপির মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া ঘোরতর নৈরাশ্যের সহিত একান্ত ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বলিয়াছিলেন, আমরা রুটির জন্য চীৎকার করিয়াছিলাম কিন্তু হায়! আমাদের প্রতি রুটির পরিবর্ত্তে প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হইয়াছে!

লর্ড ক্রশের বিল ঠিক প্রস্তর সদৃশ অকিঞ্চিৎকর না হইলেও প্রত্যেক হৃদয়বান ব্যক্তি একথা অবশ্য স্বীকার করিবেন যে নির্ব্বাচন প্রথাবিষয়ক ব্যবস্থার অভাবে উহা দ্বারা দেশের কোন বিশেষ ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই। আমাদের পরম শত্রু পায়োনিয়র' ও ইংলিশম্যান' প্রভৃতি সংবাদ পত্র সম্পাদকগণ এবং তাঁহাদের ভক্ত বৃন্দ তারস্বরে ব্রাডল প্রণীত বিলের গভীর নিন্দাবাদ এবং লর্ডক্রশের বিলের বিশেষ স্তুতি গান পূর্ব্বক কত কথাই বলিতেছেন—এই সম্প্রদায়ের লোক আমাদের প্রাণের আশা ভরসা ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া আমাদের ন্যায়ানুমোদিত প্রার্থনা বালকের অসার আবদার বিবেচনায় তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের জন্য গভর্ণমেণ্টকে প্রতিক্ষণ পরামর্শ দান করিতেছেন। ইঁহারাই বলিয়া থাকেন "ভারতবর্ষ অস্ত্র বলে অধিকৃত হইয়াছে, চির দিন উহা অস্ত্র বলেই শাসিত হইবে—বিজিত দুর্ব্বল জাতির আবার রাজনৈতিক অধিকার লাভের বাসনা কেন?" ইহাদের কথা যে কত অসার তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করা অনাবশ্যক। অস্ত্রবলে ও পশুবলে একটি দেশ নিঃসন্দেহ অধিকৃত হইতে পারে—বিশাল ভারতবর্ষ অস্ত্রবলে অধিকৃত হইয়াছে কিনা তাহার মীমাংসা এক্ষণকার অভিপ্রেত নহে—কিন্তু একটি সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের কোটিকোটি নরনারীর হৃদয় কখনই অস্ত্র বলে অধিকৃত হইতে পারে না। কোন বিজিত জাতীয় কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়ের প্রতি রাজকীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন ও সদ্ব্যবহারের পরিচয় দান একান্ত আবশ্যক—তাহাদের সুখ দুঃখে অকপট সমবেদনা প্রকাশ, তাহাদের অভাব নিবারণ, তাহাদের প্রতি সরল ভাবে বিশ্বাস স্থাপন এবং রাজ্য শাসন বিষয়ে যোগ্যতা অনুসারে তাহাদিগকে ক্ষমতা দান করিলে বিজিত দেশ পরকীয় শাস-

নের কঠোরতা বিস্মৃত হইয়া উহাকে স্বায়ত্ব শাসন জ্ঞানে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বিদেশীয় শাসনকর্ত্তাগণের নিকট অবনত হইয়া পড়িবে; তখন বিদেশীয় প্রভুশক্তি স্বতঃই সমগ্র বিজিত দেশ মধ্যে অটল ভাবে চিরস্থায়ী হইবে। উদার ইংলণ্ড এ দেশের ন্যায্য প্রার্থনায় কর্ণপাত পূর্ব্বক দেশব্যাপী বর্ত্তমান অসন্তোষ ও অভাব সযত্নে বিদূরিত করিলে ইংলণ্ডের প্রভুত্ব এদেশে চিরকাল অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজিত রহিবে। এ দেশের পঁচিশ কোটি নরনারী সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকিলে রুসিয়ার সাধ্য কি যে ইংলণ্ডকে আফগান সীমান্ত প্রদেশ হইতে ভ্রুকুটি প্রদর্শন করে ?

বড় দুঃখের বিষয় এই যে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী লর্ড সলিসব্যারি প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভা এবং নির্ব্বাচন প্রথা ভারতবর্ষের পক্ষে অমঙ্গলজনক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় পূর্ব্বদেশে পাশ্চাত্য প্রথার ফল সন্তোষজনক হইতে পারে না। তুরস্ক ও মিসর প্রভৃতি দেশে উহার ফল আশানুরূপ সন্তোষজনক হয় নাই বলিয়া তিনি ঐরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তুরস্ক ও মিসরের অবস্থার সহিত ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার কোন তুলনাই যুক্তি বিরুদ্ধ। ইংলণ্ডের উজ্জ্বল আলোকে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে—পঞ্চাশ বর্ষ ব্যাপী সুশিক্ষা ও সুদৃষ্টান্তে ভারতের প্রতিভাশালী লোকের ক্ষমতা শত গুণে বিকশিত হইয়াছে। এই সকল সুদক্ষ লোকের বিদ্যা বুদ্ধি ও ক্ষমতার উপর সান্দিহান হওয়া বর্ত্তমান রাজ মন্ত্রীর পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এবং ভারত প্রত্যাগত সুযোগ্য শাসনকর্ত্তাগণ এক বাক্যে ইহাঁদের কার্য্য ক্ষমতার বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন।

এই জন্য সাহস করিয়া বলা যায় যে, এক্ষণে এদেশে এমন সুদিন আসিয়াছে, যাহাতে শিক্ষিত ভারতবাসিগণ নির্ব্বাচিত প্রথানুসারে ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি-সভ্য নিযুক্ত হইবার সর্ব্বথা উপযুক্ত। মহামতি ব্রাডল ব্যবস্থাপক সভা গুলির সংস্কার জন্য যে উদার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা বিধিবদ্ধ হইলে এদেশের সৌভাগ্য পরিবর্দ্ধিত ও দেশের অধিবাসিগণের সুখ শান্তি শত শাখায় বিস্তৃত হইবে, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

গীতমালা।

কল্লোলিনী।

মরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকথা মত,
হৃদয়ের বাঁধন টুটিয়া,
মরমের দিশাহারা গানগুলি ল'য়ে
কল্লোলিনী চলেছে ছুটিয়া।

মরমের পাশে শত তার
জ্বলিতেছে চিতানল ছায়া।
জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিমান লয়ে
ভস্মসাৎ হইতেছে কায়া।

শুকতারা সুগভীর ফেলিয়া নিশ্বাস
ডুবে যায় আকাশের কোলে।
তটিনীর শ্রান্তকায় শিহরি উঠিছে
ছায়া দেখে আপনার জলে।

স্তব্ধ জগতের মাঝে পরাণের ছায়া
থেকে থেকে উঠিছে চমকি।
মরণের চিরস্থির শুভ্র হাসি খানি
জেগে ওঠে জগৎ আলোকি।

স্থির ছায়া পড়ে তার তটিনীর কোলে
জগৎটা ডুবে যায় ধীরে।
শ্মশানের ছায়াময় উষার আলোকে
কেঁদে কেঁদে গৃহে যায় ফিরে।

বহে যায় কল্লোলিনী মরণেরে ল'য়ে
রজনীর ছুঁইয়া নিশ্বাস
পরাণের গীতটুকু মাখিয়া হৃদয়ে
ফুলেদের লইয়া সুবাস।

মৃতপ্রায় জগতের কাহিনীর মত
আপনাতে আপনি মিলায়।
জগতের মরমের থেমে যায় গান
ক্ষুদ্র প্রাণ ভেঙ্গে চূরে যায়।

শ্রীবলেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

কে।

শুনিয়াছি জ্যোৎস্নালোকে কোকিল কূজন,
মধ্যাহ্ন মেঘের পাশে চাতকের তান,
শুনেছি নিরাশ হৃদে আশার গুঞ্জন,
বন্ধুহীন দূরদেশে স্বদেশীর গান।

শুনেছি বীণার ধ্বনি গভীর নিশায়,
জাহ্নবীর মধুমাখা পবিত্র নিঃস্বন,
শুনেছি ত সামবেদ ললিত ভাষায়,
প্রণয়ের প্রাণ খোলা প্রিয় সম্ভাষণ।

একি তৃষ্ণা! একি ক্ষুধা! অনন্তেরই তরে!
অজানিত সৌরভের মধুর নিশ্বাসে।
কি আনন্দ ঢেলে দেয় হৃদয় নিবাসে!
কি মত্ততা এনে দেয় শোকতপ্ত নরে!

কোথা সেই মনোচোর—না জানি কোথায়,
লুকায়ে নীরব প্রেমে ভাল বাসে মোরে;
সুষুপ্তির অন্তরালে হাত ছুটি ধ'রে,
বলে যেন জেগে ওগো ভুলনা আমায়'!

অনন্ত বিস্তৃত অহো! তার প্রেম রাশি,
স্বর্গ মর্ত্ত্য সমভাবে করি আলিঙ্গন;
উজলিছে দশদিক কি যে সে নয়ন!,
মধুর কৌমুদী হ'তে মধুময় হাসি।

নিদ্রিত শিশুর পাশে জননী যেমন,
প্রাণ ভোরে বালকেরে শত চুমি খায়,
কভু বা ক্রোড়েতে করি যেন সে আমায়,
প্রাণ ভোরে ভালবেসে ডাকে অনুক্ষণ।

লুকান জননী কিরে কেহ বুঝি হবে!
তাই এত সঙ্গোপনে এসে চলে যায়;
তাই বুঝি দেখা হ'লে এত চুমি খায়;
একি ধারা স্নেহ করা নীরবে নীরবে।

নিরাশ্রয় জীবাত্মার কেহ বুঝি হবে।
হবে বা সে মানবের অতৃপ্ত প্রণয়!
ধরিতে না পারি তবু চির-পরিচয়!
তাই বুঝি ডাকে সে গো এত স্নেহ রবে।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী।

গীতধ্বনি। *

রয়েছি বসি দিবস নিশি
একেলা হেথা বিজনে,
একটি করি যেতেছে ঝরি
কত না আশা পরাণে।
আকাশ পটে উজলি উঠে
চমকি যায় বিজুরি,
অবশ আঁখি! চাহিয়া থাকি
হৃদয় রহে থমকি।
শ্রাবণ ধারা আপনাহারা
ঝরে হায় অনুক্ষণে,
নয়ন জল কিসেতে বল
বাঁধা গো রবে নয়নে।
দিবস নিশি রয়েছি বসি
আপনাহারা চাহিয়ে,

সুদূরে দূরে মধুর সুরে
কে ঐ গেলগো গাহিয়ে ?
তাহার তানে আমার প্রাণে
জড়ায়ে গেল সহসা,
কিরণ রাশি নাশিল আসি
প্রাণের ঘন তমসা।
উথলি উঠে আবেগে ছুটে
পরাণের পারাবার,
অবশ প্রাণ সেই যে তান
কভু নাহি শুনে আর।
স্বপন প্রায় জাগিছে হায়
আধেক স্মৃতি মাঝারে,
এমন ধারা পাগল পারা
বল্ কে করে আমারে ?

শ্রীসরোজ কুমারী দেবী।

রাধিকা।

সখি, এমন চাঁদিনী নিশি
এমন চাঁদের হাসি,
কেন লো শ্যামের বাঁশী
বাজেনা বিপিনে আজ ?
এমন বসন্ত ভরা
জ্যোছনা প্লাবিত ধরা
কেন লো মলিন পারা ?
পরেনি কুসুম সাজ ?
বাঁশীর সুরভি তুলে
সুখভরে ফুলে ফুলে
পড়েনা গায়েতে ঢ'লে
কেন লো বসন্ত বায় ?

যমুনা স্বপনে ভুলে
উজানে লহরী তুলে
কেন লো আসেনা কূলে
ঘুমাতে শ্যামের পায় ?
শ্যামের হৃদয় রাণী,
রাধা আজ পাগলিনী,
কোথা শ্যাম গুণমণি ?
আজ কেন নিরদয় ?
বিনে সে মদির তান,
বাঁশীর মধুর গান,
আকুল রাধার প্রাণ,
ব্রজ যে আঁধারে হায় !
শুনেছি সে মথুরায়,
যালো সখি, দেখে আয়,
তেমনি কুসুম ভায়
নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে তথা ?
এমনি জ্যোছনা কিরে
সেখানে উজলে ধীরে ?
সেথা কি সমীর ফিরে
গাহিয়া প্রেমের কথা ?
সখি চির প্রেমময়
শ্যামের যে সে হৃদয়,
কোন ভাগ্যবতী হায়
হৃদয়ের রাণী তাঁর ?
দেখে আয় সহচরী
ডাকে কার নাম ধরি
মোহময় সে বাঁশরী
কোন কূলে যমুনার ?
কে সখি, ধরেছে ফাঁদে
আমার প্রাণের চাঁদে ?
কোথা সে বাঁশরী কাঁদে
কাহার চরণ তলে ?

রাধিকার আশা আর
নহে কি গো ফিরিবার,
ডুবিয়াছে যমুনার
চির বিরহের জলে ?

শ্রীপ্রমীলা বসু।

ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, অশ্ব ও তরবারি।

সম্রাট সেকন্দর লোদির অমাত্য আসফ খাঁ কোন কার্য্য উপলক্ষে বুন্দিনগরে অবস্থিতি-কালে মহারাজ দেবসিংহের পাথার নামক মনোহর অশ্ব দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া দিল্লি ফিরিয়া কুক্ষণে সম্রাটকে বলিয়াছিলেন "তেমন অশ্ব সম্রাটের অশ্বশালেও নাই। সম্রাট অশ্ববাতুল-ব্যক্তি, বহুমূল্য দিয়া বহুদূর দেশ হহতে তিনি অশ্ব আনাইয়া থাকেন,—সুতরাং তাঁহার ভাণ্ডারে সেরূপ অশ্ব নাই, এই কথাটা তাঁহার এতই অসঙ্গত, অসম্ভব বোধ হইল যে তিনি ইহাতে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রীর কথার প্রমাণ দেখিতে চাহিলেন। মহম্মদ খাঁ দেবসিংহকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে প্রেরিত হইল।

অমাত্যগণ পরিবেষ্টিত সম্রাট সেকেন্দর লোদি স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট। দাসেরা চামর ব্যজন করিতেছে, স্তাবকেরা স্তুতিবাদ গাহিতেছে, পারিষদবর্গ প্রিয়বাক্যে মনোরঞ্জন করি-তেছে, রাজকর্ম্মচারী মহম্মদ খাঁ এই সময় আসিয়া যথারীতি অভিবাদন করিয়া সিংহাসন-সমীপে দাঁড়াইলেন। সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন "কি মহম্মদ, বুন্দিরাজের খবর কি ?"

মহম্মদ উত্তর করিলেন "বাদশার প্রেরিত উপঢৌকনে জাঁহাপনার অনুগ্রহলাভে রাজা আপনাকে সম্মানিত জ্ঞানে আনন্দিত হইয়াছেন এবং আপনার আদেশানুসারে শীঘ্রই এখানে উপস্থিত হইবেন"।

সম্রাট অমাত্য আসফ খাঁর প্রতি চাহিয়া বলিলেন "কি আসফখাঁ, বুন্দিরাজের অশ্ব ত এইবার দেখা যাইবে, এখনও কি তোমার সেই কথা ?"

আঁসফখাঁ মাথা নোয়াইয়া বলিলেন "হুজুর দাসের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। প্রাণ যায় সেও স্বীকার, আমার এখনও সেই কথা। বুঁন্দিরাজের অশ্বের ন্যায় অশ্ব আপনার একটীও নাই।"

সম্রাট বলিলেন "আমার ঘোড়া 'নবাব' ও তাহার মত নহে ?"

আসফ ঘাড় নাড়িয়া উত্তর করিলেন 'না'।

সম্রাট আবার বলিলেন "পারস্য-রাজ গত বৎসর যে ঘোড়া আমাকে উপহার দিয়াছেন তাহা দেখিয়াছ?"

আসফখাঁ বলিলেন "দেখিয়াছি, আপনার সব অশ্বই আমি দেখিয়াছি, বুন্দিরাজের অশ্বের কেহই সমকক্ষ নহে"

সম্রাট বলিলেন "আচ্ছা শীঘ্রই দেখা যাইবে। মনে থাকে তোমার কথা মিথ্যা প্রমাণ হইলে তোমার প্রাণ দণ্ড হইবে।"

আসফ খাঁ বলিলেন "হুজুরের যেরূপ ইচ্ছা"।

(২)

আজ দুই দিন বুন্দিরাজ দেবসিংহ দিল্লী নগরে আসিয়াছেন সম্রাট তাঁহাকে যথোচিত সমাদর অভ্যর্থনা করিতেছেন। প্রতিদিন কোন না কোন পারিষদ তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিতে আসেন। আজ রাজভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে "অমাত্য আসফখাঁ আপনার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছুক"

রাজা বলিলেন আসিতে বল"। আসফখাঁ আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা বলিলেন "কি সংবাদ?"

আসফখাঁ বলিলেন "সম্রাট আপনাকে দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আপনার যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় তাহা দেখিতে আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন "সম্রাটের যথেষ্ট অনুগ্রহ—আমার কোন কষ্টই নাই তাঁহার অনুগ্রহ লাভে আমি বিশেষ বাধিত"

আসফখাঁ তখন বলিলেন "আপনার অশ্ব পাথারকে দেখিয়া সম্রাট মোহিত হইয়াছেন।"

পাথার বুঁদিরাজের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু, তাহার প্রশংসা শুনিয়া বুঁদিরাজ মহা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "সেও বাদশার অনুগ্রহ"

আসফখাঁ আবার বলিলেন "ঘোড়াটী বাদশার অত্যন্ত পসন্দ হইয়াছে।" ভাবিলেন দেবসিংহ এই ইঙ্গিত বুঝিয়া নিজেই সম্রাটকে অশ্ব উপহার দিতে চাহিবেন। কিন্তু আসফ খাঁ ভুল বুঝিয়াছিলেন। দেবসিংহ বলিলেন "জহরীর প্রশংসাতেই জহরের মূল্য"।

আসফ খাঁ তখন মাথা চুলকাইয়া নত মুখে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন "সম্রাট অশ্বটি কিনিতে চাহেন—কত মূল্য লইবেন"?

বুঁদিরাজ ক্রুদ্ধ হইলেন—বলিলেন "বাদশাহাকে বলিবেন আমি পাথারকে বিক্রয় করিবনা"।

আসফখাঁ বলিলেন "মহারাজ, সম্রাটকে এ উত্তর দেওয়া কি বিবেচনা-সঙ্গত? ইচ্ছায় না দিলে সম্রাট বলে লইবেন"

এই অপমান-বাক্যে ক্ষত্রিয় শোণিত উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বুঁদিরাজ উত্তর করিলেন

"এ দেহে প্রাণ থাকিতে সম্রাট পাথারকে পাইবেন না। সম্রাটকে বলিবেন ক্ষত্রিয় মৃত্যু ভয় করে না।

আসফখাঁ একটু হাসিয়া বলিলেন "মহারাজ দেহে প্রাণ থাকিতে যেন পাথারকে দিবেন না, কিন্তু দেহে প্রাণ রাখিবেন কতক্ষণ? সিংহের বিবরে বসিয়া সিংহের সহিত যুদ্ধ কি সম্ভব? কেন অনর্থক প্রাণ হারাইবেন, একটু বিবেচনা করিয়া উত্তর দিন।"

বুঁদিরাজ এ কথার সত্যতা অনুভব করিলেন। কি করিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া কিছুক্ষণ পরে আসফখাঁ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ, সম্রাটকে কি বলিব?"

বুঁদিরাজ "বলিলেন আচ্ছা ১৫ দিনের মধ্যে আমি অশ্ব লইয়া মহারাজের নিকট উপস্থিত হইব।"

(৩)

মন্ত্রী চলিয়া গেলেন,—বুঁদিরাজ বিষণ্ণ মনে আপনার উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রাণাধিক পাথারকে দিতে পারিবেন না কিন্তু না দিলেই বা উপায় কি? আসফখাঁ ঠিক বলিয়াছেন, ইচ্ছায় না দিলে সম্রাট বলে লইবেন। তিনি সিংহের কবলে আসিয়া পড়িয়াছেন। পলাইবার উপায় নাই। নিজে একাকী পাথারকে লইয়া গুপ্তভাবে পলাইতে পারেন কিন্তু তাহাহইলে কুমার সমর্ষির দশা তাঁহার সৈন্যবর্গের দশা কি হইবে? সম্রাটের ক্রোধে কি তাহারা রক্ষা পাইবে? তাহাদের উদ্ধারের উপায় স্থির করিবার জন্যই রাজা ১৫ দিন সময় চাহিয়াছেন কিন্তু ১৫ দিনে মুক্তির কি উপায় পাইবেন? দেবসিংহ নিরুপায় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন. এই সময় কুমার সমর্ষি আসিয়া বলিলেন—, "সম্রাট পুত্র বিবাহ করিতে যাইবেন আমাকে সঙ্গে যাইতে বলিতেছেন,"

রাজার মুখ এই কথায় সহসা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল সৌৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কবে যাইতে হইবে, বিবাহ কবে?"

কুমার বলিলেন "বিবাহের আর এক মাস আছে মাত্র। ১৫ দিনের মধ্যেই যাত্রা করিতে হইবে।"

রাজার নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল বিষণ্ণমুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল তিনি উদ্ধারের এক উপায় দেখিলেন। পুত্রকে আসফখাঁ কথিত সম্রাটের ঘৃণ্য প্রস্তাব আনুপূর্ব্বিক বলিয়া বলিলেন—"বৎস, সম্রাট পুত্র যে তোমাকে তাঁহার সঙ্গে লইতে চাহিয়াছেন ইহাতে বিধাতার হস্ত দেখিতেছি। নহিলে আমাদের উদ্ধারের অন্য উপায় ছিলনা। তুমি যুবরাজের সঙ্গে অধিকাংশ সৈন্য লইয়া নগর পরিত্যাগ কর এবং যুবরাজের সঙ্গে যাই বার জন্য নূতন যে সেনাসংগ্রহ হইতেছে আমাদের অবশিষ্ট সেনাবর্গ মুসলমান বেশে সেই সৈন্য দলে ভুক্ত হইয়া নগর পরিত্যাগ করুক। তাহার পর আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া তোমাদের অনুসরণ করিব।"

(৪)

বুঁদিরাজের সৈন্য সামন্ত পুত্র সকলে সম্রাট পুত্রের সহিত চলিয়া গিয়াছে! বুঁদিরাজ ইচ্ছা করিলে পলাইতে পারিতেন কিন্তু সম্রাটকে কথা দিয়াছেন ১৫ দিনের দিন অশ্ব লইয়া উপস্থিত হইবেন তাই এখনও প্রাণাধিক পাথারকে লইয়া আপনি বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। আজ বুঁদিরাজ নিজের কথামত পাথারকে লইয়া সম্রাট ভবনে চলিলেন। রাজা দ্বারে আসিয়া ভৃত্যকে বলিলেন "সম্রাটকে সংবাদ দাও, অশ্ব লইয়া বুঁদিরাজ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন"। সম্রাটও উৎসুকচিত্তে বুঁদিরাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন্। পাথারকে দেখিয়া অবধি সম্রাট তাহাকে অধিকার করিতে লোলুপ। আসফ খাঁর কথা ঠিক! সম্রাটের বাস্তবিক অমন ঘোড়া নাই। আসফ খাঁর প্রাণদণ্ড রহিত হইল তাহার পরিবর্ত্তে দেবসিংহের নিকট হইতে ঘোড়া লইয়া আসিবার অনুমতি হইল। আসফখাঁ দেবসিংহের নিকট হইতে আসিয়া তাঁহার প্রদত্ত উত্তর প্রদান করিলেন। ১৫ দিন সম্রাটের বড় দীর্ঘ মনে হইল। আসফখাঁর অনুরোধে এই কয়েক দিন কোন রকমে ধৈর্য্য ধরিয়া ছিলেন আজ শেষদিন আর ধৈর্য্য ধরিতেছে না—কখন বুঁদিরাজ আসিবেন তাহাই ভাবিতেছেন ভৃত্য এমন সময় আসিয়া বুঁদিরাজের আগমন সংবাদ দিবা মাত্র মহাহর্ষ্যে সম্রাট স্বয়ং বুঁদিরাজকে অভ্যর্থনা করিতে বাহির হইয়া আসিলেন। বুঁদিরাজ অভিবাদন করিয়া বলিলেন "আমি আমার কথামত অশ্ব লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি"।

সম্রাট অশ্ব দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "আপনার উপহারে অত্যন্ত প্রীত হইলাম। আমি আপনাকে যথোযোগ্য পুরস্কার দিব। রাজপুতানার আপনিই অধীশ্বর হইবেন।"

সম্রাটের কথায় কর্ণপাত না করিয়া দেবসিংহ বলিলেন "বাদশাহা আমার একটা কথা শুনুন, মনে রাখিবেন—রাজপুতের নিকট তিনটী জিনিস কখন চাহিবেন না, স্ত্রী অশ্ব ও তরবারি।"

এই কথা বলিয়া দেবসিংহ অশ্ব ধাবিত করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

প্রাচীন সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য। *

(১) মৃচ্ছকটিক (প্রকরণ)।

সংস্কৃত ভাষায় যে সমস্ত প্রাচীন দৃশ্যকাব্যের নাম শুনিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে ঋষি প্রবর ভরতপ্রণীত "লক্ষ্মী স্বয়ম্বর" নাটকই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই প্রকার কিম্বদন্তী আছে যে, মহর্ষি ভরত, দেব সভায় অভিনীত হইবার জন্য সর্ব্ব প্রথমে এই দৃশ্যকাব্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। এবং তাঁহার ও দেবর্ষি নারদের তত্ত্বাবধানে চিত্ররথ প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব ও উর্ব্বশী মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাদিগের সাহায্যে এই দৃশ্যকাব্য দেবসভায় অভিনীত হইত। সুতরাং কলস্বনা প্রসন্ন সলিলা মন্দাকিনীর ন্যায় দৃশ্যকাব্যের জন্মস্থানও দেবলোক।

লক্ষ্মী-স্বয়ম্বরার উল্লিখিত বিষয়টী কি তাহা বিবৃত করা আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ভুক্ত নহে। এই দৃশ্যকাব্য সৃষ্টির অব্যবহিত পরে আমরা আর কোন প্রাচীন নাটকের নামোল্লেখ দেখিতে পাই না। এই প্রকার নাটকাভিনয়, ত্রিদিববাসীগণের সম্পূর্ণ মনোরঞ্জক হইলে মহর্ষি ভরত ইহাকে কলাবিদ্যা ও বিভিন্ন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া নাট্য শাস্ত্রকে আরও সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর করিবার জন্য এতৎ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন।

ইহার পর আর দুইখানি প্রাচীন অথচ "লক্ষ্মী স্বয়ম্বর" অপেক্ষা আধুনিক দৃশ্যকাব্যের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের নাম "নাগানন্দ" ও "মৃচ্ছকটিক"। "নাগানন্দ" সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার রহিল এক্ষণে বর্ত্তমান প্রস্তাবে মৃচ্ছকটিকেরই আলোচনা করা যাউক। কাব্যাংশে, নাগানন্দ অপেক্ষা মৃচ্ছকটিকের উৎকর্ষতা সর্ব্ববাদী-সম্মত।

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের মধ্যে আজও যে যে গুলি কালের ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত উপেক্ষা করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান আছে তাহাদের মধ্যে মৃচ্ছ কটিকের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন প্রকার মতদ্বৈধ নাই। শূদ্রক নামে একজন নরপতি এই নাটকের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। শূদ্রকের পরিচয় স্থলে আমরা মৃচ্ছকটিকের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিব। শূদ্রক রাজা কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ও তিনি এই গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা কিনা এ সম্বন্ধে যে সামান্য মত বিভিন্নতা ঘটিয়াছে ঐ স্থলে তাহারও সাধ্যমত মীমাংসা করা যাইবে।

ভরত-ঋষি, ভারতীয় নাট্য শাস্ত্রের মুল সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ করিবার পর মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি পুস্তকের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। কেননা ইহার মুল ঘটনা—বীজ, সন্ধি প্রভৃতি সমস্তই

---

* এই শীর্ষক-প্রবন্ধে, "নাগানন্দ" "উত্তর রাম চরিত" "অভিজ্ঞান শকুন্তল" প্রভৃতি ক্রমশঃ আলোচিত হইবে।

ভরতের নাট্য শাস্ত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে অনুপ্রাণিত। মহর্ষি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের সূত্রানুসারে ধরিতে গেলে মৃচ্ছকটিক নাটক শ্রেণী-পরিভুক্ত না হইয়া "প্রকরণের" মধ্যে আসিয়া পড়ে। এক্ষণে নাটক ও প্রকরণের মধ্যে মর্য্যাগত বিভিন্নতা কি তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

মহর্ষি ভরত প্রণীত নাট্য শাস্ত্রের নিয়মানুসারে এবং প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের মতে কাব্য সমূহ সাধারণতঃ দৃশ্য ও শ্রাব্য দুই ভাগে বিভক্ত।* শ্রাব্য কাব্যের ভাব বা মর্ম্ম পাঠ করিয়াই বুঝিতে পারা যায় কিন্তু দৃশ্যকাব্য সম্বন্ধে ঠিক্ ইহার বিপরীত। কেবল পাঠ দ্বারা ইহার রস, ভাব, অর্থ প্রভৃতি সম্যক পরিজ্ঞাত হয় না; পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার সাহায্যে সেই অধীত বিষয়গুলির অভিনয় কার্য্য দেখিতে কৌতূহল জন্মে। শ্রাব্য কাব্যের ভাবোপলব্ধি কেবল মাত্র শ্রবণে এবং দৃশ্য কাব্যের ভাবোপলব্ধি অভিনয় দর্শনে। দৃশ্যকাব্য আবার, রূপক ও উপরূপক ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। রূপক আবার দশবিধ; † যথা নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যয়োগ, সমবকার, ডিম, ইহামৃগ, অঙ্ক, বীথি, ও প্রহসন। উপরূপকের আবার অষ্টাদশবিধ বিভাগ আছে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় দৃশ্যকাব্যের নাটক ও প্রহসন ছাড়া আর কোন বিশেষ বিভাগ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

উল্লিখিত, রূপক ও উপরূপক বিভাগের প্রত্যেক গুলির সূত্র ও উদাহরণ নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতে গেলে বর্ত্তমান প্রস্তাবের অতিশয় বাহুল্য হইয়া পড়ে বলিয়া আমরা সংক্ষেপে, কেবলমাত্র সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে, নাটক ও প্রকরণের মধ্যে যে পার্থক্যটুকু আছে তাহাই দেখাইব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মৃচ্ছকটিক নাটক নহে প্রকরণ শ্রেণী-ভুক্ত। বাঙ্গালায় সকল শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যই নাটক সেই জন্য বাঙ্গলায় নাটক ও প্রকরণের বিভিন্নতা দেখাইতে একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। নাটক দৃশ্যকাব্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুরস, সুবাস, সুস্নিগ্ধ ফল, প্রকরণ তাহার নিম্নে। নাটক অভ্রভেদী তুঙ্গ শৃঙ্গ মহাগিরি, প্রকরণ ক্ষুদ্র পর্ব্বত। নাটক পূর্ণবসন্ত ও পূর্ণশরতের মধুরতাময়ী মিশ্রণভাব সম্পন্ন,—প্রকরণ কেবল বসন্ত। নাটক—সুরভি সম্ভার মন্দার মালা, প্রকরণ—কমল-হার। এককথায় নাটক হইতে প্রকরণ নিম্ন শ্রেণীর কাব্য। কিন্তু এ পার্থক্য কোথা হইতে সমুদ্ভূত? এ পার্থক্যের মূল-সন্ধি, নায়ক নায়িকা নির্ব্বাচন, ঘটনা বর্ণন ও রস প্রবণতার মধ্যে অবস্থিত। নাটকের

---

* দৃশ্য শ্রব্যত্বভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধামতং।
দৃশ্য তত্রাভিনেয়ং যৎরূপায়োপাত্ত রূপকম্॥ সাহিত্য দর্পনম্।

† নাটকস্যাৎ প্রকরণং ব্যায়োগহঙ্ক স্তথা ডিমঃ—ইহামৃগ প্রহসণং ভাণ সমবকারক বীথীতি ভরত প্রাহনাট্যেষু দশরূপকং॥ গোষ্ঠী সংলাপ শিল্পানি ভানী হল্লীশ রাসকৌ, উল্লাপক, শ্রীগদিত প্রস্থানং, নাট্য রাসকং। দুর্ঘল্লিকা লাসিকা চ, কাব্যঞ্চেত্যুপরূপকং—স্যাৎ সপ্তদশ সংখণ্ড লক্ষণন্তু এ কথ্যতে। সাহিত্য দর্পনম।

নায়ক হইতে গেলে কোন বিখ্যাত বংশীয়, এবং ধীরোদাত্ত, ও দিব্যাদিব্য এই দুই প্রকৃতির মধ্যে কোন একটি বিশিষ্ট রাজা, রাজসুত, বা রাজর্ষি বা কোন অবতার ভাব-প্রাপ্ত, দেব-যোনী হওয়া চাই। কিন্তু প্রকরণে নায়ক-নির্ব্বাচন-প্রথা অন্য প্রকার। রাজা, রাজর্ষি বা দেবভাবাপন্ন আদর্শ মনুষ্যের পরিবর্ত্তে ইহার নায়ক ব্রাহ্মণ, বণিক বা অমাত্য হইবে। * এই নায়ক ধীর প্রশান্ত গুণ বিশিষ্ট † এবং সাপার ধর্ম্মাক্রান্ত ‡ হওয়া চাই। তার পর নায়িকা নির্ব্বাচন। নাটকের নায়িকা—নায়কেরই প্রকৃতির অনুরূপ হইবে। সেই নায়িকা সর্ব্বাংশে, উচ্চভাবসম্পন্না, গরীয়সী প্রকৃতিবিশিষ্টা সৎকুলোদ্ভবা ও সৎধর্ম্মাক্রান্তা। কিন্তু প্রকরণের নায়িকা—কখন ও বা কুলজা, কখন ও বা গণিকা কখন ও বা কুলজা ও গণিকা দুইই হইতে পারে। § এই নিমিত্ত প্রকরণে নায়ক নির্ব্বাচন স্থলে, উল্লিখিত মুল সূত্রানুসারে মালতী মাধবে—অমাত্য নায়ক, 'পুষ্পভূষিতে' বণিক নায়ক, ও মৃচ্ছকটিকে ব্রাহ্মণ নায়কের অবতারনা করা হইয়াছে। এবং নায়িকা স্থলে—পুষ্পভূষিতায় কুলস্ত্রী, মৃচ্ছকটিকে গণিকা, এবং বাসবদত্তায় বারবণিতাকে নায়িকা শ্রেণী ভুক্ত করা হইয়াছে।

এক্ষণে নাটক ও প্রকরণগত-ঘটনা-বৃত্তান্ত আলোচনা করা যাউক। নাটকের ঘটনা সাধারণত পুরাণ ও ইতিহাস মূলক-সত্য ভাবাশ্রয়ী কার্য্য কলাপ লইয়া সংবদ্ধ হয়। অধি-

---

* ভবেৎ প্রকরণে বৃত্তং লৌকিকং কবি-কল্পিতং
শৃঙ্গারো হঙ্গী, নায়কস্তু, বিপ্রমাত্যোথবা বণিক ॥
ত্রিবর্গ ধর্ম্ম কামার্থ পরো ধীর প্রশান্তকঃ।

বিপ্রনায়কং যথা মৃচ্ছ কটিকং—অমাত্য নায়কং যথা মাল্তী মাধব বণিক নায়কং যথা পুষ্প ভূষিতং।

† ধীরোদাত্ত, ধীর প্রশান্ত, ধীরোদ্ধত, ও দিব্যাদিব্য—এই চারিটী প্রকার ভেদে নায়ক চতুর্ব্বিধ। যিনি ক্ষমাশীল, গম্ভীর হিতাহিত জ্ঞান শালী, আত্ম শ্লাঘা হীন, শোক দুঃখ হর্ষ, মোহ ক্রোধ, প্রভৃতিতে অনাভিভূত স্বভাব, স্থির প্রকৃতি, ধীরভাবাপন্ন, গর্ব্বিত (অথচ সেই ভাব বিনয়াচ্ছন্ন) দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং দৃঢ় ব্রত, তাঁহাকে ধীরোদাত্ত প্রকৃতি-বিশিষ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নায়ক বলা যায়। যথা রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি। যিনি অনেকাংশে এই উচ্চ প্রকৃতির নায়ক তাঁহাকে ধীর প্রশান্ত নায়ক বলে। যথা—মাধব। যিনি মায়াবী, প্রচণ্ড, অহঙ্কার, ক্রোধ ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ আত্মশ্লাঘানিরত, চপল ও উদ্ধত প্রকৃতিবিশিষ্ট তাঁহাকে ধীরোদ্ধত নায়ক বলে। যথা, ভীমসেন। দেবতা হইয়াও যিনি মনুষ্যের ন্যায় ভাবাক্রান্ত তাঁহাকে দিব্যাদিব্য বলে। রামচন্দ্র একাধারে ধীরোদত্ত ও দিব্যাদিব্য গুণ বিশিষ্ট নায়ক বলিয়া কথিত হইতে পারেন।

‡ যিনি স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, ভোগের এবং সদ্ব্যয়ের জন্য বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করেন পুত্র লাভের জন্য কাম রিপুকে চরিতার্থ করেন তাঁহাকে সাপার ধর্ম্মাক্রান্ত বলে। মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্ত এই প্রকৃতিবিশিষ্ট বলা যাইতে পারে।

§ নায়িকা কুলজা ক্কাপি, বেশ্যা ক্কাপি, দ্বয়ং ক্বচিৎ তেন ভেদ এয় স্তস্য তত্রভেদ তৃতীয়ক। ইত্যাদি।

কাংশ স্থলে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির আখ্যাত ঘটনা লইয়া নাটকের বিবৃত বিষয় নির্ণীত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকরণে—ঘটনাচিত্রন, সর্ব্বাংশে লৌকিক, কবিকল্পিত; অর্থাৎ চিত্রিত ঘটনায় সমাবিষ্ট। মৃচ্ছকটিকে যে ঘটনা বিবৃত হইয়াছে তাহা সমসাময়িক সমাজ লইয়া। যে সময়ে এই পুস্তকের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে সেই সময়ের সমাজের প্রত্যেক কার্য্য কলাপ ইহার মধ্যে দর্পণ-প্রতিবিম্বিত ছায়ার ন্যায় রহিয়াছে। আরও নাটকে নায়ক নায়িকার চরিত্র পূর্ণভাবে দেখাইবার জন্য তাহাতে অন্যান্য চরিত্রের অবতারণা করা হয়। কিন্তু প্রকরণে সমাজকে পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করিবার জন্য কল্পনাময় ঘটনাবলীর সৃষ্টি হয়, নাটকে ভাবাভিনয়ের প্রাধান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাখিতে হয়, প্রকরণে—ভাবাভিনয়ের প্রতি তত লক্ষ্য না রাখিলেও চলে—কিন্তু ইহা ক্রিয়াভিনয়প্রধান হওয়া চাই—এই জন্য ইহাতে শকার, বিট, চেট প্রভৃতির চরিত্র * বিশেষরূপে চিত্রিত হয়। তাহার পর রস প্রাধান্য লইয়া কথা। নাটকে শৃঙ্গার ও বীর, এই দুইএর মধ্যে একটী রস প্রধানরূপে থাকিবে এবং অন্যান্য রস অপ্রধান থাকিয়া তাহার স্ফূর্ত্তির বিশেষ সহায়তা করিবে—কিন্তু প্রকরণে শৃঙ্গাররসের একমাত্র বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। মৃচ্ছকটিক প্রকরণই তাহার প্রধান সাক্ষ্য স্থল। মৃচ্ছকটিকে অন্যান্য রস, গৌণভাবে থাকিলেও শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য ইহার মধ্যে তামসী নিশিতে উজ্জ্বলদীপশিখাবৎ বিশেষরূপে প্রতিভাসিত। উপরে আমরা ভারতীয় নাট্য শাস্ত্রের মূল সূত্র ধরিয়া সংক্ষিপ্তভাবে নাটক ও প্রকরণের মধ্যে যে বিভিন্নতা দেখাইলাম, ইহা ব্যতীত ইহাদের মধ্যে অন্যান্য বিভিন্নতা তত গণনীয় নহে। নাটকের ন্যায় প্রকরণেও নান্দী, প্রস্তাবনা, পাত্র প্রবেশ, নিষ্ক্রমণ, পটক্ষেপ ও পটোত্তোলন প্রভৃতি সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষায়—নাটক ও প্রকরণের ভিন্নার্থবোধক দৃশ্য-কার্য্য না থাকিলেও আমরা প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের সূত্রানুসারে—এই প্রস্তাবে মৃচ্ছ কটিককে প্রকরণ বলিয়া উল্লেখ করিব।

পূর্ব্বে একস্থলে বলিয়াছি সাময়িক ঘটনার চিত্রণই প্রকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য। দৃশ্য কাব্যকে

---

*মদ মূর্খতাভিমানী দুষ্কুল ঐশ্বর্য্য সংযুক্তঃ
সোঽয়মনূঢ় ভ্রাতা রাজ্ঞঃ শ্যালঃ শকার ইত্যুক্ত।

অর্থাৎ—মত্ততা ও মূর্খতা বশতঃ মনে মনে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া অভিমানী নীচকুলোৎপন্ন এবং ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন রাজার অনূঢ়াপ্রণয়িনীর ভ্রাতার নাম "শকার"। শকার স্বভাবতই অতি বিলাসী অসম্বদ্ধ ভাষী, অর্থাৎ তাহার বাক্য দেশ, কাল, যুক্তিশাস্ত্র, এবং লৌকিক ব্যবহার বিরুদ্ধ, পুনরুক্তি ও প্রক্রমভঙ্গ দোষে দূষিত—এবং প্রায়ই পরস্পর অসঙ্গত। শকারের ভৃত্যের নাম "চেট"। চেটের বাক্যও শকার সদৃশ।

সুখ সম্ভোগে ধনক্ষয়কারী, চতুর, যৎকিঞ্চিৎ নৃত্যগীতাভিজ্ঞ, বেশ বিন্যাসাদি ব্যাপারে দক্ষ, মধুর ভাষী, এবং সামাজিকগণের আদরণীয় ব্যক্তিকে নাট্য শাস্ত্রে 'বিট" বলিয়া থাকে।

যদি দর্পণবৎ বিবেচনা করা যায়—তাহা হইলে তদুল্লিখিত ঘটনাবলি—কোন বিশেষ সময়ের সমাজের বা ব্যক্তি বিশেষের ছায়া বলিয়া ধরিতে হইবে। মৃচ্ছকটিক তৎকালের সমাজের উজ্জ্বল দর্পণ। উজ্জয়িনীর বৃত্তান্ত লইয়া এই পুস্তক রচিত। ঘটনা কল্পিত—কবি কপোল সমুদ্ভূত—কিন্তু সেই কল্পনার উপরে সম্পূর্ণরূপে সত্যের একটী ছায়া পড়িয়াছে। গল্প কল্পনা হইতে পারে, পাত্র পাত্রী, নায়ক নায়িকা প্রভৃতি সমস্ত কাল্পনিক হইতে পারে কিন্তু তাহার মধ্যে যে সমাজের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা কখন কাল্পনিক নহে।

মৃচ্ছকটিকে উজ্জয়িনীর যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে তাহাতে তখন তাহাকে বিশেষ সমৃদ্ধি শালিনী, ধন জন পূর্ণা, বাণিজ্য বহুলা নগরী বলিয়া বোধ হয়। প্রশস্ত রাজপথ—উন্নত সৌধমালা, রমণীয় শোভনোদ্যান কোলাহলময় দ্যূতাগার, বণিক বহুল-নগরাংশ—এবং ঐশ্বর্য্যময়ী গণিকা দেখিয়া বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, নগরী এই সময়ে সমসাময়িক সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ স্থানে অধিরূঢ় হইয়াছিল। সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের কোন স্থান তাহার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের ক্রমশঃ সঞ্চিত তেজে ধীরে কম্পিত এবং কোন স্থান হইতে তাহার প্রভাব হ্রাস হইতেছিল। এই বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রভাবে সমাজের মেরুদণ্ডে যে কি ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা এই কাব্যে বিশেষরূপে চিত্রিত হইয়াছে। মৃচ্ছক-টিকের মধ্যে সম্যকরূপে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে আমরা পাঠকগণের সুবিধার্থে এতদুল্লিখিত ঘটনাটী এইখানে বিবৃত করিতেছি।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে যে যে নাম উল্লিখিত হইবে তাহা জানিতে হইলে প্রকরণো-ল্লিখিত পাত্র ও পাত্রীগণের তালিকা আবশ্যক। নিম্নে তাহার একটী বিবরণ দেওয়া হইল।

প্রকরণোল্লিখিত পাত্রগণ।

পুরুষ—

চারুদত্ত=উজ্জয়িনীনিবাসীসম্ভ্রান্ত, নষ্টবিত্ত ব্রাহ্মণ ও বসন্তসেনার প্রণয় পাত্র।

রোহসেন=চারুদত্তের ঔরস জাত শিশুপুত্র।

মৈত্রেয়=চারুদত্তের চিরবিশ্বস্ত মিত্র।

বর্দ্ধমানক=ভৃত্য।

সংস্থানক=রাজশ্যালক, (গ্রন্থে "শকার" বলিয়া উল্লিখিত।)

বিট=রাজশ্যালকের অনুচর।

স্থাবরক=রাজভৃত্য।

আর্য্যক=রাজবিদ্রোহী (পরে উজ্জয়িনীর অধিপতি)

সর্ব্বিলক=চৌর্য্যবৃত্তাবলম্বী দুরবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ এবং মদনিকার প্রণয় পাত্র।

সম্বাহক=ভৃত্য।

মাথুর=দ্যুতাধ্যক্ষ।

দর্দ্দুরক=দ্যুতক্রিড়ক।

কর্ণপুরক=বসন্ত সেনার ভৃত্য।

চন্দনক }
বীরক } সহর কোতোয়াল।

বিট=বসন্ত সেনার ভৃত্য।

কুম্ভীলক=বসন্ত সেনার ভৃত্য।

বিচারক শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ চণ্ডালদ্বয় ও ধর্ম্মাধিকরণের কর্ম্মচারিগণ।

(স্ত্রীগণ।)

ধূতা=চারুদত্তের স্ত্রী।

বসন্তসেনা=গণিকা। চারুদত্তের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী।

বসন্তসেনার মাতা।

মদনিকা=বসন্ত সেনার সহচরী।

রদনিকা=চারুদত্তের দাসী।

অন্যান্য উল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পালক=উজ্জয়িনী রাজ।

রেভিল=বিখ্যাত গায়ক।

সিদ্ধ=ভবিষ্যৎ বক্তা।

পথিকগণ, ভৃত্যগণ ও শান্তিরক্ষক।

সংযোগ স্থল।

উজ্জয়িনী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান।

সময়।

চারি দিবস।

মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্ত একজন বাণিজ্যোপজীবী ব্রাহ্মণ। বণিকবৃত্তি অবলম্বনে, তাহার পিতা পিতামহ যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেন। উজ্জয়িনী নগরী তাহার পৈত্রিক বাসস্থান। তিনি একজন নামজাদা নাগরিক। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সেই সমস্ত বিষয়ের অবিমৃষ্যা-

দিত অধিপতি হইলেন। তিনি দেখিতে অতি সুপুরুষ। বিধাতা তাঁহাতে একাধারে রূপ-গুণের যথেষ্ট সমাবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব অতি মনোহর। তিনি মিষ্টভাষী বিনয়ী, গুণানুরাগী, ব্রতকর্ম্মাদি পরায়ণ, শাস্ত্রজ্ঞ, ধীরপ্রকৃতি স্বধর্ম্ম নিরত ছিলেন। এই সকল গুণের জন্য তিনি "অবন্তি-পুজ্য" হইয়া সাধারণের নিকট হইতে "আর্য্য" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার উপর আবার সোণায় সোহাগা—তিনি অপরিসীম দানশীল ছিলেন। পিতৃবিভবের অধিকারী হইয়া কতক কাল তিনি দরিদ্রের দুঃখ বিমোচনে—প্রার্থিতের প্রার্থনা পূরণে—নিঃসহায়ের সহায়তা করণে—প্রচুর অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। যাচকের নিকট চারুদত্তের দ্বার অবারিত। যে যায়, সেই পায়—রিক্ত হস্তে আর কাহাকেও ফিরিতে হয় না। কিন্তু এপ্রকার ভাবে আর বেশী দিন চলিল না। নিয়তির সহিত সংগ্রাম করিয়া কে কবে বিজয়ী হইয়াছে;—কে তাহার পথবদ্ধ করিয়াছে। এ হেন আর্য্য চারুদত্তেরও সেই নিয়তির বশে, প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটিতে লাগিল। ধনীর পুত্রের হাতে, অসংখ্য ধন দেখিলে চারিদিক হইতে অনেক সুখের পারাবত জুটিয়া থাকে। চারুদত্তের গৃহেও এ প্রকার পারাবতের অভাব ছিল না—ইহাদের সংসর্গে ইহাদের বিকৃত প্রকৃতির সংস্পর্শে শুদ্ধ, মতিমান, জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্রজ্ঞ চারুদত্তও দিন দিন কলুষিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। অমৃত পূর্ণ সুবর্ণ কলসে, গোময় বিন্দু পড়িল—তুঙ্গ শৃঙ্গ হিমাচল বারিধি গর্ভে নিমজ্জিত হইল—মহান্ মহীরুহ, সামান্য ঝঞ্জায় আমূল আলোড়িত হইল—চারুদত্ত ক্রমশঃ বিলাসী হইয়া উঠিতে লাগিলেন। একদিকে দানশীলতা অপর দিকে বিলাসিতা ইহাতে যাহা ঘটিবার তাহাই হইল। উজ্জয়িনীর তখন সমৃদ্ধিসম্পন্ন অবস্থা, বিলাসিতার ক্রীড়াভবন, উজ্জয়িনী তখন সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত। সুতরাং চারুদত্তের বিলাসিতা সেই সময়ের সমাজের উপযোগী হইয়া উঠিল। দ্যুতক্রীড়া সমাজের তৎকালীন প্রধান আমোদ, সঙ্গীগণের প্ররোচনায় ধীর চারুদত্ত, ধীর প্রবৃত্তি হারাইয়া এই কুৎসিত ব্যসনে নিমগ্ন হইলেন। সম্পত্তির অধিকাংশ অংশই সঙ্গীদের উদর পূরণে, এই দ্যুতব্যসনে এবং অবশিষ্ট দানে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। বিলাসিতার পরিণাম অপব্যয়, অপব্যয়ের শেষ ফল—দারিদ্রতা। "আর্য্য" চারুদত্ত বিলাসিতার চরম ফল প্রাপ্ত হইলেন। চারুদত্তের প্রকাণ্ড অট্টালিকা এতদিন উর্ম্মি-সংক্ষুব্ধ মহাসাগরবৎ সর্ব্বদাই কোলাহলময়ী ছিল, আমোদ আহ্লাদ, সঙ্গীতোচ্ছাসে গৃহভিত্তি সর্ব্বদাই প্রকম্পিত হইত—রাত্রে চারুদত্তের বিলাসময় প্রকোষ্ঠ শত শত আলোকিত গবাক্ষ-নেত্র উন্মীলিত করিয়া উজ্জয়িনীর চারিদিকে আলোক প্রভা বিস্ফারিত করিত—এক্ষণে ক্রমে ক্রমে সে সব ভাব অপনীত হইতে লাগিল। নন্দন—মহারণ্যে, প্রমোদ ভবন শ্মশানে পরিণত হইল—ঐশ্বর্য্যের সহচর সুখের পারাবত, বসন্তের কোকিল লক্ষ্মীর বর যাত্রেরা তাহার এই ধনহীনতায় অস্তগামী-শশাঙ্কের কররেখার ন্যায় ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল। যতদিন চারুদত্তের ঐশ্বর্য্য ছিল ততদিন—সহানুভূতি দেখাইবারও অনেক লোক ছিল, কিন্তু তাঁহারা বসন্তের কোকিল, বর্ষায় থাকিবে কেন? থাকিবার মধ্যে

একমাত্র উদার হৃদয় মিত্র—মৈত্রেয়। মৈত্রেয়—চারুদত্তের প্রিয়তম মিত্র—প্রাণ হইতেও প্রিয়তম—সুখের সহায়, দুঃখের সহায়, প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়। ঐশ্বর্য্য চারুদত্তকে ত্যাগ করিয়াছে—অন্যান্য পরিজনবর্গ চারুদত্তের প্রকাণ্ড সৌধ পরিত্যাগ করিয়াছে—কিন্তু মৈত্রেয় তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। চারুদত্তের সুখের সময় মৈত্রেয় অনেক সুখভোগ করিয়াছে, সুতরাং তাহার হৃদয়ের স্বাভাবিক উদারতা বশে—সে দুঃখের সময়ও তাহার সঙ্গত্যাগ করিল না। চারুদত্তের এখন এমন অবস্থা যে দুই একটী লোককে অন্ন দিতে তাহার কষ্ট বোধ হয়, তাঁহার নিজের গ্রাসাচ্ছাদন কায়ক্লেশে চলে—পরিবারের মধ্যে তাঁহার পরিণীতা স্ত্রী ধূতা, শিশু পুত্র রোহসেন, দাসী রদনিকা, আর প্রিয় বন্ধু মৈত্রেয়। মৈত্রেয় দেখেন চারুদত্তের ভাণ্ডার খাদ্য দ্রব্য শূন্য, কিন্তু পাছে বন্ধুর মনে কোন কষ্ট হয়—পাছে তাহার প্রাণে আঘাত লাগে এই জন্য তাহাকে কিছু না বলিয়া অন্য স্থলে উদরপূরণ করিয়া আসেন। যে দিনে জুটে সে দিন খান, না জুটিলে অনাহারে থাকেন—তথাপি চারুদত্তকে বলে না, তাহার সংসার ত্যাগ করে না। চারুদত্তকে পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। সে নিজের সুখ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ, ভোগস্পৃহা বিসর্জ্জন দিতে সমর্থ, অনাহারে হীন বেশে থাকিতেও স্বীকৃত কিন্তু চারুদত্তের পরিচর্য্যা করিতে অসম্মত নহে। এই ভীষণ সময়ে অদৃষ্টের এই শোচনীয় পরিবর্ত্তনে, চারুদত্তকে আর একটী আশ্রয় করিয়াছিল—সেটী তাঁহার স্বাভাবিক সদ্‌গুণাবলী।

আর! নায়িকা—বসন্ত সেনা। বসন্তসেনা, গণিকা কন্যা, কিন্তু নিজে গণিকা নহে। গণিকার গর্ভে তাহার জন্ম বটে কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত সে বিশুদ্ধচরিত্রা। এক পক্ষে চারুদত্ত যেমন ঐশ্বর্য্যবিহীন—অন্যপক্ষে বসন্তসেনা সেইরূপ ঐশ্বর্য্যশালিনী। ঘটনায় এই বৈচিত্র্য সমাবেশ। চারুদত্ত দারিদ্র্যের প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছেন—বসন্তসেনা ঐশ্বর্য্যের রত্নময় সিংহাসনে বিরাজমানা। তাহার বাটী আটমহল—তোরণ দ্বার সমুদায় গগণস্পর্শী। এতদ্ভিন্ন বসন্তসেনার পুরির মধ্যে অসংখ্য রত্নময় বেদী—কতশত বিলাস কানন, কতশত পুষ্পোদ্যান, দীর্ঘিকা, প্রাসাদ প্রকোষ্ঠে কতশত দ্যুতিমান মণিময় স্তম্ভ রাজি। বাড়ীতে লোক জনের ত অভাবই নাই। অবস্থা ঠিক চারুদত্তের বিপরীত। চারুদত্তের বাড়ীতে বাস করিবার লোক নাই বসন্ত সেনার বাড়ীতে লোক ধরে না। এতদ্ভিন্ন তাহার অসংখ্য যান বাহন, হস্তী, শকটাদিও ছিল। এই প্রকাণ্ড ধনজনশালিনী, কোলাহল পূর্ণ, রত্ন শোভিত প্রাসাদের এক মাত্র অধিকারিণী বসন্ত সেনা ও তাহার মাতা। বসন্ত সেনা কেবল মাত্র উজ্জয়িনীতে ধনশালিনী ছিলেন এমত নহে—সকল শ্রেণীর লোকই তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিত। *

* গণিকার এ প্রকার সম্মান নূতন কথা নহে—প্রাচীন গ্রীসিয় ও রোমীয় ইতিহাসে তাহার উদাহরণ প্রচুর দেখা যায়। এক জন প্রখ্যাত নামা দার্শনিক এক গণিকার নিকট হইতে এক সুবৃহৎ পুস্তকালয় উপহার পাইয়াছিলেন।

এই কথা শুনি সব ঠাঁই
রূপসী তোমার মত নাই।
রাঙ্গা কচি ঠোঁট দুটি
নিশিদিন আছে ফুটি
আপনার হাসির আলোকে
সুঠাম সুন্দর গ্রীবা
তনুখানি শুভ্র-বিভা
বিস্ময় ভরিয়া দেয় চোখে।
ঘন কেশ পাশ থরে থরে
নুয়ে পড়ে আপনার ভরে।
মাঝে তারি চিরকাল
উজ্জ্বল উদার ভাল
মহত্ত্বের উন্নত আসন
যেন মেঘস্তর টুটে
মাঝখানে জেগে উঠে
সুপবিত্র উষার আনন।
হৃদয়ে অপূর্ব্ব সুখ মানি
দেখে সবে করে কানাকানি,
কপোল অমিয় মাখা
লাবণ্যের আভা আঁকা,
চিবুকের বঙ্কিম ভঙ্গিমা।
শুধু সে ফুলের বাস,
শুধু সে বাঁশীর শ্বাস,
পতঙ্গের পাখার রঙ্গিমা।
ওই তব দেহের বিকাশ
স্বরগের সৌন্দর্য্য আভাস।
চিত্রপটে প্রতিমায়
ফুটায়ে তুলিতে চায়
গুণীজন ওইরূপ জ্যোতি;
অপূর্ণ প্রয়াস তার
ব্যর্থ হয় বার বার
তবু ধরে অপূর্ব্ব মুরতি।
তব রূপ নয়ন পরশে,
আঁখি দিয়ে প্রাণে গিয়ে পশে।
হিয়া টুটি সেথা হতে
উঠে পুন শত স্রোতে
উচ্ছ্বসিত যশের ঝরণা।
রবিকর করি পান,
সিন্ধু যথা করে দান
কোটি কোটি কিরণের কণা।

আমি কিন্তু জানি না দেখি না
অনিন্দ্য রূপসী তুমি কিনা।
মুখ চোখ কেশ ভার
কার মত কি তোমার
বিচার করিনে অহরহ;
জানি তুমি এ জগতে
স্বতন্ত্র সকল হতে
এদের কেহই তুমি নহ।
শুধু যারা অতি পরিপাটি
নাক চোক মুখ সব খাঁটি,
আঁকা ভুরু বাঁকা চোক
বাহা বাহা করে লোক
শুধু যেন গৃহসজ্জা দেহ।
প্রতি ভঙ্গী প্রতি রেখা
দর দাম ক'রে দেখা;
সে দলের নও তুমি কেহ।
আমি কি ও রূপের পিয়াসী
আমি যে তোমারে ভালবাসি
চির অসম্পূর্ণ মোরে
দিলে তুমি পূর্ণ ক'রে
কোন্ দৈব কুহকে না জানি।
আধ খানা প্রাণ মরে
বাকি আধ খানা তরে
তুমি সেই বাকি প্রাণ-খানি।
তুমি এলে অমনি এ হিয়া
স্তব্ধ হ'ল গৌরবে ভরিয়া।
যথা পূর্ণিমার ইন্দু
পরিপূর্ণ করে সিন্ধু
আপনার পূর্ণ মহিমায়।
কিরণে তরঙ্গে আর
হয়ে যায় একাকার
আলোকে গভীরে মিশে যায়।
চিরদিন সিন্ধু আর আমি
পরাণ প্রিয়ের অনুগামী
আর সবে উচ্চস্বরে
রূপের বাখান করে
আমরা নিয়মাধীন তার
তাহারি প্রভাব বলে
জীবন তরঙ্গ চলে
ইহা ছাড়া নাহি জানি আর।

জয়দেব।

একখানি সাহিত্য গ্রন্থকে দুই রকম ভাবে আলোচনা করা যায়।

১ম। কাব্য স্বরূপে।

২য়। ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার উপায় স্বরূপে।

প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিলে আমরা কেবল মাত্র কাব্যহিসাবে তাহার দেশকাল নিরপেক্ষ দোষ গুণ বিচারে সমর্থ হই। দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বন করিলে আমরা তাহা যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে দেশে রচিত হইয়াছিল সেই দেশের তৎসাময়িক অবস্থা সকলের আলোচনা দ্বারা, তাহার তদ্দেশীয় অন্যান্য কাব্য সকলের সহিত কি সম্বন্ধ এবং তাহার দোষ ও গুণ কোন কোন বিশেষ কারণ প্রসূত—এই সকল বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারি।

কাব্যের দোষ গুণ বিচার করাই সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক প্রথায় আলোচনা—উক্ত বিচারের সহায়তা করে মাত্র। কিন্তু এই উভয় উপায়ের মিলিত সাহায্যেই যথার্থ সমালোচনা করা যায়।

দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে সংস্কৃত সাহিত্যে তাদৃশ ব্যুৎপত্তি না থাকায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সহিত জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দের কি সম্বন্ধ তাহা আমার নিকট অবিদিত। এবং ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে আমার পরিমিত জ্ঞান—জয়দেবের সময়ে, অর্থাৎ বঙ্গীয় রাজা প্রথম লক্ষ্মণসেনের সময়ে বঙ্গদেশের তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাদির সম্যক নির্দ্ধারণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। সুতরাং উপস্থিত প্রবন্ধে আমাকে জয়দেবের গ্রন্থ কেবল মাত্র কাব্যাংশে বিচার করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইবে।

আর একটি কথা, শুনিতে পাই গীতগোবিন্দের নাকি একটি আধ্যাত্মিক অর্থ আছে—জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলনের বিষয়ই নাকি, রাধা কৃষ্ণের প্রেম বর্ণনা ছলে বর্ণিত হইয়াছে। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে আধ্যাত্মিকতার কোনও পরিচয় নাই। জয়দেব তাঁহার কাব্যে যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহার সহজ ও প্রচলিত অর্থ অনুসারে যতটা বুঝা যায় তাহাই বুঝিয়াছি; কোনও নিগূঢ় অর্থ উদ্ভাবন করিতে পারি নাই। আমার কাছে কৃষ্ণ ও রাধাকে আমাদেরই মত রক্ত মাংস গঠিত মনুষ্য বলিয়া বোধ হইয়াছে, এবং তাঁহাদের প্রেমকেও স্ত্রী পুরুষ ঘটিত সাধারণ মানব প্রেম বলিয়াই বুঝিয়াছি। যদি যথার্থই একটি সুগভীর আধ্যাত্মিক ভাব কাব্যখানির প্রাণ স্বরূপ হয় তাহা হইলে আমি উপস্থিত প্রবন্ধে

যাহা বলিয়াছি তাহা একান্ত অর্থ শূন্য। সূচনায় এই অসম্পূর্ণতার কথা উল্লেখ মাত্র করিয়া আমি আসল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

(১)

রাধা কৃষ্ণের প্রণয় মূলক দুই চারিটি ঘটনা লইয়া জয়দেব-গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছেন।

একদিন কৃষ্ণ গোপিনীগণ সমভিব্যহারে যমুনাতীরে বসন্ত-বিহার করিতেছিলেন এমন সময় রাধা বেশভূষা করিয়া কৃষ্ণের উদ্দেশে আসিয়া উক্ত ব্যাপার দেখিয়া ক্রোধ ভরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণও একান্ত অপ্রতিভ হইয়া মৌনভাব ধারণ করিলেন—এবং রাধাকে গমন হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা মাত্র করিতেও সাহসী হইলেন না। কিন্তু রাধা চটিয়া গেলেন দেখিয়া তিনি গোপবধূদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, কোনও এক নিভৃত কুঞ্জবনে আশ্রয় লইয়া, মনোদুঃখে রাধার কথা ভাবিতে লাগিলেন।

এদিকে রাধা স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণকৃত পূর্ব্ববিহার স্মরণে অত্যন্ত উদ্দীপিত হইয়া কৃষ্ণ আনয়নার্থে তাঁহার নিকট সখী প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণ সখীকে বলিলেন আমি যাইতে পারিব না তাঁহাকে আসিতে বল। তারপর, সখীর রাধার নিকট প্রত্যাগমন—কৃষ্ণের প্রার্থনানুযায়ী রাধাকে কৃষ্ণের নিকট পাঠাইবার চেষ্টা, কিন্তু রাধা ইচ্ছা থাকিলেও বিরহজনিত শারীরিক ক্লান্তি হেতু স্থান পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ।

সখি অগত্যা আবার কৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। কৃষ্ণ এবার স্বয়ং রাধার সকাশে যাইতে রাজী। সখি ছুটিয়া আসিয়া রাধাকে সুসংবাদ জানাইলে রাধা বাসক সজ্জা হইয়া কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ কথা রাখিতে পারিলেন না। কাজেই রাধা ঠাহরাইলেন যে কৃষ্ণ অন্য কোন রমণীর সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। উক্ত রমণীর সহিত কৃষ্ণ কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন, সেই সকল কথা রাধা কল্পনায় প্রত্যক্ষীভূত করিয়া সেই ভাগ্যবতীর তুলনায় নিজকে অত্যন্ত হতভাগিনী মনে করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাত্রি এইরূপেই কাটিয়া গেল। প্রত্যুষে কৃষ্ণ অন্য রমণীর চিহ্ন সকল শরীরে ধারণ করিয়া রাধার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। রাধা কৃষ্ণকে কিরূপ ভাষায় সম্ভাষণ করিলেন তাহা বোধ হয় আর বলিবার আবশ্যক নাই। কৃষ্ণ নিজের দোষ স্খালনের কোনরূপ চেষ্টা করিলেন না কারণ সে চেষ্টা যে নিস্ফল হইত, অধরের কজ্জল, কপোলের সিন্দুর, বক্ষস্থ যাবক রঞ্জিত পদচিহ্ন, এ সকল কোথা হইতে আসিল? তাহার না হয় একটি বাজে কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে—কিন্তু তাঁহার পীত বস্ত্রের পরিবর্ত্তে পরিহিত নীল শাটীর—সম্বন্ধে ত আর কোনোরূপ মিথ্যা কৈফিয়ৎ খাটে না। কজ্জলাদি আবশ্যক হইলে মুছিয়া ফেলা সহজ কিন্তু পরিহিত বস্ত্রত্যাগ করা ত আর সহজ নহে। রাধা কথা

শেষ করিয়া দুর্জ্জয়মান করিয়া বসিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের কাছে কি মান টিঁকে ? তিনি রাধার মনোমত কথায় তাঁহার প্রীতি সাধন করিলেন। রাধা কৃষ্ণের উপর যে আড়ি করিয়াছিলেন তাহা ভাবে পরিণত হইল। এই ত গেল প্রভাত সময়ের ঘটনা—যোগে যাগে দিনটিও কাটিয়া গেল, দিনান্তে অভিসারিকা রাধা কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন উভয়ের মিলন হইল। মিলনান্তর সম্ভোগ, সম্ভোগান্তর কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার বেশ বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থের সমাপ্তি।

দেখা যাইতেছে এ কাব্যের মুখ্য বর্ণিত বিষয়—রাধা কৃষ্ণের রূপ, বিরহে পরস্পরের দুঃখ, মিলিত হইলে পরস্পরের কথোপকথন—অর্থাৎ কেবল মাত্র রাধা কৃষ্ণের দেহের বর্ণনা ও তাঁহাদের মনোগত প্রেম ভাবের বর্ণনা। এ ছাড়া আনুষঙ্গিকরূপে যমুনাতীর কুঞ্জবন, বসন্তকাল, রাধার সখী ও অন্যান্য গোপিনীগণের কথাও বলা হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে, গ্রন্থকারের আত্ম পরিচয় ও ঈশ্বরের বন্দনা বাদ দিলে দেখা যায় রাধা কৃষ্ণের কেলি ব্যতীত স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের অন্য কোনও বিষয়, কোনও রূপ ধর্ম্ম নৈতিক কিম্বা নৈতিক মতামত, ইত্যাদি কিছুই গীতগোবিন্দে স্থান লাভ করে নাই। জয়দেবের মস্তিষ্কপ্রসূত কোনও চিন্তা ইহাতে সন্নিবেশিত হয় নাই। ইহা আমার নিকট অত্যন্ত সুখের বিষয় মনে হইতেছে। কারণ কবির ক্ষমতার পরিসর যত সংক্ষিপ্ত হয় ও তাঁহার কল্পনা যত সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে বদ্ধ থাকে ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন সমালোচকের পক্ষে সমালোচনা করাটা ততই সহজ সাধ্য হইয়া উঠে। আমি এখন জয়দেবে যাহা নাই তাহার কথা ছাড়িয়া দিয়া তাহাতে যাহা আছে তাহারি বিষয় আলোচনা করিব। জয়দেবের কবিত্ব শক্তির পরিমাণ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আমি—তাঁহার বর্ণিত প্রেম কিরূপ ও তাঁহার বর্ণিত স্ত্রীপুরুষের রূপই বা কি রূপ তাহাই যথার্থ রূপে নিরূপণ করিতে চেষ্টা পাইতেছি।

মনের ভাবের প্রকাশ কথায় ও কার্য্যে। সাধারণ গোপিনীগণ রাধা ও কৃষ্ণ ইহাঁরা প্রেম শব্দের অর্থে কি বুঝেন তাহা তাঁহাদের কথায় ও কার্য্যে বিশেষ রূপে বুঝা যায়। গোপিনীগণ, কৃষ্ণের আদিরসোদ্দীপিত মুখের উপরে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া কাণে কাণে কথা কহিবার ছলে তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, "কেলি কলা কুতূহলে" কুঞ্জবন প্রবেশের নিমিত্ত তাঁহার পরিহিত দুকূল ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি নিজদিগের প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন। রাধা, কৃষ্ণের বিরহে কাতর হইয়া সখীকে বলিলেন—

> "সখি হে কেশি মথন মুদারং
> রময় ময়াসহ মদন মনোরথ ভাবিতয়া সবিকারং" ॥

তাঁহার পর কৃষ্ণের সহিত মিলন হইলে কৃষ্ণ কি করিবেন এবং তাঁহার নিজের অবস্থা কিরূপ হইবে, রাধা সে বিষয়ে সখিকে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। সে

বক্তৃতাটি ইচ্ছা সত্বেও বলিতে পারিলাম না। নিজেরা পড়িয়া দেখিলেই তাহাতে রাধা বিরহ ও মিলন কি ভাবে দেখেন তাহা অতি স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন।

সখি কৃষ্ণের নিকট রাধার বিরহ অবস্থা জানাইয়া বলিতেছেন "রাধা ব্রতমিব তব পরিরম্ভ সুখায় করোতি কুসুম শয়নীয়ং" আরও নানা কথা বলিলেন—ফলে দাঁড়াইল রাধার অবস্থা অতি শোচনীয়—তিনি অতিশয় উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত, রক্ষা পাওয়া ভার, রোগের কারণ—কৃষ্ণের বিরহ। রোগ অতি কঠিন হইলেও কৃষ্ণের দ্বারা অতি সহজেই তাহার প্রশমন হইতে পারে—সখী কৃষ্ণকে বলিলেন এরোগ 'তদঙ্গ সঙ্গামৃত মাত্র সাধ্যং।"

আর কৃষ্ণ? তিনিত কথা ও ব্যবহারে তাঁহার মনোভাব নিঃসন্দেহ রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি কেবল মাত্র চুম্বনাদি দ্বারা গোপিনীগণের প্রতি তাঁহার অন্তরের ভালবাসা প্রকাশ করেন।

সখি দ্বারা রাধাকে বলিয়া পাঠান যে যাও শ্রীমতীকে গিয়া বল কৃষ্ণ "ভূয়স্তৎ কুচ কুম্ভ নির্ভর পরিরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি"।—কৃষ্ণ রাধার দুর্জ্জয়মান ভঞ্জনার্থে যে সকল চাটু বচন প্রয়োগ করেন তাহাতেও ঐ একই ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি সকলেই যে ভাবে মত্ত সে ভাবের নাম সংস্কৃতে ঠিক প্রেম নহে। জয়দেব বর্ণিত প্রেমের উৎপত্তি দেহজ আকাঙ্ক্ষা হইতে, তাহার পরিণতি দেহের মিলনে। তাহার নিকট বিরহের অর্থ প্রণয়ী-প্রণয়িণীর দেহের বিচ্ছেদজনিত কষ্ট।

গীতগোবিন্দে আসল ধরিতে গেলে প্রেমের কথা নাই—কেবল আদিরসের বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। হৃদয়ের সহিত জয়দেবের সম্পর্ক নাই—শরীর লইয়াই তাঁহার কারবার।

যে রমণীর হৃদয় নাই কেবল মাত্র দেহ আছে—তাহার স্ত্রী-সুলভ লজ্জা নম্রতা ইত্যাদি মানসিক সৌন্দর্য্যের বিশেষ অভাব থাকিবার কথা। রাধিকা প্রমুখ গোপ যুবতীদিগের এই নির্লজ্জতার পরিচয় তাঁহাদের ব্যবহারে ও কথোপকথনে যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করা যায়। রাধাকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলে—"স্মর শরাহত সুভগ" প্রিয়মুখ দেখিয়া নির্লজ্জভাবে উচ্চহাস্য করিয়া উঠেন।

এইত গেল প্রেমের কথা।

এখন শারীরিক সৌন্দর্য্যের কথা পাড়া যাউক। শারীরিক সৌন্দর্য্য তিনটি বিভিন্ন উপকরণে গঠিত।

(১) অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির গঠন বা আকৃতি।

(২) বর্ণ।

(৩) ভাব। অর্থাৎ আন্তরিক সৌন্দর্য্যের বাহ্য বিকাশ। জয়দেবের নায়ক নায়িকারা যখন সর্ব্বাংশে আন্তরিক সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত তখন অবশ্য তাহাদের শরীরে ভাবের সৌন্দর্য্যের দেখা পাওয়া অসম্ভব।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির গঠন এবং পরস্পরের সহিত পরস্পরের পরিমাণ সামঞ্জস্য ও বর্ণ এ সকল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইলেও দর্শনেন্দ্রির গ্রাহ্য বলিয়া ইহাতে কোনও রূপ ভোগের ভাব সংলিপ্ত নহে। যে সৌন্দর্য্য চোখে দেখা যায় তাহার কেবল মাত্র মানসিক উপভোগ সম্ভব। তাহা হইতে যে সুখ লাভ করা যায় তাহা কেবল মাত্র মানসিক আনন্দ। তাহাতে দেহের কোনও রূপ লাভ লোকসান নাই। কিন্তু স্পর্শ করিয়া যে সুখ তাহার চৌদ্দ আনা দৈহিক। সুতরাং জয়দেবের নিকট আমরা আকৃতি বর্ণের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা শারীরিক কোমলতা ও স্পর্শ যোগ্যতা ইত্যাদির অধিক বর্ণনা প্রত্যাশা করিতে পারি এবং জয়দেব এ বিষয় আশা নিস্ফল করেন না।

মুখশ্রীর প্রধান উপকরণ ভাব এবং গঠন ও বর্ণের সৌন্দর্য্য, তাই জয়দেব মুখশ্রী বর্ণনা দুই কথায় সারিয়াছেন, যে দুইটি কথা বলেন তাহাও খানিকটা যেন না বলিলে নয় বলিয়া।

সুন্দরী যুবতীদিগের গাত্রের বন্ধুরতার অর্থাৎ উন্নত অবনত অংশ সকলের প্রতিই তাঁহার আন্তরিক টান দেখা যায়। তিনি উক্ত অঙ্গাদির বেশ ফলাও বর্ণনা করেন। তাঁহার রমণীদের এইরূপ সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার বেশ পূর্ণ। কৃষ্ণকে জয়দেব যেরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার চেহারার বিষয় বিশেষ একটা কিছু পরিস্কার ভাব মাথায় আসে না—কেবল মাত্র তাঁহার বক্ষস্থল যে নির্দ্দয় রূপ আলিঙ্গনের জন্য বিশেষ উপযুক্ত এবং তাঁহার কর যুগল যে স্পর্শ-সুখ লাভের জন্য অষ্টপ্রহর লালায়িত এই দুইটি কথাই বিশেষ রূপে মনে থাকে।

গীতগোবিন্দের মুখ্য বিষয়টি কি তাহা আমি যে রূপ বুঝিয়াছি তাহা এতক্ষণ ধরিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম এখন আমি তাহার কাব্যাংশে দোষ গুণের বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

(২)

কোন একটি বিশেষ রচনা কাব্য কি না ও যদি কাব্য হয় তাহা হইলে কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ কিম্বা নিকৃষ্ট এ সকল বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইলে আগে কাব্য কাহাকে বলে সে বিষয় কতকটা পরিমাণে পরিষ্কার রূপ ধারণা থাকা আবশ্যক। আমরা প্রায় সকলেই সচরাচর কবিতা বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকি এবং আমাদের সকলেরি মনে কাব্য যে কি পদার্থ সে বিষয়ে একটা ধারণাও আছে কিন্তু সেটি যে কি তাহা ঠিক প্রকাশ করিয়া বলা অত্যন্ত কঠিন। কোনও একটি ক্ষুদ্র সংজ্ঞার ভিতর যাবতীয় কবিতা-পুস্তককে প্রবেশ করান যায় না। দুই চারি কথায় কোনও কাব্যের সমস্ত গুণের বর্ণনা করা অসম্ভব। কিন্তু সকল কাব্যের ভিতর যেটি সাধারণ অংশ তাহার নির্ণয় করিতে পারিলে—তাহা যে কি এ বিষয় একটি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। আমার বিবেচনায় আমাদের দেশের প্রচলিত বাক্য "কাব্যং রসাত্মকং

বাক্যং" কাব্যের এই সংজ্ঞায় সকল কাব্যের ভিতর যেটি সাধারণ অংশ অর্থাৎ যাহার অভাবে কোনও রচনা কাব্যই হইতে পারে না সেইটি অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই অল্প সংখ্যক কথা কয়েকটির মধ্যে কি ভাব নিহিত আছে তাহা খুলিয়া বুঝাইয়া দিলে বোধ হয় আপনারাও আমার কথা কতক পরিমাণে গ্রাহ্য করিবেন।

'রসাত্মক বাক্য' এই কথাটির যথার্থ অর্থ বুঝিতে হইলে রস, আত্মা, এবং বাক্য এই শব্দ গুলির অর্থ জানা আবশ্যক। প্রথমতঃ বাক্য শব্দ লইয়াই আরম্ভ করা যাউক। আমরা দেখিতে পাই বাক্যের দুইটি অংশ আছে। ১ম অর্থ, ২য় শব্দ। প্রথমাংশ মানসেন্দ্রিয় গ্রাহ্য, দ্বিতীয়াংশ শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য—যে শব্দ কাণে শুনিয়া অন্তরে তাহার অর্থ গ্রহণ করি তাহাই বাক্য।

বাক্যের-বিষয় মানুষের মনোভাব, উদ্দেশ্য তাহা প্রকাশ করা এবং উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের উপায় শব্দ। সুতরাং বাক্য রসাত্মক হইতে হইলে, প্রথমতঃ ভাব রসাত্মক হওয়া আবশ্যক, তৃতীয়তঃ এরূপে ভাব প্রকাশ করা কর্ত্তব্য যাহাতে রসাত্মক ভাব—রসাত্মক শব্দের সহিত সম্পূর্ণ রূপে মিশ্রিত হইতে পারে।

শব্দের রস কি? অবশ্য শ্রুতি মধুর। যেমন সঙ্গীতে একটি সুর আর একটি সুরের সহিত মিলিত হইয়া অধিকতর শ্রুতি মধুর হয় সেই রূপ একটি শব্দ আর একটি শব্দের সংস্পর্শে অধিকতর শ্রুতি মধুর হয়। কাণে শুনিতে মিষ্ট লাগিবার জন্য শব্দ বিন্যাসের পারিপাট্য হইতে ছন্দের উৎপত্তি। ভাষা ছন্দোবদ্ধ হইলে যত শুনিতে ভাল লাগে ছন্দ ব্যতিরেকে ততদূর মিষ্ট লাগে না।

সুতরাং কবির ভাষা ছন্দোযুক্ত। ছন্দোবন্ধে দুইটি উপকরণ বিদ্যমান ১ম অক্ষর-মিলন Rhyme ২য় ভাষার তাল-লয় Rhythm, এই দুইটির মধ্যে দ্বিতীয়টি ছন্দের প্রাণ স্বরূপ—Rhyme না থাকিলে ছন্দ হয় কিন্তু Rhythm না থাকিলে চলে না। Rhyme and Rhythm উভয়েই সমভাবে বর্ত্তমান থাকিলেই ছন্দ যথেষ্ট পরিমাণে পূর্ণাবয়ব হয়। সুতরাং যে কবির রচনায় Rhyme এবং Rhythm যত বহুল পরিমাণে থাকিবে ততই তাঁহার শব্দের রস বেশি হইবে।

যে ভাব মনে সুন্দর ভাবের উদ্রেক করে আমাদের হৃদয় বিশুদ্ধ আনন্দে পরিপ্লুত করে তাহাই রসাত্মক ভাব। যেমন ফুল, সুগঠিত প্রস্তর মূর্ত্তি, পূর্ণিমা রজনী ইত্যাদি আমাদের দেখিতে ভাল লাগে কিন্তু তাহার কোনও কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না—সেইরূপ মানবমনের প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষা জনিত বিষাদ। জগতের আদি অন্ত উদ্দেশ্য ইত্যাদি রহস্য পূর্ণ বিষয়সকলের চিন্তা জনিত আবেগ, বিস্ময়াদি ভাব সকল সহজেই আমাদের ভাল লাগে তাহার কোনও কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না! উক্ত প্রকার রসাত্মক ভাব সকলেই কাব্যের মুখ্য বিষয়। এই

সকল ভাবের ভিতর যে মিষ্টত্ব আছে তাহাই প্রকাশ করা—এবং আমাদের মনে এই সকল ভাব উদ্রেক করিয়া আনন্দ প্রদান করাই কবিতার উদ্দেশ্য এবং যে কবি সেই উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হয়েন তিনিই যথার্থ শ্রেষ্ঠ কবি। যদিও সুন্দর ভাব লইয়াই কবির কারবার তথাপি পৃথিবীর কোনও প্রকার সুন্দর জিনিশ একেবারে তাঁহার আয়ত্বের বহির্ভূত নয়। কি কায়িক কি মানসিক যতপ্রকার সৌন্দর্য্য আছে সকলের ভিতর একটা বিশেষ মিল আছে। চিত্রকরের মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি দ্বারা লোকের মানসি তৃপ্তি সাধন—কিন্তু তিনি তাঁহার চিত্রে বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া ভাবের সৌন্দর্য্য ফুটাইরা তুলিতে পারেন। কবির পক্ষে ও ঠিক সেইরূপ। ভাবের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও তিনি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সৌন্দর্য্যের বর্ণনাতেও ক্ষান্ত নহেন বরং যে কবি নিজের রচনায় রূপজ ভাবজ নৈতিক ইত্যাদি নানাবিধ সৌন্দর্য্যের একত্র মিলন করিতে পারেন তিনিই তত উচ্চ দরের কবি বলিয়া গণ্য হয়েন। কিন্তু যেমন একটি চিত্রকরের পক্ষে চিত্রের ভাবের সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিতে হইলে প্রথমতঃ চিত্রটিকে সুন্দর করিয়া আঁকিতে হইবে দ্বিতীয়তঃ যাহাতে তাহার ভাব পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত হয় সেইরূপ করিয়া আঁকিতে হইবে একটি কবির পক্ষে ও ঠিক সেইরূপ কোনও একটি বিষয় কাব্য ভুক্ত হইলে প্রথমে তাহাকে ভাবের সৌন্দর্য্যের সহিত লিপ্ত করিতে হইবে দ্বিতীয়তঃ তাহাকে সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইবে।

আমি ভাষা ও ভাব পৃথক করিয়া আলোচনা করিয়াছি—কিন্তু বাস্তবিক কবির নিকট ভাষা ও ভাবের ভিতর কোন প্রভেদ নাই—কবিতার ভাষা ও ভাব পরস্পর পরস্পরের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। ভাব মন্দ হইলে কবিতার ভাষা কথনই খুব সুন্দর হইতে পারে না,এবং ভাষা কদর্য্য হইলে ভাবও সম্পূর্ণ কবিত্বপূর্ণ হইতে পারে না। কবিতার ভাষা ভাবের দেহ স্বরূপ কিছুতেই তাহা ভাব হইতে পৃথক করিতে পারা যায় না। একটি ভাব দুই প্রকার ভাষায় ব্যক্ত হইলে অর্থ সম্বন্ধে অনেকটা বিভিন্ন হইয়া যায়। নিবিড় অন্ধকারকে কালিদাস বলিতেছেন সূচিভেদ্য স্তমস্ জয়দেব বলিতেছেন অনল্পতিমির—এদুয়ের কতকটা প্রভেদ আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন।

যে অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারা কবিতার ভাব ও ভাষার সম্পূর্ণ একীকরণ সম্পন্ন হয় তাহাই কবিতার আত্মা। এই আত্মা আমাদের আত্মার ন্যায় রহস্য জড়িত। যেমন বৈজ্ঞানিকগণ মানবদেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়াও তাহার ভিতরকার আত্মাকে খুঁজিয়া পান না সেইরূপ সমালোচকেরাও একখানি কাব্যের বিভিন্ন বিভিন্ন উপাদান সকল পরস্পর হইতে বিশ্লিষ্ট করিলেও তাহাদের অন্তস্থ আত্মাকে ধরিতে পারেন না। যাঁহারা ভাবের সহিত ভাষা যুক্ত করিয়া কবিতাকে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন তাঁহাদেরই কবিতার আত্মা আছে। কিন্তু যথার্থ কবিত্ব শক্তি বিবর্জ্জিত কোনও

ব্যক্তি যদি বহুল পরিশ্রম দ্বারা বিশেষরূপে পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক ভাব সকলকে পরিপাটী ছন্দোময় ভাষা যুক্ত করেন তাহা হইলেও তাঁহার রচনা কাব্যশ্রেণীভুক্ত নয়। “সৃষ্টি ও নির্ম্মাণে যে প্রভেদ কবিতা ও তাহার অনুকরণে রচিত প্রাণ শূন্য ছন্দোবন্দের সমষ্টিতে সেই প্রভেদ।” পূর্ব্বে যাহা বলিলাম তাহা সংক্ষেপে বলিতে গেলে দাঁড়ায় এই যে—যে রচনায় রসাত্মক ভাব—সম্পূর্ণরূপ অনুরূপ ভাষায় প্রকাশিত তাহাকেই কাব্য বলিয়া মানি। এখন দেখা যাউক কাব্য বিষয়ে আমার মত অনুসারে বিচার করিলে জয়দেবের কাব্যজগতে কোথায় স্থান ?

দর্শন বিজ্ঞানের বিষয়ের কোনও জাতিভেদ নাই—উচ্চ নীচ বিচার নাই। বিজ্ঞানের পক্ষে মহৎ ক্ষুদ্র উভয়ই সমান উপযোগী—বিজ্ঞানে দূরবীক্ষণ অপেক্ষা অনুবীক্ষণের আদর কিছু কম নহে। কিন্তু কাব্যের নিয়ম ঠিক ইহার বিপরীত। কাব্যের বিষয় মাত্রেই কিছু একরূপ নহে। তাহাদের ভিতর যথেষ্ট তারতম্য আছে এবং সেই তারতম্য বিচার করিয়া বিষয় নির্ব্বাচন করাতেই প্রধানতঃ কবিদিগের শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হয়।

জয়দেব অধিকাংশ কবিদিগের অপেক্ষা কাব্যের বিষয় নির্ব্বাচনে নিজের নিকৃষ্ট রুচির পরিচয় দিয়াছেন। প্রেমের পরিবর্ত্তে শৃঙ্গাররসকে কবিতার বর্ণিত বিষয় স্থির করিয়াছেন এই জন্য কখনও তাঁহাকে কালিদাসাদি কবিগণের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত করিতে পারি না। সকলেই অবগত আছেন যে প্রেমভাবের অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি আছে। স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ, কতক অংশে শারীরিক কারণ জাত—কতক অংশ শরীর ও মন উভয়ই অধিকার করিয়া থাকে কতক অংশ বা কেবল অন্তর্জগত ভুক্ত। যেমন আমাদের সঙ্গীত মাত্র ভাল লাগিলেও বীণা নিঃসৃত ধ্বনি একতারার বাদ্য অপেক্ষা ভাল লাগে—ফুল মাত্রেই সুখজনক হইলেও পদ্মকে করবী অপেক্ষা অধিক আদর করি—কবিতা লিখিতে হইলে একবার করবীর নাম করিতে দশবার পদ্মের কথা বলি কিন্তু উক্তরূপ আচরণ করায় জন সাধারণের বিরাগের পাত্রও হই না কারণ বাস্তবিকই করবীর তুলনায় পদ্ম দশ গুণ শ্রেষ্ঠ। ঠিক সেই রূপ প্রেমের যে অংশ রূপ ও ভাবগত সেই অংশই সর্ব্বাংশে প্রীতিজনক এবং তাহাই যথার্থ কাব্যের বিষয়। শরীরী ভাবটুকু প্রায় অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবি একেবারেই কবিতায় বাদ দিয়াছেন। কেহ কেহ আভাসে বুঝাইয়া দেন যে তাঁহারা শরীরের কথাটা একেবারে ভুলিয়া যান নাই—তাহা তাঁহাদের কবিতার ভিতর দিয়া অতিশয় ক্ষীণভাবে অন্তঃশিলা প্রবাহিত হইতেছে। কেহ বা তাহা ঘন কথার পল্লবে আবৃত করিয়া সাধারণের চক্ষের আড়াল করিয়া রাখেন। শ্রেষ্ঠ কবিদিগের উক্ত পদ্ধতি সাধারণে চিরদিন ধরিয়া অনুমোদন করিয়া আসিতেছেন। কারণ কাহারও সৌন্দর্য্য পূর্ণ-সূর্য্যালোকেই খুলে ভাল আবার কেহ বা অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়াই শোভা পায়।

আমি আপাততঃ, জয়দেব বিষয়টি কাব্যাকারে গঠিত করিয়া কিরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন—সেই সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহাই বলিতেছি।

জয়দেবের কবিতা-সকল প্রকৃতির শোভা, রাধাকৃষ্ণের রূপ এবং তাঁহাদের বিরহ মিলন ইত্যাদি অবস্থার বর্ণনায় পূর্ণ। সুতরাং তাঁহার বর্ণনা বিষয়ে কৃতকার্য্যতা অনুসারে তাঁহার কবিত্ব শক্তির স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইবে। কবিরা দুইরূপ প্রণালীতে বর্ণনা করিয়া থাকেন। প্রথম—স্পষ্ট এবং সহজ ভাবে। দ্বিতীয়, বর্ণিত বিষয় ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দেন। উভয় উপায়ই প্রকৃষ্ট এবং শ্রেষ্ঠকবিরা উভয় প্রণালী অনুসারেই বর্ণনা করিয়া থাকেন।

জয়দেব কেবল মাত্র প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন।

বর্ণনার পারিপাট্য ও সৌন্দর্য্য, উপমাদির অলঙ্কার সকলের প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ রূপে সাধিত হয়।

এ জগতে সকল পদার্থের মধ্যেই একটা মিল আছে। আমাদের সময়ে সময়ে কোনও একটি পদার্থ কিম্বা ঘটনা দেখিয়া মনে হয় যেন আর অন্য একটি কি জিনিশে এইরূপ ভাব দেখিয়াছিলাম। পৃথক পৃথক পদার্থের ভিতরকার এই সামঞ্জস্যের তুলনা হইতে উপমাদির উৎপত্তি।

উপমাদির দ্বারা দুইটি কার্য্যসিদ্ধ হয়।

(১) ইহার দ্বারা একটি অস্পষ্ট ভাবকে স্পষ্ট করা যায়।

(২) ইহার দ্বারা ভাবের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা যায়।

ইহা ব্যতীত কোন দুইটি ভাব বা পদার্থের ভিতর আমার-অলক্ষিত কোন মিলকেই দেখাইয়া দিলে মনে বিশেষ আনন্দ লাভ করা যায়।

কবিতার যে সকল উপমা দেওয়া হয় তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য—কোনও একটি ভাবের উপমার সাহায্যে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি এবং কেবল মাত্র উপমার পদার্থ দ্বারা মনের তুষ্টি সাধন। সুতরাং জয়দেবের বর্ণনার পদার্থ এবং সৌন্দর্য্য অনেকটা তাঁহার উপমাদি অলঙ্কার প্রয়োগের শক্তি সাপেক্ষ।

জয়দেবের বিরহাদি বর্ণনা নেহাৎ একঘেয়ে। তাঁহার বিরহী বিরহিনীদিগের নিকট যে বস্তু মনের সহজ অবস্থায় ভাল লাগিবার কথা তাহাই শুধু খারাপ লাগে। জয়দেব বিরহের ভাবের জন্য কোনও অংশ ধরিতে পারেন নাই। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে যক্ষস্ত্রীর যে বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে জয়দেবের বর্ণনায় বৈচিত্রতার অভাব এবং বিরহাবস্থার মধ্যে যে মধুর সৌন্দর্য্য আছে তাহার সম্পূর্ণ উল্লেখের অভাব—এই দুইটি ত্রুটি আমাদের নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

জয়দেবের অভিসার বর্ণনায় কেবল মাত্র বেশভূষার বর্ণনাই দেখিতে পাই।

তাহাতে অভিসারিকার মনের আবেগ—প্রেমের নিমিত্ত অবলা রমণীগণ কি রূপে নানাবিধ বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে—এ সকল বিষয়ে তিনি একটি কথাও বলেন নাই। এ বর্ণনাও নেহাৎ একঘেয়ে।

তাঁহার বসন্ত বর্ণনার প্রধান দোষ তাহাতে একটিও সম্পূর্ণ নূতন কথা দেখিতে পাই না। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিরা যে সকল বসন্ত বর্ণনা লিখিয়াছিলেন—তাহা হইতেই তাঁহার বসন্ত বর্ণনার উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

নূতনত্বের কথাটা ছাড়িয়া দিলেও তাহাতে আরও অনেক দোষ বাহির হইয়া পড়ে। তাঁহার সমস্ত বর্ণনাটিতে সমগ্র বসন্তের ভাব ফুটিয়া উঠে না। তিনি এ কথা ও কথা বলেন কিন্তু তাহার ভিতর হইতে—একটা কোনও ভাব খুব স্পষ্ট রূপে দেখা যায় না। কালিদাস অনেক স্থলে বসন্ত বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার অনেক স্থলেই তিনি একটি মাত্র শ্লোকে হয় বসন্তের সমগ্র ভাব প্রকাশ করিয়াছেন নয় একটি মান-চিত্রে সমস্ত বসন্ত বদ্ধ করিয়াছেন। যথা—

দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং।
স্ত্রিয়ঃ সকামাঃ পবনঃ সুগন্ধিঃ॥
সুখাঃ প্রদোষা দিবসাশ্চ রম্যাঃ
সর্ব্বং প্রিয়ে! চারুতরং বসন্তে॥

জয়দেব বসন্ত বর্ণনায় অনেকগুলি বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু বর্ণিত বিষয়-গুলির মধ্যে খুব একটা ভাবের মিল নাই। তিনি একটি শ্লোকের প্রথম চরণে বলি-তেছেন—যে বসন্তে বিরহীগণ বিলাপ করিতেছেন—সেই শ্লোকের আর একটি চরণে অলিকুল কর্ত্তৃক বকুল কলাপ অধিকারের উল্লেখ করিয়াছেন—এ দুয়ের ভিতর যে কি স্বাভাবিক মিল তাহা আমি বুঝিতে পারি না। তাঁহার উদ্দেশ্য বসন্তে মদন রাজার অধিকার কি রূপ বিস্তৃত হইয়াছে তাহাই করা। কিন্তু কেবল মাত্র কোনও ফুলকে মদনের নখ এবং অন্য অপর আর একটিকে বিরহীদিগের হৃদয় বিদারণের অস্ত্র স্বরূপ বলিলেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যথার্থ মদন বিকারের ভাব কিসে ফুটিয়া ওঠে তাহা কালিদাসের একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

"মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈক পাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শ নিমীলিতাক্ষীং
মৃগী কণ্ডুয়ৎ কৃষ্ণসারঃ॥"

উক্ত শ্লোকে কালিদাস মদনের নখ দূরে যাউক তাঁহার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই—তথাপি প্রেমরস মত্ততার কি চমৎকার চিত্র আঁকিয়াছেন। সমগ্রভাবের কথা

কেন ? জয়দেব এমন একটিও শ্লোক রচনা করিতে পারেন নাই যাহাতে কোনও একটি পদার্থের সজীব চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রকৃতি বর্ণনাতেও যেরূপ—স্ত্রী পুরুষের রূপ বর্ণনাতেও তিনি ঠিক সেই রূপ অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

কালিদাস

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসে বসানা তরুণার্ক রূপং।
পর্য্যাপ্ত পুষ্প স্তবকাব নম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেক ॥

এই একটি শ্লোকে সমগ্র উমাকে কত সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—জয়দেব এইরূপ দুই চার কথায়—একটি স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সমগ্র চিত্র—বর্ণনা করিতে একান্ত অপারগ। তাঁহার বিশ্বাস পদ্মের ন্যায় মুখ, তিল ফুলের ন্যায় নাসিকা, ইন্দিবরের ন্যায় নয়ন এবং বান্ধুলির ন্যায় অধর, এই সকলের একত্র সমষ্টি করিলেই সুন্দরীর মুখ নির্ম্মাণ করা যায়।

উক্ত বিশ্বাসে ভর করিয়া বিদ্যাসুন্দরের কবি বিদ্যাকে তিল ফুল, নীলোৎপল, বান্ধুলি পুষ্প এবং কুন্দ কলিকা ইত্যাদির অতি সুনিপুণ সংযোজনায় যে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উপহার স্বরূপে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তাহা অবশ্য জয়দেবের তিলোত্তমার মুখ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত।

উক্ত প্রকার বিশ্বাসের উপর আমার কোনই আক্রোশ নাই—যিনি ইচ্ছা করেন তিনি ঐ সকল ফুল জোড়া তাঁড়া দিয়া যখন তখন মনের সুখে সুন্দরীর রূপ বর্ণনা করিয়া কবিতা লিখিতে পারেন, কেবল এই মাত্র মনে রাখিলেই আমি সন্তুষ্ট থাকিব যে উক্ত পদ্ধতি অনুসারে চলিলে মাথামুণ্ড কিছুই বর্ণনা করা যায় না।

তার পর জয়দেবের উপমার বিষয় কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই জয়দেবের উপমা সকল প্রায়ই নেহাৎ চলিত গোছের। জয়দেবের পূর্ব্বে সেই সকল উপমা শত সহস্র প্রকার সংস্কৃত কবিগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে। জয়দেব কাব্য জগতের বিস্তৃত ক্ষেত্র হইতে তাহা কুড়াইয়া লইয়াছেন মাত্র। কাব্য জগতে—না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করা প্রথাটা বিশেষ রূপ প্রচলিত আছে এবং কোনও কবি যদ্যপি উক্ত উপায়ে উপার্জ্জিত দ্রব্যের সমুচিত সদ্ব্যবহার করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে লোকে কিছু একটা বিশেষ দোষও দেয় না। নেহাৎ পরের দ্রব্য বলিয়া চেনা গেলেই আমরা রাগ করি এবং কবির উদ্দেশে কটু কাটব্যও ব্যবহার করি—কিন্তু যদি তাহার একটু মাত্রও রূপের পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই তাহা হইলেই ঠাণ্ডা থাকি। জয়দেব অনেক স্থলেই পরের উপমাদি

লইয়া তাহার একটু আধটু বদলাইয়া নিজের বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এ বিষয়ে হাত বড় মন্দ সাফাই নহে। আবার অনেক স্থলে যেমনটি পাইয়াছেন অবিকল তেমনটিই রাখিয়াছেন। এইরূপ উপমাদি পড়িয়া রাগ করি আর না করি—খুব যে খুসী হই তাহা নহে। যে কথা হাজার বার শুনিয়াছি তাহা আর কার শুনিতে ভাল লাগে? আমার ত পদ্মের মত মুখ ইত্যাদি কথা শুনিলেই মনটা একটু অন্যমনস্ক হয় এবং ঐরূপ উপমা বেশীক্ষণ পড়িতে হইলেই—হাই উঠিতে আরম্ভ হয়, কারণ ও সব পুরাণ কথায় মনে কোন নির্দ্দিষ্ট ভাব বা চিত্র আনয়ন করে না। শুনিবা মাত্রই মনে হয় ও সব ত অনেক দিনই শুনিয়াছি আবার অনর্থক ও কথা কেন? ভরসা করি আপনারা সকলেই আমার সহিত এ বিষয়ে একমত।

কিন্তু জয়দেব যে কেবল মাত্র প্রচলিত উপমাদি ব্যবহার করিয়াছেন এমন নহে—তাঁহার পরিকল্পিত দুচারিটি নূতন উপমাও গীতগোবিন্দে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে যেগুলি আমার নিকট বিশেষরূপ জয়দেবীয় বলিয়া বোধ হইয়াছে, আপনাদের জ্ঞাতার্থে তাহারি দুএকটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি! জয়দেব ঈশ্বরের নরহরিরূপ সম্বন্ধে বর্ণনায় বলিতেছেন—

"তব কর কমল বরে নথমদ্ভুত শৃঙ্গং
দলিত হরিণ্য কশিপু তনু ভৃঙ্গং"

ইহার দোষ প্রথমতঃ কমলের নখলাভ ও তৎকর্ত্তৃক ভ্রমরের বিনাশ, নিতান্ত অস্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ—নরসিংহের করযুগলকে কমলের সহিত তুলনা করায় এবং হিরণ্যকশিপুকে ভৃঙ্গের সহিত তুলনা করায় উভয়ের ভিতর বিরোধ'ভাবে পরিচয় দেওয়া হয় নাই।

তৃতীয়তঃ—কৃষ্ণ নরহরিরূপ গ্রহণ করিয়া দুর্দ্দান্ত দৈত্যকে বধার্থ স্বীয় বীরত্বের পরিচায়ক যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাকে কমল ও ভ্রমরের যুদ্ধ স্বরূপ বলায় ভাবের যাথার্থ্য ও সৌন্দর্য্য কতটা পরিমাণে বজায় থাকিল আপনারাই বিবেচনা করিবেন।

বলরামকে উল্লেখ করিয়া জয়দেব বলিতেছেন।

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলইতি ভীতি মিলিত যমুনাভং।

হল তাড়নার ভয়ে যমুনা ডেঙ্গায় উঠিয়া বলরামের দেহে বসনরূপে সংলগ্ন হইয়াছেন এরূপ অযথা কথা বলায় যদি কিছু সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি পাইত, তাহা হইলেও না হয় উপমাটি সহ্য করা যাইত। আমার বিবেচনায় জয়দেব বলরামকে জলে নামাইলে যমুনাকে আর দেশ ছাড়া করা আবশ্যক হইত না।

ক্রমশঃ শ্রী কিরণ. দা—

তরলদৃগঞ্চল চলনমনোহর বদনজনিত রতিরাগং
স্ফুট কমলোদর খেলিত খঞ্জন যুগমিব শরদি তড়াগং।

কৃষ্ণের নয়ন শোভিত বদন দেখিয়া মনে হইল যেন পদ্মের ভিতর খঞ্জনযুগল খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। কমলের ভিতর খঞ্জন যুগলের বিহার আমিত দেখি নাই, জয়দেবও দেখেন নাই, এবং আমার বিশ্বাস ওরূপ কার্য্য খঞ্জনেরা কখনও করেন না। এই উপমাটিও আমার নিকটে যেমন অপ্রকৃত তেমনি অর্থশূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

আমার এই উপমা তিনটি উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য কেবল জয়দেবকে নিন্দা করা নহে—আমি এই সকল হইতে জয়দেব কি জন্য এবং কি উপায়ে উপমা প্রয়োগ করিতেন তাহাই দেখাইব। এরূপ উপমা পড়িয়া আপনাদের কি মনে হয় না যে জয়দেব কেবল উপমা প্রয়োগ করাটা কবিতায় আবশ্যক বিবেচনায় উক্ত কার্য্য করিয়াছেন। বাস্তবিক উপমায় কবিতার সৌন্দর্য্য বাড়িল কিনা এবং কোনও বিশেষ ভাব পরিষ্কাররূপে তাহার সাহায্যে ব্যক্ত করা গেল কিনা এসব কথা জয়দেবের মনেও আসে না। উপমা আপনা হইতে তাঁহার কাছে আসে না তিনি জোর করিয়া তাহাকে আনেন। অর্থাৎ তাঁহার উপমায় স্বাভাবিকতা কিছু মাত্রও নাই কেবল মাত্র তাহা কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ। প্রমাণ—কবিরা প্রায়ই সুন্দর করযুগলকে কমলের সহিত তুলনা করেন তাই জয়দেব, নরসিংহের করযুগলকে কমলস্বরূপ বলিয়া বসিলেন এবং তাহাকে কমল বলায় হিরণ্যকশিপুকে তাঁহার বাধ্য হইয়া ভৃঙ্গ বলিতে হইল। ভাবের সৌন্দর্য্য বজায় থাকিল কি না সে কথা ভাবিয়া আর কি করিবেন? একটি ভুলের জন্য বাধ্য হইয়া আর একটি অন্যায় কাজ করিতে হইল। আবার দেখুন কবিরা মুখ পদ্মের সহিত তুলনা করেন এবং নয়নযুগলকে খঞ্জনের সহিত তুলনা করেন ইহা জয়দেবের নিকট অবিদিত ছিল না কিন্তু নয়ন-শোভিত বদনকে কবিরা কি বলেন তাহা তাঁহার জানা ছিল না কাজেই কি করেন তিনি উপমা স্বরূপে পদ্মের সহিত মনে মনে খঞ্জন নয়নের যোগ করিয়া ফেলিলেন কিন্তু উক্তরূপ কার্য্য করিয়াই বুঝিলেন যে এটা নেহাৎ বাড়াবাড়ি হয় তাই খঞ্জন নয়নের পরিবর্ত্তে খঞ্জনকেই কমলোদরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন—ল্যাঠা চুকিয়া গেল; জয়দেব হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কবিত্ব হইল কিনা সে কথা আপনারা ভাবুন।

আমি ক্রমে ক্রমে প্রমাণ করিয়াছি যে জয়দেব কোনও বর্ণিত বিষয়ের সাধারণ ভাব—অথবা তাহার সর্ব্বাবয়ব প্রত্যক্ষরূপ—সহজ ভাবে কিম্বা অলঙ্কারাদির সাহায্যে উত্তমরূপ বর্ণনা করিতে অসমর্থ, তখন তাঁহাকে এ বিষয়েও বড় কবি বলিয়া গণ্য করা যায় না। এখন আমি জয়দেবের ভাষা সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা বলিয়াই আমার প্রবন্ধ শেষ করিব।

জয়দেবের ভাষা অতি সুললিত এবং শ্রুতিমধুর ইহাত সর্ব্ববাদী সম্মত। এমন কি যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা অনভিজ্ঞ তাঁহারাও একথা স্বীকার করিয়া থাকেন ! বরং শেষোক্ত ব্যক্তিদিগকেই উক্ত বিষয়ে জয়দেবকে প্রচুর পরিমাণে প্রশংসা করিতে দেখা যায়।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কবিতায় ভাষার সৌন্দর্য্য হইতে ভাবের সৌন্দর্য্য পৃথক করা যায় না। ভাবের অনুরূপ ভাষা প্রয়োগেই যথার্থ কবিত্ব শক্তির পরিচয়। যাঁহাদের মস্তিষ্কে ভাব ও ভাষা একত্রে গঠিত হয় না—তাঁহারা লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য হয় ভাব বিষয়ে পাণ্ডিত্য নয় ভাষাবিষয়ে ছন্দ নির্ম্মাণের কৌশল এই দুইয়ের একটির সাহায্য লইতে বাধ্য হন। জয়দেব আমার বিবেচনায় যথার্থ উচ্চ অঙ্গের কবিতা রচনায় অক্ষমতা বশতঃ লোক সাধারণের চটক লাগাইবার অভিপ্রায়ে শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় কথার কারিগরি দেখা যায়। মনে কোনও একটি ভাব উদয় হইলে স্বভাবতই যে কথাটি মুখাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়—জয়দেব সেটিকে চাপিয়া রাখেন তাহার পরিবর্ত্তে শব্দশাস্ত্র খুঁজিয়া ভাবপ্রকাশ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনেকাংশে অনুপযোগী আর একটি কথা আনিয়া হাজির করেন। কালিদাসাদি যথার্থ শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনা প্রণালী স্বতন্ত্র। তাঁহারা যে কথাটি স্বভাবতই মুখে আসে সেইটিই ব্যবহার করেন তবে তাঁহাদের ভাবের সহিত আমাদের ভাবের অনেক পার্থক্য সুতরাং যে রূপ ভাষা প্রয়োগ করা তাঁহাদের পক্ষে সহজ সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা একান্তই দুঃসাধ্য। আপনার, আমার জয়দেবের সহিত তাঁহাদের এইটুকু মাত্র তফাৎ।

জয়দেবের ভাষার প্রধান দোষ Rhythm অর্থাৎ ছন্দের তাল লয়ের অভাব। তাঁহার ব্যবহৃত শব্দ সকল একটি প্রায় সম্পূর্ণ অন্য আর একটির ন্যায়। অতিরিক্ত মাত্রায় অকারান্ত শব্দের ব্যবহারে, পরস্পর শব্দ সকলের হ্রস্ব দীর্ঘাদি প্রভেদ যথেষ্ট পরিমাণে না থাকায় সুতরাং তাহাদের উচ্চারণের বৈচিত্র্য অভাবে জয়দেবের ভাষায় গাম্ভীর্য্যের অভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু বাক্যের যে অংশ শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য—তাহাও গাম্ভীর্য্য ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ রূপে মধুর হইতে পারে না। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ভাষা সম্বন্ধেও গাম্ভীর্য্যযুক্ত মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্যবিযুক্ত মাধুর্য্য অপেক্ষা বহুল পরিমাণে শ্রেষ্ঠ এবং "গীতগোবিন্দের" সহিত মেঘদূতের তুলনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় গাম্ভীর্য্য গুণবিশিষ্ট হওয়ায় শেষোক্ত কাব্যের ভাষা পূর্ব্বোক্ত কাব্যের ভাষা হইতে কত উৎকৃষ্ট।

সমভাবে উচ্চারিত, অকারান্ত শব্দের একত্র বহুল বিন্যাসের আর একটি দোষ তাহাতে পাঠ মাত্রই রচনার অর্থ গ্রহণ করা কিঞ্চিৎ কঠিন হইয়া উঠে। বিভিন্ন বিভিন্ন শব্দ সকল পরস্পর হইতে বিশেষ রূপে স্বতন্ত্র না হইলে পাঠ কালীন্ তাহাদের প্রত্যেকের উপর নজর পড়ে না। একটি শ্লোকের অন্তর্ভূত শব্দ সকলের আকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য যত সুস্পষ্ট তাহার অর্থও সেই পরিমাণে চট্ করিয়া বুঝা যায়।

শব্দ সকলের বৈচিত্র্য বজায় রাখিয়া, তাহাদের ভিতর সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া যিনি রচনাকে শ্রুতিমধুর করিতে পারেন তিনিই যথার্থ ভাষার রাজা। জয়দেব তাঁহার রচনায় হ্রস্ব দীর্ঘাদির প্রভেদ জনিত বন্ধুরতা ভাঙ্গিয়া, মাজিয়া ঘসিয়া এমন মসৃণ করিয়াছেন যে পড়িতে গেলে তাহার উপর দিয়া মন পিছলাইয়া যায় প্রত্যেক শব্দটির উপর মনকে লিপ্ত করা কঠিন হইয়া উঠে—কিন্তু প্রত্যেক শব্দটির উপর মন বসাইতে না পারিলে সমস্ত রচনার অর্থের উপরেও অমনোযোগ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে।

গীতগোবিন্দে কথার বড় একটা কিছু অর্থ নাই বলিয়াই, জয়দেব যে চাতুরী করিয়া যাহাতে পাঠকের মন ভাবের দিকে আকৃষ্ট না হইতে পারে সেই অভিপ্রায়ে উক্ত প্রকার শ্লোক রচনা করিয়াছেন এমন বোধ হয় না। কিন্তু ফলে তাহাই দাঁড়াইয়াছে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি শুধু জয়দেবের দোষ দেখাইয়া আসিয়াছি। তিনি যে উৎকৃষ্ট কবিদের সহিত সমশ্রেণীতে আসন গ্রহণ করিতে পারেন না তাহাই দেখান আমার উদ্দেশ্য।

যাঁহার কাব্যের বিষয় প্রেমের তামসিক ভাব—মানবদেহের সৌন্দর্য্য যাঁহার দৃষ্টিতে ততটা পড়ে না, যিনি মানবদেহকে ভোগের বিষয় বলিয়াই মনে করেন, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সহিত যাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই—যিনি বর্ণনা করিতে হইলেই শোনা কথা আওড়ান—যাঁহার ভাষার কবিত্ব অপেক্ষা চাতুরী অধিক—এক কথায় যাঁহার কাব্যে স্বাভাবিকতার অপেক্ষা কৃত্রিমতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাঁহাকে আমি উৎকৃষ্ট কবি বলিতে প্রস্তুত নহি—ভরসা করি এবিষয়ে আপনারাও আমার সহিত একমত।

কিন্তু এ সকল কথা সত্য হইলেও জয়দেবকে যে অনেকে বড় কবি বলিয়া মনে করেন সে কথাও ত অস্বীকার করিবার যো নাই। জয়দেব সম্বন্ধে এই সাধারণ মত কি কি কারণ প্রসূত তাহা আমি কতকটা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছি। নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমতঃ—শৃঙ্গার রসের বর্ণনায় জয়দেব তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা প্রস্ফুটিত করিয়া তুলেন। তখন তাঁহার কবিতা বিশেষ রূপ স্বাভাবিক হইয়া উঠে। তখন তিনি কোনও প্রকার অপ্রকৃত ও অযথার্থ কথা বলেন না।

মনের ভাবের কথা নাই বলিলেন রোমাঞ্চ ইত্যাদি একান্ত শরীরী ভাব সকলের বর্ণনায় ত তিনি কাহারও অপেক্ষাও নিকৃষ্ট নন। আর তাঁহার ভাষার গাম্ভীর্য্য ইত্যাদি গুণ নাই বটে—কিন্তু তাহা শৃঙ্গাররসের বর্ণনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যুবতীদিগের দেহের ন্যায় তাঁহার শব্দ গুলিও কুসুম-সুকুমার। যখন রূপসীদিগের কবরী শিথিল হইয়া যাইতেছে, নীবিবন্ধন খসিয়া পড়িতেছে, যখন সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বন্ধন শ্লথ হইয়া আসিতেছে তখন ভাষার বাঁধুনি কি করিয়া প্রত্যাশা করা যায়? রাধার দেহের ন্যায় গীতগোবিন্দের ভাষা নিঃসহ নিপতিত লতাস্বরূপ। তাই শৃঙ্গার

রস বর্ণনা কালে তাঁহার ভাষা ভাবের অনুরূপ। তিনি শৃঙ্গার রসেরই কবি। কিন্তু যে রসের হউন না কবি ত বটে। এবং যথার্থ কবির রচনা যে দরেরই হউক লোকের ভাল লাগিবেই লাগিবে। সুতরাং জয়দেবের কাব্য সাধারণের নিকট একেবারেই অনাদরের—সামগ্রী নহে।

সাধারণের সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞতা আর একটি কারণ।

সংস্কৃত না জানার দরুণ ভাষার লালিত্য হইতে লোকে ধরিয়া লয় ভাবের অবশ্য মহত্ত্ব আছেই আছে।

তৃতীয়তঃ; রাধাকৃষ্ণের প্রেম জয়দেবের কাব্যের বর্ণিত বিষয় বলিয়া—সাধারণের নিকট জয়দেবের কাব্য উপাদেয়। এ পৃথিবীতে ফুল, জ্যোস্না, মলয়পবন, কোকিলের কুহুস্বর আমাদের সকলেরই ভাল লাগে। চিরদিন লোক মাত্রেরই ভাল লাগিয়াছে এবং চিরদিন ভাল লাগিবে।

কিন্তু আরও কতকগুলি বস্তু আছে যাহার যথার্থ একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য না থাকিলেও অভ্যাস ও সংস্কারবশতঃ আমাদের ভাল লাগে।

যমুনার জল, তমালের বন, বৃন্দাবন, মথুরা, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি, এ সকলের মধুরতা পূর্ণিমারজনী দক্ষিণপবনের ন্যায় আমাদের নিকট পুরাতন হয় না—যিনিই এ সকলের কথা বলেন তাঁহার কথাই আমাদের শুনিতে ভাল লাগে। আমরা অনেকেই বৃন্দাবন যমুনার জল এ সকল কিছুই দেখি নাই— কৃষ্ণের বংশিধ্বনিও কখন শুনি নাই—তবে তাহাদের কথা এত প্রাণস্পর্শ করে কেন?

কারণ ঐ এক একটি কথায় হৃদয়ে কত সুন্দর কত মধুর স্মৃতি জাগাইয়া তুলে। আমরা যমুনার জল দেখি নাই বটে—কিন্তু তাহার সম্বন্ধে আশৈশব এত অধিক কথা শুনিয়াছি ও এত সুন্দর কবিতা পড়িয়াছি—যে যমুনার সমস্ত সৌন্দর্য্য আমাদের হৃদয়ে চিরদিনের জন্য লিপ্ত হইয়া গিয়াছে—তাই রাধাকৃষ্ণের প্রণয় সম্পর্কীয় সকল বস্তুকেই প্রকৃতির চিরস্থায়ী সুন্দর অংশ সকলের মধ্যে ভুক্ত করিয়া ফেলি।

সুতরাং জয়দেব যখন সেই যমুনা, সেই বাঁশি, সেই রাধাকৃষ্ণ, ও সেই বৃন্দাবনের কথা বলেন তখন তাঁহার পরবর্ত্তী তাঁহা অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিরা আমাদের মনে ঐ সকলের যে সুন্দর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহারই দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে। আমরা আসল কারণ না বিচার করিয়া মনে করি—জয়দেবের কবিতা পড়িয়াই আমরা মোহিত হইতেছি। একের গুণ আমরা ভুল ক্রমে অন্যে আরোপ করি। চণ্ডীদাসাদি বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাব্যের বিষয় না করিলে জয়দেবের কাব্য ততটা ভাল লাগিত না।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

প্রেম। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

বৈষ্ণব কবিদিগের কল্যাণে আমাদের প্রেম-সাহিত্য বজায় রহিয়া গেল বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে প্রেমের যেরূপ স্বাধীন চর্চ্চা হইয়াছে আমাদের সেরূপ কোন কালে হয় নাই। আমাদের সামাজিক রীতিনীতি সকলই স্বাধীন প্রেম-চর্চ্চার বিরোধী। প্রেমের সম্যক্ স্ফূর্ত্তির পূর্ব্বেই আমাদের দাম্পত্য-বন্ধন; সুতরাং স্বাধীন প্রেম-চর্চ্চার আবশ্যকই থাকে না। প্রাচীনকালে এ দেশে স্বয়ম্বর প্রথা ছিল, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অভিলষিত ব্যক্তির সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া যাইত; কিন্তু তাহাতে যে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় প্রেমবৃত্তির এ দেশে সম্যক্ অনুশীলন হইয়াছে তাহা নহে। স্বয়ম্বর প্রথায় রূপ এবং গুণ মাত্র নির্ব্বাচনের সহায়তা করে। পাশ্চাত্য প্রেমেও রূপ এবং গুণ মূল উপাদান। কিন্তু পরস্পরের হৃদয়ে স্ব স্ব প্রেমের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিতে কত যত্ন এবং অনুষ্ঠান! এই সকল আশা-নৈরাশ্য-উদ্যম অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রেম-চর্চ্চা না হইয়া থাকিবার যো নাই। স্বয়ম্বরে গুণের সহিত, হৃদয়-বৃত্তির সহিত সংঘর্ষে আসিতে হয় না, তাহা কেবল শ্রদ্ধামাত্র। পাশ্চাত্য দেশের সমাজ-গঠন স্ত্রী এবং পুরুষের স্বাস্থ্যজনক সম্মিলনের অনুকূল, বিশেষতঃ প্রেমের উপরেই সেখানে দাম্পত্য-বন্ধন অনেকটা নির্ভর করে, প্রেমের স্বাধীন চর্চ্চা এই কারণে অপরিহার্য্য। আর প্রেমের স্বাধীন চর্চ্চায় বাধা দিতে না পারিলেই হিন্দু সমাজের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া যায়। প্রেম ত আর জাতি কুল বিচার করিয়া আসে না। তবে দৃঢ় সমাজবন্ধনে বাঁধিয়াও নাকি মানব-প্রকৃতিকে একেবারে চাপিয়া রাখা যায় না, সেই জন্য শৃঙ্খল-জর্জ্জর বদ্ধ সমাজ-হৃদয়ের মধ্য হইতেও প্রেমের মুক্তভাবের সঙ্গীত উঠিয়াছে। এই মুক্ত ভাব আমাদের বৈষ্ণব কবিদিগের রচনায়। প্রেম-প্রধান বৈষ্ণব ধর্ম্ম হিন্দু সমাজের নিগড়বদ্ধ সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতাপ্রয়াসী উদার হৃদয়ের প্রবল বিদ্রোহ। যেখানে ব্রাহ্মণ শূদ্রস্পর্শে আপনাকে কলঙ্কিত বোধ করিতেন, সেখানে বৈষ্ণব ধর্ম্ম চির-রুদ্ধ-দ্বার মুসলমানকে পর্য্যন্ত প্রেমালিঙ্গন দিতে কুণ্ঠিত হইল না। বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে মুক্ত প্রেমের আধার হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? প্রেমানুশীলনেই ত সে হিন্দুসমাজের অন্তরে অন্তরে আঘাত দিয়াছিল। ভাগবতের কবি বোধ করি প্রেমের মুক্তভাবের আবশ্যকতা প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিরা তাঁহার কার্য্য অগ্রসর করিয়া দেন, চৈতন্যে আসিয়া সেই মুক্তভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ হইল—সে ভাব আকার প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার অবসর পাইল। পূর্ব্বে যাহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় বীজভাবে লুক্কায়িত ছিল, চৈতন্যে তাহার পূর্ণ প্রকাশ। আমাদের সমাজে বা সাহিত্যে আদি রসের প্রাবল্য সত্ত্বেও প্রেমের বৈষ্ণব অনুশীলন কোথায়? ইদানীন্তন

কবিরা মধ্যে মধ্যে সমাজ-নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন বটে, কিন্তু মুক্ত ভাবের অনভ্যাসে কেবল এক প্রকার অস্বাস্থ্যকর হীনভাব রহিয়া গিয়াছে মাত্র। আর বৈষ্ণব প্রেম-চর্চ্চাও ত চলিল না। এখানে সেই যন্ত্র-নিয়ম। সুতরাং প্রেমের গঠন কার্য্য এবং শিক্ষা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জাতির মত অভিজ্ঞতা আমাদের সম্ভব নহে। সে সমাজের গঠন-প্রণালীই প্রেম-চর্চ্চার অনুকূল।

কিন্তু তথাপি পাশ্চাত্য সাহিত্যকে আমরা কিছু দিয়া যদি ধরিতে পারি ত সে প্রেম। এমন কি, সময়ে সময়ে মনে হয় যে, বৈষ্ণব কবিদিগের সাহায্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যকে আমরা ছাড়াইয়া উঠিতে পারি বা। ইহা দুরাশা এবং শূন্য গর্ভ কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু এমন দুরাশাও মধ্যে মধ্যে হৃদয়ে জাগে। বোধ করি, একদিক দিয়া দেখিলে আমাদের এ কল্পনাও কতকটা সত্য হইয়া দাঁড়ায়। সে দিক প্রেম-ভাবের সাধারণ বৈচিত্র্য। সাধারণ বৈচিত্র্য কাহাকে বলে বুঝান কিন্তু সুকঠিন। বৈষ্ণব কবির প্রেম-চর্চ্চায় স্ত্রী পুরুষের প্রণয় ব্যতীত প্রেমের সখ্য এবং বাৎসল্য রস আলোচিত হইয়াছে, এমন কি, পশু জগৎও সে প্রেম হইতে বঞ্চিত হয় নাই। এ হিসাবে অবশ্য প্রেমের সাধারণ বৈচিত্র্য কতকটা বুঝান যায়। কিন্তু স্ত্রী পুরুষের প্রেমের সাধারণ বৈচিত্র্য কিছু স্বতন্ত্র। বৈষ্ণব কাব্যে বিশেষ বিশেষ সাধারণ অবস্থার স্বতন্ত্র ভাব লইয়া যে আলোচনা আছে তাহাতেই সাধারণ বৈচিত্র্য সমধিক ব্যক্ত বলিয়া বোধ হয়। শুধু অবস্থা ভেদ অবশ্য সর্ব্বস্ব নহে, প্রেমের একটা সাধারণ ভাবও ইহার মধ্যে থাকা চাই। প্রেমের এই সাধারণ ভাব—সাধারণ বৈচিত্র্য নহে—পাশ্চাত্য কাব্যে বহুল। বৈষ্ণব কাব্যেও ইহার অভাব নাই। সাধারণ বৈচিত্র্যের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও আমরা তাহার উদাহরণ দেখাইতেছি। রাধাকৃষ্ণের প্রেমালোচনায় বিরহ, ভূত-বিরহ, ভাবী বিরহ, মান, অভিসার এই সকলই প্রেমের সাধারণ বৈচিত্র্যের অন্তর্ভূত। এই গেল প্রেমের একদিক। এবং এই দিকে আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমকক্ষতা স্পর্দ্ধা করি। কিন্তু প্রেমের আর এক দিকে আমরা বড় অগ্রসর নহি। মোটামুটি তাহাকে কাহিনী-বৈচিত্র্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কাহিনী-বৈচিত্র্য সে দিকের গভীরতা এবং বিস্তৃতির ভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম। পাশ্চাত্য কবিরা বিবিধ চরিত্র গঠনে প্রেমের নানাদিক দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের প্রেমের সহিত সংসারের নানাবিধ জটিল সম্পর্ক, মানব-চরিত্রের নিগূঢ় রহস্য। অনেক সময়ে যৌবনের একটা ব্যক্তিবিশেষ-বদ্ধ-নহে এমন তীব্র আকাঙ্ক্ষা পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিশেষ পরিস্ফুট দেখা যায়। বৈষ্ণব কবিদিগের এরূপ ব্যক্তি সম্পর্ক-শূন্য অথচ মানব-প্রেম বোধ করি নাই। ইহা ভিন্ন প্রেমের আরম্ভের বিবিধ জটিল রহস্য পাশ্চাত্য সাহিত্যে যেরূপ সুব্যক্ত আমাদের সেরূপ বোধ হয় না। কিন্তু এ সকল কথার দুই চারি কথায় মীমাংসা অসম্ভব। বর্ত্তমান লেখকের এ বিষয়ে মীমাংসার ক্ষমতা নাই। সত্যের

অনুরোধে বলিতে হয় যে, ব্যুৎপত্তি অভাবে বিষয়টী তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত নহে। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশ সম্বন্ধে পদে পদে ভ্রম সম্ভাবনা।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি, পাশ্চাত্য দেশে মানবপ্রকৃতিগত বিরহ, অভিমান প্রভৃতি থাকিলেও এ দেশের সাহিত্যের মত পাশ্চাত্য সাহিত্যে এ সকল বিষয় তেমন প্রাধান্য লাভ করে নাই। বিরহ সে দেশেও আছে, এবং অবিকল প্রতিশব্দের অভাব থাকিলেও কাব্যে বিরহ-ভাব পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশের মত বিরহ কাব্য পাশ্চাত্য সাহিত্যে দুর্লভ। তাহার কারণ, সামাজিক অবস্থার প্রভেদ। অন্যান্য বিবিধ বিভিন্ন কারণও হয়ত ইহার মূলে অল্প বিস্তর কার্য্য করে; যেমন, প্রকৃতির প্রভাব, জাতির চরিত্রগত বিশেষত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি। বিরহ-জ্বালা কিন্তু মানব প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ। প্রিয়জনকে আমরা কাছে কাছে রাখিতে চাই। যখন তাহার দর্শন স্পর্শন শ্রবণ হইতে বঞ্চিত হই, তখন স্বভাবতই কাতর হইয়া পড়ি। প্রাচ্য হৃদয়ের সহিত পাশ্চাত্য হৃদয়ের এখানে প্রভেদ হইতে পারে না। তবে নানা অবস্থা ভেদে আমাদের বিরহ পাশ্চাত্য বিরহ হইতে স্বতন্ত্র এবং দারুণ। কেহ কেহ বলেন, পাশ্চাত্য হৃদয় অবিশ্রান্ত উদ্যমে প্রকৃতিকে দমন করিয়া রাখে—সম্পূর্ণ জোর করিতে দেয় না, আর আমরা তাহার প্রভাবে অনেকটা ভাসিয়া যাই, এই কারণে আমাদের সহিত পশ্চিমের বিরহ-বিষয়ে এত প্রভেদ। এ কথা অভ্রান্ত কি না জানি না, কিন্তু নিতান্ত অশ্রাব্য নহে।

মানাভিমানের ব্যাপার আলোচনা করিয়া দেখিলে বিভিন্ন সমাজের প্রভাব আরও সুস্পষ্ট বুঝা যায়। সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া কৃত্রিম অভিমান সকল দেশেই আছে। কিন্তু অভিমানের গুরুতর কারণ, প্রেমের মূল নিয়ম লঙ্ঘন। আমাদের দেশে স্ত্রীজাতির কোন বিষয়ে হাত নাই। স্বামী ইচ্ছা করিলে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে পারেন, সুতরাং অন্যার প্রতি তিনি অনুরক্ত জানিলেও স্ত্রীর কিছু বলিবার অধিকার নাই। দুই দিন গৃহ-কোণে নয়ন-জলে তাহার অভিমান সমাপন করিতে হয়। অধিক দূর গড়াইলে হয়ত দুইটী মিষ্ট বচন এবং স্বামীদর্শনসুখলাভ হইতেও বঞ্চিত হইয়া সধবাবস্থায় বৈধব্য-যন্ত্রণা বহন করিতে হইবে। অগত্যা দুই দিনের সাধনাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া আবার পূর্ব্ববৎ ভাব অবলম্বন না করিলে চলে না। অভ্যাসবশতঃ পুরুষের অন্যানুরক্তি স্ত্রীর নিকট তেমন গুরুতর কিছু নহে। ইংরাজ স্ত্রীর আমাদের স্ত্রী অপেক্ষা স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা আছে। তাঁহাদের প্রেমের সহিত বিশেষ রূপে সম্মানের ভাব জড়িত। প্রেমের মূল নিয়মে আঘাত এই জন্য ইংরাজ স্ত্রীর অসহ্য। সেখানে আঘাত পড়িলে তাঁহার সমস্ত সম্মানে আঘাত পড়ে। পাশ্চাত্য দেশে অবরোধ প্রথা ত সম্মান-প্রমাণ নহে, প্রেমের একনিষ্ঠতা পুরুষের পক্ষেও নিতান্ত আবশ্যক। এই নিয়ম ভঙ্গ করিলে দম্পতির দৃঢ় বন্ধনও ছিঁড়িয়া যায়। সুতরাং আমাদের

অভিমানে চোখের জলের যে টুকু রস থাকে, পাশ্চাত্য অভিমানে সকল সময়ে তাহা না থাকিতেও পারে। এ দেশে ভাঙ্গা মান দুই চারি টী মিষ্ট কথায় জোড়া লাগে। পাশ্চাত্য দেশে ভাঙ্গিলে গড়া তত সহজ নহে। স্ত্রী পুরুষ কাহার পক্ষে কোন্‌টা কতদূর সুবিধা অসুবিধা স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু ইহা হইতে সামাজিক অবস্থা-ভেদে প্রেম-ভাবের বিভিন্নতা সহজেই উপলব্ধি হয়। বিভিন্ন সমাজের কাব্যও তাই স্বতন্ত্র ভাবের।

পাশ্চাত্য সমাজের সহিত আমাদের সমাজের খুঁটিনাটি কোথায় কি রূপ প্রভেদ জানি না, কিন্তু প্রধানতঃ মুক্ত ভাবেই বোধ করি এ দেশের সহিত পশ্চিমের অনৈক্য। আমাদের বদ্ধ অবরোধ এবং নিশ্চেষ্ট সুখই জীবনের প্রধান উপভোগ। পাশ্চাত্য দেশে অবিশ্রান্ত স্বাধীন উদ্যম। সুতরাং সহজেই বিলাসের দিকে আমাদের গতি। স্বাধীনতাপ্রিয় পাশ্চাত্য জাতির প্রেমে সুগভীর সম্মানের প্রতিষ্ঠা—প্রেমকে সে জাতি লঘুভাবে দেখিতে পারে না। আমরা প্রেমকে ততটা সম্মান দিই না। তবে বৈষ্ণব কবির নিকট প্রেমের মর্য্যাদা আছে।

তাহা হইলে বৈষ্ণব কবির রাধাকৃষ্ণের প্রেম আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। দাম্পত্য-প্রণয় না হইলেও প্রেমের সম্মানের তারতম্য কতকটা বুঝা যায়। রাধিকা কৃষ্ণের প্রতি একান্ত অনুরক্তা, কৃষ্ণের জন্য তাঁহাকে কুলেশীলে জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণ ত সেরূপ একনিষ্ঠ নহেন। বার বার প্রেমের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তিনি রাধার নিকট অপরাধী হইয়াছেন, তবুও রাধা ক্ষণিক অভিমানের পর কথা না কহিয়া থাকিতে পারেন না। রাধার কথাবার্ত্তায় বা ভাবভঙ্গীতে মর্ম্মাহতা পাশ্চাত্য রমণীর তেজ-ভাব বড় নাই। তবে বৈষ্ণব কবির প্রেমে সম্মানের গভীরতা কোথায়? কিন্তু এইখানে একটী কথা আছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেম বৈষ্ণব কবি কি ভাবে দেখিতেন? বৈষ্ণব কবির কৃষ্ণ এই বিপুল সংসারের পালনকর্ত্তা। রাধা তাঁহার সৃষ্টি। অসীমের প্রেম পরিমিত আত্মার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে পারে না, বিপুল সংসারের সর্ব্বত্রই ত তাঁহাকে প্রেম বিতরণ করিতে হইবে। রাধার কিন্তু কৃষ্ণে সম্পূর্ণ তৃপ্তি। রাধার অভিমান কেবল কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে না পারিয়া। কিন্তু এ আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিলে কিছুই বুঝা যায় না। একটু নামাইয়া দেখিতে হইবে। তাহা হইলে আবার বৈষ্ণব কবির উদ্দেশ্যের অবমাননা করা হয়। সকল বৈষ্ণব কবিই যে আধ্যাত্মিক ভাবে তন্ময় হইয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নাও হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা হয়ত পূর্ব্ব কবিদিগের পদানুসরণ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু উচ্চ ভাবেও প্রেমের সম্মান ভাব কতকটা বুঝা যায়। সসীমের ঐকান্তিক নিষ্ঠায় অসীমও বাঁধা পড়িয়াছে; ইহা কি সামান্য মর্য্যাদা? তবে প্রেমের ত্রুটি করিয়া কৃষ্ণ সমস্ত জগৎ উপেক্ষা করিয়া রাধার মধ্যেই সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে পারেন না। রাধার তাহাতে তৃপ্তি না হইতে পারে, নাচার।

কিন্তু অসীমে না গিয়াও বৈষ্ণব কবির প্রেমের সম্মান-ভাব দেখা যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যে ঈশ্বরপ্রেমের মানবীকরণ হইয়াছে। সম্মান-ভাব এ সাহিত্যে যদি না থাকিবে তবে এত প্রেমের গান কেন ? আমরা চণ্ডীদাসের একটী গান হইতে বৈষ্ণব প্রেম সম্মান দেখাইতেছি। রজকিনীকে তিনি যখন প্রেম জানাইয়াছেন তখন বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন, কামগন্ধ নাহি তায়। এইখানেই প্রেমের সম্মান ভাব পরিস্ফুট। যেখানে আধ্যাত্মিকতা এমন প্রবল সেখানে একনিষ্ঠতার অভাব হইতেই পারে না। সুতরাং বৈষ্ণব কবি প্রেমের একনিষ্ঠ সম্মান-বিষয়ে অনভিজ্ঞ নহেন। একনিষ্ঠতাই তাঁহার লক্ষ্য।

রাধাকৃষ্ণের কাহিনী সমাজক্ষেত্রে কতকটা হয়ত লাগান যাইতে পারে। রমণীর প্রেমে বদ্ধ হইয়া সংসারের সকল কাজ কর্ম্মে পুরুষ উদাসীন হইতে পারে না। বাস্তবিক, প্রেমের ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণতা নহে। কিন্তু সে কথা অস্বীকার করিতেছে কে ? পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সহিত এ কথার যোগই বা কোথায় ? একনিষ্ঠতা আবশ্যক। তাহা ত সঙ্কীর্ণতা নহে। প্রেম বিতরণে একনিষ্ঠতার হানি হয় না। প্রেমের ছলনা করিয়া যথেচ্ছারিতা অবলম্বনই একনিষ্ঠতার হানিকর। এইখানেই প্রেমের সম্মান লোপ। আমাদের সামাজিক নিয়মে ইহার বাধা নাই।

কিন্তু সমাজ-নিয়মের বাধা না থাকিলেও প্রাচীন ভারতে পুরুষের একনিষ্ঠতার মহত্ত্ব উজ্জ্বলচিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঋষি-কবির রামচন্দ্রের চরিত্রই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। রামচন্দ্র দায়ে পড়িয়া সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সাধ্বী পতিব্রতার অকপট প্রেমের প্রতি ভুলিয়াও অবজ্ঞা প্রকাশ করেন নাই। তিনি যজ্ঞ করিলেন—স্বর্ণের সীতা নির্ম্মাণ করাইয়া। তপোবনের বিজন নীরবতা মধ্যে এই সংবাদ জানকীর নিরাশ হৃদয়ে কি সান্ত্বনা দিয়াছিল ! রামায়ণে প্রেমের অন্যান্য দিকও প্রদর্শিত হইয়াছে; যেমন, স্নেহ, ভক্তি, সৌহার্দ্দ। সে সকল দিক আলোচনার আমাদের এখন তেমন আবশ্যক নাই। আমরা কেবল বলিতে চাহি যে, মহৎভাবের প্রতি সম্মান সর্ব্বত্রই। প্রাচ্য বলিয়াই মানব-চরিত্র অধঃপতিত নহে।

স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ভাব হইতেই বোধ করি প্রেমের সম্মান-ভাবের উৎপত্তি। পাশ্চাত্য দেশে রমণীর প্রতি সম্মান-প্রদর্শন বহুদিন হইতে বিবিধ উপায়ে অনুশীলিত হইয়া আসিতেছে। আমরা স্ত্রীজাতিকে অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া দেখি, পাশ্চাত্য জাতি উত্তমার্দ্ধ বলিয়া গণ্য করেন। মধ্য যুগে Chivalryর প্রসাদে পাশ্চাত্যেরা রমণীকে যে ঊর্দ্ধে উঠাইয়াছেন শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। কিন্তু তাহাতে পাশ্চাত্য জাতির হৃদয়ের আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। পাশ্চাত্য দেশে সেই অবধি রমণীর সম্মান বাড়িয়া উঠিয়াছে। তবে মধ্য যুগের অনেক বাহ্য অনুষ্ঠান এখন সরিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে অন্ধকূপে অসূর্য্যম্পশ্যা করিয়া মাথার উপরেই রমণীর

সম্মান নির্ভর করে। পুরুষজাতির সহিত মুখদেখাদেখি না থাকায় সমাজের অর্দ্ধাঙ্গের সম্মান-বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত। পাশ্চাত্য সমাজে স্ত্রীপুরুষে মিশামিশি আছে, উভয়েরই তাহাতে সংযত হইয়া চলিতে হয়। বলবান্ পুরুষ রমণীকে সমধিক সম্মান করিতে শিখে, স্ত্রীজাতিও পুরুষের সহিত আলাপাদিতে অনেক উন্নত শিক্ষা লাভ করে। স্ত্রীর প্রতি বিশেষ সম্মান পাশ্চাত্য সমাজের শিরায় শিরায় না প্রবেশ করিলে সেখানে প্রেমের সংযত স্বাধীন চর্চ্চা এতদিন চলিত না। আমাদের সমাজে শুভদৃষ্টি পর্য্যন্ত রূপ, গুণ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম সকলই ত পরের মুখে। পূর্ব্বরাগমূলক দাম্পত্যবন্ধন যে সমাজের অস্থিমজ্জায় সে সমাজে স্ত্রীপুরুষের স্বাস্থ্যকর সম্মিলন অপরিহার্য্য। ভাল মন্দের কথা হইতেছে না—ইহা আবশ্যক, না হইলে নয়।

পূর্ব্বরাগ মানবপ্রকৃতির অস্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। বোধ করি, অসূর্য্যম্পশ্যারও প্রেম-বিষয়ে স্বাধীনতা ভাল লাগে। এই প্রাচ্য দেশেও ত কাব্যে পূর্ব্বরাগবাহুল্য দেখা যায়। কিন্তু সামাজিক অবস্থাভেদে পূর্ব্বরাগের ভাবভঙ্গী পাশ্চাত্য হইতে আমাদের স্বতন্ত্র। স্ত্রী পুরুষের মেলামেশার উপর এ সকল খুঁটিনাটি প্রভেদ অনেকটা নির্ভর করে। বৈষ্ণব কবির কতকগুলি পূর্ব্বরাগের গান আছে—বড়ই সুন্দর, ভাবময়। ইদানীন্তন বঙ্গ কবিরাও পূর্ব্বরাগ বর্ণন করিয়াছেন। তাহা যেমনই হৌক্, মানবপ্রকৃতির পরিচয় প্রদান করে। দাম্পত্য-বন্ধন পূর্ব্বরাগমূলক না হইলেও প্রেম গভীর হইতে পারে দেখাইয়া যাঁহারা পূর্ব্বরাগকে সামাজিক শিক্ষার ফল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, দৃঢ় সমাজবন্ধনের বহিঃক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেই পূর্ব্বরাগের স্বাভাবিকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এ বিষয়ে বাহুল্য প্রমাণের আবশ্যক নাই।

প্রাচ্য সাহিত্যের সম্পূর্ণ নিজ-সৃষ্টি অভিসার। পাশ্চাত্য দেশে অভিসার নাই। সঙ্কেত স্থানে প্রণয়ী প্রণয়িনীর মিলন পাশ্চাত্য সাহিত্যে মিলিতে পারে, কিন্তু আমাদের অভিসার এ শুষ্ক সম্মিলন নহে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ধরণী অন্ধকার, ক্ষণে ক্ষণে বিজলী হানিতেছে, একাকিনী রাধা বিজন বনের মধ্য দিয়া চঞ্চল-চরণে চলিয়াছেন। আমাদের কবির অভিসারে সমস্ত প্রকৃতি ঘনাইয়া আসে; অন্তরের উপর বহিঃপ্রকৃতির ঘন নিবিড় ছায়া পড়ে। এ কবিত্ব প্রস্ফুটিত করিতে প্রাচ্য কবিই পারদর্শী। এ শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বারিধারা, মেঘের উপর মেঘ, অন্ধকারের উপর অন্ধকার, প্রবল বর্ষা অন্য দেশের কবি বুঝিবেন কিরূপে? আমাদের বর্ষায় আকুলতাময় কদম্ব-সৌরভ, সচকিত হরিণ-দৃষ্টি, মধুর কেকাধ্বনি; তাহার আনন্দ আমাদের প্রাচ্য কবিই বুঝেন। এমনটী কি আর অন্য দেশে আছে? সেই জন্যই ত আমাদের বিরহ, আমাদের অভিসার পাশ্চাত্য সাহিত্যে দুর্লভ।

কিন্তু কেবল মাত্র প্রকৃতিই কি আমাদের অভিসারের কারণ? সমাজের সহিত

ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই? এ সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে কিছু বলা সুকঠিন। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃতির প্রভাব নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। আমাদের জাতীয় ভাব এবং সামাজিক অবস্থাও হয়ত অভিসার-ভাবের কতকটা অনুকূল। নহিলে, শুদ্ধমাত্র প্রকৃতির প্রভাবে যে এই বিষয় দেশীয় কাব্যে এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহা বিশ্বাস করিতে একটু সময় লাগে এবং সন্দেহ বোধ হয়। বিরহের মত অভিসার ত সার্ব্বজনীন নহে। জানি না, অভিসারের মধ্যে সমাজ-নিয়মের ব্যতিক্রম-প্রয়াস লক্ষিত হয় কি না। কিন্তু ইহাতে ত স্বাধীন প্রণয় কতকটা মনে হয়। আর অভিসারে রমণীর প্রাধান্য দিয়া কবিত্ব অনেকটা ফুটিয়াছে। বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুতের মধ্যে অন্ধকার পথে একাকিনী রমণীর ভীত চকিত ভাব বড়ই সুন্দর। পাশ্চাত্য সমাজের অবস্থায় এ ভাব কিরূপ খুলে না খুলে বলা সহজ নহে।

এখন সে কথা থাক্। কাব্যে যে দেশের যাহা যত থাকুক্ না থাকুক্, বিরহ, অভিমান প্রভৃতি বিবিধ ভাব অল্প বিস্তর আছে সকল দেশেই। প্রেমের এ সকল অবস্থা আলোচনা কিন্তু পাশ্চাত্য অপেক্ষা প্রাচ্য দেশে ভালরূপ হইয়াছে। পাশ্চাত্য কাব্যে প্রেমের অপর কতকগুলি অবস্থা সমালোচিত হইয়াছে। সে অবস্থাগুলি সাধারণতঃ কাহিনী-বৈচিত্র্যের দিকে। প্রেমের দিক দিয়া মানব-চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন চেষ্টা এদেশে যে হয় নাই এমন নহে; সংস্কৃত কাব্য এবং নাটকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যে কিন্তু তাহার সমধিক বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তবে ভারতের প্রাচীন কবিরা প্রেমের যে গুটিকত আদর্শ চরিত্র গড়িয়াছেন তাহা কোনও দেশের কোনও চরিত্র অপেক্ষা হীন নহে। কিন্তু পাশ্চাত্য বিবিধ বৈচিত্র্য আমাদের সাহিত্যে নাই স্বীকার্য্য। কত বিভিন্ন অবস্থায় মানবের মনে কত বিভিন্ন ভাব হইতে প্রেম জন্মায় পাশ্চাত্য সাহিত্যে তাহা সুচিত্রিত। এই প্রেম সংঘটনের মধ্যে পুরুষ এবং স্ত্রীপ্রকৃতি নীরবে কি ভাবে কার্য্য করে, উভয় জাতির নিজের মধ্যেও কত প্রকৃতিগত শিক্ষাগত বৈষম্য নানা দিক হইতে আসিয়া নানা ভাবে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার অপর জাতির সহিত সম্মিলিত হয়, এ সকল পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিচিত্র বর্ণে পরিস্ফুট। স্ত্রীপুরুষের শিক্ষাগত এবং স্বাভাবিক মনোবৃত্তি সেখানে তন্ন তন্ন বিশ্লেষিত। আমাদের এ বিশ্লেষণ পাশ্চাত্য অপেক্ষা বিশেষ অসম্পূর্ণ।

পাশ্চাত্য প্রেম চর্চ্চার সহিত আমাদের কোথায় যেন মূল প্রণালীগত প্রভেদ আছে মনে হয়। নিশ্চিত বলিতে পারি না, কিন্তু আমার বোধ হয়, পাশ্চাত্য প্রেম-চর্চ্চা অনেকটা ইংরাজীতে যাহাকে ideal বলে। আমাদের প্রেম-চর্চ্চাকে সে হিসাবে কতকটা অনুভূতিমূলক বলা যাইতে পারে বোধ করি। পাশ্চাত্য সাহিত্যেও অনুভূতির অভাব নাই, তবে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য তুলনা করিলে প্রাচ্যকেই বিশেষ রূপে অনুভূতিমূলক বলা যায়। এ সম্বন্ধে সকল খুঁটিনাটি আমরা লক্ষ্য

করিয়া দেখি নাই ; মোটামুটি বাহিরে বাহিরে যাহা মনে হয় বলিয়াছি মাত্র। বৈষ্ণব কবির সহিত তুলনা করিলে আরও দেখা যায়, পাশ্চাত্য প্রেমে এদেশের মত সাধনার কথা বড় নাই। আমাদের বৈষ্ণব কবির প্রেমের বিশেষ সাধনা আছে, তাহাতে অনেকটা ধর্ম্ম। পাশ্চাত্য প্রেমের কবিতা আর এক ধরণের। তাহা ধর্ম্ম নহে।

কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যে আমাদের শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক বৃত্তি-গুলির কাহার সহিত প্রেমের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা যেরূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিশ্লেষিত হইয়াছে আমাদের সাহিত্যে তাহা হয় নাই। পাশ্চাত্য সমালোচন-প্রণালীর সূক্ষ্মদর্শিতা বাস্তবিক প্রশংসনীয়। প্রেমের এই বিশ্লেষণ ব্যাপারের মধ্যে বিজ্ঞান দর্শনের কতটুকু কি সংশ্রব আছে না আছে জানি না, কিন্তু বিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্রে বুৎপত্তি না থাকিলেও প্রেমের এ জটিল সম্বন্ধ সাদাসিধা একরূপ বুঝা যায়। প্রেম সম্পূর্ণ একই বৃত্তির সহিত সম্বন্ধ নহে। তাহা কতকাংশে অনুভূতিমূলক, কতক বা অন্যান্য মনোবৃত্তির সহিত জড়িত, আধ্যাত্মিক দিকও একটা আছে। ব্যক্তিবিশেষের প্রেমে আবার প্রকৃতি অনুসারে বিশেষ বিশেষ বৃত্তির সমধিক প্রাধান্য দেখা যায়। কাহারও প্রেম হয়ত অনেকটা ইংরাজীতে যাহাকে emotional বলে, কাহারও বা intellectual। অবিকল ভাবপ্রকাশক বাঙ্গলা প্রতিশব্দ অভাবে ইংরাজী কথাই আমাদিগকে ব্যবহার করিতে হইল।

প্রাচীন ভারতে প্রেমের intellectual অনুশীলন অনেকটা হইয়াছিল বোধ হয়। কিন্তু এ দেশে প্রেমানুশীলন ঈশ্বরসম্বন্ধে। সেই জন্যই বহুপূর্ব্বে অন্যান্য দেশ যখন অরণ্যের স্তব্ধ অন্ধকার মধ্যে বিলীন হইয়া ছিল তখন ভারতের কবি নিষ্কাম ধর্ম্মের নাম লইয়া অমর সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণবসাহিত্যে যে প্রেমের বিশ্বজনীনতা দেখা যায়, তাহাও ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত বলিয়াই। দেবতা-বর্জ্জিত অথচ দেবভাবময় প্রেম পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুপরিস্ফুট। পাশ্চাত্য প্রেম মানব-সন্তানকে মনুষ্যত্বে টানিয়া তুলে। ঈশ্বরপ্রেম আমাদিগকে অনন্তের দিকেত টানেই। বৈষ্ণব সাহিত্যে ঈশ্বরপ্রেমের মানবীকরণ হইয়াছে বলিয়াই আমাদের প্রাচ্য সাহিত্যে এমন প্রেমানুশীলন। কিন্তু ঈশ্বরপ্রেম আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় নহে। সেই জন্য তাহার চর্চ্চা সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে পারি না। আমরা প্রধানতঃ স্ত্রীপুরুষ-গত প্রেম লইয়াই আলোচনা করিয়া আসিতেছি।

মানব প্রেমের মধ্যেও স্নেহ ভক্তি প্রভৃতি নানা বিভাগ উপবিভাগ আছে। সে সকল আমরা এ প্রবন্ধে বাদ দিয়াছি। বৈচিত্র্য এবং রহস্য স্ত্রীপুরুষের প্রেমের মধ্যেই সমধিক ব্যক্ত। সেই জন্যই সম্ভবতঃ এ প্রেম সম্বন্ধে যত কাব্য রচিত হইয়াছে, স্নেহ-ভক্তি বিষয়ে তত হয় নাই। বাস্তবিক, স্ত্রীপুরুষ-প্রেমের, প্রগাঢ়তা, সুখ, দুঃখ, জ্বালা, ভয়, ভ্রান্তি সকলই চূড়ান্ত। মনোবৃত্তির এরূপ অনুশীলন প্রেমের অন্যান্য বিভাগে

বোধ করি নাই। এই এক প্রেমাকর্ষণে অতি ক্ষুদ্র ভাবের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে যেরূপে সুবৃহৎ আধ্যাত্মিকতার বিকাশ হইয়াছে দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। সমগ্র মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাসের সহিতও ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সে সকল বিস্তারিত আলোচনার স্থান অবশ্য এ নহে।

প্রেমের ঐতিহাসিক বিকাশ আলোচনা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য। মানবজাতির বিবিধ অবস্থার মধ্য দিয়া প্রেমের আদর্শ ক্রমে ক্রমে কত পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে এবং এই ধারাবাহিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে অন্তর্নিহিত কি ভাবের ক্রমাভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহা প্রাচ্য সাহিত্যে কোথাও পরিস্ফুট নহে। পাশ্চাত্য জগতে ক্ষুদ্রতম কীটাণুর প্রেম পর্য্যন্ত আলোচিত হইয়া মানব-প্রেমের ভাব বিশ্লেষিত হয়। ইহাতে বিজ্ঞানের সংস্পর্শ থাকিতে পারে, কিন্তু ভাব আলোচনার পক্ষে সুবিধা বৈ অসুবিধা হয় না।

সেখানে এখন প্রতিদিন নানাদিক হইতে প্রেম ভাবের নূতন নূতন বিশ্লেষণ হইতেছে। আমরা হয়ত এক দিক দিয়া মাত্র দেখিয়াছি; আরও কত দিক আছে। আমরা ত আর প্রেমকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া বসিয়া নাই। প্রেমের রহস্য নিঃশেষ করা অসম্ভব। পুরাতনের মধ্য হইতে দিন দিন নব নব বৈচিত্র্য বিকশিত হইয়া তাহাকে চিরনবীন করিয়া রাখিয়াছে। বৈজ্ঞানিক একদিক দিয়া তাহার অনুশীলন করিতেছেন, দার্শনিক আর এক পথে, কবির আবার স্বতন্ত্র পথ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেরূপ কোন পথই হয়ত অবলম্বিত হয় নাই। কতকটা সমাজ এবং কতকটা সাহিত্য মিলাইয়া প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য প্রেমালোচনার তুলনা চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। নানা কারণে বিস্তর অসম্পূর্ণতা এবং ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ দার্শনিক আলোচনার এ প্রবন্ধে সম্পূর্ণ অভাব। সুধী পাঠকেরা নিজগুণে সম্পূর্ণ করিয়া লইবেন ভরসায় এইখানেই উপসংহার করি।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইতিহাস।*

প্রকৃত ইতিহাস বিশ্বরূপ, জগতের জীবন্তমূর্ত্তি। ইহাতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত। মানবচরিত্র খণ্ড ইতিহাস। তাহার সাময়িক প্রতিমা শাখা প্রশাখা মাত্র। ব্যক্তিগত ছবি পল্লব বিশেষ। প্রশস্তকল্পে ইতিহাস সার্ব্বসাময়িক, সার্ব্ব-

* গত বৎসর এলবার্টহলে লেখক ইংরাজীতে "ইতিহাস" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন ইহা তাহার স্থূল মর্ম্ম।

ভৌমিক, সার্ব্বভৌতিক এবং সর্ব্বাত্মিক বিশদ আলেখ্য। সামান্য অর্থে ইতিহাস মানুষের মানচিত্র। ইহাতে কার্য্য, কারণ, নিয়ম, নিয়তি সতত সুন্দর রূপে প্রস্ফুটিত; রেখাগুলি স্পষ্ট, পৃথক, পরিপাটি, অথচ পূর্ণাবয়বে পরস্পর তন্ময় ভাবে লক্ষিত। যিনি ইতিহাস জানেন, তাঁহার বিশ্ব সংসার নখ-দর্পণে রহিয়াছে। যিনি না জানেন, তিনি আপনাকেও ভাল রূপে বুঝিতে পারেন নাই।

পরিণতিবাদে মানুষ সসীম। বস্তুতঃ ইহাতে কল্পনাসৌন্দর্য্য আছে, যুক্তি আছে, ভাব আছে, জ্ঞান আছে, বিজ্ঞান আছে। তথাচ চিন্তা-পক্ষে মনুষ্য-ইতিহাসের সীমান্ত করা যায় না।

মানুষ অবতার বিশেষ; মনুষ্যত্ব পূর্ণব্রহ্ম। ইহার আদি নাই, অন্ত নাই, লয় নাই, ক্ষয় নাই, দিক্ নাই, কাল নাই, অনাদি, অনন্ত, অব্যয়, নিরাকার, সৎ, সত্য, সুন্দর, সনাতন; অথচ জ্ঞানাতীত, ধ্যানাতীত, চিন্তাতীত, মনাতীত নহে। সাকার অথচ নিরাকার, ক্ষুদ্র অথচ মহান্, সামান্য অথচ বিশাল, সঙ্কীর্ণ অথচ অপার, বিশেষ অথচ নির্ব্বিশেষ, সগুণ অথচ নির্গুণ। ইতিহাস এই বিরাট মূর্ত্তির জীবন্ত ভাব। ইহার তিনটী ক্রম বা অবস্থা আছে; স্মৃতি, দৃষ্টি ও অনুমান। ভূত স্মৃতি, বর্ত্তমান অনুভূতি, ভবিষ্যৎ অনুমিতি। জগতে নির্লিপ্ত, অসংলগ্ন, আত্মগত কিছুই নাই—সকলই সাধারণ সূত্রে গ্রথিত, সম্বন্ধ বিশেষে আবদ্ধ। আর্য্য ঋষিগণের ধ্যানে জগৎসংসার এইরূপ উপলব্ধি হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের অমানুষিক প্রতিভায় এই চিন্তা বা ধ্যান জীবন্ত হইয়া ত্রিভুবন প্রেমে মাতাইয়া ভাসাইয়াছিল। মানুষে মানুষে সম্পূর্ণ পৃথক; রূপে, গুণে, আকারে, ইঙ্গিতে, ভাবে, ভঙ্গিতে পৃথক, অথচ পরস্পর সকলেই মনুষ্যত্বসূত্রে গাঁথা। মনুষ্যত্ব কি? ইহা মানুষের সার, সাধারণ গুণের সমষ্টি; কাহার নিজস্ব নহে, সাধারণ সম্পত্তি; ফলে তাহা আর কাহারই নাই, সকল মানুষেই এবং সকল মানুষেরই আছে। ইহা জাতিগত, ব্যক্তিগত নাম; দেশগত, কালগত, পাত্রগত অভিজ্ঞান; ক্রিয়াবাচক, কর্ম্মবাচক, ভাববাচক, গুণবাচক পদবী। ইহা স্বভাবের রাজটীকা; ইহজগতের রাজচক্রবর্ত্তীর লক্ষণ। সময়ের পরিবর্ত্তন আছে, সংসর্গের পরিবর্ত্তন আছে, অবস্থার পরিবর্ত্তন আছে, আনুসঙ্গিক ব্যাপারের পরিবর্ত্তন আছে, দৃষ্ট অদৃষ্টের পরিবর্ত্তন আছে; মনুষ্যত্বের নাই,—ইহা অপরিবর্ত্তনীয়। এ চিত্ত-পুতলী সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বময়, সর্ব্বত্র সমান ভাবে বিরাজমান।

মানুষ পরিবর্ত্তনশীল; মনুষ্যত্ব অপরিবর্ত্তনীয়। দেশভেদে, কালভেদে, অবস্থাভেদে মানুষ বিভিন্ন হয়; মনুষ্যত্ব হয় না। কেহ কেহ সময় ও অবস্থার পক্ষপাতী; বলেন, সময় ও অবস্থায় সকলই হইয়া থাকে। ফলে সকলি হয় বটে, আবার কিছুই হয় না। পাত্রাকারে জলের আকার, অবয়ব, গঠন; অবস্থায় হিম, শিশির তুষারে পরিণত হয়। তথাচ জল—জল; আজও জল; কালও জল, স্থানভেদেও

জল, অবস্থাভেদে ও জল। বস্তুতঃ অবস্থা জাগতিক গতির দিক্‌-নির্ণয় করিয়া থাকে। জল সমতলগামী, কিন্তু "সমতল" সর্ব্বত্র সমান নহে। মনুষ্যত্ব সমুদ্র বিশেষ—অগাধ, অনন্ত, অসীম, অপার; মানুষ একটী ক্ষুদ্র চঞ্চল লহরী মাত্র,—এই আছে, এই নাই, যাহাতে উৎপত্তি, তাহাতেই স্থিতি, তাহাতেই গতি, তাহাতেই লয়; কোথায় উঠিল, কোথায় ফুটিল, কোথায় ছুটিল, কোথায় মিলাইল, তাহার কোন চিহ্নই নাই। ফলে মনুষ্যত্বে যাহা আছে, মানুষেও তাহা আছে; মানুষে যাহা আছে, মনুষ্যত্বেও তাহা আছে। এক বিন্দু জলেও অগাধ জলধিতে গুণের পার্থক্য নাই। ইতিহাস এই দ্বিবিধ চিত্রেই লিপ্ত—একবার মানুষ হইতে মনুষ্যত্বে উঠিতেছে, আবার মনুষ্যত্ব হইতে মানুষে নামিতেছে। সুতরাং প্রতিনিয়তই তাহার প্রতিভা বিকশিত হইতেছে।

ডার্বিণ বর্ণোৎপত্তির সুন্দর সোপানাবলি নির্ণয় করিয়াছেন; হেকেল তাঁহার পদাঙ্ক অনুগমন করিয়া ভ্রূণের ইতিবৃত্তে বর্ণের ইতিবৃত্ত দেখিতে পাইয়াছেন। লক্ষ লক্ষ বৎসরের পরিণতি-প্রবাহ দশ মাসে সংক্ষেপে পুনরাবৃত্ত হইয়া থাকে। কোম্‌তও বহুদিন পূর্ব্বে মানুষের মানসিক পরিণতির অবস্থাত্রয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে মনুষ্য মাত্রই জাতিগত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিয়া বোধ হয়। হেকেলের পরিণতি ও ডার্বিণের পরিণতি একই পদার্থ; কেবল সময় ও মাত্রায় প্রভেদ। মানুষ মাত্রই জাতিগত চরিত্রের উত্তরাধিকারী। নিয়মাদির, অবস্থাদির দুর্ভেদ্য জটিলতা-প্রযুক্ত সর্ব্বত্র সুচারু রূপে লক্ষিত হয় না। পরিণতি পক্ষে তাই এত বিভিন্ন রূপ; মানুষে মানুষে প্রভেদ; চিত্তবিকাশে এত দূর অগ্র পশ্চাত দেখা যায়। ফলে অদ্যকার মানুষে কল্যকার মানুষ আছে। মনুষ্যত্বের অদ্যকার স্ফূর্ত্তিতে কল্যকার স্ফূর্ত্তি স্বতঃসিদ্ধ। শতদলের কাল দশ দল বিকশিত হইয়াছিল—আজ আর দুই দল অধিক ফুটিয়াছে মাত্র। আগামী কল্য আরও দুই দল ফুটিতে পারে। এইরূপেই ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে। তাই বলি জাতিগত ইতিহাস ব্যক্তিগত জীবনী। তবে অণুবীক্ষণ দ্বারা আলোচ্য। আবার ব্যক্তিগত কার্য্য সূক্ষ্ম সূত্রে জাতিগত কার্য্যের নিদর্শন। বস্তুতঃ ব্যক্তি জাতির নিদর্শন, ব্যাখ্যা ও পরীক্ষা। ব্যক্তির মুহূর্ত্তে জাতির শতাব্দী। ব্যক্তিতে জাতি মূর্ত্তিমান। যেমন সম্মুখস্থ দীপে সূর্য্য আছে, পাত্রস্থ জলে গঙ্গা আছে, বৃষ্টি-বিন্দুতে সমুদ্র আছে, সভ্যতায় আর্য্য-শ্রী আছে, গ্রন্থমাত্রে বেদ আছে, কাব্যে রামায়ণ আছে, ধর্ম্মে ভারত আছে, সেইরূপ প্রত্যেক মনুষ্যে যুগ-যুগান্তরের উপাদান আছে—জ্ঞান আছে—শিক্ষা আছে—ব্যাখ্যা আছে; যাহা ছিল সকলি আছে; রূপান্তর ও ভাবান্তর হইলেও হইতে পারে। আজ ক্ষুদ্র বাঙ্গালীর চিন্তায় আর্য্য চিন্তা আছে; তাহার চিত্তবিপ্লবে আর্য্যবিপ্লব আছে। প্রত্যেক বিপ্লব, প্রত্যেক সংস্কার, প্রত্যেক ব্যভিচার, প্রত্যেক যুদ্ধ, প্রত্যেক বিগ্রহ, প্রত্যেক জয়, প্রত্যেক পরাজয়, প্রত্যেক অনুষ্ঠান, প্রত্যেক সংস্থান, প্রত্যেক আয়োজন, প্রত্যেক উদ্‌যাপন আদৌ কোথায়

কাহার চিত্তের অন্তস্তলে নিসন্ন ছিল, সময়ক্রমে জল-বুদ্‌বুদের ন্যায় উদ্‌বুদিত হইয়া জাগতিক মন মাতাইয়া তুলিয়াছিল। পরিশেষে সেই মানসিক সামগ্রী প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিশ্বসংসারকে শাসন করিতে লাগিল। যখন সেই ব্যক্তিগত-চিন্তা জাতির মর্ম্ম ভেদ করিয়া আবার ব্যক্তিগত হইবে, তখন তাহাতে যুগযুগান্তরের ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে।

জাগতিক সকল ব্যাপারে "আমি"ই মূল ও কেন্দ্র স্বরূপ। যেখানে "আমি" নাই সেখানে আর কিছুই নাই। সুতরাং ইতিহাস "আমার" সহিত ঐক্য না হইলে আমি ইতিহাসের মর্ম্ম বুঝিলাম না। ঐতিহাসিক সত্য আমার জীবনের সত্যের সহিত বিসং-বাদিত হইলে অমান্য ও অবিশ্বাস্য। যাহা ইতিহাসে আছে তাহা আমাতে থাকা চাহি, যাহা আমাতে নাই, অথচ ইতিহাসে আছে, তাহার অস্তিত্ব নাই; যাহা আমাতে আছে, তাহা ইতিহাসে না থাকিলেও প্রমাণ্য। ঐতিহাসিক সত্যের এই ভাব—ঘটনা বিশেষের নহে।

নিজস্বে স্বভাবের আকর্ষণ। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের একটী সাধারণ মূর্ত্তি আছে। কোন মনুষ্য বা সামগ্রীর আদর যে তন্মধ্যে সকলেই আপনাকে দেখিতে পায়—আমি আছি, তুমি আছ, তিনি আছেন। কালিদাস, সেক্ষপীয়র, গেইতের এত আদর কেন? তাঁহারা সর্ব্বদা আমার তোমার ও তাঁহার মনের কথা যেন বলিয়া দেন। মিথ্যা জানিয়াও আমরা কেন তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করি ও রচনায় বিমোহিত হইয়া যাই? আমাদের মনের ছবিগুলি যেন তাঁহারা আঁকিয়া দেন। আমাদের জানা, অজানা, লুকান, হারাণ, ছাড়ান মন যেন একত্রে দেখাইয়া দেন। আমার মনের কথা আমি যাহা স্পষ্ট বুঝিতে না পারি, তাহা তাঁহারা যেন বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দেন। ইতি-হাসের বিপুল ব্যাপারে, মানুষের বলের জয়ে, কৌশলের জয়ে, বিদ্যার জয়ে, বুদ্ধির জয়ে, নীতির জয়ে, ধর্ম্মের জয়ে—কেন আমরা উন্মত্ত হইয়া উঠি? আবার মনুষ্যের লজ্জায়, পাপে, তাপে, রোগে, শোকে, যুদ্ধবিগ্রহে আমরা কেন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ি? ইতিহাস কিছু সকল সুখের কথা—সত্যের কথা—ধর্ম্মের কথা নহে। ইহা সুখদুঃখে, পাপপুণ্যে পরিপূর্ণ। তবে এত আদর কিসে? আমরা সেই মনুষ্যসমুদ্রে মগ্ন হইয়া সকল কথাই আপনার মনে করি এবং তাহাতে যেন আপনার অনন্তমূর্ত্তি দেখিতে পাই। আমরা ধন, মান, নীতি, যশ, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধর্ম্মের গৌরব করি, কেন না, উহারা আমার নিজের প্রাপ্ত না হইলেও প্রাপ্তব্য সামগ্রী। আমার আমিত্ব যেন ঐ সকলে নৃত্য করিয়া বেড়ায়। আমি যেন আমিহারা সংসারে হা হা করিয়া বেড়াইতেছি। উহারা সেই আমার "আমি" কে দেখাইয়া দেয়। আমার যাহা আছে, তাহা উহাদের মধ্যে আছে, এবং আমার যাহা নাই ও চাই তাহাও আছে। এজন্য এত আদর।

ইতিহাস "কাণ আছে শুনিলাম" নহে। ইহার দর্শন ও আলোচনা স্বতন্ত্র। কর্ত্তৃবাচ্যে চাহি—ভাববাচ্যে নহে। আমার "আমি" মূলগ্রন্থ, ইতিহাস টীকা টিপ্পনী মাত্র। যাঁহার আপনাতে অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক নিয়মে দৃষ্টি নাই, তাঁহার ইতিহাসে দৃষ্টি কোথায়? তিনি অবস্থার প্রভেদ না দেখিয়া, ফল-প্রভেদ দেখেন। তিনি অগ্নিতে সভ্যতার সৃষ্টি দেখিতে পান না। তিনি অগ্নির শুদ্ধ উপস্থিত দাহিকা শক্তিই বুঝেন। সুতরাং সভ্যতার ভস্মাবশেষ লইয়াই সাময়িক মালা রচনা করেন। ফলে আপন জীবনে সকল দেশের ও যুগের ইতিহাস আছে। আমি জগতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। সুতরাং ইতিহাসের প্রারম্ভ প্রাচীন ভারতে নহে, গ্রীসে নহে, রোমে, নহে, চীনে নহে, মিসরে নহে, তাতারে নহে, আরব্যে নহে পারস্যে নহে; বর্ত্তমান ইংলণ্ডে নহে, ফ্রান্সে নহে, জর্ম্মণিতে নহে, আমেরিকায়ও নহে। ইহা পাঠকের আপনাতে। ইতিহাসে ও নবন্যাসে প্রভেদ কি? একটীতে আমি আছি; অপরটীতে আমি নাই আমার ধ্যান বা প্রতিরূপ আছে। শুদ্ধ ইতিহাস কেন, বিশ্বসংসারই আমার মনের সামগ্রী—আমি ছাড়া কিছুই নাই। ইতিহাস আমাতে সপ্রমাণ। প্রত্যেক ঐতিহাসিক সত্য আমাদের মানসিক সত্য; কেন না, প্রত্যেক ঘটনার কারণ ও নিয়ম মানসিক নিয়মের অধীন। বিনা কারণে ও নিয়মে ঘটিতে পারে না। 'অমুক' কেমন করিয়া হইল? ইহার উত্তরে বলিব যে কোন বিশেষ কারণে ও নিয়মানুসারে হইয়াছে, এবং ঐ অবস্থায় চিরকালই ঐরূপ হইয়া থাকে। আমি ও তুমি ঐরূপ অবস্থায় ঠিক ঐরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করি। মানুষ মাত্রেই তাহা করিবে যে পর পর কার্য্যসোপানে পদার্পণ করিয়া আমার পূর্ব্বপুরুষেরা জয়লাভ করিয়াছেন বা অপ্রতিভ হইয়াছেন, আমি সেগুলি আনুপূর্ব্বিক জানিতে চাহি, এবং ইতিহাসের প্রকৃত উদ্দেশ্যই তাই। বস্তুতঃ ইতিহাসে কালাকাল নাই—সদাই বর্ত্তমান; দেশাদেশ নাই—সম্মুখ ক্ষেত্র। যখন আমি জানিলাম যে আমার মত মানুষে, আমার মত উপায়ে ও অভিপ্রায়ে ওয়াটারলুর যুদ্ধ করিয়াছেন, তখন আমি প্রকৃত ওয়াটারলুর যুদ্ধ বুঝিলাম। কিন্তু পুনশ্চ যখন আমি জানিলাম যে 'অমুক' অমুক অবস্থায় অমুক কার্য্য করিয়াছেন—কার্য্যটী অলোক সম্পন্ন ব্যাপার নহে—সুবিশাল হইলেও মনুষ্যলব্ধ বটে, তখন আমি উহার কারণ ও নিয়মাদি অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম—আপনাকে সেই অবস্থায় রাখিলাম—দেশ, কাল, বিসদৃশ অবস্থা প্রভৃতির ঐক্য করিলাম; হইলে বুঝিলাম আমি ভিন্ন রুচির, শিক্ষার, দেশের, ও কালের লোক; অবিকল তদবস্থ হইলে আমিও ঠিক তাহাই করিতাম। তখন প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিহাস বুঝিলাম।

একত্বে বহুত্ব ও বহুত্বে একত্বই বিজ্ঞানের মূল। নিখিল সংসারে বিসদৃশরূপে অশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। পার্থক্যে অপার্থক্যই আমাদের জ্ঞানের সূত্র। এক থাকিয়া ভিন্ন হইবে এইটী যেন জগতের নিয়ম। সেই থাকিয়া না-সেই হওয়াই যেন স্বভাব।

বালক, যুবা, বৃদ্ধ বিভিন্নরূপ—আমি সেই অভিন্নাত্মক এক। বিশ্বব্যাপার সাদৃশ্যে গাঁথা। রূপ-সমুদ্রে, রস-সমুদ্রে, গন্ধ-সমুদ্রে, স্পর্শ-সমুদ্রে, সংখ্যা-সমুদ্রে সম্বন্ধ সূত্র আছে। প্রত্যেক মানুষের মুখই স্বতন্ত্র, তত্রাচ সেই অসংখ্য বিসদৃশ মুখে সাদৃশ্যের রেখা বা লক্ষণ আছে। বংশীর নানারন্ধ্র নানাশব্দ অথচ সংমিলনী স্বরের ঐক্য আছে। জগৎসংসারে মৌলিক পদার্থজ নিয়মের সংখ্যা অল্প; বিপুল সাহিত্যসমুদ্র কয়েকটী অক্ষরের নানা প্রকার যোগ-প্রবাহ মাত্র।

জাতীয় ঘটনা ব্যক্তিগত করা এবং ব্যক্তিগত ঘটনা জাতিগত করাই ইতিহাসের উদ্দেশ্য। ব্যক্তি হইতে জাতির জ্ঞান, জাতি হইতে ব্যক্তির জ্ঞান, তবে আরোহ ও অবরোহ প্রণালীর মত পরস্পর সাপেক্ষ। অগ্রপশ্চাত তদুভয়ে আছে মাত্র। ইতিহাসের সত্য ঐ রূপে প্রকাশিত ও সম্প্রসারিত হয়। বাহ্যজগত আমার চিত্তের বিভিন্ন অবস্থার সহিত ঐক্য; এবং যাহা আমার বোধগম্য তাহা চিন্তায় সত্যমুখে পরিচালিত। জগতে সকলেরই আংশিক প্রকাশ। বিজ্ঞান সেই অংশ সংগ্রহ করিয়া সামান্যপাত করে; অর্থাৎ ভগ্নাংশ লইয়া পূর্ণায়তনের যথাস্থানে যথামতে সাজাইয়া রাখে, ; দেখিলে বোধ হয়, দৃষ্টবস্তু উহারই অংশ বটে—ঠিক ঐস্থান হইতেই যেন খসিয়া পড়িয়াছিল। চীনের খেলানার অংশগুলি যেমন বালকে সবিধানে যথাস্থানে সাজাইতে থাকে পাছে প্রকৃত গঠনের ব্যত্যয় হয়; বৈজ্ঞানিক ও সেই সত্যগুলি লইয়া চিত্তক্ষেত্রে সংসার সাজাইয়া থাকেন। আমরা প্রাচীন বলিয়া প্রাচীনের গৌরব করি না। সত্যযুগে সত্যের, দ্বাপরে ধর্ম্মের, ত্রেতায় বীরত্বের পূজা। সকলই স্বাভাবিক। স্বভাবের ও স্বাভাবিকেরই আমরা গৌরব করিয়া থাকি। মানুষের অনন্তমূর্ত্তি; কিন্তু চিন্তায় ঐক্য আছে। সত্যযুগে যাহা ছিল এখনও তাহা আছে, তবে ন্যূনাধিক্য হইতে পারে। তখনও রবি শশি, বায়ু বৃষ্টিতে অন্তঃকরণকে যে প্রকার আকর্ষণ করিত, আজও সেই প্রকার করিয়া থাকে। শাক্যসিংহের ন্যায় চিত্তে কালের অস্তিত্ব নাই। মনের প্রশস্তি থাকিলে দেশকালের ভিন্নতা থাকে না।

তবে আমাতে ইতিহাসের ব্যাখ্যা আছে, ইতিহাসে আমার ব্যাখ্যা নাই, টীকা টীপ্পনি আছে। আমা হইতেই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের অর্থোৎপত্তি হইয়া থাকে। মানুষের মন নিখিল সংসারকে ইচ্ছার বশবর্ত্তী করিতে চায়। কিন্তু যখন দেহের জগতে কোন কার্য্যই দৈব বা ইচ্ছামত হয় না, সকলই নিয়মাধীন; তখন এক নিয়মের অধিকার হইতে নিয়মান্তরে যাইবার প্রয়াস পায়; অথবা অপর নিয়মের আশ্রয়ে বর্ত্তমান নিয়মাধীন কার্য্যের কথঞ্চিৎ ইচ্ছানুরূপ পরিবর্ত্তন করিতে যায়। অবস্থার পরিবর্ত্তনে নিয়মের পরিবর্ত্তন হয় না, কার্য্যের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। মানুষের অবস্থার পরিবর্ত্তনই ইতিহাস। সময় ইহার অমূল মূল। সুখের উদ্দেশে সময়ের বিশাল বক্ষে ক্রমশঃ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। অনন্তবিশ্ব অনন্ত পরিবর্ত্তনীয় ব্যাপার।

দর্শনের মায়াময় ব্যাপার তাৎপর্য্য ও এই। ধন, মান, কুল, শীল, বিদ্যা, বুদ্ধি, নীতি ধর্ম্মের আবশ্যক কি। স্বভাবের রূঢ় নিয়মাদির অধিকার হইতে এড়াইবার চেষ্টা মাত্র। আমরা এসকলের গৌরব করি, কেন না এ সকলে আমাদের স্বাধীনতা আছে, আধিপত্য আছে, বল আছে, শক্তি আছে, শোভা আছে, সৌষ্ঠব আছে, উন্নতি আছে, সভ্যতা আছে সুখ আছে, শান্তি আছে। ভগবান্ কপিল তাই বলেন যে সুখ না থাকিলে জগতে কোন কার্য্যই হইত না। তিনিই প্রথম হিতবাদী।

ইতিহাসে দ্বিবিধ ভাব আছে; নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক। প্রথমটী ব্যক্তিগত চরিত্রের আলেখ্য; দ্বিতীয়টী জাতিগত জীবনের মানচিত্র। জাতীয় চরিত মোটামুটি * জাতিগত মধ্যমরাশি ব্যক্তির জীবনী; ব্যক্তিগত ইতিহাস জাতীয় নীতির উত্তম বা অধমের জ্বলন্তমূর্ত্তি। ইতিহাসে তিনটী সামগ্রী আছে। উত্তম, অধম ও মধ্যম। উত্তম ও অধম ব্যক্তিগত জীবনীর ছবি; মধ্যম জাতিগত জীবন। জীবনী আলোক বা আঁধারের মূর্ত্তি; জাতিচরিত দুইটীর মিশ্র। জাতীয় জীবনে জ্ঞান আছে—আদর্শ নাই। উত্তম জগতের নেতা, অগ্রে অগ্রে বিশ্বসংসারকে পথ দেখাইয়া লইয়া যান; অধম মেষপালের কুকুরের মত বিপথ হইতে তাড়না করে। উত্তম আকর্ষণ—অধম শাসন; উত্তম দেবতা—অধম দৈত্য।

ইতিহাস (জাতীয় চরিত) ভয়ঙ্কর দুরূহ ও জটিল ব্যাপার; জীবনী অপেক্ষাকৃত নিস্তর সরল। একটী জটিল মনুষ্যজগতের রীতি নীতি প্রকৃতি, ধর্ম্মকর্ম্ম, আচারব্যবহার প্রভৃতির সংশ্লেষ বিশ্লেষ করিয়া পর পর কার্য্যকারণমালা সাজাইয়া নিয়মাদি আবিষ্কারে ব্যস্ত; অপরটী ব্যক্তিগত চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া মানসিক নিয়মের সঙ্গতি ও পরীক্ষা করিয়া থাকে, এবং উপস্থিত ব্যক্তির কর্ম্মসূত্র ধরিয়া তাহাকে আমাদের ভক্তিভাজন বা ঘৃণাস্পদ করিয়া তুলে। নীতিজগতের মূল নিয়মাদি দর্শানই প্রকৃত ইতিহাসের কার্য্য। বিপুল কার্য্যক্ষেত্রে অশেষবিধ জটিল ও কুটিল অবস্থায় ঐ সকল মূল সূত্রে দৃষ্টি পড়া সহজ নহে। ফলে মূল নিয়মাদিতে দৃষ্টি না থাকিলে কোন বিপ্লবের কথা দূরে থাকুক, সামান্য ঘটনাও বুঝা যায় না এবং তাহাদের কার্য্যকারণের সম্বন্ধও হৃদয়ঙ্গম হয় না। জীবনী ব্যক্তিগত কর্ম্ম ও চরিত্র দেখায়; ইতিহাস জাতিগত উন্নতিসোপান পর পর সাজাইয়া রাখে। উভয়ই সমান আবশ্যক। মনুষ্য মনের নিয়মাদি লইয়াই উভয়ের ব্যবসায়। দুইটীতে মনুষ্যের দুই দিক্ দেখাইয়া থাকে। একটী স্থূল হইতে সূক্ষ্মে যায়, অপরটী সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে আসিয়া পড়ে। একটীতে পূর্ণ মূর্ত্তির এক কোণা মাত্র পাওয়া যায়, তাহাতে কাল ও দেশ অতি সঙ্কীর্ণ; অপরটী মনুষ্য জগতের বিশাল মূর্ত্তি—সর্ব্বব্যাপী ও ত্রিকালবর্ত্তী।

* Buckle's Law of Average,

ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জীবনী আংশিক, ইতিহাস মানুষের পূর্ণমূর্ত্তি। ইহাতে অতীত আছে, বর্ত্তমান আছে, ভবিষ্যতেরও আভাস আছে, সকলি আছে। ইহাতে সভ্যতার পদাঙ্ক পর পর সুচারু রূপে দেখা যায়। ইহাতে গত উপস্থিত, মৃত জীবিত, এবং বহুকালের আঁধার কক্ষ আলোকিত হয়। ইতিহাসে উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আছে, কার্য্য আছে, কারণ আছে, বীজ আছে, অঙ্কুর আছে, বৃক্ষ আছে, বর্ত্তমানের আয়তন আছে, ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা, আভাস বা আশয় আছে। সংক্ষেপতঃ ইতিহাস অনেকটা মানুষের সুখের পরিণতির চিত্র। অতীতে বর্ত্তমানে সংযোজনা করিয়া ভবিষ্যতের অনুমানে ইতিহাস মনুষ্যের পূর্ণ-মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া থাকে। যাহা কিছু ছিল, যাহা কিছু আছে, তাহাদের সম্বন্ধ নিরাকরণ করিয়া কর্ম্মমালা গাঁথিয়া রাখে এবং বর্ত্তমানের কারণ অতীতে নির্দ্দেশ করিয়া পরে কি হইবে তাহা চিন্তা করিয়া থাকে। জীবনীর উদ্দেশ্যও কতক তদ্রূপ। মহৎ কি প্রকারে মহত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার কি কি উপাদান ছিল, তাঁহার অনুষ্ঠানই বা কিরূপ ছিল, তাঁহার কোন্ ব্রতই বা কোন্‌রূপে উদযাপন হইল, কি কি উপায়ে তিনি ঐ সকল মহত্ত্বাপার সমাধা করিলেন যাহাতে তাঁহাকে আজ মহত্বে বরণ করিল। তাঁহার প্রকৃতিতেই বা কি ছিল, অবস্থাতেই বা কিসের সংঘটন হইল, কোন্ অবস্থায় কি সহকার করিল: এই সমস্তই জীবনীর আলোচ্য। জীবনীতেও জাতীয় জীবন আছে। ব্যক্তিগত জীবন জাতিগত চরিত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথগাকারে আলোচনা অসম্ভব।

স্তূপাকার অসংলগ্ন বিষয় জানাকে জ্ঞান বলে না। জ্ঞান সুশৃঙ্খল। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ও নিয়ম প্রভৃতির জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। ভবিতব্যতা জ্ঞানই বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষণ। ভবিষ্য জ্ঞান যাহাতে যত প্রবল তাহা ততই বিজ্ঞান নামের যোগ্য। ইতিহাস বিজ্ঞানের প্রধান সহকার। যে ইতিহাসে বিজ্ঞানোপযোগী সামগ্রী নাই, তাহার আবশ্যক অতি সামান্য। ফলে ইতিহাস বিজ্ঞান নহে। অনেকে তাহাকে সেই সৌম্যমূর্ত্তি আরোপ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন; কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ভাল রূপে কৃতকার্য্য হয়েন নাই। মহামতি কোম্‌ত ইহার নেতা। সে উচ্চ পদে বরণ করা এক্ষণে কতদূর অসঙ্গত জানি না। তবে ইতিহাসকে আপাততঃ সমাজবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে। ইহাতে সমাজ বিজ্ঞান বিশেষ বিবৃত ও প্রকাশিত হইতে পারে। সুতরাং ইতিহাস বিজ্ঞান সাপেক্ষ। বিজ্ঞানের সিংহাসনে ইহার স্থান নহে—পদ্মাসনে। অনেকে চলিত ইতিহাসকে জ্ঞানের চরম সীমা মনে করেন। সেটী ভ্রম। সে ইতিহাস এ ইতিহাস নহে। অদ্যাবধি তাহার অনুষ্ঠান হয় নাই, হার্বার্ট স্পেনসর প্রভৃতির পরিণতিবাদ সেই মুখেই চলিতেছে। সময়ে হইবার অনেক সম্ভাবনা আছে। ইতিহাস সময়ের বাঁধনি মাত্র; ভূত ও বর্ত্তমানের সেতু-কার্য্যকারণ সূত্রের একটী প্রকৃত গ্রন্থি বটে। ইহাতে বর্ত্তমানের হেতুবাদ আছে, ধরণা নাই, ব্যাখ্যা নাই। ইহা দ্বারা ভাবী

অনুমান করা যায়—পরিচালন সংযোজন বা সংগঠন করা যায় না। চিন্তামার্গে এই পর্য্যন্ত। ভাবমার্গে ইহার কতক কার্য্য আছে। পাপে ঘৃণা, পুণ্যে ভক্তি, স্বার্থে অবজ্ঞা, নিঃস্বার্থে আনন্দ, অজ্ঞানে তাচ্ছিল্য, জ্ঞানে আদর, ক্রোধে দ্বেষ, দয়ায় মমতা উপজিত হয়। সদসদের দ্বার উদ্ঘাটন করত তাহাদের প্রাণের প্রাণ বিশ্লেষ করিয়া এরূপ পরিপাটী ভাবে সম্মুখে আবির্ভাব করে যেন আমরা তৎসম্প্রদায়ের মধ্যগত বলিয়া মনে হয়। আমরা তদ্দ্বারায় মানসচক্ষে যেন মহত্ত্বের সৃষ্টি ও পাপের নির্ব্বাপন করিয়া থাকি। ইতিহাসে এইরূপে মনের তেজ ও ব্যাপকতা জন্মে। মনুষ্যের ধর্ম্ম কর্ম্ম, রীতিনীতি, আচারপদ্ধতি, ব্যবহার সংস্কার, সাহিত্যবিজ্ঞান, জ্ঞান দর্শনে মহতের মূর্ত্তি কিরূপ প্রতিফলিত হয়, বা মহতের উপর তাহাদের কিরূপ কার্য্যকারিতা হয়, তাহা ইতিহাসে জানা যায়। কিন্তু তাহাতে মহতের ভবিষ্যতের আধিপত্য দেখা যায় না। শাক্যসিংহ, ইসা, মুসা, মহম্মদ, চৈতন্যের আধিপত্য কতদূর থাকিবে, জানি না; ফলে ছিল এবং আছে বলিতে পারি। তাঁহাদের বুদ্ধিতে, চেষ্টায়, উদ্যোগে, কার্য্যে, অচলতায়, নম্রতায়, ধীরতায়, বীরতায়, দয়ায়, বাৎসল্যে, অমায়িকতায়, প্রেমে সকলে মুগ্ধ হইয়া থাকি। এরূপ জ্ঞানে ও ধ্যানে চিত্ত অবশ্যই বলীয়ান হইয়া উঠে। মহতের ভবিতব্যতা জানা যায় না, সুতরাং মহত্ত্বের বিজ্ঞান নাই। ইহা স্মৃতিমূলক জ্ঞান। শত বৎসর পরে কিরূপ মহৎলোক অবতীর্ণ হইবেন, বা হইবেন কি না, তাহা কে বলিতে পারে?

এ প্রকার উদ্দীপনা ব্যতীত জীবনচরিতে লভ্য অতি অল্প। মনুষ্য-মনের নিয়মাদির ব্যাখ্যাও ইহাতে সম্পাদিত হয়। মনুষ্যজগতের উন্নতির সোপানাবলিও জানা যায়। অবশ্য মহতের অন্তর্দীপ্ত ব্যাপারে জীবন আছে—সৌন্দর্য্য আছে—হৃদয়দ্রবী প্রেম আছে। তদালোচনায় সাহস, বীরতা, উদারতা, নিঃস্বার্থতা এবং অন্তঃকরণের ব্যাপকতা জন্মে। বস্তুতঃ ইহা চিত্তস্বাস্থ্যকরও বটে। ইহাতে আত্মপ্রসাদ, আত্মবিস্মরণ, প্রেমের উচ্ছাস হইতে থাকে। মান নাই, মর্য্যাদা নাই, স্বার্থ নাই, শুদ্ধ কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মের জন্য যিনি আত্মোৎসর্গ করেন, তাঁহার কার্য্য আলোচনা করিয়া কে না পুলকিত হইবে? কিন্তু মহৎ পথ দেখাইয়া দেন—কার্য্য দেখাইয়া দেন না। নেপলিয়নের আদর্শ এলেকজাণ্ডার। নেপলিয়ন এলেকজাণ্ডারের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন—বীরতা লইয়াছিলেন—তাঁহার সর্ব্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা লইয়াছিলেন—কার্য্য লয়েন নাই। অবস্থা ভেদে কার্য্যভেদ—অনুষ্ঠান ভেদ। যে কৌশলে আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ডারত্ব লাভ করিয়াছিলেন, নেপলিয়ন্ সেই কৌশল অবলম্বন করিলে কখনই নেপলিয়ন হইতে পারিতেন না। অধিকন্তু আলেকজাণ্ডারের প্রকৃতি কিছু অবিকল নেপলিয়নের প্রকৃতি নহে। দুই জনের প্রকৃতি স্বতন্ত্র, ক্ষেত্র স্বতন্ত্র, সুতরাং কার্য্যও স্বতন্ত্র অনুষ্ঠানও স্বতন্ত্র। জীবনীতে আনন্দ পাই—উত্তেজনা পাই, বল পাই, সাহস পাই, ভরসা পাই, উদ্যম

পাই ; কার্য্য পাই না,—কৌশল পাই না—উপায় পাই না। কর্ম্ম আপনার। উদ্‌যোগ অবস্থাগত। ক্ষেত্র কর্ম্মঃ বিধিয়তে। আবার আপনার উপাদান ও অবস্থামতই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সময় স্বতন্ত্র, কার্য্য স্বতন্ত্র। যে বাণে রাবণ মরিয়াছিল তাহাতে মেঘনাদ মরিত না, আজ হয়তো তাহাতে সামান্য মানুষ মারা ভার। আমার জীবনের অবিকল দৃষ্টান্ত বা উপমান (নজীর) নাই। অপরে যাহা করিয়া জগতে জয় লাভ করিয়াছেন, আজ আমি তাহা অনুষ্ঠান করিলে হয় তো হাস্যাস্পদ হইব। অবস্থার ঐক্য নাই—অনুষ্ঠানের ঐক্য কিরূপে হইতে পারে? ফ্রাঙ্কলীন যে অবস্থায় ফিলাডেল্‌ফিয়ায় গিয়াছিলেন, অন্য বালকে সেই রূপ করিলে কি বড় হইবে? ভল্‌তেয়র যাহাতে বড় হইয়াছিলেন তদনুষ্ঠানে যদি সকলে বড় হয়, তাহা হইলে আর ভাবনা কি? বড়ত্বে স্বাতন্ত্র্য আছে—অনুকরণ নাই।

যিনি বড় তাঁহার বড়ত্ব কিসে? তিনি কাহারও অবিকল অনুকরণ বা অনুবাদ নহেন। স্বাবলম্বন মহত্বের একটী প্রধান উপাদান। অবশ্য "বড়"র অনুকরণ করা মানুষের প্রধান প্রবৃত্তি বটে। কিন্তু মহত্ব অনুকরণ-প্রসূত নহে। ইহা সূর্য্য—চন্দ্র নহে। মহত্বের পদবী নাই—স্বয়ং আপনার পদবীর সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার সৌভাগ্য নাই—আপনিই আপনার সৌভাগ্য। সময় ও অবস্থার ফল হইয়াও সময় ও অবস্থাকে আবশ্যক মত গড়িয়া লন। মহত্বে বিদ্যা না থাকিলেও থাকিতে পারে—প্রতিভা আছে, সাধনা আছে, কার্য্যদক্ষতা আছে—প্রেম আছে—ঐকান্তিকতা আছে—অধ্যবসায় আছে—আত্মোৎসর্গ আছে। যিনি পূর্ব্বমীমাংসা মত কার্য্য করেন, তাঁহার মহত্ব নাই। নেপলিয়ান নেপলিয়ন হইয়া আজ আসিলে হাস্যাস্পদ হইতেন। বর্ত্তমান কার্য্যক্ষেত্র; সুতরাং অতীতের সোপানে পদ রাখিয়া কার্য্য করা চলে না। যিনি বর্ত্তমানে নির্ভর না করিয়া অতীতে নির্ভর করেন তিনি কার্য্যক্ষম নহেন। বিদ্যার রাজপথ নাই, কার্য্যেরও রাজ পথ নাই। বাঁধাপথ আঁধারে যাওয়া যায়; সাধারণে সেই পথেই চলিয়া থাকে। অসাধারণের চিন্তালোকে সকল পথই আলোকিত হয়, সুতরাং সকল পথই তাঁহার অবলম্বনীয়। সময়ানুসারে কার্য্যসৌকার্য্যার্থে তিনি নিজ পথ অনুসরণ করেন। অমুক কর্ম্ম ভলতেয়ার নেপলিয়ন করিয়াছেন, সুতরাং আমারও তাহা কর্ত্তব্য, বা আমিও তাহা করিব, ইহা মহত্বের লক্ষণ নহে। ইতিহাস নজীর নহে—টীকা; নেতা নহে—সাক্ষ্য। ইহাতে অনুষ্ঠান নাই—আভাস আছে—জ্ঞান আছে। বস্তুত অবিকল অনুকরণ বা অনুবাদ হয় না; হইলেও সৌন্দর্য্য থাকে না। স্বভাবে তাহা নাই, শিল্পে তাহা নাই—আমাদের ইচ্ছায়ও তাহা নাই। আমরা কাহারও মত হইতে চাহি না—আপনার মতই থাকিতে চাই। যদি কোন দেবতা আসিয়া কুরূপকে সুরূপ করিতে চাহেন, বোধ হয়, সে স্বীকার করে না। তবে তাহাকে বজায় রাখিয়া যদি রূপের সংস্কার হয়, তাহাতে আপত্তি নাই। আমাকে "আমি" রাখিয়া ভাল

কর—ক্ষতি নাই। গোপাল কালিদাস হইতে চাহেন—গোপাল থাকিয়া, নতুবা নহে।

আমি যাহার গৌরব করি, তাহাতে আমি আছি—আমার ভাব আছে—ছায়া আছে—আশা আছে—ভরসা আছে। ইমার্সন বলেন আমার প্রাপ্ত "আমি"অপ্রাপ্ত অথচ প্রাপ্তব্য "আমি"র আরাধনা করে। আমি জীবনচরিতে মুগ্ধ কেন? উহাতে আমার দূরতঃ উল্লেখ আছে। আমি বড়র গুণকীর্ত্তন করি। কেন না, তাঁহাতে আমি আছি। যাঁহার পূজা করি, তাঁহাতে লীন হইতে চাই। পারি বলিয়া, নতুবা নহে। নিজমত উচ্চ প্রকৃতির লোকেই আদর্শ; পাছে অনুকরণে আত্মলোপ হইয়া যায়। কবির আদর্শ কালিদাস, বীরের নেপলিয়ন, দার্শনিকের কোম্‌ত, বৈজ্ঞানিকের ডার্বিন, দাতার কর্ণ, সত্যবাদীর যুধিষ্ঠির, ধার্ম্মিকের শাক্যসিংহ, ইত্যাদি। এস্থলে ভাল মন্দের নিয়ম এক। ভালর আদর্শ ভাল, মন্দের মন্দ। আপনার প্রকৃতির উচ্চমাত্রায় প্রশংসা। আমরা পরের দোহাই দিয়া প্রকারান্তরে আপনার দোহাই দিয়া থাকি। কবি কবির, শিল্পী শিল্পীর, বীর বীরের, ধনী ধনীর, মানী মানীর, ইত্যাদি। সুতরাং ইতিহাস নেতা নহে, প্রণেতা নহে—সাক্ষ্য ও প্রমাণ। ইহা কার্য্যক্ষেত্রের সম্বল নহে—নিদর্শন।

ব্যক্তিগত ইতিহাস লিখিবার উদ্দেশ্য কি? একজন মহাপুরুষ কি প্রকারে স্নানাহার করিতেন, কি প্রকার শয্যায় কি প্রকারে নিদ্রা যাইতেন, কি ভঙ্গিতে পথ চলিতেন, লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন, কেমন করিয়া কথা কহিতেন, তাঁহার কোন্ বৎসর জন্ম, কতবৎসর বয়সে মৃত্যু, এজগতে তাঁহার কি ভাল লাগিত, তাঁহার পুত্র কন্যা কয়টি, এবম্বিধ কৌতূহল পরিতৃপ্ত করাই কি আখ্যায়কের অভিপ্রায় ও কর্ত্তব্য? কোন ব্যক্তিগত কতকগুলা স্বরূপ কথা, কতকগুলা উপকথা এবং কতকগুলা কিম্বদন্তির একত্র সমাবেশ বা সংগ্রহের নাম জীবনী নহে। তত্ত্বই জ্ঞানের চরম কল্প! যথায় তত্ত্ব নাই, প্রাকৃতিক নিয়ম নাই, কার্য্যকারণে দৃষ্টি নাই তথায় জ্ঞানের প্রাণ নাই। যাহার কারণ জানি না—তাহা আদৌ বুঝি না। সমাজতত্ত্বের সহকারক ইতিহাস; মনুষ্যত্ব প্রকাশক জীবনী। কিন্তু যে ইতিহাসে নিয়ম নাই, কার্য্যকারণের মালা নাই, তাহা ইতিহাসই নহে। যে জীবনীতে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা নাই, তাহা জীবনীই নহে। ইতিহাস জাতিগত, জীবনী ব্যক্তিগত, ছবি। দুইটীই সমাজ শাস্ত্রের অঙ্গ—দুইটিই প্রমাণ—দুইটিই পরীক্ষা। জীবনী ইতিহাসের মূল। আদৌ ইতিহাস কতকগুলা ব্যক্তিগত চরিত্র মাত্র ছিল। সত্যের মূলে বিষয়। তত্ত্ব বা সাধারণ্যপাত ক্রমসিদ্ধ। অনুমান পরবর্ত্তী কাণ্ড। নিয়ম ও কারণ নির্দ্দেশ করাই বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। মনুষ্য জগতের আভ্যন্তরিক নিয়ম নিরাকরণ করা ইতিহাসের কর্ত্তব্য। সুতরাং জাতিগত বা ব্যক্তিগত চিত্র বিশদ, স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক রীতি-বিশুদ্ধ হওয়াই উচিত। মহত্তের

বিবরণ ইতিহাসে বিজ্ঞানোপযোগী করিয়া সাজানই নিতান্ত আবশ্যক। জীবনীতে জাতীয় চরিত্রের বিশিষ্ট মূর্ত্তি পাওয়া যায়, সুতরাং ধারণার পক্ষে সুবিধা। অণুবীক্ষণে ক্ষুদ্রকে অনায়াসেই বৃহদাকার করিয়া তুলে। ফলে ক্ষুদ্রকে বৃহৎ বলিয়া ধারণ করায় তত্ত্বের ব্যাঘাৎ আছে। জীবনীতে জাতীয় চরিত্র অতিরঞ্জিত পাওয়া যায়। জাতীয় ইতিহাসে সাধারণের চরিত্র আছে। সাধারণ চরিত্র অপেক্ষাকৃত অস্ফুট। সুতরাং ইতিহাসে দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণ দুই আবশ্যক। আমরা জাতিতে ব্যক্তি—আবার ব্যক্তিতে জাতি মিলাইয়া দেখি। এইরূপে পরস্পর সংস্কার করিয়া লই। অতিরেক মাত্রা চিন্তায় পৃথক করিয়া থাকি। মানুষ মানুষের প্রধান আলোচ্য। দর্শন বিজ্ঞানের আদিপর্ব্ব, জীবনী ইতিহাসের। অবস্থান্তরে উভয়ে পৃথক হইয়াছে। উভয়ই জ্ঞানের অঙ্গ বিশেষ। মানুষ শুদ্ধ উদরান্নের জন্য ব্যস্ত নহে। একবার উচ্চ প্রকৃতি জাগরুক হইলে আর সে নীচের দিকে ঝোঁকে না; আপনি ক্রমাগতই বাড়িতে থাকে। তাই বলি মস্তিষ্ক হৃদয়ের দাস। ইতিহাস সংশ্লিষ্ট নিয়মাদির পরিচায়ক; জীবনী বিশ্লিষ্ট।

মানুষের ভাল মন্দ আলোচনার নাম জীবনী। উচ্চ ও অধঃস্থলে উহা বিচরণ করিয়া থাকে। ইতিহাসে একশেষ নাই; মধ্যম রাশিতে উহার আধিপত্য। অশেষবিধ শক্তির জটিল জাল অনুশীলন করিয়া তাহাদের কার্য্যকেন্দ্র নিরাকরণ করাই উহার প্রকৃত কর্ত্তব্য। লোকারণ্যের মধ্যবিন্দু যথায় সকলের শক্তি, প্রবৃত্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, প্রাণ ও হৃদয় সংমিলিত হইয়াছে তাহারই তদন্ত করা ইতিহাসের অধিকার। কার্য্য-সামঞ্জস্যের সাময়িক মূর্ত্তি ইহার আলোচ্য। চতুর্দ্দিকে নানা শক্তি নানা মতে আপন আপন দিকে আকর্ষণ করায় গুণবৃক্ষ যে নিয়মে উচ্চ-মুখে দাঁড়াইয়া থাকে মনুষ্যজাতির সাময়িক অবস্থিতিও সেইরূপ নিয়মে সংসাধিত হয়। জীবনী সেই শক্তি বিশেষের অতিশয় সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ করত মনুষ্যত্বের আলোচনার সহায়তা করিয়া থাকে। বড় লোক একটী বড় ঘটনা। তাঁহাতে সময়ের, এবং সময়েতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আছে। আমরা বিষয় তত চাহি না যত বিষয় সম্বন্ধীয় নিয়ম চাহি; কার্য্য তত নহে, যত কার্য্যান্তর্গত শক্তি জানিতে চাহি। মনুষ্যত্বের কঙ্কালমালা সংযোজনা করিয়া প্রাণদান করাকে ইতিহাস বলে। সুতরাং তুচ্ছ বিষয় ত্যাগ করিয়া আবশ্যকীয় সারাংশ সংগ্রহ করাই, উহার উদ্দেশ্য। সেই সার সম্বন্ধের নামই নিয়ম। কিন্তু কেমন করিয়া জানিব কোনটী আবশ্যকীয় আর কোনটী নহে। ফলে যাহা বিজ্ঞানের সহকারী তাহাই আবশ্যক। ভাল মন্দ যে মাত্রায়, আবশ্যক সে মাত্রায় নহে। কার্য্য আকারে বড় হইতে পারে—আবশ্যক আকারে নহে। আমরা "বড়" সৎ বা সত্য, জ্ঞান বা বুদ্ধির পরিচয়ে ব্যবহার করি নাই। ভাল হোক, মন্দ হোক, সাধারণ পক্ষে যাহার কোন বিশেষ আকর্ষণ বা প্রভাব আছে, তাহাই বড়। যাহা নিয়ম পক্ষে আবশ্যক তাহাই প্রকৃত আবশ্যক। কোন বড় জাতি কোন মহাযুদ্ধে পরাজিত হইতে পারে;

ব্যাপারটী অতি বড়; কিন্তু আবশ্যক পক্ষে তত না হইলেও সামান্য হইতে পারে। কোন ঘটনায় বা কোন একজন সামান্য লোক দ্বারায় হয়তো সেই যুদ্ধ উত্তেজিত হইয়াছিল আবশ্যক পক্ষে এইটী বস্তুতঃ উহাপেক্ষা বিস্তর বড়। খৃষ্টীয় ইউরোপ—আধুনিক উচ্চতম সভ্যতম ইউরোপ—তত বড় নহে, যত স্বয়ং খৃষ্ট বড়। যে পরিমাণে যাহাতে যত কার্য্যকারিতা তাহা তত বড়। কেহ নিহিত স্বভাবকে প্রকাশিত ও আলোকিত করেন। জীবনীতে তাই মনের উচ্চতা ও ব্যাপকতা জন্মে। যাঁহারা লুকান স্বভাবকে ফুটাইয়া তুলেন এবং তদ্বারা আমাদের মনের প্রচ্ছন্ন কক্ষ নূতন আলোকে আলোকিত করেন, আমরা তাঁহাদের প্রসাদেই আপনাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই। জীবনী এ বিষয়ে প্রকৃত প্রতিভা। ইহাতে আমার আমিত্ব প্রকাশিত হয়। মহৎলোক একটি প্রকাণ্ড কারণ এবং একটী প্রকাণ্ড কার্য্য। তাঁহার আবির্ভাব, তিরোভাব, প্রাদুর্ভাব, কার্য্যশক্তি, অধ্যবসায়, নিঃস্বার্থতা প্রকৃত ইতিহাস পূর্ণ। তিনি ইতিহাসের সৃষ্টিকর্ত্তা ও অভ্যন্তরিক মূর্ত্তি। তিনি ইতিহাসকে গড়িয়া লন; ইতিহাসও তাঁহাকে গড়িয়া লয়। তাঁহার জীবনী ইতিহাসের জীবনী। তিনি ইতিহাসের পট বা বন্ধন। তিনি আমাদের আদর্শ ও আলেখ্য, সর্ব্বময় কর্ত্তা ও সর্ব্বার্থিক কর্ম্ম। তিনি আমাদের আশা, ভরসা, সাহস, আলোক, এবং উপদেশ। কবি সৌন্দর্য্যের ব্যবসায়ী, দার্শনিক সত্যের, কিন্তু উভয় ই চিন্তাশীল। মনুষ্য মাত্রই চিন্তাশীল। এমন লোক নাই যাঁহার কোন নূতন চিন্তা নাই। তবে কাহারও বাঁধন আছে একাগ্রতা আছে; কাহারও তাহা নাই। মহতে সাধারণে প্রভেদ এই। বিস্ময়ের উচ্চ মাত্রায় ভক্তি, আনন্দের উচ্চ মাত্রায় জ্ঞান। যিনি সচ্চিদানন্দ তিনি পরমজ্ঞানী। বড় লোক সময়ের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি; জ্ঞানী লোক অসময়ের কাণ্ডারী ও সর্ব্বসময়ের গুরু। যিনি সত্যের জন্য লালায়িত, ধর্ম্মের জন্য আত্মহারা, জগতের ভাবে স্বতঃবিভোর এ বিশ্বসংসার তাঁহারই নিজস্ব। তাঁহার বড়ত্ব অপ্রকাশিত থাকিলেও থাকিতে পারে। ফলে বড় সচরাচর ভুবন বিখ্যাতকেই বলা যায়। বড় কার্য্যে লোকের বড়ত্ব সপ্রমাণ হয়। কিন্তু যাঁহার চিত্তের ব্যাপকতা আছে, তাঁহার যশ বা কার্য্য না থাকিলেও তাঁহার বড়ত্ব আছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্যারিলাল মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ পরমহংস দেবের জীবন চরিত্র।

(চৈত্র সংখ্যার পর)

শিবনারায়ণ এই সকল দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে মনে বলিতেন যে পাণ্ডা ও যাত্রী উভয়কেই ধিক্। সনাতন পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা হইতে বিমুখ হইয়া ইহাদিগের এই সকল দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। ইহারা আপনার অন্তরে বাহিরে যিনি পরিপূর্ণ তীর্থ ও জ্যোতিঃস্বরূপ আছেন তাঁহাকে না জানিয়া দেশে দেশে পশুবৎ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, কোন পথ পাইতেছে না। শিবনারায়ণ অমরগঙ্গাতে স্নান করেন নাই, বিভূতি মাখেন নাই ও অম্বরনাথকে প্রণামও করেন নাই। তিনি দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিলেন। তাহাতে তাঁহাকে সকলে পাপী বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিল। শিবনারায়ণ বলেন উলঙ্গ শব্দের অর্থ এই যে, আত্মা পরমাত্মা অভেদ অর্থাৎ এক হইয়া যান, পরমাত্মাতে অর্থাৎ আপনার স্বরূপেতে দ্বিতীয় কোন বস্তু না থাকে, পরিপূর্ণ রূপে স্বয়ং আপনি থাকেন সেই অবস্থার নাম উলঙ্গ এবং দিগম্বর।

পরে সেখান হইতে যাত্রীরা বিদায় হইয়া যেখানে বস্ত্র ইত্যাদি রাখিয়াছিল সেই ভৈরোঁ গড্ডিতে রাত্রি যাপনার্থে যাত্রা করিল।

রাত্রিকালে শিবনারায়ণ এক জন সাধুকে বলিতে লাগিলেন যে, 'তীর্থস্থানে আসিয়া যদ্যপি কেহ মিথ্যা বলে তাহা হইলে তাহার কোন জন্মে উদ্ধার হয় না, চিরকাল নরকে পতিত হইয়া থাকে, কিন্তু যে কেহ তীর্থে আসিয়া সত্য কথা বলে তাহা হইলে যদি তাহার দশ যুগের পাপ থাকে তাহা নাশ হইয়া যায় এবং সদা আনন্দরূপ মুক্তস্বরূপ থাকে। আমি অম্বরনাথের পায়রা দর্শন করিতে পাই নাই, আমি কেন মিথ্যা বলিয়া নরকেতে পতিত হইব। এই কথা শুনিয়া শিবনারায়ণের নিকট সাধু বলিতে লাগিল যে মহাশয় আমিও দর্শন করিতে পাই নাই। এই কথা শুনিয়া ক্রমে ক্রমে সকলেই বলিতে লাগিল যে আমরাও দর্শন করিতে পাই নাই।

অনন্তর ওখান হইতে যাত্রীরা রওনা হইয়া মটন্ গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে যাত্রীরা এক রাত্রি বিশ্রাম করিবে। সেইখানে একজন গয়লা এক কলস দুগ্ধ লইয়া বিক্রয় করিতে উপস্থিত হইল। এক শ্রীবৈষ্ণব সাধু তাহার দুগ্ধের দাম পাঁচ সিকা ঠিক করিল। বলিল যে "আমার বাসাতে দুগ্ধ লইয়া চল"। সেই সময় আর একজন সন্ন্যাসী-মহাত্মা উঠিয়া গয়লাকে বলিল যে "দুগ্ধের কত দাম লইবে?"

গয়লা বলিল "২।৷০ টাকা লইব।"

সন্ন্যাসী বলিল "আমার বাসাতে লইয়া চল, ২৷৷০ টাকা দিব"—এবং শ্রীবৈষ্ণব

বলিলেন যে "আমি ১।০ সিকা দাম স্থির করিয়াছি, তোমাকে দিতে দিব না।" সন্ন্যাসী বলিলেন যে "চুপ্ কর, নতুবা ভাঙ্গের মতন ঘুঁটিয়া তোকে খাইয়া ফেলিব।" শ্রীবৈষ্ণব বলিলেন যে "কখন কাহাকে ঘুঁটিয়া খাইয়াছিস্?"

এই কথা বলিয়া দুই জনে কলস ধরিয়া টানাটানি করাতে দুগ্ধের কলস ভাঙ্গিয়া গেল ও দুগ্ধ সকল নষ্ট হইয়া গেল। তৎকালে সন্ন্যাসীর কাছে একগাছ লাঠি ছিল। সেই লাঠি দ্বারা শ্রীবৈষ্ণবকে ২।৩ ঘা মারিল। তাহাতে একদিকে কতকগুলি শ্রীবৈষ্ণব ও আর দিকে কতকগুলি সন্ন্যাসী জুটিয়া উভয় দলে মারামারি হইতে হইতে কাহারও হাত কাহারও পা ভাঙ্গিয়া গেল। ২।৩ শত সন্ন্যাসী এইরূপে আঘাত পাইল এবং শ্রীবৈষ্ণবদিগেরও কয়েক জন আহত হইল। মুসলমানেরা মটন্ গ্রাম হইতে আসিয়া শ্রীবৈষ্ণব এবং সন্ন্যাসী উভয় দলকে দুই দিকে গলা ধাক্কা দিয়া বিবাদ নিবারণ করিয়া এই বলিয়া গালি দিতে লাগিল যে "তোরা মাথা মুড়াইয়া সাধু হইয়া পরস্পরে এইরূপ ঝগড়া মারামারি করিস্, শান্ত গম্ভীর ভাবে থাকিতে পারিস না, তোদের অপেক্ষা গৃহস্থেরা ভাল, তাহারা নিজ পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া সংসার প্রতিপালন করে, অভ্যাগতকে যথাশক্তি দান করে, ও ঈশ্বরকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে।"

এই সকল অবস্থা দেখিয়া শিবনারায়ণ মনে মনে বলিলেন যে, অম্বরনাথ দর্শন করিবার ফল অতি শীঘ্র সাধুরা প্রাপ্ত হইল এবং আহত ব্যক্তিরা পড়িয়া পড়িয়া কৈলাস ভোগ করিতে লাগিল।

পরে ওখান হইতে শিবনারায়ণ কাশ্মীর আসিলেন এবং কাশ্মীরে এক রাত্রি থাকিয়া সেখান হইতে বারমুলা ছাউনির পথ ধরিয়া পঞ্জাব যাত্রা করিলেন। বারমুলা ছাউনির প্রায় এক ক্রোশ উত্তরে রাস্তার নিকটে একটা মুদির দোকান আছে। সেই দোকানে হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের দুইজন ব্রাহ্মণ আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহারা দুই জনে এক খানি খাটের উপর শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। এমত সময় সেই দোকানে দুইজন অশ্বারোহী মুসলমান আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সেইখানে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ দুই জনকে খাটের উপর হইতে নামিতে বলিল। তাহাতে তাহারা বলিল যে আমরা ব্রাহ্মণ। এই কথা শুনিয়া দুই দিক হইতে দুইজন মুসলমান অশ্বের চাবুক লইয়া সেই ব্রাহ্মণ দুই জনকে মারিতে আরম্ভ করিল,—এবং ব্রাহ্মণ দুইজন এই বলিয়া অত্যন্ত চীৎকার করিতে লাগিল যে "আমাদের অপরাধ মাপ করুন।" তাহাতেও মুসলমানদের দয়া হইল না, তাহারা আরো মারিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল যে আমাদের সম্মুখে তোরা খাটের উপর বসিয়া এবং শয়ন করিয়া থাকিস্? তোরা কাফের, আমাদের অপেক্ষা নীচ জাতি, তোরা হিন্দু অর্থাৎ হীনবল ও তেজোহীন

এবং মানেও হীন। অতএব তোরা কিরূপে আমাদের সম্মুখে খাটের উপরে বসিবি।" এই বলিয়া আরো মারিতে লাগিল। দুইটি ব্রাহ্মণ মার খাইতে খাইতে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তৎকালে সেই দোকানের মুদি আসিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিল যে "হুজুর মাপ করুন।" সেই মুদিও হিন্দু। সেই মুদি তাহাদের সম্মুখে আসিয়া বলাতে তাহারা সেই মুদিকেও মারিতে আরম্ভ করিল এবং মার খাইতে খাইতে সেই মুদিও অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

শিবনারায়ণ তৎকালে সেই দোকানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই সমস্ত ঘটনা দেখিয়া হিন্দুদিগকে মনে মনে ধিক্কার দিয়া মুসলমানদিগকে ডাকিয়া প্রীতি পূর্ব্বক উভয় পক্ষকে শান্তভাবে বুঝাইতে লাগিলেন যে, "তোমরা বিচার পূর্ব্বক গম্ভীর ভাবে বুঝিয়া দেখ তোমরা বিবাদ করিয়া মরিতেছ কেন? মুসলমান বস্তুটা কি? লাল, কাল, হরিদ্রা না পীত বর্ণ? হাড় চামড়া না মাস? তোমরা হিন্দু হইতে তফাৎ কিসে? যদ্যপি ত্বকচ্ছেদ করাকে মুসলমান বল তবে তাহা যথেষ্ট নহে। প্রথমে তো সকলেই হিন্দু হইয়া জন্মিয়াছ। হিন্দুরাই তোমাদের আদি বীজ। তাহা তো তোমরা প্রত্যক্ষ জান। তাহাদের তবে কেন তোমরা দেখিয়া জ্বলিয়া মর। আর ঐ গরিব ব্রাহ্মণ-দিগকে বিনা অপরাধে কেন মারিয়া অনর্থক কষ্ট দিলে। যদ্যপি তাহাদের বল থাকিত তাহা হইলে তোমাদের যদি উহারা মারিত তাহা হইলে তোমাদের কত কষ্ট হইত। সকলেই তো খোদার অর্থাৎ পরব্রহ্মের স্বরূপ। মারপিট এরূপ করিতে নাই, বিচার করিয়া শান্তভাবে চলিতে হয়।

মুসলমান দুই জন বলিলেন "আপনি যথার্থ বলিতেছেন মহারাজ, আমরা কি করিব যেমন মৌলবীরা বলিয়া দেয় আমরা সেইরূপ করি। আমরা জানি যে হকের নাম মুসলমান, কিন্তু দেখিতে পাই আমাদের মুসলমানের মধ্যে কত জন মিথ্যা বলিতেছে, কিন্তু আমরা ঠিক জানি না, যে কাহাকে মুসলমান বলে।

অনন্তর শিবনারায়ণ সিন্ধু নদী পার হইয়া পেশওয়ারে যাইলেন। পেশওয়ার কেল্লার সম্মুখে একটা কূপ আছে। সেই কূপের নিকটে তিনি আশ্রয় লইলেন। সেইখানে বাগানে একটা কুণ্ড আছে। সেখানে একজন ব্রহ্মচারী থাকিতেন। সেই ব্রহ্মচারী আসিয়া শিবনারায়ণকে বলিলেন যে "আপনি রাত্রিতে এখানে থাকিবেন না। সহরেতে যাইয়া থাকুন, যদ্যপি এখানে থাকেন তাহা হইলে মুসলমানেরা আসিয়া আপনার গলা কাটিয়া ফেলিবে, নতুবা শুন্নৎ করাইয়া মুসলমান কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া দিবে, জাত মারিয়া ফেলিবে। আমরা দিবসে এখানে থাকি, রাত্রিতে সহরের মধ্যে থাকি, এবং ইংরাজদিগকে দিবসে সিপাহীরা পাহারা দেয়, রাত্রি হইলে কপাট বন্ধ করিয়া রাখে। নতুবা উহাদিগকে বাহিরে পাইলে মুসলমানেরা কাটিয়া ফেলে।

শিবনারায়ণ বলিলেন যে, "আমি সকল জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সকল জাতি আমাতে প্রবেশ করিবে, যেরূপ সমুদ্রেতে সকল নদীর জল যাইয়া পড়ে।"

শিবনারায়ণ এইকথা ব্রহ্মচারীকে বলিয়া রাত্রিতে সেইখানে বিশ্রাম করিলেন। বিশ্রাম করিয়া সেখান হইতে কাবুলের দিকে দুই তিন দিনের পথ যাইয়া সেখানকার অবস্থা দেখিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। পেশোওয়ার হইতে পঞ্জাবাভিমুখে এক গ্রামের বাহিরে বৃক্ষের তলায় একদিন বসিয়া আছেন—এক নিদারুণ নিষ্ঠুরতা দেখিতে পাইলেন। সেই গ্রামের মধ্যে সকলেই মুসলমান, কেবল মাত্র দুই তিন জন হিন্দু। এক মুসলমান পুত্রের সহিত বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে একজন হিন্দুর একটি কন্যাকে অপর গ্রামের কতকগুলি মুসলমান আসিয়া বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। কন্যাটি অত্যন্ত চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এবং তাহার পিতা মাতা হায় হায় করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল এবং সেই মুসলমানদিগকে বলিতে লাগিল যে, আপনারা দয়া করিয়া ছাড়িয়া দেন।

মুসলমানেরা দয়া না করিয়া তাহাদিগকে মারিয়া তাড়াইয়া দিল।

নিকটেই এক হিন্দু মুদির দোকান ছিল, শিবনারায়ণ মুদিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে একি ঘটনা হইতেছে ?

মুদি বলিল "মহারাজ ! এদেশের হিন্দুদের দুর্দ্দশার কথা কি বলিব, কোন বিচারক রাজা নাই। হিন্দুরা নালিশ করিলে মুসলমানেরা কাহারও কথা শুনে না। তাড়াইয়া দেয়, বলে, যে তোর কন্যাকে অপর জায়গায় বিবাহ দিতিস, না হয় আমরা ধরিয়া আনিয়া আমাদের পুত্রের সহিত বিবাহ দিব। আমরা মুসলমান, বড় জাতি।" মহারাজ, এদেশে সকলেই মুসলমান। কোন কোন গ্রামে দুই তিন জন করিয়া হিন্দু থাকে। তাহাদের কন্যারা রূপবতী হইলেই মুসলমানেরা বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের পুত্রের সহিত বিবাহ দেয়। কিম্বা যে কন্যার বিবাহ হইয়াছে এবং সুন্দরী তাহাকে পথ ঘাটে যদি দেখে তাহা হইলে তাহার অলঙ্কারাদির সহিত তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। দুই চারিমাস তাহাদের বাটিতে রাখিয়া সেই কন্যার পিতা মাতাকে পত্র লেখে যে তোমরা দুই শত অথবা পাঁচ শত যাহার যেরূপ ক্ষমতা সেই অনুযায়ী টাকা দিয়া তোমাদের কন্যাকে লইয়া যাও। মাতা অথবা শ্বশুর শাশুড়ি যে কেহ থাকে তাহারা টাকা দিয়া সেই কন্যাকে মুসলমানদের বাটি হইতে লইয়া আইসে। কিম্বা যে গ্রামে দশ পোনের ঘর হিন্দু আছে সেই গ্রামে দুই এক বৎসর বাদে মুসলমানেরা আসিয়া তাহাদের যাহা কিছু অর্থ থাকে হিন্দুদিগকে বাঁধিয়া সেই সমস্ত কাড়িয়া লয় ও তাহাদের ঘরে যে সকল সুন্দরী স্ত্রীলোক থাকে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া চলিয়া যায়।

কিন্তু হিন্দুস্থানে যে ইংরাজ রাজা আছেন তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিই। কেননা

তাঁহারা গরিবের দুঃখ শুনেন এবং তাঁহাদের শাসনে বলবান ব্যক্তি গরিবদিগকে বল-পূর্ব্বক কোন কষ্ট দিতে পারে না। যদ্যপি কষ্ট দেয় তৎকালে নালিশ করিলে বিচার করিয়া কষ্ট নিবারণ করেন।”

শিবনারায়ণ বলিলেন “তোমরা এদেশে এত কষ্ট পাইয়া কেন থাক, হিন্দুস্থানে চলিয়া যাইতে পার না?”

সেই মুদি দুঃখ করিয়া বলিল যে “হে মহারাজ, আমরা কয় জন আছি কোন্ দেশে কোন্ গ্রামে যাইব! আগে আমরা এই দেশে সকলেই হিন্দু ছিলাম!

ক্রমশঃ।

দেপাড়ার মেলা।

দেপাড়ায় প্রতিবৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় একটি করিয়া মেলা বসিয়া থাকে। কয়েক বৎসর হইতে ইচ্ছা করিতেছি এই মেলা দেখিতে যাইব কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। এই বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমার প্রভাতে কয়েক বন্ধু মিলিয়া দেপাড়ার দিকে যাত্রা করিলাম।

দেপাড়া কৃষ্ণনগরের দুইক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম। এখানে নৃসিংহ দেবের একটি প্রাচীন মন্দির আছে, বৈশাখী পূর্ণিমায় নৃসিংহ দেবের জন্ম দিন উপলক্ষে মেলা বসিয়া থাকে।

প্রভাত সূর্য্যের রক্তিম কিরণ জাল যখন সমস্ত আকাশ প্লাবিত করিয়া আম্রকাননের ঘন পত্রাবলীর মধ্যে লোহিত আভা ছড়াইয়া দিতেছিল সেই সময় আমরা নগরছাড়িয়া প্রান্তরে প্রবেশ করিলাম, বৈশাখের মনোহর প্রভাতে প্রান্তরের দৃশ্য মাধুর্য্য পূর্ণ। যতদূর দৃষ্টি যায় হরিৎবর্ণ ধান্যক্ষেত্রে চতুর্দ্দিক ছাইয়া রহিয়াছে; এক একবার বায়ু হিল্লোলে ধানগাছগুলি সুন্দর হিল্লোলিত হইতেছে, তাহাদের সর সর কম্পনে যেন তাহাদের হৃদয়ের সঙ্গীত অব্যক্ত ভাষায় উচ্ছসিত হইয়া উঠিতেছে, বুঝিতে না পারিলেও সে সঙ্গীত প্রাণস্পর্শী!

আমরা ধান্য ক্ষেত্রের আইল ঘুরিয়া যাইতে লাগিলাম, আইলের আশেপাশে দুএকটি ছোট-খাট গাছ, তাহাদের কোনটির উপর একটি ফিঙ্গে, কোনটির উপর একটি টিয়া পাখী বসিয়া রহিয়াছে।

ক্রমে আমরা একটি বৃহৎ আম্র কাননে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তাহার ভিতর দিয়াই রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, দেখিলাম ডালে ডালে প্রচুর আম্র ঝুলিতেছে, অধিকাংশই অপক্ক, সমস্ত গাছগুলি জাল দ্বারা ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে। বাগানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর

বাঁধিয়া বাগানরক্ষক স্ত্রী ও পুত্র কন্যার সহিত বাস করিতেছে। তখন বাগানরক্ষক বৃক্ষে উঠিয়া পাকা আমগুলি পাড়িতেছিল, তাহার স্ত্রী বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া তাহার স্বামীর সহায়তা করিতেছিল, আর তাহাদের পুত্র কন্যাগণ অদূরে হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া গাছের দিকে তাকাইয়াছিল, তাহাদের সরল মুখ মণ্ডল ও শান্তিপূর্ণ চক্ষুতে মনের উচ্চাভিলাষের অভাব ও হৃদয়ের সরলতা প্রকাশ করিতেছিল।

একটি গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম পথের উপরই একটি পুষ্করিণী, এই স্থানের পথটি একটু প্রশস্ততর, পুকুরটির প্রায় চারিদিকেই কতকগুলি তাল গাছ, এক কোণে একটি তেঁতুল গাছ, ইহার নিবিড় পত্রের মধ্যে বসিয়া একটি দহিয়াল এখন পর্য্যন্তও সুস্বরে গান করিতেছে, মুক্ত আকাশে আর কোন প্রতিবন্ধক না পাইয়া সেই গান দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছে; হঠাৎ অদূরস্থিত একটি গাব গাছের নব বিকশিত পত্রাবলীর মধ্যে হইতে 'বৌকথা কও' পঞ্চমে সুর তুলিয়া ডাকিয়া উঠিল, সহস্র প্রকৃতি যেন তাহার কণ্ঠস্বরে ডুবিয়া গেল, আমরা বিমুগ্ধ হইয়া চলিতে লাগিলাম।

পুকুরের এক ধার দিয়া একটি অপ্রশস্ত পথ সেই গ্রাম হইতে মাঠের দিকে চলিয়া গিয়াছে। দুই তিন জন রাখাল গরুর পাল লইয়া সেই দিকে চলিয়াছে, দুই একটি নব বৎস এক দিক হইতে ছুটিয়া অন্যদিকে যাইতেছে তাহাদের মাতাগণও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া যাইতেছে।

তাহার পরই দেখিলাম কতকগুলি গ্রাম্য মহিলা কলস কক্ষে গল্প করিতে করিতে জল আনিতে চলিয়াছে, তাহাদের কথা অনেক শুনিতে পাইলাম। সরল হৃদয়ে তাহারা আপন আপন সুখ দুঃখের কথা কহিতেছিল। তাহাদের কথা গুলিতে কৃষক জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস জানিতে পারা যায়।

আমরা অতি ধীরে ধীরে যাইতেছিলাম, বেলা প্রায় নয়টার সময় দেপাড়ায় পৌঁছিলাম; লোকে ইহাকে দেপাড়া বলিলেও ইহার প্রকৃত বা পূর্ণনাম নৃসিংহদেব-পাড়া নৃসিংহ দেবের মন্দির আছে বলিয়াই এই নামটি হইয়াছে।

দেপাড়া অতিক্ষুদ্র গ্রাম, আমরা একেবারে মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম, মন্দিরের নিকট এক মাইলের মধ্যে কোনদিকে বসতি নাই। চতুর্দ্দিকে চসা জমী; তবে মন্দিরের চতুর্দ্দিক জঙ্গলপূর্ণ, অশ্বত্থ, বট, তেঁতুল, বেল প্রভৃতি বড় বড় গাছেই এই জঙ্গল হইয়াছে; মন্দিরটি সমতল ভূমিখণ্ডের উপর নহে, একটি উচ্চ ঢিবির উপর, মন্দিরটি ক্ষুদ্র।

ক্রমে যতই বেলা বাড়িতে লাগিল, চতুর্দ্দিকস্থ নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে জন সমাবেশ হইতে লাগিল। আমরা একটি বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিবার জন্য বসিলাম; কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর নিকটস্থ একটি সরোবরে স্নান করিয়া আসিলাম, তাহাতে জল যদিও অধিক ছিল না, কিন্তু তাহা শীতল ও পরিষ্কার। স্নান শেষ করিয়া

কিঞ্চিৎ জলযোগ করা গেল, তাহার পর সেই জঙ্গলের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম।

বড় বড় বৃক্ষ, তাহার তলদেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যাত্রীগণের বিশ্রাম স্থান। বৃক্ষতলেই নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আনীত দেখিতে পাইলাম; আম, লিচু, তালের শাঁস, বঁইচি প্রভৃতি ফল স্তুপাকারে রহিয়াছে, নানাবিধ মিষ্টান্ন দ্রব্যও দেখা গেল কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলি অখাদ্য। বেলা দুইপ্রহরের সময় তরমুজ খরমুজ প্রভৃতি আরও অনেক ফল চারিপাঁচ ক্রোশদূর হইতে বিক্রীত হইতে আসিল; কৃষ্ণনগর হইতেও দুপাঁচ জন দোকানদার তাস, পট, পটকা, কাঁচের গ্লাস, মাটির পুতুল প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ আনিয়াছিল। আমরা মধ্যাহ্নে মন্দিরের ভিতর ঠাকুর দেখিতে চলিলাম।

দেখিলাম কলিকাতা বটতলায় এক পয়সা দামে যে দশ অবতারের ছবির কাগজ বিক্রয় হয়, তাহাতে যেমন নৃসিংহ মূর্ত্তি সেইরূপ একমূর্ত্তি। নৃসিংহদেব কোন সিংহাসনের উপর অবস্থিত নহেন, মৃত্তিকার উপরই অর্দ্ধোপবিষ্ট ভাবে অবস্থান করিতেছেন, ক্রোড়ে মৃত হিরণ্যকশিপু, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, বোধ হয় পাষাণময়।

মন্দিরের পুরোহিত বড় ভদ্র লোক বলিয়া বোধ হইল। আমাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন এই মন্দির সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা বলিলেন। নৃসিংহদেবের অনেক মাহাত্ম্যের কথা শুনিতে পাইলাম।

কিছু পরে ক্ষুধার উদ্রেক হওয়াতে মন্দিরের বাহিরে কিয়দ্দূর আসিয়াই আমরা বিস্ময় নেত্রে দেখিলাম একটি বিল্ববৃক্ষে শত শত ইষ্টক খণ্ড রজ্জুবদ্ধ রহিয়াছে; প্রথমে মনে করিলাম রাখালের দল এই কাজ করিয়াছে, নতুবা আর এমন নিষ্কর্ম্মা লোক কে আছে যে গাছে ঢেলা বাঁধিয়া রাখিবে? অদূরে এক বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম; সে ব্যক্তি উত্তর দিল যে পুত্রলাভের মানসে লোকে এই সমস্ত ইষ্টক খণ্ড বাঁধিয়া রাখিয়া যায়, ঠাকুর তাহাদের প্রতি সদয় হইয়া পুত্ররত্ন দান করেন; তাহাদের লাভ বংশ বৃদ্ধি—আর ঠাকুরের লাভ পায়সান্নের ভোগ। ক্ষুধানলে সে সময় আমাদের উদর দগ্ধ হইতেছিল—বিশেষতঃ উপস্থিত বন্ধু বর্গের মধ্যে কাহারও পুত্রের প্রয়োজন বোধ হয় নাই—সুতরাং জন সাধারণের প্রতি ঠাকুরের এই অসীম অনুগ্রহের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আমরা দ্রুত পদে নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এ সময় রন্ধন কার্য্য করা বিশেষ সুবিধা জনক নহে বুঝিয়া আমরা চিপিটক ও দধিতে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু ভোজন ব্যাপার বড় সুবিধা জনক হইল না—মোটা চিঁড়া, জোলো দই আর মান্ধাতার আমোলের সন্দেস এই তিন দ্রব্যের একত্র সম্মিলনে যে কি উপাদেয় দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহা আশা করি আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ সকলেই অনুমান করিয়া লইতে সক্ষম, সুতরাং সে সম্বন্ধে এখানেই পূর্ণচ্ছেদ।

আহারাদি সমাপন করিয়া আমরা বিশ্রাম করিতে বসিব, এমন সময় মন্দিরের নিকট অনেক লোকের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য সেই-স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম নবদ্বীপ হইতে একটি ভদ্র লোক সপরিবারে আত্মীয় স্বজন লইয়া তাহার নবকুমারের অন্নপ্রাশন দিতে মন্দিরে আসিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্ব কথিত বিল্ব শাখায় ইষ্টক খণ্ড বাঁধিয়া রাখাতে নৃসিংহদেবের প্রসাদে এইভদ্র লোকটি পুত্রমুখ দর্শন করিয়াছেন, সেই জন্য কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তিনি নৃসিংহদেবের নিকট পায়সান্ন ভোগ দিবেন এবং দেবতার প্রসাদে তাঁহার পুত্রের অন্নপ্রাসন হইবে। দেখিলাম অনেকগুলি গোপ দুগ্ধ ভার লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, একটি বৃক্ষ-তলে কতকগুলি উনান খনন করা হইল, পায়সান্ন প্রস্তুত হইলে যথা ক্রমে অন্ন-প্রাসন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল; আহূত অনাহূত অনেকেই নৃসিংহদেবের প্রসাদ পাইলেন। শুনিলাম এইরূপ অন্নপ্রাসন কোন মাসেই ফাঁক যায় না।

এই সময়ে পাঠক মহাশয়দের আর একটি কথা বলিব; এটি নৃসিংহদেবের মাহাত্ম্য কথা। নৃসিংহদেবের ভোগের পায়সান্ন প্রস্তুতের জন্য যে দুগ্ধ আনীত হয় তাহা সম্পূর্ণ রূপে নির্জ্জলা, এবং সেই জন্য গোয়ালারা এই দুগ্ধের দাম সাধারণ দুগ্ধ অপেক্ষা অনেক অধিক লইয়া থাকে; যদি কোন গোয়ালা লোভ সামলাইতে না পারিয়া দুগ্ধে একটুও জল মিশাইয়া দেয়—তবে পথি মধ্যে সেই দুগ্ধ ভাণ্ড খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। শুনিলাম গোয়ালারা অনেক ঠেকিয়া শিখিয়াছে সেই জন্য তাহারা আর দুগ্ধে জল মিশাইতে সাহস করে না। তবে নাকি স্বরূপগঞ্জ, নবদ্বীপ প্রভৃতি গঙ্গার নিকটবর্ত্তী স্থানের গোয়ালাদিগের নিকট নৃসিংহদেবও জব্দ; তাহারা দুগ্ধের দাম অধিক নেয়—আবার প্রচুর গঙ্গাজল মিশাইয়া দুগ্ধ লইয়া আসে—দুগ্ধে গঙ্গাজল মিশাইলে সে দুগ্ধভাণ্ডের উপর নৃসিংহদেবের জুরিস্‌ডিকসন্ নাই।

এইবার আমরা আমাদের বৃক্ষতলে আসিয়া শয়ন করিলাম। এখন বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে, ভয়ানক গরম কিন্তু বৃক্ষতল কথঞ্চিৎ শীতল। সূর্য্যদেব পশ্চিমে ঈষৎ হেলিয়া পড়িয়াছেন—তাঁহার দুই একটি রশ্মি বৃক্ষপত্রের মধ্য দিয়া আমা-দের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে; একটি ঘুঘু আমাদের অদৃশ্য থাকিয়া বৃক্ষ পত্রে শরীর আচ্ছাদিত করিয়া ডাকিতেছে 'ঘুঘু-ঘু'। নিকটস্থ একটি তেঁতুলের ডালে এক পাল হনুমান, তাহাদের অধিকৃত এই বিজন প্রদেশ আজ কোলাহল পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া তাহাদের মনে কিছু ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা লাঙ্গুল আষ্ফালন করিয়া কখন বা ছাপ্পান্ন রকম মুখভঙ্গিতে দন্তবিকাশ পূর্ব্বক চিঁ চিঁ শব্দ করিয়া আপনাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেছে, কখনও বৃক্ষের এক শাখা হইতে দূরস্থিত শাখান্তরে লম্ফ দিয়া তাঁহাদের আদি পুরুষ বীর প্রবর পবনাত্মজের স্মৃতি দর্শকদিগের মনোমধ্যে জাগরিত করিয়া দিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরেই নৃসিংহদেবের একজন পুরোহিত আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন; তিনি অনেকক্ষণ আমাদের নিকট বসিয়া রহিলেন এবং নানা কথায় আমাদিগকে আমোদিত করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার নিকট নৃসিংহদেবের আবির্ভাব ও মন্দির স্থাপনার ইতিহাস শুনিয়া লইলাম—এসম্বন্ধে আমাদের যে টুকু অভিজ্ঞতা জন্মিল অনুরুদ্ধ না হইলেও তাহা প্রিয় পাঠক মহোদয়গণের নিকট প্রকাশ করিব, কেন না এই বিবরণের অনেক স্থান এরূপ বিশ্বাস যোগ্য যে তাহা আষাঢ় মাসেরই কথা।

পুরোহিত মহাশয় আমাদের নিকট যে গল্পটি বলিলেন, তিনি তাহা তাঁহার পিতামহের মুখে শুনিয়াছিলেন—তাঁহার পিতামহেরও নাকি এটি শোনা কথা—সুতরাং ইহা কোন্ সময়ের কথা তাহা জানিবার উপায় নাই; তখন বঙ্গের নবাব কে ছিলেন, দিল্লীর সিংহাসনে কোন সম্রাট বিরাজ করিতেছিলেন তাহাও কেহ জানেন না। তবে ইহা অতি প্রাচীন কথা—তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তখন এই সমুদয় স্থান ঘোর অরণ্যাবৃত ছিল—দুই প্রহরের সময়ও বাঘ ভাল্লুকের দল ইতস্তত নির্ভয়ে বিচরণ করিত; তাহার উপর নাকি ইহা ভূত প্রেতেরও লীলাভূমি ছিল। দুই তিন ক্রোশ-ব্যাপী এই জঙ্গলের অনতি দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসী বর্গ প্রায় সকলেই কৃষক ছিল, অল্প করে অনেক জমি পাইত বলিয়াই তাহারা এই বিপদসঙ্কুল অরণ্যের নিকট স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করিত। সময়ে সময়ে শীত কালে তাহারা বাঘ ভালুক ও বন্য শূকরের উপদ্রবে এতই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িত যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নি কুণ্ড জ্বালিয়া তাহারই পার্শ্বে বসিয়া সপরিবারে রাত্রি যাপন করিত। সে সময় এ অঞ্চলে দস্যুভয়ও যথেষ্ট ছিল, সময়ে সময়ে গ্রামবাসীরা সভয়ে দেখিত দুএকটি হৃতসর্ব্বস্ব মৃত পথিক রক্তাক্তদেহে তাহাদের গ্রাম্য পথপ্রান্তে পড়িয়া আছে। হয়ত দুই প্রহরের সময় রাখাল বালকগণ অরণ্যপার্শ্বে দিঘির ঘাটে গরুকে জল খাওয়াইতে গিয়া দেখিত দিঘীর সেওলা ও কাদার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দুই একটি মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে, সময়ে সময়ে কৃষকগণ তাহাদের শস্যক্ষেত্র পরিদর্শন করিতে করিতে সন্ধ্যাকালে অরণ্যের নিকট আসিয়া পড়িত, হয়ত অরণ্য মধ্যে অস্বাভাবিক শব্দ শুনিয়া সেদিকে চাহিয়াই গভীর অরণ্যের ভিতর আলোকচ্ছটা দেখিতে পাইত, সুতরাং আর কোন দিকে না চাহিয়াই "রাম রাম" করিতে করিতে গ্রামের দিকে ছুটিয়া যাইত; গ্রামে পৌছিয়াই তাহারা স্বস্ব কল্পনা শক্তির প্রভাবে ভূত প্রেতের শত শত নূতন গল্প সৃষ্টি করিয়া অগ্নি কুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া স্ত্রী পুত্র কন্যাগণের নিকট বলিতে থাকিত; শুনিতে শুনিতে তাহারা রোমাঞ্চ হইয়া উঠিত।

প্রকৃত পক্ষে এই আরণ্য প্রদেশ তখন ডাকাইতদিগের একটি প্রধান আড্ডা ছিল, সাধারণ লোকে তাহাদের প্রজ্জলিত আলোক দেখিয়া ও তাহাদের কর্কশ দুর্বোধ্য কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভূত প্রেত ভাবিয়া দূর হইতেই পলায়ন করিত।

এই অরণ্যের নিকট যে দিঘি ছিল তাহা অতি প্রাচীন, একটু মনোযোগের সহিত দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, এই স্থলে একটি ক্ষুদ্র নগর বা কোন বৃহৎ অট্টালিকা ছিল, কাল ক্রমে তাহা ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে, সেই ধ্বংশরাশির উপর এই বৃহৎ অরণ্য গজাইয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু আমরা এখন দেখিতেছি সে অরণ্যও ধ্বংশ প্রায়, দুই একটি প্রাচীন অশ্বত্থ বট ও তেঁতুল গাছ তাহাদের বিগতপ্রায় গৌরবের সাক্ষী দিতেছে।

এস্থানে যে সুবৃহৎ অট্টালিকা ছিল বলিতেছি তাহার প্রমাণ ও কিছু কিছু আছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক ও প্রস্তর খণ্ড প্রচুর পরিমাণে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইষ্টকখণ্ড গুলি দেখিয়া বোধ হয় তাহা বর্ত্তমান যুগের নহে—সেই জন্য অনুমান হয় বহুকাল পূর্ব্বে হয়ত কোন জমিদার বা রাজা এখানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং এই দিঘিও তাঁহার খণিত মনে হয়। বিশেষ যখন এই স্থানের অধিকাংশ জমীই কৃষ্ণনগরের রাজার জমীদারীর অনুর্ভূত, তখন কৃষ্ণনগরের রাজবংশের কোন প্রাচীন রাজা এখানে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়াও অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে এ সম্বন্ধে কোন আভাষ পাওয়া যায় না।

যাহাই হউক ইহা একপ্রকার নিশ্চয় যে নৃসিংহ দেবের প্রতিষ্ঠা হইবার অনেক পূর্ব্বেই এই অট্টালিকাদি ধ্বংশ হইয়া গিয়াছিল, এবং বিধ্বস্ত অট্টালিকা গুলি অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষ সমূহ বক্ষে ধারণ করিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সে সময় এদিকে বড় লোকজনের যাতায়াত ছিল না—এক একজন পথিক পথভ্রান্ত হইয়া দৈবাৎ এদিকে আসিয়া পড়িলে উর্দ্ধশ্বাসে অন্যদিকে পলায়ন করিত, কিম্বা মধ্যাহ্নে দল ছাড়িয়া দুই একটি গাভী গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলে রাখালেরা খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইয়া যাইত। একজন গোয়ালার কতকগুলি দুগ্ধবতী গাভী ছিল, তাহাদের মধ্যে একটি গাভী প্রত্যহ প্রায় ৫।৬ সের করিয়া দুগ্ধ দিত, কিন্তু কয়েক দিন পরে গোয়ালা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে তাহার বাঁটে কিছু মাত্র দুগ্ধ নাই; প্রত্যহ যখন গাভী চড়িতে যায় তখন কেহ যেন তাহার দুগ্ধ দোহন করিয়া লয়, ইহাতে গোয়ালার মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইল; একদিন সে রাখালকে কারণ জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু রাখাল কিছুই বলিতে না পারায় তাহাকে দুই এক ঘা প্রহারও খাইতে হইল। প্রহার খাইয়াও সে নিরুত্তর রহিল—তখন গোয়ালার মনে একটু দয়ার উদ্রেক হইল। সে রাখালকে সেই গাভীটির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলিল ও দল ছাড়িয়া গাভী অন্য কোন দিকে যায় কি না দেখিতে বলিয়া দিল। রাখাল সম্মত হইল, পর দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাখাল গোচারণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল—যে তাহার সেই গাভীটি অনেকক্ষণ দলে থাকে, প্রায় দুই প্রহরের সময় সে অরণ্যে প্রবেশ করে ও অল্প সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসে, ফিরিয়া আসিলে বোধ হয় কেহ তাহাকে দোহন করিয়া লইয়াছে কারণ তখন তাহার বাঁটগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা শুষ্ক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

গোয়ালা এই কথা শুনিয়া এই ঘটনার আভ্যন্তরিক রহস্য অবগত হইবার জন্য অতি উৎসুক হইয়া উঠিল। পরদিন সকালে যখন রাখাল গাভীগুলি লইয়া চরাইতে গেল গোয়ালাও তাহার অনুসরণ করিল। এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া সে প্রকৃতই দেখিল তাহার গাভী বেলা দুই প্রহরের সময় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, গোয়ালাও অতি সাহসে ভর করিয়া গাভীর অনুগমন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে গাভী একটি উচ্চ ভূখণ্ডে উঠিয়া একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর দুগ্ধধারা বর্ষণ করিতে লাগিল, তাহার পর গাভী ফিরিল সঙ্গে সঙ্গে গোয়ালাও ফিরিয়া আসিয়া গ্রামস্থ সকলকেই সেই ঘটনা বলিল। রাত্রে নৃসিংহদেব গোয়ালাকে স্বপ্ন দিলেন যে সেই দুগ্ধ বর্ষিত স্থানে তিনি ভূমি ফুঁড়িয়া উঠিলেন তাঁহার যেন একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হয়। গ্রামবাসীগণ সেখানে গিয়া দেখিতে পাইল নৃসিংহ দেব পূর্ণ মূর্ত্তিতে সেখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু তাহারা সামান্য অবস্থার লোক বিশেষতঃ সেরূপ গণ্ডগ্রামে চুন, সুরকি, হট, কাট, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি পাওয়া দুস্কর সুতরাং ইষ্টকই মন্দিরের পরিবর্ত্তে তাহারা তাঁহার একখানি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিল। গ্রামবাসীগণ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিদিন দুগ্ধ ভোগ দিয়া আসিত। বিপদে আপদে তাহারা নৃসিংহ দেবের পূজা মানিত, নৃসিংহও অকৃতজ্ঞ নহেন তাহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন।

কালক্রমে এই অরণ্যে এক সন্ন্যাসী আসিয়া জুটিল। সে নাকি মন্ত্রসিদ্ধ; কিন্তু সন্ন্যাসীকে মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি কোন ক্রিয়া কেহ কখনও করিতে দেখে নাই, তবে তাহার একটি কৌতুকাবহ অনুষ্ঠান ছিল; সমস্ত দিন ধরিয়া সন্ন্যাসী মাঠে মাঠে ঘুঁটে কুড়াইয়া বেড়াইত, এবং সন্ধ্যাকালে সেই ঘুঁটে সাজাইয়া অরণ্যের মধ্যে আগুণ জ্বালাইয়া তাহার পর 'বাবাগো' 'মা গো' 'পুড়িয়ে মারলে গো' 'তোমরা সব এস গো' ইত্যাদি নানাপ্রকার চীৎকার শব্দ করিত।

গ্রামের লোক সন্ন্যাসীর চীৎকার শুনিয়া দলবদ্ধ হইয়া ছুটিয়া আসিত, ভাবিত, তাহার কোন বিপদ হইয়াছে। কিন্তু আসিয়া দেখিত আগুণের নিকট বসিয়া সন্ন্যাসী বিড় বিড় করিয়া বকিতেছে, ও তাহার বিপদ হইয়াছে মনে করিয়া যাহারা ছুটিয়া আসিয়াছে তাহাদেরই কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করিতেছে। গ্রামবাসীগণ দুই তিন দিন এই ব্যাপার দেখিয়া তাহার পর হইতে আর কেহ তাহার চীৎকারে কাণ দিত না। সন্ন্যাসী আটদশ দিন এইরূপে চীৎকার করার পর যখন দেখিল তাহার চীৎকারে আর কেহই এদিকে আসে না তখন একদিন সন্ধ্যাকালে নৃসিংহ দেবের কুটীরে প্রবেশ করিয়া স্তূপাকারে ঘুঁটে সাজাইয়া ঠাকুরকে ঢাকিয়া ফেলিল তাহার পর তাহাতে অগ্নি লাগাইয়া দিল, ঠাকুর যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলেন ও চীৎকার করিয়া গ্রামবাসীদিগকে উদ্ধারের জন্য ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীর চীৎকার ভাবিয়া কেহই সে দিকে অগ্রসর হইল না। নৃসিংহদেবের কপালে একটি মহামূল্য

মণি ছিল তাহারই লোভে নাকি সন্ন্যাসী এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও তাহার কৃতকার্য্যতার পথে বিঘ্ন উপস্থিত হইল। মণি নৃসিংহ দেবের ললাট হইতে বহির্গত হইয়া প্রবল বেগে নিকটস্থ জলাশয়ে প্রবেশ করিল, তাহার আভায় মুহূর্ত্তের জন্য চতুর্দ্দিক আলোক পূর্ণ হইয়া উঠিল।

যাহাহউক সন্ন্যাসীর হৃদয় দমিল না—সে দিঘিতে নামিয়া জলের মধ্যে মণির অনুসন্ধান করিতে লাগিল, তখন প্রায় অর্দ্ধরাত্র। সমস্ত রাত্রি সে জলের ভিতর মণি খুঁজিতে লাগিল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিলে পক্ষীগণ যখন জাগিয়া উঠিল শুকতারা ম্লান হইয়া গেল, পূর্ব্বাকাশে উষার আলোকচ্ছটা দেখা দিল তখন সন্ন্যাসী মণি প্রাপ্ত হইল; তাহার পর সে কোথা চলিয়া গেল তাহা কেহই জানে না;—সন্ন্যাসীর এই ডাকাতি ব্যাপারই বা কিরূপে জনসমাজে প্রচারিত হইল তাহাও দুর্ভেদ্য।

সে যাহা হউক সন্ন্যাসীর অগ্নিকাণ্ডে নৃসিংহদেব অবশ্য ভস্মসাৎ হইয়া গেলেন; পরদিন প্রভাতে গ্রামবাসীগণ ঠাকুরের দুর্দ্দশা দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল, সন্ন্যাসীরও অনেক অনুসন্ধান হইল—কিন্তু বৃথায়। নৃসিংহদেব কিছু দিন গৃহ শূন্য অবস্থাতেই রহিলেন। কতদিন পরে কেহই জানেন না—কোন ভদ্র লোক নৃসিংহদেবের একটি ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ ও যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য দেপাড়ার দিঘিটির পঙ্কোদ্ধার করিয়া দেন।

এই বৈশাখী পূর্ণিমায় এখানে যে উৎসব হয় তাহা ভিন্ন নৃসিংহদেবের অন্য কোন উৎসব নাই, কিন্তু প্রতিদিনই একবার করিয়া তাঁহার পূজা হইয়া থাকে; প্রতি বৎসরই পূর্ব্ববঙ্গ হইতে অনেক যাত্রী দেবদর্শনার্থ এখানে সমাগত হয়, এবং যাহার যাহা মাননা থাকে তাহা দিয়া যায়। নিকটস্থ স্থানের লোকও সময় সময় আসিয়া থাকে; সাধারণের প্রদত্ত পূজাতেই নৃসিংহদেবের ও তাঁহার পুরোহিত বর্গের উদর পূর্ণ হয়।

বৈশাখী পূর্ণিমার অপরাহ্নকাল পর্য্যন্ত এখানে লোক জনের সমাগম থাকে তাহার পরই জন-কোলাহল মন্দীভূত হইয়া আসে; সকল যাত্রী চলিয়া গেলে আমরাও সন্ধ্যার ঈষৎ প্রাক্কালে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত পুরোহিত মহাশয়ের নিকট বিদায় লইয়া নগরের দিকে ফিরিলাম।

সুন্দর সন্ধ্যাকাল, আকাশ পরিষ্কার, কোন দিকে এক খণ্ড মেঘের চিহ্নমাত্র নাই; তখনও অন্ধকার গাঢ় হয় নাই, আলো অন্ধকারে মিশিয়া প্রকৃতি এক অপূর্ব্ব বর্ণ ধারণ করিয়াছে, আকাশের দিকে চাহিতেই দেখিলাম হীরক খণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল—দুই একটি নক্ষত্র আকাশের বিশাল ক্রোড়ে দূরে দূরে ফুটিয়া উঠিয়াছে, বোধ হইতে লাগিল তাহারা করুণ দৃষ্টিতে শোক তাপ ও অশান্তির আলয় পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, যেন তাহাদের হৃদয়ের শুভ্রতা, প্রাণের সরলতা ও কোমলতা পৃথিবীকে

দিয়া পৃথিবীর শোক তাপ ও চিন্তামগ্ন জর্জ্জরিত হৃদয়খানি চাহিতেছে! আমরা মুগ্ধনেত্রে কখনও আকাশের দিকে কখনও দূর প্রান্তরের দিকে চাহিতে চাহিতে চলিলাম; নিকটে দূরে বিশাল অশ্বত্থ, শিমুল ও সেগুয়ান গাছের দিকে তাকাইতে মনে যেন আতঙ্ক উপস্থিত হইতে লাগিল, মনে হইল এই নির্জ্জন প্রান্তরে, সন্ধ্যায়, আমরা কয় জন পথিক—বেলা থাকিতে থাকিতে আমাদের বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মুহূর্ত্তেই হৃদয় সংযত হইল—মনে আবার নূতন ভাবের উদয় হইতে লাগিল, ভাবিলাম এই প্রকাণ্ডাকার বৃক্ষ শ্রেণী, এই নিস্তব্ধ প্রান্তরে এই মধুর সায়াহ্নে উন্নত মস্তকে শাখা প্রশাখা ঊর্দ্ধে তুলিয়া কাহার চিন্তায় নিমগ্ন! কোন বিরাট পুরুষের আশা পথ চাহিয়া তাহারা স্তব্ধ ভাবে অপেক্ষা করিতেছে? কাহার উপাসনায় সমস্ত রাত্রি নিমগ্ন থাকিয়া প্রভাতে তাহারা প্রেমাশ্রুতে সর্ব্ব শরীর ভাসাইতে থাকে? হায়, আমরা অন্ধমানব কিছুই দেখিতে পাই না, আশা, মোহ, ভয় প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে সর্ব্বদাই আমাদের হৃদয় পূর্ণ থাকে—সর্ব্বদাই আমরা কোলাহল পূর্ণ সংসারের ঘটনাবলীর মধ্যে ডুবিয়া থাকি, বিশ্ব পিতার প্রকৃতি রাজ্যের এমন সুন্দর কবিত্ব পূর্ণ ভাব দেখিবার জন্য কখনও হৃদয় অধীর হয় না—ধিক্!

আমাদের ভয় চলিয়া গেল—হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হইতে লাগিল, বিজন প্রান্তর বিশ্ব পিতার সুন্দর প্রাসাদ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, পিতৃ গৃহে আর ভয় কি? আমরা নির্ভয়ে চলিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রান্তরে আসিয়া পড়িলাম; দেখিলাম চন্দ্র হাসিতে হাসিতে পূর্ব্বাকাশে উঠিয়াছেন; তাহার মধুর কিরণে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত; বৃক্ষপত্রে সেই কিরণ ধারা পতিত হইয়া প্রতিফলিত হইতেছে। দুই একজন কৃষক গান করিতে করিতে গৃহাভিমুখে ফিরিতেছে। দূর অরণ্য হইতে একটি আরণ্য পক্ষী বিকট শব্দ করিয়া উঠিল, একটু অগ্রসর হইতে না হইতেই শুনিতে পাইলাম, একটি আম্র কানন হইতে কোকিল আকুল কণ্ঠে 'কু-উ, কু-উ' করিয়া ডাকিয়া উঠিল। বসন্ত চলিয়া গিয়াছে তাই তাহার হৃদয় বিরহদগ্ধ, তাই তাহার এই ব্যথিত রোদন; তাহার চিন্তাস্রোত, তাহার অতীত স্মৃতি এতদিন যেন কি এক পাষাণস্তরে অবরুদ্ধ ছিল, আজ সহসা বৈশাখী পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্রের উজ্জ্বল কিরণধারার সেই স্তর বিদীর্ণ হইয়া তাহার মর্ম্মদেশ হইতে ধ্বনিত হইতেছে 'কু-উ, কু-উ'।

দেখিতে দেখিতে আমরা জনাকীর্ণ নগরের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম; ছক্কর গাড়ীর হড় হড় শব্দে, ও নাগরিক বর্গের কণ্ঠ স্বরে আমাদের পূর্ব্ব চিন্তা ভাঙ্গিয়া গেল, আবার সংসারের চিন্তা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল; আমরা পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে ফিরিলাম।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

পালিতা।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

'ঐলো বর বাড়ীর ভিতর আসছে'

'উলুদেলো উলুদে — শাঁখ বাজা'

'ও কমলি বাজন্দারগুলোকে ভাল ক'রে বাজাতে বল'

'দিদি বরণডালা কোথায় ?'

'বরণডালা, ছিরি, বুধবার পিদীপ, জলের ঘটি, ধান দূর্ব্বো, সব নিয়েছিলো নিয়েছি— দালানে চল'।

'নাপিত ছেলে আবার কোথায় গেল—? এই যে শশি, ভাল করে গাল দিয়ো বাছা, দেখো যেন কেউ দৃষ্টি না দেয়—"

বাহির বাটিতে ঝমাঝ্ঝম ঢাক ঢোল—কাঁশর ঘণ্টা পড়িল। বর জামাতাবরণের পর সভা হইতে উঠিয়া এই বাদ্যবাদন সমারোহের মধ্য দিয়া শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি চীৎকার-ধ্বনি পরিপূর্ণ অন্তঃপুরে আনীত হইয়া নির্দ্দিষ্ট কলাতলায় দণ্ডায়মান হইলেন। সপ্ত-সধবা নানা অনুষ্ঠানে বর প্রদক্ষিণ শেষ করিয়া থামিলে যুবতী জন মনোলোভা-সাজ সজ্জাপরায়ণা অর্দ্ধ বয়সী শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী আবাহু-অলঙ্কৃত হস্ত চালনা দ্বারা বিধিমত প্রকারে বরণ কার্য্য সমাধা করিলেন।

গূঢ়তত্ত্বদর্শীরা বলিয়া থাকেন—বরণের গূঢ় অর্থ বশীকরণ। ইয়োরপে দৈহিক ম্যাগ্নীটিজম্ শক্তির আবিষ্কার এক শতাব্দী মাত্র—বরণপ্রথায় এ জ্ঞানে বহু পুরাতন ভারতের প্রাধান্যের পরিচয়।

তত্ত্বদর্শীগণের কথা অমান্য করি না,—তবে কলিযুগের বরণে সত্যযুগের ফল দেখিতে না পাইয়া শাশুড়ি ঠাকুরাণীদের দল বড়ই ভগ্ন হৃদয়। জামাইকে বাশ মানাইবার জন্য একমাত্র বরণের উপর তাঁহাদের নির্ভর করিলে আর চলে না! তাঁহাদিগকে এ জন্য অগত্যা অন্যান্য নানা প্রকার তুকের এখন আশ্রয় লইতে হইয়াছে। বর্ত্তমান স্থলে কলিযুগ আবিষ্কৃত সে সকল কোনরূপ তুকই বাকী রহিল না। শাশুড়ি ঠাকরুণ কৌটা বন্ধ করিয়া তাহার মধ্যে জামাতার চিত্ত চিরকালের জন্য বন্ধ করিলেন, কলার 'বাসনায়' পিন গুঁজিয়া,—কুলুপে চাবি দিয়া জামাতার জিহ্বার অস্তিত্ব দূর করিলেন এবং নাকের নিকট পাকাটি ভাঙ্গিয়া তাহার নাসিকা পর্য্যন্ত উড়াইয়া তবে ছাড়িলেন।

(এইখানে জনান্তিকে শ্বশ্রূঠাকুরাণীদিগের প্রতি নিবেদন—তৃতীয় প্রথাটির অর্থ আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম—কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় প্রথাটির—বিশেষতঃ দ্বিতীয়টির

উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণ সহানুভূতি। একাধারে দুই জিহ্বা আমাদের মতেও নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন, সুতরাং সর্ব্বস্থলে উত্তমার্দ্ধের প্রবল জিহ্বা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া অধমার্দ্ধের উপর জয় লাভ করুক—এই ক্ষেত্রে আমাদের এই আশীর্ব্বাদ)।

এইরূপে জামাতাকে চিত্তহীন, জিহ্বাহীন, নাসিকাহীন করিয়া শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী হৃষ্টচিত্তে তাহার দুই হাতের মধ্যে মাকু রাখিয়া সুতা দিয়া হাত বাঁধিয়া বলিলেন—

"কড়ি দিয়ে কিনলুম, দড়ি দিয়ে বাঁধলুম,
হাতে দিলুম মাকু—একবার ভ্যা কর ত বাপু'

মেয়ের দলকে দল জামাইয়ের ভেড়ার ডাক শুনিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল। বেচারা বর না ডাকিয়াও নীরবে ভেড়া বনিয়া গেলেন—এই সময় রব উঠিল—"পথ দাও পথ দাও—"। এইবার শুভদৃষ্টির আয়োজন।

এতক্ষণ অন্য গৃহে নির্জ্জনে পিঁড়ির উপর কন্যা একাকী বসিয়াছিলেন,—সেই কাষ্ঠাসন সহ কন্যা বহন করিয়া চারিজন পুরুষ "পথ দাও—পথ দাও" করিতে করিতে দালানে আসিয়া পড়িলেন। অমনি বরের সম্মুখে বস্ত্র যবনিকা ধৃত হইল,—কন্যার কাষ্ঠাসন তাহার অন্তরালে আনীত হইয়া আনুসঙ্গিক গৌণ অনুষ্ঠানাদি (বর বড় না কনে বড় ইত্যাদি) শেষ করিয়া কন্যাবাহকগণ কন্যাকে লইয়া সপ্তবার বর প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বরের সম্মুখে কাষ্ঠাসন ধৃত করিলেন। যবনিকা অন্তর্হিত হইল পরামাণিক মহাশয় ভুষমণদিগকে গালি পাড়িয়া থামিলেন—কন্যার মাতা বলিলেন "চাও বাবা—ভাল করে চাও, মা ভাল ক'রে দেখ, শুভ দৃষ্টি হোক।"

বর তৃষিত-দৃষ্টিতে কন্যার দিকে চাহিল—সেই বহু প্রত্যাশিত মধুর সুন্দর নয়নালোকে নয়ন পরিতৃপ্ত করিতে জীবন আকুল হইয়া চাহিল, কিন্তু মুহূর্ত্তে দিকবিদিক ব্যাপী অন্ধকারে তাহার নয়ন ভরিয়া গেল, ঘূর্ণমান মস্তিষ্ক, স্তম্ভিত দেহপ্রাণ ভীষণ অন্ধকারময় মহা শূন্যের মধ্যে সহসা যেন বিলয় প্রাপ্ত হইল।

... ...

তথাপি বিবাহ বন্ধ রহিল না, শুভ দৃষ্টির পর বর কন্যা সম্প্রদান স্থলে আনীত হইয়া মন্ত্র পাঠ করিলেন। জীবনের জীবন-শূন্য দেহ কলের পুত্তলির মত অন্যের উচ্চারিত শব্দের অনুসরণ করিয়া গেল।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের পক্ষে বাসর ঘরের বরপীড়ন-উৎসব কিরূপ উল্লাসময় তাহা প্রসিদ্ধ কথা। সে দিন মেয়েরা বরকে মেয়ের সামিলই জ্ঞান করিয়া থাকেন, এদিনে সম্পর্ক বিচার পর্য্যন্ত থাকে না—শাশুড়ি সম্পর্কীয়া নবীনা ভামিনীগণও এদিনে তামাসার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কেহবা সম্পর্কটাকে ক্ষণস্থায়ী বন্দোবস্তে সুবিধামত পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলেন, কেহবা ততটা আবশ্যক বিবেচনা না করিয়া নিঃশব্দে পশ্চাৎ হইতে কান মলিয়া যান—আর সমুখে আসিয়া আধ-ঘোমটার মধ্য হইতে

বাছা বাছা রসিকতার কথা কহিতেও ছাড়েন না। কিন্তু আজ যে নৈরাশ্যময় অবসন্ন-ভাব লইয়া জীবন বিবাহের পর বাসর গৃহে আসিয়া বসিয়াছে—কৌতুকপরায়ণা রমণীগণ তাঁহাদের সরস রসনা নির্গত খর বচনে এবং কোমল করকমল-তাড়নেও তাহা দূর করিতে পারিতেছিলেন না—তাই বাসর ঘরের আমোদ যেন আজ ততটা জমাট বাঁধে নাই। বরের এই অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে যুবতীগণ বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন—চারিদিক হইতে নানারূপ নৈরাশ্য সূচক কথা উঠিতেছিল—

"ওমা একি গোমসা বর গা! কথা কয় না কেন?"

"ওল্ দেলো ঠাকুর ঝি—বোল ফুটবে"

"ভ্যাল্লা বর পেয়েছিস টগর, তোর জন্য সব কথা রেখে দিচ্ছে" ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সাধারণ হা হুতাশের মধ্যেও বাসর ঘরের নিত্য নৈমিত্তিক পীড়ন অনুষ্ঠান কিছু মাত্র কম পড়ে নাই, বরের উপর চারিদিক হইতে সমানই (যদি বা অধিক না হয়) হস্তবাণ ও বাক্যবাণের প্রয়োগ চলিয়াছিল।

সকলেই বরকে ঠাট্টা করিতেছে—স্নেহলতা জীবনকে ঠকাইবার অভিপ্রায়ে মাটির ঢেলা পুরিয়া এক পান সাজিয়া আনিল, ইচ্ছা পানটি হাতে দিয়া তাহাকে খাইতে বলে—কিন্তু লজ্জায় ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া একজন বলিল—"যাও না তার আর লজ্জা কি? সম্পর্কে ভগিনীপত—আবার দেওর,—ঠাট্টারই ত জিনিস।" স্নেহলতা একটু হাসিয়া বরের নিকটে আসিয়া পানটি বাড়াইয়া বলিল—"বর পান খাও"।

জীবন তাহার দিকে চাহিল—এই প্রথম এখানে সে স্নেহলতাকে দেখিল—সেই কোমল মধুর নিরূপম সৌন্দর্য্যময়ী দেবী প্রতিমা! জীবনের অন্ধকার নিরানন্দ প্রাণ সহসা জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল।

Whence that completed form of all completeness?
Whence came that high perfection of all sweetness?

তাহার নীরব অনির্ব্বচনীয় বিস্ময় আনন্দে এই ভাব ওতপ্রোত হইয়া উঠিল।

স্নেহলতা আবার বলিল—"বর পান খাও"

জীবন পান লইয়া মুখ আনত করিল।

নত মুখে ভাবিতে ভাবিতে পানটি মুখে দিয়া কখন খাইয়া ফেলিল, তাহাতে ঢিল ছিল কি পাটকেল ছিল জানিতেও পারিল না। তাহার এই বেআকুবি দেখিয়া চারিদিকে হাসি ঠাট্টা চলিতে লাগিল। স্নেহলতাও হাসিতে লাগিল। টগর ঘোমটার মধ্য হইতেও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

জীবন লজ্জিত হইয়া আর একবার স্নেহের মুখের দিকে চাহিল—স্নেহ হাসিয়া চলিয়া গেল। ইত্যবসরে আর এক জন সুরসিকা তাহাকে আর একটি পরামর্শ দিয়াছিলেন—সে তাহাই পালন করিবার অভিপ্রায়ে আস্তে আস্তে বরের পশ্চাতে আসিয়া অতি

সন্তর্পণে তাহার কাপড়ের খুঁট টানিয়া লইয়া একটা পিন দিয়া বিছানার সঙ্গে আট- কাইয়া দিল, তাহার পর কতকগুলি ফুল ও খানিকটা গোলাপ জল তাহার মাথার উপর ছড়াইয়া পলাইয়া গেল। এইরূপ উপদ্রবে রাত দুপর হইয়া পড়িল।

গৃহিণী গৃহে আসিয়া বলিলেন—"রাত হয়ে গেল—মেয়ে জামাই শুইয়ে দে না। আর কেন?" ইহার পর বেশীক্ষণ বরকে বসাইয়া রাখিতে আর কেহ সাহস করিলেন না। উঠিতে সম্মতি পাইয়া বর উঠিয়া দাঁড়াইলেন—পিনে অাঁটা চাদরটা পট করিয়া জোরে উঠিয়া আসিল। আর একবার ইহাতে সকলে মহা হাসি হাসিয়া লইয়া রীতিমত অনুষ্ঠানে বর কন্যাকে শয্যাশায়িত করিয়া চলিয়া গেলেন। অবশ্য রাত্রের আড়ি পাতার পালাটাও ইহার পর বাদ যায় নাই।

নিস্তব্ধ রাত্রিতে, শুভ বাসর শয্যায়, নব পরিণীতা বালিকার পার্শ্বে শয়ন করিয়া জীবন দারুণ যন্ত্রণা ভারে প্রপীড়িত হইতে লাগিল। জীবন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে লাগিল স্নেহলতাকে সে কিরূপ ভালবাসে, তাহার হৃদয় প্রাণ আত্মা তাহারই, অথচ সমাজে সে অন্যের। কাহাকে আত্ম সমর্পণ করিতে আসিয়া কাহার ভার সে গ্রহণ করিল! এ কি অদৃষ্টের বিড়ম্বনা!

দার্শনিকেরা বলেন—অন্যের দুর্দ্দশা দেখিলে লোকে আনন্দলাভ না করিয়া থাকিতে পারে না। কথাটা সর্ব্বকালে সত্য বলিয়া মানি না, তবে জানি না—হয়ত জীবনের দুরবস্থায় কোন কোন পাঠক হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"হঠাৎ এতটা কেন? স্নেহ- লতাকে জীবন দু চার দিন দূরে দূরে দেখিয়াছে বই নয়—ইহাতেই এতটা বাড়াবাড়ি - এতটা মারাত্মক ব্যাপার,- শুষ্ক ডাঙ্গায় সহসা এতটা হাবুডুবু—এ কেন?

এ কথার উত্তর দেওয়া বড় সহজ নয়—আমরাও ভাবিতেছি "কেন"?

যদি বল ইহা রূপের আকর্ষণ তাহা হইলেও ঠিক বলা হয় না। স্নেহলতার মাধুর্য্যে —জীবনের অতৃপ্ত সৌন্দর্য্য-আকাঙ্খা পরিপূর্ণ হইয়াছে বটে, তাহার মূর্ত্তি তাহার কল্পনা নয়নে সৌন্দর্য্যের রুদ্ধ অনন্ত রাজ্য খুলিয়া দিয়াছে বটে কিন্তু তাই বলিয়া, স্নেহলতাকে ত সুন্দরী বলা যায় না। অন্ততঃ খ্যাত-প্রতিপত্তি সৌন্দর্য্যসমালোচিকাগণ—এবং সৌন্দর্য্যবিচারক রূপ-সর্ব্বস্ব ভাবুকগণ জীবনের এই অমার্জ্জিত হীন রুচির পরিচয়ে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিবেন—"স্নেহলতা এমনি কি সুন্দরী!" আমরাও বলি—স্নেহলতা এমনি কি সুন্দরী! তাহার সৌন্দর্য্যের মধ্যে কোমল লালিত্যটুক আর করুণ শ্রীখানি, কিন্তু পত্র ঢাকা ফুল যেমন সহসা নয়ন আকৃষ্ট করে না, সেইরূপ তাহার এই ম্লান সৌন্দর্য্য বরঞ্চ লোকের বাহবা-দৃষ্টি হইতে তাহাকে ঢাকিয়া রাখে, তাহার সৌন্দর্য্য- মাধুরী অনুভব করাও একটু সময় সাপেক্ষ। তবে তাহাকে সুন্দরী বলি কি করিয়া?

তবে ইহাও বলি—ওপাড়ার কালী বাবুর ছোটমেয়ে ত সর্ব্ববাদীসম্মত রূপসী

কিন্তু তাহাকেও ত জীবন দেখিয়াছে, তাহার রূপের তারিফও করিয়াছে বটে—কিন্তু কই তাহার রূপে ত জীবন দিব্য দৃষ্টি পায় নাই?

যদি বল রূপে নহে—স্নেহলতার গুণে জীবন আত্মহারা; তাহার উত্তর এই, স্নেহলতার মূর্ত্তিতে জীবন তাহার কল্পনার আদর্শ গুণ সমূহ অনুভব করিয়াছে সত্য,—সম্ভবত স্নেহলতা সে গুণের সত্যই অধিকারী। কিন্তু তাহার পরিচয় কি জীবন জীবনে কিছু পাইয়াছে? তাই আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়—এ ভালবাসা কেন?" চৌম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে—ইহা একটি সত্য—কিন্তু কে বলিবে ইহা কেন? মানুষ নিজের মধ্যে একটি অসম্পূর্ণ ভাব—একটি অভাব অনুভব করে—এই অভাব পূর্ণ করিতে মানুষ আর একটি আত্মার সহিত একত্ব লাভ করিতে চাহে। কিন্তু সকল আত্মার সহিত সকলের সম্মিলন হয় না, মনের মানুষ পাওয়া চাই, সুতরাং মানুষ যেখানে কল্পনার চক্ষে নিজের অসম্পূর্ণ আত্মার বাকী আধখানা দেখিতে পায়—সেইখানেই আকৃষ্ট, মুগ্ধ, এবং তাহাকে নিজের করিতে লালায়িত হয়। যে নিয়মে পৃথিবী ঘোরে—পাতা পড়ে—মেঘ ডাকে, জীব জন্মে,—সেই নিয়মে ইহাও একটি সত্য—তবে কে বলিবে ইহা কেন সত্য? ইহার একমাত্র উত্তর এই, কারণের কারণ যেমন একমাত্র অনাদি কারণ—পার্থিব প্রেমের কারণও একমাত্র সেই মহান প্রেম—ইহা ছাড়া এ কথার আর উত্তর নাই?

মানুষ সংসারে অহরহ নিজের অসম্পূর্ণ আত্মার পূর্ণার্দ্ধ খুঁজিয়া সারা হইতেছে, যে ভাগ্যবান তাহার অদৃষ্টে খাঁটিজিনিষ মিলিয়া যায়—কিন্তু সাধারণতঃ এখানে এ সম্বন্ধে হীরক ভ্রমে কাচ ধরিতেই আখ্‌সার দেখা যায়।

এই আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিতে মানব পৃথিবীতে স্বর্গের সুখ—স্বর্গের অমরত্ব অনুভব করে, ক্ষুদ্র জীবনে মহান উদ্দেশ্য সাধনে বল পায়,—এবং ইহার অপূর্ণতায় জীবন শূন্য, অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন নিরানন্দ হইয়া পড়ে। জীবন স্নেহলতাকে আপনার করিতে না পাইয়া এই দারুণ শূন্যতা অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু যথার্থ যে ভালবাসিতে পারে—প্রেমের স্বর্গীয় ভাবে যাহার বিশ্বাস, নৈরাশ্যের মধ্যেও সে বল পায়—শারীরিক প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া আকাঙ্ক্ষার আকুলতাকে অতিক্রম করিয়া সে আত্মার সম্মিলন অনুভব করিতে পারে—সুতরাং তাহার প্রেম ক্রমে দৈহিক আকর্ষণ ও সামাজিক বন্ধন সূত্রের গ্রন্থি ব্যতীতও স্বতঃ স্থির থাকিতে সক্ষম হয়।

নৈরাশ্য দগ্ধ হইয়া জীবনের ভালবাসা আরো বিমল, উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—সে ভাবিতে লাগিল—"তাহার সহিত আমার বিবাহ হইল না—এই জন্য কি সে আমার কেহ নহে! স্বর্গের তারা—কত দূরে,—আমাদের নিকট হইতে কত দূরে,—তবুও সে আমাদের আলোক প্রদান করে, আনন্দ প্রদান করে। হৃদয়ে যাহার রাজ্য,

সংসারে তাহাকে পাইলাম না বলিয়া সে আমার কেহ নহে? সমাজের প্রেমে মলিনতা আছে স্পৃহা আছে—দুঃখ তাপ আছে—কিন্তু এই নীরব আত্মদান, পবিত্র-ভক্তি পূজা নিষ্কলঙ্ক; তবে কেন এ নৈরাশ্য, কেন এ যন্ত্রণা! প্রেমে সে আমার না হউক ভক্তিতে সে আমার, শরীর সম্বন্ধে সে আমার আপনার না হউক—কিন্তু আত্মার সম্পর্কে সে আমার আপনার। তবে আমার দুঃখের কারণ কোথা!

মানুষ শরীর মন আত্মার সমষ্টি। সুতরাং মূলে মানুষের প্রেম আত্মার মিলন অনুরাগ হইতে জন্মাইলেও ক্রমে মানুষ তাহার ভালবাসার বস্তুকে শরীর মন আত্মা সমস্ত দিয়া আপনার করিতে চায়। জীবনও তাহাই চাহিয়াছিল। কিন্তু যখন জীবন দেখিল সে আকাঙ্ক্ষা তাহার পূর্ণ হইবার নহে—তখন তাহার আকাঙ্ক্ষার গতিও অন্য পথ অবলম্বন করিতে চাহিল। কষ্ট নিবৃত্তির ইচ্ছা মানুষে সহজে বলবতী। মানুষ যখন দেখে তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার উপায় নাই, তখন মানুষের প্রত্যাশা আপনা হইতে কমিয়া আসে—ক্রমে সেই অনুযায়ী মনের বৃত্তিও গঠিত হয়। নদী যেমন স্থান অনুসারে প্রবল গমনে চলিয়াও বাধা প্রাপ্ত হইলে আপনার গতিকে পথ দেখাইতে বাধ্য হয় মানুষের প্রেম-বৃত্তি ও সেইরূপ—স্থান ও অবস্থা অনুসারে স্নেহ, ভক্তি, বন্ধুত্বের আকার ধারণ করে। যে মানুষে যত মনুষ্যত্ব যাহার প্রেম যত গভীর—নিরাশপ্রেম স্বার্থের পথ হইতে তাহাকে তত সরাইয়া পবিত্র রাজ্য দেখাইয়া দেয়—তত সে আপনার আকাঙ্ক্ষা নিজের আয়ত্তে আনিতে পারে। নৈরাশ্য-প্রদর্শিত এই পথ মানুষ আজীবন অবলম্বন করিয়া চলিতে পারে কি না, জানি না—কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও ইহা তাহার নিকট সত্য রাজ্য পুণ্য রাজ্য খুলিয়া দেয়। মানুষের যদি মঙ্গলে বিশ্বাস থাকে—তাহা হইলে সহস্র বার পদস্খলন করিয়াও শেষে এই পথ অনুসরণ করিতে সে চেষ্টা করে—বল পায়। কেন না সেই সহস্র কষ্টের মধ্যেও ঈশ্বরের করুণা সে দেখিতে পায়। যাহাদের সে বিশ্বাস নাই তাহারাই যথার্থ অশান্তি ভোগ করে। বিশ্বসংসারকে ক্ষুদ্র এক তাহার বিপক্ষে খড়্গ-হস্ত হইতে দেখে—সংসারের উপর অমঙ্গলের আধিপত্য ছাড়া আর সে কিছুই দেখিতে পায় না। নৈরাশ্য জীবনকে স্বার্থের সংগ্রামে আকাঙ্ক্ষার বিসর্জ্জনে প্রবৃত্ত করিল।

রাত্র প্রভাত হইল, যুবতীগণ শয্যা তুলিবার ছলে দ্বারে আসিয়া বলিলেন "শ্যামচাঁদ রাত পুইয়েছে—কুঞ্জের দ্বার খোল—"

জীবন অমনি তাড়াতাড়ি খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। যুবতীগণ ঘরে আসিয়া মশারী তুলিয়া কেহ খাটে কেহ বা নীচের বিছানায় বসিলেন। জীবন জিজ্ঞাসা করিল—"আমি বাইরে যাব"? যুবতী একজন হাসিয়া বলিলেন "রাধিকাকে ছেড়ে যেতে কি পারবে কালাচাঁদ?"

স্নেহলতা টগরের কাছে বিছানায় বসিয়াছিল—সে বলিল—"জামাই বাবু বুঝি কালো—ছোট দিদি ?"

ছোট দিদি একটা বেশ রসিকতার উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন—এমন সময় ভবি দাসী একটা চিঠি আনিয়া বলিল—"কাল বিকালে দাদা বাবুর নামে এই চিঠি এসেছিল—মা গোলেমালে তাঁকে দিতে ভুলে গেছলেন—তাই সকালেই পাঠালেন—আর কখন বর কণে যাবে—খবর নিয়ে যেতে বল্লেন। সকালে গেলেই হয় ভাল"।

স্নেহ বলিল—"বর কনে সেই সন্ধ্যা বেলাই যাবে—জ্যেঠাইমাকে বল্‌বে এ বেলা আমরা ছেড়ে দেব না—"।

দাসী বলিল "তা দেবে কেন ? ঠাকুরপো ভগ্নিপোত হোল দরদখানা আরো বাড়লো। আহা মোহন দাদা বাবু এ বিয়েতেও এলেন না!"

মোহনের নাম শুনিয়া স্নেহলতা মুখ আনত করিল, জীবন চিঠিটা খুলিতে খুলিতে বলিল "ইনি মোহনদার স্ত্রী" ?

ভবি বলিল "ও পোড়াকপাল! দাদা বাবু এত দিন কি তা জানতে না ?

জীবন ঈষৎ হাসিল। এ হাসি অর্থহীন হাসি নহে, হৃদয়ের গভীরতম আনন্দ প্রবাহ। স্নেহলতা মোহনের স্ত্রী! তবে সমাজসম্বন্ধেও জীবনের সে আপনার! তাহাকে ভক্তি করিতেও সে অধিকারী ? জীবন প্রাণের অন্তরপ্রাণ হইতে একটা সুখ বোধ করিল। এইখানে তাঁহার 'ফিলজফি' হার মানিল! এই সম্বন্ধের অধিকারে তাহার এতখানি আহ্লাদের কারণ কি!!!

জীবন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া চিঠি খুলিতেছিল—খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, সহসা মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল—সমস্ত দেহ কাঁপিতে লাগিল, অশ্রুরুদ্ধ নয়নের দৃষ্টি স্নেহলতার উপর পতিত হইল—মুহূর্ত্তে নিজের নৈরাশ্যদুঃখ জীবন সমস্ত ভুলিয়া গেল—অনাথিনী পতিহীনা বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া—দুঃখ সমুদ্রে শিশির কণার মত তাহার দুঃখ লয় প্রাপ্ত হইল। বিদীর্ণ হৃদয়ের গভীর যন্ত্রণায় কাতর হইয়া সে ভাবিতে লাগিল—"তুমি বিধবা, তুমি চির দুঃখিনী ?" তাহার সেই দুঃখ মোচনের জন্য প্রাণ মন আত্মা জীবন সুখে বিসর্জ্জন দিতে পারিত কিন্তু বুঝিল তাহাতে এ দুঃখ নিবারণের নহে।

বলা বাহুল্য পত্রখানিতে জীবন মোহনের মৃত্যু সংবাদ পাইয়াছিল।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

পালিতা।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দিন চলিয়া যায়, বৎসর চলিয়া যায়, ঘটনাস্রোত চৌদিক পরিবর্ত্তিত করে, কিন্তু এরূপ ধীরে ধীরে এরূপ অজ্ঞাতসারে, এরূপ স্বপ্নের মত অগোচর ভাবে, যে সে পরিবর্ত্তন কাহারো প্রাণে যেন পৌঁছে না। ফিরিয়া চাহিতে গেলে অতীতের বিপর্য্যস্ত বিপ্লব দৃশ্যে, কালের প্রকাণ্ড ব্যবধানে সহসা চমকিয়া উঠিতে হয়—কিন্তু সম্মুখে চাহিয়া চির পরিবর্ত্তনশীল দীর্ঘব্যাপী-কাল রথে দ্রুত ধাবিত হইয়াও আমরা আপনাদিগকে অচল স্থির অপরিবর্ত্তিত মনে করি। অথচ ক্ষুদ্র এক ঘটনায়, সামান্য এক মুহূর্ত্তে আমাদের জীবনের এই সুদীর্ঘ কালনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, আমরা তখন ব্যথিত চমকিত হইয়া জাগিয়া দেখি—কোথায় সেদিন? কোথায় সে সব, কোথায় সে আমি?

জগৎবাবুর কন্যার বিবাহ-দৃশ্য এখনো পাঠকের চোখের উপর। তাঁহাদের কি মনে হইতেছে না—সেই সুখ দুঃখ ঘটনা-বিজড়িত বাসর-উৎসবে এই মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তাঁহারা উপস্থিত ছিলেন? কিন্তু তাঁহাদের এই মুহূর্ত্তের মোহ না ভাঙ্গিতে কাল নিজ রাজ্যে আরো ১০টি বৎসর ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। চিরায়ু চিরযৌবন বিশ্বজগতের ইহাতে আনন্দ ধরে না। ১০ বৎসর বয়োবৃদ্ধি লাভ করিয়া, নূতন বয়সে, নূতন জ্ঞানে, নূতন অভিজ্ঞতায় তাহার উথলিত-হৃদয়ের আনন্দ অনন্ত ধারায় উচ্ছসিত। কিন্তু দশবর্ষ হ্রস্ব পরমায়ু-দুর্ভাগ্য সৌরজগৎ এই অনন্ত বিতরিত আনন্দ সুধাও পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করিতে অক্ষম। এই আনন্দের দিনেও পৃথিবী তাই পূর্ব্বের ন্যায় সমানই সুখ দুঃখ, হাসি অশ্রু লইয়া নিজ পথে ধাবমান। সমগ্র জীবলোকে ইহারি ছায়া প্রতিবিম্বিত। ১০ বৎসর পূর্ব্বে জীবলোকে যে আশা নিরাশা—যে হর্ষ দুঃখ যে জীবন মৃত্যুর প্রবাহ চলিয়াছিল আজও সেইরূপ চলিয়াছে। এই চির অপরিবর্ত্তনীয়-চিরপরিবর্ত্তন প্রবাহে ভারতবর্ষের বক্ষে ১০ বৎসর পূর্ব্বে যে একতার ক্ষীণভাব ছায়ার মত প্রকাশ পাইয়াছিল, ইলবার্ট বিলে রিপনের জয়নাদে, কনগ্রেসের প্রথম সূত্রপাতে, জাতীয় জীবনের সূচনায় সেইভাব এখন প্রাণবিশিষ্টরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। এই দশ বৎসরে ভারতের জাতীয় জীবনে কাল উক্ত রূপে আপনার পদাঙ্ক ফেলিয়াছে—আর প্রত্যেক মানুষের জীবনে? কালের পক্ষে সহস্র বৎসরও কিছুই নহে, জাতির পক্ষে শতবৎসরও সামান্য কিন্তু মানুষের ক্ষুদ্র পরিমিত জীবনে ১০ বৎসরও সুদীর্ঘকাল। কত স্মৃতি বিস্মৃতি, কত দুঃখ সুখ, কত জ্ঞান মোহ ইহার মধ্যে এ সংসারের প্রত্যেকের জীবন

নূতন করিয়া গঠিত করে। সুতরাং জগৎ বাবুর সংসারো এ সম্বন্ধে বর্জ্জিত-বিধির মধ্যে গণ্য নহে। অথচ এই নিত্য নূতন পুরাতনে লীন হইয়া তাহাদের কয়জনের জীবনের রূপান্তর তাহাদের নিজের নিকট প্রতিভাত!

চারুর বয়স এখন ২৫।২৬। তিনচার বৎসর পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু তাহার বালিকা স্ত্রী বৎসর খানেক মাত্র শ্বশুর গৃহে বাস করিতে আসিয়া চারুর যৌবনউত্তপ্ত-হৃদয়ে উচ্ছসিত প্রেমাকাঙ্ক্ষা জ্বালাইয়া তুলিয়া সেই অতৃপ্ত উদ্দাম প্রেম, বিচ্ছেদে অবসিত করিয়া দিয়া কে জানে কোন অজানা রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে।

এতদিন চারু অতীতের পানে চাহিয়া দেখে নাই, সে জানিত অতীত বর্ত্তমানে নূতন পুরাতনে তাহার জীবন সূত্র একই আছে। সহসা দারুণ মর্ম্মবেদনায় তাহার এ ভুল ভাঙ্গিয়া গেল, তাহার ছিন্নতন্ত্রী হৃদয়ে শোকের গান হাহাকার করিয়া উঠিল—জগৎবাবুর সংসারের মধ্যে সে একাকী কেবল এই ১০ বৎসরের একটী মুহূর্ত্তে সহসা অনুভব করিল—আমি—সে আমি আর নাই।

গভীর দুঃখে সান্ত্বনা কোথায়? কালে। বিস্মৃতির অমোঘ ঔষধি জলে অতি সন্তর্পণে প্রক্ষালিত করিয়া কাল দগ্ধ হৃদয়ের ক্ষত যন্ত্রণা নিবারণ করে।

বিস্মৃতি আছে- বলিয়াই এই শোকদুঃখ-পাপতপ্ত সংসারে শান্তি আছে তবে কেন এ সংসারে বিস্মৃতির এত অনাদর!

বিস্মৃতি না থাকিলে স্মৃতির মাহাত্ম্যই বা কোথায়। বিস্মৃতি আছে বলিয়াই স্মৃতিতে প্রকৃত সুখ আছে, স্মৃতির প্রকৃত স্থান আছে, নহিলে পুরাতন স্মৃতির হাহাকারেই বিশ্ব আর্ত্তনাদ করিয়া মরিত; তীব্র অভাবের, গভীর আকাঙ্ক্ষার যন্ত্রণার মধ্যেই স্মৃতি উন্মত্ত আকুল হইয়া বেড়াইত।

প্রকৃত পক্ষে বিস্মৃতি স্মৃতি লোপ করে না, স্মৃতির তীব্র জ্বালা মাত্র প্রশমিত করে। বিস্মৃতি-সিঞ্চিত এই প্রশমিত স্মৃতিই যথার্থ উপভোগ্য। তখনই স্মৃতি শান্তিময়, সুখময় মধুময়। কেন না তখনই ঈশ্বরের মঙ্গলভাব আমাদের হৃদয়ে পৌঁছে, তখনি বুদ্ধের নির্ব্বাণমুক্তি-ভাবের আমরা আভাষ পাই।

দুঃখের আর এক সান্ত্বনা মনুষ্য হৃদয়ের সমব্যথা লাভে। এই সহানুভূতিতে আত্মার সহিত আত্মা সংস্পর্শ লাভ করিয়া পরমাত্মারি করুণা অনুভব করে—তাই এই সমবেদনায় মনুষ্যের দুঃখতাপ প্রশমিত হয়।

কিন্তু যে সমবেদনা আমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব না করি, তাহা পূর্ণ-উথলিত হৃদয়ের সহানুভূতি হইলেও শান্তির পরিবর্ত্তে তাহা আমাদিগের অশান্তির কারণ হইয়া উঠে। ইহা সহানুভূতির দোষ নহে—মনুষ্যের অজ্ঞানতা, অসম্পূর্ণতার দোষ। যীশুখৃষ্টের বিশ্বব্যাপী করুণা-ধারাও য়ীহুদিদিগের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই—তাই সেই অসীম মমতাও তাহাদের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

চারুর ব্যথার ব্যথীর অভাব নাই। তাহার কষ্টে তাহার বাড়ীর লোকে সকলেই আন্তরিক দুঃখিত। তাহার সম্মুখে এই দুঃখ প্রকাশেরও সে ত্রুটি দেখিতে পায় না; চারু অন্তঃপুরে আসিলেই—তাহার মা বোন এবং স্বসম্পর্কীয়া আত্মীয়াগণ যাঁহারা যখন উপস্থিত থাকেন তাঁহারা সকলেই তাহাকে অজস্র সান্তনার কথা কহেন। কিন্তু "আহা আহা" শব্দের আধিক্যপূর্ণ এই সান্তনার শেষ অব্যর্থ মর্ম্ম—কোথায় কোন মেয়েটি ভাল দেখিতে, তাহার সহিত চারুর বিবাহ প্রস্তাব। সুতরাং এই সান্ত্বনা সান্ত্বনাকারীগণের মর্ম্মোত্থিত হইলেও তাহা চারুর হৃদয় স্পর্শ করে না। ইহাতে কেবল সে তাহাদের হৃদয়হীনতার পরিচয় পায়, ইহা তাহার স্মৃতির অপমান বলিয়া মনে হয়, তাই সে নিজের দহন-যন্ত্রণা নিজের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া এই নিষ্ঠুর সান্তনা হইতে দূরে থাকিতে চায়।

স্ত্রী এখানে আসিয়া অবধি চারু কিশোরীর নিকট বড় যাইত না। কিন্তু আজ কাল কিশোরীই তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল—মদ্যপানই তাহার দুঃখের নিবারণ।

ছেলেবেলা পাঠক চারুকে কবিতা লিখিতে দেখিয়াছেন—কিন্তু অনেকদিন হইতে চারুর সে ঝোঁক গিয়াছে,—সে দিন থাকিলে কবিতা লিখিয়া সে হয়ত এখন অনেকটা শান্তি লাভ করিতে পারিত।

বেলা নয়টা, চারু সবে মাত্র বিছানা হইতে উঠিয়া, মুখ হাত ধুইয়া তাহার বাহিরের ঘরে টেবিলের কাছে বসিয়াছে। এই ঘরেই সে আজ কাল শোয়। ঘরের উত্তরদিকে একটি গলি। গলিটি তাহার নজরে পড়িতেছে না, মাঝে মাঝে কেবল খাবারওয়ালার হাঁক, আলু পটল বিক্রেতার ডাক, বাজার ফেরত স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ কণ্ঠ-গল্প, সহসা বা একখানা গরুর গাড়ির ক্যাঁচক্যাচানি এবং সঙ্গে সঙ্গে এই মধুর প্রাতঃকালে গাড়োয়ানের বেসুরো আনন্দসঙ্গীত তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। গলির ঠিক পর পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র দোতলা বাড়ী, দোতলায় একখানি মাত্র ঘর, ঘরের সামনের ছোট বারান্দায় দাঁড়ে-টাঙ্গান একটি টিয়া পাখীকে দুইটি ছোট ছেলে মেয়ে কৃষ্ণ নাম পড়িতে শিখাইতেছিল। সম্মুখে খোলা ছাতে শীতের প্রশান্ত রৌদ্র ঝক ঝক করিতেছিল। একবার নীচে গলিতে যখন হাঁক উঠিল—"চাই ভাল নেবু মিঠে নেবু—বিদ্‌নাস্থুর" ছেলেটি অমনি দৌড়িয়া ছাদের সেই মুক্ত রৌদ্রে আসিয়া দাঁড়াইয়া বেদনাওয়ালার অনুকরণ করিয়া বলিল "তাই নেবু তাই। ভায়ো নেবু, দিদি আঙ্গু তাই" বোনটি তখন হাসিতে হাসিতে তাহার কাছে ছুটিয়া আসিয়া চুমো খাইতে খাইতে বলিল "তাই নেবু তাই দে না খোকাবাবু।" খোকাবাবু তাহার কথায় ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বিরক্ত ভাবে তাহার হাত ছাড়াইয়া আবার বলিল—"তাই নেবু তাই—ভালো নেবু।"

মধুর কিরণ বিভাসিত প্রশান্ত প্রাতঃকালে, দুইটি সরল শিশু হৃদয়ের আনন্দ খেলা দেখিয়া চারু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নিজের মনের প্রতি চাহিল, তাহারো

এমনি একদিন ছিল, জগৎ যেদিন তাহারো হৃদয়ে এমনি করিয়া আনন্দ বিতরণ করিত। তাহার শৈশবের সেই সরল পুণ্যভাব আনন্দভাব কোথায় আজ? "কোথায় তুমি, অমরা! তুমি নাই, এই পাপতপ্ত হৃদয়কে আবার নবজীবন দান করিয়া তবে ঊর্দ্ধে তুলিবে কে?"

চারু ভাবিতে ভাবিতে টেবিলে মাথা রাখিল, আবার যখন মুখ তুলিল তখন পূর্ব্বোক্ত বালক বালিকা দুইটির আনন্দ মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে সেই গৃহের দেয়ালে বিলম্বিত একটি শব-কঙ্কালের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। ইতি পূর্ব্বে যে একটি কোমল অনুতাপের ভাবে তাহার মনের সহজ ভাব ফিরিয়া আসিতেছিল অমনি সহসা তাহা বিকৃত হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, এই ত পরিণাম! সংসারে কিছু নাই? সত্য কিছু নাই? মৃত্যুই কি জগতের সমস্ত সত্য? এত ভালবাসা, এত স্মৃতি এত যন্ত্রণা, কিছুই কিছু নহে, সমস্ত মিথ্যা! ভগবান কোথায় তবে? মঙ্গল কোথা তবে? কিছু নাই এখানে? এই কঙ্কালই এখানকার সারবস্তু!

যে নৈরাশ্যে ঈশ্বরে অবিশ্বাস আনয়ন করে মৃত্যু হইতেও তাহা ভয়ানক। মৃত্যুতে মনুষ্যের শরীর পাত হয়, এই নৈরাশ্যে আত্মাকে মৃত্যু মুখে লইয়া যায়।

চারুর চিন্তায় সহসা বাধা পড়িল, টগর আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল, চারুর সেই আরক্ত নেত্র, ব্যথিত দৃষ্টি, শুষ্ক শীর্ণ মুখ দেখিয়া তাহার চোকে জল আসিল, সে বলিল—"দাদা এমনি করে কদিন কাটবে? বিয়ে কর দাদা আবার।"

চারু সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিল—"এখানে কেন এসেছিস, এখনি কেউ এসে পড়বে, যা বাড়ীভিতরে যা।"

টগর বলিল—"মা তোমাকে ডাকছেন একবার ভিতরে চল, তোমাকে ডাকলে ত তুমি যাও না, তাই আমি নিজে এসেছি।"

চারু। আচ্ছা আমি যাব এখন,—তুই ত এখন যা—

টগর। তুমি না গেলে আমি কখনই যাব না, তুমি এস আমার সঙ্গে, নইলে মা আসবেন।

চারু দেখিল বেগতিক, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার সঙ্গে চলিল।

গৃহিণী তখন একতলায় রসুই ঘরের লাগাউ ঘরে বসিয়া কুটনা কুটিতেছিলেন, আর বাজার খারাপ আনিয়াছে বলিয়া রান্নাঘরের দাসীকে নানামতে অভিযোগ করিতেছিলেন।

"সিকি পয়সার থোড় না আনিয়া সে আধ পয়সার থোড় কেন আনিল! নটে শাক যদি নাই মিলিয়াছিল তবে অন্য একটা শাক কি ছাই বুদ্ধি করিয়া আনিতে নাই! শাকের ঘণ্ট না দিয়া 'বাবু' মুখে ভাতের গ্রাস উঠাইবেন কিরূপে? বলি কমলি ত বাপু কাল দুইসের আলু এর চেয়ে কত বেশী আনিয়াছিল—আজ যেন তাঁর আধা! আর এই

সজনার ডাঁটা কগাছা, কত? দুপয়সা? এরূপ করলে ত আর সংসার বয় না।” দাসী এইরূপে অভিযুক্ত হইয়া নিতান্তই উত্তেজিত ভাবে আপন নির্দ্দোষীতা প্রমাণ করিতে কম্‌লিকে সাক্ষী মানিতেছিল। কম্‌লি কিছু দূরে বসিয়া মাছ কুটিতেছিল—কুটিতে কুটিতে মেজের রাশিকরা তরকারীর দিকে চাহিয়া উভয় পক্ষেরি মন-রাখা কথা বলিতে গিয়া কোন পক্ষকেই সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছিল না, সুতরাং কলরব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই সময় চারু আসায় এই হেঙ্গাম অতি সহজেই মিটিয়া গেল। চারুকে দেখিয়া গৃহিণী বঁটি হইতে হাত সরাইয়া বলিলেন—“চারু একবার কি বাড়ীভিতর মুখো হবিনে, তোকে না দেখে থাকি কি করে বল দেখি”—বলিয়া তরকারির হাতেই আঁচল লইয়া অশ্রু মুছিলেন। চারু কোন কথা কহিল না, টগর বলিল ‘দাদা কি আসতে চায় আমি ধরে আনলুম।”

গৃহিণী বলিলেন—“চারুরে, তোর এই বয়সে এমন ক’রে কদিন থাকবি? কালী বাড়ুয্যের স্ত্রী আজও লোক পাটিয়েছিল—অমন সুন্দরী মেয়ে আর হবে না।”

চারু বলিল—“মা একশবার ঐ কথা কেন? আমি ত বলেছি আপাতত বিয়ে করব না।”

গৃ। ও কথা কি বলে বাছা; পুরুষ বেটা ছেলে একটা গেলে অমন দশটা হয়, যে গেছে তার জন্য কি জীবনটা তুই খোয়াবি?”

চারু বলিল—“ও কথা এখন থাক আমায় হাঁস্পাতালে যেতে হবে—এখন স্নান টান করতে যাই।”

গৃহিণীর অনুনয় ক্রন্দনের মধ্যেও চারু সেখান হইতে চলিয়া গেল, দোতলায় উঠিয়া তাহার শয্যা গৃহের দিকে দৃষ্টি পড়িল। কি ভাবিয়া আস্তে আস্তে সেই ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, স্ত্রীর মৃত্যুর পর এই প্রথম তাহার এ গৃহে পদার্পণ। গৃহে যেখানকার যা সমস্ত তেমনিই আছে, গৃহের প্রত্যেক জিনিষে, সেই বালিকার স্মৃতি হাহাকার করিতেছে। নীচের বিছানার তাহার সেই বইখানি এখনো পড়িয়া, যেন পড়িতে পড়িতে সে উঠিয়া গিয়াছে, পান লইয়া এখনি ফিরিয়া আসিবে।

চারুর বুক ফাটিয়া উঠিল, সে যন্ত্রণা-পীড়িত হইয়া জানালার নিকট কৌচে বসিয়া পড়িল, এইখানে তাহারা দুজনে বসিয়া কতদিন বাগানের শোভা দেখিয়াছে। যে দিন শেষ বসিয়াছিল—সেদিন একটি বর্ষার দিন। মুহুর্মুহুঃ মেঘ ডাকিতেছে, বিদ্যুৎ চমকিয়া যাইতেছে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে, কাল মেঘের রঙ্গে দিনের অস্পষ্ট আলো মিশিয়া বাগানের গাছ পালা এক অপূর্ব্ব বর্ণ ধারণ করিয়াছে. বালিকার হাতে হাত বাঁধিয়া চারু মেঘদূত আওড়াইতেছিল—সহসা বজ্র ডাকিয়া উঠিল, বালিকা ভয়বিহ্বল-চিত্তে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল, সেই আলিঙ্গনই তাহাদের শেষ আলিঙ্গন।

বহু দিন বুঝি সে বর্ষা চলিয়া গিয়াছে—এখন শীতকাল। চারিদিকে শুষ্ক পত্র বিক্ষিপ্ত করিয়া, পুষ্করিণীতে অবিশ্রান্ত স্রোত বহাইয়া কাননের প্রাণে প্রাণে কি এক বিষাদ তরঙ্গ তুলিয়া, সেই বালিকার অদর্শনেই যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া, হুহু করিয়া শীতের বাতাস বহিতেছিল।

চারু কৌচে মাথা রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। অনেকক্ষণ পরে সে যখন চক্ষু খুলিল—এ কি তাহার সাশ্রু নয়নে কাহার এ প্রতিবিম্ব! চারু চমকিয়া—চক্ষু মুছিয়া আবার দেখিল,—দেখিল স্নেহলতা তাহার কাছে দাঁড়াইয়া, তাহার নীরব অশ্রুময় করুণ দৃষ্টি তাহার উপর স্থাপিত। এমন করিয়া কাতর নেত্রে ত তাহার মুখের দিকে আর কেহ চাহে নাই! চারুর তাপিত হৃদয়ে সহসা শান্তি বিন্দু পতিত হইল। ছোট বেলায় সে যেমন স্নেহের গলা ধরিয়া বেড়াইত—আজ তেমনি করিয়া গলা ধরিয়া একবার প্রাণ খুলিয়া তাহার কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। চারুর নয়নে অশ্রু উৎস বহিতে লাগিল। অশ্রুর অন্ধকার দূর হইলে আর একবার চারু স্নেহের দিকে ভাল করিয়া চাহিল, তাহার মনে হইল—অনেক দিন অনেক দিন পরে আজ সে যেন স্নেহকে দেখিতেছে,—এই দশ বৎসর স্নেহের ছবি যেন তাহার নয়ন পটে একবারও বিভাসিত হয় নাই; স্নেহের এই বৈধব্য মূর্ত্তি আজ তাহার নূতন বলিয়া মনে হইতে লাগিল, তাহার আজ নূতন করিয়া মনে হইল—স্নেহ বিধবা। একটি অসীম মর্ম্মবেদনায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল, উভয়ের সমবেদনাপূর্ণ দৃষ্টি উভয়ের প্রতি স্থাপিত হইল।

ভৌগোলিক প্রশ্ন।*

ইংরাজীতে এক প্রকার মজার ভৌগোলিক প্রশ্নোত্তর খেলা আছে। স্থান বিশেষের বা নদী বিশেষের নামের অর্থের সহিত তাহার খ্যাতি জুড়িয়া দেওয়া। যেমন, কেহ প্রশ্ন করিলেন, যাহা পায় তাহাই গ্রহণ করে কোন্ দেশ? ইহার সহজ উত্তর জা (যা') পান। আমরা পাঠকবর্গের জন্য কতকগুলি ভৌগোলিক প্রশ্ন দিলাম। পাঠক মহাশয়েরা স্থান নির্দ্দেশ করুন দেখি।

১। দেশীয় কবিরাজের প্রিয় নিকেতন কোথায়?

২। হৃদয় খুলিতে নিষেধ কোন্ অঞ্চলে?

৩। প্রবাস ক্লিষ্ট বিরহী বাঙ্গলার কোন্ ভাগে প্রিয়জনের দর্শন না পাইয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন?

---

* গত বারের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর—স্বার্থপরতা। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

৪। এই ইংরাজ শাসিত ভারতে রূপের হাট কোথায় ?

৫। কলিকালে অনঙ্গের অঙ্গ দেখা যায় কোন্ দেশে ?

৬। কোন্ পুরে ত্রেতা এবং দ্বাপরের অবতার-সম্মিলন ?

৭। অক্ষয় বুদ্ধি কোন্ স্থানে ?

৮। কোন্ পুরেই বা বকের শ্রেষ্ঠত্ব ?

৯। কবন্ধ-রাজধানী বর্ত্তমানে কোথায় ?

১০। কোথায়ই বা নাসিকার আকার লোপ সম্ভাবনা ?

১১। বিকৃত ব্যঙ্গ এখনও টিঁকিয়া আছে কোন্ দেশে ?

১২। প্রাচ্য ভূমির ক্রন্দন-বিলাপ কোথায় গিয়া শেষ হয় ?

সূর্য্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়।

সান্ধ্য আকাশের বিভাসিত তরল নীলিমা-হৃদয় বাহিয়া জগতের শ্রান্ত রবি পরপারের কনক-লাবণ্যে ডুবিয়া গেল। যেথানে সে অতি ধীরে ধীরে গভীর নীরবে প্রথম অদৃশ্য হয়, দিগন্ত-রেখায় সেখানে কেবলই একটী ছায়াময় ঘন রক্তিম অস্পষ্টতা—পুঞ্জমান সন্ধ্যার আধ অন্ধকারের মধ্য হইতে ক্ষীণতর প্রতীয়মান। পরস্পরের সমস্ত নিভৃত সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়া আকাশ এবং ধরণী অজ্ঞাতসারে সেই সন্ধ্যারাগ-রক্ত ছায়ালোক-রহস্যক্ষেত্রে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়াছে; বিহ্বল মিলনের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণ আঁকড়িয়া থাকিতে চায়।

আকাশে ঈষৎ দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত বিবশ মেঘখণ্ডের তরঙ্গায়িত প্রান্তরেখা ঘিরিয়া অস্তগত ঔজ্জ্বল্যের তরল স্পর্শ বহিয়া গিয়াছে—কোমল, পেলব, দীপ্ত। নিম্নে ছায়াময় দিগন্তের পাদমূল ধৌত করিয়া দিয়া তরঙ্গিণীর ক্ষীণ রজত-প্রবাহ কম্পিত চাঞ্চল্যে কলকল চলিয়াছে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তটাহত তরঙ্গ দূর্ব্বাদলের সুকুমার শ্যামল শিহরণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘনাইয়া স্রোতে গড়াইয়া যায়। ঘন নীলিমার মধ্যে মধ্যে বিচিত্র সিন্দূর-তাম্র নীলাভ বর্ণ-সমাবেশ—গায়ে গায়ে ঢলিয়া, মিশিয়া, কিন্তু পূর্ণ অভিব্যক্ত। তরঙ্গিণীর অধীর হৃদয়ে তাহার চঞ্চল ছায়া।

সূর্য্য ধীরে ধীরে ডুবিল। দ্রবীভূত গাঢ় রক্তিমা পরপারের চিত্রার্পিত বৃক্ষাবলীর পশ্চাতে উজ্জ্বল শাখা-পল্লবের মধ্য দিয়া নামিয়া গেল। কেমন ধীরে ধীরে সে দৃষ্টি অতিক্রম করে! প্রথমে অত্যুজ্জ্বল কনকদীপ্তি—চাহিতে চক্ষু ঝলসিয়া যায়; গড়াইয়া গড়াইয়া পশ্চিমের তরঙ্গায়িত তরুশিরে আসিয়া সে অনবরত স্পন্দমান দীপ্তি ক্ষীণ

রক্তিম হইয়া আসে। ক্রমে জ্যোতির তীব্রতা মুছিয়া গিয়া দিগন্তের চরণ বাহিয়া ঘন রক্তিম দ্রব-সৌন্দর্য্য অকূলে বিলীন হয়।

সম্মুখে সূর্য্যাস্ত; পশ্চাতে চন্দ্রোদয়। অপর দিগন্তের দূর আকাশপটে মুদ্রিত ছায়াবৎ তমাল-তাল-শ্রেণীর প্রচ্ছন্ন নিবিড়তার অলক্ষ্য হইতে অবগুণ্ঠনবতী রমণীর ন্যায় চন্দ্রমা অবসন্ন রক্তিম রবির পানে তাকাইয়া। রবি ডুবিয়াছে—আর দেখা যায় না। পশ্চিমাকাশের বিচিত্র বর্ণ ঔজ্জ্বল্যের উপর দিয়া নীরবে সন্ধ্যা ধূসর আচ্ছাদন টানিয়া দিতেছে। পূর্ব্ব সীমায় চন্দ্রমার মাধুরী-মথিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল লাবণ্য রজত-রঞ্জিত শ্যামল পুলকের মধ্য দিয়া অর্দ্ধ পরিস্ফুট। চন্দ্র উঠিতেছে—আরও ধীরে ধীরে আরও নীরবে।

তরঙ্গিণীর হৃদয় চন্দ্রোদয়ে যেন আরও চঞ্চল। মৃদু সান্ধ্য পবনে আন্দোলিত হইয়া দূর বৃক্ষান্তরাল হইতে দু'একটী শুভ্র নগ্ন রশ্মি তাহার প্রবহমান হৃদয় স্পর্শ করিয়া বুঝি কি মধুময় রজত-বারতা দিয়া গেল। এক দিকে লীনপ্রায় অবসান—ঘনীভূত ছায়ারহস্যে আলোক ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়; অপর দিকে ছায়াময় নিবিড়তা ভেদ করিয়া অল্পে অল্পে প্রশান্ত স্নিগ্ধালোকে ফুটিয়া উঠে। এই দুই কনক-রজত সৌন্দর্য্য-সঙ্গমের সুকুমার স্পর্শ লইয়া নদীতরঙ্গভঙ্গে কুলুকুলু বহিয়া যায়।

চন্দ্র যত উঠে, নদী অধীরে বহিয়া যায়। বিমল জ্যোৎস্না-প্লাবিত হৃদয় রজত-তরঙ্গে উথলিয়া উঠিতে থাকে। অস্তাচল-রবি-রক্ত নীলিমার বর্ণ-বৈচিত্র্য আকাশেও যেমন মুছিয়া যায়, নদীগর্ভেও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে একেবারে মিলাইয়া আসে। দিগন্তের ক্ষীণ তটভূমিতে সে সান্ধ্য ছায়া-অস্পষ্টতা আর নাই। ম্লান জ্যোৎস্না-কম্পনে ঈষৎ কম্পিত দিগন্ত-হৃদয় ছায়া ছায়া—শ্যামলতার উপরে একটা শুভ্র অস্পষ্ট আভা আচ্ছন্ন করিয়া।

বাঙ্গালার নদীতীরে এই সূর্য্যাস্ত হইতে চন্দ্রোদয় দৃশ্য যেমন সুন্দর এমন আর কোথায়? চতুর্দ্দিকে সমতল ক্ষেত্র—শস্যশ্যামলার উচ্ছ্বসিত আনন্দ-মূর্ত্তি—দূর দিগন্ত-বেলায় মৃদু চুম্বনে আকাশ ধরণীকে স্পর্শ করিয়াছে। ইহারই একদিকে অস্ত, আর এক দিকে উদয়; একদিকে অবসান, অপর দিকে আরম্ভ; এক দিকে লয়, অন্য দিকে সৃষ্টি। এইখানে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মধুর সামঞ্জস্য। বিভিন্ন বৈচিত্র্যের সমাগমে সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ।

শ্রীবলেন্দ্র নাথঠাকুর।

পত্র।

স্ত্রী-শিক্ষা।

পূর্ব্ব পত্রে স্ত্রী পুরুষের প্রাকৃতিক পার্থক্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম, সে বিষয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের যে মত কি তাহার নিদর্শন-স্বরূপ অধ্যাপক গেডিস ও শ্রীযুক্ত আর্থর টমসন কৃত নূতন একখানি পুস্তক হইতে কিয়দংশের মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি। * "স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতি পরস্পরে সম্পূর্ণ এবং পরস্পরের অধীন। কিন্তু পুরুষ শ্রেষ্ঠ কি স্ত্রী শ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে তর্ক করাও যা আর উদ্ভিদ শ্রেষ্ঠ কি পশু শ্রেষ্ঠ সেই বিষয়ে তর্ক করাও একই কথা। ইহারা প্রত্যেকেই নিজের হিসাবে নিজে শ্রেষ্ঠ, এবং উভয়ে পরস্পর সাপেক্ষ। সাধারণতঃ এ কথা সত্য যে পুরুষেরা অধিকতর কর্ম্মিষ্ঠ,উদ্যমশীল, আগ্রহবান্, প্রবল প্রবৃত্তিশালী, এবং পরিবর্ত্তনশীল; স্ত্রীলোকেরা অধিকতর মৃদুস্বভাব (passive), রক্ষণশীল, নিরুদ্যম ও স্থির-প্রকৃতি। পুরুষগণ কর্ত্তৃক জাতির ব্যক্তিগত বৈষম্য সাধিত হয়; এবং স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক জাতিগত সাম্য রক্ষিত হয়। পুরুষদের কর্ম্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়াতে তাহাদের মস্তিষ্ক বৃহত্তর, বুদ্ধি অধিকতর হইয়াছে; কিন্তু স্ত্রীলোকদের মাতৃ-কার্য্য সাধন করিতে হয় বলিয়া পরার্থপর মনোবৃত্তির অধিকতর অংশ তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান। পুরুষেরা স্বভাবতঃ বলিষ্ঠতর হওয়ায় তাহাদের স্বাতন্ত্র্য এবং সাহস অধিক; এবং স্নেহ মমতার স্থায়িত্বে স্ত্রীলোকদিগের গৌরব। পুরুষদিগের এই কর্ম্মিষ্ঠ স্বভাব এবং স্ত্রীলোকদিগের সহিষ্ণুতা প্রাকৃতিক কারণজাত; যাঁহারা বলেন পুরুষদের উপদ্রবে স্ত্রীজাতিকে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে তাহা ভ্রম। পুরুষজাতির নিজত্ব অধিক বলিয়া তাহাদের সৃজনশক্তি অধিক; স্ত্রীজাতির পরার্থপরতা অধিক বলিয়া তাহাদের সাধারণ বুদ্ধি অধিক, ইহা প্রত্যক্ষ লক্ষিত হয়। স্ত্রী অতীত সত্য আপনার মধ্যে সংরক্ষণ করে বলিয়া তাহার সংক্রমণী বুদ্ধি অধিক; পুরুষ নিত্য নূতন সত্য আহরণ করে বলিয়া বিক্ষেপনী কার্য্যে সে অধিকতর ক্ষমবান্। স্ত্রীজাতির মৃদুভাব থাকাবশতঃ তাহারা অধিকতর সহিষ্ণু, উন্মুক্তান্তঃকরণ, এবং তীক্ষ্ণ খুঁটি নাটি বুঝিতে পারে; অতএব আমরা যাহাকে বলি দ্রুত সত্য নির্দ্ধারণের ক্ষমতা,—তাহা তাহাদের আছে। পুরুষ কর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া কোনও কার্য্যে স্ত্রী অপেক্ষা অধিক কার্য্যক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে, এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসম্বন্ধে তাহাদের তীক্ষ্ণ গভীর দৃষ্টি, মনে কোন বহির্বিষয়ের ভাব অঙ্কিত হইলে তাহা লইয়া অধিক

---

* The Evolution of Sex: by Professor Geddes and J. Arthur Thomson—Contemporary Science Series pp. 270—71.

নাড়া চাড়া করে, এবং তাহার সহিত খুঁটিনাটির প্রতি অবহেলার ভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু সাধারণ সত্য অধিকতর বলের সহিত ধারণ করিতে পারে। পুরুষ অধিকতর চিন্তাশীল, স্ত্রী অধিকতর অনুভূতিশীলা। পুরুষ অধিকতর আবিষ্করণে পটু, কিন্তু মনে রাখিতে পারে না; স্ত্রী অধিক সংগ্রহ করিতে পারে এবং সহজে ভুলে না।”

স্ত্রী পুরুষের এই প্রাকৃতিক পার্থক্যের উপর ভিত্তি করিয়া স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দু চারিটি কথা বলা যাইতে পারে। স্ত্রীশিক্ষা কি প্রণালী অনুসারে সম্পাদিত হইলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে কার্য্যকারী হইতে পারে তাহা দেখিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে শিক্ষা কি তাহা বিবেচনা করিলে সুবিধা হইবে। কোন প্রাণীর চরম উৎকর্ষের সম্ভাবনার প্রত্যক্ষরূপে কার্য্যে পরিণতির নাম শিক্ষা। যে উপায়ে সে সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে আপনাকে বিকাশ করিয়া জগতে আপন কার্য্য-সাধন করিতে পারে তাহাই তাহার উপযুক্ত শিক্ষা। সেইরূপ মনুষ্যজাতি যে উপায় দ্বারা তাহার চরম উন্নতিলাভ করিয়া আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে তাহাই মনুষ্যের পক্ষে প্রকৃত শিক্ষা।

সাধারণতঃ মানবকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়—শরীর, মন ও আত্মা। অতএব স্বীকার করিতে হয় যে মানুষের চরম উন্নতির নিমিত্ত এই তিন অংশেরই সম্যক ও সুচারু উৎকর্ষ আবশ্যক। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই যখন শরীর মন ও আত্মা আছে বলিয়া স্বীকার করা হয় তখন উভয়েরই আত্ম বিকাশের জন্য এই তিন অংশেরই উৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন। কিন্তু উভয়ের উপাদান এক হইলেও বিভিন্নরূপ সংমিশ্রণবশতঃ উভয়ের যেরূপ প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয় তাহাতে উভয়েরই এক বিধি অনুযায়ী শিক্ষা উপযোগী হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন উদ্ভিদের উৎকর্ষ লাভ প্রণালী জন্তুতে প্রয়োগ করিলে তাহা নিতান্ত নিষ্ফল হয়, সেইরূপ পুরুষের শিক্ষাও অবশ্য স্ত্রীতে বিশেষ কার্য্যকারী হয় না। শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্বন্ধে বাহুল্য উল্লেখ এ স্থলে আমার অভিপ্রায় নহে, কেবল মাত্র মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধেই আমার বক্তব্য আবদ্ধ থাকিবে। দার্শনিকেরা মনকেও সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন—বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও ইচ্ছাবৃত্তি। কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে প্রথমোক্ত দুই বৃত্তিরই অধিক প্রাধান্য; ইচ্ছা বৃত্তিরও এ সম্পর্কে বিশেষ কার্য্য আছে, কিন্তু তাহার উল্লেখে পত্রটি অধিক বাড়িয়া যাইবে অতএব তাহাতেও বিরত হইলাম। এখন আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে যে এই দুই বৃত্তি সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে কি উপায়ে বর্দ্ধিত হইতে পারে।

আমরা সকলেই জানি যে শিক্ষার বিষয় সত্য—তাহা না হইলেত পাগল এবং খেয়ালিকে পূর্ণমাত্রায় শিক্ষিত বলিয়া সর্ব্বোচ্চ আসন দিতে হয়। যেমন ভগবৎতত্ত্বজ্ঞ মহাজনেরা বলিয়াছেন যে ঈশ্বরবিষয়ক সত্য—জ্ঞান ও ভক্তি এই দুই মার্গ দ্বারা লাভ হয়, সেইরূপ জাগতিক সকল সত্যই দুই উপায়ে প্রাপ্তব্য—বুদ্ধি দ্বারা ও হৃদয় দ্বারা। জ্যামিতি শাস্ত্রানুসারে ইহাকে ত্রিভুজের দ্বারা অঙ্কিত করা যাইতে পারে। নিগেত

ভূঙ্গটি যেন সকল সত্যের আকর এই বিপুল বিশ্বসংসার—ইহা ব্যতীত আমাদের জ্ঞাতব্য সত্যের অপর কোনও আধার নাই। পার্শ্বস্থ ভুজদ্বয় মস্তিষ্ক ও হৃদয়রূপী সত্য নিরাকরণের দুইটি পথস্বরূপ। প্রথমটিকে সত্যের জ্ঞানভাব এবং দ্বিতীয়টি সত্যের রসভাব বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে বিন্দুতে পার্শ্বস্থ ভুজদ্বয় মিলিত হইতেছে সেটি গঙ্গা যমুনার সঙ্গমের ন্যায় জ্ঞানভাব ও রসভাবের সম্মিলনস্থল। পরস্পরে পরস্পরের কর্তৃক সংগৃহীত সত্য মিলাইয়া আপনার মনে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত স্ত্রী পুরুষের জাতিগত পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে যে বুদ্ধিবৃত্তি পুরুষ-প্রকৃতির কেন্দ্রস্বরূপ, এবং হৃদয়বৃত্তি স্ত্রী-প্রকৃতির কেন্দ্রস্বরূপ। সত্য-নিরাকরণের উপায় পুরুষের পক্ষে জ্ঞানভাব এবং স্ত্রীর পক্ষে রসভাব। বিভিন্ন প্রণালীর দ্বারা সংগৃহীত সত্যের মিলন হইলে তখন উভয়েই সত্যকে প্রকৃত সত্য বুঝিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করে। স্ত্রী পুরুষ পরস্পরে পরস্পরের পার্থক্য বজায় রাখিতে না পারিলে অবশ্য এ কার্য্য সাধিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। আমরা বুদ্ধি দ্বারা উভয় প্রণালী বুঝিলেও আমাদের কার্য্য এক পার্শ্বে ঝুঁকিয়া পড়িবারই অধিক সম্ভাবনা—এ পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে রক্ষিত হইলে আমাদের সে ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা অতি অল্পই থাকে। প্রকৃতিরও এমনি অলঙ্ঘনীয় নিয়ম যে চারাগাছ খুঁটির সাহায্যে ঊর্দ্ধগামী হইলেও কোন প্রকারে বৃক্ষ হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, শাললতা আপনার নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে বৃদ্ধি পাইতে পারে কিন্তু কোন ক্রমে "সঞ্চারিণী" রমণী হইতে পারে না; সেইরূপ শিক্ষার প্রভাবে স্ত্রী কিছু আর পুরুষ হইতে পারে না। পুরুষও আবার তেমনি শিক্ষার বলে কিছু আর স্ত্রী হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। স্ত্রীকে পুরুষরূপে কিম্বা পুরুষকে স্ত্রীরূপে গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস পাইলে, মনুষ্যের অতি নিকট সম্পর্কীয় কোন জীবের সৃষ্টি হইতে পারে কিন্তু শিব গড়া হয় না। অতএব স্ত্রী-শিক্ষার সাধারণ নিয়মস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যে উপায় দ্বারা তাহাদের প্রকৃতি-দত্ত হৃদয়রূপী মূল-বীজের চরমোৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে তাহাই তাহার শিক্ষার প্রকৃত প্রণালী।

এখন দেখা গেল স্ত্রীজাতির শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হৃদয়-বৃত্তির সম্যক উন্মেষণ। এই হৃদয়বৃত্তি আবার দুই জাতীয়, আত্ম-সুখান্বেষী এবং পর-সুখান্বেষী। দ্বিতীয় জাতীয় হৃদয়বৃত্তিগুলিই স্ত্রীজাতির মধ্যে অধিক কার্য্যকারী; যথা দয়া, মায়া, মমতা, স্নেহ, ভক্তি, ও প্রেম ইত্যাদি। এ গুলির সমধিক ও যথাযথ চর্চ্চায় আত্মগত হৃদয়বৃত্তিগুলির কার্য্যকারিতাও কতকাংশে মঙ্গলভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। অতএব বলা যাইতে পারে যে পরগত মনোভাবের সম্যক উন্মেষণই সাধারণ স্ত্রীজাতির প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য। যাহাতে নারী-হৃদয়ের দয়া সর্ব্বজীবের প্রতি বিস্তারিত হয়, যাহাতে সমগ্র সৃষ্টিকে আপনার আত্মার একান্ত আত্মীয় বলিয়া প্রতীতি জন্মে, যাহাতে তাহাদের সুখ দুঃখ আপনার সুখ দুঃখের ন্যায় উপলব্ধি হয়, এইরূপ ভাবে স্ত্রীজাতির শিক্ষা হওয়াই প্রশস্ত। ভক্তি ভাবের এরূপ অনুশীলন প্রয়োজন যে উহা ঈশ্বরের প্রতি সংক্রমিত হয়; তাহা হইলে মন্দ ও অসত্যের প্রতি এরূপ আন্তরিক ঘৃণা জন্মিবে যে স্বজাতিকে ছাড়াইয়া নিকটস্থ পুরুষজাতীয় আত্মীয় স্বজনের মনকেও সমুন্নত করিতে সক্ষম হইবে। মানব-দুর্ব্বলতা যখন আসিয়া পুরুষজাতীয় আত্মীয়বর্গের মন অধিকার করিবার জন্য কুহকাস্ত্র প্রয়োগ করিবে, তখন এই উৎকৃষ্ট শিক্ষার বলে স্ত্রীরা তাহাদিগকে অসত্য ও অমঙ্গলের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া জগত-সংসারের প্রকৃত মঙ্গলসাধন করিবার উপযোগী হয়েন। এই নিমিত্ত স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষতঃ ধর্ম্ম-পুস্তক ও সাধুগণের জীবন-

চরিত, উচ্চ অঙ্গের কাব্য উপন্যাস ও পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। এগুলি স্ত্রীশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, এতদ্ব্যতীত অপরাপর যে সকল শাস্ত্র বা বিদ্যা এই শিক্ষার সহায়ক তাহাও তাহাদের শিক্ষনীয়। সঙ্গীত ও চিত্র-বিদ্যাও এই শিক্ষার উপযোগী। তাহার পরে আপনাপন রুচি ও প্রবণতা অনুসারে অপরাপর বিদ্যা শিক্ষা করুন তাহাতে কাহারও আপত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই—বরং সংসারে তাহা সুফলই প্রসব করিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা স্ত্রীজাতির পক্ষে কোন ক্রমেই উপযোগী বলিয়া আমার মনে হয় না। তাহার শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী যেরূপ—তাহাতে মস্তিষ্ককেই অধিক আকর্ষণ করে, হৃদয়ের প্রতি তাহার বড় লক্ষ্য নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, অবস্থাভেদে উহা পুরুষজাতির উপযোগীরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কারণ উহার মূল উদ্দেশ্য পুরুষজাতিকে শিক্ষিত করা। পুরুষের শিক্ষার প্রণালী মস্তিষ্ক হইতে হৃদয়ে অগ্রসর হওয়া, আর স্ত্রীর শিক্ষার প্রণালী হৃদয় হইতে মস্তিষ্কে অগ্রসর হওয়া। তবে পুরুষের শিক্ষার প্রণালী কেমন করিয়া স্ত্রীর সম্পর্কে সেরূপ কার্য্যকারী হইতে পারে? এতদ্ব্যতীত নিরুপায় হইয়া উদরান্নের জন্য পুরুষকে পরীক্ষা দিতে বাধ্য হইতে হয়, স্ত্রী যদি সখ করিয়া আমোদের জন্য সেই পরীক্ষা দিতে গিয়া আপনার শারীরিক ও মানসিক অবসন্নভাব আনয়ন করেন তবে আর তাহার উপায় কি! পুরুষের স্নায়বীয় প্রণালী স্ত্রী হইতে অনেকাংশে অধিকতর সবল, এবং বহুকাল হইতে সে একার্য্যে অভ্যস্ত; তথাপিও যখন তাহার পরীক্ষার ক্লেশ দূর হইতে কিছু কাল লাগে তখন দুর্ব্বল স্ত্রীজাতির পক্ষে যে ইহা কিরূপ কুফলপ্রদ তাহা বিস্তারিত বলিবার আবশ্যক করে না।

সংসারে স্ত্রীর কার্য্য-ক্ষেত্র গৃহজগৎ, পুরুষের বহির্জগৎ। স্ত্রীর প্রধান অস্ত্র হৃদয়, পুরুষের মূল অস্ত্র মস্তিষ্ক। পুরুষ জাহাজ, দূর দেশ হইতে বাণিজ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে আনয়ন করে; নারী তরণী, দূর দেশ হইতে আনীত সেই সকল বাণিজ্যদ্রব্য স্বদেশের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে লইয়া আইসে। স্ত্রীর অস্ত্র দ্বারা যেরূপ পুরুষের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না; সেইরূপ পুরুষের কার্য্যও স্ত্রী কর্ত্তৃক সম্যক প্রকারে সাধিত হইবার সম্ভাবনাও অতি অল্প। স্ত্রী স্বামীর সম্পর্কে সহধর্ম্মিণী, সন্তানের সম্পর্কে উৎকৃষ্ট মাতা, ভ্রাতার সম্পর্কে উৎকৃষ্ট ভগিনী, মাতা পিতা গুরুজনের সম্পর্কে উৎকৃষ্ট কন্যা, গৃহ সম্পর্কে উৎকৃষ্ট গৃহিণী, এবং জগৎ সম্পর্কে উৎকৃষ্ট নারী হউন—ইহাই তাঁহার রাজত্ব—এরাজ্য তিনি সুশাসিত না করিলে কে করিবে? পুরুষ বহির্জগৎ হইতে কার্য্যোদ্ধার করিয়া শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্লিষ্ট দেহ ও মন লইয়া তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে চাহে—এই আশ্রয়দানই তাঁহাদের কার্য্য, এই আশ্রয়দানেই তাঁহাদের মহত্ব; শিক্ষার বলে, তাঁহাদের এই কর্ত্তব্য, এই মহত্ব তাঁহারা রক্ষা করিয়া তাঁহাদের জাতিগত উৎকর্ষ সাধন করুন, তাহা হইলেই সমগ্র মনুষ্যজাতিকে তাঁহারা মনুষ্যত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

শ্রীযোঃ—

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আভাষ। শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত। ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী বঙ্গসাহিত্য সমাজে বিশেষরূপে পরিচিত। তাঁহার 'অশ্রুকণা' অল্পদিন মাত্র সাহিত্য আকাশে যে বিমল জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছে "আভাষ" তাহারি পুনরাভাষ। নানাবিধ বিষয়ক কবিতা-স্তবকে এই সুললিত কাব্য গ্রন্থখানি গ্রথিত হইয়াছে। যদিও সমালোচনার জন্য আমরা পুস্তকখানি পাইয়াছি, তবুও ইহাকে সমালোচনা করিতে কেমন আমাদের মন সরিতেছে না। মনে হয় যেন সমালোচনার স্পর্শে এই শিশির স্নাত কামিনী ফুলগুচ্ছ মলিন হইয়া যাইবে—পাপ্‌ড়ীগুলি যেন ঝরিয়া পড়িবে। এক সম্প্রদায়ের কবি আছেন, যাঁহারা লেখ্য বিষয়টীকে নিংড়াইয়া তাহার সমস্ত রসটুকু—সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্বটুকু সমস্ত মর্ম্মগত ভাবটুকু বাহির করিয়া জ্বলন্ত কবিতাতে আমাদিগকে বিমোহিত করেন। শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী সে সম্প্রদায়ের কবি নহেন। তাঁহার কল্পনা প্রজাপতির মত ফুলের শুদ্ধ মধুটুকু গ্রহণ করে। তাঁহার কাব্য পড়িতে পড়িতে এমন মনে হয় না যে তিনি কাগজ কলম লইয়া কখনো কবিতা লিখিতে বসিয়াছিলেন—যেমন শিশিরকণা দুর্ব্বাদলে পড়িয়া মুক্তারূপে ফুটিয়া উঠে সেই রকম গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যে তাঁহার কল্পনার উচ্ছ্বাসগুলি যেন অক্ষররূপে পরিণত হইয়াছে। গিরীন্দ্রমোহিনীর কল্পনা "স্নিগ্ধ বিদ্যুতের" ন্যায় উজ্জ্বল অথচ তীব্র নহে, লীলাময়ী অথচ দুরন্ত নহে, মুগ্ধকরী অথচ মর্ম্মভেদী নহে৷

উপহার স্বরূপ পাঠককে গুটিকতক কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

অনাহূত।

তোদের মতন, অতিথি এমন
দেখিনে ত কভু জনমে;
কোন্ দেশে ছিলি, কোথা হ'তে এলি
জুড়াতে তাপিত মরমে;
চুরি ক'রে খাস্, কেড়ে নিয়ে যাস্,
উলটী পালটী সব;
বকিবারে গিয়ে, ফেলি যে হাসিয়ে,
কি মধুর উপদ্রব!
বকিয়ে বকিয়ে, দিদি মেরে ফেলে,
এক কথা শত বার;

কোথায় শিখিলি, ভাঙা চোরা বুলি ?
উত্তরে মেনেচি হার।
উঁকি ঝুঁকি চেয়ে, ছুটে যাও ভয়ে,
পুনঃ এসে ধর গলে ;
মিঠে মিঠে হেসে, কোলে চড়ে বসে,
প্রেম উৎস দাও খুলে !

শিশির।

ঘাসের বনে মুক্তামালা, ছড়িয়ে ফেলে চপল বালা
রাতারাতি চলে গেছে কোন্ সাগরের পার—
—রাগ করে ছিঁড়েচে সাধের প্রেমের উপহার।
তারেই নিশির শিশির ব'লে, যাচ্চে লোকে পায়ে দলে,
হায় হায় ! মুক্তাগুলি কেঁদে গলে বিরহে কাহার ?
রাগ ক'রে ছিঁড়েচে সাধের প্রেমের উপহার।
অথবা কোন্ বিরহিণী, খুঁজতে এসে নয়ন-মণি,
দেখা বুঝি না পেয়ে তার, সারানিশি কেঁদে কেঁদে,
নিরাশ-আশা প্রাণের তৃষা চোখের জলে গেছে গেঁথে।

নিরাশ পথিক।

একাকী বিজনে পান্থ কত খেদ গান গাও,
আলোকে করিয়া সাথী অনন্তের পথে যাও,
কেনই বিফল আশা,
নাই কি তোমার বাসা,
কেন সবই ভাসা ভাসা,
জগতের পানে চাও ?
একাকী বিজনে পান্থ কত খেদ গান গাও !
মোছ অশ্রু-জল-রাশি,
হায় !—হেসনা নিরাশ হাসি,
জীবন পূর্ণিমা নিশি
দু দণ্ডের মেঘে ছাও !
একাকী বিজনে পান্থ কত খেদ গান গাও ;
নিশীথে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন যত যায় দেখা,
সফল না হয় সব অস্পষ্ট অলক্ষ্য রেখা।

তাবলে কি উষা এলে চা'বেনা রবির পানে,
জীবন কাটায়ে দিবে বিফল স্বপ্নের ধ্যানে ?
কিসের বেদনা ছার,
কেনই গভীর শ্বাস ?
প্রাণে আন নব বল,
মিছে, বৃথা হা হুতাশ।
সাধ প্রাণে আছে যার জীবন্ত তাহাই আশা,
(নহে) সাধ-হীন, আশা-হীন, লক্ষ্য-হীন ভালবাসা।

মিলন।

দূরে হ'তে কাছে আনা স্বভাব আমার,
ফুরাইয়া যায় কাজ মিশে গেলে ছুটী।
জগত রয়েছে দূরে হইতে আমার,
আনিতে পরাণে তার করি ছুটাছুটী।
প্রেমের জগতে আমি মধ্য আকর্ষণ।
বিরহ রূপেতে আমি সম্পূর্ণ মিলন।

বিরহ।

বিরহে থাকে প্রেম মরমে মিশি,
তাই অদরশনে সুখসাধে ভাসি,
বিরহে আঁখি আগে, সকলি জেগে থাকে,
আঁখিতে আঁখিতে হলে শুধু জাগে হাসি!

হিমানী। লেখকের নাম নাই। ইহা ঈশ্বরভক্ত শোকতপ্ত হৃদয়ের নিজের প্রতি সান্ত্বনা। ঈশ্বরের মঙ্গলভাবে লেখকের হৃদয় পূর্ণ. লেখক সত্যের চক্ষে এই শোক-তাপ পূর্ণ জগৎকে দেখিয়াছেন, সুতরাং বইখানি পড়িতে প্রশান্ত আনন্দ জন্মে। আমরা নীচে একস্থল উদ্ধৃত করিলাম।

দিনের পর রাত আসে—এত প্রকৃতিরই নিয়ম। ভগবান প্রেমের অটুট ডোরে হাসি কান্না পাশাপাশি গেঁথেছেন। প্রেমময় প্রকৃতির চারিদিকে তাঁর প্রেমের ছবি এঁকেছেন। আহা! চেয়ে দেখ কি সৌন্দর্য্য চারিদিকে ছড়িয়েছেন!—ওই যে ছবির মাঝে কালো রেখা গুলো দেখা যায় ও গুলো কি তাঁরি প্রেম তুলির দাগ নয় ? প্রকৃতির সুন্দরছবি হ'তে কালো দাগ গুলো মুছে দেখত—সৌন্দর্য্য চলে যায় কি না। আমরা যাকে শোকের দাগ বলি—যাকে দুর্ঘটনা বলি তাও ভগবানের প্রেমের বিধান—তা' না থাক্‌লে সব সৌন্দর্য্য চলে যায়—প্রেমের দাম কমে যায়। শোকের ভিতর দিয়েই

তাঁর প্রেম দেখব—আঁধারের ভিতর দিয়ে তাঁর মুখের জ্যোতি দেখ্‌ব। শোক দিয়ে কি ভগবান শুধু মানুষকে পরীক্ষা করেন? শুনেছি দূরবীক্ষণের কাচে নাকি ঐ আকাশের ব্যবধান ভেদ করে গগণবিহারী গ্রহ নক্ষত্রের ছবি চোখের কাছে এনে দেয়। শোকের অশ্রু একবিন্দু চোখের কোলে দেখা দিলে—সে অশ্রু বিন্দুর ভিতর দিয়ে কত সৌন্দর্য্যের রাজ্য—কত নীহারিকার ছবি দেখা যায়; অশ্রু বিন্দুর ভিতর দিয়ে স্বর্গের সিংহাসন বড় কাছে দেখায়!

প্রবাদ সংগ্রহ। শ্রীকানাইলাল ঘোষাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত। বঙ্গদেশের শ্রুতি-প্রচলিত প্রবাদ এইরূপে পুস্তকাকারে আবদ্ধ করিয়া লেখক সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। কেবল বঙ্গদেশের নহে—হিন্দুস্থানের কতকগুলি চলিত প্রবাদও ইহাতে আছে।

বইখানির দুএক জায়গায় সামান্য সামান্য ভুল হইয়াছে—যেমন—

"সাধ হয় বোস্কব হতে, প্রাণ যায় মুরছল দিতে।"

কথাটা মুরছল নহে, মোচ্ছব অর্থাৎ মহোৎসব।

আর এক জায়গায়—"সব করলে জোশী বাকী ভীম একাদশী।" "যশী" স্থানে "জোশী" লিখিত হওয়াতে হঠাৎ অর্থ বুঝা যায় না।

'অরণ্যের ছরাত'—লেখক ব্যাখ্যা করিয়াছেন অরণ্যের ন্যায় শরীর—এই ব্যাখ্যা আমাদের ভুল বোধ হইল। আমরা যতদূর জানি কথাটি ছরাত নহে—ছরাদ, কথাটি শ্রাদ্ধের গ্রাম্য কথা, সুতরাং যেমন অরণ্যে রোদন—তেমনি অরণ্যে ছরাদ অর্থাৎ ফাঁকি দিয়া শ্রাদ্ধ করা। লেখক অন্য স্থলেও ছরাদ অর্থে শরীর লিখিয়াছেন। প্রবাদ সংগ্রহে এইরূপ দুচারিটি যা ভুল আছে, দ্বিতীয় সংস্করণে আশা করি লেখক তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

কবি গিরিধর কৃত মহাকবি জয়দেবের গীত গোবিন্দের প্রাকৃত পদ্যানুবাদ।

লেখক ভূমিকায় একস্থলে বলিয়াছেন—

অনেকেই জানেন যে গীতগোবিন্দের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ রসময় দাস নামে কোন ব্যক্তি লিখিয়া গিয়াছেন, এবং সচরাচর সেই অনুবাদই মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। আমাদিগের গৃহে রসময় দাসের পদ্যানুবাদ হস্তলিপিতে বর্ত্তমান আছে; বাজারে রসময় দাসের নাম দিয়া যে পদ্যানুবাদ বিক্রীত হয়, তাহাতে অনেক স্থলে ভ্রম এবং চরণস্খলন দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, আমাদিগের গৃহে হস্তলিপিতে কবি গিরিধরকৃত গীতগোবিন্দের যে প্রাকৃতানুবাদ বর্ত্তমান আছে, এবং যাহা আমরা অদ্যাপি মুদ্রিতাকারে দৃষ্টি করি নাই, আমরা সেই অনুবাদ আদ্যোপান্ত পাঠ

করিয়া মোহিত হইয়াছি। গিরিধর জনৈক বৈষ্ণব কবি ছিলেন; তিনি ১৬৫৮ শাকে আষাঢ় মাসে ঐ প্রাকৃতানুবাদ সমাপ্ত করেন, অর্থাৎ মহাকবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য সম্পূর্ণ হইবার প্রায় ষোড়শ বৎসর পূর্ব্বে ঐ অনুবাদ রচিত হয়। সুতরাং গিরিধর ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক কবি ছিলেন। রসময় দাস কেবল শাদা পয়ারে গীতের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া গীতগোবিন্দের অনুবাদ করিয়াছেন। গিরিধর তাহা করেন নাই। তিনি মূলের অনুকরণে রাগ ও তালে পদ বাঁধিয়াছেন—অর্থাৎ জয়দেবের যে যে পদাবলি যে যে রাগ ও তালে গীত হয়, গিরিধরকৃত প্রাকৃত ভাষায় গীতগোবিন্দের সেই সেই স্থল সেই সেই রাগ ও তালে গীত হইতে পারে। অপিচ, রসময় দাস অনেকস্থলে বিশদরূপে লিখিতে পারেন নাই। আমরা উভয়ের অনুবাদ পাঠ করিয়া এই মীমাংসা করিয়াছি। যে স্থলে দুই চারি পংক্তিতে ভাবসমাপ্তি হয়, রসময় দাস সেই স্থলে প্রায় দুই চারি পাতা লিখিয়াছেন। গিরিধর পয়ার, লঘু ত্রিপদী দীর্ঘ ত্রিপদী প্রভৃতি ববিধ ছন্দঃ ব্যবহার করিয়াছেন; এবং মধ্যে মধ্যে মাত্রাবৃত্তিতেও পদ্যরচনা করিয়াছেন, সেই কারণ তাঁহার কৃত অনুবাদ বিশেষ রুচিকর বলিয়া প্রতীতি হয়। রসময় দাসের রচনা কতকটা নীরস বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু গিরিধরের রচনা যথার্থ রসময়ী। অনুবাদে যতদূর সম্ভবে, গিরিধর জয়দেবের কাব্যের রস এবং মৌলিক ভাব বজায় রাখিয়াছেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমরা গিরিধরকৃত অনুবাদ জনসমাজে প্রচার করিতে সাহসী হইলাম। সহৃদয় পাঠকবর্গ কর্ত্তৃক উহা সাদরে গৃহীত হইলে আমরা কৃতার্থ হইব।”

আমরা রসময় দাসের বাঙ্গলা অনুবাদ পড়ি নাই—সুতরাং তুলনা করিয়া বলিতে পারি না তাহা অপেক্ষা ইহা উৎকৃষ্ট কি না, তবে অনুবাদটি নীরস নহে ইহা বলা যায়। কিন্তু তাহা হইলেও জয়দেবের গীতগোবিন্দ অনুবাদ্য বস্তু নহে। যেমন গঙ্গাজলেই গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য রক্ষিত হয় সেইরূপ জয়দেবের ভাষা নহিলে অনুবাদের ভাষায়—তাহা যতই কেন উৎকৃষ্ট হউক না—তাহার ভাব বিকৃত হইয়া পড়ে।

সিন্দুর বিন্দু। শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত প্রণীত। এখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস। ইহা সুরুচিজনক না হইলেও কিম্বা ইহাতে গল্প পারিপাট্য বা স্বভাব বিন্যাস তেমন না থাকিলেও ইহাতে প্রশংসার একটি বিষয় আছে। প্রেমের মহাপ্রভাবে এক বারনারীর কলুষিত মনোভাবকেও কিরূপে পবিত্রতায় পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল ইহাতে তাহাই চিত্রিত।

প্লেটো-টিমীয়স্।

পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিবার সময় যে সকল জড় বস্তু ব্যবহার করেন তাহাদিগের উল্লেখ করা হইল। তিনি এই দ্বৈতীয়িক কারণগুলিকে আপনার কর্ম্মকারক স্বরূপ মাত্র ব্যবহার করেন (অর্থাৎ জগৎ সৃজন কার্য্যে তাহাদিগের প্রাধান্য ছিল না;) সংসারে সমুদয় পদার্থে যে সৎতা বিরাজমান দেখা যায় তাহা তাঁহারই সৃষ্টি। জগতের বস্তু সমূহের দুই প্রকার কারণ আছে, এক ঐশিক আর এক জড়; ইহাদিগের মধ্যে প্রথমতঃ আমাদিগের ঐশিক কারণ আবিষ্কার করিবার প্রয়াস পাওয়া উচিত, এবং তাহার পর জড় কারণ। (দ্বিতীয় প্রকার কারণ অনুশীলন করিবার আবশ্যকতা এই যে তাহাদিগের প্রকৃতি না বুঝিলে উচ্চতর অর্থাৎ ঐশিক কারণের প্রকৃতি সম্পূর্ণ রূপে বুঝা যায় না।)

[উল্লিখিত কয়েক পংক্তি হইতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও দর্শন এই দুয়ের প্রতি প্লেটো কি রূপ চক্ষে দেখিতেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। পদার্থ সমূহের দুই প্রকার কারণ আছে—এক প্রাকৃতিক, জড় কারণ আর এক ঐশিক, মানসিক কারণ; ঐশিক কারণগুলি অনুসন্ধান করাই আমাদিগের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, যেহেতু তাহাদিগের জ্ঞান লাভেই আমাদিগের পরম সুখ জন্মিয়া থাকে। জড় কারণ গুলির অনুশীলন করার অভিপ্রায় ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে যে তাহাদিগের সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলে ঐশিক কারণ গুলির জ্ঞান স্পষ্টতর হইবে। ঐশিক কারণ অর্থে কি বুঝায় তাহা এইরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে; জগতে প্রত্যেক ঘটনা সম্বন্ধেই আমরা দুইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারি, (১) ঘটনাটী কিরূপে উৎপন্ন হয়, আর (২) কি উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ উহা দ্বারা জীবের কি মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত প্রশ্নে প্রাকৃতিক কারণ আর দ্বিতীয়োক্তটীতে ঐশিক কারণ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে।]

অতঃপর প্লেটো মানব সৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন। জগতে জড় পদার্থ প্রথমে এক অতি বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল, তাহাতে কোন প্রকারই নিয়ম বিদ্যমান ছিল না। পরমেশ্বরই প্রথমতঃ জড় জগতে নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন আর তৎপরে জড়ের সাহায্যে এই বিশ্ব সংসার সৃজন করেন। দেবগণের সৃষ্টি তিনি স্বয়ং করেন; কিন্তু মানব-সৃষ্টি তিনি নিজে না করিয়া তাঁহার সৃষ্ট দেবগণকে উহা করিতে আদেশ দেন। কি রূপে মানব সৃষ্ট হইল তাহা প্লেটো নিম্নলিখিত প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন :—

এই সকল দেবগণ, ঈশ্বরের কার্য্য অনুকরণ করিয়া ও তাঁহার নিকট হইতে অমর আত্মা গ্রহণ করিয়া, ঐ আত্মার উপযোগী করিয়া উহার যান স্বরূপ একটি দেহ গঠিত করিলেন আর দেহটী আত্মায় সংযোগ করিয়া দিলেন। তাহার পর আবার তাঁহারা উক্ত

অমর আত্মার সহিত আর একটি মরণশীল আত্মা যুক্ত করিলেন। দ্বিতীয় আত্মাটীর কতকগুলি ভয়ঙ্কর গুণ রহিল; আমোদ, যাহার প্রলোভনে অমঙ্গল ঘটিবার প্রধানতম সম্ভাবনা, আর কষ্ট, যাহা দ্বারা সৎতা দূরীকৃত হয়; ইহা ভিন্ন আবার অবিমৃশ্যকারিতা ও শঙ্কা, যাহারা (মানুষের পক্ষে) অন্ধ পথ প্রদর্শক স্বরূপ; ক্রোধ, যাহা সহজে পরামর্শ মানে না; এবং আশা, যাহা অজ্ঞান ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা সহজেই পরিচালিত হয় এবং যাহা প্রত্যেক বাসনা হইতেই আঘাত পাইতে পারে। দেবগণ এই সকল গুণ আবশ্যক মত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া মরণশীল আত্মার সৃজন করিলেন। ইহার পর তাঁহারা এই আত্মাকে দেহের শিরঃস্থল হইতে দূরে এমন একটী বাসস্থান দিলেন যে অমর আত্মা ইহার সংস্পর্শে আসিয়া কলুষিত না হয়। শিরঃ ও বক্ষঃ (মরণশীল আত্মার বাসস্থান) এই দুয়ের মধ্যে তাঁহারা গ্রীবাদেশ যোজক স্বরূপ রাখিলেন। বক্ষঃস্থলে তাঁহারা মরণশীল আত্মা স্থাপন করিলেন এবং এই আত্মার এক ভাগ উৎকৃষ্টতর আর অপর ভাগ নিকৃষ্টতর ছিল বলিয়া তাঁহারা দেহের গহ্বরটী পুরুষের প্রকোষ্ঠ ও নারীর প্রকোষ্ঠের ন্যায় দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন ও তাহাদিগের মধ্যে ডায়াফ্রাম নামে একটী পর্দ্দা বসাইয়া দিলেন। মরণশীল আত্মার যে অংশে সাহস ও ক্রোধ গুণ বিদ্যমান ছিল, সে অংশটী তাঁহারা শিরোদেশের যত নিকটে সম্ভব রাখিলেন; অর্থাৎ গ্রীবাদেশ ও ডায়াফ্রামের মধ্যদেশে। এইরূপ রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে উক্ত গুণটী অমর আত্মার নিকটে থাকিলে উহার নিকট জ্ঞানময় উপদেশ পাইয়া কামাদি রিপুবর্গকে দমন রাখিতে পারিবেক। [এই স্থল হইতে দেখা যাইতেছে যে প্লেটোর মতে রিপু দমন পক্ষে ক্রোধবৃত্তি জ্ঞানবৃত্তির সহায়তা করিয়া থাকে।] হৃৎপিণ্ডকে দেবগণ প্রহরীর প্রকোষ্ঠে রাখিলেন; প্রহরী যেরূপ সৈনিকবর্গকে চেতন করাইয়া দেয় হৃৎপিণ্ডও সেই রূপ করিয়া থাকে। জ্ঞানবৃত্তি হইতে ক্রোধ যখন সংবাদ পায় যে কোন বাহ্যিক কারণে কিম্বা আভ্যন্তরিক কোন বাসনার প্রবর্ত্তনায় অন্যায় ঘটিয়াছে তখন উহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে আর হৃৎপিণ্ডও তখন উহার শিরাগুলির মধ্য দিয়া দেহের সমুদয় চৈতন্য শীল অংশে ঐ সংবাদ প্রেরণ করে। এক্ষণে ফুস্‌ফুসের উদ্দেশ্য কি দেখা যাউক; দেবগণ পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে বিপদের আশঙ্কায় ও ক্রোধের উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ড উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে ও দপ্ দপ্ করিতে থাকিবে। এই সময় যাহাতে ইহা শীতল হইয়া রাগের অবস্থায় জ্ঞানের আজ্ঞা বহন করিতে সমর্থ হয় এই উদ্দেশ্যে দেবগণ হৃৎপিণ্ডের নিকট ফুস্ ফুস্ স্থাপন করিলেন। ইহা নরম, গহ্বরময় এবং জলীয় ও বায়বীয় পদার্থে পূর্ণ, ইহা দ্বারা হৃৎপিণ্ডের আবেগ ও উত্তাপ হ্রস্বীকৃত হয়।

ইহার পর প্লেটো পাকস্থলীর বর্ণনা করিয়াছেন; আত্মার যে অংশের খাদ্য পানীয়াদি জীবন ধারণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বস্তু সমূহের বাঞ্ছা আছে সে অংশ-

টীকে দেবগণ ডায়াফ্রাম ও নাভীদেশ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থলে স্থাপন করিলেন, এবং তথায় একটী খাদ্য পাত্র গঠিত করিয়া দিলেন। অশ্বশালায় ঘোটককে যেরূপ খাদ্য পাত্রের নিকটে বাঁধিয়া রাখা হইয়া থাকে, উল্লিখিত আত্মাকেও ঐ রূপে রাখা হইল কারণ তাহা না করিলে মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষা হয় না। এই তৃতীয় আত্মাকে অমর আত্মা হইতে দূরে রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে দূরে থাকিয়া আহারাদি করিলে উহা অমর আত্মার কার্য্যের কোন ব্যাঘাত জন্মাইবে না। প্লেটোর মতে যকৃতের উদ্দেশ্য কি তাহা বলা যাইতেছে। পাকস্থলী (অর্থাৎ তাহাতে অবস্থিত উক্ত তৃতীয় আত্মা) জ্ঞানময় বিষয় বুঝিতে অসমর্থ হইবে ইহা দেবতারা জানিতেন; কিন্তু উহা কল্পনা দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে, সুতরাং যাহাতে উহাতে দিবারাত্র কল্পনার কার্য্য ঘটিতে পারে তদুদ্দেশে তাঁহারা উহার পার্শ্বে যকৃৎ সংস্থাপিত করিলেন। জ্ঞান-বৃত্তি হইতে শক্তি প্রচালিত হইয়া যকৃতে পৌছিলে (দর্পণে যে রূপ) তাহা হইতে নানা প্রকার প্রতিকৃতি জন্মিবে; আর ঐ শক্তির প্রকৃতি অনুসারে যকৃতের ভিন্ন ভিন্ন পরি-বর্ত্তন ঘটিবে। জ্ঞানবৃত্তি যখন ভীতিকর শক্তি পাঠাইবে যকৃতের তখন সমুদয় অংশ পিত্তে পূর্ণ হইয়া তিক্ত হইবে ও উহা সঙ্কুচিত হইবে; আবার যখন জ্ঞানবৃত্তি হইতে স্ফূর্ত্তিকর রস আসিবে যকৃতও তখন মিষ্ট হইবে ও স্বাভাবিক সরল ও মসৃণ অবস্থায় থাকিবে। এইরূপে যকৃৎ রাত্রিকালে স্বপ্নাদি দ্বারা পাকস্থলীতে দৈবজ্ঞান জন্মাইয়া দিবে—এইরূপ দৈবজ্ঞান ঘটাইবার হেতু এই যে পাকস্থলীস্থিত আত্মা প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী নহে।

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে দেখা যাইতেছে যে লোকে যাহাকে দৈবজ্ঞান কহে প্লেটো তাহাকে প্রকৃত জ্ঞান হইতে নিকৃষ্ট মনে করেন, আর যে যে অনুভূতি হইতে দৈব-জ্ঞান জন্মিয়া থাকে প্লেটোর মতে যকৃতই তাহাদিগের আধার। যকৃতের এইরূপ কার্য্য নির্দ্দেশ করিবার কারণ বোধ হয় এই যে প্লেটোর সময়ে লোকে পশু বলিদান করিয়া তাহার যকৃত পরীক্ষা করিয়া ঘটনা গণনা করিত। দৈবজ্ঞান সম্বন্ধে প্লেটো তাঁহার মত এই প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন। যে সকল দেবগণ আমাদিগের সৃজন করেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের পিতা পরমেশ্বরের আদেশ স্মরণ রাখেন, সে আদেশটী এই যে, মানব জাতিকে যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট করিতে হইবে। অতএব দেবগণ আমা-দিগের আত্মার নিকৃষ্ট অংশটিকেও সত্যের আভাষ পাইবার পথ করিয়া দিয়াছেন, অর্থাৎ উহাকে দৈবজ্ঞান লাভ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।' মানুষের জ্ঞান-বৃত্তি দুর্ব্বল বলিয়াই যে ঈশ্বর আমাদিগকে এই দৈবজ্ঞানবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কারণ জ্ঞানবৃত্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকিলে কখনও কাহারও উক্ত দৈবজ্ঞান লাভ হয় না; নিদ্রাকালে (যখন স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি শৃঙ্খলবদ্ধ থাকে) কিম্বা রুগ্ন অবস্থায় কিম্বা প্রকৃতির একরূপ উৎসাহময় অবস্থাতেই

এই জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যাহা হউক জ্ঞানী ব্যক্তির এই দৈবজ্ঞান লব্ধ ইঙ্গিত-গুলি অগ্রাহ্য করা উচিত নহে; ইহাদিগের অর্থ কি, ইহাদিগের দ্বারা শুভ কিম্বা অশুভ সংবাদ বুঝিতে হইবে, এই সকল বিষয় তাঁহার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। কিন্তু যে ব্যক্তি এইরূপ দৈবাবেশ অনুভব করিয়াছে ও বিশেষতঃ যে ব্যক্তিতে উক্ত আবেশ বিদ্যমান রহিয়াছে এই দুয়ের মধ্যে কেহই ভবিষ্যৎ গণিতে অধিকারী নহে; উহারা যাহা দেখে কিম্বা শুনে তাহার প্রকৃত অর্থ কি ইহা নির্ণয় করা উহাদিগের কর্ম্ম নহে; কারণ অনেক পূর্ব্বে হইতেই লোকে এই কথা বলিয়াছে যে কর্ত্তব্য নির্ণয় করা ও আত্মজ্ঞান লাভ করা এ দুটী কেবল মাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিরই কার্য্য। এবং এই নিমিত্ত আইন ও লোকাচার দ্বারা একশ্রেণী অনুবাদক নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহা-দিগের কার্য্য এই যে তাহারা দৈবাবেশ-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের কথিত বিষয়গুলির অর্থ নির্ণয় করিয়া থাকে। লোকে ইহাদিগকে ভবিষ্যদ্-বক্তা কহিয়া থাকে, কিন্তু বাস্ত-বিক পক্ষে ইহারা উক্ত নামের যোগ্য নহে কারণ তাহারা কখনও ভবিষ্যদ্বাণী কহে না, কেবল দৈবাবিষ্ট ব্যক্তিগণের কথার অর্থ প্রকাশ করে মাত্র। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে যকৃৎ যেরূপে গঠিত হইয়াছে ও যে স্থানে অবস্থিত হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য ভবিষ্যৎ কথন। এবং ইহা বুঝিতে হইবে যে জীবিত দেহেই যকৃৎ উক্ত উদ্দেশ্যের প্রকৃত উপযোগী, মৃত দেহে উহা অন্ধভাবাপন্ন হয় এবং তখন আর উহা হইতে বিশেষ কিছু স্পষ্ট বুঝা যায় না। [প্লেটোর এইরূপ বলিবার অর্থ সম্ভবতঃ এই যে তিনি তৎকাল প্রচলিত পশু বলিদান ও মৃত পশুর যকৃত হইতে ভবিষ্যদ্গণনা প্রথায় বিশ্বাস করিতেন না।

অতঃপর প্লীহার বর্ণনা করা যাইতেছে; প্লীহার কার্য্য যকৃৎকে পরিষ্কার রাখা। প্লীহা বামপার্শ্বে যকৃতের নিকট অবস্থিত, উহা এত নরম যে উহাকে যেরূপ ইচ্ছা সেই রূপ আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে যেমন দর্পণ হইতে যেরূপ ইচ্ছা সেই-রূপ প্রতিবিম্ব গঠিত হইতে পারে। যখন যকৃতে কোন প্রকার মল জন্মে, প্লীহা তাহা নিষ্কাশিত করিয়া লয় ও স্বকীয় গহ্বরময় ও রক্তহীন কায়ের অভ্যন্তরে রাখিয়া দেয়; এইরূপে প্লীহা ক্রমে ক্রমে মলপূর্ণ হইয়া উহা অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে। কিন্তু যখন আবার শরীরে বিরেচন ঘটে, তখন উহা হ্রস্বত্ব প্রাপ্ত হয় ও পূর্ব্বাবস্থায় পরিণত হয় এবং এইরূপে আমরা আত্মার অমর ঐশিক অংশ ও মরণশীল অংশ, তাহাদিগের অবস্থিতি, সম্বন্ধ, ও কার্য্য এ সমুদয় বর্ণনা করিয়াছি; আমরা যাহা বলিয়াছি তাহা যে সম্পূর্ণ সত্য তাহা আমরা বলিতে সাহস করিতে পারি না, কোন দেবতা যদি আমাদিগের কথিত বিষয়ের সত্যতা বিষয়ে সাক্ষ্য দেন তবেই আমরা ওরূপ বলিতে পারি। আমাদিগের কেবলমাত্র কোন বিষয় সম্ভবপর কি না ইহা বলিয়াই সন্তুষ্ট থাকা উচিত, এবং কোন বিষয়ে আমরা যত মনোযোগ দিই তত সাহসের সহিত এইরূপ বলিতে পারি।

প্রাচীন সংস্কৃত দৃশ্য কাব্য।

মৃচ্ছকটিক প্রকরণ।

(২)

শকার ব্যর্থ মনোরথ হইয়া প্রস্থান করিলে মৈত্রেয় ও রদনিকা চারুদত্তের গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহ প্রবেশের সময় মৈত্রেয় রদনিকাকে বলিলেন "দেখ তোমার এই অবমাননার কথা আর্য্য চারুদত্তকে কিছুমাত্র বলিও না। একেত তিনি ধনাভাবে—দ্রারিদ্রতার উৎপীড়নে যথেষ্ট কষ্ট পাইতেছেন তাহাতে আবার এই অবমাননার কথা শুনিলে আরও মর্ম্মপীড়া পাইবেন।" রদনিকা স্বভাবতই সংবৃতমুখী সুতরাং এ সকল কথা চারুদত্তের জানিবার কোন সম্ভাবনা রহিল না।

শকারের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া—পক্ষ দ্বার দিয়া—অঞ্চলে প্রদীপ নির্ব্বাণ করতঃ—বসন্ত সেনা সকলের অলক্ষ্য ভাবে চারুদত্তের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন—চারুদত্ত ভাবিলেন রদনিকা ফিরিয়া আসিয়াছে। এই সময়ে তাঁহার শিশুপুত্র রোহসেন সন্ধ্যার শীতল বাতাসে শীত বোধ করিতেছিল—চারুদত্ত বসন্তসেনাকে রদনিকা বোধে জাঁতি-পুষ্পে সুবাসিত স্বীয় উত্তরীয় তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন "রদনিকে! বালক রোহসেন শীতে বড় কষ্ট পাইতেছে তুমি তাহাকে ভবনের অভ্যন্তরে আনয়ন করিয়া এই উত্তরীয়ে গাত্রাচ্ছাদন কর।

বসন্তসেনা ত আর রদনিকা নয়—সুতরাং সে এ প্রশ্নের উত্তর দিল না—না দিবার আরও দুইটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ সে তাহার প্রণয় পাত্রকে সম্মুখে দেখিয়া সুখাভিভূত হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ—গোপন ভাবে সহসা তাঁহার অন্তপুর প্রবৃষ্ট হওয়াতে লজ্জায় কথা কহিতে সাহস করিতেছিল না। চারুদত্ত আবার তাহাকে রদনিকা বোধে রোহসেনকে ভিতরে আনিতে আজ্ঞা করিলেন—বসন্তসেনা তত্রাচ স্থান ত্যাগ করিল না; চারুদত্ত ইহাতে ব্যথিত হইয়া কহিলেন—"হাঃ ধিক্ কি কষ্ট! লোকে দৈববশে দীন দশা প্রাপ্ত হইলে, মিত্র ও চিরানুরক্ত ব্যক্তিরাও বিরক্ত হইতে থাকে—কথার অবাধ্য হয়।"

চারুদত্তের বাক্যশেষ না হইতে হইতে মৈত্রেয় গৃহপ্রবেশ করিয়া কহিলেন—এই যে রদনিকা!

চারুদত্ত বড় বিপদে পড়িলেন—তিনি পরিজন বোধে রদনিকা ভ্রমে, পরস্ত্রীর অঙ্গে জাতিপুষ্প-বাসিত উত্তরীয় নিক্ষেপ করিয়া অকার্য্য করিয়াছেন বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মৈত্রেয় বলিলেন "আর্য্য! পরস্ত্রী দর্শনের আশঙ্কা করিবেন না।

ইনিই সেই রূপ গুণ শালিনী বসন্তসেনা কামদেবায়তন প্রমোদ কাননে আপনার প্রতি অনুরক্তা হইয়া ঘটনাবশে আপনার গৃহে আশ্রয় লইয়াছেন।”

চারুদত্তের ভ্রমাপনয়ন হইলে তিনি চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলেন—পরে শকারের অত্যাচার বৃত্তান্ত, ও তাঁহার প্রতি সেই দুর্বৃত্তের শাসন বাক্য প্রয়োগ অবগত হইয়া কহিলেন “সে অতিমুর্খ।”

ইহার পর চারুদত্ত বসন্তসেনাকে প্রীতিপূর্ণ বচনে—নিজগৃহে অভ্যর্থনা করিলেন।

বসন্তসেনা চারুদত্তের একদিকে মহাজনোচিত স্বভাব সুলভ সদাশয়তা ও অন্য দিকে দারিদ্রতা দেখিয়া অতিশয় মর্ম্ম পীড়িতা হইলেন এবং কোন গূঢ় অভিপ্রায় দ্বারা পরিচালিত হইয়া চারুদত্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আর্য্য! যদি আমি আপনার অনুগ্রহের পাত্রী হই—তবে এই অলঙ্কারগুলি আপনি গচ্ছিত স্বরূপ রাখুন; দুর্ব্বৃত্ত শকার প্রভৃতি এই অলঙ্কারের লোভেই আমার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল।” চারুদত্তের গৃহ জীর্ণ সুতরাং তিনি বিষম সমস্যায় পড়িলেন—এই বহুমূল্য রত্নালঙ্কার কি তাঁহার অরক্ষিত জীর্ণ প্রকোষ্ঠে রক্ষিত হইয়া শেষে চৌরের কুক্ষিগত হইবে? তিনি অস্বীকার করিলে—বসন্তসেনা কহিলেন—“এটি অলীক কথা—লোকেরা সৎপুরুষ দেখিয়াই বস্তু গচ্ছিত রাখে, গৃহ দেখিয়া রাখে না।” চারুদত্ত সম্মত হইয়া অলঙ্কারগুলি রাখিয়া দিলেন। চারুদত্ত মৈত্রেয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“এই অলঙ্কার ভাণ্ড দিবাভাগে বর্দ্ধমানককে রাখিতে দিবে—ও রাত্রিকালে তুমি নিজে রক্ষা করিবে।” বর্দ্ধমানক তাঁহার ভৃত্য।

ক্রমশঃ রাত্রি অধিক হইয়া উঠিল—সুতরাং বসন্তসেনা বাটী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন—চারুদত্ত নিজে সমভিব্যাহারী হইয়া তাহাকে বাটী পৌছাইয়া দিলেন। এই খানেই প্রথম অঙ্ক শেষ হইল।

চারুদত্তের বাড়ী হইতে আসিয়া অবধি বসন্তসেনা তাহার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগিনী হইয়া উঠিয়াছেন। এখন তিনি সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক, সখীদিগের সহিত অনেক সময়ে অসংলগ্ন বাক্যালাপ করিয়া থাকেন। এক কথা বলিতে অপর কথা বলেন—এক কাজ করিতে অপর কাজ করেন। মদনিকা তাহার প্রিয় পরিচারিণী—তাহার সাক্ষাতেই অনেক সময় চারুদত্তের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

উজ্জয়িনীর সভ্যতা এই সময়ে চরমসীমায় পদার্পণ করিয়াছিল—সমাজ বিশেষরূপে পরিপুষ্ট হইলে তাহাতে সভ্যতার আনুসঙ্গিক দোষগুণ অনেক আসিয়া জুটে; সুতরাং উজ্জয়িনীতে তৎকালে দ্যূতক্রীড়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। উজ্জয়িনী মধ্যে মাথুর একজন প্রধান আড্ডা গৃহধারী। একদিন এইরূপ ঘটিল—যে সংবাহক নামক এক ব্যক্তি দ্যূত ক্রীড়ায় পরাস্ত হইয়া পণের টাকা না দিয়া পলাইতেছে এবং মাথুর প্রভৃতি তাহাকে ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়াছে।

সংবাহক প্রাণ পণে দৌড়াইতে লাগিল; মাথুর প্রভৃতি তাহার পদ চিহ্ন ধরিয়া তাহার

অনুসরণ করিতে লাগিল। সংবাহক পথি মধ্যে এক দেবতা শূন্য দেব ভবন পাইয়া মনে মনে ভাবিল—আমি এই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেব স্থান অধিকার করিয়া তদ্রূপ দাঁড়াইয়া থাকি। ইহারা এ মন্দিরে প্রবেশ করিলেও আমাকে দেবতা জ্ঞান করিয়া চলিয়া যাইবে। সংবাহক যাহা ভাবিল তাহাই করিল;—সেই দেব মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রতিমার অনধিকৃত শূন্য স্থান অধিকার করিয়া দেবমূর্ত্তির ন্যায় স্থির নিশ্চল ভাবে দণ্ডায়মান রহিল।

দ্যূতাধ্যক্ষ সভিক (মাথুর) মন্দির সন্নিহিত হইয়া ভাবিল দুষ্ট সংবাহক নিশ্চয়ই এইখানে কোথাও লুকায়িত হইয়াছে। সে দেখিল মন্দিরের দিকে কতকগুলি পদচিহ্ন রহিয়াছে—ইহার দ্বারা কাহারও মন্দির প্রবেশ সূচিত হইতেছে। কিন্তু তদ্বিপরীতে আরও কতকগুলি পদচিহ্ন রহিয়াছে—তাহা দেখিলে বোধ হয়—কেহ যেন মন্দির হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। মাথুর ভাবিল ইহা দুষ্ট সংবাহকের দুষ্টতা ও চতুরতা। যাহা হউক মাথুর প্রভৃতি মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল দিব্য এক দেবমূর্ত্তি!! কিন্তু এই দেব শূন্য পরিত্যক্ত মন্দিরে দেবতা আসিল কোথা হইতে? প্রথমে তাহারা দেব মূর্ত্তিধারী সংবাহককে অনেক প্রকারে নাড়া চাড়া দিল—কিন্তু মূর্ত্তি তত্রাপি নিশ্চল দেখিয়া অবশেষে এই ভাবিয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিল—যে এই মূর্ত্তি যদি সত্যই সংবাহক হয় ত এইখানে বসিয়া দ্যূতক্রীড়া করিলে—দ্যূতলোলুপতা বশতঃ সে কখনও স্থির ভাবে থাকিতে পারিবে না। খেলা চলিতে লাগিল, এ বলে এইবার আমার খেলা—ও বলে আমার খেলা—এইরূপ একটা মহা কলরব উপস্থিত হইল। সংবাহক আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না—সহসা সেই শূন্য মন্দিরের দেবমূর্ত্তি নিজাধিকৃত স্থল ত্যাগ করিয়া "আমার খেলা আমারি খেলা" বলিয়া তাহাদের কাছে আসিয়া বসিল। আর যায় কোথায়? তাহারা সংবাহককে ধরিয়া টাকার জন্য মহা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, সংবাহকের হস্তে কপর্দ্দক মাত্র ছিল না—সুতরাং সে আত্ম বিক্রয় দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিতে স্বীকৃত হইল। সকলে প্রকাশ্য রাজপথে গেল—সংবাহক চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল ওগো, কে এমন ক্ষমতাপন্ন আছ—আসিয়া আমায় ক্রয় কর—কিন্তু কেহই তাহাকে ক্রয় করিতে আসিল না—তখন সে বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিল—"হায়! আর্য্য চারু দত্ত দরিদ্র হওয়াতেই আমার এইরূপ দুর্দ্দশা হইতেছে।"

প্রকাশ্য রাজপথে সংবাহককে লইয়া এই প্রকার উৎপীড়ন হইতেছে—এমন সময়ে দর্দ্দুরক নামক অন্য এক ধূর্ত্ত দ্যূতকর সেই ক্ষেত্রে উপনীত হইল। সে নিঃসম্বল সংবাহকের এপ্রকার দুর্দ্দশা আর সহ্য করিতে না পারিয়া সভিকের চক্ষে কৌশলে এক মুষ্টি ধূলি নিক্ষেপ করিয়া সংবাহককে পলাইতে ইঙ্গিত করিল।

এই সময়ে একটা জনপ্রবাদ উঠিয়াছিল "সিদ্ধ পুরুষে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন—উজ্জয়িনী-রাজ পালক শীঘ্রই রাজ্যচ্যুত হইবেন—এবং আর্য্যক নামে এক গোপ-পুত্র

রাজা হইবেন।" এই ভবিষ্যদ্বাণীর অনুসারে এবং পালকের অত্যাচার-ভয়ে ভীত হইয়া অনেকে সেই গোপপুত্র আর্য্যকের দলভুক্ত হইতেছিল—দর্দ্দুরকও মাথুরের সহিত বিবাদ করিয়া—রাজ দ্বারে শাস্তি এড়াইবার জন্য আর্য্যকের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

সংবাহক দর্দ্দুরকের সহায়তায় অবৈধ উপায়ে মুক্তিলাভ করিয়া রাজপথে ধাবিত হইয়া সমুখেই দেখিল এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা। ভাবিল ইহা কোন মহদ্ব্যক্তির হইবে— "আর্য্য! শরণাগত হইলাম" বলিয়া সে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। সে অট্টালিকা বসন্তসেনার। গৃহকর্ত্রীর কর্ণে সেই সময়ে সংবাহকের সভয় বাক্য প্রবেশ করিল, তিনি দাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"চেটি! শরণাগত নির্ভয় হউক, পার্শ্বদ্বার রুদ্ধ-কর।"

সংবাহক কক্ষমধ্যস্থ হইলে—বসন্তসেনা সাদরে শরণাগতকে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন—"তুমি কাহার ভয়ে এত ভীত হইতেছ।" সংবাহক সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলে—বসন্তসেনা দাসীকে দ্বার খুলিয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। তার পর বসন্ত-সেনা তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—সংবাহক বলিল—"পাটলিপুত্র নগরে আমার জন্মস্থান—আমি গৃহপতির (গৃহস্থ ?) পুত্র জীবিকার জন্য অঙ্গমর্দ্দন বৃত্তি শিক্ষা করিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম ইহাতেই সৎপথে থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব। আমি লোক মুখে উজ্জয়িনীর শোভা সৌন্দর্য্যাদির কথা শুনিয়া ব্যবসা চালাইবার জন্য এই স্থানে আসিয়াছিলাম—অদৃষ্ট ক্রমে এক মহাপুরুষেরও আশ্রয় লাভ ঘটিয়াছিল। তিনি অতিশয় সৌম্যাকৃতি সত্যবাদী ও প্রার্থনাধিক ধনদান করিয়াও স্বমুখে গৌরব প্রকাশ করেন না—অপরে অপকার করিলে তাহা ভুলিয়া যান্— অধিক কি বলিব—স্বীয় আত্মাকে পরকায় মনে করেন—এবং পুত্র নির্ব্বিশেষে শরণা-গতকে পালন করেন। কিন্তু হায়? সেই মহাত্মা এক্ষণে অপরিমিত দান করিয়া দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন—সুতরাং আমরা অনন্যোপায় হইয়া আশ্রয় হীন হইয়াছি।

এই অসীম গুণশালী নষ্টবিত্ত দাতা, চারুদত্ত ব্যতীত আর কেহই নহেন। বসন্ত সেনা সংবাহকের মুখে চারুদত্তের গুণাবলী ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া-প্রিয়জনের প্রতি অনু-রাগ বশতঃ ও সংবাহককে চারুদত্তের লোক বোধে তাহার যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন "আপনকারই এই গৃহ। চেটি, ইহাকে বসিতে আসন দাও—এবং ইহার নিকট তালবৃন্ত পরিচালন কর, ইহার সাতিশয় পরিশ্রম হইয়াছে।"

বসন্তসেনা চারুদত্তের গুণানুরাগিণী তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্তা—সুতরাং তাঁহার অনুগত সংবাহককে ঋণমুক্ত করিবার জন্য তিনি স্বীয় রত্নময় বলয় খুলিয়া দাসীর হস্তে দিলেন—এবং বলিয়া দিলেন—"দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া থাক ইহার উত্তমর্ণ-গণ আসিলে এই বলয় বিক্রয় দ্বারা ঋণ শোধ করিও। ঠিক সেই সময়ে মাথুর প্রভৃতি

সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া সংবাহকের অনুসন্ধান করায় চেটি তাহাদের বসন্তসেনা প্রদত্ত বলয় প্রদান করিয়া সংবাহককে ঋণ মুক্ত করিল। সংবাহক তখন অনুতপ্ত চিত্তে, বসন্ত সেনার নিকট বিদায় লইয়া দ্যূতক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৌদ্ধ সন্ন্যাস গ্রহণ করিল।

তৃতীয় অঙ্ক।

একদিন উজ্জয়িনীর কোন স্থলে চারুদত্তের সঙ্গীত শ্রবণের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল—রজনী দ্বিযাম উত্তীর্ণা হইয়াছে—রাজ পথে কুক্কুরেরা সুখে নিদ্রা যাইতেছে—পথ ঘাট জন শূন্য। কোলাহলের মধ্যে কেবল, নৈশ সমীরণের স্বন্ স্বন্ শব্দ ও ঝিল্লিরব। চারু-দত্ত একাকী নহেন—সঙ্গে আছেন চির সহচর মৈত্রেয়। চারুদত্ত দ্রুতপদে গৃহাভিমুখ হইয়াছেন—সঙ্গীত সভায় কে কেমন গাহিল, কাহার কণ্ঠ স্বর কিরূপ এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিতে করিতে উভয়ে রাজপথ অতিবাহিত করিয়া গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন ঘোর রাত্রি, সমস্ত প্রকৃতি সুষুপ্ত, নির্জীব ও স্পন্দহীন। চারুদত্ত ইতি-পূর্ব্বেই যথেষ্ট ক্লান্ত হইয়াছিলেন—রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া পাদপ্রক্ষালনাদি করিয়া শয়ন করিলেন। পূর্ব্বকার নিয়মানুসারে তাঁহার ভৃত্য বর্দ্ধমানক আসিয়া বসন্তসেনার রত্নময় অলঙ্কারপূর্ণ ভাণ্ড মৈত্রেয়কে অর্পণ করিল। বর্দ্ধমানক দিবসে এই ভাণ্ড রক্ষা করিত—রাত্রে তাহার রক্ষার ভার মৈত্রেয়ের উপর। প্রতি রাত্রে এই ন্যস্ত-বস্তু রক্ষণে মৈত্রেয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন—ইহার জন্য তাঁহার রাত্রে সুনিদ্রা হইত না এই জন্য তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে বলিয়া উঠিলেন—"আঃ ইহা অদ্যাপি রহিয়াছে? এই উজ্জয়িনীতে কি চৌরও নাই—যে এই নিদ্রা নিবাতক সুবর্ণ ভাণ্ডকে অপহরণ করে!"

মৈত্রেয়ের অভিসম্পাত সেই রজনীতে সফল হইল। সর্ব্বিলক নামক এক ব্রাহ্মণ কুমার দ্যূতে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অর্থাভাব নিবন্ধন চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। শুধু অবলম্বন নহে—ইহাতে বিশেষ ক্ষিপ্রহস্ত ও কর্ম্মঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সর্ব্বিলক কি প্রকার পাকাচোর, পাঠক পরে এ বিষয়ের বিশেষ পরিচয় পাইবেন।

মৈত্রেয়, রত্ন ভাণ্ড কুক্ষিগত করিয়া নিদ্রিত হইলে সর্ব্বিলক খণিত সন্ধি দ্বারা গৃহ প্রবেশ করিল এবং ঘোর নিদ্রাভিভূত মৈত্রেয়ের ক্রোড়দেশ-ন্যস্ত রত্ন ভাণ্ড লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

সর্ব্বিলক প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরেই চারুদত্তের দাসী রদনিকার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে সন্ধিপথে গৃহমধ্যে আলোক আসিতেছে দেখিয়া সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—"আর্য্য! মৈত্রেয়, উঠ উঠ, আমাদের গৃহে সিঁধ কাটিয়া চোর আসিয়াছে।" হাঁকাহাঁকিতে সকলে উঠিলেন। মৈত্রেয় বলিলেন—চোরটা নিশ্চয়ই সন্ধি খনন-শিক্ষার্থী;

সে হাতেকলমে কাজ শিখিবার জন্যই এইরূপ করিয়াছে। নতুবা আমরা ধনহীন একথা উজ্জয়িনীর মধ্যে কে না জানে?"

চারুদত্তও এই বাক্যের পোষকতা করিয়া বলিলেন—"যা ভাবিয়াছ তাহাই ঠিক। তবে লোকটা কিন্তু এ দেশী নয়—আমি দরিদ্র—নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতেছি—ইহা হয়ত সে জানিত না—কিন্তু মদীয় ভবনের আয়তন বিস্তৃতি দেখিয়া অপরিমিত ধন প্রাপ্তির আশায় অতিশয় পরিশ্রমে সন্ধি খনন করিয়াছে এবং পরিশেষে নিতান্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ও নিরাশ হইয়া গিয়াছে। আহা! সে বন্ধুগণের নিকট গিয়া কি বলিবে?"

মৈত্রেয় চারুদত্তের এই অসাধারণ উদারতা দেখিয়া বলিল "মহাশয়, চোর বিমুখ হইয়া গিয়াছে—বলিয়া এত দুঃখ করিতেছেন কেন? সে বাটী খুব বড় দেখিয়া ভাবিয়াছিল, অনেক স্বর্ণ রৌপ্য ভাণ্ড মিলিবে—" এই কথা বলিবার পরই তাহার মনে স্বর্ণ ভাণ্ডের কথা উদিত হইল—সে শ্লাঘার সহিত বলিল,—মহাশয় আপনি বলেন—মৈত্রেয় বড় মূর্খ—কিন্তু আমি বসন্তসেনার রক্ষিত সুবর্ণভাণ্ড আপনার হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া বিশেষ বুদ্ধিমানের কার্য্যই করিয়াছি; তাহা না করিলে—এই দাসী পুত্র পাপিষ্ঠ চোর নিশ্চয়ই তাহা চুরি করিয়া লইয়া যাইত। আমরা এখন দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি—রত্ন ভাণ্ড চোরের হস্তগত হইলে তাহার অধিকারিণীর ক্ষতিপূরণ করা আমাদের পক্ষে অতিশয় দুর্ঘট হইয়া পড়িত।"

মৈত্রেয় তাঁহাকে বসন্তসেনার রত্নভাণ্ড প্রত্যর্পণ করিয়াছে এই কথা শুনিয়া চারুদত্ত যার পর নাই আশ্চর্য্য হইলেন। বস্তুতঃ তিনি তাহা পান নাই। যে দিন বাড়ীতে সিঁধ হয়—সেই দিন রাত্রে মৈত্রেয় স্বপ্নের ঘোরে চারুদত্তকে উল্লিখিত রত্নভাণ্ড রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিল। সেই স্বপ্নের ছায়া এখনও অলক্ষ্যভাবে তাহার মনে ঘুরিতেছিল, তাই সে মনের বিশ্বাসে ঐ কথা বলিল। কিন্তু চারুদত্ত প্রকৃত পক্ষে তাহা পান নাই—সুতরাং তিনি ভাবিলেন মৈত্রেয় স্বভাবসিদ্ধ রহস্যপটুতা গুণে তাঁহাদের পরিহাস করিতেছে—কিন্তু যখন সে পুনঃ পুনঃ পরিহাসের কথা অস্বীকার করিল, তখন রত্নভাণ্ড যে চোর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে তদ্বিষয়ে চারুদত্তের আর কোন সন্দেহ রহিল না। চোর যে রিক্ত হস্তে তাঁহার বাটী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই স্বাভাবিক উদারতা বশে, এই চিন্তাতে ও তাহার মন প্রফুল্ল হইল কিন্তু সেই রত্নালঙ্কার তাঁহার নিজের সম্পত্তি নহে, পরের গচ্ছিত ধন মাত্র এই কথা তাঁহার স্মরণ পথে উদিত হওয়াতে তিনি অধিকতর বিমর্ষ হইলেন।

তিনি মৈত্রেয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বয়স্য! বসন্তসেনার বস্তু চোরে লইয়াছে ইহা বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না—সকলে আমাকে কেবল নীচ ব্যক্তির ন্যায় তুচ্ছ বোধ করিবে। দারিদ্রতার কোন গুণ নাই—অথচ ইহা নানা প্রকার

শঙ্কার আস্পদ। হায়! কি কষ্ট! অর্থ গিয়াছে তাহাতে আমি তিলমাত্র দুঃখিত নই—কিন্তু ইহাতে আমার অমূল্য চরিত্রধন দূষিত হইল।" মৈত্রেয় বন্ধুর বাক্যে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন—"আপনি এত ভয় করিতেছেন কেন? কে দিয়াছে? কে লইয়াছে? আর কোন ব্যক্তিই বা সাক্ষী আছে? এই কথা বলিয়া আমি সমস্তই অপলাপ করিব।" কিন্তু চারুদত্তের ধর্ম্ম প্রবলতা তখনও তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সহিত অন্তর্হিত হয় নাই। তিনি বলিলেন "বয়স্য! তবে কি আমি মিথ্যা বলিব? গচ্ছিত বস্তুর পরিশোধার্থ বরং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিব—তথাপি চরিত্র নাশিনী মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না।"

চারুদত্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন ইতিমধ্যে মৈত্রেয় অন্তঃপুরে গিয়া ধূতা দেবীর নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। ধূতা পতিগত প্রাণা, বিশুদ্ধ চরিত্রা আর্য্য মহিলা—সিংহের সিংহিনী, উপযুক্ত স্বামীর যোগ্য সহধর্ম্মিণী, চোরের কথা বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবেনা—ইহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল—তিনি স্বীয়মাতৃ গৃহে লব্ধ একছড়া রত্নাবলী বিক্রয় দ্বারা স্বামীর চরিত্র দুর্ণাম হইতে রক্ষা করিতে কৃত সংকল্প হইলেন। কিন্তু ভাবিলেন চারুদত্ত হৃতসর্ব্বস্ব হইলেও আত্মমর্য্যাদা ও অভিমান তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই, আমার প্রদত্ত রত্ন মালা তিনি অভিমান বশে গ্রহণ না করিলেও করিতে পারেন। এই ভাবিয়া মৈত্রেয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আমি রত্নষষ্ঠী ব্রত করিয়াছিলাম, তাহাতে বিভবানুসারে ব্রাহ্মণকে কিছু দান করিতে হয়—আমি এ পর্য্যন্ত কাহারেও কিছু দিই নাই—এ জন্য এই রত্নাবলী দিতেছি আপনি গ্রহণ করুন।" মৈত্রেয় এ প্রকার প্রস্তাবনার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া সাদরে সেই রত্নমালা গ্রহণ করিয়া চারুদত্তের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই রত্নাবলী দেখাইলেন—চারুদত্ত সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মিত্র! একি?" মৈত্রেয় বলিলেন—"ইহা উপযুক্ত দারপরিগ্রহের ফল!!" চারুদত্ত এই উত্তরে অতিশয় মর্ম্ম পীড়িত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"হায়! যে পুরুষ দুর্ভাগ্যবশতঃ আপন ধন হারাইয়া স্ত্রীর দত্ত ধনে প্রতিপালিত ও বিপদ হইতে মুক্ত হয় সেই পুরুষই যথার্থ স্ত্রী, আর যে স্ত্রী স্বামীর দুঃসময়ে—অকাতরে ধনদান করে সেই স্ত্রীই যথার্থ পুরুষ। মৈত্রেয়, তুমি এই রত্নাবলী লইয়া বসন্তসেনার নিকটে যাও, তাঁহাকে ইহা প্রদান করিয়া বলিও বুদ্ধি-দোষে দ্যূত ক্রীড়ায় আপনার গচ্ছিত স্বর্ণালঙ্কার সমস্ত হারাইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে এই রত্নাবলী গ্রহণ করুন।" মৈত্রেয় বিনা বাক্যব্যয়ে চারুদত্তের আদেশ পালন করিতে গমন করিল।

এইরূপে সন্ধিচ্ছেদ নামক তৃতীয় অঙ্ক শেষ হইল।

চতুর্থ অঙ্কে—বসন্তসেনা চারুদত্তের আলেখ্য দর্শন করিতেছেন—কাছে দাসী মদনিকা বসিয়া আছে—বসন্তসেনা মদনিকাকে বলিলেন—"হঞ্জে মঅনিত্র অবি সুসদিসী

ইয়ং চিত্তাকিদী অজ্জ চারুদত্তস্য” (কেমন এই চিত্রাকৃতি আর্য্য চারুদত্তের সুসদৃশী হইয়াছে কি না) মদনিকা উত্তর করিল—“ঠিকই হইয়াছে—”

“তুমি কি করিয়া জানিলে ?”

“যেহেতু ইহার উপর আপনকার সস্নেহ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে।”

এই প্রকার উত্তরে বসন্তসেনা বড় সন্তুষ্ট হইলেন না,—তাঁহার বিশ্বাস—চারুদত্তের সৌম্য মূর্ত্তির চিত্র, পার্থিব বর্ণ দ্বারা প্রতিফলিত করা মানব চিত্রকরের পক্ষে অতি অসম্ভব কার্য্য। স্বভাবের হস্ত, পরমেশ্বরের হস্ত যে কমনীয় সজীব চিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সামান্য মনুষ্য তুলিকা ধরিয়া বর্ণ সমাবেশ দ্বারা তাহার কি অনুকরণ করিবে ? বস্তুতঃ প্রণয়ের এইরূপ উন্মাদিনী শক্তিই বটে ? ?

তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে আর এক দাসী আসিয়া বসন্তসেনাকে বলিল—“আর্য্যে ! মাতা আদেশ করিয়াছেন চতুর্দ্দিকে বস্ত্রাবৃত কর্ণীরথ * খিড়কী দ্বারে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। বসন্তসেনা মনে করিয়াছিলেন, চারুদত্ত তাঁহাকে আনিবার জন্য রথ পাঠাইয়াছেন কিন্তু যখন তিনি জানিলেন রাজ শ্যালক সংস্থানক (শকার) উক্ত যান ও দশ সহস্র মুদ্রা মূল্যের অলঙ্কার পাঠাইয়াছেন—তখন ক্রোধে অধীর হইয়া দাসীকে দূর করিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণকুমার সর্ব্বিলক বসন্তসেনার দাসী মদনিকার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল—সে এক্ষণে ঘটনা ক্রমে মদনিকার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বসন্তসেনার গৃহে উপস্থিত হইল। নিষ্ক্রয় দানে বসন্তসেনার দাসীত্ব হইতে মদনিকাকে বিমুক্ত করিবার জন্যই সর্ব্বিলক নিশাযোগে চারুদত্তের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিল। সে মদনিকাকে বলিল “দেখ ! এই সমস্ত বহুমূল্য অলঙ্কার তোমার জন্য বিষম সাহসে সংগ্রহ করিয়াছি তুমি আর্য্যা বসন্তসেনাকে গিয়া বল—যে এই সমস্ত অলঙ্কার তাঁহার জন্য প্রস্তুত করান হইয়াছে।” অলঙ্কার দেখিয়া—সেই সমুদায় যে বসন্তসেনার সম্পত্তি—তাহা আর মদনিকার বুঝিতে বাকি রহিল না। এই সমস্ত অলঙ্কার চারুদত্তের নিকট গচ্ছিত ছিল—বসন্তসেনা চারুদত্তের দরিদ্রতা দেখিয়া দয়াপরতন্ত্র হইয়া—গচ্ছিতচ্ছলে তাঁহাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন—কিন্তু চারুদত্ত সেরূপ প্রকৃতির লোক নহেন—বলিয়াই তাহা নিজ ব্যবহারে প্রয়োগ করেন নাই। মদনিকা অলঙ্কার ঘটিত সমস্ত কথা সর্ব্বিলককে প্রকাশ করিয়া বলিয়া পরিশেষে কহিল—“এক কাজ কর তাহাতে সব দিকই রক্ষা হইবে—তুমি আর্য্যা বসন্তসেনার নিকট এই অলঙ্কারগুলি লইয়া গিয়া বল—আর্য্য চারুদত্ত তাহার গচ্ছিত অলঙ্কারগুলি আমার দ্বারা পাঠাইয়াছেন। তাহাতে সব দিকই রক্ষা হইবে।

* স্ত্রীলোকদিগের জন্য বস্ত্রাবৃত গো শকট।

ইতিপূর্ব্বে বসন্তসেনা মদনিকাকে তালবৃন্ত আনিতে পাঠাইয়াছিলেন, আনিতে বিলম্ব দেখিয়া নিজে অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া দেখিলেন—সর্ব্বিলক ও মদনিকা নিভৃতে অস্ফুটস্বরে কথোপকথন করিতেছে—মধ্যে মধ্যে তাঁহারও নাম উচ্চারিত হইতেছে। তিনি কৌতূহলপরবশ হইয়া তাহাদের কথোপকথন আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন এবং স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন তাহারা পরস্পর দৃঢ় প্রণয়াসক্ত হইয়াছে। ইহার পর মদনিকা সর্ব্বিলকের আগমন সংবাদ দিবার নিমিত্ত তাহার নিকট উপনীত হইল। পাখা আনিতে গিয়া দেরী করিয়াছে সুতরাং মদনিকার মনে বড় ভয় হইয়াছিল—সে ভাবিল—বসন্তসেনার কাছে চারুদত্তের নাম অমোঘ ইন্দ্রজাল সুতরাং বলিল "আর্য্যে! আর্য্য চারুদত্তের নিকট হইতে এক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন—"

"সে চারুদত্তের লোক তাহা তুমি কি প্রকারে জানিলে?

"আমি কি আত্মীয় লোক চিনিতে পারি না?"

"বসন্তসেনা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন"—হাঁ! তাই বটে অবশ্যই চিনিতে পার—এখন তাহাকে লইয়া আইস।"

ইতিহাস।

কোম্ত বলেন চিন্তার তিনটি অবস্থা আছে। মনুষ্যের মন পর পর যথা নিয়মে সেই তিনটি পৃথক অবস্থায় পরিণত হয়। আমাদের সকল চিন্তায়, সকল জ্ঞানেই বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তিনি এই তিন অবস্থাকে আধিদৈবিক (Theological), আধ্যাত্মিক (Metaphysical), ও বৈজ্ঞানিক (Positive, Scientific) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের সকল আলোচনারই পরপর এই তিনটী বিভিন্ন গ্রাম বা সোপান আছে। প্রথমাবস্থায় আমরা জগতীয় যাবতীয় ব্যাপার আত্মবৎ কোন উচ্চপ্রকৃতির ইচ্ছাপ্রসূত কার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন করি। দ্বিতীয়াবস্থায় সূক্ষ্ম-প্রকৃতি বা সবিশেষ শক্তি দ্বারায় সকল ঘটনারই ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। তৃতীয়াবস্থায় সাদৃশ্য ও পারম্পার্য্যের নিয়মাদি লইয়াই জগতের ব্যাখ্যা। চন্দ্র উঠিতেছে, নদী ছুটিতেছে, ফুল ফুটিতেছে, বৃষ্টি পড়িতেছে, কেন না আমাদের মত দৃষ্ট বস্তুরও প্রাণ আছে, মন আছে, ইচ্ছা আছে, তাই তাহারা এইরূপ করিতেছে; বা দৃষ্ট বস্তুর অন্তর্গত কোন ইচ্ছাময় আত্মা আছে যাহাতে এইরূপ করাইতেছে; অথবা দৃষ্টবস্তু ছায়াবাজীর মত আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছে; বাজীকর প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া এইরূপ কৌতুক করিতেছেন। জ্ঞানের প্রথমাবস্থা এই। তৎপরে আমরা সকল দৃশ্যেরই স্বতঃ কোন

বিশিষ্ট গুণ বা শক্তি স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। যেন সেই অন্তর্গত গুণ, সত্ত্ব বা শক্তিতে এ প্রকার হইতেছে। জ্ঞানের দ্বিতীয় অবস্থা এই রূপ। বৈজ্ঞানিক অবস্থায় বজ্রকে আর দেবক্রোধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করে না; তাহার নিয়মাদি স্থির করিয়াই ক্ষান্ত থাকে। এইটী প্রকৃত উচ্চাবস্থা।

এক্ষণে দেখা কর্ত্তব্য ইতিহাস সম্বন্ধে উক্ত নিয়ম কেমন সুযোগ্য। বস্তুতঃ কোম্তের নিয়মানুসরণ করিয়া ইতিহাস আলোচনা করিলে বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়। প্রথমতঃ রাজ্যবিপ্লব ও সমাজবিপ্লবের কথা দূরে থাকুক, সামান্য ব্যক্তিগত ঘটনাও দেবদৈত্যের কার্য্য বলিয়া মীমাংসিত হইত। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকে সময়ের তিনটি বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন ও ভগ্নাংশ বলিয়া ধারণা ছিল। ইতিহাস তখন তপোবল বা ধ্যানসিদ্ধ ব্যাপার ছিল; ইতিবেত্তা দেবতাজ্ঞানিত লোক। তখন ইতিহাস অনেক সময় পূর্ববর্ত্তী ও ঘটনা পরবর্ত্তী বিষয় বলিয়া জানা ছিল। কথিত আছে কেহ কেহ শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঘটনা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়া পত্রস্থ করিয়াছেন। রামের ষষ্টি হাজার বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ বিরচিত। ঘটনার যত পূর্ব্বে ইতিহাস প্রণীত, সত্য পক্ষে তাহা ততই প্রামাণ্য, ফলে এ প্রকার ভবিষদ্ জ্ঞান বৈজ্ঞানিক অনুমানপ্রসূত নহে। ইহা ধ্যানগত ব্যাপার—সহজে আর কাহারও বুঝিবার সামর্থ্য নাই। ইতিহাস এ অবস্থায় কয়েকজন মহাপুরুষের জীবনী মাত্র ছিল। ভূলোক ও স্বর্গলোকের যাঁহারা মুখবন্ধ ছিলেন এবং অদৃষ্ট ও দৃষ্ট জগতে ঘটকালি করিতেন তাঁহারাই ঐতিহাসিক বিষয় ছিলেন। তখন কয়েকজন ঋষি, যোগী, যোদ্ধা, রাজা, কবি প্র ভৃতির চরিত্যাখ্যা লইয়াই ইতিহাস ব্যতিব্যস্ত ছিল। আপামর সাধারণ মনুষ্য-সমুদ্রকে তুচ্ছ জ্ঞানে অবজ্ঞা করিত। দ্বিতীয়াবস্থায় মনুষ্যের ভিন্ন ও অপেক্ষাকৃত উন্নত ব্যাখ্যা আরম্ভ হইল। এখন সমগ্র মনুষ্যজাতিকে নিখিল সংসার পরিবৃত ভূবায়ুর ন্যায় বিবেচনা হইল এবং দিক্‌পাল, নরপাল প্রভৃতি পতঙ্গের মত সেই অনন্ত বিস্তারে এই ভাসিতেছে, এই ডুবিতেছে, এই খেলিতেছে, এই পড়িতেছে, এই আছে, এই নাই, এই ভাসিয়া আসিল, এই ভাসিয়া কোথায় চলিয়া গেল। এখন মনুষ্যের কার্য্যকলাপের বিস্তর বিভিন্ন কারণ প্রদর্শিত হইল। দেবদেবী এবার আত্মা, শক্তি, ধর্ম্ম, স্বভাব, প্রভৃতিতে পরিণত হইল। মানুষ মানুষে সমান এই ধারণাটি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। এরূপ সমতা কল্পনা মাত্র—দৃষ্টের অনুমান নহে। রুসোর আদিম অবস্থা আর একটি উপমা। তৃতীয়াবস্থায় ইতিহাস নূতন ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছে। নূতন পুরাতনে, বর্ত্তমান অতীতে, উপস্থিত অনুপস্থিতে সংযোজনা করা ইতিহাসের প্রধান অনুশীলন হইয়া উঠিয়াছে। এমন একটি সামান্য প্রথাও নাই যাঁহার সূত্রপাত পূর্ব্ববিবরণে নাই। অতীতের ভীষণ ছায়াময়ী মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান সময়সমুদ্রে কার্য্যোর্ম্মি দিবানিশি ছুটিতেছে। বর্ত্তমান রীতি, নীতি, প্রকৃতির আদিবাসস্থানে আলোক লইয়া যাইতেছে এবং সেই সকল তমসাচ্ছন্ন দূর গহ্বরে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের উজ্জ্বল প্রতিভায়

প্রফুল্ল করিয়া তুলিতেছে। এক্ষণে কোন ঐতিহাসিক সামান্যপাত মনুষ্যপ্রকৃতির পরিচায়ক না হইলে অগ্রাহ্য। জন্মজন্মান্তরে কর্ম্ম ভ্রমিতেছে। পরপুরুষের উপর পূর্ব্ব-পুরুষের অধিকার ভয়ানক। জাতিগত ধর্ম্ম অতি সামান্য ফলদ। মানুষের অবস্থার কার্য্যপ্রতিকার্য্যের সংখ্যা এত অধিক যে প্রতি পরবর্ত্তী সময়ে তাহার মৌলিক নিয়মাদি নিরূপণ করা সুকঠিন। কিন্তু যদি সেই কার্য্যকলাপ মধ্যে কোন ঐক্য, বা পারস্পার্য্য না থাকে তাহা হইলে সমাজ বিজ্ঞান অসম্ভব। জগৎ সংসার প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মনুষ্য জগৎ অতি ভয়ানক পরিবর্ত্তনশীল। আমরা বলিতে পারি কোন নূতন কারণ উপস্থিত হইলে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় কি পরিবর্ত্তন হইতে পারে। এস্থলে সমাজ স্থির ও অচল বলিয়া ধরিয়া লই। কার্য্যকল্পে ইহা অন্যায্য নহে। সুতরাং ইতিহাস সামাজিক নিয়ম নিরূপণ করিবার একমাত্র সহকার।

বৈজ্ঞানিক অবস্থায় ইতিহাসের আবার তিনটি মূর্ত্তি দেখা যায়। বর্ত্তমান জ্ঞান, বিশ্বাস, ধারণা, প্রভৃতি অতীতে আরোপ করা একটির লক্ষণ। বর্ত্তমানের ওজনে প্রাচীনের ওজন। বর্ত্তমানে যাহা অনুবাদিত না হইবে, বর্ত্তমানে যাহার পরিবর্ত্তে কিছু না থাকিবে, তাহার কোন অস্তিত্বই নাই। ব্যোমজান ব্যতীত পুষ্পক (বিমান) নাই; কামান ব্যতীত অগ্নিবাণ নাই, তাড়িৎ ব্যতীত কবচ নাই, সুরা ব্যতীত সুধা নাই। এই মতে বর্ত্তমানের কেবল তারিখ পরিবর্ত্তন করিয়া পুর্ব্বপুরুষগণকে প্রতিবাসী করিয়া তুলার নামই ইতিহাস। যিনি নাস্তিক তিনি যীশুকে দেখিতে পাইলেন না, যীশুর পরিবর্ত্তে টমাস পেন্ বা ভলটেয়ারকে তদধিকৃত সিংহাসন দিলেন, কিম্বা প্রকারান্তরে বলিলেন যীশু নাস্তিক ছিলেন। যিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী তিনি বেদে বাইবেল দেখিতে পাইলেন; তিনি হয়তো বলিলেন শাক্যসিংহ যীশুর ভক্ত। যিনি বৈষ্ণব তিনি কপিলের অস্তিত্বই স্বীকার করিলেন না। তিনি সর্ব্বত্র চৈতন্য মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। ইতিহাস এ অবস্থায় বালকের খেলানা ছিল। মনুষ্যের রীতি, নীতি, প্রবৃত্তি, চিন্তা, অভিপ্রায়, প্রথা, কথা, কার্য্য, ভাব, প্রভৃতি আরোপ করিয়া পুত্তলি খেলা করা হইত। কিন্তু তদন্তর ইতিহাস বাস্তব হইয়াছে, অর্থাৎ ইহার ছবিগুলি কতকটা মানুষের মত দেখা যায়, দেবতা, দৈত্য, রাক্ষস বা পুত্তলি নহে।

দ্বিতীয়াবস্থায় ইতিহাসের দিগন্তর গতি সম্পূর্ণ বিপরীত। এক্ষণে আর কার্য্যকলাপ বর্ত্তমানের চক্ষে দেখা হয় না। অতীতের চক্ষে অতীত আলোচনা করাই ন্যায্য। অতীতের অবিকল জীবন্ত মূর্ত্তি অতীতের অবস্থায় ও লক্ষণে মাখা দেখিতে চায়। এ অবস্থায় কবির কল্পনার আবশ্যক। প্রাচীনের অবয়বীমূর্ত্তি কল্পনায় পুনর্জীবিত করিতে হইবে। গত বিষয়ের ভগ্নাবশেষ হইতে অতীতের পূর্ণমূর্ত্তি আবির্ভাব করিতে হইবে। কোন একটি বিশেষ ঘটনা হইতে সাধারণ অলিখিত বিষয় অনুমান করিবার ক্ষমতা চাহি। লেখক সত্যভীত ও ধর্ম্মপরায়ণ হইবেন, অথচ তাঁহার ঐতিহাসিক নবন্যাস লেখার প্রতিভা থাকিবে।

সামান্য বিষয়ের অর্থ ও তাৎপর্য্য নির্ণয়ের শক্তির আবশ্যক। নতুবা বিগত সমাজের মৌলিক তত্ত্ব কিরূপে পাওয়া যাইবে? সুতরাং যে সময়ের ইতিহাস সেই সময়ের চক্ষে দেখা আবশ্যক। ভূতকে বর্ত্তমান করা এবং ভবিষ্যৎকে সম্মুখে আনা ইহার প্রধান কার্য্য। অনুমান ও কল্পনা ইহার ন্যায্য অস্ত্র। বিগত, অদৃষ্ট ও অজ্ঞাত বিষয়কে ইঙ্গিত মাত্র বর্ত্তমান, দৃষ্ট ও জ্ঞাত প্রকরণে জীবন দান করিতে হইবে। বিন্দুবিসর্গ হইতে সময় ভাণ্ডারের সশরীরী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে হইবে। সামান্য বিষয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া কার্য্য-কারণশৃঙ্খল সাজাইয়া হারান গ্রন্থি যোজনা করিতে হইবে। ইহাতে প্রকৃত নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের ক্ষমতা চাই।

তৃতীয়াবস্থায় ইতিহাসের কার্য্য মনোহর। ইহা মনুষ্যজগতের ব্যাখ্যা। মানুষের যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে, মানুষ যে সকল অবস্থায় পড়িয়াছে, এ সকলের কারণ ও নিয়মাদি অনুশীলনই ইহার কার্য্য। ইতিহাস একটী বর্দ্ধনশীল মনুষ্য-জগতের কার্য্য-কারণের শৃঙ্খল। মনুষ্যের একখানি সুবিশাল মানচিত্র যেন ক্রমান্বয় খুলিতেছে এবং প্রত্যেক নূতন অংশ যাহা দৃষ্ট হইতেছে—তাহা পূর্ব্বকার দৃষ্ট অংশের বৃদ্ধি মাত্র। এক সময়ের ঘটনাবলি পূর্ব্বকালের ঘটনাবলির ফল এবং পরবর্ত্তী ঘটনাবলির কারণ। এই সকল ঘটনাবলির নিশ্চয়ই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে। কিন্তু সেই নিয়ম কিরূপে আলোচনা করিতে হইবে, ইতিহাস তাহাই মীমাংসা করে। অন্তর্জগতের ও বহির্জগতের সম্বন্ধ নিরূপণ, মানসিক ও সামাজিক নিয়ম নিরাকরণ, মনুষ্য সংসারের পরিবর্ত্তনের কারণ নির্দ্দেশ, এবং বর্ত্তমান কার্য্য প্রণালী দ্বারা ভাবী অবস্থা অনুমান করাই ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। গিজো, বাকল, প্রভৃতির মতে এইরূপ ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের সম্ভব। তাঁহারা সময়কে নিজ ইতিহাস বলিতে দিয়াছেন। শুষ্ক কঙ্কাল মালায় পূর্ণজীবন সঞ্চার করিয়াছেন। শুদ্ধ আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কি ছিলেন তাহাতেই ইতিহাস সমাপ্ত করেন নাই। তাঁহারা কি প্রকারে ঐরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহার মীমাংসায় তৎপর হইয়াছেন। কিসে কোন্ সামাজিক অবস্থা বিশেষরূপ ধারণ করিল,কেন একটী বিশিষ্ট প্রথা কোন দেশে কোন সময়ে স্থান পাইল, এক জাতির রীতি, নীতি, চরিত্র কেন আর একজাতি হইতে পৃথক হইল, সভ্যতার উপাদান কি, জাতীয় উন্নতি কিসে, অবনতির কারণই বা কি,তাঁহারা এই সকল আলোচনাতেই নিবিষ্ট। বিবরণ ভাগ তাঁহাদের মতে ইতিহাসের সার নহে। তবে তাহাতেও রস আছে। বৈজ্ঞানিক নিয়ম নিরাকরণের সহকার না হইলে সে রসে নবন্যাসের অপেক্ষা অধিক আদর নাই। তাঁহারা প্রায় অনেক স্থলে হেতুবাদে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। মনুষ্য-স্বভাবে তাঁহাদের বিশেষ প্রবেশ আছে। নেপলিয়ন ইতিহাসকে প্রচলিত গল্প বলিতেন। বস্তুতঃ পূর্ব্বে প্রায় তাহাই ছিল। এক্ষণে উহা বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হইয়াছে। মানুষের কোন কর্ম্মই দৈব হয় না। ভৌতিক ঘটনার মত সামাজিক ব্যাপারের বা

সামাজিক দৃশ্যের নিয়ম আছে। ইতিহাস সেই বৰ্দ্ধনশীল কার্য্যকারণমালা অনুসরণ করে। . প্রত্যেক ঘটনা অতীতের বৃদ্ধি মাত্র। বর্ত্তমান ভূতের ক্রমবিকাশ। পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা পরবর্ত্তী অবস্থার প্রতিকারণ। বিষয় অস্থিপঞ্জর—নিয়ম প্রাণ। কে কেমন ছিল জানিবার তত আবশ্যক নাই। কিসে হইল জানাই প্রকৃত জ্ঞান। সাধারণ্যে বিষয়ের ব্যাখ্যা।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাস হয় কি না। অবস্থার ঐক্য না হইলে নিয়মাবিষ্কারের সম্ভাবনা কোথায়? আর বস্তুতঃ ইতিহাসে দর্শন অতিসামান্য; পরীক্ষার তো কথাই নাই। দর্শন ও পরীক্ষা বিজ্ঞানের প্রাণ। অচেতন পদার্থের ইচ্ছা-বৃত্তি নাই, সুতরাং পরিবর্ত্তনের আশঙ্কা অতি সামান্য; তত্রাচ এস্থলে দর্শনেরও অনেক ভ্রম আছে। কিন্তু জীবন-তত্ত্বেও সমাজ সন্দর্শনে সে ভ্রমের সহস্রগুণ সম্ভাবনা। অশেষ পরিবর্ত্তনশীল সমুদ্রে সত্য প্রায়ই পাওয়া যায় না। তদুপরি বর্ণনার ভ্রান্তি আছে। অন্য পদার্থের উল্লেখ ব্যতীত আমরা কোন পদার্থ ই বর্ণনা করিতে পারি না। দৃষ্ট পদার্থ একটী; বর্ণনায় কত পদার্থই আসিয়া পড়ে, এবং তদ্ব্যতীত বর্ণনাও হয় না। সুতরাং ভ্রান্তির সম্ভাবনা বিস্তর। কিন্তু তত্রাচ ইতিহাস বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচ্য হইতে পারে। ইহাতে দর্শন এবং পরীক্ষাও আছে। অবশ্য পদার্থবিদ্যার মত অধিক নাই বটে। নীতিকারেরা প্রত্যহই পরীক্ষা করিয়া থাকেন। গত সময়ের ভুলভ্রান্তিতেও পরীক্ষার ফল আছে।) ফরাশীর রাষ্ট্রবিপ্লব একটী উচ্চদরের পরীক্ষার নিদর্শন। আমরা কোন জাতির ভাবী অবস্থা জ্যোতিষের গণনার ন্যায় নিশ্চয় বলিতে পারিনা, কিন্তু তাহা নিয়ম দোষে নহে—হেতুবাদে (data)। ফলে ইতিহাসের সত্য মানসিক নিয়মে পরীক্ষিত হইবে।

ইমার্সন বলেন যাঁহার প্রতি অসংখ্য লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি, তিনি সেই সকল লোকের পূর্ণমূর্ত্তি। নেপলিয়নকে যদি ফ্রান্স বলা যায়—নেপলিয়নকে যদি ইউরোপ বলা যায় তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল লোকের উপর তাঁহার আধিপত্য ছিল তাহারাও ক্ষুদ্র নেপলিয়ন। সকল জ্ঞান ই আদৌ ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত জ্ঞান ক্রমে সাধারণে পরিণত হয়। পুনশ্চ সাধারণ জ্ঞানও ক্রমান্বয় ব্যক্তিগত জ্ঞানে পরীক্ষিত হইতে থাকে। জীবনী ইতিহাসের ভিত্তি; এবং ঐতিহাসিক নিয়মও জীবনীতে পরীক্ষিত হয়। কিন্তু জাতীয় চরিত্র জীবনীতে নাই। জীবনী জাতীয় চরিত্রের বর্দ্ধিত বা অতিরঞ্জিত মূর্ত্তি।

ইতিহাস এক্ষণে আমাদের প্রকৃত ব্রহ্ম-অস্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। ইতিহাস ব্যতীত অতীত নাই—বর্ত্তমানের ব্যাখ্যা নাই—ভবিষ্যতের কাণ্ডারী নাই—কোন কার্য্য সুসিদ্ধির উপায় নাই। বীরতায় নেপলিয়ন বা ওয়াসিংটন্ আমাদের আরাধ্য; দর্শনে কপিল, কোম্ত; বিজ্ঞানে আমরা নিউটন্, গেলেলি, ডার্ব্বিন, প্রভৃতির পদাঙ্ক অনুগমন করি; অধ্যবসায় ও কার্য্যকারিতায় ভলটেয়র, রুসো, টমস্ পেনের নাম করিয়া

থাকি। ফলে ইতিহাসে বর্ত্তমানের ব্যাখ্যাও নাই—ভবিষ্যতের পরিচালনাও নাই। ইতিহাসের ভোজবিদ্যায় গত, বিস্মৃত সময়সমুদ্র হইতে লুক্কায়িত রত্ন উদ্ধার করত কার্য্য-কারণের হার গ্রথিত করিয়া আমাদের সম্মুখে উপনীত করে; মূর্ত্তিমান অতীত আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়; ভবিষ্যৎ দ্রুতপদে সসজ্জিত হইয়া আসিয়া বর্ত্তমানকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করে। সময়ের পার্থক্য ভাব সরিয়া দাঁড়ায়। আমরা চিরপরিবর্ত্তনীয় মনুষ্যব্যাপার ছায়াবৎ দূর আঁধারে লীলা করিতে দেখিতে পাই। পর পর যথাক্রমে মানশ্চক্ষে গতায়াত করে, যুগের মায়াচক্র ক্রীড়া করিতে থাকে। রাজাও রাজ্য উঠিতেছে,—ইন্দ্রচন্দ্র ভাসিতেছে—ডুবিতেছে; রীতিনীতিপদ্ধতি ফুটিতেছে,—নিবিতেছে; ধর্ম্মবিজ্ঞান পড়িতেছে; পুনরায় পরিণতির জটিল পথ সরলভাবে আদ্যন্ত বিচরণ করিতেছে; সভ্যতার স্রোত আদিম জন্মভূমি হইতে নিরবচ্ছিন্ন উচ্চমুখে সবেগে সতেজে বহিতেছে এবং প্রতি নিয়তই বলিতেছে, যে রাজ্যবিস্তার রাজ্যের দৌর্ব্বল্যের কারণ, ভোগ-বিলাস অধঃপাতের লক্ষণ, সুনীতি জাতিমহত্ত্বের গূঢ় তাৎপর্য্য এবং স্বাধীনতা বুদ্ধিমত্তার সমবায় কারণ। জগতে কোন কার্য্যই স্থায়ী নহে—সকলই নশ্বর—এই আছে, এই নাই; কালের মত সকলই চপল। ফলে ইতিহাসে বর্ত্তমান রহস্যের প্রকৃত সার কারণও—ভবিষ্যতেরও গঠন নাই। দাসত্ব প্রথমে কোথায় উঠিয়াছিল, গল্পামোদ ব্যতীত জ্ঞানকল্পে তাহা আমার জানিবার বিশেষ কোন ফল নাই; কিন্তু ইহার সর্ব্বকালীন ফল কি, তাহা জানাই আবশ্যক। এপ্রকার জ্ঞান ব্যতীত ভবিষ্যতের পরিচালনা হয় না। মানুষের উপর জাতীয় পদ্ধতির ফলাফল জানা সহজ; কিন্তু জাতীয় পদ্ধতির উপর মানুষের ফল জানা যায় না। সুতরাং মানুষের উপর আনুসঙ্গিক ব্যাপারের সংস্কার জানাই বিজ্ঞানকল্পে প্রশস্ত। শাক্যসিংহ, যীশু, চৈতন্যের প্রাদুর্ভাব জানা যায়; কিন্তু ভাবী মহাত্মার প্রাদুর্ভাব অনুমানসিদ্ধ নহে। তিনি কি রূপে আবির্ভাব হইবেন ও কোন্ সুমহৎ কার্য্য করিবেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। আগত মহাপুরুষ আশা ভরসা মাত্র—অনুমান নহে। দুই দিকেই ইহা অপ্রশস্ত। কিন্তু জাতীয় পদ্ধতির প্রাদুর্ভাব অনায়াসসিদ্ধ, এবং যখন জানা যায় তখন তাহার সত্য সর্ব্বকালব্যাপী—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানে সমান বিরাজমান।

জীবনী বা ইতিহাসে ভাবের ও কল্পনার যতদূর উত্তেজনা হয় প্রজ্ঞার ততদূর কার্য্যকারিতা হয় না। অবশ্য "বড়র" জীবনীতে স্বাস্থ্য আছে—চিত্তের বল আছে—আশা আছে—ভরসা আছে। তাহাতে আমরা বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হই এবং মনে উচ্চ আশা জন্মে। কিন্তু অতীত শুদ্ধ পবিত্র আখ্যান নহে। ইহাতে স্বার্থপরতারও পূজা আছে; নীচ কৌশলেরও গৌরব আছে; পশুশক্তিরও মর্য্যাদা আছে। ইতিহাসে শাক্যসিংহ আছেন, টাইমুরও আছেন; যীশু আছেন, নৈপলিয়নও আছেন; ওয়াসিংটন আছেন, লক্ষ্মণ সেনও আছেন; কুরুক্ষেত্র আছে, এলেকজণ্ডারের দিক্‌বিজয়ও আছে;

আমেরিকার স্বাধীনতা, ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব, ম্যারেঙ্গ ও পলাশীর যুদ্ধ আছে। ইহাতে দেব চরিত্রও আছে পিশাচ চরিত্রও আছে। এলেক্জণ্ডার নেপলিয়নের আদর্শ। এখনও নেপলিয়ন আদর্শনীয় কি না স্থির নাই। ইতিহাসের আলোক স্থির বা পবিত্র নহে; বরং অস্থির, অস্ফুট, সংশয়াত্মক। পবিত্র হইলেও শুদ্ধ প্রাচীন গুণকীর্ত্তনের আবশ্যক কি? আমার অবস্থা স্বতন্ত্র—কার্য্য স্বতন্ত্র—মীমাংসা স্বতন্ত্র। আমার আদর্শ নাই। আমি আমার অবস্থায় কি করিব—বা আমার কোন্ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহা ইতিহাসে কোথাও নাই। আজ আফগান যুদ্ধে পলাশীর কৌশল খাটিবে না। ইতিহাসে পুনরুক্তি নাই। অনেকে বলেন ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হইয়া থাকে (History repeats itself)। সে কথা কাব্য। জীবনের অবস্থা কখনই দুইবার সমান দেখা যায় না। সুতরাং কার্য্যের আয়োজন ও সংযোজন বর্ত্তমানের উপর নির্ভর। আদর্শের অনুগমন যথার্থ আভ্যন্তরিক দৃষ্টির ফল নহে। বরং ইহাতে সংসারের নিয়মাদিতে বিশদদৃষ্টির অভাব বলিয়াই প্রকাশ পায়। অমুক কার্য্য ভলটেয়র করিয়াছেন, আমিও করিব; ইহা যোগ্যতার লক্ষণ নহে। আজ নেপলিয়ন প্রাচীন কাহিনী সমভিব্যাহারে আসিলে হাস্যাস্পদ হইতেন। আমি অমুক কর্ম্ম করিব কেননা এই অবস্থায় ফ্রাংক্লীন এই কার্য্য করিয়াছিলেন। সাফল্যের নিয়মানুসারে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। রাজকার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে গেলে জগৎসংসারের রাজ-কার্য্যের ইতিহাস পড়িলেও হয় না; বর্ত্তমান লোকের অভাব, আকাঙ্ক্ষা, মত, বিশ্বাস, ধারণা, আশা, ভরসা, প্রভৃতিতে সূক্ষ্ম দৃষ্টির আবশ্যক। বর্ত্তমানকে বিশদ না করিয়া, ইতিহাস বরং বর্ত্তমান হইতে আলোক প্রাপ্ত হয়। পলাশীর যুদ্ধ মনে কর। অসংখ্য লোক সামান্য কয়েক জন দ্বারা পরাজিত হইয়াছিল। যতক্ষণ না আমি সংখ্যার তারতম্যের ব্যাখ্যা অন্য কোন কারণে পাই, ততক্ষণ আমার পলাশীর যুদ্ধ বুঝা হয় নাই। মনে মনে কার্য্যকারণমালা সাজাইয়া দেখিব যে অমুক উহার কারণ, যে কারণে আজও ঐরূপ ঘটনা হইতে পারে। সংক্ষেপতঃ অতীতে যে যে কারণে যে যে ঘটনা হইয়াছে আজও সেই সেই কারণে সেই সেই অবস্থায় সেই ঘটনা ঘটা চাই, নতুবা আমার তদ্বিষয়ে বিশ্বাসের ব্যতিক্রম জন্মে। ইতিহাস বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে আমরা মনে মনে প্রশ্ন করি অমুক কারণে অমুক ব্যাপার অমুক অবস্থায় আজ হইতে পারে কি না। এই প্রশ্নের উত্তরের উপর ঐতিহাসিক সত্য নির্ভর করে। সুতরাং বর্ত্তমান হইতে অতীত অনেক আলোক প্রাপ্ত হয়। অনন্তের মধ্যে দাঁড়াইয়া মানুষ বর্ত্তমান সোপানে পদ রাখিয়া কার্য্য করে। অতীতের বিরাটমূর্ত্তিতে সাহস পায় বটে; কিন্তু ভবিষ্যতে কৃতকার্য্য হইবার জন্য নিজের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। অতীত বর্ত্তমানে আছে; বর্ত্তমান ভাবীর জন্মভূমি। ইতিহাসে যতই সত্য থাকুক না কেন, আমাদের বিশ্বাস বর্ত্তমানমূলক। দুই আর দুই চার হয়, ইহা শিক্ষকের

প্রতি বিশ্বাসের ফল নহে। তবে ইতিহাসের আবশ্যক? শিক্ষা। আমরা প্রতিনিয়ত কিছু রাজ্য উঠিতে পড়িতে দেখিতে পাই না, ইন্দ্রপাত চন্দ্রপাতের ঝনঝনিও শুনিতে পাই না, আমাদের সম্মুখে কিছু প্রত্যহ নূতন ধর্ম্মস্রোত অভ্যুদিত হয় না; এই জন্যই ইতিহাসের আবশ্যক। কিন্তু আমরা ইতিহাসের সাহায্য অতি সাবধানে লইয়া থাকি। আমাদের জ্ঞানের অধিকাংশই পরকীয়, নিজ দর্শনের ফল নহে।—দর্শন ও পরীক্ষা অনেকটা ইতিহাসেই সমাধা করি। ইহাতে আমাদের নূতন কিছুই শিখায় না; তবে আমার ধারণাকে প্রবল করিয়া তুলে। আমার দৃষ্টিতে যে ভুল নাই, ইতিহাস তাহারই সপ্রমাণ করে। ইতিহাসে মনুষ্যজাতির সাহায্য হয় সত্য; কিন্তু তাহা ব্যক্তিগত বহুদর্শন অপেক্ষা অধিক নহে। আমরা বিশ্বাসী পাত্র দেখিয়া সত্য সংগ্রহ করি না। আমাদের বিশ্বাসের সহিত যাহার ঐক্য নাই, দেবতায় তাহা সত্য বলিলেও গ্রাহ্য হয় না। আমি অমুককে হত্যা করিতে না দেখিয়াও সাক্ষ্য মুখে বিশ্বাস করি, কেন না হত্যাকাণ্ড অসঙ্গত নহে। যদি হত্যাকাণ্ড অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা থাকে, তাহা হইলে একথা যুধিষ্ঠির বলিলেও আমার বিশ্বাস হইত না। সায়ামের রাজা বরফ জানিতেন না— বিশ্বাসও করেন নাই। সত্যও দেশ ধারণা-গুণে বিশ্বাস্য হইতেছে না। অন্য কথা স্বতন্ত্র। তাই ইতিহাস বিজ্ঞান সাপেক্ষ। ইহার নিজের মূল্য অল্প।

মনুষ্যের মনের আখ্যায়িকা আভ্যন্তরিক। মনের রহস্য ইতিহাসে নাই। স্বভাব এই মনের কথা বলিল, আবার পরক্ষণে তাহা গোপন করিল। কর্ম্মের ইতিবৃত্ত বিবরণে পূর্ণ; বিবরণও অত্যাচারী—জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। বিষয়ানুসন্ধায়ী—গল্প অনুসন্ধায়ী। বিষয় দৃশ্য—দৃশ্য ভ্রান্তি মূলক। কোন বিষয়ই আপনার ব্যাখ্যা করে না—সকলই কিন্তু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। সাধারণ্যপাতে বিষয়ের লোপ, নিয়মের আবির্ভাব। নিয়মই প্রধান জ্ঞান ও স্মৃতিসুলভ। সংস্কারে স্বতঃ কোন দোষ গুণ নাই। ইহার ভাল মন্দ মনুষ্যের অবস্থা সংঘটিত। আমরা বর্ত্তমান জ্ঞান ব্যতীত সমাজ পরিচালনা করিতে পারি না। যতক্ষণ না কোন নূতন প্রবর্ত্তনার অপরিহার্য্য ফল বুঝিতে পারি—মনুষ্যের মনে ও চরিত্রে উহার কি প্রকার কার্য্যকারিতা জানি, ততক্ষণ কোন সংস্কারই করিতে পারি না। বৈদ্য নিজ ঔষধের গুণ না জানিলে উপস্থিত রোগীর চিকিৎসা করিতে পারেন না। সংস্কার বিশেষের কোথায় উৎপত্তি, কোথায় গতি, কোথায় স্থিতি, প্রভৃতি জানিবার বিশেষ ফল নাই, উহার সর্ব্বসাময়িক কার্য্য ফল কি, এই জ্ঞানই আবশ্যক—সুতরাং ইহা ইতিহাস নহে—বর্ত্তমান অভিজ্ঞতা। এই প্রকার জ্ঞান ব্যতীত বর্ত্তমান ভালরূপ বুঝা যায় না—ভবিষ্যৎ ও ভালরূপ পরিচালিত হয় না। বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতার অর্থে বর্ত্তমান লোকদিগের রীতি, নীতি, প্রকৃতি, মত, বিশ্বাস, আচার, ব্যবহার, ধারণা, সংস্কার ও পদ্ধতির সবিশেষ জ্ঞান। মনুষ্যের উপর

সংস্কারের ফল, সংস্কারের উপর মনুষ্যের প্রাদুর্ভাব, এবং পরস্পরে উভয়ের কার্য্য প্রতিকার্য্য আলোচনা করাই ইতিহাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। একটী অগ্রে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জানা যায় না; অপরটী তো সংস্কারেই নিহিত আছে। কোন দিকেই ইতিহাসের দ্বারা বর্ত্তমানের ব্যাখ্যা বা ভাবী পরিচালনা হয় না। ফলে সংস্কার পরিবর্ত্তনশীল—মানুষ নশ্বর, মনুষ্যত্ব নিত্যবস্তু। কারলাইলের মতে আদর্শেই জীবন। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসে তাহা পাই কই? আর্নলড্ বলেন চরিত্রই জীবন। কই তাহাই বা ইতিহাসে কোথায়? গাইতে বলেন কর্ম্মই জীবন। শাক্যসিংহের কর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ে নিনাদিত হইয়াছে। কই ইতিহাসে আমরা কর্ম্ম পাই কই? ইহাতে ভাবের উন্নতি হয়, আদর্শ মনোনীত করিবার জন্য কল্পনাকে উত্তেজিত করে না। প্রাচীন কথায় কার্য্যকারিতা কই? চিত্তের পরিতোষ কোথায়? ধর্ম্মজ্ঞানের অবলম্বন কই? ইহার আলোক তো সর্ব্বদা বিশদ নহে। ধর্ম্মের উন্নতি, পাপের অবনতি ইতিহাসে নাই। ন্যায়ও দেখা যায় না। সতত বরং "বড়র" প্রতি অবিচার ও অত্যাচার—"বড়র" দুঃখ ক্লেশই দেখা যায়। সদাচার, সচ্চরিত্র বর্ত্তমান অভিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। ইতিহাসে আমার কার্য্য নির্দ্দিষ্ট নাই। অপরে অন্যাবস্থায় পুরাকালে কি করিয়াছে তাহাতে আমার ফল বিশেষ নাই। আমায় স্বতন্ত্র অবস্থায়, স্বতন্ত্র রহস্যভেদ করিতে হইবে। অধিকন্তু দুই বার কোন অবস্থাই ঘটে না। মনুষ্যমনের নিয়মের সহিত- যাহার ঐক্য তাহাই মান্য—যাহা নহে তাহা অমান্য।

শুদ্ধ নাম, ধাম, দিন, কাল, প্রথা, প্রণালী, যুদ্ধ, বিগ্রহ, কিম্ভূত কিমাকার আচার, ব্যবহার, প্রভৃতির মূল্য সামান্য। জ্ঞানচক্ষে যাহা মূল্যবান্—তাহাই প্রকৃত আদরণীয়। কি প্রাচীন, কি নব্য, ভাষার স্বতঃ মূল্য অল্প। নিয়মই শিক্ষার চরম। নেপলিয়ন কি কৌশলে যুদ্ধ করিতেন, সক্রেটিস্ কিরূপে তর্ক করিতেন, দাঁতে কি প্রকারে বসিয়া কাব্য লিখিতেন, কলম্বস কোন্ দিন আমেরিকা আবিস্কার করিয়াছেন, তাহা জানায় কৌতূহল নির্ব্বাপিত হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানকল্পে তাহাতে লভ্য অতি সামান্য। এ প্রকার জ্ঞানে আমাদের জীবনযাত্রার বিশেষ সহকারীতা হয় না। এরূপ অসংলগ্ন কথায় আমোদ আছে, শিক্ষা আছে, কার্য্যকারিতা সামান্য। যে ইতিহাসে মনুষ্যত্বের ব্যক্তিগত বা জাতিগত অনন্ত স্রোতের নিয়মাদি পাওয়া না যায়, তাহা অসার। ব্যক্তি সমাজের উপর কার্য্য করে, সমাজও ব্যক্তির উপর কার্য্য করিয়া থাকে। ব্যক্তিগত চরিত্র মনোগত এবং দেহগত নিয়মাধীন। সুতরাং ঐ সকল নিয়মজ্ঞান ব্যতীত চরিত্রজ্ঞান হইতে পারে না।

প্রকৃত ইতিহাস ব্যক্তি বা জাতির দোহাই দিয়া মনুষ্যজগৎ প্রস্ফুটিত করে। সেই অনন্ত শক্তির কোথায় উৎপত্তি, কোথায় স্থিতি, কোথায় নতি, কোথায় গতি, কোথায় স্ফূর্ত্তি—ও কোন নিয়ম বা প্রণালীতে পরিচালিত, তাহার ব্যাখ্যাই ইতিহাস। ইহাতে জীবরহস্য ভেদ করা যায়। যেরূপ অপরিহার্য্য ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে রবি শশি তারা

আকাশে বিচরণ করে, মনুষ্যজগতও সেইরূপ নিয়মে গাঁথা। যাঁহাদের জীবনীতে ইতিহাসের গৌরব, তাঁহাদের গুণে সকলে মুগ্ধবটে—কিন্তু কার্য্যক্ষেত্র বর্ত্তমান সুতরাং বিজ্ঞান সদৃশ কিছুই কার্য্যকর নহে। অনুকরণ আলস্য, ঔদাস্য ও অযোগ্যতার ফল। জীবনী মানসিক ও দৈহিক নিয়ম এবং কার্য্যপ্রতি কার্য্যে বপিত। ইতিহাসের প্রমাণ জীবনীতে আছে, জীবনীর প্রমাণও ইতিহাসে আছে। নিত্য সম্বন্ধ সংস্থাপনই জ্ঞান। যে যে উপাদানে মহত্বের সৃষ্টি তাহারই অবতারণা ও উদ্ভাবনা করাই জীবনীর মুখ্য উদ্দেশ্য। কার্য্যকারণের নিত্য সম্বন্ধ অনুসরণ করা সকল বিদ্যারই অভিপ্রায়। উচ্চপ্রকৃতির উপাদান কি, সহকারই বা কে, কার্য্যপ্রণালীই বা কি প্রকার, সৃষ্টি কিসে, পুষ্টি কোথায়, ইত্যাদি আলোচনাই জীবনী। বৃত্তান্তগুলি সংগ্রহ, সুসজ্জিত ও বিভক্ত করিয়া সাধারণ্যপাত করাই আখ্যায়কের প্রধান কার্য্য। উপাদানের সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ করিয়া চরিত্রের নিয়মাদি অবতারণা করাই বিধেয়। অবস্থা, সংসর্গ, শাসন দেশ, কাল, পাত্র, শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম্ম, নীতি, বিদ্যা, প্রতিভা প্রভৃতির আলোচনা, এবং ব্যক্তিগত, বংশগত, জাতিগত পরিণতি অবতারণা করাই জীবনীর সার তত্ব। শুদ্ধ বড়ত্বে মুগ্ধ হইয়া রচনা কৌশলে জগৎকে মাতাইয়া তোলা জীবনীর চরমকার্য্য নহে। বড়ত্বের অনুসরণ করত লুক্কায়িত নিয়মাদি নিরাকরণ করিয়া বিশ্বসংসারকে বড়ত্বের পথ দেখানই প্রকৃত কার্য্য। বড়ত্বকে আয়ত্তে আনা জীবনীর অভিপ্রায়। নতুবা জীবনীর উদ্দেশ্য নাই—ফল নাই। শুদ্ধ মহত্বে উন্মত্ত হইয়া বিস্ময়ের উচ্চ মাত্রায় বুদ্ধিকে ধাঁধাঁ লাগাইয়া জ্ঞানহারা হইয়া ভক্তি সাগরে ভাসমান হওয়া ইহার সার কল্প নহে। কিন্তু বড়ত্বের আলোচনায় চিত্তের স্ফূর্ত্তি হয়, মনের উত্তেজনা হয়, প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাস হয়, হৃদয়ের বেগ ও একাগ্রতা জন্মে। দেবচরিত ও উপন্যাসের কল্পিত প্রকৃতিতেও আমরা মুগ্ধ হইয়া থাকি—বিস্ময়ের উচ্চমাত্রায়ও উঠি। তবে জীবনীর ফল? ঐ সকলেও ভক্তির চরমসীমায় বিলক্ষণ লইয়া যায়। ফলে দেবতা হয় ইতিহাসের নয় উপন্যাসের সামগ্রী—কেহদেখেনও নাই—জানেও না। আমাদের ভক্তির উক্তিও অত্যন্ত অধিক। বোধ হয়, ভক্তি ইতিহাস মুলক। তবে বাস্তব মনুষ্যচরিত্রের আবশ্যক কি? ইহাতে কারণ আছে—কার্য্য আছে—সাধনা আছে—সিদ্ধি আছে ও সম্ভবপর সাধ্য বিষয়ও আছে, যাহা আমাদের প্রাণের প্রাণ জানিত বা অজানিত ভাবে হারানিধির মত খুঁজিয়া বেড়ায়। শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা, ভক্তি, বিশ্বাস প্রভৃতির এই একই পথ। মহত্ব কি উদ্ভাবনা করা যায়? জানি না—বলিতে পারি না—হইলেও হইতে পারে। ফলে মহত্বের স্ফূর্ত্তি কতকটা সম্ভবপর। শরীরতত্বে শরীরের সৃষ্টি হয় না; কিন্তু স্বাস্থ্য রক্ষা বা বলবৃদ্ধি নিশ্চয়ই সংসাধিত হইয়া থাকে। আমরা শক্তির সৃষ্টি করিতে পারি না, সত্য—কিন্তু তাহার উন্নতি সাধিতে পারা যায়—তাহার অপচয় যাহাতে না হয় তাহাও করা সাধ্যাতীত নহে। রসায়ন-তত্ত্ববিৎ অঙ্গার ও জলে উদ্ভিদের উৎপত্তি স্থির করিয়াছেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তিনি কি ঐ

উপাদানে উদ্ভিদের সৃষ্টি করিতে পারেন ? তবে তিনি কেন সে পথে ধাবিত হয়েন। কারণ আমাদের জ্ঞানলিপ্সা সেই পথেই ধাবমান। অন্য কারণ না থাকিলে থাকিতে পারে—কিন্তু বিজ্ঞানের আলোচনাই তাই। মহত্ত্বের উদ্ভাবনা না হইলেও জ্ঞানকল্পে এইরূপ আলোচনাই প্রধান।

শ্রীপ্যারিলাল মুখোপাধ্যায়।

ইংরেজ মহিলার শিক্ষা ও স্বাধীনতার গতি।

পূর্ব্বে স্বদেশীয় ভগিনীদিগকে দেখাইয়াছি যে ইংরেজ মহিলারা ভারতনারীগণের তুলনায়—শুধু ভারতীয় কেন—প্রায় সমস্ত আসিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপের অন্যান্য দেশীয় নারীগণের তুলনায় অনেক শিক্ষিত ও স্বাধীন। তাহারা ঐ শিক্ষা ও স্বাধীনতা কিরূপে ও কতদিনে পাইয়াছে তাহা এই প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিব। আমাদের ভারতবর্ষের অন্তঃপুর-ব্যবস্থার মত ইংলণ্ডে কোন পরিবারে স্ত্রীলোকের পুরুষ হইতে একেবারে পৃথক বাসের বন্দোবস্ত দেখা যায় না। তবে ইংরেজ নারীরা যে পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত অনেক আটকে থাকিত ও প্রায় সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পুরুষের মতানুযায়ী চলিত তাহার কোন সন্দেহ নাই। আর সাধারণ স্থানে বেড়াইবার সময় বা অপরিচিত লোকের সম্মুখে যাইবার সময় ইহাদের মধ্যে যে ঘোমটা দিবার রীতি ছিল তাহারও প্রমাণ আমরা ইতিহাস ও উপন্যাস ইত্যাদিতে অনেক পাই। বিখ্যাত সর ওয়াল্টর স্কটের 'আইভেনো'তে লেডি রয়েনা যখন দেখিলেন, টেম্পলার তাঁর প্রতি অভদ্রভাবে কটাক্ষপাত করিতেছে, তিনি অমনি ঘোমটা টানিয়া মুখ ঢাকিলেন। আরো, 'টুর্‌নেমেণ্ট' বা ক্রীড়া যুদ্ধের সময় স্ত্রীলোকেরা ঘোমটা মুখে দিয়া বসিয়া পুরুষের লড়াই দেখিত, ইত্যাদি। ইংরেজ রমণীর বর্ত্তমান মুখাবরণও (ইংরেজীতে যাকে ভেল বলে), সেই পূর্ব্ব অবগুণ্ঠনের অপভ্রংশ মাত্র। আর যদিও আজকাল অধিকাংশ ব্রিটন বাসিনীরা কেবল বিরূপ বা বয়স ঢাকিবার আশায় মুখে ভেল পরে, তথাচ, এদেশে দুচারজন এমন স্ত্রীলোকও পাওয়া যায় যাঁহারা যথার্থ লজ্জা বা নম্রতাবশত সাধারণ স্থানে ভেল ব্যবহার করেন। তবে মুখ আচ্ছাদনের রীতি না থাকিলেও এদেশের ভদ্র স্ত্রীলোকদের টুপি এখন তাহাদের ঘোমটার কাজ করে। আমাদের দেশে যেমন কোন ভদ্রমহিলা মুখ না ঢাকিয়া কখন বাড়ীর বাহির হন না, এখানেও ভদ্রস্ত্রীরা সেইরূপ খোলামাথায় কখন রাস্তায় বাহির হন না। উহা করিলে যে জাত যায় তা নয়,

তবে রীতিনীতির জোর সব দেশেই সমান, যা বরাবর চলিয়া আসিতেছে কেহ তার বিরুদ্ধে গেলেই লোকে তাহাকে অভদ্র বা লজ্জাহীন বলে।

উক্তরূপ মুখ আচ্ছাদন প্রথা ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান সৌন্দর্য্যদায়ী টুপি ব্যবহারের মত নানা আটক ও অত্যাচার তাড়াইয়া ইংরেজ রমণীরা যে কত যত্ন ও পরিশ্রমে উহাদের অধুনাতন সুন্দর স্বাধীনতা পাইয়াছে, তাহা লিখিতে গেলে সমস্ত ব্রিটনের ইতিহাস তোলপাড় করিতে হয়, এই প্রবন্ধ তাহা হইলে এক প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে; সে কারণে আমি অধিক দূরে না গিয়া কেবল দুতিন শত বৎসর হইতে বর্ত্তমান ইংরেজ মহিলাদের শিক্ষা ও স্বাধীনতার অবস্থা যত সংক্ষেপে পারি লিখিব।

ইংরেজ স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা রাণী এলিজাবেথের সময় হইতেই একরূপ আরম্ভ বলিতে হয়। তিনি ভারতবর্ষের মুসলমান সম্রাট আকবরের সমকালীন ছিলেন। তাঁর রাজত্বের পূর্ব্বে কেবল রাজরাণী ও বড় ঘরের মহিলারা যাহা কিছু লেখাপড়া শিখিতেন, তাহাও অতি সামান্য। রাণী এলিজাবেথ ভ্রাতার সঙ্গে সমানে শিক্ষিত হওয়াতে তিনি নিজ রাজ্যে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতায় উৎসাহ দিয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রতি লোক-দিগের আক্রোশ কমাইয়া দেন। কিন্তু তখনকার শিক্ষা এখনকার তুলনায় অতি নিকৃষ্ট ছিল। কেবল ধনী ও দুচারজন মধ্যবিত্ত লোকের কন্যারা লেখাপড়া শিখিত, অন্যান্য সাধারণ বালিকারা বিদ্যার নাম পর্য্যন্ত জানিত না। সেজন্য এলিজাবেথের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাও আবার ইংলণ্ড হইতে একরূপ চলিয়া যায়। তার পর ইংরেজ মহিলারা পুনরায় পূর্ব্বের মত মুর্খতা ও কুসংস্কার ইত্যাদিতে ডুবিয়া পড়ে। কিন্তু তাহাদের ঐ অজ্ঞানতার অন্ধকার অধিক দিন স্থায়ী হইতে পায় নাই, কেননা, ইংলণ্ডে নানা কুসংস্কারময় কাথলিক ধর্ম্মের প্রভাব ক্রমে হ্রাস ও অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত ধর্ম্ম প্রটেষ্টাণ্টদের প্রাদুর্ভাব ও স্থিতি হওয়ার সঙ্গে স্ত্রীজাতির অবস্থাও উন্নত হইতে থাকে। তথাপি ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বের ইংরেজ মহিলাদিগের অবস্থা খুঁজিলে আমরা তাহাতে তাহাদের বর্ত্তমান শিক্ষা, স্বাধীনতা ও কার্য্য শক্তির রেখা পর্য্যন্ত দেখিতে পাই না। তখন এম্ এ, বিএ, এম্ ডি, প্রভৃতি উপাধিধারী স্ত্রীলোকদের নাম ব্রিটনবাসীদের কাছে স্বপ্নস্বরূপ ছিল, আর স্ত্রীদিগের উচ্চশিক্ষাব নামে নারী ও পুরুষ উভয় জাতিই খড়্গহস্ত হইতেন। ব্রিটনের ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন, প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে রাণী অ্যানের সময় ইংরেজ স্ত্রীদের অবস্থা বর্ত্তমান ভারতমহিলাদিগের অধিক উর্দ্ধে ছিল না, বরং ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা অনেক নীচে ছিলেন। তাঁহাদের ঐ সময়কার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে আমরা মহা শিক্ষা ও উপকার নাই। অল্পশিক্ষা যে অজ্ঞতার অপেক্ষাও অপকারী ও বিপদের আকর, তাহা উহাতে স্পষ্ট দেখায়।

রাণী অ্যানের আগে ব্রিটনের সাধারণ নারীরা কিছুই শিক্ষা পাইত না বলিলেই

হয়; কিন্তু তাহাতে তাহাদের বেশী ক্ষতি হইত না কেননা, অতি অল্প ইংরেজ পুরুষই তখন শিক্ষিত ছিল; স্ত্রীলোক ও পুরুষ দুই মূর্খ থাকাতে ইংরেজ সংসার, আমাদের ভারতবর্ষের কৃষিপরিবারের মত, বেশ চুপচাপ ও মিল শান্তিতে চলিত। পুরুষেরা নিজেদের কাজ লইয়া দিন কাটাইত, আর স্ত্রীরা গৃহ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিত। রাণী অ্যানের সময়ে অ্যাডিসন, পোপ, ষ্টীল, সুইফট প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত ইংরেজ গ্রন্থকারেরা ভাল ভাল প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়া পুরুষদের মনে শিক্ষা ও জ্ঞানের রুচি জন্মাইয়া দিলেন; তাহার পর যখন বিদ্যাবান স্বামী ও মূর্খা স্ত্রীর মিলনে ইংরেজ পরিবারে মহা গণ্ডগোল বাধিবার উপক্রম হইল তখন অমনি ব্রিটন নারীরা এক এক বই কিনিয়া লেখাপড়া শিখিতে বসিলেন। অতি অল্প বালিকার ভাগ্যেই যথার্থ শিক্ষা ঘটিল—কেননা, স্ত্রীলোকদের স্কুল বা কলেজ তখন কোথায়? অধিকাংশ ভদ্রলোকের কন্যারা বিদ্যাশিক্ষার জন্য 'কন্‌ভেন্টে' অর্থাৎ ধর্ম্মাশ্রমে গিয়া দুতিন বৎসর থাকিতে বাধ্য হইত। কিন্তু তাহাদের সে শিক্ষা আমাদের দেশের বর্ত্তমান জেনানাশিক্ষার মত—শিক্ষয়িত্রীরা নিজ নিজ ধর্ম্ম ও বিশ্বাস লইয়াই পাগল; বালিকারা কিছু শিখুক বা নাই শিখুক, কিছু বুঝুক বা নাই বুঝুক, তাহাদিগকে একবার নিজ নিজ মতের মধ্যে আঁকড়াইতে পারিলেই হইল। কাজেকাজেই দেশে অল্প শিক্ষিত স্ত্রীলোকের ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল, আর উহার সঙ্গে সঙ্গে হিংসা, দম্ভ, অহঙ্কার, অলসতা, ও বাহ্যাড়ম্বর প্রভৃতি যত মন্দগুণ আসিয়া ইংরেজ স্ত্রীদের হৃদয় অধিকার করিল। এমন কি ধনী সমাজের অনেক নারীদিগের চরিত্র পর্য্যন্ত কলুষিত হইয়া উঠিল, আর রাজ পরিবারের যত বড় বড় লোকদের মধ্যে নানা বিবাদ, কলহ, ষড়যন্ত্র প্রভৃতি ঘটিতে লাগিল। কারণ, মানুষ যতদিন একেবারে মূর্খ থাকে, ততদিন তাহারা পাখাহীন শাবকের মত, নিজ নিজ বাসায় স্থিরভাবে বসিয়া থাকে, কিন্তু অল্প শিক্ষিত লোক নূতন ডানাপ্রাপ্ত পাখীর ন্যায় দিন রাত ছট্ ফট্ করিয়া বেড়ায় ও খাদ্য ইত্যাদি লইয়া অন্যান্য পাখীদের সঙ্গে ঝগড়া বাধায়, আর অনেক সময়ে নিজের ক্ষমতাতীত দূরে উড়িয়া বিপদসঙ্কুল স্থানে পড়িয়া যায় ও অবশেষে প্রাণ হারায়।

সুখের বিষয়, ইংরেজ স্ত্রীলোকদিগকে অধিক দিন ওরূপ মাঝ পথে দাঁড়াইতে হয় নাই। নানা কষ্ট, যন্ত্রণা, ঘৃণা ও অবমাননা সহিয়া প্রায় এক শ বৎসর পরে তাহারা আপনাদিগের অবস্থা সংশোধনে যত্নবতী হয়, সেই অবধি রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের সঙ্গে ব্রিটনের অন্যান্য বিষয়ের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির ন্যায় ব্রিটন মহিলারাও জ্ঞান ধর্ম্ম, শিক্ষা ও স্বাধীনতায় ক্রমশ উপরে উঠিতেছে। ইংরেজ স্ত্রীদিগের বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষা ও অবাধ স্বাধীনতা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনের ফলে হইলেও এবং স্ত্রীহিতাকাঙ্ক্ষী পুরুষ, প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মযাজক ও উপযাজকেরা নারীদের মানসিক উন্নতির জন্য নানা উপায় করিয়া তাহাদিগকে দলিত অবস্থা হইতে তুলিয়া সাধ্যমত উচ্চপদে

বসাইবার প্রয়াস পাইলেও ব্রিটনবাসিনীদিগের এখনকার শিক্ষিত ও মার্জ্জিত অবস্থা তাহারা নিজেদের যত্ন ও পরিশ্রমবলেই পাইয়াছে। যেমন কাহারও কোন আভ্যন্তরিক পীড়া জন্মিলে তার গায়ের উপর হাজার ঔষধ ও প্রলেপ লাগাইলেও বিশেষ কোন ফল দর্শেনা, সেইরূপ কোন জাতীয় স্ত্রী-পুরুষদের যথার্থ উন্নতি অপর কোন জাতি বা দলের সাহায্যে সাধিত হয় না; কিন্তু তাহারা নিজে একবার উহাতে মনোযোগী হইয়া উঠিলে—রীতিনীতির জোরই বল, আর সমাজের অত্যাচারই বল—সবই ঐ আত্ম উদ্যম ও আত্ম সাহায্যের কাছে একে একে বলি যায়।

মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার শাসনের সঙ্গে ব্রিটনে নানা বিজ্ঞানের চর্চ্চা ও দেশের সকল বিষয়েরই শ্রীবৃদ্ধির ধূম পড়িল, কলের গাড়ী, কলের জাহাজ, ও টেলিগ্রাফে ব্রিটনের ভিতর ও বাহির তোলপাড় হইয়া উঠিল। সমস্ত ইউরোপেই এ সময় বিজ্ঞান চর্চ্চা ও নানা আবিষ্কারের ধূম পড়িলেও—অপরিসীম মূলধন, অধ্যবসায় ও কার্য্য শক্তির বলে ইংলণ্ড সকলের আগে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল; দেশের সর্ব্বত্র সংবাদ ও লোক যাতায়াতের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে লোকের চোকও ফুটিল। পুরুষেরা শিক্ষিত হইয়া নিজ নিজ কাজ ভালরূপে বুঝিতে পারিলে সকল কর্ম্ম সুচারুরূপে চলিবে ও অনেক অর্থ সঞ্চয় হইবে আশায় ধনী ও মধ্যবিত্ত সকল লোকেই পুত্রদিগকে স্কুল কলেজে পাঠাইতে লাগিলেন। সকল বড় বড় কর্ম্মে কঠিন পরীক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বশত যুবকেরা অবিলম্বে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু ঐসব চতুর ও শিক্ষিত যুবকদিগের সঙ্গিনী হইবার উপযুক্ত স্ত্রী কোথায়? ইংলণ্ডে ত ভারতবর্ষ, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের মত পিতামাতার দ্বারা পাত্র পাত্রীর নির্ব্বাচন হয় না, সুতরাং সুশিক্ষিতা ও সুচতুরা না হইলে যুবকেরা যুবতীদিগকে পছন্দ করিবে কেন? পিতা মাতারা এই বিভ্রাট দেখিয়া দুই চারি জন শিক্ষিত পুরোহিতের স্ত্রী ও কন্যাকে কর্ত্রী করিয়া দু একটী বালিকা বিদ্যালয় খুলিলেন। ক্রমে ছাত্রীর সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলেরও সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। নগর, জনপদ ও গ্রামে পর্য্যন্ত বালক ও বালিকাদিগের স্কুল খোলা হইল। নিতান্ত গরীব ভিন্ন প্রায় সকল পিতামাতারা পুত্র কন্যাদিগকে সমানে স্কুলে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে পার্লেমেণ্টের মতানুসারে বোর্ডস্কুল হইয়া এমন এক আইন প্রচার হইল যে দরিদ্র ভিখারীগণের ছেলে মেয়েদিগকেও কোন এক নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত স্কুলে না পাঠাইলেই নয়। এদেশের ধনী-কন্যাগণ ৬। ৭ বৎসর হইতে ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত স্কুলে পড়েন, ইচ্ছা হইলে তাহার পরে তাঁহারা কলেজে গিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করেন। গরীবদের মেয়েরা সচরাচর ১২। ১৩ বৎসর পর্য্যন্ত স্কুলে যায়।

এইরূপে, পূর্ব্বে পিতামাতাগণ কন্যাদিগকে সৎপাত্রে গচ্ছিত করিবার ইচ্ছায় যে রুচির সৃষ্টি করেন, এখন ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র তাহা ব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটনে এখন

সর্ব্বশুদ্ধ ১০০০ এক হাজার উচ্চ শ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় বা কলেজ আছে; প্রতিটীতে গড়ে ৫০০ পাঁচ শ ছাত্রী; তাহাদের বয়স ১৫ থেকে ২৫ বৎসর। তাহা ছাড়া লণ্ডন, কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির জন্য ৬। ৭টী বড় স্ত্রী-কলেজ আছে; প্রতিটীতে গড়ে ৫০ জন ছাত্রী প্রতি বৎসর অধ্যয়ন করে। আর ছোট বালিকাদের স্কুলের সংখ্যা নাই বলিলেই হয়। যে দেশে গোয়ালা, ধোবা, নাপিত, মুদি, কসাই ও এমন কি ডোমের মেয়েরা পর্য্যন্ত লিখিতে ও পড়িতে শিখে, সেখানে যে ছোট মেয়েদের জন্য কত সংখ্যক দৈনিক পাঠশালার আবশ্যক তাহা পাঠিকারা সহজেই বুঝিতে পারেন। গরীবসন্তানদের শিক্ষা অতি সামান্য হইলেও—(নিজের ভাষায় একটু লেখা পড়া ও গোটা দুই আঁক কসা মাত্র—) মধ্যবিত্ত ও ধনী কন্যাদের শিক্ষা অতি উত্তম। এদেশে এমন ভদ্র স্ত্রী একটীও নাই যে নিজের ভাষা উত্তম রূপে জানে না, বা পিয়ানো বাজাইতে পারে না। অনেকে উহার সঙ্গে ফরাসী ও লাতিন ভাষা জানে, আমাদের ভারতবর্ষে যেমন সংস্কৃতের আদর, সমস্ত ইউরোপে লাতিনের সেইরূপ গৌরব, সে জন্য সম্পূর্ণ রূপে সুশিক্ষিতা হইতে হইলে ইংরেজ বালকদিগের লাটিন জানা অতি আবশ্যক। কেহ কেহ জর্ম্মণ বা ইটালীয় শিখে, দু একজন একটু গ্রীক বা রুষ ভাষাও শিখে। অনেকে তার উপর চিত্র বিদ্যায় অভ্যস্ত হয়, কেহ বা জরির কাজে পারদর্শিতা লাভ করে, আর কেহ বা অন্য কোন শিল্প বিদ্যায় মন দেয়। এখন অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত থাকা ভদ্র ইংরেজ মহিলাদের পক্ষে বড় লজ্জার কথা।

আজকাল বালিকারা উচ্চশিক্ষা পাইলেও কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকদের একটীও কলেজ বা উচ্চশিক্ষার কোনরূপ উপায় ছিল না। যখন ইংরেজ নারীরা মধ্যমরূপে শিক্ষিতা হইয়া আরো জ্ঞান লাভে অভিলাষী হইল, তখন তাহারা আপনাদিগকে উহাতে বঞ্চিত দেখিয়া শিক্ষিত ও মার্জ্জিত স্ত্রীলোক মিলিয়া দেশের সর্ব্বজনকে আপনাদিগের এই অভাব জানাইতে লাগিল এবং নানা স্থানে বক্তৃতা করিয়া ও নানা সংবাদপত্রে লিখিয়া সর্ব্বত্র তোলপাড় করিয়া তুলিল, সঙ্গে সঙ্গে পার্লেমেণ্টে আবেদন পত্র পাঠাইল। অনেক তর্ক, আন্দোলন, বাদ, প্রতিবাদ ইত্যাদির পরে পার্লেমেণ্ট স্ত্রীলোকদিগের উচ্চশিক্ষায় অনুমতি প্রদান করিল এবং তিন চারি বৎসর ক্রমাগত ঘোর আন্দোলনের পর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় স্ত্রীলোক ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য নিজ দ্বার উন্মুক্ত করিল। দুচার বৎসর তাহারা উহাতেই সন্তুষ্ট রহিল। কিন্তু সমস্ত দ্বীপের মধ্যে শুধু একটী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে কেন? তাহাদের ভ্রাতারা স্কুলের পাঠ শেষে প্রায় অধিকাংশ কেম্ব্রিজ বা অক্সফোর্ডে গিয়া বড় বড় উপাধি লয় ও বড় নাম পায়; তবে তাহারা কেবল 'মেয়ে মানুষ' বলিয়া ঐ অধিকারে বঞ্চিত থাকিবে কেন? আবার স্ত্রী পুরুষে তর্ক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রাচীন ও গোঁড়া পণ্ডিত ও প্রোফেসরদিগের সেকেলে মৎ বদলাইয়া তাঁহা-

দিগকে বর্ত্তমান কালের উপযোগী মতে আনিতে যে কত সময়, পরিশ্রম ও গোলমালের আবশ্যক হইয়াছিল তার ঠিক নাই। কিন্তু অসীম কার্য্য শক্তি ও অধ্যবসায় বলে ইংরেজ মহিলারা উহাতে সফল হয়। একজন বৃদ্ধ প্রফেসর লিখিয়াছেন যে, প্রথম যেদিন তিনি দেখিলেন তাঁর লেক্‌চারঘর স্ত্রীলোক ছাত্রীতে পূর্ণ, লেক্‌চার না দিয়া প্রথমটা তাঁহার পলাইতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু তিনি যখন বালিকাদের সরল অথচ দৃঢ়-সংকল্প ও জ্ঞানতৃষিত মুখের প্রতি চাহিলেন, তখন তাহাদিগকে শিক্ষা না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। সময়ে অভ্যাসবশত তাঁহাদের ঐরূপ লজ্জা বা কুসংস্কারটুকু চলিয়া গিয়াছে। এখন ইংরেজমহিলারা সঙ্গতি থাকিলে লণ্ডন, কেম্বি্রজ, অক্সফোর্ড বা এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষা করে ও পুরুষের সঙ্গে সমানে আড়াআড়ি করিয়া উপাধি লয়।

যে সব সুশিক্ষিত, কার্য্যক্ষম ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নারীদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে ইংরেজ স্ত্রীদের উচ্চ শিক্ষার উপায় খোলা হয়, তার মধ্যে মিসেস্ বেসেণ্ট, মিসেস ফসেট, মিস অক্টেভিয়া হিল প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত মহিলা প্রধান। মিসেস ফসেট ইংলণ্ডের পরলোক গত প্রসিদ্ধ অন্ধ পোষ্ট মাষ্টার মান্যবর মিষ্টার ফসেটের স্ত্রী, তিনিই প্রথম নারী-কেম্বি্রজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি লন। এই প্রবন্ধে তাঁর জীবনী লেখা যদিও অসম্ভব, তথাপি তাঁর শিক্ষা, জ্ঞান, উদারতা মহত্ব ও কার্য্যশক্তি বিষয়ে গোটা-কতক কথা না লিখিয়া থাকিতে পারি না। তাঁর স্বামী একেবারে দৃষ্টিহীন হইলেও স্ত্রীর সাহায্যে তিনি রাজকার্য্য চালাইতেন; তিনি পতির চক্ষুস্বরূপ ছিলেন; তাঁর বুদ্ধি জ্ঞান ও শিক্ষা প্রভাবে মিষ্টার ফসেট একদিনের জন্যও চক্ষুর অভাব অনুভব করেন নাই। এখন তিনি বিধবা ও বৃদ্ধা হইলেও তাঁহার কার্য্যশক্তি এবং সমস্ত স্ত্রীজাতির প্রতি উদারভাব ও সহৃদয়তার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই; বরং নারীদের উন্নতি ও তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার নিবারণের জন্যই তিনি যেন জীবন রাখিয়াছেন। মিসেস বেসেণ্টের নাম অধিকাংশ ব্রিটন মহিলাদের কাছে গুরুমন্ত্রের স্বরূপ। পূর্ব্বে ইংরেজ-স্ত্রীজাতি সম্বন্ধীয় আইন বড় কড়া ও পক্ষপাতী ছিল, কিন্তু তাঁর পরিশ্রম ও যত্নে এখন এদেশে বিবাহ ও স্ত্রীধন সম্বন্ধীয় যত আইনের সংশোধন ঘটিয়াছে। এ পৃথিবীতে দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার করা এরূপ অভ্যাস যে কি সভ্য কি অসভ্য, কোন জাতিই সুবিধা পাইলে তাহা ছাড়ে না; এই নিমিত্ত ঐ নিষ্ঠুরতা নিবারণের জন্য 'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর' না হইলে চলে না। কাজেই যখন মিসেস বেসেণ্ট দেখিলেন যে তাঁর কথা ও বক্তৃতায় পুরুষেরা বেশী কান দেয় না, বা 'মেয়ে মানুষের বকা রোগ' ইত্যাদি বলিয়া উড়াইয়া দেয়, তখন, "ইংরেজ স্ত্রীদের দাসত্ব" "ইংরেজ স্ত্রীদের স্বাধীনতার উপায়" প্রভৃতি বিষয়ে এমন সব প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিতে লাগিলেন, যে তাহা পড়িয়া ছোট বড় যত ইংরেজ নারীদের নিজ নিজ অবস্থাসম্বন্ধে চোক ফুটিল ও

তাহারা আপনাদের অবস্থা সংস্কারের জন্য মহা গোলমাল আরম্ভ করিল; তখন পুরুষেরাও লজ্জা বা মানের খাতিরে নিজ নিজ স্ত্রী কন্যা সম্বন্ধীয় যত আইন ও কুরীতি সংশোধন করিয়া তাহাদের অবস্থা উন্নত করিবার পথ পাইল না। একজন যথার্থ শিক্ষিত, উন্নত চরিত্র ও সহৃদয় স্ত্রীলোক হইতে দেশের ও স্ত্রীজাতির কত উপকার হইতে পারে, আমরা মিসেস বেসেন্টে তার উদাহরণ পাই।

এখন রাণী অ্যানের সময়ের ও বর্ত্তমান ইংরেজমহিলাদের মিলাইয়া দেখ; এই এক শ বৎসরে উহাদের মধ্যে এত প্রভেদ দেখিয়া আমরা অবাক হই। শিক্ষা-বলে তাহারা এখন মার্জ্জিতরুচি গুণবতী জ্ঞানবতী হইয়াছে, তাহাদের শরীর অলসতা ছাড়িয়া কর্ম্মক্ষম সইয়াছে; আর অনেক কাজে তাহাদের প্রবেশাধিকার থাকায় তাহাদের বুদ্ধিশক্তির দ্রুত বিকাশ চলিতেছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ঐ পরিবর্ত্তন বিনা কষ্টে ও বিনা পরিশ্রমে সাধিত হয় নাই। ইংরেজ স্ত্রীরা তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সমাজ ও পুরুষদের কাছে কত বিদ্রূপ, উপহাস ও তাচ্ছিল্য সহিয়াছে, আর কত সাংসারিক বাধা অতিক্রম করিয়াছে তার ঠিক নাই। প্রথম প্রথম ইংরেজ বালিকারা যখন কলেজে গিয়া পুরুষের সঙ্গে সমানে শিক্ষা লাভ আরম্ভ করিল তখন লোকে তাহাদিগকে 'ব্লুষ্টকিং' বা নীল মোজা ইত্যাদি নাম দিয়া বিদ্রুপ করিত, কিন্তু তাহারা তাহাতে লজ্জা বা ভয় না পাইয়া এক মনে নিজ নিজ কার্য্যে অগ্রসর হইতে লাগিল, দেখিয়া সকলে ক্রমে চুপ হইয়া গেল, এখন ঐরূপ উচ্চশিক্ষায় ইংরেজরা আর দোষ ধরে না, বরং শিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগকে অত্যন্ত মান্য করিয়া চলে।

এইরূপে ইংরেজনারীদের শিক্ষার পথ পরিষ্কার হইয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে উহাদের স্বাধীনতাও বাড়িয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইংলণ্ডে কখন অবরোধ প্রথা ছিল না, স্ত্রী ও পুরুষজাতি বরাবরই এক সঙ্গে মিশামিশি করিয়া আসিয়াছে, একত্র টেবিলে বসিয়া খাইয়াছে, একত্র খেলিয়াছে, বেড়াইয়াছে, ইত্যাদি। ক্রমে তাহাদের শিক্ষার সঙ্গে তাহাদের চালচলনও মার্জ্জিত হইয়া আসিল, ও কথাবার্ত্তায় মধুরতা জন্মিল। আর পুরুষেরা যখন দেখিল স্ত্রীলোকে নিজেরাই নিজেকে রক্ষা করিতে সক্ষম, সর্ব্বত্র নিজেদের মান রাখিয়া চলিতে পারে, তখন তাহারা একে একে স্ত্রীলোকদিগের কৃত্রিম আটকগুলি খুলিয়া লইতে লাগিল ও নারীজাতিকে অনেক অধিক স্বতন্ত্রতা দিয়া তাহাদিগকে সংসারে অবাধে কাজ করিবার অবসর দিল।

কিন্তু আমাদের চোকে ইংরেজ মহিলাদের বর্ত্তমান স্বাধীন জীবন অতি সুন্দর বলিয়া বোধ হইলেও আমেরিকার তুলনায় উহা অনেক নিকৃষ্ট। ইংরেজেরা সাধারণত অত্যন্ত গোঁড়া; (এখানে আমি ধর্ম্ম সম্বন্ধে গোঁড়া বলিতেছি না), নিজেদের পুরাণ রীতি-নীতি পরিবর্ত্তনে অধিকাংশ লোক বড় অনিচ্ছুক। এ পৃথিবীতে প্রায় সব জাতিই প্রাচীন আচার ব্যবহারে এত অভ্যস্ত হইয়া যায় যে তার কোন অন্যথা দেখিলে লোকের

চোকে যেন কাঁটা ফুটে, তাহারা প্রাণপণে উহার প্রতিবাদ করিবার প্রয়াস পায়; ইংরেজ জাতিও ঐ দোষে বাদ যায় না। অবশ্য, জ্ঞানী ও শিক্ষিত পুরুষরা মহিলাদিগকে সমান চোকে দেখেন, কিন্তু সাধারণ লোকেরা উহাতে এখনও অভ্যস্ত হয় নাই। সাধারণতঃ ইংরেজ-স্ত্রী ভারতনারীদের তুলনায় অনেক স্বাধীন হইলেও তাদের অবস্থা একেবারে দোষ শূন্য বা কষ্টহীন নয়। দরিদ্র স্ত্রীদের অবস্থা অত্যন্ত দুঃখময়, তাহারা অন্যান্য অনেক দেশীয় ও ভারতবর্ষীয় দরিদ্রবালাদের অপেক্ষা নিজ নিজ স্বামী ভ্রাতা ইত্যাদির দ্বারা অধিক নিষ্ঠুরভাবে আচরিত হয়। আর এদেশে স্ত্রীকে প্রহার করিবার বিরুদ্ধে আইন থাকিলেও ছোট লোকদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের মারামারি প্রায় ঘটিয়া থাকে; ইহাতে বোধ হয় আমাদের দেশের মত ব্রিটিষ স্ত্রীজাতি নিঃশব্দে নির্দয় স্বামীদের দৌরাত্ম্য সহিলে এদেশে দুর্দান্ত স্বামীদের অত্যাচারের শেষ থাকিত না। অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত ইংরেজেরা পূর্ব্ব কুসংস্কার ছাড়িয়া এখনও স্ত্রীদিগকে পুরুষের সমান জ্ঞান করিতে পারে না। আর আজকাল সকল কাজে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সঙ্গে সমানে আড়াআড়ি করাতে পুরুষেরা অনেক স্থানে পদভ্রষ্ট হইয়াছে, সে জন্য স্ত্রীদের উপর তাদের বড় আক্রোশ জন্মিয়াছে। যাহারা বরাবর হেঁটমাথায় তাহাদের দাসত্ব করিয়া আসিয়াছে, তাহারা যে এখন কানে কলম গুঁজিয়া ব্যাঙ্ক, পোষ্ট আফিস, ষ্টেশন, পাঠগৃহ, যাদুঘর, স্কুল, কলেজ, হাঁসপাতাল প্রভৃতি সকল জায়গায় তাদের সঙ্গে সমানে কাজ করিবে ও নিজেদের শ্রেষ্ঠতা বা কার্য্যক্ষমতা দেখাইবে, ইহা যেন পুরুষেরা সহিতে পারে না। আরো, তাহাদের আবার ভয় হয়, যে স্ত্রীলোকদের উচ্চশিক্ষা ও স্বাধীনতার গতি না রোধ করিলে পাছে আমেরিক-মহিলাদের মত ইংরেজ বালারা বা কোন্ দিন হাইকোর্টে বসিয়া বিচার আরম্ভ করে।

ইহাতেই দেখা যায় শিক্ষিত ও উন্নতিশীল লোকেরা ইংলণ্ডে উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষ হইলেও সাধারণ লোকেরা উহাতে অসন্তুষ্ট বই খুসী নয়, সে জন্য তাহারা সাধ্যমত ঐ শিক্ষা ও স্বতন্ত্রতার বিরুদ্ধে বলিতে ছাড়ে না। কিন্তু অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া ইংরেজ মহিলারা যেরূপ সকল কাজে জাঁকাইয়া বসিয়াছে, তাহাতে তাহাদিগকে ঐ সব অধিকার হইতে এখন বঞ্চিত করা কাহারও সাধ্য নয়। ইংরেজ পুরুষেরা যদি উহা করিতে সাহস পায় তাহা হইলে নারীগণ মুখামুখি যুদ্ধ ছাড়িয়া হাতাহাতি লাগাইবে।

আর ঐ রূপ শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভ করিয়াই কি ইংরেজ মহিলারা স্থির রহিয়াছে? তাহারা এখন অনেক বিষয়ে পুরুষের সমান পদ পাইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও তাহারা সন্তুষ্ট নয়; কিছু দিন ব্রিটন বাসে বা ইংরেজী সংবাদ পত্র পড়িলেই জানা যায় যে ব্রিটিনবাসিনীরা নিজেদের অবস্থা আরো উন্নত ও সর্ব্বত্র পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার ও পদ পাইবার জন্য প্রতিদিন কত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়া থাকে। প্রত্যহ দেশের কোথাও না কোথাও বক্তৃতা করিয়া নিজেদের অভাব ও অবস্থা পরস্পরকে জানা-

ইতেছে। সতত পরস্পরের সাহায্য ও শিক্ষার জন্য সকলে প্রস্তুত রহিয়াছে। এদেশে পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচনের সময় স্ত্রীলোকদের মত দিবার আইন নাই, সে কারণে মিসেস্ ফসেট, মিসেস্ বেসেণ্ট প্রভৃতি শিক্ষিত মহিলারা সর্ব্বত্র মহা আন্দোলন করিতেছেন; শ্রম, একত্ব ও অধ্যবসায় বলে তাঁরা যে সময়ে ঐ অধিকার পাইবেন তাহার সন্দেহ নাই। কেন না, তাঁহাদের যত্নে অল্পদিন হইল, অনেক তর্ক ও বক্তৃতা ইত্যাদির পর ইংরেজ মহিলারা লণ্ডন কাউণ্টি কাউন্সিলের সভ্য হইবার অনুমতি পাইয়াছেন, ও ইহার মধ্যে দশ বার জন স্ত্রীলোক মেম্বর হইয়াছেন।

প্রকৃত শিক্ষা ও স্বাধীনতার সঙ্গে ব্রিটনবাসিনীদের বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি প্রখর হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের মন দৃঢ় ও চরিত্র সবল হইয়াছে। অনেক স্ত্রীলোক পুরুষের সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া আপনারাই আপনাদিগের ভরণপোষণের ভার লইতেছে। অনেক গ্রন্থকর্ত্রী পুস্তক রচনায় মাসে দু তিন হাজার অর্থ উপার্জন করেন। এদেশে প্রায় ৫০ জন স্ত্রীলোক ডাক্তার আছেন, আর দু তিন শ উপাধিধারী নারী দেখা যায়। প্রায় পঞ্চাশ হাজার স্ত্রীলোক শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আছে, আশি হাজার বালিকা- (এদেশের বালিকা, আমাদের দেশে তাহারা দিদিমা হইয়া পড়ে),—কেরাণীর কাজ করে। তাছাড়া দোকান পসারে ও ছোট ছোট কাজে যে কত স্ত্রীলোক খাটিয়া জীবিকা উপার্জন করে তার শেষ নাই। অনেক সময়ে কন্যারা অর্থ উপার্জন করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতাদিগকে পালন করে; ভগিনীরা চাকরী দ্বারা অনাথ শিশু-ভ্রাতা ভগিনীদিগকে বাঁচাইয়া রাখে; বিধবারা স্বতন্ত্র ভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া সমাজে নিজেদের মান্য ও সন্তানদের পদ বজায় রাখে। এইরূপে অনেক কাজে স্ত্রী পুরুষের সমানে খাটিবার অধিকার থাকাতে ইংরেজ সংসার ও সমাজ যে কত বল ও উপকার পায় তা লিখিয়া বলা যায় না। গ্রেট ব্রিটনে স্ত্রীলোক ও বালিকাদের প্রায় ৪৫ খানা সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা আছে, অধিকাংশই স্ত্রীলোকদের দ্বারা চালিত। তার মধ্যে 'কুইন' নামে সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র সর্ব্ব প্রধান; উহার গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ১,০০,০০০ এক লক্ষ। ছোট বড় মহিলাদের পরস্পরের মিলন ও আলাপের জন্য প্রতি নগর ও জনপদে দু চারটী সভা ও ক্লব আছে, সেখানে তাহারা বক্তৃতা দেয় ও কথাবার্ত্তা কহে। তাহা ছাড়া অনেক পরোপকারী ধনী ও শিক্ষিত নারীদের সাহায্যে ও যত্নে গরীব ও শ্রমজীবী স্ত্রীদের জন্য প্রতি নগরে কত ছোট ছোট সভা ও আড্ডা খোলা হইয়াছে। সেখানে তারা কাজ শেষে নানা প্রকার আবশ্যকীয় শিক্ষা পায় ও গান বাজনা ইত্যাদি নির্দ্দোষ আমোদ আহ্লাদ করে। দেশের রাণী হইতে নিতান্ত দরিদ্রবালা পর্য্যন্ত আত্ম নির্ভর করিতে জানে ও পরস্পরের উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে।

এই সব পড়িয়া স্বদেশীয় ভগিনীরা দেখিবেন ইংরেজ মহিলাদের শিক্ষা আমাদের

চেয়ে কত উচ্চ, তাদের স্বাধীনতা কত প্রশস্ত ও তাদের জীবন সংসারে কত উপকারী। তথাচ ইংরেজস্ত্রীদের এত শিক্ষা, কার্য্যশক্তি ও এত দিনের স্বাধীনতার মধ্যেও আমরা যখন তাহাদের উপর পুরুষের আধিপত্য ও কর্কশ আচরণ দেখিতে পাই, তখন এত অল্প কালের মধ্যে ভারতীয় নারীদিগকে সকল বিষয়ে পুরুষের সঙ্গে সমভাবে গণ্য দেখিব কি প্রকারে? সময়ে যে ব্রিটন মহিলাদের ন্যায় আমাদের অবস্থাও উন্নত ও ভারত মহিলারা আবার সর্ব্বত্র পূজিত হইবেন তাহার কোন ভুল নাই। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা রাণী অ্যানের কালের ইংরেজ স্ত্রীদের অবস্থার মত, আমরা সবে শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি; যে দিন আমরা সকল বিষয়ে সুশিক্ষিতা হইয়া স্বাধীনতার যথার্থ মর্ম্ম বুঝিব সে দিন ভারতের অন্তঃপুরই বল, আর রীতি নীতিই বল, কিম্বা সমাজই বল—কিছুই আমাদের গতি আটকাইতে পারিবে না।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।
('ইংলণ্ডে বঙ্গ মহিলার' লেখিকা)

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ভাষা।

"ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে"।

ভাষার মধ্যে এমন কতকগুলা কথা আছে, যাহা কানের কাছে প্রাণের কাছে কেবল কোলা ব্যাং এর মত কড় কড় করিতে থাকে, মনে হয় যে, সে কথা গুলো না থাকিলেই ভাল হইত। আর প্রীতি পদার্থটা সার্ব্বভৌমিক করিতে পারিলেই যেমন তাহার জন্মের উদ্দেশ্য সফল হয়, শব্দ সমুদ্রের মধ্যে ও তেমনি কয়েকটা কথা আছে যাহা সুধা বিশেষ, মথিয়া তুলিতে পারিলে অমর হওয়া যায়। তবে জগতে ব্যাংগুলারও ত আবশ্যক আছে। আষাঢ়ের ঘোর বর্ষায়, ভেকের অবিশ্রাম সমতান কড় কড় ধ্বনিতে আকাশের কোমল হৃদয় ফাটিয়া ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িয়া থাকে, সেইরূপ ঘোর ঈর্ষার নীরস, নিষ্ঠুর কথা গুলোর কড়কড়ানিতে কোমলতার হৃদয় ফাটিয়া অশ্রু ঝরিয়া থাকে; তবে কি জগতে উভয়েরই জন্ম কেবল যাতনার অশ্রু আদায়ের জন্য? তাহাতে কি সুখ কে জানে? যাউক, কিন্তু সমুদ্রের বুকে যেমন কালাগ্নি ও অমৃত, শম্বুক ও রত্ন, দুইই আছে তেমনি শব্দ সিন্ধুর মধ্যে সুধা ও হলাহল দুইই আছে। উপরোক্ত ছত্রটী যাঁহার হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়াছে তিনি মনুষ্য হইলেও দেবতা।

যদি, কেহ এই সুখ, দুঃখ, আশা, তৃষা, লালসা, বাসনা, অতৃপ্তি, অপূর্ণতা সংক্ষুভিত জগতে শান্তি আকাঙ্ক্ষা করেন, পূর্ণতার অন্বেষণ করেন, তৃপ্তির আস্বাদন চাহেন, তবে "ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে," এই মূল মন্ত্রে সাধনা করুন, দেখিবেন যাহা অতি দূর দুরান্তরে—যাহা সহস্র কর্ম্মানুষ্ঠানে সিদ্ধ হয় নাই, সেই অমূল্য শান্তিনিধি "ভাল বাসিবে বলে ভালবাসিনে," এই মহামন্ত্রের সাধনে লাভ করিয়াছেন।

(হৃদয়।)

হৃদয়টা আমাদের বিশাল দর্পণ। ইহাতে বিশ্বের ছায়া প্রতিফলিত হয়, যিনি এই ছায়া ধরিয়া রাখিতে পারেন তিনি ফটোগ্রাফার কবি। যিনি পারেন না তিনি শূন্য (০)। যাউক, এমন কোন একটী ভাব নাই বা থাকিতে পারে না যাহা আমাতে আছে তোমাতে নাই, ইতর বিশেষ কেবল বিকাশ লইয়া। তোমাতে যাহা আমাতেও তাহা আছে সেই জন্যই আমি তোমাকে ভালবাসি, এই সাদৃশ্য যদি না থাকিত তাহা হইলে কখন মনুষ্য মনুষ্যকে ভাল বাসিতে পারিত না, যে ঘৃণাভাজন সে কাহার ও স্নেহভাজন হইতে পারিত না, শ্রদ্ধাভাজন, ভক্তিভাজন ইত্যাদি কথারও সৃষ্টি হইত না। তোমার হৃদয়ে যদি অন্যের হৃদয় প্রতিবিম্বিত না হয় তাহা হইলে তুমি অন্ধ, একা ঘরের ভিতরে বসিয়া থাকিও, রাস্তায় বাহির হইয়া অযথা লোকের ঘাড়ে পড়িও না, নিজের একটী অঙ্গহীনতার উপরে আর একটা অঙ্গহীনতা বৃদ্ধি করিয়া লোকের দোষ দিয়া অন্যায় বিবাদে প্রবৃত্ত হইও না।

বর্ষা সঙ্গীত।

বর্ষা।

নামিল বরষা আসি।
ঘোর জলদ জাল,
গগণ আবরিল,
চমক চপলা হাসি,
নামিল বরষা আসি।
শ্বেত পতাকা,
উড়িল বলাকা,
চাতক নীর পিয়াসী,
নামিল বরষা আসি।
ঘন গর জন,
অনিল স্বন স্বন
বজ্র বিকট ভাষী,
নামিল বরষা আসি।
কলাপ বিথারি
ময়ুর ময়ূরী
নাচিল হরষে ভাসি,
নামিল বরষা আসি।
বিশিখ পারা
বাঁকা বৃষ্টি ধারা,
নাশিল উতাপ রাশি,
নামিল বরষা আসি।

শ্রীগিরীন্দ্র মোহিনী দাসী।

একাকিনী।

সুনিবিড় ঘন গরজে সঘন,
ঝর ঝর বারি-ঝরণা !
সচকিত দিশি, চমকিত নিশি
ঘোর তামসী বরণা !
স্বন স্বন স্বন দুরন্ত পবন ;
চমকিছে মুহু দামিনী !
সেগো একাকী আপনে, রয়েছে কেমনে
বুঝি জাগরণে কাটে যামিনী ?
যত গরজন গুরু হিয়া দুরু দুরু,
শূন্য পানে আঁখি লগনা, —
বুঝি আমারি স্মরণে আমারি স্বপনে
আমারি বিরহে মগনা।

ওগো একাকী ফেলিয়া এসেছি চলিয়া
কেমনে সে হিয়া বাঁধিছে ?
সেই মলিন বয়ান ছল ছুনয়ান
আঁখি পরে শুধু জাগিছে।
সেযে কত কেঁদে কেঁদে বাহু দিয়ে বেঁধে
বলেছিল "ওগো যেয়োনা,
যদি নিতান্তই যাবে কি বলিব তবে
বেশী দিন যেন রয়োনা।"
এযে— কঠোর হৃদয় বজ্র শিলাময়,
তাই ফেলে আছি তাহারে ;
সেযে— একা শূন্য ঘরে—নিশিদিন ধ'রে
কেবলি ভাবিছে আমারে।

শ্রী—দেবী।

পালিতা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এক শ্রেণীর বুদ্ধিমান লোক দেখা যায়, কোন বিষয় ধারণা করিতে তাঁহাদে অধিক সময় লাগে না। কোন যুক্তির জটিল শৃঙ্খলও তাঁহারা সহজে উন্মুক্ত করি আয়ত্ত করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু কোন বিষয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত ভেদ করি ইহাঁদের চেষ্টা জন্মে না, বিষয়টির অল্প দূর দেখিয়াই ইঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন।

চারু এই শ্রেণীর বুদ্ধিমান;—তাহার বুদ্ধি প্রখর, কিন্তু অগভীর। এরূপ বুদ্ধির প্রধা গুণ, সকল রূপ যুক্তিতে ইহা উন্মুক্ত, সুতরাং ইহা অন্ধভাবে কোন মতের খুঁটি ধরি থাকিতে চাহে না, কিন্তু ইহার প্রধান দোষ এই, ইহাতে জীবনের উদ্দেশ্যের এক স্থিরতা জন্মে না। অটল বিশ্বাসে স্থায়ী মনের ভাব গঠিত হইলে স্বভাবে যেরূপ তে স্বীতা জন্মে, লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইতে যেরূপ বল পাওয়া যায়, এরূপ অস্থির বুদ্ধি লোকে পক্ষে তাহা অসম্ভব। অপেক্ষাকৃত গভীর ও জটীল বুদ্ধির সংঘর্ষণে আসিলে ইহা

নিজত্ব সহজেই লোপ পাইয়া যায়—ইহারা কোন পথে অগ্রসর হইবে না হইবে, তথন তাহা আর সম্পূর্ণ তাহাদের নিজের উপর নির্ভর করে না। অন্ততঃ কিশোরীর সংসর্গে আসিয়া চারুর জীবনে এইরূপ ঘটিয়াছে, তাহার দুর্ব্বল স্বভাব ক্রমশঃ দুর্ব্বলতর হইয়া পড়িয়াছে। কিশোরীর পরিবর্ত্তে সে যদি কোন মহৎ আশ্রয়ের অটল বিশ্বাসের মধ্যে আসিয়া পড়িত ত সম্ভবত তাহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চালিত হইত।

চারু যথন ১৬ বৎসরের বালক এণ্ট্রেন্স ক্লাশে পড়ে তথন পাঠক তাহাকে ক্লাশের একজন ভাল ছোকরা বলিয়া জানিতেন, তাহার পর এল্ এ পর্য্যন্ত দিয়া সে বিদ্যালয় ছাড়িয়া দিল। তাহার বিশ্বাস জন্মিল—পরীক্ষা দেওয়া তাহার জীবনের কার্য্য নহে, নির্লিপ্ত ভাবে কবিতার সাধনা দ্বারা—তাহার কবিত্ব শক্তিকে পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া তুলাই—তাহার জীবনের উদ্দেশ্য। কলেজ ছাড়িয়া দেওয়াতে প্রথমটা জগৎ বাবু একটু অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু যথন মাসিক পত্রে সাপ্তাহিক পত্রে অনবরত চারুর কবিতা বাহির হইতে লাগিল, জগৎ বাবুর আলাপী বন্ধুগণ তাঁহার বালক পুত্রের প্রতিভা শক্তির ব্যাখায় তাঁহাকে নিতান্ত গর্ব্বিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন তথন আর জগৎবাবু চারুর সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার টাকা আছে, উপার্জ্জনের জন্য চারুর পরীক্ষা দিবার আবশ্যক নাই,—যে কোন প্রকারে হউক, চারু সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলেই তিনি সন্তুষ্ট। কিন্তু চারুর কবিত্ব শক্তি থাকিলেও উচ্চদরের প্রতিভার তাহাতে অভাব। প্রতিভার অশ্রান্ত অধ্যবসায়, নিত্য নূতন দিব্য দৃষ্টি তাহাতে ছিল না, সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই তাহার কবিতা-উৎস, ভাবের ভাণ্ডার শূন্য হইয়া পড়িল। তথন সংবাদ পত্রের প্রকাশিত কবিতাগুলি পুস্তকাকারে বাহির করা—সমালোচনার প্রশংসা অপ্রশংসা নিতান্তই হেয়স্কর জ্ঞান সত্বেও সমালোচনার প্রশংসার জন্য লালায়িত হওয়া এবং সর্ব্বোপরি, কিশোরী-দার মত সমজদার ব্যক্তির নিকট অহরহ সেক্সপিয়ার নামে অভিহিত হওয়াই তাহার কবিত্বের পরিণতি, জীবনের সুখ হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপে কবিতার সহিত তফাৎ হইয়া দিন দিন সে কিশোরীর সহিত অধিক ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে লাগিল। কিশোরী আইন পড়িত, চারু আইন দিবার ইচ্ছায় মাঝে আবার বি, এ পড়িতে আরম্ভ করিল—কিন্তু পরীক্ষার পরিশ্রম-অভ্যাস অনেক দিন গিয়াছে, সুতরাং এক বৎসর পড়িয়াই সে সঙ্কল্প তাহার ত্যাগ করিতে হইল,—জগৎ বাবু দেখিলেন—চারু কিছুই করে না, না কবিতা লেখে,না পড়াশুনা করে, তিনি তাহাকে ডাক্তারি শিখিতে অনুরোধ করিলেন। ২৩ বৎসর বয়সে বিবাহের কিছুদিন পরে সে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত হইল। সৌভাগ্য ক্রমে (তাহার বা কলেজের জানিনা) এথন পর্য্যন্ত কলেজে তাহার নামে বেতনটা জমা হইয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য এই দশ বৎসরে তাহার ধর্ম্মভাবও নানারূপে পরিবর্ত্তিত হই-

য়াছে। এক ঈশ্বরে বিশ্বাস হইতে ক্রমে বৈজ্ঞানিক সন্দেহ-বাদকে সে যখন অটল খুঁটির ন্যায় আশ্রয় বলিয়া ধরিয়াছে,—তখন সহসা মাদাম ব্লাভাটস্কির অভ্যুদয়ে তাহার ধর্ম্মভাবেরও আবার রূপান্তর হইল। হিন্দুশ্রেষ্ঠ কিশোরী হিন্দুধর্ম্মের পুনরুন্নতি বাসনায় 'থিয়সফিষ্ট' হইল, চারুও তাহার অনুবর্ত্তী। তফাতের মধ্যে 'থিয়সফি'র মতামতের উপর নির্ভর করিয়া কিশোরী থিয়সফিষ্ট হয় নাই সুতরাং থিয়সফিষ্ট হওয়ার সহিত তাহার ধর্ম্ম বিশ্বাসের কিছুই যোগ ছিল না। চারু তাহার মত ভণ্ড নহে, সুতরাং সে মাদাম ব্লাভাট্স্কির ন্যায় বুদ্ধিমতী সুতার্কিক রমণীর মুষ্টিতে আসিয়া সহজেই তাঁহার যুক্তিতে নমিত হইল, এবং বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই সে থিয়সফিষ্ট হইল। তাহার জীবনে এই সময় দারুণ পরিবর্ত্তন ঘটিল—চারু ধর্ম্মশাস্ত্র এই প্রথম আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইল, বুদ্ধের নির্ব্বাণ—হিন্দুর মোক্ষ, পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম, নির্গুণ সগুণ ঈশ্বর, কর্ম্মফল এই সকল আলোচনা করিয়া কর্ম্মফল এবং নির্গুণ ঈশ্বরে সে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আর মহাত্মা গুরুর জন্য লালায়িত হইয়া মদ্য মাংস পরিত্যাগ করিল,—এই সময় হইতে কিশোরীর সহিত তাহার দেখা শুনা ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল। ইহার পর মাদাম কুলোর আবির্ভাবে মাদাম ব্লাভাটস্কির দৈবশক্তি এবং মহাত্মাদিগের অস্তিত্ব যখন মিথ্যা সপ্রমাণ হইল তখন সে হৃদয়ে আঘাত পাইল বটে, কিন্তু তাহার ধর্ম্ম বিশ্বাস অবিশ্বাসে পরিণত হইল না—মাদামকে সে ভণ্ড বলিয়া জানিল, থিয়সফির সভায় তাহার আর যোগ রাখিতে ইচ্ছা হইল না, তাহার ধর্ম্ম বিশ্বাসও কিছু পরিবর্ত্তিত হইল কিন্তু সম্পূর্ণ নহে, সে নির্গুণ ঈশ্বর আর অখণ্ড কর্ম্মফলের পরিবর্ত্তে সগুণ ঈশ্বরের করুণা, প্রসাদ তাঁহার মঙ্গলভাব অনুভব করিতে লাগিল—এই সময় তাহার স্ত্রী সম্মিলন। কিন্তু তাহার জীবনের এই আনন্দ দিন, ধর্ম্মের প্রেমের এই শুভ সম্মিলন অবস্থা—স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সহসা অস্তপ্রাপ্ত হইল—দারুণ অন্ধকারের মধ্যে তাহার জ্ঞান বিশ্বাস জ্যোতি সহসা ডুবিয়া গেল।

ইহাতেই বুঝা যাইতেছে—চারুর ধর্ম্ম বিশ্বাস তখনো সজ্ঞান বিশ্বাস দিয়া গঠিত হয় নাই—সে বিশ্বাস তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারে নাই। যে বিশ্বাসে ঈশ্বরের ন্যায় করুণা নিজের অস্তিত্বের মত প্রত্যক্ষ সত্যভাবে আত্মায় অনুভূত হইয়া ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরতা জন্মে তাহাই আত্মাগত প্রবুদ্ধ স্থির বিশ্বাস; সুতরাং বাহিরের ঝড় বাতাসে তাহা টলে না, সুগভীর দুঃখান্ধকারেও তাহা ধ্রুব তারার ন্যায় পথপ্রদর্শক। ইহাই মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক ভাব। মানুষের আত্মার অনন্তের প্রতি এমনি একটি আকর্ষণ আছে, পূর্ণ মঙ্গলের প্রতি এমনি অনুরাগ আছে—যে পৃথিবীর সহস্র অপূর্ণতা, দুঃখ অমঙ্গলের মধ্যেও এই বিশ্বাসেই তাহার যথার্থ সান্ত্বনা। সুতরাং নৈরাশ্য পীড়িত, অন্ধকার অবিশ্বাস-গ্রস্ত মনুষ্যেতেও অতি সামান্য কারণে এই স্বাভাবিক ভাব স্ব-প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। স্নেহলতার একটি মাত্র সেই সান্ত্বনাপূর্ণ মমতাদৃষ্টিতে চারুর সেই

ভয়ঙ্কর মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন সূচিত হইল। সেই দৃষ্টিতে ঈশ্বরের করুণা ঈশ্বরের মঙ্গলভাব আবার তাহার মনে জাগাইয়া তুলিল, জীবন আর লক্ষ্যহীন ভারগ্রস্ত বলিয়া বোধ হইল না,—মুহূর্ত্তে যেন সে আবার তাহার জীবনের যুগ যুগান্তর উল্লঙ্ঘন করিল।

দ্বিপ্রহরের আহারাদির পর অন্তঃপুরে যে যাহার ঘরে সকলে বিশ্রাম করিতেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, স্নেহলতা নিরুপদ্রবে বাগানের সম্মুখের বারান্দায় একাকী বসিতে অবসর পাইয়াছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে—বারান্দার ধারে খোলা আলিশার টবে ফুল গাছের পাতায় পাতায় মুক্তার মতন বৃষ্টি ফোটা শোভিত হইয়াছে, বাগানের আর্দ্র গাছ পালা সরস নবীন হইয়া আনন্দ ভরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, সরোবরের বায়ু-আন্দোলিত বক্ষে তীরের বৃক্ষপত্র খসিয়া খসিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। শীতাতুর কাকের দল আর্দ্র পাখনা ঝাড়া দিয়া কাতর বিকৃত কণ্ঠে কাকা করিয়া উঠিতেছে,—স্নেহলতা বাগানের দিকে চাহিয়া গুণ গুণ করিয়া গান করিতেছিল, আর গাহিতে গাহিতে মাঝে মাঝে হাতের একখানি পুস্তকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল।

এই সময় টগর আসিয়া বলিল,—"কি হচ্ছে দিদি? বই পড়া? আঃ তোমার সারা দিন ঐ এক কাজ!" বলিতে বলিতে সে স্নেহের নিকটে বেঞ্চের উপর বসিল, স্নেহ মৃদু হাসিয়া বই খানি বন্ধ করিল।

পাঠক জানেন, স্নেহই টগর অপেক্ষা দুই বৎসরের বড়, কিন্তু দেখিতে টগরকে স্নেহ হইতে এত বড় দেখায় যে তাহাকে স্নেহের মায়ের বয়সী মনে করিলেও অসঙ্গত হয় না। টগরের সমুখে প্রায় চুল নাই, যাহা আছে তাহাও পরিপাটি রূপে টানিয়া উঁচু খোপার সঙ্গে বাঁধা, প্রশস্ত সিঁথিতে এক রাশ সিন্দুর, ভারী ভারী মুখ, সালঙ্কৃত হৃষ্ট পুষ্ট শিথিল দেহ, সমস্ত মূর্ত্তিতে অর্দ্ধ বয়স্কা গৃহিণীর ভাব। আর স্নেহলতা? বৃন্তস্থিত ফুলের মত তাহার ক্ষীণ তনু-সংলগ্ন মুখের প্রফুল্ল সরল কান্তিতে, করুণ মধুর দৃষ্টিতে, কোমল পাণ্ডুবর্ণ লাবণ্যে—অসজ্জিত সাজসজ্জায় যেন চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকার স্বপ্নময়ী মূর্ত্তি বিরাজিত, সরল বুদ্ধির গাম্ভীর্য্য সে মুখে ব্যাপ্ত, কিন্তু সংসারের কুটীলতার চিহ্নলেশ যেন তাহাতে নাই। তাই বাল্যের অপরিস্ফুট সৌন্দর্য্যেই তাহার যৌবনের মাধুর্য্য অতি স্নিগ্ধরূপে বিকাশিত।

টগর স্নেহলতার কাছে বসিয়া তাহার হাত হইতে বইখানা লইয়া দেখিয়া বলিল— "দাদার বই যে, তা থাক এখন পড়া থাক, একটা কথা বলি শোন, আজ শনিবার থিয়েটারে চল।"

স্নেহ বলিল—"আজ ঠাকুরপো আসবে তুই থিয়েটার যাবি?" টগর নীচের ঠোঁট খা সাধ্য উপরে বাড়াইয়া বলিল "তবে ত সবই হোল! তিনি ত এসে তোমার সঙ্গে দাদার সঙ্গে গল্প করে খেয়ে দেয়ে নিদ্রা দেবেন—আর আমি খুকীকে নিয়ে সারারাত জেগে মরব, তার চেয়ে থিয়েটার গেলে একটা রাত আমোদে কাটবে—"

স্নেহ হাসিয়া বলিল—"তা গেল-হপ্তায় আমরা গেলুম, আবার মেসমশায় যেতে দেবেন ?"

টগর—"বাবা বুঝি টের পাবেন, তুই যাবি কি না বল না—সে ভার আমার উপর"।

মেশমশায়কে লুকাইয়া যাইতেও স্নেহের ইচ্ছা নাই কিন্তু টগর আগ্রহে তাহাকে যাইতে অনুরোধ করিতেছে—তাহাকে 'না' বলাও তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ, কোন বিষয়ে সহসা কাহারো মনে কষ্ট দিতে সে অপারক, সুতরাং সে মুস্কিলে পড়িয়া বলিল "আজ থাক না ভাই; এই বৃষ্টি বাদল"—

টগর রাগ করিল—বলিল—"বাবা এত সাধলে শিবের মাথায় ফুল পড়ে। মায়ের যদি খুকীকে না রাখতে হোত তা হলে কি আমি তোকে সাধি!"

স্নেহ বলিল—"আজ কি হবে ?"

টগর। "হবে বিবাহবিভ্রাট আর সতী কি কলঙ্কিনী। সখীরা কি সুন্দর গায় ভাই, সেই গানটা গাত ভাই দিদি—"

স্নেহ—"কোনটা ?

টগর—"সেই যে সেইটে, চল চল মোরা।"

স্নেহ। "মোট একদিন শুনেছি আমার ভাই মনে নেই"

টগর। "না মনে নেই ? তোকে গাইতে বল্লেই ঐ এক কথা, এদিকে নিজের মনে রাত দিন গুণ গুণ হচ্ছে। এতক্ষণ বাগানের দিকে চেয়ে কি গাচ্ছিলি শুনি—"

স্নেহ "সে থিয়েটারের গান নয়—"

টগর। "দাদার ঐ বইয়ের বুঝি ? আচ্ছা ভাই গা, আমাকে শিখিয়ে দে দেখি—"

এরূপ আদায়-বন্দবস্তে গান গাওয়াটা স্নেহলতার পক্ষে যদিও বড় সুবিধাজনক নহে, কিন্তু না গাহিলেও টগর রাগ করিবে—সে আধ আধ বাধ বাধ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া গান ধরিল, কিন্তু গাহিতে গাহিতে শেষে সমস্ত সংকোচ ভুলিয়া গেল, ক্রমে তাহার কোমল সুরতান অতি মধুর ভাবে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, সে গাহিল,—

হায়রে, হোলনাত মালা গাঁথা!
সারা বেলা ফুল তুলে
গাঁথব বলে এনু কূলে
কে জানে গো কেমন ভুলে
ভাবতে ভাবতে কাহার কথা,—
আঁচল খসে ফুল রাশি
স্রোতের জলে গেছে ভাসি
মুছে আঁখি—চম্‌কে দেখি
কোলে পড়ে খালি সূতা!

ঐ যে বেজেছে বাঁশি
তরীখানি আসিছে ভাসি
এখনি সে হাসি হাসি
চাহিবে মালা, কি করিব ছুতা ?
তার পিয়ার গলে, দেবে বলে—
চেয়েছিল মালা গাছি
আপনি যাচি ;
বলেছিল—আর,
হবে　সুখের বাঁধন তার,
পরিলে বালা—
আমার হাতের এ মালা ।
হায় ! কে আমি তাহার !
ওগো পূরাতে নারিনু তার সাধ,
সাধিল রে বাদ,
পোড়া নয়নের ধার !
জানে না সে তা ।
সে যে মালা চেয়ে নাহি পাবে
নিরাশ প্রাণে ফিরে যাবে—
চির দিন মোর প্রাণে জাগিবে ব্যথা ।
হায়রে ! পূরাতে নারিনু তার সাধ—
এ জীবনই বৃথা !"

শনিবারে সকাল সকাল কালেজের ছুট, চারু বাড়ীভিতর আসিয়া বারান্দায় পা দিবার আগেই গানের সুর শুনিতে পাইল তাই বারান্দায় না গিয়া দ্বারদেশেই দাঁড়াইয়া রহিল। গানের প্রতিপদ যখন কোমল সুকণ্ঠ নির্গত হইয়া সুস্বরে সুতানে উঠিতে পড়িতে লাগিল তখন চারুর গান রচনা সার্থক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। গানটিও থামিল—চারু গৃহে প্রবেশ করিল, তাহাকে দেখিয়া স্নেহের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, টগর হাসিয়া বলিল "দাদা সব লুকিয়ে শুনেছে—তা দাদার সাক্ষাতে আবার গাইতে লজ্জা। আগে ত কত গেয়েছিস"—

চারু বলিল—"তোদের লজ্জার যদি একটুও মানে মোদ্দা আছে। গাও না স্নেহ"

স্নেহ আবার লাল হইয়া উঠিল, চারু আবার বলিল—"গাও না স্নেহ তাতে কি লজ্জা।"

টগরও বলিল—"গা না দিদি" যদিও সে গাহিলে যে টগর মনে মনে বড় প্রশংসা

করিত তাহা নহে। এই সময় ঝি আসিয়া বলিল—"দিদিমণি এই বারান্দায়! আমি সাতগাঁ খুঁজে মরচি! খুকী যে কেঁদে সারা—মা কত বকছে এস শীগ্‌গির—"

"যাচ্ছি! মাগো! একদণ্ড কোথায় বসার যো নেই" বলিয়া বিরক্ত ভাবে সে উঠিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

টগর চলিয়া গেল, চারু বেঞ্চের একধারে বসিয়া আবার বলিল—"স্নেহ গাও না—"

স্নেহ বলিল "আমি—আমি—পারব না"

চারু বলিল—"আমি এত ক'রে বলচি গাবে না ?"

স্নেহ তাহার দিকে চাহিল, চারুর মুখে হৃদয়ের আকুল আগ্রহের ভাব দেখিয়া তাহার মুখ মলিন হইয়া পড়িল—সে আবার কাতর স্বরে বলিল—"আমি জানি না—আমি—কি গাব—? আমি পারব না—

চারু বলিল - "যা জান "

স্নেহ খানিকটা চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর আবার সহসা বলিল—"চারু রাগ করো না—আমি পারব না—আমি পারলে গাইতুম তোমার এত বলতে হোত না।"

চারু দেখিল তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারিয়া স্নেহলতা ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, সে বলিল—"আচ্ছা থাক আমার একটা নূতন কবিতা শোন—তাই শোনাতেই আমি এসেছি।"

আজকাল চারুর লেখনী দিয়া আবার এক আধটা কবিতা বাহির হইতেছে। চারু পড়িল—

কে তুমি ধরায়, সতি, পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী!
শুভ্র সুবিমল যেন প্রভাতের ফুল!
নাহি সাজ সজ্জা কোন—মণি রত্ন আভরণ,
আপন রূপেতে তবু আপনি অতুল।
সংসার কঠোর ঘোর—ভেঙ্গেছে আশ্রয় তোর,
ছিন্ন বৃন্তে বিকশিত সৌন্দর্য্য তরুণা!
ম্লান ধরাতলে বাস—অধরে অটুট হাস,
হৃদয়ে লুকান অশ্রু নয়নে করুণা!
আপনার নাই কেহ, বিশ্ব তাই নিজ গেহ,
পরকে আনন্দদানে তোমার মহিমা!
যে যায় দলিত করে—তব বাস তারো তরে
বঙ্গের বিধবা তুমি— স্বর্গের গরিমা।

তখন ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল—বৃষ্টির সুগম্ভীর শব্দের মধ্যে চারুর কবিতা পাঠের সেই সুস্বর-লয়তান সুমধুর সঙ্গীতের ন্যায় স্নেহলতার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। প্রণয়ীর নিকট প্রথম প্রেম-সম্ভাষণ লাভে, আত্মায় আত্মার প্রথম অশরীরী স্পর্শ অনুভবে হৃদয়ে যে ভাবের তরঙ্গ বহিতে থাকে, কবিতার প্রতি ছত্রে চারুর স্নেহভাব বিকশিত দেখিয়া স্নেহের হৃদয়ে সেই তরঙ্গ উঠিতেছিল। এরূপ ভাবের উচ্ছাস তাহার হৃদয়ে এই প্রথম, সুতরাং ইহার কারণ সে বুঝিল না, কেবল নূতন, অজ্ঞাত, অকারণ এক সুখে তাহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। চারু কবিতা শেষ করিয়া বলিল—"কেমন হয়েছে ?"

স্নেহলতার স্বপ্নময়দৃষ্টিপূর্ণ নয়ন হইতে বড় বড় দুই ফোঁটা স্তম্ভিত অশ্রু সহসা খসিয়া পড়িল, স্নেহলতা চমকিয়া সলজ্জে আনত-দৃষ্টি হইয়া বলিল—"বেশ"।

চারুর হৃদয় সে অশ্রুতে ব্যথিত হইল, সে ভাবিল তাহার কবিতা স্নেহের মনে তাহার অসহায় অবস্থা জাগ্রত করিয়া দিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে সে আজ সহসা বলিল—"স্নেহ বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে তোর কি মত ?"

চারু স্নেহের সহিত নানাবিষয়ের গল্প করিত ; সময়ে সময়ে কথা প্রসঙ্গে ধর্ম্ম, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি—এ সকল বিষয়েরই কথা উঠিত, কেবল বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে সে অতি সাবধানে এ পর্য্যন্ত কোন কথা তুলে নাই, সুতরাং স্নেহ তাহার ঐ প্রশ্নে আশ্চর্য্য হইল, তাপর বলিল—"একবার বিয়ে হলে নাকি আবার বিয়ে হয় ?"

চারু বলিল—"যাদের বিবাহ বিবাহই নয়, নিতান্ত অল্প বয়সে যাদের বিবাহ হইয়াছে ?"

স্নেহলতা এবিষয়ে যে বিশেষ চিন্তা করিয়া একটা স্থায়ী অটল মত গড়িয়া রাখিয়াছিল তাহা নহে, —তবে সাধারণতঃ হিন্দুকন্যাদিগের যেরূপ হইয়া থাকে—কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়াও লৌকিক-জনশ্রুতি ও আজন্ম বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার মনে এ সম্বন্ধে যে একটি আদর্শ ভাব ছিল—বয়ঃক্রমের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই আদর্শ ভাবেরই শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিয়া বিধবামাত্রেরই জীবনে তাহা বরণীয় ইহাই তাহার ধ্রুব বিশ্বাস। তাহার পর চারু তাঁহার কবিতাতেও সেই আদর্শ ভাবেরই গুণগান করিয়াছেন, তাহাকে প্রশংসা করিতে গিয়া বিধবাদিগের নিঃস্বার্থ জীবনেরই প্রশংসাগান করিয়াছেন ইহাতে তাহার মনের অস্পষ্ট চিন্তা আরো সে পরিস্ফুট দেখিতে পাইল, তাহার লক্ষ্য পথ আরো সুপ্রশস্ত সুগম মনে হইতে লাগিল, সে বলিল—

"কিন্তু বিবাহই কি জীবনের উদ্দেশ্য ? কেন, শুনতে পাওয়া যায় বিলাতে অনেক কুমারী আজীবন অবিবাহিত থেকে চির জীবন পরোপকারে দান করেন, —আমাদের দেশে ত আর অবিবাহিত থাকার প্রথা নেই—কিন্তু বিধবারা—"

চারু। "হ্যাঁ যদি বিধবা মাত্রেই পরোপকারেই জীবন দান করিয়া আনন্দ লাভ

করিতে পারেন ত তাহার অধিক সুখের বিষয় কি আছে? কিন্তু জীবনের গতিবে এরূপ পথে প্রবাহিত করা সকলের পক্ষে সহজ নহে, কাহারো কাহারো পক্ষে একে বারে অসম্ভব। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে ঈশ্বর দত্ত যে পরস্পর মিলন আকাঙ্ক্ষা, সে আকাঙ্ক্ষা অতিক্রম করিয়া উঠা সকলের পক্ষে সমান সহজ নহে, কাহারো কাহারে পক্ষে একেবারে অসম্ভব। এই মিলনে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ, সুতরাং এ আকাঙ্ক্ষ অপবিত্র অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা নহে, তবে যেমন জলের স্বচ্ছতা পঙ্কিলতায় নষ্ট হয় সেইরূপ এই নির্ম্মলপ্রেমও মানুষ সময় সময় নিজের কলঙ্কিত প্রকৃতি দিয়া কলঙ্কি করে। সুতরাং যে সকল বিধবার প্রেমসর্ব্বস্ব হৃদয়, যাহারা একজনে আত্মদান ন করিয়া থাকিতে পারে না, যাহারা একজনের হৃদয় না পাইলে সংসার শূন্য দেখে এই মিলন ব্যতীত যাহারা কোন রূপ শিক্ষায়, কোনরূপ উপায়ে, আপনার আত্মা হৃদয়, মনের বিকাশ করিতে পারে না, তাহারা কি করিবে? তাহারা একজনে প্রেমে আত্ম-সমর্পণ করিয়া—সেই প্রেমকে কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া তখন জগতের ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে তাহাদের জীবন প্রসারিত করিতে পারে, নহিলে তাহাদের শূন্য লক্ষ্যহীন অসুখী জীবন সংসারে কাহারো সুখ সাধন করিতে পারে না। নিজের অসুখে সর্ব্বদা হাহাকার করিতে থাকে, শুষ্ক কাষ্ঠের মত সংসারের চিতানল জ্বালাইবার কার্য্যে লাগিতে পারে—কিন্তু সংসার কিছু আর তাহা হইতে শীতলতা লাভ করিতে পারে না সুতরাং যে সকল বিধবাগণ চির বৈধব্যে আনন্দলাভ না করিয়া সমাজের স্বার্থপূর্ণ নিষ্ঠু নিয়মের গুণে কেবল তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ নির্ম্মল পবিত্র প্রেমকে মলিন করিতে বাধ্য হয়, এবং এইরূপে মঙ্গলের পরিবর্ত্তে জগতে অমঙ্গল আনয়ন করে—তাহারা কি করিবে?” স্নেহ পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কখনো এরূপ করিয়া ভাবে নাই, তাহার ভাবিবার আবশ্যক হয় নাই, কেননা তাহার মনে এতদিন প্রকৃত প্রেম ভাবের উদ্রেক হয় নাই, সুতরা সে ইহার অভাব বুঝে নাই। মাঝে মাঝে কখনো কখনো অকারণে প্রাণে সে এ প্রকার শূন্যতা অনুভব করে সত্য, কিন্তু তখন সে মোহনের ছবিখানি দেখে—তাহা স্নেহের আদরের কথা গুলি মনে করে, শৈশবে তাহার প্রকৃত মর্য্যাদা সে বুঝি না, এখন মোহনের সেই ব্যবহার, আদর স্মৃতিগ্রথিত করিয়া তাহাকে মনে করিয়া রাখিতে চাহে, এবং ইহাই যে ভালবাসা, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত জানে। সুতরাং আজিকার পূর্বে এরূপ কথা এরূপ ভাবে তাহার মনেই আসে নাই। চারুর কথা যুক্তি দ্বারা সে অঠি মনে করিতে পারিল না, তবুও আজন্মসংস্কার-বিরুদ্ধ বলিয়া কথাটা বেশ হৃদয়ের সহি মানিয়া লইতে ইচ্ছা হইল না, সে আধা-প্রাণে বলিল—“হ্যাঁ তা—সত্য—কিন্তু—কিন্তু

চারু বলিল—“কিন্তু আবার কি? এই মনে কর—তোর কি আর বিয়ে করতে ইচ্ছা হতে পারে না”—কথাটা স্নেহের বড়ই খারাপ লাগিল—তাড়াতাড়ি বলিল- “না না আমার বিয়ে করতে ইচ্ছা হবে না”—

চারু। মনে কর তুই যদি কাউকে ভাল বাসিস ?

স্নেহ। কি কথাই বল ? ভালবাসলেই বুঝি বিয়ে করতে হয় ?

চারু দেখিল—এরূপ করিয়া তাহার সংস্কারের বিরুদ্ধে কথা বলিয়া তাহাকে ঠিক বুঝাইতে পারিবে না—তাই অন্য উপায় অবলম্বনের চেষ্টায় বলিল—"আচ্ছা আমি বিধবা বিয়ের কথা বলছি নে। মনে কর তোর যদি এতদিন পর্য্যন্ত বিয়ে না হোত, তাহলে ত তোকে বিয়ে করতে হোত"—

স্নেহ। "তা—তা তাহলে তাঁকেই বিয়ে করতে পারতুম—তা ছাড়া আর"—

চারু হাসিয়া বলিল—"মেয়েরা সব illogical। এখন যেন তাকে জেনেছিস তখন ত আর জানতিস নে"

এই সময় তাঁহাদের কথা বন্ধ হইল, টগর আসিয়া বলিল—"কি কথা হচ্ছে ?"

চারু বলিল—"টগর আজ শনিবার, জীবন দা এখনি আসবেন জানিস ত ?

টগর বলিল—"সে ত জানি—কিন্তু তোমাদের কি কথা হচ্ছেল আমাকে দেখেই যে সব চুপ"

চারু বলিল—"মস্ত কথা হচ্ছেল, তোকে বলব না, বলিসনে স্নেহ ?"

চারু হাসিয়া চলিয়া গেল,—টগরের ভারী রাগ হইল, সে বলিল "তা নাই বল্লে আমি শুনতে চাইনে।" বলিয়া সেও মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল।

স্নেহলতা ডাকিল—"টগর শুনে যাও সব বলছি—বিশেষ কিছুই কথা নয়"—

টগর ফিরিয়াও চাহিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্নেহলতা বিধবা হওয়া পর্য্যন্ত জগৎবাবু তাহার লেখা পড়ায় একটু বিশেষ যত্ন লইতেন। কেননা তিনি জানিতেন, জ্ঞান চর্চ্চার প্রবৃত্তি জন্মাইলে তাহার ভবিষ্যৎ-জীবন নিতান্ত উদ্দেশ্যহীন, অসুখের হইবে না। সুতরাং স্নেহলতা বাঙ্গলা বেশই শিখিয়াছিল, ইংরাজিও চলনসই রকম বেশ বুঝিতে পারিত। কিন্তু তাই বলিয়া স্নেহ যে একরাশ বই পড়িয়াছে তাহা নয়—একে তাহার সময় অল্প, গৃহের কাজ কর্ম্ম করিতেই প্রায় তাহার দিন কাটে, তাহারপর সময় হইলেও অজস্র পুস্তক কিছু আর তাহার আয়ত্তের মধ্যে নাই, তাহার জন্যও তাহার পরমুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, জগৎবাবু যতক্ষণে তাহাকে কোন একখানি বই কি. কাগজ আনিয়া দেন ততক্ষণে সে পড়িতে পায়। জগৎ বাবুও এ সম্বন্ধে নিতান্ত মুক্তহস্ত নহেন, যেমন তেমন বই অবারিত ভাবে তাহাকে পড়িতে আনিয়া দেন না, বাঙ্গলা মাসিক পত্র, ধর্ম্ম-গ্রন্থ, ইতিহাস, জীবনী, কখনো কখনো ভাল ভাল দু একখানি কাব্য উপন্যাস তাহাকে পড়িতে আনিয়া দেন এবং পড়া হইলে সেই বিষয়ে তাহার সহিত আলোচনা করেন।

ইহা ছাড়া সময় হইলে নিজে তাহার সহিত প্রাকৃতিকবিজ্ঞান ও সেক্সপিয়রের কাব্যাদিও পাঠ করেন।

এইরূপ সযত্ন-শিক্ষায়—স্নেহলতার মনোবৃত্তির প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বাল্যকাল হইতে প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া তাহার মৃদু স্বভাব যে সহিষ্ণুতাকে আশ্রয় লইয়াছিল, জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই সহিষ্ণুতা ঈশ্বরের প্রতি অটল নির্ভরের ভাবে পরিণত হইয়াছে। ঈশ্বরের করুণার প্রতি তাঁহার মঙ্গল ভাবের প্রতি তাহার এত গভীর বিশ্বাস, যে সে বিধবা বলিয়া কেহ যদি তাহার সাক্ষাতে বিধাতার প্রতি দোষারোপ করিয়া তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে সে দুঃখ তাহার মর্ম্মে প্রবেশ করে না—সে জানে ঈশ্বর মঙ্গলময়, তাঁহার রাজ্যে যে অমঙ্গল ঘটে, তাহারও পরিণাম পূর্ণ মঙ্গল। মানুষ অসম্পূর্ণ জীব, তাঁহার এই পূ মঙ্গলভাব তাই সকল সময় সে ধারণা করিতে অক্ষম, কষ্ট দুঃখ শোক তাপের শুভফ অনুভব করিতে অক্ষম। ঈশ্বর স্নেহের যে অবস্থা দিয়াছেন অবশ্য তাহার পক্ষে ইহা মঙ্গল নহিলে তাহার এ অবস্থা কেন ঘটিবে? ইহার বিপরীত মনে করিলে তাঁহা করুণার প্রতি অবিশ্বাস করা হয়।

কোন কারণে নিতান্ত পীড়িত হইলেও এইরূপ বিশ্বাস তাহাকে শান্তি প্রদান করে সুতরাং তাহার কথাবার্ত্তায়, মূর্ত্তিতে, হাব ভাবে, ব্যবহারে সকল বিষয়ে এই সরল বিশ্বা জাত একটি মধুর প্রশান্ত প্রসন্নভাব বিরাজিত। এইরূপে ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া, জগ বাবুকে ভালবাসিয়া, গৃহ কার্য্য লেখাপড়া করিয়া এবং সময়ে সময়ে মোহনের ক ভাবিয়া গৃহিণীর শত তিরস্কারের মধ্যেও তাহার দিন গুলি এক রূপ প্রশান্ত সু কাটিয়া যায়।

আজ চারু চলিয়া গেল, আজ তাহার আর পড়া শুনা হইল না, কেমন এক অ ভাবিক অশান্ত সুখের ভাবে তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে চারুকে বরাব ভাল বাসে, কিন্তু চারুর কবিতাস্তুতিতে তাহার অকৃত্রিম স্নেহ আজ সে প্রথম প্রক দেখিয়াছে। কবিতার প্রত্যেক লাইন তাহার মনে ছিল না তাহার দুএকছত্র ক্রমা তাহার মনে পড়িতে লাগিল—

"কে তুমি ধরায়, সতি, পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী
শুভ্র সুবিমল যেন প্রভাতের ফুল!

কি সুন্দর ছবি? কিন্তু কার? ইহার যোগ্য কে? অন্তত—

বঙ্গের বিধবা তুমি স্বর্গের গরিমা!

ছি ছি—এও কি কথা?—কি গুণ আছে? কিছু না। এ সমস্ত চারুর মনের ভ তাহার কল্পনার ছবি। চারু কবি, তাহার কবিত্ব সত্য, আর সব মিথ্যা।"

এ কবিতার সহিত প্রকৃতপক্ষে তাহার যে কিছু মাত্র মিল নাই, সে যে এ কবিত

নিতান্ত অযোগ্য তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল, তথাপি সে ইহাতে সুখবোধ করিল, কেন না ইহা চারুর স্নেহ-প্রকাশক।

স্নেহ এই তীব্র সুখে অশান্ত হইয়া পড়িল। অনেক সময় কষ্ট দুঃখ অনুভব করিলে সে যেমন মোহনের ছবিখানি দেখিতে যায়, আজ সুখকাতর হইয়াও সে গৃহে আসিয়া তাহার ছবিখানি বাহির করিল।

ফটোগ্রাফখানি ১০ বৎসর পূর্ব্বের তোলা। সুতরাং অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ সেখানি স্নেহের যেমন অস্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল এমন পূর্ব্বে হয় নাই। মোহনের আসল চেহারা তাহার মনে ছিল না; এই ফটোগ্রাফখানিতে তাহার মনে মোহনের একটি অস্পষ্ট মূর্ত্তি উদিত হইত, কিন্তু আজ সে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক ছবিখানি নিরীক্ষণ করিয়াও তাহার সেই অস্পষ্ট ছায়া ছায়া মূর্ত্তিও মনে আনিতে পারিল না। ছবিখানি দেখিতে দেখিতে তাহার মনে হইতে লাগিল চারুর সহিত ইহার যেন সাদৃশ্য আসিতেছে। স্নেহলতা চোখ বুজিল, মুদ্রিত নয়নের সম্মুখে চারুর জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিতে পাইল, চক্ষু খুলিয়া আবার ছবির দিকে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল সেখানি স্পষ্ট চারুর ছবি।

এই সময় হারার মা ডাকিল—"দিদিমণি মাঠাকরুণ ডাকছেন। বলি হয়েছে কি? গিন্নি যে দেখনু ভারী রাগ রাগ।"

স্নেহলতা যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল—সহসা চমকিয়া জাগিয়া উঠিল।

ভৌগোলিক প্রশ্ন। *

১। কোন্ নগরের কোণে কোণে পথহারা পথিকেরা নগরের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া ফিরে?

২। স্বাধীন কলি শাপবদ্ধ হইয়া আপনার মন্দির-গৌরবে পৃথিবীর নয়ন আকর্ষণ করিয়াছে কোথায়?

৩। বাঙ্গালার যশস্বীগণ কোথায় পদার্পণ করিলে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় সহসা নিষ্প্রভ ও ম্লান হইয়া পড়েন?

৪। আবরণপ্রিয়তা ভারতবর্ষের কোন্ অংশে প্রবল?

৫। চির-নিমন্ত্রণ কোথায় মিলে?

৬। লুচির ঐকান্তিক অভাব কোন্ দেশে?

৭। অবারিত দ্বারই বা কোথায়?

৮। রোষভরে লুব্ধনেত্রে আমাদের পানে চাহিয়া কোন্ দেশ?

৯। কোন্ দেশের অস্তিত্ব নাম মাত্র?

১০। নির্দ্দয় ধরণীতে দয়া মিলে কোথায়?

---

* গতবারের ভৌগোলিক প্রশ্নের উত্তর।

১। বৈদ্যবাটী।	৫। কামরূপ।	৯। কাটামুণ্ড।
২। খুল্না।	৬। রামকৃষ্ণপুর।	১০। নাসিক।
৩। পাবনা।	৭। বর্দ্ধমান।	১১। বঙ্গ।
৪। শ্রীহট্ট।	৮। বক্সার।	১২। আরব।

শ্রীমতী বিনয়কুমারী বসু ৮টি প্রশ্নের শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় ৯টি এবং শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ সাতটি প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

রাধা।

আমাদের দেশের প্রেম-চর্চায় যে সকল চরিত্র বিশেষ সহায়তা করিয়াছে তাহা মধ্যে রাধিকাই বোধ করি প্রধান। সীতা সাবিত্রী কাহিনী এ দেশে স্ত্রীজাতির চরি উন্নত আদর্শে গঠন করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ধর্ম্মের সহিত, উৎসবের সহি একীভূত হইয়া রাধিকার মত সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে কোনও চরিত্রই পা নাই। সীতা সাবিত্রীও কাব্য হইতে ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত, কিন্তু তাহাতে দে ব্যাপী আন্দোলনও হয় নাই, তেমন সাহিত্যও জন্মে নাই। এ সকল চরিত্র নীর দেশের চরিত্রগঠনে আংশিক স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে মাত্র। রাধিকার চরিত্র চরিত্র হিসা সকল দিকেই হীন। পাতিব্রত্যও নাই, সে তেজও নাই, সে শিক্ষা দীক্ষা ভ কিছুই নাই। কিন্তু এত হীন হইয়াও রাধিকা বঙ্গসাহিত্যের জননী, আধ্যাত্মি ব্যাখ্যার কেন্দ্রস্থল, এবং বোধ করি অনুসন্ধান করিলে আরও অনেক ইত্যাদি ইত্যা বাহির হয়। কারণ অবশ্যই আছে। নহিলে, কত শত মহৎ চরিত্রের সহিত প্রা দ্বন্দ্বিতা করিয়া রাধাই সমধিক ফুটিয়া উঠিবে কেন? রাধা রূপসী বটে, তেম আরও অনেক আছে। রূপসীর চিত্র আঁকিতে বিশেষ রূপে রাধার আবশ্যক ক না। আর গুণের কথা ত পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি—সংস্কৃত সাহিত্যের গুণবতীদিগে পার্শ্বে রাধা দাঁড়াইতে অক্ষম। তবে রাধা শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্তা বটে। কিন্তু কেব মাত্র এই কারণে রাধার প্রভাব সম্ভব নহে। প্রেমের গভীরতা সীতার চরি যেমন এমন আর কোথায়? রাধাকে ছাড়িয়া দিলে প্রেম-চরিত্রের আমাদের অভ হয় না।

কিন্তু তথাপি রাধাকে বিদায় দেওয়া চলে না। আমাদের দেশে রাধাকৃষে প্রণয়-সঙ্গীতেই মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার অনেকটা বিকাশ হইয়াছে রমণীর প্রেম আমরা মাতৃভাবে, পত্নীভাবে, কন্যাভাবে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিয়া কিন্তু কেবল রমণীভাবে বড় দেখি নাই। রাধার চরিত্রে এই ভাব কতকটা ফুটিব অবসর পাইয়াছে। বড় বড় চরিত্রের আদর্শ প্রেমের সহিত কলঙ্কিনী রাধিকার প্রে বিস্তর তফাৎ। সীতা সাবিত্রীর প্রেম দাম্পত্য প্রণয়ের চরম উৎকর্ষ। রাধার প্র সমাজ-নিয়মের ব্যভিচার। রাধা আদর্শ সহধর্ম্মিণী নহে, গৃহিণীও নহে। মাতৃভ রাধায় বিকশিত হয় নাই। কিন্তু তাহার মধ্যে রমণীহৃদয়ের একটা আকাঙ্ক্ষার ভ বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই জন্যই বোধ হয় এ দেশের সাহিত্যে রাধার এ প্রভাব। আরও এক কথা। অন্যান্য চরিত্র আমাদের ধর্ম্মের সহিত সম্বদ্ধ হই নীরবে গঠন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, রাধার চরিত্র ভাঙ্গনের সহায়তা করিতে

ক্রটি করে নাই। রাধা আসিয়া হিন্দুসমাজে এক বিপ্লব বাধিয়া যায়। ভাঙ্গন কার্য্যে একটা প্রবল মত্ততা আছে। সুতরাং তাহাতেও লোকের সহজে আকৃষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। ইহা ভিন্ন সে সময়ের সামাজিক অবস্থা হয়ত রাধার প্রভাব প্রতিষ্ঠার অনুকূল ছিল। বোধ করি, আমাদের সমাজে প্রেমচর্চ্চা তখন অনেকটা রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু মানব-হৃদয় কিছু আর সকল সময়ে সমাজ-নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলে না। রাধার আবির্ভাবে সে আপনার অন্তর-তন্ত্রীতে আঘাত অনুভব করিল। দেখিল, তাহার হৃদয়ের সহজ আকাঙ্ক্ষা রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-কাহিনীতে ব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ নানা কারণে আমাদের প্রেম-চর্চ্চায় রাধার বিশেষ প্রভাব। কিন্তু তাই বলিয়া উন্নত আদর্শ-সৃজনে বা চরিত্র গঠনে নহে।

তবে আধ্যাত্মিক ভাবে রাধাকে আদর্শ ভক্ত বলিয়া অনেকে গণ্য করেন। রাধা শ্রীকৃষ্ণের রূপে মুগ্ধা। সে রূপ তাঁহার অন্তরের স্তরে স্তরে বিঁধিয়াছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর। এ হিসাবে রাধার প্রেম বড় সামান্য নহে। কিন্তু সাধারণের নিকট, মুখে যে যাহা বলুক, কৃষ্ণ দেবতা হইয়াও মানবসন্তান।* কৃষ্ণের কল্পনা, হাস, বাঁশী, যমুনা, গোপিনী বৃন্দা এবং প্রণয়িনী রূপসী রাধিকার সহিত অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠতায় সম্বদ্ধ। কাব্য পাঠকালে অপার্থিব হিসাবে রূপক ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া বড় কেহ অর্থ করে না। এবং তাহা না করিলেও রাধিকার চরিত্র উচ্চ আদর্শরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। গূঢ়ার্থ যাহা কিছু থাকে বাদ দিলে রাধিকা কৃষ্ণের দেহে মুগ্ধ, যৌবনে আচ্ছন্ন, ভোগ লালসায় অধীর।† তবে এ দেহজ অনুরাগের মধ্যে অন্তরের একেবারে অভাব স্বীকার করা যায় না।

এখন কথা হইতেছে, রাধাকে কি ভাবে দেখা যায়? আধ্যাত্মিক রূপক হিসাবে না কবির সৃষ্টি হিসাবে? আমাদের দেশে কাব্যের সহিত ধর্ম্ম অনেকস্থলে এরূপ মিশিয়া গিয়াছে যে, পরিণতি দেখিয়া মূল ঠাহরাইয়া উঠা যায় না। উমা এখন ধর্ম্মের সহিত একীভূত, কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, কাব্যেই উমার প্রথম আবির্ভাব। কাব্য ধর্ম্মে পরিণত হইয়া আমাদের মধ্যে প্রেমের কতকগুলি ভাব অনু-

---

* ঠিক বিপরীত। কৃষ্ণ রাধার প্রেম ভারতবর্ষের আপামর সাধারণ দেবলীলা বলিয়াই বিশ্বাস করে। সেই জন্যই রাধিকার প্রণয়ের এত মাহাত্ম্য। ভাঃ সং।

† কথাটা ঠিক নহে। রাধা কৃষ্ণেই অনুরক্ত। কবিগণ তাঁহার পূর্ণানুরাগ উক্ত রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র। তাঁহাদের চক্ষে দেখিতে হইলে, বিশুদ্ধ প্রেমেও মানসিক একত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা হইতেই ভোগলালসার সৃষ্টি—ইহা সর্ব্বস্থলে দূষণীয় হইলে দাম্পত্য প্রণয়েও দূষণীয় হইত। সুতরাং কবিগণ রাধার অনুরাগের প্রগাঢ় ভাব সুচারুরূপে দেখাইবার জন্যই ঐ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ইংরাজি সাহিত্যেও যে উক্তরূপ ভাব প্রকাশের অভাব আছে তাহা নহে, তবে আধুনিক ইংরাজি রুচি অনুসারে আভাষ ইঙ্গিতে উহা ব্যক্ত হইয়া থাকে বলিয়া লেখক সম্ভবতঃ এস্থলে কবিদিগের প্রকৃত ভাব বুঝেন নাই। ভাঃ সং।

শীলনের সহায়তা করে। উমার কল্পনাতে স্নেহ-ভাবের সুন্দর বিকাশ হইয়াছে। এ প্রেম-চর্চ্চা অনেকটা গার্হস্থ্য। যশোদাতেও মাতৃভাবের সুন্দর বিকাশ লক্ষিত হয়। রাধায় প্রেমের একেবারে স্বতন্ত্র অন্য এক দিক আলোচিত হইয়াছে। তাহার মূল কাব্য কি ধর্ম্ম নিশ্চিত বলা সহজ নহে। তবে কবিদিগের হস্তে কাব্য-সৌন্দর্য্য যে রাধার মধ্যে সমধিক প্রস্ফুটিত হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং বোধ করি, সেইটুকু মাত্র আলোচনা করিলেও রাধার শ্রীহানি হইবে না।

প্রথমতঃ রাধার রূপ। রাধা রূপসী—গৌরবর্ণা। এদেশে রূপ বর্ণনায় সাধারণতঃ গৌর অথবা শ্যামবর্ণের প্রাধান্য। গৌরবর্ণ অবশ্য শ্রেষ্ঠ। শ্যামবর্ণও নিতান্ত হেয় নহে। তবে বর্ণের মধ্যে গৌরেরই মর্য্যাদা অধিক। তাহা বহুদূর হইতে নয়ন আকর্ষণ করে। নিয়মের ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণা দ্রৌপদীর রূপাকর্ষণে স্বয়ম্বর-সভা উথলিয়া উঠিয়াছিল। রাধা গৌরী, তাহাতে অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পূর্ণ। সুতরাং কৃষ্ণ সহজেই রাধার রূপে আকৃষ্ট। বৈষ্ণব কবিদিগের এ বর্ণনার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব বড় পরিস্ফুট নহে। তাঁহারা সকল সময়ে সম্মুখে একটা আধ্যাত্মিক প্রতিমা খাড়া রাখিয়া রচনা করিতেন কি না বলা যায় না। তবে শ্রীকৃষ্ণত্বে ঈশ্বরত্ব তাঁহারা হয়ত ‡ জানিতেন। কবিতা রচনা কালে মানবভাবই সম্ভবতঃ তাঁহাদের অন্তরে আধিপত্য করিত। নহিলে, তাঁহাদের সঙ্গীতে দেহের গঠন-সৌন্দর্য্য এমন সুব্যক্ত হইবে কেন ? § রাধার প্রতি অঙ্গ তাঁহাদের তুলিকাস্পর্শে সু-অভিব্যক্ত। আর গঠনের দিকে তাঁহাদের স্বাভাবিক একটু অনুরাগও দেখা যায়। রাধার দেহে যখন প্রথম যৌবন বিকাশ হইল, বৈষ্ণব কবি সে বয়ঃসন্ধির রূপমাধুরী একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। তাহার পর যখনই অবসর পাইয়াছেন রাধার যৌবন-সম্বদ্ধ অঙ্গ-সৌন্দর্য্য দেখিয়া লইতে তাঁহারা ত্রুটি করেন নাই। রাধার প্রত্যেক অপাঙ্গ দৃষ্টি, লঘুহাস্য, হৃদয় বিকাশ তাঁহাদের নখদর্পণে। রাধার সহিত তাঁহাদের যখন তখন সাক্ষাৎ—স্নান সময়ে, বন পথে, নিভৃতে কুঞ্জমাঝে, গৃহে সখী সমাগমে। এবং যখন যে ভাবে দেখিয়াছেন সেইভাবেই তাঁহারা সুন্দরী রাধিকার চিত্র আঁকিয়াছেন। কখনও কিছুমাত্র সংকোচ অনুভব করেন নাই।

সেই জন্য বৈষ্ণব কবিদিগের চিত্র হইতে আমরা রাধার রূপ সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারি। রাধার অঙ্গসৌষ্ঠব পূর্ণ, গৌর বর্ণ, যৌবন চল চল। কিন্তু রাধার সমগ্র মুখে কি ভাব পরিব্যাপ্ত বৈষ্ণব সঙ্গীত হইতে তাহার একেবারে স্পষ্ট পরিচয় সামান্যই পাওয়া যায়। তবে নানা বর্ণনার মধ্য হইতে বুঝা যায় যে, রাধার মুখে একটী কোমল ভাব আছে। চঞ্চল লোচনের বর্ণনার মধ্য হইতেও মুখের ভাব

‡ হয়ত না নিশ্চয়। ভাং সং।

§ নহিলে কাব্যে অসম্পূর্ণতা দোষ ঘটে। ভাং সং।

বুঝিবার কতকটা সুবিধা হয়। রাধার রূপে বিলাস ভাবের উদ্রেক করে—শান্ত ভাব অপেক্ষা চাঞ্চল্যেরই তাহাতে প্রাদুর্ভাব। এক প্রকার সৌন্দর্য্য আছে যাহা আপনার মধ্যে স্থির থাকিয়া জগৎকে টানিয়া আনে। এ সৌন্দর্য্যে অধীরতাও অনেকটা চাপা। রাধার সৌন্দর্য্য এ জাতীয় নহে। রমণীসুলভ তেজ ভাবেরও রাধার সৌন্দর্য্যে বিশেষ অভাব। সতীর মুখে কোমলতার সহিত দৃঢ় তেজস্বিতা দেখা যায়। ম্লানভাবেও সীতা তেজস্বিনী। রাধার কোমলতা বিলাস স্ফূর্ত্তি—তেজদীপ্ত নহে।

শকুন্তলা প্রভৃতির রূপের ন্যায় রাধার রূপের সহিত প্রকৃতির সেরূপ ঘনিষ্ঠতা নাই। সে রূপ অনেকটা সহর-ঘেঁষা। বন কি উদ্যানলতার সহিত তাহার উপমা খাটে না। রাধার কোমলতা নবনীতের সহিত উপমেয়। রূপেও আঁটাআঁটি কিছু অধিক—তাহাতে অনেকটা হিসাব করা ভাব আছে। নির্ঝরিণীর স্বতঃউচ্ছ্বসিত মুক্তপ্রাচুর্য্য তাহাতে তেমন দৃষ্ট হয় না। কিন্তু আমরা রাধার রূপের নিন্দা করিতেছি না। রাধা ইহাতেই রূপসী। নাকে মুখে চোখে রাধা পৃথিবীর যাবতীয় রূপসীর সমকক্ষ। তবে চরিত্রগত মহত্বের মুখে যে সৌম্য ছায়া পড়ে তাহা রাধায় বড় পরিস্ফুট নহে। রাধার রূপ দিল্লীর রাজপ্রাসাদে সাজাইয়া রাখিবারই বিশেষ উপযোগী। সীতার মত অরণ্যে তপোবনে সে রূপ খুলে না। সে গঠন কুঁদিয়া নির্ম্মাণ করাই বটে।

কৃষ্ণ যুবতী রাধিকার এই রূপে মসগুল। তিনি যাহা খুঁজেন, রাধায় তাহা মিলিয়াছে। দেহ উপভোগ স্পৃহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রেম। রাধিকার দৈহিক রূপ যথেষ্ট আছে। অন্তরের সহিত রূপের যেখানে সম্বন্ধ সেখানে কৃষ্ণের বড় দৃষ্টি নাই। এই কারণে রাধার বদন-কমলে এবং খঞ্জন নয়নে মানসিক সৌন্দর্য্যের কিরূপ বিকাশ হইয়াছে না হইয়াছে আমরা শুনিতে পাই না। আমরা যতদূর জানিয়াছি, রাধার ভ্রূভঙ্গে হৃদয় ভাঙ্গে গড়ে, অধরে অধর আকর্ষণ করে, কোমল কপোলে শ্রীকৃষ্ণের চুম্বনভার মাত্র সহে।

নিজ রূপের প্রতি রাধার স্ত্রীজাতি সুলভ অনুরাগও আছে। সুন্দরী আপনাকে রূপসী বলিয়া জানেন। সুতরাং ঘন ঘন দর্পণে মুখ দেখিয়া অরুচি জন্মে না। রূপচর্চ্চাই ত রাধার আজন্ম হইয়া আসিতেছে। আর এই রূপের ফাঁদেই ত শ্যামসুন্দরের মন ধরা পড়িয়াছে। নহিলে, কাণায় কাণায় যাহার প্রণয়িনী তাহাকে দুই দণ্ড চোখে চোখে রাখা যায়? রূপের কোনও অনুষ্ঠানেরই রাধার ত্রুটি নাই—গন্ধদ্রব্য, অলক্তক, বেশভূষা, দর্পণ, সমজদার সহমর্ম্মী সহচরী, এবং আবশ্যকীয় দুই চারিটা নয়নের কটাক্ষ, গ্রীবার বঙ্কিম ভঙ্গী, মৃণালবাহুর অনাবশ্যক ভ্রমরতাড়ন ইত্যাদি ইত্যাদি। জীবনের অন্যান্য গুরুতর কার্য্যের এই জন্য রাধার অবসর হইয়া উঠে না। রাধার দুই চিন্তা—নিজের রূপ এবং মাধবের রূপ। নিজের রূপে শ্যামকে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে, আর শ্যামের রূপে নিজে বাঁধা। রাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধই রূপজ।

শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ দেখিয়া রাধা অধীর, সে রূপ অনেকটা রাধারই মতন। রাধার মত কৃষ্ণ অবশ্য গৌরবর্ণ নহেন, সমস্ত দেহের গঠনও তাঁহার অবিকল রাধার অনুরূপ নহে, তবে উভয়ের গঠন কতকটা এক জাতীয় বটে। ভ্রম ক্রমে বিধাতা বুঝি একজনকে পুরুষ করিয়া গড়িয়াছেন। কৃষ্ণের রূপে উন্নত পুরুষভাব কদাচ দেখা যায়। কৃষ্ণ পুরুষ রূপে স্ত্রীরই এক বিশেষ সংস্করণ। তবে রাধা এ রূপে মুগ্ধা। বৈষ্ণব কবিরাও এই রূপেরই বিশেষ পক্ষপাতী। আমাদের তাহাতে আপত্তির কিছুই নাই। কিন্তু পুরুষ হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের তেমন সুপুরুষ বলিয়া মনে হয় না। এবং বোধ করি, মহাদেবের পার্শ্বে কিম্বা রামচন্দ্রের পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া উমাকে অথবা সীতাকে এক-জনের গলদেশে বরমাল্য দিতে বলিলে শ্রীকৃষ্ণকে কেহই তাহা দিতেন না। শ্রীকৃষ্ণের রূপে গোপীকুলই মুগ্ধ। রাধার মানসিক অবস্থা নিতান্তই তেজহীন, অলস, সেইজন্য চূড়ার ঠাম, ভ্রূর ভঙ্গীতেই সে মন আত্মহারা। স্বভাবতঃ রমণীহৃদয় পুরুষ-সৌন্দর্য্যে সমুন্নত তেজগাম্ভীর্য্যই ভালবাসে বোধ হয়। তবে ভিন্নরুচিও ত সংসারে আছে। আমাদের অন্তঃপুরচারিণীগণ কিরূপ সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী বলা যায় না। বাঙ্গলা দেশেই ত বীর সেনাপতি কার্ত্তিকেয় সৌখীন বাবু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

এ সকল কতকটা অপ্রাসঙ্গিক কথার এইখানেই শেষ হোক্। রূপের সহিত রাধিকার এই অবধি বিশেষ সম্পর্ক। আমরা রাধার রূপ দেখিয়াছি, রাধা যে রূপে মুগ্ধা সে রূপও দেখিলাম। মোটামুটি, উভয়ের রূপেরই প্রধান উপাদান ভোগবিলাস। গুণের ব্যাপার রাধার চরিত্রে বড় বেশী শুনা যায় না। * সুতরাং রাধাকে দেখিবার আমাদের বড় বাকি নাই। এখন কেবল তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় দেখা যাইতে পারে। যেমন, রাধা প্রণয়িনী, রাধা বিরহিণী, রাধা মানিনী, রাধা অভিসারিকা ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহাতে রাধার রূপের সহিত ভাবের সাদৃশ্য অনেকটা পরিস্ফুট হইবার সম্ভাবনা। আর রাধার জীবনে ইহা ভিন্ন ত বিশেষ কোন ঘটনাও দেখা যায় না। হাস্য পরিহাস, সাজসজ্জা, বিরহ, অভিসার, মানাভিমান এবং হাবভাবের সমষ্টিই রাধিকা।

প্রথমে দেখা যাক, কৃষ্ণের সহিত রাধিকার প্রণয়ের আরম্ভ কোথায়। বলা বাহুল্য, রূপেই উভয়ের প্রণয় আরম্ভ। রাধিকা কৃষ্ণের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ। কৃষ্ণও রূপ দেখিয়াই রাধিকায় অনুরক্ত। ইহাতে অস্বাভাবিক কিছু নাই। রূপের আকর্ষণ মানবজাতির স্বভাবসিদ্ধ। দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রণয়, রোমিও জুলিয়েটের প্রণয়, এ সকলই রূপমূলক।

---

* যে গুণে মানব, প্রেমে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারে—রাধার চরিত্রে সেই গুণ কবিগণ আঁকিয়াছেন; রাধা সমাজ-নায়িকা নহেন; সুতরাং অন্য নানা গুণে তাহার চরিত্র বিকশিত করা তাঁহারা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। ভাং সং।

এবং রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ের মত দর্শনেই ইহাঁদের প্রেমারম্ভ। সুতরাং রূপমূলক প্রেম বলিয়াই রাধাকৃষ্ণের প্রেম দূষ্য নহে। কিন্তু রূপমূলক প্রেম মোটামুটি দুই প্রকার। এক, চকিতের মধ্যে রূপের মধ্য দিয়া আন্তরিক প্রেম সঞ্চার হয়। আর, রূপেতেই প্রেম গণ্ডীবদ্ধ হইয়া থাকে। এখন দেখিতে হইবে, রাধার প্রেম কোন্ শ্রেণীর। কৃষ্ণের প্রেম শেষোক্ত শ্রেণীর বলিয়াই বোধ হয়। প্রমাণের অভাব নাই—তাঁহার প্রণয়িনীর সংখ্যা গণনা করিলেই অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসে। বৈষ্ণব কবিদিগের খণ্ডিতার বর্ণনাগুলি দেখিলেই মনে হয়, কৃষ্ণ নিতান্তই হৃদয়হীন, প্রেমহীন, লজ্জাহীন, চরিত্রহীন চরিত্র। কিন্তু তাহা হইতে রাধার প্রেম বুঝা যায় কিরূপে? কৃষ্ণের এরূপ ব্যবহারেও রাধা তাঁহার প্রতি অনুরক্তা। কৃষ্ণকে দেখিলেই রাধার অৰ্দ্ধেক মান ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে ত রাধার চরিত্রে ক্ষমাশীলতাই সমধিক প্রকাশ পায়। কিন্তু তাহা নাও হইতে পারে। রাধার চরিত্রে গভীরতার অভাবই হয়ত কৃষ্ণের দুর্ব্ব্যবহার সহনের কারণ। প্রেমের নিয়ম ভঙ্গ অপরাধ রাধার নিকট অতি লঘু, কিছুই না। প্রেমের ভিত্তিতে যে দৃঢ়তা দেখা যায় রাধার তাহা নাই। সুগভীর প্রেম অপমান বড়ই অনুভব করে। শারীরিক ভোগলালসা অতিক্রম করিবার শক্তি তাহার আছে। রাধার এ শক্তির অভাব। ভোগলালসা তাঁহার হাড়ে হাড়ে। কিন্তু তথাপি রাধা শ্রীকৃষ্ণের নিকট কখনও অবিশ্বাসিনী হয়েন নাই। সুন্দরীর কৃষ্ণের প্রতি বেশ একটু টানও লক্ষিত হয়। ইহাতে মনে হয়, রাধার প্রেম ভোগলালসায় গঠিত হইলেও তাহাতে অন্তরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম অপেক্ষা রাধিকার প্রেম গাঢ়। তবে তাহাও অনেকাংশে রূপবদ্ধ। রাধা কৃষ্ণের প্রণয়ে মদির-মত্ততা অধিক বলিয়া বোধ হয়। তাহাতে যৌবনে যৌবনে যেরূপ সম্মিলন হয়, জীবনে জীবনে সেরূপ একীকরণ হয় না। †

এতক্ষণ আমরা যে ভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেম আলোচনা করিলাম তাহা যে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক রূপকাদি বর্জ্জিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ প্রণয়-কাহিনীর মধ্যে আধ্যাত্মিক রূপকের প্রতিষ্ঠা একেবারে অসম্ভব বোধ হয় না। চণ্ডীদাস প্রভৃতি দুই চারিজন বৈষ্ণব কবির রচনা দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা এ রূপক বুঝিতেন। তবে রূপক বুঝিলেও কথায় কথায় রূপক মিলাইয়া কবিতা রচনা করিতেন না। তাঁহারা এই বিষয় লইয়া কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও আধ্যাত্মিকতা হইতে স্বতন্ত্র পথে রাধা

---

† লেখক ইংরাজি সাহিত্য দিয়া ইংরাজি স্বভাব দিয়া রাধার প্রেম বিচার করিয়া এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমাদের দেশের দাম্পত্য প্রণয়ের আদর্শ কি? স্বামী সহস্র অপরাধ করিলেও তাহাতে পূর্ণ অনুরক্ত থাকা। সুতরাং রাধিকার প্রেমেও কবিগণ আমাদের সেই দেশধৰ্ম্মই অঙ্কিত করিয়াছেন মাত্র। আর বাস্তব পক্ষে সুগভীর প্রেমেই ক্ষমাশীলতা সম্ভবে; আমরা ইংরাজি সাহিত্যে যে তাহার এই অভাব দেখি তাহার কারণ উহাদের দাম্পত্য প্রেমের মজ্জা পরস্পরের নিকট চুক্তি। ভাঃ সং।

কৃষ্ণের প্রেমের বিবিধ অবস্থা আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। তাহাতে রূপক-ভক্তেরা ভরসা করি দোষ গ্রহণ করিবেন না। আমাদের ত রাধা অথবা কৃষ্ণের সহিত শত্রুতা নাই যে, দোষ বাহির করিয়া তৃপ্ত হইব। তবে গূঢ়ার্থ অপেক্ষা সহজে যাহা চোখে পড়ে তাহার আলোচনাই সুবিধার বোধ করি।

রাধা বিরহিণী। কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় গিয়াছেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাধার দিন আর ফুরায় না। বাস্তবিক, বিরহে কৃষ্ণের প্রতি রাধার অনুরাগ প্রকাশ পায়। সকল কবির রাধা অবশ্য সম্পূর্ণ একভাবে ব্যথিত নহেন, তবে মোটা-মুটি একটা ঐক্য আছে। কৃষ্ণের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ হইতে বঞ্চিত হইয়াই রাধার ব্যথা। কোন কোন কবিতায় ফুলশর প্রভৃতিরও উল্লেখ বাহুল্য দেখা যায়। রাধার চরিত্রের সহিত অবশ্য অসামঞ্জস্য কিছু ঘটে না। বিরহে রাধার কৃষ্ণের কথাই মনে পড়ে—সেই পুরাতন দিন, হাসি, বাঁশী, নিকুঞ্জ, মানভঞ্জন, এমন অনেক কথা। আবার একটু ভয়ও হয়, পাছে আর কেহ কৃষ্ণকে দখল করিয়া থাকে। সেই আর কেহর উদ্দেশে অনেক প্রকার হিতাকাঙ্ক্ষাজড়িত মধুর সম্ভাষণ এবং আশীর্ব্বাদ প্রয়োগও মধ্যে মধ্যে শুনা যায়। যৌবনটাকে লইয়াও রাধা যে নাড়াচাড়া না করেন এমন নহে। সহচরীর নিকট দুঃখ করা হয় যে, এই নবযৌবনই যদি বিরহে কাটাইতে হইল তবে আর প্রিয়ের অনুরাগে ফল কি? এইরূপ বিরহের মধ্যে রাধার অনেক মনের কথা বাহির হইয়া পড়ে। সকল কথা আমরা তুলিতে পারি না; কারণ সখীদিগের সহিত যে সকল কথাবার্ত্তা হয় তাহা ত আর সমালোচনার জন্য নহে। গোপনীয় কথার উপর আমরা যেটুকু হস্তক্ষেপ করিয়াছি তাহাই যথেষ্ট।

রাধার বিরহ প্রধানতঃ দুই ঋতুতে জাগিয়া উঠে—বসন্তে ও বর্ষায়। এ দেশে এই দুই ঋতুই বিরহকাল। বসন্তে যত বিরহিণী বড় বড় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকেন। সেই উষ্ণ নিশ্বাস টানিয়া লইয়া দীর্ঘ শীত রজনীর পরে বৃক্ষকুল শ্যামল যৌবনে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। রাধা কৃষ্ণ অভাবে বসন্তের সুখভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। অনেক হা হুতাশ করেন, সহচরীদিগকে অনেক কথা বলেন। তাহার পর বসন্ত চলিয়া যায়। বসন্তাবসানে কিছুদিন বিরহ একটু চাপা থাকে। আবার আষাঢ়ের নূতন মেঘে বিরহ ঘনাইয়া আসে। কিছু দিন গুমরিয়া গুমরিয়া বর্ষাও ফুরাইয়া যায়। তাহার পর বিরহ অনেক দিন ছাড়া পায়। মধ্যে মধ্যে বারো মাসই একটু আধটু বিরহ কান্না শুনা যায়। সকল কবি বোধ করি বারো মাস একঘেয়ে ক্রন্দন সহিতে পারেন না, সেই জন্য বারো মাসের বিরহ অধিক শুনা যায় না। পাঠক এবং লেখক উভয়ের পক্ষেই তাহাতে অনেকটা সুবিধা হইয়াছে বলিতে হইবে।

বিরহের পর মিলন। তখন আর কি নূপুর রুণুঝুনু, বেণী আন্দোলন, যৌবন বন্যা অপেক্ষা প্রবল, বাক্য এবং হাবভাব দুই তরফেই পূর্ণমাত্রায়। মিলন আলোচনা করিয়া

দেখিলে রাধিকার চরিত্রে লজ্জার কতদূর প্রভাব বুঝিবার সুবিধা হয়। লজ্জাই রমণীর শ্রী। সুতরাং রাধিকার অন্তরের শ্রী এইখানে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। প্রথমে কৃষ্ণের সহিত রাধার প্রথম মিলন আলোচ্য। কারণ, লজ্জা সেইখানেই সমধিক ব্যক্ত। প্রথম মিলনের পূর্ব্বে কৃষ্ণের সহিত রাধার সাক্ষাৎ হইয়াছে, রাধা বাঁশী শুনিয়াছেন। কিন্তু তখন কিছু আর আলাপ হয় নাই। আড়নয়নের উপরেই তখন সকল নির্ভর করিত। তাহার পর নিকুঞ্জে সম্মিলন। সহজ বুদ্ধিতে যতদূর বুঝা যায়, নিকুঞ্জে রাধিকার ভাব এবং ব্যবহার বড় লজ্জাবৃত নহে। তবে অভ্যস্ত লজ্জাভিনয় কতকটা হইয়াছিল। যেমন, এ দেশের রঙ্গমঞ্চে ক্রন্দনের আবশ্যক হইলেই চোখে রুমাল উঠে, প্রেমের কথা উঠিলেই স্বর নাসিকায় আসিয়া আশ্রয় লয়, বীর-চরিত্র দেখাইতে হইলেই দেহের মধ্যে উনপঞ্চাশ ছটফটানি এবং কণ্ঠস্বরে উনপঞ্চাশ বায়ু সহসা প্রাবল্য লাভ করে। যথার্থ লজ্জার যে শ্রী তাহা রাধিকায় দৃষ্ট হয় না। রাধার লজ্জা নিতান্ত কৃত্রিম—নিতান্তই যেন কৃষ্ণকে ধরিবার ফাঁদ পাতা। রাধা বড় লজ্জাবতী নহে। অসংযত চরিত্রে লজ্জা প্রবল হইতে প্রায় পারে না। লজ্জা সংযমের সুশীলা সহচরী।

রাধার মানাভিমানের ব্যাপার মিলনেরই সহিত সম্বদ্ধ। কৃষ্ণ রাধার প্রেমের অপমান করিয়াছেন, রাধা তাই মান করিয়া বসিয়া আছেন। কৃষ্ণ যত সাধ্য সাধনা করিতেছেন, সুন্দরী নীরব—মুখে কথাটী নাই। কিন্তু কৃষ্ণ ত ছাড়িবার পাত্র নহেন, রাধার মন বুঝিয়া তিনি অনেক কথা বলিলেন। রাধা শুনিয়াও শুনেন না, অপরদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছেন। অনেক কষ্টে মান ভাঙ্গিল। তখন আবার পূর্ব্ববৎ। মানভঞ্জনের পরিচ্ছেদ এইখানেই সমাপ্ত।

রাধা প্রণয়িনী, রাধা বিরহিণী, রাধা মানিনীকে আমরা দেখিলাম। এখন অভিসারিকা রাধাকে দেখিলেই আমাদের রাধার চিত্র একরূপ সম্পূর্ণ হয়। অন্যান্য খুঁটিনাটি না দেখিলেও চলে। কারণ, এই কয় ভাবেই রাধা অনেকটা ফুটিয়াছেন।

মেঘের উপর মেঘ করিয়া বহুদিন পরে আবার সেই পুরাতন বর্ষা ফিরিয়া আসিয়াছে। পুরাতন গগনতলে তেমনি করিয়া ধরণী সিক্ত যৌবনে আসিয়া দাঁড়াইল। বিরহ-কাতরা রাধিকা-সুন্দরী কাতরদৃষ্টিতে সম্মুখের রজনীবিদ্ধ সূচিভেদ্য অন্ধকার পানে চাহিয়া রুদ্ধশ্বাসে শূন্য মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া—বর্ষার অন্ধকার আকাশ ঝরঝর ঝরিয়া যায়, চঞ্চল তড়িল্লতা-বিদীর্ণ হৃদয়ে শ্যাম বিষাদছায়া ঘনাইয়া আসে, দীর্ঘ মেঘগর্জ্জনে দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত মেদিনীর অন্তর শিহরিয়া উঠে—এ দুর্দ্দিনে এ দীর্ঘ বনপথ বাহিয়া একাকিনী রমণী তৃষিত প্রিয়সন্দর্শনে যায় কি রূপে? কিন্তু না যাইলে নয়। সেখানে প্রিয়জন আশাপথ চাহিয়া বসিয়া যে। পথ চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার হৃদয় জরজর। রাধাও গৃহে থাকিতে পারেন না—তাঁহার মন সেখানে। কিন্তু

দুর্য্যোগ যে থামে না। বিজন অন্ধকারের মধ্য হইতে দূরে দূরে মকমক ভেককণ্ঠধ্বনি উত্থিত হইতেছে, আর ঝম্‌ঝম্ ঝম্‌ঝম্ অবিশ্রান্ত ধারাপতন শব্দ।

এই দুর্য্যোগে রাধা ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। পিচ্ছিল পথে পুঞ্জীকৃত অন্ধকার জমিয়া। ঘন বনশ্রেণীর মধ্য দিয়া পথ—কোথাও ঈষৎ স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট। পথের কষ্ট প্রিয়াভিমুখগামিনী মনের আবেগে বড় অনুভব করিতে পারিলেন না। এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণের সহিত তাঁহার সম্মিলন। সে সুখের জন্য সকল কষ্টই সহ্য করা যায়।

অভিসার যে কেবলই মেঘাচ্ছন্ন বর্ষার রাত্রে তাহা নহে। সকল ঋতুতেই অভিসার আছে। তবে বর্ষার অভিসারই রীতিমত গুরুতর ব্যাপার। আমাদের মনে অভি-সারের সহিত সাধারণতঃ বর্ষাই ঘনাইয়া আসে। নহিলে, হিমক্লিষ্ট পৌষ রজনীতেও অভিসারিকা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের রাধাই এরূপ সময়ে কতবার অভিসারে বাহির হইয়াছেন। চিত্রহিসাবে তাহার সৌন্দর্য্য ন্যূন নহে।

এই গেল অভিসারের কথা। এখন আমরা রাধার চিত্র সম্পূর্ণ দেখিলাম বলিতে পারি। সুতরাং রাধার চরিত্র আলোচনা করিবার সুবিধা হইল। রাধিকা গীতিকাব্যে স্থান পাইবারই বিশেষ উপযুক্ত। কারণ, তাঁহার চরিত্রে চিত্রসৌন্দর্য্য যেরূপ ব্যক্ত ঘটনা-সৌন্দর্য্য সেরূপ প্রস্ফুটিত নহে। রাধিকা যে ভাবেই চিত্রিত হইয়াছেন তাঁহার রূপই সমধিক ফুটিয়াছে। ঘটনা-বৈচিত্র্যে জীবনের মহত্ত্ববিকাশ হয় নাই। অবস্থার সহিত গুরুতর দ্বন্দ্ব রাধার কখনও উপস্থিত হইয়াছে শুনা যায় না। গীতিকাব্যে এক একটি ভাবই সম্পূর্ণ হয়। রাধার জীবনের ঘটনাগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র—একেকটী আপনার মধ্যে সম্পূর্ণ। বিরহের সহিত অভিসার অনিবার্য্য নহে, রাধার জীবনে প্রেমের বিবিধ অবস্থা ধারাবাহিক উপন্যাসে বিন্যস্ত নহে। ধারাবাহিকতা উপন্যাসে বিশেষ আবশ্যক। অর্থাৎ ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে সেখানে মানবজীবন গঠিত হয়। রাধার সেই বৃন্দাবন, সেই বাঁশীর স্বর, সেই অভিমান, সেই যমুনার জল, সেই বিরহ-বিলাপ এবং সেই নিকুঞ্জ মিলন। ইহাতে ঔপন্যাসিক উপাদান কোথায়? আর নাট্যরস এই অবস্থার মধ্যেই যতটুকু। মেঘদূতের যক্ষে রাধার চরিত্র অপেক্ষা নাট্যরস স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে বোধ হয়। তবে সমাজ নিয়মের ব্যতিক্রমে কতকটা যদি নাট্যরস থাকে বলিতে পারি না।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মন্তব্য।

সম্প্রতি ভারতীতে রাধা কৃষ্ণের প্রণয় ঘটিত দুইটি সুলেখক রচিত প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। উভয় প্রবন্ধেই রাধা কৃষ্ণ সামান্য নায়ক নায়িকা বলিয়া গৃহীত—বিশেষ এই যে "রাধা" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক রাধা কৃষ্ণের প্রেম লীলার মধ্যে আধ্যাত্মিক অর্থ ও রূপকের স্থল আছে ইহা স্বীকার করিয়া ইহাকে সমালোচ্য বিষয় হইতে বর্জ্জিত করিয়াছেন। ইহাতে এইরূপ একটী কথা উঠে যে, যাঁহারা রাধা কৃষ্ণের প্রণয় কবিতায় বা সঙ্গীতে গাঁথিয়াছেন তাঁহারা যদ্যপি ঐ প্রণয়ের আধ্যাত্মিকতা ও রূপক ভাব বুঝিয়া থাকেন—যদি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া থাকেন—তাহা হইলে রাধা কৃষ্ণকে সামান্য নায়ক নায়িকা বলিয়া গ্রহণ করিলে তাঁহাদের মনোভাব ও তাঁহাদের কবিতা ও সঙ্গীতের মর্ম্ম অপরিজ্ঞাত থাকিবে—ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। এজন্য প্রথমতঃ স্থির করা আবশ্যক যে বৈষ্ণব কবিগণ রাধা কৃষ্ণকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন। যাহাকে বৈষ্ণব মাত্রেই সর্ব্ব বিষয়ে প্রামাণ্য বলিয়া মানেন সেই সকল বৈষ্ণব শাস্ত্র অল্প পরিমাণে আলোচনা করিলেই এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায়।

নারদীয় পঞ্চরাত্র বৈষ্ণবদিগের বহু সম্মানিত শাস্ত্র ও অতি প্রাচীন শাস্ত্র। মহাভারতে প্রাচীন শাস্ত্র বলিয়া ইহার উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে রাধা পরমেশ্বরের পরা-প্রকৃতি অর্থাৎ নিজত্ব শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন—যে শক্তি বা স্বভাবের বলে পরমেশ্বর পরমেশ্বর। কিন্তু পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে কৃষ্ণের ব্রজবিহারের বর্ণনা নাই। শ্রীমদ্ভাগবৎ বৈষ্ণবদিগের আর এক খানি সর্ব্বজন গৃহীত শাস্ত্র এবং যতদূর জানা যায় তাহাতে ব্রজবিহারের ইহাই আদিগ্রন্থ এইরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহাতে রাধার নাম নাই। পঞ্চরাত্র হইতে ভাগবতুক্ত প্রধান গোপিকার নাম রাধা হইয়াছে ইহাই সম্ভাবনা।

এইরূপে একরকম বুঝা যায় যে বৈষ্ণবদিগের নিকট রাধা কৃষ্ণ পরমেশ্বরত্ব ও পরমেশ্বরের নামান্তর মাত্র। এখন দেখিতে হইবে যে রাধা কৃষ্ণের প্রণয় বলিলে বৈষ্ণবেরা কি বস্তুকে বুঝেন ও ইহা লইয়া বৈষ্ণবদের এত নাড়াচাড়া কেন?

বৈষ্ণবদিগের দৃষ্টিতে জীবের চরম উদ্দেশ্য—পরম পুরুষার্থ—এই যে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ ফলস্পৃহা ত্যাগ করিয়া আনন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরে চিত্তের অব্যভিচারী স্থিতি। পরম পুরুষার্থ সিদ্ধির পাঁচ প্রকার সাধন। যে রস অর্থাৎ আনন্দময় মনোভাবের দ্বারা চিত্ত পরমেশ্বরে আকৃষ্ট হয় তাহার বিভেদের দ্বারা সাধনের প্রকার ভেদ হয়। বৈষ্ণব মতে মাধুর্য্য রসের সাধনে পরমেশ্বরে চিত্তের উন্নয়ন সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও আধুনিক। এই রসের বিস্তারের দ্বারা ভক্তজনকে প্রসাদ দানের অভিপ্রায়ে কৃষ্ণাবতারে ভগবান ব্রজবিহার করিয়াছেন এবং সেই অভিপ্রায় সাধনের নিমিত্ত পরাশক্তি রাধা রূপে ব্রজধামে অবতীর্ণা। বৈষ্ণবেরা আরো বলেন

যে সর্ব্বাগ্রে শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলাখ্য পঞ্চাধ্যায়ে মাধুর্য্য রস অভিব্যক্ত করেন ক্রমে সেই রস ভক্ত কবিদিগের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া চৈতন্যদেবে পরাকাষ্ঠা লাভ করে। চৈতন্য মহাপ্রভু যতি ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছেন যে আত্মাবরুদ্ধ মাধুর্য্যই মাধুর্য্য রসের শেষ পরিপাক। মাধুর্য্য রসের এ দেশেই চরম অভিব্যক্তি ও মাধুর্য্য রসের সাধক বৈষ্ণব বাঙ্গালা দেশেই প্রচুর। ইহাঁরা রাধা কৃষ্ণের প্রণয়কে সেই মাধুর্য্য রসের উত্তেজক বলিয়া আস্থা করিয়া থাকেন। সাধারণের এই প্রণয়রহস্য ভুল বুঝিবার সম্ভাবনায় বৈষ্ণবগণ ললিতমাধব, উজ্জ্বল নীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থ এখনও সাধারণের নিকট প্রচার করা গর্হিত বিবেচনা করেন—কেবল স্নিগ্ধ জনের সহিত বৈষ্ণব মণ্ডলীতে এই সকল গ্রন্থের আলোচনা হয়।

আত্মাকে অধিকার করিয়া যে ব্যাপার তাহাকেই আধ্যাত্মিক বলে অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মাকে লইয়া যে ব্যাপার তাহাই আধ্যাত্মিক। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে দেখাইতেছে যে রাধা কৃষ্ণের প্রণয় আধ্যাত্মিক ভাবে ওতঃপ্রোত।

ভারতীতে গীত গোবিন্দ বিশেষরূপে সমালোচিত হইয়াছে অতএব জয়দেবের উজ্জ্বল গীতি অবলম্বন করিয়া রাধাকৃষ্ণ প্রেমের আধ্যাত্মিকতা সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস করা কর্ত্তব্য। স্বকীয় প্রবন্ধের মঙ্গলাচরণস্বরূপ প্রথম শ্লোকে জয়দেব বলিয়াছেন,

রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকুলে রহঃ কেলয়ঃ।

যমুনার তীরে রাধা কৃষ্ণের যে নিত্য ক্রীড়া তাহা জয়যুক্ত হউক।

এস্থলে "নিত্য" এই বিশেষণ পদ বিশেষরূপ মন্তব্য।

তাহার পর প্রবন্ধের বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া কবি তাহার উদ্দেশ্য প্রকাশ করিতেছেন,

যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীং॥

হরি স্মরণে মনে রসোদয় হইবার প্রবণতা জয়দেবের সরস্বতীকে সম্যক বুঝিবার প্রধান উপকরণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া মনকে রসাপ্লুত করা কবির প্রধান উদ্দেশ্য। কৃষ্ণ নামের এখনও উল্লেখ নাই।

যাঁহার স্মরণে মন সরস হয় সে হরি কে? এই আকাঙ্ক্ষা নিবারণের জন্য দশাবতারের স্তব করিয়া দেখাইতেছেন যে জগদীশ্বরই হরি এবং এই স্তবের শেষ শ্লোকে দেখাইতেছেন যে সেই জগদীশ্বরই কৃষ্ণ—দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ। বৈষ্ণব মতে কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম নরাকৃতি। এইরূপ সমষ্টি জগদীশ্বর ভাবে কৃষ্ণের স্তব করিয়া ব্যষ্টি কমলাপতি কৃষ্ণের স্তব করিতেছেন—কৃষ্ণ দ্বিমণ্ডলস্থ আদিদেবতা, ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী উদ্ধার

অঙ্কশায়িনী। মাধুর্য্য রসের দ্বারা ভক্তের মনাকর্ষণের জন্য ব্রজভূমে ইনি অভিব্যক্ত হইয়াছেন—রাধা ইহার সংসার বাসনা শৃঙ্খলা, ইহা সূচনা করিবার অভিপ্রায়ে বিহার চিহ্ন বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া অনুপূরয়তু প্রিয়ং বঃ—এইরূপ আশীর্ব্বাদন করিতেছেন। এবং পদ্মার উল্লেখে রাধা যে পদ্মা ইহা বুঝাইতেছেন এখানে আর একটী বিশেষরূপ দেখিবার বিষয় এই যে গীতগোবিন্দের প্রত্যেক সর্গের শেষে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব স্মারক এক একটি শ্লোক আছে।

ইহাতে এইরূপ অনুভব হয় যে মাধুর্য্য রসের দ্বারা ভগবৎ নিষ্ঠার সাধন স্বরূপ গীতগোবিন্দ প্রবন্ধ। এই রস স্ত্রীপুরুষের ক্রীড়া নহে, অব্যভিচারীরস—এই ভাবটী ফুটাইবার জন্য রাধার উক্তি,

শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব।

এখানে শব্দের প্রচলিত অর্থ লইয়া পাছে কেহ সামান্য ইন্দ্রিয় ভোগ সূচক ভাব গ্রহণ করেন এই শঙ্কা নিবৃত্তির জন্য মাতৃভাবে শক্তি উপাসকদিগের মধ্যে সমাদৃত "আনন্দ লহরী" নামক কাব্যের একটী শ্লোকের চরণ উদ্ধৃত হইতেছে,

শরীরী শৃঙ্গারো রস ইব দৃশাং দোগ্ধিকুতুকং॥

প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে সলোমনের গীতি নামক হীব্রু কাব্য ও পারস্য দেশীয় সুফী কবিদিগের মানুষিক প্রেমোন্মাদের আধ্যাত্মিক পরিণতি ও তাহার সহিত ব্রজবিহারপ্রিয় বৈষ্ণব কবিদিগের মেলন করিবার ইচ্ছা পরিত্যক্ত হইল। কেবল শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত জয়দেবের সঙ্গতি প্রদর্শনই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যথেষ্ট হইবে।

গোপীগণের সম্বন্ধে শুকদেব বলিতেছেন,

তমেব পরমাত্মানং জার বুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্য প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥ (১)

ইহাতে বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরীক্ষিৎ কহিলেন,

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরম স্তাসাং গুণধিয়াং কথং॥ (২)

---

(১) পরমাত্মা যে কৃষ্ণ তাঁহাকে উপপতি বুদ্ধিতে অভিরত হইয়াও (কোন কোন গোপী) সদ্য পাপপুণ্য রূপ কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ত্রিগুণাত্মক দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

(২) হেমুনি, তাহারা কৃষ্ণকে কেবল কমনীয় বলিয়া জানিত ব্রহ্মভাবে জানে নাই। তবে ত্রিগুণের অন্তর্ভূত যে বুদ্ধি তাহার দ্বারা সংযুক্ত হইয়া তাহাদের অনাদিকালের গুণপ্রবাহ কিরূপে নিঃশেষ হইল?

শ্রীশুক উবাচ।

উক্তং পুরস্তাদেতৎ তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥
নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তি র্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেবচ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥
নচৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যতএতদ্বিমুচ্যতে॥ (৩)

গোপীদিগের সহিত প্রথম সমাগম কালে ভগবান কহিলেন,

অস্বর্গ্য মযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহং।
জুগুপসিতঞ্চ সর্ব্বত্র ঔপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥
শ্রবণাদ্দর্শনাৎ ধ্যানাৎ ময়ি ভাবানুকীর্ত্তনাৎ।
নতথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥ (৪)

কিন্তু গোপীগণ দৃষ্টাদৃষ্ট ফল কামনা ত্যাগ করিয়া প্রেমাবলম্বন করিয়াছেন কি না তাই উত্তর করিলেন,

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তং।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবান তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥

---

(৩) চেদীরাজ শিশুপাল হৃষিকেশে দ্বেষ যুক্ত হইয়াও যে প্রকারে সিদ্ধি লাভ করে তাহা তোমার নিকট পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। অতএব অধোক্ষজের প্রিয় ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে আর কি সন্দেহ? হে রাজন্! ব্যয় রহিত, জ্ঞানের অতীত, সত্ব রজ তম এই ত্রিগুণ বিরহিত অথচ গুণ সমস্তের নিয়ন্তা যে ভগবান তাঁহার নরলোকের মুক্তির জন্য অভিব্যক্তি হইয়াছে। যাহারা নিত্য হরিতে কাম ক্রোধ ভয় স্নেহ সম্বন্ধ বা ভক্তি বিধান করে তাহারা তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। তোমার সর্ব্ব যোগৈশ্বর্য্যশালী জন্মরহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণে এরূপ বিস্ময় কর্ত্তব্য নহে কেননা স্থাবর জঙ্গমাদি তাঁহা হইতেই মুক্তি লাভ করে।

(৪) কুলস্ত্রীগণের পক্ষে উপপতি সংক্রান্ত সুখ স্বর্গ বিনাশক, যশ নাশক, তুচ্ছ, দুঃখজনক, ভয়াবহ ও সর্ব্বত্র ঘৃণিত। (অপর দিকে) শ্রবণ দর্শন ধ্যান ও কীর্ত্তণের দ্বারা আমাতে যেরূপ ভাব উৎপন্ন হয় সন্নিকর্ষে তদ্রূপ কখনই হয় না। অতএব নিজের নিজের গৃহে ফিরিয়া যাও!

কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্
নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভি রার্ত্তিদৈঃ কিং ॥

* * *

কাস্ত্র্যঙ্গতে কলপদায়ত মূর্চ্ছিতেন
সম্মোহিতার্য্য চরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাং।
ত্রৈলোক্যসৌভাগ্যমিদঞ্চ নিরীক্ষরূপং
যদ্গোদ্বিজ দ্রুমমৃগাঃ পুলকান্য বিভ্রন্ ॥ (৫)

চতুর্বর্গ ফল ত্যাগ করিয়া গোপবধূ সর্ব্ব জীবের আনন্দ স্বরূপ কৃষ্ণে মানস করিয়াছে সুতরাং সেই আনন্দ ভোগেচ্ছার প্রবলতাবশতঃ কৃষ্ণের সহিত তাহাদের মিলন লাভ হইল। কিন্তু সে মিলন কিরূপ?

রেমে তয়া চাত্মরত আত্মারামো প্যখণ্ডিতঃ।
কামীনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীনাঞ্চৈব দুরাত্মতাং ॥ (৬)

কালান্তরে বিরহের পর মিলন হইলে কৃষ্ণ বলিতেছেন,

নাহন্তু সখ্যো ভজতো ২পি জন্তূন্
ভজাম্যমীষা মনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।
যথা ধনো লব্ধধনে বিনষ্টে
তচ্চিন্তয়া ন্যন্নিভৃতো ন বেদ ॥ (৭)

বিরহ প্রভৃতি প্রেমাঙ্গও ভাগবত অনুসারে দেখিলে রাধা কৃষ্ণের চরিত্র ও লীলা সামান্য নায়ক নায়িকার প্রেম ব্যাপার হইতে ভিন্ন বলিয়া অনুভব হয়। কিন্তু সাধারণের পাঠ্য প্রবন্ধে এ বিষয়ের সম্যক আলোচনা নিরাবশ্যক। তবে রাসলীলা অধ্যা-

---

(৫) আপনি স্বয়ং ধর্ম্মবিৎ. পতিপুত্র বান্ধবদিগের শুশ্রূষণে স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে যাহা বলিলেন তাহা আপনাতেই বর্ত্তমান হউক, যেহেতু শুশ্রূষণীয়ত্ব রূপে উপদিশ্যমান এই পতি পুত্রাদির অধিষ্ঠানও আপনি, কেননা আপনি ঈশ্বর—আপনি এই দেহধারীদিগের আত্মা, প্রিয়তম এবং বন্ধু। হে আত্মন্, আপনি নিত্যপ্রিয় ও আত্মারূপী, শাস্ত্র নিপুণব্যক্তিগণ আপনাতেই রতি করিয়া থাকেন, সংসারে পতি পুত্রাদি কেবল পীড়াদায়ক—তাহাতে উপকার কি? হে অঙ্গ, আপনার কলপদ. দীর্ঘ মূর্চ্ছনাযুক্ত বেণু রবে ত্রিলোকী মধ্যে এমন কোন স্ত্রীলোক নাই যে স্বধর্ম্ম হইতে চলিত না হয়। যেহেতু গোজাতি, পক্ষী, মৃগ, বৃক্ষগণও আপনার ত্রৈলোক্যের সৌভাগ্যস্বরূপ এই রূপ দেখিয়া পুলকিত হইতেছে।

(৬) স্বরূপে সন্তুষ্ট, অপ্রাজিত হইয়াও তিনি কামনাযুক্ত ব্যক্তির হীনতা ও স্ত্রীলোকদিগের দৌরাত্ম্য দেখাইবার জন্য সেই গোপীর সহিত বিহার করিলেন।

(৭) হে সখিগণ, যে প্রাণী আমাকে ভজনা করে তাহাদের নষ্টধন ব্যক্তি যেরূপ অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধন চিন্তা করে সেইরূপ (আমায়) অবিচ্ছিন্ন ধ্যান জন্মাইবার অভিপ্রায়ে আমি তাহাদের ভজনা করি না।

য়ের শেষে শুকদেব পরীক্ষিৎ রাজার সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত যাহা বলিয়াছেন তাহার দুই একটা কথা উদ্ধৃত করা উচিৎ :—

গোপীনাং তৎ পতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহীনাং
যোঽন্তশ্চরতি সো ঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্॥
অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়াঃ শ্রুত্বা যৎ তৎপরো ভবেৎ। (৮)

এখন এরূপ বলা যাইতে পারে যে গীতগোবিন্দ ও ভাগবতের রাসলীলা আলোচনা করিলে মন নিঃসন্দেহ হয় সে রাধা কৃষ্ণ লীলা আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ। এবং ইহা এক বিশেষ জাতির রূপক। বিশেষ এই—সামান্য রূপকে যে বস্তুর দ্বারা অপর বস্তুকে লক্ষ্য করা যায় সেই প্রথমোক্ত বস্তু সম্পূর্ণ কাল্পনিক; কিন্তু বৈষ্ণব মতে ব্রজলীলার নায়ক নায়িকা বাস্তব অথচ আধ্যাত্মিক সত্যের দেহবদ্ধ প্রতিকৃতি।

এই সকল কারণে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী কবিরচিত রাধা কৃষ্ণের লীলা ও চরিত্র বুঝিতে হইলে উহার আধ্যাত্মিক ভাব সর্ব্বত্র স্মরণ রাখিতে হইবে এবং বিশেষ কারণ না থাকিলে আধ্যাত্মিক ভাবেই উহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ বিশেষ কারণ অপরিজ্ঞাত। ভারতীতে প্রকাশিত উভয় প্রবন্ধেই ঐ বিশেষ কারণ স্থির করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত দেখা যায় না। প্রবন্ধদ্বয়ের অপ্রশংসার জন্য ইহা বলা হইতেছে না। কেননা যদি সমালোচিত কবিতা সকলে আধ্যাত্মিক ভাব না থাকিত ও যদ্যপি ঊনবিংশতি শতাব্দীতে ইয়ুরোপে ক্রমগঠিত সমাজ সম্মত স্ত্রীপুরুষের প্রণয়ের আদর্শ রাধা কৃষ্ণের প্রণয়ের আদর্শ হইত তাহা হইলে প্রবন্ধ দ্বয় নির্দ্দোষ হইত। কেবল এই এক কথা যে বৈষ্ণব কবিতা আধ্যাত্মিকভাবে সুবাসিত। আধ্যাত্মিক ভাবে না বুঝিলে বৈষ্ণব কবিতার মর্ম্ম গ্রহণ হয় না।

প্রতিদান।

বিগত পঞ্চম জাতীয় মহাসমিতির পরিগৃহীত ১৩'শ প্রস্তাবানুসারে স্বদেশের কল্যাণে যাঁহারা ভারতভূমির প্রতিনিধি স্বরূপে ইংলণ্ডে গমন পূর্ব্বক মহাসমিতির উদ্দেশ্য প্রচারের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন প্রতিনিধি গত মার্চ্চ মাসে স্বব্যয়ে তথায় উপনীত হইয়া ঘোরতর পরিশ্রম সহকারে আশানুরূপ কর্ত্তব্য

(৮) যিনি গোপীগণ ও তাহাদের পতিগণের অন্তরে বিরাজ করেন, যিনি অধ্যক্ষ তিনি ভূতবর্গকে প্রসাদ দান করিতে লীলাচ্ছলে ইহলোক দেহধারণ করেন। তিনি মানুষ দেহ ধরিয়া মানুষের উপযুক্ত লীলা করেন যাহা শুনিয়া মনুষ্য তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মানিয়া তাহাতে রত হয়।

সম্পাদন করিয়া অল্পদিন হইল স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বঙ্গদেশের একজন প্রধান বক্তা স্বনাম প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাঁদের মধ্যে একজন। জন্মভূমির প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য ইনি জাতীয় মহাসমিতির অভিপ্রায় অনুসারে গত ১৭ই মার্চ্চ স্বদেশ পরিত্যাগ পুরঃসর স্বাধীনতার জননী পুণ্যভূমি ইংলণ্ডে শুভ যাত্রা করেন। উহার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যম পরিবর্দ্ধন নিমিত্ত স্থানীয় নির্দ্দিষ্ট কংগ্রেশ কমিটির যত্নে পাশ্চাত্য প্রথানুসারে যে একটী বিদায় ভোজের আয়োজন হইয়াছিল তথায় মহাসমিতির প্রধান নেতা, সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমন্ত্রিত প্রতিনিধির কার্য্য-ক্ষমতা সম্বন্ধে জলন্ত উদ্দীপনার সহিত গম্ভীরভাবে যে হৃদয়গ্রাহী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, দেবতার আশীর্ব্বাদে তাহা অক্ষরে অক্ষরে সফলতা লাভ করিয়াছে! তিনি ৭ই এপ্রিল ইংলণ্ডে উপনীত হয়েন; তথায় উপস্থিত হইয়াই তিনি উৎসাহশীল সহযোগিগণের সহিত এক প্রাণে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, এবং ৮ই এপ্রিল হইতে ১৮ই জুন পর্য্যন্ত প্রায় সার্দ্ধ তিন মাসকাল অপরিমিত উৎসাহ, অবিচলিত অধ্যবসায় এবং অবিশ্রান্ত পরিশ্রম সহকারে নানাস্থানে গমন পূর্ব্বক প্রকাশ্য সভামণ্ডলীতে মহাসমিতির উদ্দেশ্য প্রচার করিয়াছেন।• এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ৩০টি সভায় সহস্র সহস্র লোকের নিকট ভারতবর্ষের অবস্থা ও অভাব সম্বন্ধে গভীর উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। বিদেশীয় সমাজে• বিদেশীয় ভাষায় বক্তৃতাদানে শ্রোতৃবর্গের অনুরাগ আকর্ষণ কখনই সহজ বিষয় নহে, বিশেষতঃ সভাস্থলে ভারতের অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় শ্রেণীর লোকের সম্মিলন-জনিত কত সাবধানে বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা ও উপসংহার আবশ্যক; এজন্য তিনি সবিশেষ প্রস্তুত থাকিলেও তাঁহাকে অনেক স্থানে কত বাধা বিঘ্ন সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে তৎসমস্তই সুকৌশলে অতিক্রম পূর্ব্বক শত শত উচ্চ পদস্থ সহৃদয় নরনারীর গভীর অনুরাগ ও সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার তেজস্বী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার এমনই মোহিনী শক্তি যে ইংলণ্ডের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধি, প্রতিভা ও মর্য্যাদায় সুপ্রসিদ্ধ, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই তাঁহার বর্ণিত বিবরণ শ্রবণে প্রীত হইয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারণে তদীয় কর মর্দ্দন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত আত্মীয়তা বর্দ্ধন এবং তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে সহায়তা দানে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি সমুদ্র পার হইয়া বিদেশীয় সমাজে গমন পুরঃসর অল্পদিনের মধ্যে যে কার্য্য সাধন করিয়াছেন, স্বদেশে থাকিয়া সহস্র চেষ্টা পাইলেও তাহা সহজে শীঘ্র সুসিদ্ধ হইত না। তাঁহার প্রাণগত যত্নে ভারতের দুঃখ-কাহিনী শ্রবণে ইংলণ্ডের শত শত নিদ্রিত প্রাণ জাগরিত হইয়াছে। মাসাধিক কাল অতীত হইল তিনি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অবিরাম প্রয়াসে তত্রত্য

সুশিক্ষিত ও চিন্তাশীল রাজনৈতিক সমাজে ভারতবর্ষের দুরবস্থা ও অভাব সম্বন্ধে যে তুমুল আন্দোলনস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা এখনও প্রশান্ত ভাব ধারণ করে নাই—পর-দুঃখ কাতর সহৃদয় ইংরেজ সমাজ এখনও তাহাতে বিশেষরূপে আন্দোলিত হইতেছে—এখনও তত্রত্য সত্য ও সুনীতির পরিপোষক প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের স্তম্ভ উক্ত আন্দোলন বিষয়ক বিবিধ প্রস্তাবে পরিপূর্ণ হইতেছে।

তিনি ইংলণ্ড হইতে বোম্বাইনগরে উপস্থিত হইলে তথাকার সহস্র সহস্র সহৃদয় নরনারী তদীয় সদনুষ্ঠানের বিনিময়ে তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রীতি উপহার ও আশীর্ব্বাদ দান করিয়াছিলেন; এবং তথা হইতে কলিকাতায় আগমনের পথে নানাস্থান হইতে তাঁহার মস্তকে পুষ্পাঞ্জলি ও শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়াছিল। ত্রিবেণী সঙ্গম-স্থল প্রয়াগতীর্থে তিনি সমর-বিজয়ী বীরের ন্যায় সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। যে দিন প্রাতঃকালে তিনি এলাহাবাদ হইতে হাবড়ায় উপস্থিত হইলেন সে দিন গগনমণ্ডল নিবিড় মেঘ-মালায় সমাচ্ছন্ন ছিল, পূর্ব্ব রজনীতে বৃষ্টির আধিক্যবশতঃ পথ জল-কর্দ্দমে পরিপূর্ণ হইয়া গমনাগমনের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল এবং তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি পতিত হইতেছিল; কিন্তু তথাপি তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণে তাঁহার শতাধিক গুণগ্রাহী স্বদেশবাসী দুরবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা দান করিবার জন্য হাবড়ার ষ্টেসনে সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

গত জুলাই ভারত সভা একটী সায়ং সমিতিতে প্রীতি-ভোজদানে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। তৎপরে তাঁহার স্বজাতিপ্রেম ও ত্যাগস্বীকারের যথার্থ প্রতিদান স্বরূপ প্রকৃষ্ট অভিনন্দন দান করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার গুণের পক্ষপাতী কৃতজ্ঞ কলিকাতাবাসিগণ বিগত ২১শে জুলাই সোমবার অপরাহ্নে কলিকাতা টাউন হলে যে একটী বিরাট সভার আয়োজন করিয়াছিলেন তাহাতে প্রায় পঞ্চ সহস্র হৃদয়বান সুশিক্ষিত বঙ্গ সন্তান একত্র সম্মিলিত হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠকবর্গের নিকট সেই বিরাট সভার সংক্ষিপ্ত কার্য্য বিবরণের পরিচয় দান জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

আমরা অনেকবার টাউনহলে অনেক সভার অধিবেশন হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু সে দিন ভারত-প্রতিনিধির অভিনন্দন জন্য উক্ত বিশাল গৃহে যে সভার অধিবেশন হইয়াছিল তেমন নেত্র-প্রীতিকর মহোৎসাহ পূর্ণ সভা আর কখনও তথায় দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। বেলা ৫টা ১৫ মিনিটের সময় সভার কার্য্যারম্ভের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু দুই ঘটিকার পূর্ব্ব হইতেই সভাস্থল জনপূর্ণ হইতে আরম্ভ হইল, এবং চারি ঘটিকার পূর্ব্বে সুবিস্তৃত গৃহ প্রবল জন-স্রোতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এমন কি, অনেকেই দাঁড়াইবার উপযুক্ত স্থান না পাইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চারিজন সুশিক্ষিতা বঙ্গ মহিলা এবং কতিপয় মিত্রভাবাপন্ন ইয়ুরো-

পীয় মিসনরি (ধর্ম্ম যাজক ?) সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে কদাচিৎ কোন সভায় উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি, এবং যাঁহারা এক সময় সভা সমিতি অপরিণত বয়স্ক ছাত্রগণের আড়ম্বর প্রকাশের স্থল বিবেচনায় তৎপ্রতি সানুনাসিক স্বরে নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেককে উৎসাহের সহিত সভাস্থ হইতে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। তেমন জ্বলন্ত উৎসাবের ছবি জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন ভিন্ন আমরা ইতিপূর্ব্বে আর কোন সাধারণ সভাস্থলে দেখিয়াছি কি না তাহা আমাদের স্মরণ নাই।

নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে স্থানীয় নির্দ্দিষ্ট-কনগ্রেস্ কমিটির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয় সভা আহ্বান করিলে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার সুদক্ষ নেতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি সভার উদ্দেশ্য ও কার্য্য উল্লেখ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলে চতুর্দ্দিক হইতে গভীর অনন্দধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুষ্ঠিত সাধু কার্য্যের প্রকৃত প্রতিদান স্বরূপ তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিনন্দন দান করিবার জন্যই যে বর্ত্তমান সভার অধিবেশন, তাহা তিনি সকলকে সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়া সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশের জন্য ইংলণ্ডে কি কি কার্য্য সাধন করিয়াছেন এবং কোন কোন বিষয়ে তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও উদ্যম সফল হইয়াছে, এবং সেখানে তাঁহাকে কতই বিঘ্ন বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক অভীষ্ট সাধনে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, তৎসমস্ত জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত প্রকাশ করিয়া তৎপরে তিনি বলিলেন যে কেহ কেহ বলিয়াছেন, সুরেন্দ্রনাথ এমন কি কায করিয়াছেন যে তজ্জন্য তাঁহার স্বদেশবাসিগণ তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে অভিনন্দন দান করিবে। ঐ সকল সমালোচকবর্গের নিকট তিনি এই উত্তর দান করিতে প্রস্তুত যে যদি তাঁহারা ভাবিয়া থাকেন যে সুরেন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য মহা সভা (Parliament) কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ একখানি সুসংস্কৃত আইন হস্তে লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইবেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আশা নিঃসন্দেহ বিফল হইয়াছে; কিন্তু তিনি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারেন যে তাঁহারা সকলে স্বস্ব হৃদয় মন্দিরে স্বদেশের হিতকল্পে যে পবিত্র আশা পোষণ করিতেছেন, তাহাতে তিনি বৃটেনিয়ার মহৎ অধিবাসিগণের সহানুভূতি ও উৎসাহ আকর্ষণে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইয়াছেন; এতদ্বিষয়ে তিনি যে বিশেষ রূপে সফলপ্রযত্ন হন নাই, কে তাহা প্রমাণ করিতে সক্ষম? বিদেশে কোন একটী বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া সহজ নহে; কোন ব্যক্তি বিদেশে অপরিচিত সমাজে উপস্থিত হইয়া যাহাদের মুখ দেখিতে পায় তাহাদের সহিত তাহার প্রত্যেক বিষয়েই বিভিন্নতা; এরূপ স্থলে অপরিচিত ব্যক্তির মুখ হইতে কোন বাক্য নিঃসৃত হইলে বিদেশীয়দিগের অন্তরে তাহা হইতে কোন স্থায়ীভাব

জন্মিবে কি না ইহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। কোন একটী সাধু ও ধর্ম্ম সঙ্গত বিষয় না হইলে ইংলণ্ডে সাধারণের সহানুভূতিপূর্ণ প্রীতি লাভ করা দুঃসাধ্য; বাবু সুরেন্দ্রনাথ কেবল মাত্র সেইরূপ প্রীতি লাভে সমর্থ হন নাই, পক্ষান্তরে তিনি তত্রত্য বিভিন্ন প্রধান প্রধান নির্ব্বাচন-স্থানে গমন পূর্ব্বক বক্তৃতা দানের জন্য তত্রত্য অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সমাদরে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি বিদেশীয় সমাজে যে জয় লাভ করিয়াছেন তাহা তিনি কখনই সহজে অর্জ্জন করেন নাই—তাঁহার সম্মুখে কত বাধা উপস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তৎসমস্তই তিনি বিশেষ দক্ষতা সহকারে পরাভব করিয়া তত্রত্য হৃদয়বান নরনারীর আনন্দ ও অনুরাগ বর্দ্ধন করিয়াছেন। অনন্তর তিনি অক্‌সফোর্ড নগরের তর্ক সভার (Debating Club) উল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন উক্ত সভায় ভারতীয় বিষয়ের আন্দোলনে যোগ্য পিতার সুযোগ্য পুত্র লর্ড হিউ সিসিলের নিকট প্রবল বাধা প্রাপ্ত হইয়াও ভারতের অন্যতর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত আর্ডলে নর্টনের বিশেষ সহায়তায় তিনি কেমন জয় লাভ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা কি ন্যায়ানুসারে বলিতে পারেন যে তাঁহার দ্বারা কোন কার্য্যই সাধিত হয় নাই? যে সকল সমালোচক এরূপ কথা বলেন তাঁহারা কিছুই জানেন না। তিনি বিস্মিত হইয়াছেন যে ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ, যাহাদের, স্বদেশের ইতিহাস হইতে অধিক অবগত হওয়া উচিত, এবং যাঁহারা নিশ্চয় অধিক পরিমাণে জানেন, তাঁহারাও অম্লানবদনে লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন যে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় নাই। তাঁহাদের অসার বাক্য তিনি সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করেন; যাহাদের ইতিহাসে বিন্দুমাত্র জ্ঞান নাই তাহারাই কেবল ঐরূপ অসার কথা বলিতে পারে। যদি কেহ জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য নিচয় এক, দুই, তিন অথবা চারি বৎসরে সুসিদ্ধ দেখিতে আশা করিয়া থাকেন তবে তিনি মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন; ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান সংস্কার কার্য্যগুলি দুই এক বৎসরে সহজে সংসাধিত হয় নাই। ইংলণ্ডেই যদি এত বিলম্ব ও বিঘ্ন বাধায় সংস্কার কার্য্য সুসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহা হইলে ইংরেজ জাতি যে সকল প্রস্তাবের কিছুই অবগত নহেন, এবং দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারা যাহাতে কদাচিৎ মনোযোগ দান করিয়া থাকেন, তৎসমস্ত বিষয় সুসিদ্ধ হইবার পক্ষে কত অধিক বিলম্ব ও বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। এই সকল বলিয়া তিনি গভীর উৎসাহ ও একান্ত আগ্রহ সহকারে সকলকে এই কথা মনে রাখিতে বলিলেন যে স্বদেশের হিতকরে অনুষ্ঠিত মহৎ কার্য্যে উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য যদি তাঁহারা প্রত্যেকেই ধন এবং প্রাণ দ্বারা সহায়তা না করেন তাহা হইলে সকল উদ্যম বিফল হইবে; তখন এইরূপ একটী মহা আন্দোলন আর চলিবে না। উপসংহারে তিনি বিনীতভাবে বলিলেন প্রত্যেক স্বদেশানুরাগী ব্যক্তির একান্ত কর্ত্তব্য এই যে, তিনি শারীরিক পরিশ্রম, সদুপদেশ দান এবং অর্থ ব্যয়ে এই স্বদেশ হিতকর পবিত্র কার্য্যে

আনুকূল্য দান করেন তাহা হইলে পরিশেষে তাঁহাদের সমস্ত যত্ন ও উদ্যম সুবর্ণময় ফল প্রসব করিবে। এই বলিয়া তিনি উপবিষ্ট হইলেন, অমনি চারিদিক হইতে গভীর আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইতে আরম্ভ হইল।

অনন্তর অশীতিপর বৃদ্ধ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব মহাশয় একান্ত উৎসাহ সহকারে নিম্নলিখিত প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন:—"৫ম জাতীয় মহাসমিতির প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনে এই সভা তাঁহাকে অন্তরের সহিত সমাদরে অভ্যর্থনা দান করিতেছেন এবং তাঁহাকে জানাইতেছেন যে তথায় অবস্থিতিকালে তিনি স্বদেশের কল্যাণার্থে যে সকল গৌরবময় কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছেন তাহা সভাস্থ সকলে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বিশেষ রূপে অনুভব করিতেছেন।" সুমধুর বক্তা শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উল্লিখিত প্রস্তাবের অনুমোদন পূর্ব্বক সুকৌশলে সংক্ষেপে সকলের প্রিয়বন্ধু বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাদর অভ্যর্থনার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিলেন, এবং জলন্ত উৎসাহের সহিত প্রাণ খুলিয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিলেন।

অনন্তর মুন্সি হিদায়ৎ বকস্ উর্দ্দু ভাষায় একটি সংক্ষিপ্ত হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার সহিত উল্লিখিত প্রস্তাব সমর্থন করিলে শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ মিত্র মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে সভার পক্ষ হইতে অভিনন্দন পত্রখানি শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে উপহার দান করিতে অনুরোধ করিলেন।

(অভিনন্দন পত্র পঠিত স্বরূপে গৃহীত হইল। উহা ইতিপূর্ব্বে সভাস্থলে বিতরিত হইয়াছিল এবং সকলেই উহা পাঠ করিয়াছিলেন।)

মৌলবী সৈয়দ মুক্তাজাদ হোসেন উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।

তৎপরে বাবু প্রসন্ন চন্দ্র রায় প্রস্তাব করিলেন —নিম্নলিখিত ভদ্র মহাশয়গণ শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অভিনন্দন পত্র গ্রহণ জন্য সম্মানের সহিত সভাস্থলের বেদীর উপরে আনয়ন করিতে অনুরুদ্ধ হউন —ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, মুন্সি হিদায়ৎ বকস্, শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু, বাবু শালগ্রাম সিংহ এবং শ্রীযুক্ত জানকী নাথ ঘোষাল।"

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে পর উহা সর্ব্ব সম্মতিতে গৃহীত হইল।

বাবু সুরেন্দ্র নাথ প্রথম হইতেই সভাস্থলের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে তাঁহার জনৈক পূর্ব্বতন কৃতজ্ঞ স্বদেশ ভক্ত ছাত্রের সহিত একত্র উপবিষ্ট হইয়া উভয়ে সভাসম্বন্ধীয় দুই একটী অত্যাবশ্যক বিষয়ে কথোপকথন এবং মধ্যে মধ্যে বক্তাগণের গভীর উত্তেজনা পূর্ণ বাক্যনিচয় শ্রবণে আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। যথা সময়ে নির্দ্দিষ্ট পাঁচ জন সভা গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সম্মানের সহিত তাঁহাকে সভাস্থলে আনয়ন করিলেন। তিনি বেদীর উপরিভাগে উপস্থিত হইবামাত্র সমবেত ভদ্রমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া গভীর আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। বিশাল গৃহের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দুই তিন মিনিটকাল প্রবল আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি অবনত মস্তকে নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

অনন্তর আনন্দ কোলাহল নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিলে সভাপতি মহাশয় সমবেত ভদ্র মণ্ডলীর সমক্ষে অভিনন্দন পত্র পাঠার্থে দণ্ডায়মান হইলেন। চতুর্দ্দিক হইতে বাবার আনন্দ ধ্বনি উত্থিত হইল।

অভিনন্দন পত্রের আদ্যোপান্ত সুরেন্দ্রনাথের প্রশংসাবাদে পরিপূর্ণ—তিনি জাতীয় মহাসমিতির প্রতিনিধি স্বরূপে ইংলণ্ডে গমন পূর্ব্বক স্বদেশের শাসন প্রণালীতে প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভার প্রবর্ত্তন জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত তত্রত্য ক্ষমতা-শালী হৃদয়বান নরনারীর অনুরাগ ও উৎসাহ আকর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে উহাতে তাঁহার গুণগ্রাহী স্বদেশবাসিগণের আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদত্ত হইয়াছিল।

সভাপতি মহাশয় মুক্ত কণ্ঠে গম্ভীর ভাবে অভিনন্দন পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, সমবেত পঞ্চসহস্রলোক নীরবে নিস্পন্দভাবে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন, আর সুরেন্দ্রনাথ অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া সকলের হৃদয়-নিহিত শুভ আশীর্ব্বাদ হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই চমৎকার দৃশ্য দর্শনে কাহার হৃদয়ে স্বদেশভক্তি প্রজ্জ্বলিত না হইয়া উঠে।

পাঠান্তে সভাপতি মহাশয় অভিনন্দন পত্রখানি একটী সুন্দর কারুকার্য্য-শোভিত আধারে বদ্ধ করিয়া সম্মানিত প্রতিনিধির হস্তে প্রদান করিলেন, তিনি কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হৃদয়ে মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক সাদরে গ্রহণ করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে আনন্দধ্বনি উথলিয়া উঠিল।

তদনন্তর বাবু সুরেন্দ্রনাথ প্রকাশ্যভাবে সভাস্থ সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তাঁহাদিগের নিকট তাঁহার ইংলণ্ডে অবস্থিতি কালীন কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান জন্য বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্বদেশের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের কণামাত্র সম্পাদন জনিত স্বদেশবাসিগণের নিকট সম্মান লাভের বিনিময়ে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগকে হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রদান করিয়া, ইংলণ্ডের নানাস্থানে তিনি কিরূপ সাদর অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি যে সকল সভায় বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন তত্রত্য শ্রোতৃবর্গের নিকট হইতে কিরূপ উৎসাহ ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা ভারতবাসীর প্রাণের আশা ও জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্য কেমন প্রবল অনুরাগের সহিত অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সাধুতা ও সদ্ব্যব-হার পরিদর্শনে তাঁহার হৃদয়ে বৃটিশ জাতির মহত্ত্ব ও উদারতার প্রতি কিরূপ প্রবল ভক্তি জন্মিয়াছে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিলেন। তাঁহার বিবেচনায় বিশাল ভূমণ্ডলে বৃটিশ জাতি উদারতা ও সহিষ্ণুতা গুণে অদ্বিতীয়। তাঁহাদের নিকট কোন লোক কিছু বলিতে উদ্যত হইলে তাঁহারা যদি একবার ঘুণাক্ষরে বুঝিতে পারেন যে বক্তা আগ্রহাতিশয়সহকারে সরলান্তঃকরণে প্রকৃত সত্য বিষয় বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা হইলে তাঁহার বক্তব্য বিষয় যতই অপ্রিয় ও অপ্রীতিকর হউক, তাঁহারা তাহা নিঃসন্দেহে অনুরাগ ও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া থাকেন, এবং একবার যদি কোন একটী বিষয় তাঁহাদের নিকট অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে তাঁহারা সাধ্যানুসারে তৎ প্রতিবিধানে সচেষ্ট হন। অনন্তর কোন্ কোন্ স্থানে তাঁহার সম্মুখে বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা তিনি সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে লাগিলেন। এডিনবরা নগরে যে অধিবেশন হইয়াছিল তথায় তাঁহাদের বক্তব্য শেষ হইলে একজন সৈনিক বিভাগীয় কর্ম্মচারী (Major of the guards) সভা গৃহের এক প্রান্তভাগ হইতে দণ্ডায়মান হইয়া ভারতের দারিদ্র্য বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে তিনি ২৫ বৎসর কাল ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় দরিদ্রতার কোন লক্ষণই দেখিতে

পান নাই। বাবু সুরেন্দ্রনাথ তাহার বাক্যের প্রত্যুত্তর দান করিয়াছিলেন; তিনি স্বয়ং ভারতবর্ষের অধিবাসী, তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন ভারতবাসিগণের মধ্যে অতিবাহিত করিয়াছেন, সুতরাং ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার স্বকীয় অভিজ্ঞতা অনুসারে তিনি বলিতে বাধ্য যে ভারতবাসী যথার্থ দরিদ্র। অর্থনীতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ দাদাভাই নরোজীর মত উল্লেখ পূর্ব্বক তিনি স্বীয় মন্তব্যের পোষকতা করিলেন। নরোজী বিশেষ সতর্কতার সহিত গণনা পূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন যে সমস্ত ভারতবাসিগণের বার্ষিক আয় এক সঙ্গে গণনা করিলে প্রত্যেক ভারতবাসীর বার্ষিক আয় মোটের উপর ২০ কুড়ি টাকার অধিক নহে; পক্ষান্তরে প্রত্যেক ইংরেজের বার্ষিক আয় একুনে ৪০ চল্লিশ পাউণ্ড, প্রত্যেক ফরাসিসের ৩০ ত্রিশ পাউণ্ড এবং প্রত্যেক রুসিয়াবাসীর ৮ আট পাউণ্ড পরিমাণে বার্ষিক আয়। কিন্তু যদি উক্ত সৈনিক পুরুষ ভারতীয় অর্থনীতিজ্ঞের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন তাহা হইলে তিনি গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী সার ইভ্‌লিন্ বেয়ারিং ভারতবাসীর আয় সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা দেখুন। তাঁহার গণনায় প্রত্যেক ভারতবাসীর মোটের উপর বার্ষিক আয় ২৭ সাতাশ টাকার অধিক নহে। এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে সৈনিক কর্ম্মচারী বাক্ যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করিলেন, সভাস্থ পুরুষ ও রমণীগণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

হালবৰ্ণ ক্লবে যে সভার অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন যে অচিহ্নিত সরকারী কর্ম্মের (Uncovenanted service) উচ্চ পদ গুলিতে ভারতবাসীর নিয়োগ-পথ এক প্রকার বন্ধ রহিয়াছে। জনৈক ভারত প্রত্যাগত ইংরেজ সভামধ্য হইতে এই কথার প্রতিবাদ করিলেন; সৌভাগ্য বশতঃ ক্লবসংশ্লিষ্ট পুস্তকালয়ে এলাহাবাদ কনগ্রেসের কার্য্যবিবরণ পুস্তক ছিল, উহাতে শ্রীযুক্ত নর্টন্ সাহেবের বক্তৃতার একস্থানে শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ রায় কর্তৃক প্রস্তুত একটী তালিকা সন্নিবিষ্ট ছিল, উক্ত তালিকাস্থিত কর্ম্ম-সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়া প্রতিবাদকারীর ভ্রম প্রদর্শিত হইলে প্রতিবাদকর্ত্তা হতবুদ্ধি হইয়া উপবিষ্ট হইলেন।

বার্ম্মিংহাম নগরে যে সভা হইয়াছিল তাহাতে মেজর জেনারল্ ফেল্‌স্ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি একজন সৎপ্রকৃতির লোক এবং ভারতবাসীর প্রতি তাঁহার প্রকৃত সহানুভূতি আছে; কিন্তু তিনি বলিতে আরম্ভ করিয়াই আপত্তি উত্থাপিত করিলেন; শ্রীযুক্ত হিউম্ এমন সুকৌশলে এবং দক্ষতার সহিত তাঁহার বাক্যের প্রত্যুত্তর দান করিলেন যে সভাস্থ সকলেই একবাক্যে উক্ত প্রত্যুত্তর যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেন। শ্রীযুক্ত হিউম যে কেবল মাত্র পরিগঠন ও শৃঙ্খলা বিধানে নিপুণ তাহা নহে, তিনি একজন সুদক্ষ তার্কিক এবং সুবক্তা বলিয়াও বিখ্যাত। জেনারল্ ফেল্‌স্ এই বলিয়া জাতীয় সমিতির উদ্দেশে দোষারোপ করিয়াছিলেন যে উহাতে দ্বিতীয় মন্ত্রণা-বিভাগের (Second chamber) কোন ব্যবস্থা প্রদত্ত হয় নাই। শ্রীযুক্ত হিউম্ এই উত্তর প্রদান করিলেন যে দ্বিতীয় মন্ত্রণা বিভাগের কথা দূরে থাকুক, আমরা একটির জন্যও প্রার্থনা করি নাই।

মেজর ফেল্‌স্ বঙ্গদেশের কুলীন ব্রাহ্মণবর্গের বহুবিবাহ প্রথার দোষোল্লেখ করিয়াছিলেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং কুলীন ব্রাহ্মণ, শ্রীযুক্ত হিউম্ তাঁহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন—"আমার বন্ধু কুলীন ব্রাহ্মণ এবং তিনি ইচ্ছা করিলে স্বজাতির

প্রথা অনুসারে পাঁচ শত রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের পূর্ব্বে আত্মহত্যা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করেন।" এইরূপ অনেক পরীক্ষায় তাঁহাদিগকে উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বৃটিশ জনসাধারণের ভারতবর্ষের অবস্থায় অনভিজ্ঞতা, অমনোযোগ এবং কুসংস্কার ও অপ্রকৃত বর্ণনা জনিত অনাস্থা—বিশেষতঃ ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের দলাদলির জন্যও তাঁহাদিগকে আরও অনেক বাধা সহ্য করিতে হইয়াছিল। ইংলণ্ডে অধিকাংশ লোকের মনে ধারণা এই যে, আমরা এদেশে স্বাধীন শাসন-প্রণালী (Home Rule) প্রবর্ত্তিত করিতে অভিলাষী। আমাদের সেরূপ অভিলাষ নহে, তাহা অনেকবার অনেক প্রকাশ্য সভাস্থলে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখিত হইয়াছে; আমরা ভারতের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাগণকে অতিক্রম করিতে চাহি না এবং তাঁহাদের ক্ষমতাও হ্রাস করিতে ইচ্ছা করি না, একথাও শতবার বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে; পক্ষান্তরে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য সফল হইলে গবর্ণমেণ্ট বলহীন হইবার পরিবর্ত্তে দেশীয় সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ ব্যক্তিগণের সহায়তা লাভে পরম শক্তিশালী হইবেন। ইংলণ্ডীয় মহাসভার সভ্যগণের দলাদলি ও মত-বিভিন্নতায় তাঁহাদিগকে কি রূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহাও তিনি সুস্পষ্ট রূপে উল্লেখ করিলেন এবং সকলকে জানাইলেন যে এইরূপ বিস্তর অসুবিধা ও বিঘ্ন বাধা সত্ত্বেও তাঁহাদিগের অভীষ্ট বিষয় উল্লেখ মাত্র তৎসমস্তই শ্রোতৃবর্গেরহৃদয়াভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের বোধগম্য হইয়াছিল। তাঁহারা তাঁহাদিগের নিকট যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—ইংরেজ জাতি আমাদিগকে উচ্চ শিক্ষা দান করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা দান করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে নির্ব্বাচন-প্রথানুযায়ী আয়ত্ত শাসন প্রণালী দান করিয়াছেন, তাঁহারা দেশের সুখ শান্তি বর্দ্ধন এবং দেশমধ্যে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, এবং তাঁহারাই দেশীয় অধিবাসিগণের চরিত্রের উন্নতি ও মহত্ব সম্পাদনে বিশেষ উৎসাহ দান করিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের হৃদয়ে যে সকল ন্যায্য উচ্চ আশার সঞ্চার করিয়াছেন, এখন কি তাঁহারা তৎসমস্ত দলিত ও বিনষ্ট করিতে প্রস্তুত? তাঁহারা কি তাঁহাদের পরম কল্যাণকর রাজনীতি কৌশলের প্রকৃতি-সিদ্ধ অনিবার্য্য ফল দ্বারা পরিচালিত হইতে অনিচ্ছুক?

তাঁহারা সকল স্থান হইতে এইরূপ প্রার্থনার একই উত্তর পাইয়াছিলেন, এবং উহাতে আমাদিগের অভাব ও উচ্চ আশার প্রতি হৃদয়বান বৃটিশ জাতির গভীর আস্থা ও সহানুভূতি প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ত্রিশটি সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং সকল স্থানেই আশানুরূপ ফল লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্লার্কেন্‌ওয়েল নগরে তাঁহাদের প্রথম সভার অধিবেশন হইয়াছিল, স্বদেশীয় মাননীয় শ্রীযুক্ত দাদাভাই নরোজী এই স্থান হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া পার্লামেণ্ট মহাসভায় প্রবেশ লাভের জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহার প্রতিযোগী শ্রীযুক্ত ইভ্‌স্ সাহেব একণে কার্য্যক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, সুতরাং দাদাভাইর উদ্যম সফল হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

শ্রীযুক্ত ব্রাড্‌লর নিয়োগ স্থল নর্থ্যাম্‌টন্ নগরে তাঁহাদের দ্বিতীয় সভার অধিবেশন হইয়াছিল—শ্রীযুক্ত ব্রাড্‌ল উপস্থিত ছিলেন এবং স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ বাক্‌পটুতা সহকারে বক্তৃতা দানে সভার উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কেন্‌সিংটন্ নগরে তৃতীয় সভার অধিবেশন হইয়াছিল, সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত জষ্টিস ম্যাকার্থি

সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে পশ্চিম বিভাগে তাঁহাদের আন্দোলন আরম্ভ হয়; কার্ডিফ নগরে যে সভার অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সুসিদ্ধ হইয়াছিল; সভাস্থ সকলেই গভীর উৎসাহের সহিত সভার কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই এক-বাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন যে আমরা যাহা চাহিতেছি তাহা অত্যধিক নহে অত্যল্প। দক্ষিণ ওয়েল্‌সের সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত জন্‌ষ্টোন্ সাহেব প্রকাশ্যভাবে এই উপদেশ দান করিয়াছিলেন—"একখানি অখণ্ডরুটি প্রার্থনা কর যাহাতে উহার অর্দ্ধাংশ প্রদত্ত হইতে পারিবে, কিন্তু কখনই ধনশালীর টেবল্ হইতে পতিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুটির ছিক্কার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিও না।" ব্রিষ্টলের সভায় কলিকাতা হাইকোর্টের সহৃদয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত জষ্টিশ নরিশ সাহেবের গভীর সহানুভূতি পূর্ণ যত্ন প্রভাবে আশানুরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ হইয়াছিল। তিনি অযাচিত ও অননুরুদ্ধ ভাবে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া তাঁহার জনৈক ক্ষমতাশালী বন্ধুকে সভার বিশেষ কৃতকার্য্যতার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত নরিশ সাহেবের এই সাধুতার নিমিত্ত সমস্ত স্বদেশানুরাগী ভারতবাসী তাঁহার নিকট একান্ত কৃতজ্ঞ। অকস্‌ফোর্ড্ নগরের সভা প্রতিনিধিগণের যত্ন অপেক্ষা আমাদিগের ন্যায্য ও পরিমিত প্রার্থনা গুণেই অধিক পরিমাণে জয়লাভ করিয়াছিল।

উত্তর বিভাগের আন্দোলন নিউক্যাসলের নিকটবর্ত্তী গেট্‌স্‌হেড নগরে তত্রত্য প্রসিদ্ধ ডাক্তর স্পেন্স ওয়াটসন্ সাহেবের বাটীতে একটী উদ্যান সমিতিতে হইয়াছিল। উক্ত সমিতিতে সকল দলের প্রতিনিধিগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিল এবং সকলেই উহাতে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রতিনিধিগণ নিউক্যাসল্ হইতে স্কট্‌লণ্ডে গমন করেন; তথায় সর্ব্বশুদ্ধ চারিটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। গ্লাস্‌গো নগরে যে সভা হইয়াছিল সেইটিই শেষ সভা এবং তাহাতে প্রতিনিধিগণের উদ্যম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সফল হইয়াছিল। তত্রত্য জনৈক প্রধান ধনশালী বণিক শ্রীযুক্ত জন্ টালিস্ সাহেবের সহায়তা প্রভাবেই উক্ত সভা সমধিক জয়লাভ করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত টালিস্ আমাদের প্রসিদ্ধ স্বদেশবাসী পার্সিবণিক শ্রীযুক্ত আর ডি, মেটার পরম বন্ধু; মহাসমিতির প্রতিনিধি বাবু সুরেন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত মেটার নিকট হইতে একখানি পরিচয় পত্র লইয়া তাঁহার নিকট পরিচিত হয়েন। শ্রীযুক্ত গ্লাড-ষ্টোন সাহেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহারা গ্লাস্‌গো হইতে লণ্ডনে চলিয়া আসিবার নিমিত্ত টেলিগ্রাম দ্বারা আহুত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহাদের যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা এক্ষণে একটি ঐতিহাসিক বিষয় রূপে গণ্য হইবার যোগ্য। শ্রীযুক্ত গ্লাডষ্টোন সাহেবের ভারতবর্ষের অবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহার সহানুভূতি ও সহায়তা লাভে সমর্থ হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। ভারত-প্রতিনিধিগণের সম্মানার্থে ম্যাঞ্চেষ্টর নগরের উত্তর বিভাগের সভ্য শ্রীযুক্ত সোয়ান্ সাহেবের বাটীতে যে একটি ভোজের আয়োজন হইয়াছিল তাহাতেই তাঁহাদের মহাসমিতির উদ্দেশ্য বিষয়ক আন্দোলন সমাপ্ত হইয়াছিল।

এই প্রকারে তাঁহাদের কার্য্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান পূর্ব্বক তিনি এই বলিয়া সকলের মনে আশার সঞ্চার করিলেন যে তাঁহাদের উদ্যমে ইংলণ্ডে মহাসমিতির উদ্দেশ্য বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়াছে এবং তত্রত্য সহস্র সহস্র হৃদয়বান ও ক্ষমতাশালী

নরনারী তাঁহাদের প্রাণের আশার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রতিবর্ষে এইরূপ আন্দোলনের জন্য ইংলণ্ডে কতিপয় প্রতিনিধি প্রেরিত হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়; ভারতীয় রাজনৈতিক কার্য্যালয়ের (Indian political agency) যত্নে অনেক সুকার্য্য সাধিত হইতেছে; কিন্তু উহার অনুষ্ঠিত কার্য্য পরিবর্দ্ধিত ও সমুন্নত হওয়া প্রার্থনীয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে উহার শাখা কার্য্যালয় সংস্থাপিত হওয়া উচিত, এবং মহাসমিতির উদ্দেশ্য সর্ব্বক্ষণ আন্দোলিত করিবার নিমিত্ত বেতনভোগী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা একান্ত আবশ্যক। এই সকল কার্য্য সংসাধন জন্য অনেক অর্থের আবশ্যক। যাঁহারা দেশের জন্য পরিশ্রম করেন না তাঁহাদের অর্থ সাহায্য দান করা উচিত। যাঁহারা অর্থ দান করেন এবং দেশহিতের জন্য পরিশ্রম করেন তাহারাই যথার্থ সুসন্তান; যাঁহারা অর্থ দান করেন না এবং পরিশ্রমেও কাতর, তাঁহাদিগকে কি বলিয়া বর্ণনা করিতে হয় তাহা তিনি বলিতে পারেন না। অনন্তর তিনি আগামী জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন উল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন যে এবার কলিকাতা নগরে উক্ত মহাসমিতির অধিবেশন হইবে। সমগ্র ভারতের শত শত প্রতিনিধির পরিচর্য্যার ভার আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে; দেশের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অনুসারে আমাদিগকে সকলের প্রতি যথোচিত আতিথ্য প্রদর্শিত করিতে হইবে; মহাসমিতির উপলক্ষে আমরা মান্দ্রাজ, এলাহাবাদ ও বোম্বাই নগরের নিকট যে সকল বিষয়ে ঋণী, এবার আমাদিগকে তৎসমস্তের যথোপযুক্ত প্রতিদান দিতে হইবে। প্রতিবর্ষে মহাসমিতির অধিবেশন উপলক্ষে যেরূপ মহৎ আতিথ্য প্রদর্শিত হইতেছে, আমরাও যেন তাহার গৌরব অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিতে পারি। আমরা সহজে দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিব না। আমাদের উপর ভারতবর্ষীয় এবং ইংলণ্ডস্থ শাসনকর্তৃগণের চক্ষু পতিত হইয়াছে—আমরা তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি, আমরা যাহা বলি, যাহা করি এবং সর্ব্বোপরি আমরা যে পরিমাণে ত্যাগ স্বীকারের পরিচয় দান করিতে সক্ষম হইব তদনুসারে বিবেচিত হইবে আমরা প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক শাসন প্রণালী লাভের উপযুক্ত পাত্র কি না। জগদীশ্বর ভারতের ভবিষ্যতের জন্য সুদিন সঞ্চিত রাখিয়াছেন; আমরা যদি প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রদর্শন করিতে পারি তাহা হইলে অচিরে তাহা দেখিতে সমর্থ হইব।

উপসংহারে তিনি গভীর উৎসাহের সহিত সকলকে আগামী মহাসভার কৃতকার্য্যতার জন্য কায়মনে সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন যে, যদি আমরা নিঃস্বার্থ ভাবে প্রাণপণে স্বদেশের মঙ্গলের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে সক্ষম হই, তাহাহইলে জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদে, সহৃদয় ইংলণ্ডের সহায়তায় একদিন অবশ্যই আমাদের প্রাণের আশা পূর্ণ হইবে; এই বলিয়া তিনি সভাস্থ সকলকে তাঁহাদের সহৃদতার জন্য পুনরায় ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা দান পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। চতুর্দ্দিক হইতে গভীর আনন্দ প্রকাশক করতালি ধ্বনি হইতে লাগিল। অনন্তর সভাপতি মহাশয় সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বক্তৃতায় সভাস্থ সকলের উৎসাহবর্দ্ধন পূর্ব্বক সভাভঙ্গ করিলেন।

শ্রীবিজয় লাল দত্ত।

আর্য্যামি এবং সাহেবি আনা। *

আমাদের দেশে যখন জাতি-ভেদের গোড়াপত্তনও হয় নাই সেই মান্ধাতারও পূর্ব্বের আমলে একটি নবাভ্যাগত পরাক্রমশালী জাতি উত্তর অঞ্চল হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম কোণে আড্ডা গাড়িয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে আর্য্য বলিতেন এবং ভারতবর্ষের আদিম নিবাসীদিগকে দস্যু বলিতেন। তাহার পরে যখন জাতিভেদের সবে-মাত্র গোড়া-পত্তন আরম্ভ হইয়াছে সেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক মান্ধাতার আমলে আর্য্য বলিতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন-বর্ণ-সম্বলিত একটি জেতৃজাতি বুঝাইত এবং শূদ্র বলিতে অধীনস্থ বিজিত দস্যুগণ বুঝাইত। এই প্রাচীন কালের ভারতবর্ষীয় আর্য্য-জাতিকে যদি একটা মৎস্যরূপে কল্পনা করা যায় তবে এইরূপ দাঁড়ায় যে তাহার মুড়াখানি ব্রাহ্মণ, পেটিখানি ক্ষত্রিয় এবং ল্যাজাখানি বৈশ্য; কিন্তু এক্ষণকার এই কলিযুগে সে মৎস্যটির ল্যাজা এবং পেটি, অর্থাৎ বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়, কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া অবশিষ্ট থাকিবার মধ্যে কেবল মুড়াখানি মাত্র অর্থাৎ একা কেবল ব্রাহ্মণ মাত্র অবশিষ্ট আছে—তাহাও না থাকারই মধ্যে; কেন না, কাল-রাক্ষস কাহাকেও সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে—বিশেষতঃ অমন একটা শাঁসালো সামগ্রীকে! বলিব কি—নিদারুণ রাক্ষসটা সেই শত-যোজন-ব্যাপী তিমি মৎস্যের দশযোজন-ব্যাপী মুড়াখানির ভিতর হইতে তাহার সমস্ত রস কস শুষিয়া গলাধঃকরণ করিয়াছে—তাহার বিন্দু [illegible] অবশিষ্ট রাখে নাই! ফলেও তাই দেখা যায় যে, এক্ষণকার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত স[illegible]র মস্ত[illegible]—উপরি-অঞ্চলে শিখা দেদীপ্যমান কিন্তু তাহার ভিতর-অ[illegible]চিন্তার পরিবর্ত্তে অন্নচিন্তা বলবতী! এক্ষণকার ব্রাহ্মণও [illegible] তাঁহা[illegible]মান! পৈতার সময়ে নূতন ব্রহ্মচারী কোথায় বারো বৎসর [illegible] বাস করিয়া বেদ অভ্যাস করিবেন—তাহা না করিয়া তিনি তিন দি[illegible]স করিয়া নিছক আলস্যে দিনপাত করেন! পূর্ব্বতন কালে যাঁহা[illegible]ইউপবীত গ্রহণান্তে গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিতেন, তাঁহারা [illegible]হই নগরে পল্লীতে ভিক্ষা করিতে বাহির হইতেন এবং সেই সূত্রে প্রত্যহই তাঁহারা গণ্ডা গণ্ডা শূদ্রের মুখ দর্শন করিতেন—তাহাতে তাঁহাদের শাদা পৈতা কালো হইয়া যাইত না! কিন্তু এক্ষণকার নূতন ব্রহ্মচারীরা

---

* চৈতন্য লাইব্রেরি সভার বিগত অধিবেশনে এই স্বরচিত প্রবন্ধটি শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পঠিত হয়। ইহা শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে; দশ পোনেরো দিবস পরে গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে তত্ত্ব করিলেই তাহা যৎকিঞ্চিৎ মূল্যে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শূদ্রের ভয়েই অস্থির—পাছে শূদ্রের অপবিত্র মুখ কোনো গতিকে তাঁহাদের নয়নপথে নিপতিত হয় এই ভয়ে তাঁহারা তিন দিবস ঘরে কপাট বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকেন! ইহার অর্থ আর কিছু না—"আমি যখন শূদ্রের মুখ দেখিতেছি না তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, আমি তপোবনে বাস করিতেছি!" মনকে প্রবোধ দিবার কি চমৎকার যুক্তি-কৌশল! এইরূপ যুক্তি-কৌশলের বশবর্ত্তী হইয়াই—বালকেরা জল-শূন্য ক্ষুদ্র কলসীতে করিয়া পুতুলের মাথায় জল ঢালিবার সময় মুখে ঘট্ ঘট্ শব্দ করে, কেননা তাহা না করিলে "জল ঢালা হইতেছে" এ বৃত্তান্তটি একেবারেই অপ্রমাণ হইয়া যায়; এইরূপ যুক্তি-কৌশলের বশবর্ত্তী হইয়াই—দুই এক জন বাঙ্গালী সাহেব কথায় কথায় ইংলণ্ডকে হোম্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কেননা তাহা না করিলে তিনি যে বাঙ্গালী নহেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষেই সাহেব এ বৃত্তান্তটি অপ্রমাণ হইয়া যায়; শূদ্রের মুখ নূতন ব্রহ্মচারীর নয়নগোচর হইলে "তিনি যে তপোবনে গুরুর সম্মুখে বসিয়া বেদ অধ্যয়ন করিতেছেন" এ বৃত্তান্তটি একেবারেই নস্যাৎ হইয়া যায়! এসব ছেলেমি কাণ্ড পূর্ব্বে আমাদের দেশে ছিল না—এগুলি হ'চ্চে অধুনাতন টোলের অধ্যাপকদিগের নস্যান্ধ মস্তিষ্কের নূতন সৃষ্টি! একজন নৈয়ায়িক স্মার্ত্তবাগীশ বলিতে পারেন যে, কলিযুগের বিধানে তিন দিবস কারাগৃহে বদ্ধ থাকা'র নামই বারো বৎসর গুরুগৃহে বেদাভ্যাস করা; তাহা যদি তিনি বলেন, তবে তাঁহার প্রতি আমার বিনীত নিবেদন এই যে, অতগুলা কথা না বলিয়া দুই কথায় তিনি এইরূপ বলিলেই তো বলিতে পারিতেন যে, "ক[illegible]গের" বিধানে সূত্র-গুচ্ছ-ধারী শূদ্রের নামই ব্রাহ্মণ!

মুড়া যিনি ব্রাহ্মণ—তাঁহারই যখন এই দশা [illegible], পেটটি যিনি ক্ষত্রিয় তাঁহার তো কথাই নাই। মুড়াটির মজ্জা না থাকুক [illegible] আছে, পেটের আবার তাহাও নাই! কাল রাক্ষস এমনি তাহাকে নি[illegible] মুছিয়া পরিষ্কাররূপে উদরস্থ করিয়াছে যে, কুত্রাপি তাহার চিহ্ন মাত্র[illegible] পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান অব্দে ক্ষত্রিয় শব্দ কেবল পরশুরামের কোপাগ্নিকেই আমাদের মনে পড়াইয়া দেয়। আমরা আমাদের চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেই দেখিতে পাই যে, রাম সিংহ শ্যাম সিংহ প্রভৃতি পশ্চিম প্রদেশীয় সিংহেরা নামেই কেবল সিংহ; তা ভিন্ন ভারতের এ মুড়া-হইতে ওমুড়া-পর্য্যন্ত দাপাইয়া বেড়াইলেও কেহ বলিতে পারিবেন না যে, তাহার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে তিনি কোথাও একটা সিংহ দেখিয়াছেন অথবা কোথাও একজন ক্ষত্রিয় দেখিয়াছেন! ত্রেতাযুগে পরশুরাম যৎকিঞ্চিৎ যাহা বাকি রাখিয়াছিলেন—দ্বাপর-যুগে কুরুক্ষেত্র তাহা সমূলে নিঃশেষিত করিয়া ছাড়িয়াছে। বৈশ্য আবার ততোধিক রহস্য! বর্ত্তমান অব্দে কে যে বৈশ্য আর কে যে বৈশ্য নয় তাহা "দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ!" খুব সম্ভব যে, পুরা-প্রচলিত অসবর্ণ-বিবাহের বিমুক্ত

রাক্ষস, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এই দুই মুখের শোষণ-বলে, সমস্ত বৈশ্য-শোণিত ক্রমে ক্রমে গলাধঃকরণ করিয়া অবশেষে অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিনই যখন সশরীরে বর্ত্তমান ছিল, তখন সেই তিন বর্ণকে এক সঙ্গে জ্ঞাপন করিবার জন্য আর্য্য-শব্দেরও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এক্ষণকার এই কলিযুগের কঠোর অঙ্কে আর্য্যের মধ্যে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বাদে একা কেবল ব্রাহ্মণই অবশিষ্ট। বর্ত্তমান কালে তিন বর্ণ যখন এইরূপ এক বর্ণে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তখন আর্য্য-শব্দের সাহায্যে তিন বর্ণকে এক সঙ্গে জোড়া দিবার জন্য কাহার কি এত মাথাব্যথা পড়িয়াছে বলিতে পারি না; তিন-বর্ণই যখন নাই—তিন বর্ণের মধ্যে যখন এক বর্ণ ই কেবল আছে—তখন তিন বর্ণকে এক শব্দে জ্ঞাপন করিবার জন্য আর্য্য-শব্দের সাহায্য বাঞ্ছা করা নিতান্তই "শিরো নাস্তি শিরঃপীড়া"—মাথা নাই তার মাথা ব্যথা। তবে কি একা কেবল ব্রাহ্মণকেই আর্য্যের কোটায় কারারুদ্ধ করিয়া রাখা যাইবে? তাহা করিলে নিরীহ ব্রাহ্মণ-বেচারীর প্রতি নিতান্তই জুলুম হয়! রাজ-পুরুষেরা আমাদের দেশের কোনো মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে Gentleman এর Certificate প্রদান করিলে তাহাতে যত তাঁহার মান-মর্য্যাদা বর্দ্ধিত হয় তাহা বুঝাই যাইতেছে! সেরূপ করিলে শুধু যে কেবল তেলা মাথায় তেল দেওয়া হয় তাহা নহে, তাহাতে প্রকারান্তরে লোককে জানানো হয় যে, পূর্ব্বে ইহাঁর মাথায় তেল ছিল না—দয়ার্দ্রচিত্তে আমরা ইহাঁর মস্তকে বিলাতি পোমেটম লেপন করাতে ইহাঁর পদতলে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশের চিহ্ন ফুটিয়া বাহির হইল, অর্থাৎ পূর্ব্বে ইনি ভদ্রলোক ছিলেন না—আমরা ইহাঁর হস্তে জেণ্টেলম্যানের সার্টিফিকেট প্রদান করাতে তাহারই অমোঘ প্রসাদ-বলে আজ অবধি ইনি ভদ্র-লোকের শ্রেণীভুক্ত হইলেন! আমাদের দেশের কোনো চির-প্রসিদ্ধ বংশের ভদ্রলোককে Gentelman এর Certificate প্রদান করা এবং ব্রাহ্মণ জাতিকে আর্য্য উপাধি প্রদান করা দুইই অবিকল সমান। ফলে, ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া আর্য্য বলিলে ব্রাহ্মণদেব তাহাতে তুষ্ট না হইয়া বরং রুষ্টই হ'ন; তাঁহার রোষের কারণ এই যে আর্য্য তো সকলেই—ক্ষত্রিয়ও আর্য্য—বৈশ্যও আর্য্য—এবং কলিযুগের নূতন শাস্ত্র অনুসারে যাঁহার লোহার সিন্ধুকে টাকা আছে কিম্বা নামের অন্ত-ভাগে দুই চারিটা ইংরাজী অক্ষর আছে তিনিই আর্য্য! ব্রাহ্মণ তো আর সেরূপ আর্য্য নহে! শাস্ত্রের বিধান মতে ক্ষত্রিয়-বীর্য্যও ব্রহ্মতেজের নিকটে নত-মস্তক। তাহার সাক্ষী—বাল্মীকির রামায়ণে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে "ধিক্‌বলং ক্ষত্রিয়-বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলং" ক্ষত্রিয়-বল ছার বল—তাঁহাকে ধিক্! ব্রহ্ম তেজ বলের বল মহাবল!" ভাগীরথী শুধু তো আর নদী ভাগীরথী নহে, শাস্ত্রের বিধান মতে তিনি দেবী ভাগীরথী; তেমনি ব্রাহ্মণ শুধু তো আর আর্য্য-শর্ম্মা নহে—শাস্ত্রের বিধান মতে তিনি দেব শর্ম্মা। গঙ্গাস্নানকে গঙ্গাস্নান না বলিয়া কেহ যদি

বলেন নদী-স্নান, তবে তাহা শ্রবণ মাত্রে—এমন যে শীতলসলিলা দেবী, ভাগীরথী, রোষের বাড়বানলে তিনিও উষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ওঠেন না! তেমনি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজকে ব্রহ্মতেজ না বলিয়া কেহ যদি বলেন "আর্য্যতেজ"—ব্রাহ্মণ-শাস্ত্রকে ব্রাহ্মণ-শাস্ত্র না বলিয়া বলেন "আর্য্য-শাস্ত্র"—ব্রাহ্মণ জাতিকে ব্রাহ্মণ-জাতি না বলিয়া বলেন "আর্য্যজাতি", তবে তাহাতে ব্রহ্মণ্য দেবের কর্ণে শেল বিদ্ধ হইবারই কথা।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, এক্ষণকার কালে তিন বর্ণকে এক শব্দে বাচন করিবার জন্য আর্য্য শব্দের সাহায্য যাচ্ঞা করা শিরো নাস্তি শিরঃপীড়া এবং এক্ষণে দেখা গেল যে, ব্রাহ্মণকে আর্য্য উপাধি প্রদান করিলে ব্রহ্মণ্য দেবকে প্রকারান্তরে অপমান করা হয়;—তবেই হইতেছে যে, বর্ত্তমান কলিযুগে ভারতবর্ষের কোনো জাতি-বিশেষকে অথবা কোনো জাতি-সমষ্টিকে লক্ষ করিয়া জাতি-বাচক অর্থে আর্য্য-শব্দ ব্যবহার করা নিতান্তই বিড়ম্বনা। অতএব অধুনাতন কালে আর্য্য শব্দ উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে কিরূপ স্থলে তাহাকে কিরূপ অর্থে প্রয়োগ করা যুক্তি-সঙ্গত তাহা একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা করিতে গেলে আর্য্য-শব্দের অর্থ কাল-ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া কোথাকার জল কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রতি একবার প্রণিধান করিয়া দেখা আবশ্যক; এই বিবেচনায় এইখানে তাহার একটা চুম্বক আলেখ্য প্রদর্শন করা যাইতেছে।

আমাদের দেশে আর্য্য-শব্দের প্রয়োগ প্রথমে আর্য্যাবর্ত্তের চতুঃসীমার মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল; তাহার পরে তাহা ভারতবর্ষের দক্ষিণাভিমুখে এবং পূর্ব্বাভিমুখে ক্রমশই দূরে দূরে পরিব্যাপ্ত হইয়া কলিকাতায় বাজারের সুলভ গোদুগ্ধের ন্যায় সর্ব্ব-ঘটেই অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। মহানগরীর অভিধানে যেমন পোনেরো আনা জল-মিশ্রিত এক আনা দুগ্ধও দুগ্ধ শব্দের বাচ্য—কলিযুগের অভিধানে—তেমনি ভদ্রাভদ্র যে-সে-বংশীয় ভদ্রলোক আর্য্য নামের অভিধেয়। এই খেদে আর্য্য-শব্দ আমাদের দেশে এতকাল পর্য্যন্ত অমর-কোষের কোটরাভ্যন্তরে মুখ মুড়িসুড়ি দিয়া কথঞ্চিৎ প্রকারে কালাতিপাত করিতেছিল—লোকালয়ে তাহাকে বড় একটা বাহির হইতে দেখা যাইত না;—বিশেষতঃ মুসলমানদিগের প্রাদুর্ভাব কালে আর্য্য-নারীদিগের দেখাদেখি আর্য্য-শব্দেরও বহিস্ফূর্ত্তি একেবারেই দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু আজ অকস্মাৎ একি বজ্রাঘাত! বিদ্বজ্জন-পুরের পথে ঘাটে মাঠে হাটে আর্য্যশব্দের একি প্রবল বন্যা! আমাদের দেশে আর্য্য-শব্দের রাতারাতি এই যে নূতন অভ্যুদয়, ইঁহার মূল প্রবর্ত্তক মনুও নহেন, যাজ্ঞবল্ক্যও নহেন, পরাশরও নহেন, বেদব্যাসও নহেন—তবে কে? আর কে—উক্ষতরণ (অর্থাৎ Oxford) চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীমন্ ম্যাক্স্ মুলার ভট্ট।

ইতিপূর্ব্বে আর্য্য-জাতিকে একটা মৎস্যরূপে কল্পনা করা গিয়াছে, এক্ষণে আর্য্য-

শব্দের প্রয়োগ-পদ্ধতিকে সেইরূপে কল্পনা করা হো'ক্। পুরাণের একস্থানে এইরূপ একটা উপন্যাস আছে যে, একটা মৎস্য প্রথমে এক হাঁড়ি জলে প্রতিপালিত হইয়াছিল; কাল ক্রমে যখন সে বড় হইয়া হাঁড়ির সীমা ছাড়াইয়া উঠিল তখন তাহাকে একটা ডোবার মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইল; যখন সে আরো বড় হইয়া ডোবার সীমা ছাড়াইয়া উঠিল তখন তাহাকে পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল; এরূপ করিয়া মৎস্যটা ক্রমশই যত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল ততই সে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হইয়া অবশেষে যখন সমুদ্র হইতে মহা-সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইল তখন ক্রমে সেখানেও তাহার স্থান সংকুলন হওয়া ভার হইয়া উঠিল; কিন্তু আমাদের দেশে আর্য্য শব্দের প্রয়োগ-পদ্ধতি এতকাল পর্য্যন্ত ঠিক্ তাহার বিপরীত পথ অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল; ক্রমশই তাহা ক্ষুদ্র-হইতে ক্ষুদ্রতর জলাশয়ে সংক্রামিত হইয়া—এককালে যাহা শত-যোজনব্যাপী তিমি মৎস্য ছিল কালক্রমে তাহা কীট হইতে কীটাণুতে পরিণত হইতে লাগিল; ইউরোপ এসিয়া এবং আফ্রিকার ত্রিবেণীসঙ্গম হইতে আর্য্যাবর্ত্তের পুষ্করিণীতে এবং তথা হইতে অমর-কোষের ডোবার ভিতরে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিরীহ মৎস্যটি মর্ত্ত্যলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পন্থা অন্বেষণ করিতেছিল—তাহার যখন নাভিশ্বাস উপস্থিত তখন মহাত্মা ম্যাক্সমুলার ভট্ট দয়ার্দ্র চিত্তে তাহাকে সেই সংকীর্ণ কারাগার হইতে আলোকে বাহির করিয়া আনিয়া—আবার তাহাকে তাহার পুরাতন বাসস্থানে—সূর্য্যের উদয়াস্তস্পর্শী মহা-সমুদ্রে—প্রত্যানয়ন করিলেন। অতএব ম্যাক্সমুলারের আর্য্য স্বতন্ত্র এবং অমর-কোষের আর্য্য স্বতন্ত্র।

এতদিন ধরিয়া আর্য্য-শব্দ আমাদের দেশে কচিৎ কোনো সংস্কৃত পুঁথির অসূর্য্যস্পশ্য নিভৃত নিকেতনে কীটে কীটে জর্জ্জরিত হইতেছিল—কেহই তাহাকে পুছিত না; সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ম্যাক্স্ মূলার ভট্ট বঙ্গীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর কর্ণকুহরে আর্য্য-মন্ত্রের ফুৎকার প্রদান করিয়া তাঁহাদের প্রসুপ্ত আর্য্যতেজ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন—এখন আর রক্ষা নাই! যখন ম্যাক্সমুলারের নামও কেহ জানিত না—ম্যাক্স্মূলার যখন পাঠশালায় হামাগুড়ি দিতেছেন—সেই মান্ধাতার আমল হইতে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণের মর্ম্ম-নিহিত সার সার বচনগুলি ব্যাখ্যাত হইয়া আসিতেছে—সে দিকে কেহই বড় একটা কাণ পাতিলেন না; রামমোহন রায়ের আমল হইতে মহানগরীর বক্ষ-প্রদেশে বেদ-উপনিষদের প্রশান্ত গম্ভীর অথচ অগ্নিময় বাক্য-সকল বিশুদ্ধ সংস্কৃত-স্বরে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে—তাহা কাহারো গ্রাহ্যে আসিল না; বিলাত-হইতে আর্য্য-মন্ত্রের আমদানি হইল—আর আমাদের দেশশুদ্ধ সমস্ত কৃতবিদ্য যুবক আর্য্য আর্য্য করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিলেন; তাঁহাদের সহস্র কণ্ঠের উদ্গীরিত আর্য্য-নামের চীৎকার জয়-ধ্বনিতে ইয়ঙ্ বেঙ্গলের গাত্রে থরহরি কম্প উপস্থিত হইল; ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য দেব দানোয়-পাওয়া শবদেহের

ন্তার মৃত্যু-শয্যা হইতে সহসা গাত্রোত্থান করিয়া পৈতা মাজিতে মাজিতে ফিরে-কিঁর্ত্তি কোমর বাঁধিয়া বসিয়া সন্ধ্যা গায়ত্রী মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিলেন; ইতিপূর্ব্বে কোনো পুরুষেই যাঁহারা অধ্যয়ন-অধ্যাপনার চৌকাট মাড়াইতে সাহসী হ'ন নাই সেই সকল ব্রাহ্মণেতর বংশের তন্ত্বাগীশেরা অকস্মাৎ গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাইতে আরম্ভ করিলেন;—শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে ঠেলিয়া আপনারা জ্ঞান-সমুদ্রের উঁচা পাড়ে আরোহণ-পূর্ব্বক যোগ যাগ তন্ত্র মন্ত্র বেদ উপনিষদ্ প্রভৃতি যেখানকার যতকিছু নিগূঢ় রহস্য সমস্তই বিস্মৃতির রসাতল-গর্ত্ত হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য সুধীবর বেশে (সু ধীবর-বেশে) কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন; কাঁহারো জালে একটা তাঁবার চাক্তি উঠিল, তিনি ভাবিলেন "এমন উজ্জ্বল সুবর্ণ তো একালে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না!" কাঁহারো জালে একটা সাত রাজার ধন মাণিক উঠিল অমনি "এ আবার কি—দূর" বলিয়া তিনি তদ্দণ্ডেই তাহা রসাতলে ফেরত পাঠাইলেন। ম্যাক্স্ মূলার ভট্টের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে আর্য্য বলিয়া যে একটা শব্দ অভিধানে আছে তাহা তাঁহারা জানিতেন কি না সন্দেহ! তাহার পরে ম্যাক্স্ মূলার যখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া পৃথিবীময় আর্য্য-মন্ত্রের বীজ ছড়াইতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাহার দুই একটি ছিটা ফোঁটা তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহাদের মানস-ক্ষেত্রে আর্য্যামির অঙ্কুর গজাইতে আরম্ভ করিল। এই বৃত্তান্তটি স্মরণে জাগ্রত রাখিবার মানসে ম্যাক্স্মূলার ভট্টকে আমরা গোস্বামী বলিয়া সম্বোধন করিব এবং বঙ্গীয় নব্য আর্য্যদিগকে গোস্বামীর শিষ্য বলিয়া সম্বোধন করিব। গোস্বামী শব্দের মুখ্য অর্থ ধরিতে গেলে গোস্বামী বলিতে যদিচ গো-রক্ষক বুঝায়, কিন্তু সে অর্থে গোস্বামী উপাধি ম্যাক্স্ মূলার ভট্টকে কিছুতেই শোভা পায় না; কেননা তিনি খড়দ'র গোস্বামীও নহেন—শান্তিপুরের গোস্বামীও নহেন—তিনি উক্ষতরণের অর্থাৎ Oxfordএর গোস্বামী; অনেক উক্ষ Ox এবং গো যেখানে নিত্য নিত্য গোলোকে তরিয়া যায় সেই উক্ষতরণের তিনি গোস্বামী! তাঁহাকে যদি গোরক্ষক অর্থে গোস্বামী বলা যায় তবে প্রকারান্তরে বলা হয় "যিনিই রক্ষক তিনিই ভক্ষক!" অতএব তাহাতে কাজ নাই! আমরা তাঁহাকে চলিত অর্থেই গোস্বামী বলিব। গোস্বামী কিনা মন্ত্রদাতা দীক্ষাগুরু—এই অর্থেই আমরা তাঁহাকে গোস্বামী বলিব। অনতিপরেই প্রকাশ পাইবে যে, গোস্বামীর বৈজ্ঞানিক আর্য্য এবং তাঁহার শিষ্যদিগের সঙ্ আর্য্য দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

ফল কথা এই যে, আর্য্য চারি প্রকার—(১) বৈদিক আর্য্য, (২) পৌরাণিক আর্য্য, (৩) বৈজ্ঞানিক আর্য্য, (৪) সঙ্ সাজা আর্য্য।

প্রথম, বৈদিক আর্য্য;—ভারতবর্ষের প্রাচীনতম আর্য্য যাহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণের মূল উপাদান তাহাই বৈদিক আর্য্য।

দ্বিতীয়, পৌরাণিক আর্য্য ;—পৌরাণিক আর্য্যের চতুর্দ্দিকে কোনো প্রকার জাতীয় গণ্ডির বের দেওয়া নাই—সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তিমাত্রই তাহার উদার ক্রোড়ে স্থান পাইতে পারেন ; তাহার সাক্ষী—পুরাণে লিখিত আছে "কর্ত্তব্যমাচরণ্ কার্য্যমকর্ত্তব্যমনাচরন্। তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে স বা আর্য্য ইতি স্মৃতঃ।" "অর্থাৎ কর্ত্তব্য আচরণ করিয়া এবং অকর্ত্তব্য অনাচরণ করিয়া যিনি প্রকৃত আচারে অবস্থিতি করেন তিনিই আর্য্য শব্দের বাচ্য।"

তৃতীয় বৈজ্ঞানিক আর্য্য ;—এই আর্য্যই গোস্বামীর আর্য্য ; এ আর্য্যের বিশাল পরিধির অভ্যন্তরে বাঘে গরুতে একত্রে জল-পান করে ; ইংরাজ বাঙ্গালী, ফরাসীস্ জর্ম্মান্, রুষীয় পোল্ সকলেই সকলকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে ; এ আর্য্যের সুবিস্তীর্ণ ললাটে এই মন্ত্র-বচনটি স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে যে, "উদারচেতসাং পুংসাং বসুধৈব কুটুম্বকং" উদারচেতা পুরুষদিগের সমস্ত পৃথিবীই জ্ঞাতি কুটুম্ব।

চতুর্থ, সঙ্‌সাজা আর্য্য ;—এইটিই গোস্বামীর শিষ্যদিগের আর্য্য ; এ আর্য্য বৈদিক আর্য্য নহে ইহা বলা বাহুল্য ; কেননা, সত্য-যুগের বৈদিক আর্য্য যাহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের মূল উপাদান এবং ত্রেতা-যুগের বৈদিক আর্য্য যাহা ঐ তিন বর্ণের সমষ্টি এ দুই আর্য্য কলি-যুগের ত্রিসীমার মধ্যেও স্থান পাইতে পারে না—কেমন করিয়াই বা স্থান পাইবে ? এ ছার কলিযুগে ক্ষত্রিয়ও নাই, বৈশ্যও নাই ; কাজেই এক্ষণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সমষ্টি বলিতে কেবল আকাশ-কুসুমই বুঝায়—তা ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না। এ আর্য্য পৌরাণিক আর্য্যও নহে ; কেননা পৌরাণিক আর্য্য জাতি-বিচার না করিয়া সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রকেই ক্রোড়ে লইতে প্রস্তুত—গুহ চণ্ডালকেও তিনি ত্যজ্য পুত্র করেন নাই। পৌরাণিক আর্য্য সদাচারের পক্ষপাতী—সঙ্ আর্য্য সদসৎ সকল-প্রকার লোকাচারের পক্ষপাতী ; এ আর্য্য সামান্য একটি লোকাচারের পান হইতে চুন খসিলেই—কি যেন একটা মহাপ্রলয় ঘটিয়াছে মনে করে ; গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হইয়া বিলাত-ফের্তাদিগের প্রতি গোবরের ব্যবস্থা করে ; ঢাল নাই খাঁড়া নাই নিধিরাম সর্দ্দার হইয়া উনবিংশ শতাব্দীয় বিজ্ঞানকে দ্বন্দ-যুদ্ধে আহ্বান করে ; নিরীহ সেকেলে পৌরাণিক আর্য্যের সাধ্য কি যে, এ আর্য্যের নিকটে এগোয় ! এ আর্য্য বৈজ্ঞানিক আর্য্যও নহে ; কেননা, গোস্বামীর বৈজ্ঞানিক আর্য্য ইংরাজ বাঙ্গালি ফরাসীস্ জর্ম্মান প্রভৃতি সকল আর্য্য জাতিকেই ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করে ; কিন্তু এ আর্য্য আপনার মূষিক-সম্প্রদায়-ভুক্ত আর্য্য ছাড়া আর আর সমস্ত আর্য্যকেই—সিংহ-সম্প্রদায়-ভুক্ত আর্য্যকেও—ম্লেচ্ছ বলিয়া অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, গোস্বামীর শিষ্যদিগের আর্য্য—বৈদিক আর্য্যও নহে, পৌরাণিক আর্য্যও নহে, বৈজ্ঞানিক আর্য্যও নহে—তাহা যে কোন্ আর্য্য, সেইটিই বিষম সমস্যা ! স্পষ্ট কথা বলিতে কি—

এ আর্য্য আর্য্যই নহে কেবল আর্য্যের একটা ভান—আর্য্যের একটা প্রহসন! একটি জ্যেষ্ঠতাত বালক যে-রকমের জ্যেষ্ঠতাত—এ আর্য্যটি ঠিক্ সেই রকমের আর্য্য। জ্যেষ্ঠতাত বালকের জ্যেটামি যেমন একটা রোগ, এ আর্য্যের আর্য্যামি তেমনি একটা রোগ। অতঃপর গুরুর বৈজ্ঞানিক আর্য্য এবং শিষ্যের সঙ্-সাজা আর্য্য উভয়কে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া কাহার কিরূপ ভাবগতি তাহা একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যা'ক্।

মহর্ষি ব্যাসের প্রণীত স্মৃতির অভ্যন্তরে সুন্দর একটি বচন আছে,—সেটি এই;— "নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতা চ" "ব্রাহ্মণের এমন বিত্ত আর নাই যেমন একতা সমতা এবং সত্যতা"• এই ঋষিবাক্যটির নিক্তির ওজনে গুরু এবং শিষ্য দোঁহার দুইরূপ বিভিন্ন আর্য্যকে তৌল করিয়া দেখিলেই কাহার কি রূপ মূল্য তাহা তদ্দণ্ডেই ধরা পড়িবে।

ব্যাস-ঋষি বলেন যে, একতা ব্রাহ্মণের একটি প্রধান পরিচায়ক লক্ষণ;—গোস্বামীর বৈজ্ঞানিক আর্য্যের একতা এমনি জগদ্ব্যাপী যে, তাহা ইংরাজ বাঙ্গালী ফরাসীস প্রভৃতি নানা দেশের নানা আর্য্য-জাতিকে সাজাত্য-পাশে বন্ধন করিয়া ফেলিয়াছে। পক্ষান্তরে তাঁহার বঙ্গীয় শিষ্যদিগের আর্য্য একতা'র এমনি বিরোধী যে, যদিও তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্য এক্ষণে ক্ষত্রিয়-শূন্য এবং বৈশ্য-শূন্য সুতরাং হাত পা খোঁড়া, আর, ব্রাহ্মণ-জাতি সে আর্য্যের মস্তক হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান-বিহনে তাহা মস্তিষ্ক বিহীন, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও তাঁহারা গায়ের জোরে বলিতে ছাড়েন না যে, সেই হাত-পা-খোঁড়া মস্তিষ্ক-বিহীন ভারতবর্ষীয় আর্য্য-সন্তানেরাই প্রকৃত পক্ষে আর্য্য, আর, ইউরোপের হস্ত-পদ-বিশিষ্ট, মস্তিষ্ক-ভূয়িষ্ঠ, জ্ঞানবান্ এবং তেজীয়ান আর্য্যেরা আর্য্যই নহে—তাহারা সকলেই ম্লেচ্ছ নরাধম!

ব্যাস-ঋষি বলেন "সমতা ব্রাহ্মণের আর একটি প্রধান পরিচয়-লক্ষণ";—বৈজ্ঞানিক আর্য্যের এমনি উদার সমতা-গুণ যে, তাহা ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যস্থিত জাতিগত উচ্চ-নীচ ভাব একেবারেই কোপাইয়া সমভূম করিয়া দিয়াছে; পক্ষান্তরে, গোস্বামীর শিষ্যদিগের সঙ্ আর্য্য আত্ম-গরিমায় ভোঁ হইয়া আপানার বেলায় তিলকে তাল দেখেন এবং অন্যের বেলায় তালকে তিল দেখেন। এটা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না যে, পৃথিবীস্থ সমস্ত আর্য্য-জাতির ভাল মন্দ স্বভাব-চরিত্র হরে দরে সমান—তাই কতক গুলা ছেলে-ভুলানিয়া অমূলক যুক্তি দ্বারা সকল লোককেই তাঁহারা এই নিগূঢ় তত্বটি বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরাই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এবং ইউরোপীয় আর্য্যেরা শকুনি-মাতুলের প্রপিতামহ! অর্থাৎ যেন পূর্ব্বতন কালে আমাদের দেশে শকুনি ছিলেন না—দ্যূতক্রীড়া ছিল না—ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ছিল না—রমণীহরণ ছিল না—দ্বেষ হিংসা মদ মাৎসর্য্য এসব কোনো বালাইই ছিল না—প্রত্যুত সকলেই ঋষ্যশৃঙ্গের

ন্যায় ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া বনে বনে তপস্যা করিয়া বেড়াইতেন! তাহার পরে কালিদাসের সময়ে যেন ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা মদ্য-পান বেশ্যাশক্তি অভিসার এ সকল কিছুই জানিতেন না—সকলেই জিতেন্দ্রিয় যোগী পুরুষ ছিলেন! তাহার আরো কিছু দিন পরে যেন চানক্য ছিলেন না—নরহত্যা ছিল না! রঘুনন্দনের ন্যায় দিগ্বিজয়ী স্মার্ত্তবাগীশেরা মূল-গ্রন্থ-সকলের শব্দ এবং অর্থ অবলীলাক্রমে উল্টাইয়া দিয়া (এমন কি ব-য়ের পেট কাটিয়া তাহাকে র করিয়া গড়িয়া তুলিয়া) যেন হয়কে নয় করিতেও জানিতেন না, নয়কে হয় করিতেও জানিতেন না—প্রবঞ্চনা প্রতারণা কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না! ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা সকলেই যুধিষ্ঠির, সকলেই রামচন্দ্র! আর, ইউরোপীয় আর্য্যেরা সকলেই চানক্য, সকলেই শকুনি! কি চমৎকার সমতা!

ব্যাস-ঋষি বলেন যে, সত্যতা ব্রাহ্মণের তৃতীয় আর-একটি পরিচয়-লক্ষণ;—গোস্বামীর আর্য্যের সত্যতা সূর্য্যালোকের ন্যায় দেদীপ্যমান! সে সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যাবতীয় আর্য্য ভাষার অস্থিতে অস্থিতে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে রোমে রোমে অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে গোস্বামীর শিষ্যদিগের যত কিছু সত্যতা সকলই মুখের ফুঁ, হাতের ফক্কা! তাঁহারা বলিবার সময় বলেন "গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি—গঙ্গা হইতে শত যোজন দূরে থাকিয়াও যিনি গঙ্গা গঙ্গা বলেন তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন" অথচ প্রায়শ্চিত্ত বিধানের সময়—যিনি প্রত্যহ গঙ্গা স্নান করেন তাঁহারও যে-পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন আর যিনি কোনো জন্মেই গঙ্গার ত্রিসীমা মাড়া'ন না তাঁহারও সেই পাপের সেই প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন; "গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ" এ বচনটির প্রতি এতই যদি তাঁহাদের অটল শ্রদ্ধাভক্তি তবে বিলাত-ফের্তা বঙ্গীয় যুবকদিগের প্রতি গোবর খাইবার বিধান না দিয়া গঙ্গাস্নানের বিধান দিলেই তো হইতে পারে—তাহা তাঁহারা না দে'ন কেন? তবেই হইতেছে যে, তাঁহাদের শাস্ত্রের বিধানে নিষ্পাপ ব্যক্তিরই পাপ ধৌত হইয়া যায়, পাপী ব্যক্তির কোনো পাপই স্বস্থান হইতে তিল মাত্রও বিচলিত হয় না! তাঁহাদের ঔষধ-সেবনে নীরোগ ব্যক্তিই আরোগ্য লাভ করে—রোগী ব্যক্তি যেমন আছে তেমনিই থাকে! কি চমৎকার সত্যতা!

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, গোস্বামীর বৈজ্ঞানিক আর্য্য যেমন একতা সমতা এবং সত্যতার একটি জলন্ত আদর্শ, তাঁহার বঙ্গীয় শিষ্যদিগের সঙ্‌ আর্য্য তেমনি অনৈক্য বৈষম্য এবং অসত্যতার একটি অদ্বিতীয় আদর্শ। গোস্বামী তাঁহার আপনার মতো কার্য্য করিতেছেন—মহতের মতো কার্য্য করিতেছেন—পৃথিবীস্থ বিভিন্ন আর্য্য-জাতির অন্তর্নিহিত ভ্রাতৃবিচ্ছেদের মূলে কুঠার আঘাত করিয়া সকলের মধ্যস্থলে একতা সমতা এবং সত্যতার জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন;

তাহার বঙ্গীয় শিষ্যেরাও তাঁহাদের আপনাদের মতো কার্য্য করিতেছেন—ইতরের মতো কার্য্য করিতেছেন—অনৈক্য বৈষম্য এবং কপট ব্যবহারের জিলিপির পাক ক্রমাগতই অধিকাধিক পেঁচাও করিয়া পাকাইয়া তুলিতেছেন—ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের অনন্ত হুতাশনে ক্রমাগতই অধিকাধিক আহুতি প্রদান করিতেছেন;—এখন কে আর্য, কে অনার্য্য, শ্রোতৃ-মহোদয়েরা তাহা মনে মনে মিস্তকে ঠাহরিয়া দেখুন্। এই পুরাতন ঋষি-বাক্যটি যদি সত্য হয় যে, "নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতা চ" ব্রাহ্মণের এমত বিত্ত আর নাই যেমন একতা সমতা এবং সত্যতা, তবে অগত্যা এইরূপ স্বীকার করিতে হয় যে, গোস্বামীর আর্য্যই প্রকৃষ্ট রূপে ব্রাহ্মণ-লক্ষণাক্রান্ত এবং তাঁহার বঙ্গীয় শিষ্যদিগের আর্য্য চণ্ডালেরও অধম লক্ষণাক্রান্ত। অতঃপর অনুসন্ধান করা যাইতেছে—প্রথমতঃ আর্য্যামি রোগটা কি? দ্বিতীয়তঃ সে রোগের গোড়ার সূত্রটা কি? তৃতীয়তঃ সে রোগের চিকিৎসা-প্রণালী কি রূপ?

প্রথম, আর্য্যামি রোগটা কি? রোগটা আর কিছু না—বাতুলের প্রলাপ! আর্য্যামি করা স্বতন্ত্র এবং আর্য্যোচিত কার্য্য করা স্বতন্ত্র! যাঁহারা পৃথিবীতে একতা সমতা এবং সত্যতার জ্যোতি বিকীর্ণ করেন তাঁহারাই আর্য্যোচিত কার্য্য করেন। পৃথিবী-মাতার মুখ উজ্জ্বলকারী বঙ্গের শিরোভূষণ রামমোহন রায় আর্য্যোচিত কার্য্য করিয়াছেন; কঠোর অধ্যবসায়ী পরহিত পরায়ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরজীবন আর্য্যোচিত কার্য্য করিয়াছেন এবং অদ্যাপি আর্য্যোচিত কার্য্য করিতেছেন; অকূল পুরাতত্ত্ব সাগরের অদ্বিতীয় রত্ন-ধীবর ম্যাক্স মূলার আর্য্যোচিত কার্য্য করিতেছেন; ইহাঁরই নাম আর্য্যোচিত কার্য্য; আর, যাঁহারা না পড়িয়া পণ্ডিত—না কিছু করিয়া বেরাজিস কর্ম্মা, যাঁহারা হাসির জায়গায় কাঁদেন কান্নার জায়গায় হাসেন এমনি যাঁহাদের কবিত্ব-রসবোধ, তাঁহারা যখন বুক ফুলাইয়া বলেন "আমরাই আর্য্য—ইংরাজ ফরাসীস্ জর্ম্মান প্রভৃতি আর আর-সভ্য সভ্য জাতি ম্লেচ্ছ নরাধম; আমাদের পুষ্পক বিমান ছিল—ইউরোপের রেল্‌গাড়িই সার; আমাদের অগ্নি অস্ত্র বরুণ অস্ত্র ছিল—ইউরোপের কামান বন্দুকই সার; আমাদের স্বর্গমর্ত্য-রসাতল-ভেদী ধ্যান-বার্ত্তাবহ ছিল—ইউরোপের তাড়িত বার্ত্তাবহই সার;" এই যে সব শূন্যগর্ভ আস্ফালন এবং গগনভেদী স্পর্দ্ধাবাণী (ইতর ভাষায় যাহাকে বলে ছোটো মুখে বড় কথা) ইহারই নাম আর্য্যামি!

দ্বিতীয়, আর্য্যামি রোগের গোড়া'র সূত্রটা কি? গোড়া'র সূত্রটা আর কিছু না—ইংরাজদিগের "ওঠ্ বোস্" মন্ত্র! ইংরাজেরা যখন আমাদিগকে "বোস্" বলিয়াছিল তখন আমরা এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া তদণ্ডেই বসিয়া পড়িয়াছিলাম; ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী আমাদিগকে মুখ রাঙাইয়া বলিলেন "তোমরা আফ্রিকাবাসী কালো নিগর" আর অমনি আমরা করযোড়ে বলিলাম "আমরা দীন হীন অধম কাজী, আমাদের কোনো সঙ্গতি নাই, তোমরাই আমাদের মাবাপ, তোমরাই আমাদের সর্ব্বস্ব!"

ইংরাজেরা "বোস্" বলিতেই যেমন আমরা বসিয়া পড়িয়াছিলাম—"ওঠ্" বলিতেই তেমনি আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ইংরাজি টোলের অধ্যাপকেরা আদর করিয়া আমাদিগকে বলিলেন "তোমরা আর্য্য!" আর আমাদের আর্য্যতেজ দেখে কে? তদ্দণ্ডেই আমরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া বুক ফুলাইয়া সিংহনাদে বলিয়া উঠিলাম "তোমরা ম্লেচ্ছ—আমরা আর্য্য! তোমাদের আছে কি—আমাদের নাই কি? তোমাদের সম্বল বিজ্ঞানের গোটাকত পুঁথি বই তো আর নয়—আমাদের বেদ আছে, পুরাণ আছে, স্মৃতি আছে, তন্ত্র আছে, মন্ত্র আছে—নাই কি? আমাদের জাতির সঙ্গে কি তোমাদের জাতির ঘুণাক্ষরেও তুলনা হইতে পারে!" কি আশ্চর্য্য! ওঠ্ মন্ত্রের চোটে এক নিমেষের মধ্যেই আমাদের বুলি ফিরিয়া গিয়া—পূর্ব্বে যেমন আমরা নেঙ্ঠে ইঁদুর হইয়া তলে শুঁড়ি মারিয়াছিলাম, এক্ষণে তেমনি আমরা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র হইয়া গর্জ্জন করিতে সুরু করিলাম! ঈশ্বর করুন্ যেন এ-হেন সুখ স্বপ্ন হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই "পুনর্মূষিকো ভব" শুনিয়া হঠাৎ আমাদের চক্ষুস্থির না হয়!

আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বঙ্গীয় নব্য আর্য্যেরা গোস্বামীর নিকট হইতে আর্য্য-মন্ত্রটি চুপি চুপি আদায় করিয়াছেন ইহা দেশ-শুদ্ধ সকল লোকেই জানে, অথচ সে বৃত্তান্তটি চাপিয়া রাখিয়া তাঁহারা তাঁহাদের দীক্ষা-গুরুকে ভাবে-গতিকে নূতন একপ্রকার গুরু দক্ষিণা প্রদান করিলেন—সে গুরু-দক্ষিণা রজতের পূর্ণচন্দ্র নহে—তাহা হস্তের অর্দ্ধচন্দ্র! অর্থাৎ তাঁহারা এইরূপ ভাণ করিলেন—যেন জাতিবাচক আর্য্য-শব্দের আবিষ্কর্ত্তাও তাঁহারা, আর, আর্য্যও তাঁহারা; তা বই—ম্যাক্স মূলার যেন কেহই নহে—জাতিবাচক আর্য্যশব্দের আবিষ্কর্ত্তাও তিনি নহেন, আর্য্যও তিনি নহেন; প্রত্যুত তিনি ম্লেচ্ছ নরাধম!* ইহারই নাম "তোমার শীল তোমার নোড়া ভাঙ্ব তোমার দাঁতের গোড়া!" আর কিছু না—একটি দুগ্ধ-পোষ্য শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার হস্তে একখানি শাণিত ছুরি প্রদান করিলে প্রদাতা এবং গৃহীতা উভয়েরই তাহাতে বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা; প্রদাতার শক্ত হাড়ে শিশুর হস্তের ছুরির এক আধ আঁচড়ে বেশী কি আর হইবে—তাহা মহিষ-শৃঙ্গে মশক-দংশন বই আর কিছুই নহে! কিন্তু দুগ্ধ-পোষ্য বালকের কচি হাড়ে তাহা একটা-না-একটা কাণ্ড না বাধাইয়া সহজে ছাড়ে না। মূষিক যদি সিংহকে গোখাদক ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করে, তবে সিংহের তাহাতে কিছুই হয় না—তাহার লাঙ্গুলের একগাছি লোমও বিচলিত হয় না; কিন্তু তাহাতে ক্ষান্ত না থাকিয়া মূষিকের পো যদি আপনাকে সিংহ অপেক্ষাও বড় মনে করিয়া বিড়ালকে তাড়া করে, তবে তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়; তাহাই এক্ষণে ঘটিয়াছে! বঙ্গীয় নব্য আর্য্যেরা ম্যাক্স মূলার প্রভৃতি আচার্য্যগণকে ম্লেচ্ছই বলুন আর বর্ব্বরই বলুন তাহাতে সেই সকল প্রবীন সমরাগ্নি-পরীক্ষিত মহারথীগণের কিছুই আসিবে না যাইবে না; কিন্তু তাহাতেই ক্ষান্ত না থাকিয়া—একা বীর ডন্ কুইক্সোট যেমন বুদ্ধি-

নাণ্টিতে আরোহণ করিয়া—অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া—প্রিয়তমা ডল্‌সিনিয়ার অমোঘ প্রসাদ-বলে বলী হইয়া—পৃথিবী উন্টাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও যে তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা উন্টাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে—কেহ বা টিকি রাখিয়া, কেহ বা ফোঁটা কাটিয়া, কেহ বা গেরুয়া পরিয়া, কেহ বা পৈতার গোচ্ছা দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত করিয়া, এক এক জন এক এক মহামহোপাধ্যায় আর্য্য হইয়া আসরে নাবিয়া তাল ঠুকিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতেছেন—এটা তাঁহারা ভাল করিতেছেন না! তাঁহাদের কি স্মরণ নাই যে, লা-মাঞ্চা নগরের বীরকেশরী ডন্‌কুইক্‌সোট্ যত-বার কোমর বাঁধিয়া পৃথিবী উন্টাইয়া দিতে গিয়াছেন, ততবার উন্টাইয়া পড়িবার মধ্যে তিনিই অশ্ব হইতে উন্টাইয়া পড়িয়াছেন—তা বই পৃথিবী এক তিলও উন্টায় নাই! এইরূপ করিয়া যখন তাঁহার সমুদয় দন্তগুলি একে একে অন্তর্ধান করিল তখন তিনি দর্পণে আপনার ভগ্নদন্ত চপেটিত-কপোল মুখখানি নিরীক্ষণ করিয়া আপনিই আপনার নাম দিলেন "বিষণ্ণ মুখাকৃতি বীর" knight Of the sorrowful figure!" রোগ তো আর গাছে ফলে না! এই উন্নত শতাব্দীর পরিস্ফুট দিবালোকে মান্ধাতার আমলের অপরিস্ফুট বিধান-সকল প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়ানো—হাতের লেখা পুঁথি ছাড়া গ্রন্থ পাঠ না করা—গেরুয়া বস্ত্র ছাড়া বস্ত্র পরিধান না করা—খড়ম ছাড়া পাদুকা পরিধান না করা—শুদ্ধ কেবল পুরাণের রূপক এবং হেঁয়ালি ভাঙিয়া সেই উপকরণের সাহায্যে বিজ্ঞানের মহোচ্চ শিখর-পর্য্যন্ত একটা প্রশস্ত রাজমার্গ চালাইয়া দিয়া স্বর্গের সোপান নির্ম্মাণ করিতে যাওয়া—এইরূপ যাহার অশেষ বিশেষ উপসর্গ—তাহা যদি না রোগ হয় তবে রোগ যে আর কাহাকে বলে তাহা জানি না!

তৃতীয়, রোগের চিকিৎসা। আর্য্যামি রোগের চিকিৎসা সাম্যপন্থী [illegible] হইলেই ভাল হয়; সে মতের মূল মন্ত্র এই যে "সমে সাম্যং প্রযোজয়েৎ"—সমানে সমান প্রয়োগ করিবেক। এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, "কে বলে আর্য্যামি একটা রোগ বরং তাহা একটা গুরুতর রোগের মহৌষধ—তাহা সাহেবিআনা রোগের মহৌষধ!" বটে—কিন্তু সে কিরূপ ঔষধ? সে ঔষধ নিজেই একটা সংক্রামক এবং মারাত্মক মহাব্যাধি!—তাহার বাতাসে জ্ঞানের দুই চক্ষু অন্ধ হইয়া যায় এবং কর্ম্মের হস্তপদ অসাড় হইয়া যায়! তবে আর তাহা সাহেবিআনাকে দমন করিবে কি প্রকারে? বরং আরো তাহা সাহেবিআনাকে খোঁচা দিয়া উস্কাইয়া তোলে। সাহেবিআনার ঔষধ স্বতন্ত্র;—ইংরাজদিগের বাহ্য আকার প্রকার ভাব-ভঙ্গীর অনুকরণই সাহেবিআনা, আর, ইংরাজদিগের বিজ্ঞান, শিল্প, কার্য্য-নৈপুণ্য, কর্ম্মিষ্ঠতা, কর্তব্য-নিষ্ঠা, তেজস্বিতা, এই গুলির নাম উনবিংশ-শতাব্দীর সভ্যতা; এই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাই সাহেবিআনা-রোগের মহৌষধ; তা ভিন্ন আর্য্যামিও সাহেবিআনা রোগের

ঔষধ নহে, সাহেবি আনাও আর্য্যামি-রোগের ঔষধ নহে; আর্য্যামি-রোগের ঔষধ তবে কি? না "সমে সাম্যং প্রয়োজয়েৎ"—আর্য্যোচিত কার্য্যই আর্য্যামি-রোগের একমাত্র ঔষধ।

কেহ মনে করিবেন না যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা আকাশ হইতে পড়িয়াই আর্য্য হইয়াছিলেন; তবে কি? না পৃথিবীস্থ সমস্ত আর্য্যজাতি যেরূপ করিয়া আর্য্য হইয়াছে তাঁহারাও সেইরূপ করিয়া আর্য্য হইয়াছিলেন; দুই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা আর্য্য-পদবীতে সমুত্থান করিয়াছিলেন—কি দুই নিয়ম? না বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা যাহাকে বলেন সন্ততির নিয়ম Law of heredity এবং সঙ্গতির নিয়ম Law of adaptation। সন্ততি বা সন্তান শব্দের অর্থ সং তান—তান কি না ধারাবাহিক প্রবাহ, একটানা প্রবাহ; জীব-জন্তু সকলের আনুপূর্ব্বিক একটানা প্রবাহ যে-একটি সার্ব্বভৌমিক মৌলিক নিয়মে নিয়মিত হয়, তাহারই নাম সন্ততির নিয়ম; সে নিয়ম এই যে, সন্তান-সন্ততিরা কোনো-না-কোনো অংশে পিতৃপুরুষদিগের অনুধর্ম্মী হইতে চায়ই চায়; এ নিয়মের মূল মন্ত্র এই যে, বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া। সঙ্গতির নিয়ম কি? না চতুর্দ্দিকের অবস্থার সহিত সঙ্গত-মাফিক চলিতে না পারিলে কোনো জীবই পৃথিবীতে টেঁকিয়া থাকিতে পারে না—ইহাই সঙ্গতির নিয়ম। চারিদিকের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সহিত সঙ্গত-মাফিক চলিতে গেলেই জীবের পৈতৃক গুণ-সকল অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে থাকে। এই জন্য সঙ্গতির নিয়মকে পরিবর্ত্তনের নিয়ম বা গতির নিয়ম বা উন্নতির নিয়ম বলিলে তাহার ভাবার্থের কোনো প্রকার ব্যতিক্রম হয় না। সঙ্গতির নিয়মকে সংক্ষেপে আমরা বলিব পারিবর্ত্তিক নিয়ম, এবং সন্ততির নিয়মকে সংক্ষেপে আমরা বলিব কৌলিক নিয়ম। কৌলিক নিয়মের মূল-মন্ত্র হ'চ্চে "যেমন পিতা মাতা তেমনি সন্তান-সন্ততি;" পারিবর্ত্তিক নিয়মের মূল-মন্ত্র হ'চ্চে "যেমন অবস্থা তাহার তেমনি ব্যবস্থা;" এক্ষণে ইহা বলা বাহুল্য যে কৌলিক নিয়মানুসারে জন-সমাজের স্থিতি নিয়মিত হয়, এবং পারিবর্ত্তিক নিয়মানুসারে জন-সমাজের গতি এবং উৎপত্তি নিয়মিত হয়।

বঙ্গীয় নব্য আর্য্যেরা কেবল কৌলিক নিয়মই জানেন—মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা এইটিই জানেন; তা বই এটা জানেন না যে, মহাজন যিনি—তিনি মহাজনই হইতেন না যদি পারিবর্ত্তিক নিয়মানুসারে তিনি তাঁহার নিজের সময়ের নূতন অবস্থার উপযোগী নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না করিতেন। দুই হাত নহিলে তালি বাজে না; এই জন্য জীব-রাজ্যে স্থিতির নিয়ম এবং গতির নিয়ম দুইই সমান আবশ্যক। কৌলিক নিয়মটিই স্থিতির নিয়ম, আর, স্থিতির নিয়ম বলিয়াই—কি পশুর মধ্যে—কি বর্ব্বর জাতির মধ্যে—কি আর্য্যজাতির মধ্যে—সর্ব্বত্রই তাহা সমান-ভাবে কার্য্য করে; পায়রা'র বাচ্ছা পায়রা হয়, কাকের বাচ্ছা কাক হয়, কাফ্রীর পুত্র কাফ্রী হয়, বাঙ্গা-

লির পুত্র বাঙ্গালি হয়, ইংরাজের পুত্র ইংরাজ হয়; জাতির ইতর-বিশেষে কৌলিক নিয়মের কার্য্যকারিতার ইতর-বিশেষ হয় না—কৌলিক নিয়ম সর্ব্বত্রই সমান-ভাবে কার্য্য করে; পক্ষান্তরে, পারিবর্ত্তিক নিয়মটি গতির নিয়ম—তাই তাহা গতিশীল, আর, গতিশীল বলিয়া ই—তাহা সকল জাতির মধ্যে সমান-ভাবে কার্য্য করে না, প্রত্যুত যে যেমন জাতি তাহার অভ্যন্তরে তেমনি-ভাবে কার্য্য করে; জাগ্রত জাতির মধ্যে জাগ্রত ভাবে কার্য্য করে, প্রসুপ্ত জাতির মধ্যে প্রসুপ্ত ভাবে কার্য্য করে। ফলেও তাই দেখা যায় যে "যেমন অবস্থা তাহার তেমনি ব্যবস্থা" এ নিয়মটি মনুষ্যের মধ্যে যেমন চক্ষুষ্মান্-ভাবে কার্য্য করে—পশুদিগের মধ্যে তাহার সিকির সিকিও সে ভাবে কার্য্য করিতে পারে না। গ্রীষ্মদেশের হস্তী শীতদেশে সহস্র বৎসর ধরিয়া পুরুষানুক্রমে "নৈসর্গিক দম্পতি নির্ব্বাচন" (Natural selection) এবং "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন" (Survival of the fittest) এই দুই জৈবিক নিয়মে পরিগঠিত হইতে থাকিলেও তাহার পৃষ্ঠ দেশে ঘন-লোমরাজি আবির্ভূত হয় কি না সন্দেহ; কিন্তু এক জন বাঙ্গালী ইংলণ্ডে যাইতে না যাইতেই তাঁহার পৃষ্ঠ দেশ হইতে ফিন্‌ফিনে উড়ানী ঝরিয়া পড়িয়া চারি আঙ্গুল পুরু শীত বস্ত্র তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, যেমন অবস্থা তাহার তেমনি ব্যবস্থা এ নিয়মটি পশু অপেক্ষা মনুষ্যের মধ্যে বেশী প্রবল; তেমনি তাহা বর্ব্বর-জাতি অপেক্ষা সভ্য-জাতির মধ্যে বেশী প্রবল। সুয়েজের নৈসর্গিক সেতুবন্ধ জাহাজের পথ-রোধ করে বলিয়া সেই অপরাধে সেই শত যোজন-ব্যাপী বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে রসাতলে পাঠাইয়া দেওয়া যে-সে জাতির কর্ম্ম নহে। কৌলিক নিয়ম এবং পারিবর্ত্তিক নিয়ম উভয়ে যদিচ পরস্পরের প্রতিযোগী, কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, উভয়ে পরস্পরের বিরোধী; বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক্—পতি-পত্নীর ন্যায় দুইহে দুইয়ের প্রাণ-পরিপোষক। পারিবর্ত্তিক নিয়মানুসারে বাঙ্গালিরা পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই ইংরাজদিগের সহিত সম্ভব-মতো বিদ্যাবুদ্ধিতে টক্কর দিতে পারিতেছেন ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে কৌলিক নিয়ম রীতিমত কার্য্য করিতেছে—প্রমাণ হইতেছে যে, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষেই আর্য্য-সন্তান। নচেৎ বাঙ্গালিরা যদি কৌলিক নিয়মের গোঁড়া পক্ষপাতী হইয়া পারিবর্ত্তিক নিয়মকে ঘরে ঢুকিতে না দিতেন, তবে তাহাতে প্রমাণ হইত যে, তাঁহারা আর্য্য সন্তান হইয়াও কাফ্রীদিগের ন্যায় অসভ্য বর্ব্বর। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কৌলিক নিয়মের অনুচিত পক্ষপাতী হইলে কৌলিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়; যে ডালে উপবেশন করা হইতেছে সেই ডালের মূলোচ্ছেদ করা হয়। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, গের্দা ঠেসান্ দিয়া পায়ের উপরে পা দিয়া বসিয়া থাকিয়া এবং শুধু পূর্ব্ব পুরুষদিগের নামের দোহাই দিয়া কোন আর্য্যজাতিই আর্য্য হ'ন নাই, প্রত্যুত ভিতরের এবং বাহিরের প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়াই

আর্য্যেরা আর্য্য-পদবীতে সমুত্থান করিয়াছেন। দুই অস্ত্রে মনুষ্য প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করে—বিজ্ঞান-অস্ত্রে এবং ধর্ম্ম অস্ত্রে; বিজ্ঞান-অস্ত্রে ভৌতিক প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে স্বীয় বশে আনয়ন করে, এবং ধর্ম্ম-অস্ত্রে মানসিক প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে স্বীয় বশে আনয়ন করে। আমাদের দেশের পূর্ব্বতন আর্য্যেরা উভয় অস্ত্রেই প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে জয়-লাভ করিয়া আর্য্য-পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন; নচেৎ "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এই ঘুম পড়ানী মাসিপিসি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, শুদ্ধ কেবল কৌলিক নিয়মের লাঙ্গুল ধরিয়া চলিয়া, এযাবৎকাল পর্য্যন্ত কোনো আর্য্যজাতিকেই আর্য্য হইতে দেখা যায় নাই। কেহ যদি সত্য সত্যই মনে করেন যে, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা শুদ্ধ কেবল এক হাতে তালি বাজাইতেন, শুধু কেবল কৌলিক নিয়মেই চলিতেন—পারিবর্ত্তিক নিয়মকে ঘরের চৌকাট মাড়াইতে দিতেন না, তবে তাঁহাদের সে ভ্রমটি ঘুচাইয়া দিবার জন্য দুইটি উদাহরণ পরে পরে প্রদর্শন করিতেছি।

প্রথম উদাহরণ। এ উদাহরণ দৃষ্টে প্রমাণ হইবে যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বিজ্ঞান-অস্ত্রে কুসংস্কারের সহিত রীতিমত সংগ্রাম করিতেন। বহু পূর্ব্বে যে সময়ে আপামর সাধারণ সকল লোকেরই এইরূপ ধ্রুব-জ্ঞান ছিল যে, পৃথিবী সমতল, এবং তাহার পোষকতায় পুরাণের এটা একটা অকাট্য সিদ্ধান্ত ছিল যে, পৃথিবী ত্রিকোণ, সেই সময়ে জ্যোতির্ব্বিৎ ভাস্করাচার্য্য ঐ প্রচলিত লৌকিক এবং পৌরাণিক মতের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে বলিলেন যে,

"সর্ব্বত্রৈব মহীগোলে স্বস্থানমুপরিস্থিতং
মন্যন্তে খে যতো গোল স্তস্যক্বোর্দ্ধং কচাপ্যধঃ॥"

ভূমণ্ডলে সর্ব্বত্রই-লোকে স্বস্থানকে উপরিস্থিত মনে করে, যেহেতু পৃথিবী গোল, তাহার ঊর্দ্ধই বা কি আর অধোই বা কি? (এখানে "কু" শব্দের অর্থ পৃথিবী)

পুনশ্চ

"যো যত্র তিষ্ঠত্যবনীংতলস্থাং
আত্মানমস্যা উপরিস্থিতং চ
স মন্যতেঽতঃ কুচতুর্থ সংস্থা
মিথশ্চতে তির্য্যগিবা মনন্তি।
অধঃশিরস্কাঃ কুদলান্তরস্থা *

* "কুদলান্তরস্থা"—কু শব্দে পৃথিবী; পৃথিবীর দলান্তরস্থ" অর্থাৎ ছোলার যেমন দুইটি দল আছে, তেমনি ভূগোলকে দুইটি দলে বিভক্ত মনে করা যাইতে পারে—একটি দল তাহার উপরিস্থিত অর্দ্ধ খণ্ড, আর একটি দল তাহার নিম্নস্থিত অর্দ্ধ খণ্ড; নিম্নস্থিত অর্দ্ধ খণ্ডের ভূপৃষ্ঠে যাহারা বাস করে তাহারাই "কুদলান্তরস্থ"।

ছায়া মনুষ্যা ইব নীর তীরে
অনাকুলা স্তির্য্যগধঃস্থিতাশ্চ
তিষ্ঠন্তি তে তত্র বয়ং যথাত্র ॥”

“যিনি যেস্থানে থাকেন, তিনি পৃথিবীকে তলস্থ এবং আপনাকে তাহার উপরিস্থ মনে করেন; যাঁহারা পরস্পর হইতে পৃথিবীর চতুর্থাংশ দূরে অবস্থান করেন, তাঁহারা পরস্পরকে ত্যাড়্‌চা ভাবে (অর্থাৎ কাত হইয়া পড়া ভাবে) অবস্থিত বলিয়া মনে করেন। পৃথিবীর উল্টা পিটে জলাশয়ের তীরস্থ ব্যক্তির জল-বিম্বস্ত প্রতিবিম্বের ন্যায় মনুষ্যেরা অধোমস্তক, কিন্তু আমরা যেরূপ ভাবে এখানে অবস্থিতি করিতেছি, উপরি-উক্ত অধঃস্থিত এবং তির্য্যক্-স্থিত ব্যক্তিরা ঠিক্ সেইরূপ অনাকুল ভাবে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিতি করিতেছে।” ভাস্করাচার্য্যের স্বহস্ত-রচিত এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া শ্রোতৃবর্গের কিরূপ মনে হয়? এইরূপ কি মনে হয় যে, তিনি লৌকিক এবং পৌরাণিক মত শিরোধার্য্য করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন—না উল্টা আরো এইরূপ মনে হয় যে, তিনি প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন? পৃথিবীশুদ্ধ লোক যেখানে একবাক্যে বলিতেছে যে, পৃথিবী ত্রিকোণ, সেখানে তিনি একাকী শুদ্ধ কেবল বৈজ্ঞানিক প্রমাণের বলে—কেহ যাহা চক্ষে দেখে নাই কর্ণে শোনে নাই এইরূপ একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত টানিয়া আনিয়া দাঁড় করাইলেন; অসংকুচিত চিত্তে অম্লানবদনে বলিলেন যে, “পৃথিবী গোল”—ইহা কি যে-সে লোকের কাজ? ইহারই নাম আর্য্যোচিত কার্য্য। এইরূপ আর্য্যোচিত কার্য্যের পরিবর্ত্তে তিনি যদি আর্য্যামি করিতেন, তিনি যদি বলিতেন “মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা” পূর্ব্ব পুরুষেরা যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঠিক্—পুরাণ যাহা বলিয়াছে তাহাই ঠিক্—সকলে যাহা একবাক্যে বলে তাহাই ঠিক্—পৃথিবী ত্রিকোণ হইাই ঠিক্, —আমাদের দেশের পুরাতন জ্যোতিষের আর্য্যতাই বা কোথায় থাকিত, প্রামাণিকতাই বা কোথায় থাকিত? তাহা হইলে আজিকের এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে সে জ্যোতিষকে কে-ই বা পুছিত আর কেই বা তাহাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনিত?

দ্বিতীয় উদাহরণ। এ উদাহরণ দৃষ্টে প্রমাণ হইবে যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ধর্ম্ম অস্ত্রে লোকাচারের অনুমোদিত কুরীতির সহিত সংগ্রাম করিতেন। অতীব পুরাকালে—বেণ রাজার আমলে—আমাদের দেশে রাক্ষস বিবাহ প্রভৃতি কতকগুলা অসভ্য বিবাহ-পদ্ধতি লোক-সমাজে প্রচলিত ছিল। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা সেই সকল পুরাতন প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া—উঠিয়া-পড়িয়া-লাগিয়া সেগুলিকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া—তাহার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মবিবাহের সুসভ্য পদ্ধতি জনসমাজে চালাইয়া ছিলেন; ইহারই নাম আর্য্যোচিত কার্য্য; তাহা না করিয়া তাঁহারা যদি আর্য্যামি করিতেন—লোকাচারের জোয়ালে ঘাড় পাতিয়া দিয়া বলিতেন “মহা-

জনো যেন গতঃ স পন্থা” আর্য্য পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহাই ঠিক—রাক্ষস বিবাহই ঠিক্” তবে আজিকের এই হিন্দু-সমাজের আর্যত্বই বা কোথায় থাকিত—ভদ্রত্বই বা কোথায় থাকিত! এই দুই দৃষ্টান্তই যথেষ্ট; ইহাতেই এক আঁচড়ে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা লৌকিক কুসংস্কার এবং কুরীতির বিরুদ্ধে বিজ্ঞান-অস্ত্রে এবং ধর্ম্ম-অস্ত্রে সংগ্রাম করিয়া—সত্য এবং মঙ্গলের জয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া—নিক্তির ওজনে উচিত মূল্য প্রদান করিয়া—আর্য্যকীর্ত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু নব্য আর্য্যেরা কি করিয়াছেন? তাঁহারা কি লৌকিক অথবা পৌরাণিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটিও বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন? দেশের কোনো প্রকার লোক-প্রচলিত কুরীতির বিরুদ্ধে আলস্য-শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া একটিবারও উঠিয়া দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছেন? তাহা দূরে থাকুক—আদুরে ছেলেরা যেমন অষ্টপ্রহর বার স্তার নিকট হইতে আদর ভিক্ষা করে, তাঁহারা তেমনি ভদ্রাভদ্র সকল-প্রকার প্রচলিত লোকাচারের স্বপক্ষে অলীক বাচালতা করিয়া ভদ্রাভদ্র সকল-শ্রেণীস্থ বঙ্গজনেরই আদর ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন এবং সেই ভিক্ষার ধনে আপনাদের আর্য্য-গরিমার ভাণ্ডার দিন দিন স্ফীত করিয়া তুলিতেছেন! এইরূপে যাঁহারা সিকি পয়সা দিয়া লাখ টাকা মূল্যের আর্য্যকীর্ত্তি ক্রয় করেন, তাঁহাদিগকে আমরা শুধু এই কথাটি বলিয়াই এ যাত্রা ক্ষান্ত হইতে চাই যে, সস্তার তিন অবস্থা! এই সকল নব্য আর্য্যাদিগের প্রতি আমাদের বক্তব্য ইহার অধিক যদিচ আর কিছুই নাই কিন্তু উঁহাদের প্রতি মনু ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি পুরাতন আর্য্যদিগের বাৎসল্যপূর্ণ উপদেশ এখনো-পর্য্যন্ত আকাশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে; তাহা এই যে, “সত্যসত্যই যদি তোমারা আর্য্য হইতে চাও, তবে পূর্ব্বে আমরা যাহা করিতাম তাহাই কর; লৌকিক এবং পৌরাণিক ভ্রান্ত মতের বিরুদ্ধে জ্ঞান-ধর্ম্মের জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত কর; তোমাদের মধ্যে রামমোহন রায়ের ন্যায় প্রকৃত আর্য্যদিগের জন্মগ্রহণ যেন নিষ্ফল না হয়। আর্য্যামি করিলে কিছুই হইবে না! নিশ্চিত জানিও যে আর্য্যামি একটা সংক্রামক এবং মারাত্মক মহাব্যাধি, আর, তাহার একমাত্র ঔষধ আর্য্যোচিত কার্য্য।” আর্য্যামি এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট—অতঃপর সাহেবিআনা কিরূপ তাহার প্রতি একবার মনঃ সমাধান করা যাক্।

আর্য্যামিও যেমন, সাহেবিআনাও তেমনি—দুইই সমান। দুই নারিকেলের শাঁস ফেলিয়া ছোব্ড়া ভক্ষণ। আমাদের দেশের জ্ঞান ধর্ম্ম ধৈর্য্য বীর্য্য দয়া দাক্ষিণ্য অহিংসা ক্ষমা ঋজুতা এইগুলিই শাঁস, আর, টিকি রাখা, ফোঁটা কাটা, ভিতরে সার নাই মুখে বামনাই, দলাদলির মোড়ল-গিরি, এইগুলিই ছোবড়া; এই ছোবড়া-গুলিই আর্য্যামির প্রধান সম্বল; তেমনি আবার, উন্নত বিজ্ঞান, উন্নত শিল্প, প্রবল কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কর্ম্মিষ্ঠতা কার্য্য-নৈপুণ্য, তেজস্বিতা, এইগুলিই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা'র মূল উপাদান—এই-

গুলিই শাঁস; আর, ইংরাজদিগের স্তায় চটুল-ধরণের চাল্ চোল্, ইংরাজদিগের স্তায় জড়ানে জড়ানে বুলি, ইংরাজদিগের স্তায় রক্ত চলাচলের ব্যাঘাতজনক আঁটা সাঁটা অশোভন পরিচ্ছদ, এইগুলিই ছোব্ড়া; এই ছোবড়াগুলিই সাহেবিআনার প্রধান সম্বল। তাই আমরা বলি যে, আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা দুইই এপিট্ ওপিট—এ বলে আমায় দ্যাখ্, ও' বলে আমায় দ্যাখ্।

কেহ মনে করিতে পারেন যে, ইংরাজেরা যে-কোনো প্রণালীতে যে-কোনো কার্য্য করে, বাঙ্গালীরা সেই প্রণালীতে সেই কার্য্য করিলে তাহাতেই তাঁহাদের সাহেবিআনা হয়; তাহা যদি কেহ মনে করেন—সেটি তাঁহার বড়ই ভুল! কেননা তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, ইংরাজেরা যেহেতু ইংরাজি লিখিবার সময় বামদিক্ হইতে ডাহিন-দিকে লেখনী চালনা করে এই জন্য বাঙ্গালিদের উচিত যে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবার সময় ডাহিনদিক্ হইতে বামদিকে পারসীক ধরণে লেখনী চালনা করেন; নহিলে যেন তাঁহাদিগকে সাহেবিআনা-দোষে লিপ্ত হইয়া পড়িতে হইবে! ফলে, এ কথা কোনো কাজের কথা নহে যে, ইংরাজদিগের যে-কোনো রীতিনীতি বা যে-কোনো আচার ব্যবহার বাঙ্গালিদের মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই সাহেবিআনার লক্ষণ। ম্যাক্‌স মূলার ডক্টের এ কথা যদি সত্য হয় যে, ইংরাজ বাঙ্গালী ফরাসীস্ প্রভৃতি সকল আর্য্য-জাতিই গোড়ায় একজাতি ছিল, তবে ইংরাজ-বাঙ্গালি জাতি-দ্বয়ের মৌলিক আচার-পদ্ধতি যে একই ধাঁচা'র হইবে—তাহা তো হইবারই কথা বরং তাহা না হওয়াই বিচিত্র; তবুও যদি এ বিষয়ে কাহারো মনে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকে—তবে বক্ষ্যমান দুইটি উদাহরণ শুনিলে, সে সন্দেহ তাঁহার মন হইতে তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইয়া যাইবে।

প্রথম উদাহরণ;—বন্ধুগণের সম্মিলন-কালে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যেরূপ কর-নিপীড়নের (Shakehandএর) প্রথা প্রচলিত আছে আমাদের মধ্যে যে, সেরূপ নাই বা ছিল না, তাহা নহে; কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বসীর প্রথম অঙ্কের প্রথম ঘটনা-টিতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরূরবা ইন্দ্রপুরী-হইতে মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় পথিমধ্যে যখন চিত্ররথ-গন্ধর্ব্বের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল, তখন উভয়ে স্ব স্ব রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পরস্পরের হস্ত নিপীড়ন করিলেন।

দ্বিতীয় উদাহরণ;—বিবাহোদ্যত বর-কন্যার বয়সের ব্যবস্থা ইউরোপে যেরূপ—আমাদের দেশেও পূর্ব্বে সেইরূপ ছিল; তাহার সাক্ষী—মনুর বিধানে পুরুষের ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম এবং কন্যার বারো বৎসর বয়ঃক্রম বিবাহের উপযুক্ত বয়স। এখানে ইহা বলা বাহুল্য যে, আমাদের দেশের বারো বৎসর ইংলণ্ডের ষোলো বৎসর অপেক্ষা বেশী বই কম নহে।

ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, ইউরোপ এবং ভারতবর্ষ উভয়েরই মধ্যে এরূপ

কতকগুলি মৌলিক আচার ব্যবহার রীতি নীতি প্রচলিত আছে যাহা আর্য্যজাতি মাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি—একা কেবল ইংরাজদের নিজস্ব সম্পত্তি নহে; সে গুলিতে—কি ইংরাজ—কি বাঙ্গালি কি ফরাসীস্—সকলেরই তুল্য অধিকার; কাজেই সেগুলি সাহেবিআনার উপকরণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। তা ছাড়া, তদপেক্ষা ব্যাপকতর এরূপ কতক-গুলি বিষয় আছে যাহাতে আর্য্যানার্য্য সকল জাতিরই সমান অধিকার—যেমন মনুষ্যত্ব, জ্ঞান, ধর্ম্ম ইত্যাদি; কাজেই এ-গুলিও সাহেবিআনার উপকরণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। একজন অতিবৃদ্ধ টোলের ভট্টাচার্য্য হয় তো মনে করিতে পারেন যে, ইংরাজি বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিক্ষা সাহেবিআনারই সামিল; কিন্তু তাঁহার সে কথা কোনো কাজের কথা নহে; এটা অন্ততঃ তাঁহার জানা উচিত যে, সকল-প্রকার জ্ঞান-চর্চ্চাতেই সকল জাতিরই সমান অধিকার;—জ্ঞান এবং ধর্ম্ম জাতীয়-শৃঙ্খলের বন্ধন-হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিতি করে। পূর্ব্বতন গ্রীকজাতি যে, মিসরীয় জাতির নিকটে জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিল, তাহা বলিয়া তাহারা কি মিসরী হইয়া গিয়াছিল? পাদ্‌রী জনেরা যে বাঙ্গালা শিক্ষা করেন—তাহা বলিয়া তাঁহারা কি বাঙ্গালী হইয়া যা'ন? সার্ উইলিয়ম জোন্‌স্ যে, কোনো দেশের কোনো ভাষাই শিক্ষা করিতে বাকি রাখেন নাই—তাহা বলিয়া তিনি কি স্বজাতির পদবী হইতে তিলমাত্রও বিচ্যুত হইয়াছিলেন। স্বর্ণ যাহা—তাহা সকল দেশেই সমান—কেবল স্বর্ণের অলঙ্কার দেশ-ভেদে ভিন্ন; তেমনি জ্ঞানের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি সকল-দেশেই সমান; কেবল—জ্ঞানের বিকাশের তারতম্য-প্রযুক্ত তাহার ভাব-ব্যঞ্জক ভাষা দেশ-ভেদে বিভিন্ন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষা জ্ঞানের বিভিন্ন পরিচ্ছদ বই আর কিছুই নহে। জ্ঞান ইংরাজীও নহে—বাঙ্গালিও নহে—সংস্কৃতও নহে, জ্ঞান জ্ঞানই। যাহার ভাণ্ডারে রৌপ্য আছে তাহাকেই আমি বলিব—ধনী; তা সে-রৌপ্য সিলিঙ্ বেশেই থাক্ আর আধুলি বেশেই থাক্ আর যে-কোনো বেশেই থাক্ তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। সিলিঙ্ অপেক্ষা আধুলি আমাদের দেশে সমধিক ব্যবহারোপযোগী—ইহা খুবই সত্য; কিন্তু তাহা বলিয়া আমাকে যদি কেহ এক রাশ সিলিঙ্ দেয়—তাহা কি আমি লইব না? অবশ্যই লইব—দুই হাত পাতিয়া লইব—লইতে ছাড়িব না; কিন্তু লইয়াই টাঁকশালে দৌড়িব;—ও সেখানে সেই সিলিঙ্-গুলি দিয়া মনের সাধে টাকা আধুলি সিকি গড়াইয়া লইব; তাহার বাট্টা যত লাগে লাগুক্ সে জন্য কাতর হইব না। ইংরাজেরা কি করে? আমাদের দেশ হইতে কাঁচা মাল ধূলি রাশির স্থায় ঝাঁটাইয়া লইয়া যায়, এবং তাহা দিয়া স্বদেশের ব্যবহারোপযোগী কত কি নূতন নূতন অপূর্ব্ব সামগ্রী রচনা করে; আমরা যদি তেমনি তাহাদের পুঁথি হইতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল সংগ্রহ করিয়া সেই উপাদান-গুলিকে স্বদেশীয় ভাষার ছাঁচে ঢালিয়া দেশোপযোগী করিয়া গড়িয়া লইতে

জো পাই, তবে সে সুবিধাটি আমরা ছাড়িব কেন ? * ফল কথা এই যে, জ্ঞান, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কার্য্য-নৈপুণ্য, তেজস্বিতা, এই সকল মনুষ্যোচিত গুণ জাতি-বিশেষের বা ব্যক্তি-বিশেষের এক-চেটিয়া পণ্য দ্রব্য হইতে পারে না ; এ গুলির প্রতি হস্ত প্রসারণ করিবার অধিকার সকল জাতীয় সকল মনুষ্যেরই সমান ; অতএব জ্ঞান-উপার্জ্জনের জন্য ইংরাজি শিক্ষা কোনো গতিকেই সাহেবিআনা শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। কিন্তু জ্ঞান-উপার্জ্জনের জন্য ইংরাজি শিক্ষা করা স্বতন্ত্র, আর, বাবাকে পাপা বলিবার জন্য অথবা দারাকে ডিয়ার বলিবার জন্য ইংরাজি শিক্ষা করা স্বতন্ত্র ! জ্ঞান উপার্জ্জনের জন্য ইংরাজি শিক্ষা করিলে লোকে মানুষের মতো মানুষ হয় ; ঢঙ উপার্জ্জনের জন্য ইংরাজি শিক্ষা করিলে লোকে বনমানুষের মতো মানুষ হয় ;—দুয়ের মধ্যে এইরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, যে-সকল রীতিনীতি আচার-ব্যবহার সমস্ত আর্য্যজাতির সাধারণ-সম্পত্তি—সাহেবিআনার উপকরণ-গুলি তাহার ভিতরে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে না ; এক্ষণে দেখিলাম যে, জ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতি মনুষ্যত্বের সার উপাদান যাহা মনুষ্যজাতির সাধারণ সম্পত্তি, তাহার ভিতরেও সাহেবিআনার কোনো প্রকার উপকরণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে না। তবেই দাঁড়াইতেছে যে, ইংরাজদিগের এরূপ-কতকগুলি বিশেষ-রকমের হাব-ভাব আকার-প্রকার ভাব-ভঙ্গী চাল চোল্ যাহা আর্য্যগণেরও সাধারণ সম্পত্তি নহে, আর, মনুষ্য জাতিরও সাধারণ সম্পত্তি নহে—সেই গুলিই সাহেবিআনার উপকরণ। এই তো গেল উপকরণ ; সাহেবিআনার প্রকরণ কি যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহা এক কথায় বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে ; কি ? না—অনুকরণ। পূর্ব্বোক্ত উপকরণগুলি শেষোক্ত প্রকরণের মধ্য দিয়া সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইলেই তাহাকেই আমরা বলি—সাহেবিআনা। এমতে দাঁড়াইতেছে যে, অনুকরণই সাহেবিআনা-রোগের মূল-সূত্র।

অনুকরণ কেবল একটা দিক্-বিদিক্-শূন্য অন্ধ চপলতা—তাহার ভিতরে কোনো পদার্থ নাই। অনেক সময় অনুকরণের এটা মনে থাকে না যে, "যার যা তারে সাজে অন্যে তাহা লাঠি বাজে" তাই সে প্রায়ই বিস্‌মোল্লায় গলদ্ করিয়া বসে ; প্রায়ই সে ভাল মনে করিয়া একটা কাজ করিতে যায়—করিয়া বসে একটা বেতালা বেসুরা

* এই সুযোগে কাঁকতালে একটি কথা বলিয়া লই ;—ইংরাজী ভাষার বাঙ্গালা অনুবাদ-কালে অনেক লেখক কিম্ভূত কিমাকার নূতন এক-তরো ভাষা গড়িয়া তোলেন,—এইটি বড় দোষের কথা ! আমরা তাই "Letter killteh' spirit giveth life" এই বচনটির অনুবাদ করিতে হইলে এইরূপ অনুবাদ করি যে, যৌগিক শব্দ বাক্যের প্রাণবধ করে, আন্তরিক ভাব বাক্যে প্রাণদান করে ; নচেৎ এরূপ অনুবাদ করি না যে, "অক্ষর বধ করে ও আত্মা জীবন-দান করে !" "স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট" এরূপ ধরণের অনুবাদ শুনিলে আমাদের গাত্রে জ্বর আইসে !

বেমানান্ কিম্ভূত কিমাকার কাণ্ড ! * হিন্দু সন্তানের (Esquire) ইস্কোএআর পদবী ইহার একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ;—ইউরোপের মধ্যম অব্দের শাস্ত্র-অনুসারে স্কোএআর পদবী সাধারণ লোক-জনের পদবী অপেক্ষা এক ধাপ উচ্চে অবস্থিত। ব্রাহ্মণের নীচেই যেমন কায়স্থ—নাইটের নীচেই তেমনি স্কোএআর। ইউরোপের মধ্যম অব্দে নাইট্ যখন ঘোড়ায় চড়িবার উপক্রম করিতেন—স্কোএআর তখন রেকাব ধরিতেন; নাইট্ যখন দ্বন্দ্-যুদ্ধে যাত্রা করিতেন—স্কোএআর তখন তাঁহার

* এই প্রসঙ্গে মহামান্য সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একটি অতি সরস গল্প বলিলেন—সেটি এই ;—একজন পল্লীগ্রামের কবিরাজ তাঁহার একটি ছাত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহার হাতের একজন রোগীকে দেখিতে গেলেন। রোগীর হাত দেখিয়া তিনি বলিলেন "নাড়ীতে কিঞ্চিৎ রসাধিক্য দেখিতেছি—পথ্য-বিষয়ে আমি তোমাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলাম তাহার তো কোনো অন্যথাচরণ কর নাই ?" রোগী বলিল "আপনি যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন আমি সেই রূপই করিয়াছি—তাহার একচুলও এদিক্ ওদিক্ হয় নাই," কবিরাজ বলিলেন "তোমার হাতটা দেও দেখি—আর-একবার দেখি"—হাত দেখিয়া বলিলেন "সত্য বল দেখি তুমি ইক্ষুরস ভক্ষণ-করিয়াছ কি না ?" রোগী বলিল "আপনি ঠিক্ আঁচিয়াছেন—আমি যথার্থই ইক্ষুরস ভক্ষণ করিয়াছি ;". কবিরাজ বলিলেন "তোমার নাড়ী দেখিয়াই তাহা আমি বুঝিয়াছি—ওরূপ কার্য্য আর যেন না হয়" কবিরাজের এইরূপ অসাধারণ নাড়ী-জ্ঞান দেখিয়া বাড়ি-শুদ্ধ লোক অবাক্ হইয়া গেল, এবং সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। কবিরাজ ছাত্র-সমভিব্যাহারে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিবার সময় পথিমধ্যে তাঁহার ছাত্রটি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "কবিরাজ মহাশয়, পুঁথিতে কোথাও তো এরূপ লেখে না যে, নাড়ী দেখিয়া কে কি খাইয়াছে না খাইয়াছে তাহার উপলব্ধি সম্ভবে; আপনি তবে নাড়ী দেখিয়া কেমন করিয়া ইক্ষু ভক্ষণের ব্যাপারটা অনুমান করিলেন—সেইটি আমাকে বুঝাইয়া বলুন্ ?" কবিরাজ বলিলেন "বাপু! এটা আর বুঝিলে না! রোগীর ঘরের চারিদিকে আকের ছিব্ড়া পড়িয়া আছে দেখিলাম—দেখিয়া ভাবিলাম যে, সে ঘরে আর কে আক খাইতে যাইবে—রোগীরই এ কাজ! এখন বুঝিলে ?" ছাত্র বলিল "এই বই নয় ?—এতো আমিও পারি! কবিরাজ মহাশয়—এবারে যখন আপনি রোগী দেখিতে যাইবেন তখন রোগ-নির্ণয়ের ভারটা আমার উপর সমর্পণ করিবেন।" কবিরাজ তাহাতে সম্মত হইলেন। ছাত্রটি রোগীর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, সেখানে এক ঘর লোক বসিয়া আছে—ইহা দেখিয়া তাহার উৎসাহানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; সে রোগীর নাড়ী দেখিতেছে আর ঘরের চারিদিকে নেত্র-পাত করিতেছে—আকের ছিবড়া বা আর কোনো খাদ্য-সামগ্রীর কোনো নিদর্শনই খুঁজিয়া পাইতেছে না—অবশেষে চৌকাটের কাছে কতকগুলা জুতা পড়িয়া আছে দেখিয়া মনে ভাবিল "এতক্ষণে ঠিক্ পাইলাম!" আর তদ্দণ্ডেই রোগীকে বলিল "তোমার নাড়ীর গতি যে রূপ দেখিতেছি—নিশ্চয়ই তুমি জুতা ভক্ষণ করিয়াছ তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই! ইহা শুনিয়া রোগীর বাড়ির লোকেরা তাহাকে উত্তম মধ্যম জুতা ভক্ষণ করাইয়া বিদায় করিল। অনুকরণের এইরূপই বিচিত্র গতি।

সাজ-সজ্জা বহন করিতেন; ইহাতেই স্কোএআর পদবীর এত মান মর্য্যাদা। শুধু যে কেবল ইংরাজদের মধ্যেই এরূপ তাহা নহে, আমাদের দেশের মান্য গণ্য শ্রেণী-বিশেষের মধ্যেও নাইটের সেবক স্কোএয়ার পদবীর ন্যায় ব্রাহ্মণের সেবক দাস পদবী বহুকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। তবে, এখন যেরূপ কাল পড়িয়াছে তাহাতে সজ্জন কায়স্থেরা আপনাদের পদবীর সংশ্রব হইতে দাস শব্দটি উঠাইয়া দিয়াছেন—খুবই ভাল করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ-মাত্র নাই; কিন্তু তা'ও বলি—একটা উপসর্গকে তাঁহারা এক দ্বার দিয়া বাহির করিয়া দিয়া তদপেক্ষা গুরুতর আর-একটা উপসর্গকে কোন্ যুক্তিতে তাঁহারা আর-এক দ্বার দিয়া ঘরে ঢোকা'ন্—এইটি বড় রহস্য! ব্রাহ্মণের খালি চরণের পদধূলিকে যাঁহারা ডরা'ন—নাইটের বুট্মণ্ডিত চরণের পদধূলি দিয়া কোন্ লজ্জায় তাঁহারা ললাটে তিলক কাটেন—এইটিই বুঝিতে পারা সুকঠিন। শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের গাড়ু গামছা বহন করা যদি এতই নীচ কার্য্য হইল, তবে ম্লেচ্ছ নাইটের রেকাব ধরা এবং বুট্ পরিষ্কার করা বড় যে একটা ভদ্রজনোচিত কার্য্য তাহার প্রমাণ কি? ফল কথা এই যে, "যার যা তারে সাজে" ইস্কোএআর পদবী দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরাজকেই সাজে, দাস পদবী দ্বিতীয় শ্রেণীর হিন্দু সন্তানকেই সাজে; কিন্তু অন্যে তাহা লাঠি বাজে—ম্লেচ্ছ নাইটের রেকাব ধরা হিন্দু সন্তানকে লাঠি বাজে, হীনদেন ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করা ইংরাজ সন্তানকে লাঠি বাজে। * এইটি না বুঝিবার দরুণ—

---

* Esquire উপাধিতে যাঁহারা স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পা'ন—বাবু উপাধি তাঁহাদের দু চক্ষের বিষ! ইংরাজ কেরাণী-পতি বাঙ্গালা কেরাণীদিগকে বাবু বলিয়া সম্বোধন করে—এই খেদে তাঁহারা বাবু-শব্দের প্রতি এত বীতরাগ! তাঁহারা এতই যদি সূক্ষ্ম-চর্ম্মী যে, সাহেবেরা বাবু-শব্দের অপব্যবহার করে বলিয়া সেই খেদে তাঁহারা বাবু-শব্দকে আপনাদের নামের কাছ ঘেঁসিতে দিতে নারাজ, তবে দেশশুদ্ধ লোকে যে বাঙ্গালির গায়ের হ্যাট্ কোট্কে ফিরিঙ্গি পোষাক্ বলিয়া খোঁটা দেয়, তাহার বেলায় তাঁহাদের সে সূক্ষ্ম-চর্ম্ম কোথায় থাকে? তা'র বেলা—দেশ-শুদ্ধ লোকের লাঞ্ছনা তাঁহারা গায়ে পাতিয়া লইবেন তাহাও স্বীকার তবুও বিলাতি পরিচ্ছদের মায়া প্রাণ থাকিতে ছাড়িতে পারিবেন না—এ যা তাঁহারা বলেন এটা কিরূপ কথা? এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হয় কেন? ইংরাজ কেরাণী-পতিদিগের মতই কি তাঁহাদের সর্ব্বারাধ্য লোক মত (public opinion)? দেশ-শুদ্ধ লোকের মত কি লোক মত নহে? নকল সাহেবেরা যাহা বলিতে যাহাই বুঝুন্না কেন—আসল বিলাতি সাহেবেরা public opinion বলিতে আপনাদের দেশের লোক-মতই বোঝেন; তা ছাড়া, ভিন্ন দেশীয় লোকের মত (বিশেষতঃ ভিন্ন দেশীয় কেরাণীপতিদিগের মত) ইউরোপীয় কোন্ সভ্যজাতির মধ্যে লোক-মত বলিয়া সমাদৃত হয় তাহা আমরা জানি না। ইংরাজদিগের মধ্যে এমনও তো দেখিতে পাওয়া যায় যে, বচসা-কালে উচ্চ পদবীস্থ লোক নীচের লোককে কঠোর-ভাবে Sir বলিয়া সম্বোধন করে যথা,—"You hold your tongue sir;" Sir Richards Temple যদি বলেন যে, খান্সামাকে ধমক্ দিবার সময়েও লোকে Sir শব্দ উচ্চারণ

অনুকরণ-রূপী চঞ্চল হরিণ দন্তহীন নখহীন ঝিমন্ত দিশী নেকড়ে বাঘের হস্ত এড়াইবার জন্য প্রত্যহই নূতন নূতন ফন্দি বাহির করিতেছে অথচ দন্ত-নখবিশিষ্ট বিলাতি জাত-বাঘটাকে ঘরে ঢোকাইবার জন্য লালায়িত। বঙ্গীয় নব্য আর্য্যেরাও আবার তেমনি—যার যা তারে সাজে এ বোধ তাঁহাদের মূলেই নাই; এ বোধ তাঁহাদের নাই যে, গেরুয়া বসন উদাসীনকেই সাজে—গৃহীকে সাজে না; মাথায় টিকি ব্রাহ্মণপণ্ডিতকেই সাজে—বিষয়ী ব্যক্তিকে সাজে না; রুদ্রাক্ষমালা শাক্তকেই সাজে আর কাহাকেও সাজে না; তাঁহারা সকল হিন্দু সম্প্রদায়ের দেখাদেখি নির্ব্বিশেষে সকল বেশ ধারণ করিতেই প্রস্তুত—যেহেতু তাঁহারা সার্ব্বভৌমিক আর্য্য! এইরূপ দেখা যাইতেছে যে অনুকরণ—আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা উভয় রোগেরই একটি সাধারণ উপসর্গ!

অনুকরণ কি? না দেখাদেখি কার্য্য করা। সাহেবদের দেখাদেখি কার্য্য করা'র নাম সাহেবিআনা। সাহেবদের দেখাদেখি বাঙ্গালিরা কি করেন? যাহা করেন তাহা বুঝাই যাইতেছে;—বাহ্য আকার প্রকার ভাবভঙ্গী চাল্ চোল্ কথাবার্ত্তার ঢঙ এইগুলিই চক্ষে দেখিবার সামগ্রী—এইগুলিই একজনের দেখাদেখি আর একজন চট্ আদায় করিতে পারে—বাঙ্গালিরা তাহাই করেন। কিন্তু মনুষ্যের আভ্যন্তরিক ভাব এবং চরিত্র চক্ষে দেখিবার সামগ্রী নহে—তাহা অন্তরে অনুভব করিবার সামগ্রী; কাজেই কোনো প্রকার আন্তরিক ভাব এবং চরিত্র একজনের দেখাদেখি আর একজন আদায় করিতে পারে না—কেমন করিয়াই বা পারিবে? যাহা চক্ষে দেখা যায় না তাহা একজনের দেখিয়া আর একজন কেমন

করে—অতএব Sir উপাধি অতীব লজ্জাস্পদ উপাধি—ফের যদি আমাকে কেহ Sir উপাধি-যুক্ত শিরোনামায় পত্র লেখে তবে তাহার নামে আমি লাইবেলের মোকদ্দমা আনিব"—তবে লোকে তাঁহাকে কি বলিবে? আসল্ কথা এই যে, খান্‌সামাকে Sir বলাতেও Sir উপাধি কাঁচিয়া যায় না, আর, কেরাণীকে বাবু বলাতেও বাবু উপাধি কাঁচিয়া যায় না। বাবু শব্দের মূল বৃত্তান্ত আর কিছু না—Sire শব্দ হইতে যেমন Sir হইয়াছে—বাবা শব্দ হইতে তেমনি বাবু হইয়াছে; তাহার সাক্ষী—হিন্দুস্থানীরা যখন তখন বাবা অর্থে বাবু শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। Sire শব্দের অর্থ বাবা বই আর কিছুই নয়, আর, Sir শব্দ Sire শব্দেরই অপভ্রংশ। এইরূপ, Sir শব্দ এবং বাবু শব্দ উভয়েরই মূল অর্থ যখন একই প্রকার, তখন বাঙ্গালি সাহেবেরা কোন্ যুক্তিতে Sir উপাধিকে স্বর্গের সোপান এবং বাবু উপাধিকে পাতালের সোপান বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করেন—বুঝিতে পারি না। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইরূপ মনে হয় যে, মাণ্ডারীন্ উপাধি চীন্‌কেই সাজে আর কোনোজাতিকেই সাজে না; সেখ্ উপাধি মুসল্‌মানকেই সাজে—ব্রাহ্মণপণ্ডিতকেও সাজে না—পাদ্‌রিকেও সাজে না; বাবু উপাধি বাঙ্গালিকেই সাজে—ইংরাজকে সাজে না; Sir উপাধি ইংরাজকেই সাজে বাঙ্গালিকে সাজে না।

করিয়া শিখিবে? সেক্‌স্‌পিয়রের হাতের লেখা সকলেই অনুকরণ করিতে পারে কিন্তু সেক্‌স্‌পিয়রের কবিত্ব-রসের অনুকরণ দেবতারও অসাধ্য;—ইহার কারণ অন্বেষণ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সেক্‌সপিয়রের হাতের লেখা প্রত্যক্ষের গোচর বলিয়াই তাহা অনুকরণের আয়ত্তাধীন; আর, সেক্‌স্‌পিয়রের অন্তর্নিহিত কবিত্বরস প্রত্যক্ষের অগোচর বলিয়াই তাহা অনুকরণের আয়ত্ত-বহির্ভূত। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, কালিদাসও সেক্সপিয়রকে অনুকরণ করিয়া দিশী সেক্সপিয়র হ'ন নাই, সেক্সপিয়রও কালিদাসকে অনুকরণ করিয়া বিলাতি কালিদাস হ'ন নাই; নেল্‌সন্‌ও নেপোলিয়নকে অনুকরণ করিয়া জলপথের নেপোলিয়ন হ'ন নাই, নেপোলিয়নও নেল্‌সন্‌কে অনুকরণ করিয়া স্থল-পথের নেল্‌সন্ হ'ন নাই; রামমোহন রায়ও লিউথরকে অনুকরণ করিয়া দিশী লিউথর হ'ন নাই—লিউথরও রামমোহন রায়কে অনুকরণ করিয়া বিলাতি রামমোহন রায় হ'ন নাই। যা'র যা তারে সাজে—সেক্সপিয়রের কবিত্ব সেক্সপিয়রকেই সাজে, কালিদাসের কবিত্ব কালিদাসকেই সাজে; সুবিখ্যাত Emerson তাই বলিয়াছেন "Shakespeare never will be made by the study of shakespeare" সেক্‌স্‌পিয়ার পড়িয়া কোনো জন্মেই কেহ সেক্‌স্‌পিয়র হইতে পারিবেন না; নেপোলিয়নের যুদ্ধ কৌশল নেপোলিয়নকেই সাজে, নেল্‌সনের যুদ্ধ কৌশল-নেল্‌সন্‌কেই সাজে; একজনের অনুকরণ আর এক জনকে সাজে না—একজাতির অনুকরণ আর এক জাতিকে সাজে না। Museকে সাড়ী পরা সাজে না; সরস্বতীকে গৌন পরা সাজে না; (কোনো বঙ্গ কবি যদি সম্রাট্ হংসের (Swan) কণ্ঠের সহিত রূপসীর কণ্ঠের তুলনা দেন, তবে তাহারই নাম সরস্বতীকে গৌন্ পরানো); পদ্ম-মৃণালের আগায় গোলাপফুল সাজে না, গোলাপের ডালে পদ্ম-ফুল সাজে না,—যাহা সাজে না তাহা আপনার গাত্রে বল পূর্ব্বক সাজাইতে যাওয়ার নামই অনুকরণ।

অনুকরণ যে কাহাকে বলে সে বিষয়ে এক্ষণে আর অধিক বাক্যব্যয় করিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না, কিন্তু অনুকরণ যে, কাহাকে বলে না, সে বিষয়ে যৎস্বল্প একটি কথা এখনো আমাদের বলিবার আছে—সেটি এই যে, আদর্শের প্রতিকৃতি অনুকৃতি শব্দের বাচ্য নহে। মনে কর দুই জন চিত্রকর এক পল্লীতে অবস্থিতি করিতেছেন; আর মনে কর যে, প্রথম চিত্রকর সুন্দর একটি দৃশ্য চিত্রপটে উদ্ভাবন করিয়াছেন; সেই অঙ্কিত চিত্রটি দেখিয়া দ্বিতীয় চিত্রকরের মনে একটি অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদ্বোধন হইল; তাহার পরে সেই দ্বিতীয় চিত্রকর উদ্বোধিত ভাবটিকে পটে অভিব্যক্ত করিতে গিয়া প্রথম চিত্রটির অবিকল অনুরূপ দ্বিতীয় আর একটি চিত্র তাঁহার হস্তদিয়া বাহির হইয়া পড়িল। এরূপ স্থলে প্রথম চিত্রটিকে আমরা বলিতে পারি—আদর্শ, এবং দ্বিতীয় চিত্রটিকে আমরা বলিতে পারি—তাহার

প্রতিকৃতি; এ ভিন্ন—দ্বিতীয় চিত্রটিকে প্রথম চিত্রের অনুকৃতি বলিতে পারি না; তাহার কারণ এই যে, প্রথম এবং দ্বিতীয় দুইটি চিত্র দুই জনের সমান মনের ভাব হইতে উৎপন্ন হওয়াতেই সমান আকার ধারণ করিয়াছে, তা বই—একটার দেখা দেখি আর একটা তাহার সমান হইয়া ওঠে নাই; একটার দেখাদেখি যখন আর একটা জন্মগ্রহণ করে নাই তখন কাজেই একটা আর একটার অনুকৃতি বলিয়া সংজ্ঞিত হইতে পারে না। কেহ বলিতে পারেন যে, দ্বিতীয় চিত্রকর প্রথম চিত্র-হইতে ভাব লইয়া তবে তো দ্বিতীয় চিত্রটি উৎপাদন করিয়াছেন—তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, দ্বিতীয় চিত্র প্রথম চিত্রের অনুকৃতি নহে? ইহার উত্তর এই যে, লোকে যেমন জলাশয় হইতে জল তুলিয়া কলস পূরণ করে, সেরূপ করিয়া কেহ কোনো একটি ভাবকে বাহির হইতে উঠাইয়া লইয়া অন্তরে পুরিতে পারে না—কেমন করিয়াই বা পারিবে? ভাব তো আর আকাশ-ব্যাপী ভৌতিক পদার্থ নহে যে, তাহাকে একস্থান হইতে উঠাইয়া আনিয়া আরেক স্থানে রাখিতে পারা যাইবে; ভাব মানসিক পদার্থ—আকাশের মধ্য দিয়া মূলেই তাহার চলাচলি সম্ভবে না। অতএব, দ্বিতীয় চিত্রকর প্রথম চিত্র হইতে ভাব লইয়াছেন, ইহার অর্থ এরূপ নয় যে, প্রথম চিত্রটির গায়ে একটি ভাব আটা দিয়া জোড়া ছিল, সেখান হইতে তিনি তাহা উঠাইয়া লইয়া আপনার মনের ভিতরে পুরিয়াছেন; উহার অর্থ শুদ্ধ কেবল এই যে, প্রথম চিত্রটি দেখিবা-মাত্র দ্বিতীয় চিত্রকরের মনে একটি ভাবের উদ্বোধন হইল—বাহির হইতে ভাবের আগমন হইল না কিন্তু অন্তর হইতে ভাবের উদ্বোধন হইল;—তাঁহার অন্তরে যাহা প্রসুপ্ত ছিল তাহাই উদ্বোধিত হইল, যাহা মুকুলিত ছিল তাহাই বিকসিত হইল, যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহাই প্রাদুর্ভূত হইল; কাজেই ভাব-গ্রহণ বলিতে বাস্তবিকই কিছু-আর বাহির হইতে ভাব-গ্রহণ বুঝায় না, প্রত্যুত অন্তর হইতে ভাবের উদ্বোধনই বুঝায়। এই জন্য, উদ্বোধিত ভাব হইতে যদি দৃষ্টপূর্ব্ব আদর্শের অবিকল অনুরূপও একটা প্রতিকৃতি উদ্ভাবিত হয়, তথাপি তাহা প্রতিকৃতি ভিন্ন অনুকৃতি-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। এক নেপোলিয়নের দৃষ্টান্তে যখন শত সহস্র ফরাসীস সেনা তোপের মুখে জরাজীর্ণ সেতু অতিবাহন করিয়া শত্রুদের উপরে জয়লাভ করিল, তখন তাহাতে ইহাই প্রমাণ হইল যে, যেমন নেপোলিয়ন—তেমনি তাঁহার ফরাসীস্ সৈন্য; সে সৈন্য সম্বন্ধে এরূপ বলা যাইতে পারে না যে, তাহারা নেপোলিয়নের দেখাদেখি সেই মুহূর্ত্তেরই ভুঁই-ফোঁড় বীর, কেন না—তাহারা গোড়া হইতেই বীর; যে বীরভাব গোড়া হইতেই তাহাদের অন্তঃকরণে পুঁজি করা ছিল, নেপোলিয়নের দৃষ্টান্তে তাহাই উদ্বোধিত হইয়া উঠিল—এ বই আর কিছুই নহে। যেরূপ বীর-ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নেপোলিয়ন স্বয়ং তোপের মুখে একপদ অগ্রসর হইলেন, সেইরূপ অন্তর্নিহিত বীরভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহার সৈন্যেরা তোপের মুখে শত পদ অগ্রসর হইল;

নেপোলিয়নের দেখাদেখি তাহারা তাহা করেও নাই—করিতে পারিতও না ; কেন না, তাহারা যখন তোপের মুখে অগ্রসর হইতেছে, তখন নেপোলিয়নের আকার প্রকার ভাব-ভঙ্গী নকল করিবার অবকাশ তাহাদের কোথায় ? নেপোলিয়নের সৈন্যেরা যদি নেপোলিয়নের ধরণে ওয়েষ্ট্ কোটের পাকেটে হাত দিয়া সমাহিত-ভাবে দাঁড়াইত, নেপোলিয়নের ধরণে থাবা থাবা নস্ত লইত, নেপোলিয়নী ঢঙের কোর্ত্তা পরিত, তাহা হইলেই প্রকাশ পাইত যে, তাহারা নিজের কোনো আন্তরিক ভাবের বশবর্ত্তী না হইয়া শুদ্ধ কেবল নেপোলিয়নের দেখাদেখি কার্য্য করিতেছে ; এইরূপ কার্য্যই অনুকৃতি শব্দের বাচ্য। এরূপ অনুকৃতি-পরায়ণ সৈন্তদিগের কোনো কার্য্যের মধ্যে বীরত্বের প্রতিকৃতি সহস্র খুঁজিলেও পাওয়া যাইতে পারে না। ফল কথা এই যে, আন্তরিক ভাবের পুঁজি হইতে যে কার্য্য উদ্গীরিত হয়, তাহা দৃষ্ট আদর্শের অবিকল অনুরূপ হইলেও তাহা অনুকৃতি-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না—তাহা প্রতিকৃতি শব্দেরই বাচ্য। অন্তরে ভাবের খাঁকৃতি এবং বাহিরে চটক এই পিতা মাতা হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম অনুকৃতি। মোটামুটি সংক্ষেপে বলিতে হইলে—ভাব-মূলক কার্য্য যদি আদর্শের অনুরূপ হয়, তবে তাহা প্রতিকৃতি শব্দের বাচ্য, আর, ভাব-শূন্য কার্য্য যদি যথা-দৃষ্টং তথা লিখিতং ভাবে কৃত হয় তবে তাহাই অনুকৃতি-শব্দের বাচ্য। অনুকৃতির ললাটে এই বাক্যটি ছাপ দেওয়া আছে যে, Letter killeth মৌখিক শব্দ বিনাশের পথ এবং প্রতিকৃতির ললাটে এইরূপ ছাপ দেওয়া আছে যে, Spirit giveth life আন্তরিক ভাব অমৃতের সোপান। মূলেই যাঁহার সুরবোধ নাই তিনি যত বড়ই ওস্তাদের নিকটে গান শিখুন্ না কেন—শিখিবার মধ্যে তিনি কেবল ওস্তাদের মুদ্রা-দোষটিই শেখেন—যেহেতু তাহা তাঁহার চক্ষের প্রত্যক্ষ বিষয় ; সুর-বোধ যদি চক্ষে দেখিবার বস্তু হইত তবে ওস্তাদের দেখাদেখি যেমন করিয়া তাঁহার মুদ্রা-দোষ জন্মিয়াছে তেমনি করিয়া তাঁহার সুরবোধ জন্মিতে পারিত। একজন উদ্যানের মালী দিবা-রাত্রি ফুল লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছে অথচ ফুলের সৌন্দর্য্য যে, কাহাকে বলে, তাহার বিন্দু বিসর্গও সে হয় তো জানে না ; একজন কবি কোনো একটি ফুলের হয় তো নাম ধাম কিছুই জানেন না—অথচ ফুলটি দেখিবা মাত্র তিনি হয় তো তাহার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া যা'ন ; মালীটি যদি কবির সেই বিমোহিত অবস্থার ভাবভঙ্গী অনুকরণ করিলেই কবির সৌন্দর্য্য-রস-বোধটি স্বীয় মনোমধ্যে আঁকড়িয়া পাইত—তবে পৃথিবীতে আর কবি ধরিত না ! অতএব বীরত্বই হউক্, রসবোধই হউক্, প্রীতিই হউক্ ভক্তিই হউক্, নয়নের অপ্রত্যক্ষ অন্তঃকরণের যে কোনো ভাবই হউক্, তাহারই সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, যাহার অন্তরে যাহা নাই তাহা তাহাকে অনুকরণের ভিসুকে করিয়া কোনো মতেই গিলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। তবে কি ? না সহবাস দৃষ্টান্ত এবং শিক্ষার গুণে যাহার অন্তরে যাহা প্রসুপ্ত আছে তাহাই উদ্বো-

ধিত হয়, যাহা মুকুলিত আছে তাহাই বিকসিত হয়, যাহা প্রচ্ছন্ন আছে তাহাই অঙ্কুরিত হয়। ভস্মে আহুতি দিলে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে না—অগ্নিতে আহুতি দিলেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

এ সম্বন্ধে মহাত্মা যেশু অতীব একটি সারবান্ বাক্য উদ্গীরণ করিয়াছেন, সেটি এই ;—"Unto every one that hath shall be given and he shall have abundance, but from him that hath not shall be taken away even that which he hath." যাহার আছে সে আরো পাইবে—একগুণের জায়গায় শতগুণ পাইবে; কিন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা আছে তাহাও তাহার নিকট হইতে অপহৃত হইবে" ; এ কথাটির মূল্য লক্ষ টাকা। তাহার সাক্ষী—যৎকিঞ্চিৎ যাহার সুরবোধ আছে সে ওস্তাদের সাক্রেতি করিলে আরো অধিক পরিমাণে সুরবোধ উপার্জ্জন করিবে; কিন্তু যাহার মূলেই সুরবোধ নাই সে ওস্তাদের সাক্রেতি করিলে উপার্জ্জন করিবার মধ্যে কেবল মুদ্রা-দোষ উপার্জ্জন করিবে—গুণ উপার্জ্জন না করিয়া দোষ উপার্জ্জন করিবে। যাহার ঘটে নাই পুঁজি—সে যদি ব্যবসা বাণিজ্য করিতে যায়, তবে সে—ধন উপার্জ্জন না করিয়া ঋণ উপার্জ্জন করিবে; পূর্ব্বে তাহার টাকা না থাকার দুঃখ যেমন ছিল—আর এক দিকে—ঋণ না থাকার সুখ তেমনি ছিল, সে-সুখটিও তাহার ঘুচিয়া যাইবে। অতএব, বাহির হইতে ভাবের পুঁজি সংগ্রহ করিতে হইলে, অন্তরে ভাবের পুঁজি পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত থাকা আবশ্যক; বিদেশীয় ভদ্র রীতি নীতি উপার্জ্জন করিতে হইলে স্বদেশীয় ভদ্র রীতি নীতিই তাহার একমাত্র গোড়াবন্ধন; কেন না, জল যেমন জল আকর্ষণ করে, টাকা যেমন টাকা আকর্ষণ করে, ভাবের পুঁজি তেমনি ভাবের পুঁজিকে আকর্ষণ করে; তা ভিন্ন, ভাবের খাঁক্তি ভাবের পুঁজিকে আকর্ষণ করিতে পারে না।

কি ইউরোপ কি ভারতবর্ষ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাতার স্তন্য দুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় ভদ্র রীতি নীতি আচার ব্যবহার শৈশব কাল হইতে ভদ্র গৃহস্থ ব্যক্তির প্রাণের অভ্যন্তরে দিন দিন ক্রমশই গাঢ় হইতে গাঢ়তর-রূপে বদ্ধমূল হইয়া আসিতে থাকে। এইরূপ করিয়া সকল দেশেরই ভদ্রসমাজে সদ্ভাব এবং সদাচারের একটানা স্রোত ক্রমাগতই প্রবাহিত হইয়া আসিতে থাকে। বাঙ্গালী-সন্তান যেমন বাঙ্গালা ব্যাকরণ না পড়িয়াও অনর্গল বাঙ্গালা কহিতে শেখেন, তেমনি বঙ্গদেশীয় ভদ্রলোক শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়াও স্বদেশীয় ভদ্র রীতি নীতি আচার ব্যবহার চতুর্দ্দিক্ হইতে আত্মসাৎ করিতে থাকেন। স্বদেশীয় ভাষার ব্যাকরণ এবং সমাজের ব্যবস্থা-প্রণালী যদি প্রতি ব্যক্তিকেই নিজের প্রযত্নে গড়িয়া লইতে হইত, তবে মাতৃভাষাও কোনো দেশে ভূমিষ্ঠ হইতে পারিত না, আর, ভদ্র সমাজও কোন দেশে মস্তক তুলিতে পারিত না। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, বঙ্গ সন্তানের শৈশব কাল হইতে অন্যূন আঠারো

বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শিক্ষা উপার্জনের কাল; সেই মুখ্য সময়টির মধ্যে স্বদেশীয় ভদ্র রীতি নীতি আচার ব্যবহার যাঁহাদের মনের অভ্যন্তরে রীতিমত আড্ডা গাড়িতে না পায়, —সেই মুখ্য সময়টিতে যাঁহারা স্বদেশে থাকিয়াও স্বদেশীয় ভালো কোনো কিছুরই মর্ম্মাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারেন, তাঁহাদের সেই শিক্ষার বয়সটি চলিয়া গেলে, তাঁহারা যে, কিরূপে বিদেশীয় ভদ্র রীতি নীতি আচার ব্যবহার উদরস্থ করিয়া জীর্ণ করিবেন—তাহা বুঝিতে পারা সুকঠিন। অতএব ক্রাইষ্টের এ কথাটি অতীব সত্য যে, যাহার আছে সে আরো পায়, কিন্তু যাহার নাই তাহার যাহা আছে তাহাও যায়; তাহার সাক্ষী—স্বদেশের ভাষাজ্ঞান এবং ভদ্র রীতি নীতির সংস্কার গোড়া হইতেই যাঁহাদের অন্তঃকরণের মধ্যে পুঞ্জীভূত আছে তাঁহারা বিদেশে গেলে সেখানকার সার সার বস্তু-গুলি আকর্ষণ করিয়া আত্মসাৎ করেন—বিজ্ঞান শিল্প কর্ত্তব্যনিষ্ঠা কার্য্য-নৈপুণ্য তেজস্বিতা মহত্ত্ব পরানুকরণে বিরাগ এইগুলি আত্মসাৎ করেন; পূর্ব্ব হইতেই যাঁহাদের আছে তাঁহারা আরো পা'ন; কিন্তু যাঁহাদের গোড়া থাকতি—স্বদেশীয় ভদ্র রীতি-নীতি আচার ব্যবহারের মধুরসের আস্বাদ যাঁহারা জানেনও না জানিতে চাহেনও না, তাঁহারা শিক্ষার্থে বিদেশে গেলে হিতে বিপরীত করিয়া বসেন; যাঁহাদের নাই তাঁহাদের যাহা আছে তাহাও যায়। তাঁহাদের আপনাদের দেশের ভদ্রা-ভদ্রের তুলাদণ্ড যদি তাঁহাদের মনের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকিত, তবে তাহা দিয়া তাঁহারা অন্য দেশের ভদ্রাভদ্র তৌল করিয়া দেখিয়া—তাঁহাদের পক্ষে যাহা ভাল তাহাই কেবল তাঁহারা গ্রহণ করিতেন; কিন্তু সে তুলাদণ্ড যখন তাঁহাদের মনোমধ্যে নাই, তখন অজ্ঞাত অপরিচিত বিদেশীয় রীতি নীতির ভালমন্দ যে, তাঁহারা কিরূপে বোধায়ত্ত করিবেন, তাহা বুঝিয়া ওঠা ভার। ফলেও তাই দেখা যায়, অপক্ববুদ্ধি লঘুচিত্ত বঙ্গীয় যুবক ইংলণ্ডে গেলে, সেখানকার সু কু এবং যৎসামান্য এই তিন প্রকার বিরোধী সামগ্রীকে তিনি একাসনে বসাইয়া সু'য়ের অপমান করেন, কু'য়ের স্পর্দ্ধা বাড়াইয়া তোলেন, এবং অজ্ঞানের প্রবর্দ্ধক কাচের মধ্য দিয়া তিল-প্রমাণ ক্ষুদ্র বিষয়কে তাল-প্রমাণ বড় দেখেন।*

---

* বাঙ্গালি সাহেবেরা যে, বাস্তবিকই ইংরাজী তিলকে তাল দেখেন এবং বাঙ্গালি তালকে তিল দেখেন, তাহার প্রমাণ সেদিনকার সভাস্থলে হাতে হাতে পাওয়া গেল। একজন বক্তা উঠিয়া বলিলেন "মেষের চামড়া মেষকে সাজে—বৃকের চামড়া বৃককে সাজে, বাঙ্গালিরা আগে বৃক হো'ন্ তবেই বৃকের চামড়া তাঁহাদের গাত্রে মানাইবে; আগে তাঁহারা সাহেবদের মতো তেজী পুরুষ হো'ন তবেই তাঁহাদের গাত্রে সাহেবি ঢঙের কোর্ত্তা মানাইবে"—যেন হ্যাট্‌কোট তেজস্বিতার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ! পুরাণের ভীমসেন তো আর মেষ ছিলেন না—বৃকোদর তিনি বৃকই ছিলেন; তিনি কি ইংরাজি ঢঙের কোট পরিতেন? হানিবাল কি রোমীন ঢঙের পরিচ্ছদ পরিতেন?

জ্ঞান-শিক্ষার জন্য তাঁহারা এখান হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন—ঢঙ শিক্ষা করিয়া তাঁহারা সেখান হইতে এখানে ফিরিয়া আসেন! এইরূপ করিয়াই আমাদের দেশে সাহেবিআনার সূত্রপাত হইয়াছে এবং এখনো তাহার জের চলিতেছে। অতঃপর সাহেবিআনা রোগের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া অচিরাৎ তাহার একটা ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আনুপূর্ব্বিক নিরবচ্ছিন্ন মনঃসংযোগের যন্ত্রণা হইতে আপনাদিগকে শীঘ্রই অব্যাহতি প্রদান করিতেছি—আপনারা সুস্থির হউন্।

ইতিপূর্ব্বে বারবার বলিয়াছি যে আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা উভয় রোগেরই পক্ষে সাম্য-পন্থী চিকিৎসাই সবিশেষ ফলপ্রদ। "সমে সাম্যং প্রয়োজয়েৎ"--সাহেবিয়ানার ভিতরেই সাহেবিআনার ঔষধ জাগিতেছে, এখন তাহাকে বাহির করিয়া লইতে জানিলে হয়! সাহেবদিগের আকার প্রকার ভাব-ভঙ্গী প্রভৃতি বাহ্য আবরণের ভিতরে বিজ্ঞান তেজস্বিতা আত্মনির্ভর কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা কার্য্য-নৈপুণ্য কর্ম্মিষ্ঠতা এই সার পদার্থগুলি জাগিতেছে; সেগুলিকে এক কথায় ব্যক্ত করিতে হইলে, তাহার নাম উনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতা; এইটিই হ'চ্চে সাহেবী উপকরণ-গুলির মাতৃক সত্ব কিনা mother tincture; এই মাতৃক সত্বটি জলে গুলিয়া গুলিয়া তাহার তেজ কমানো চাই—নহিলে তাহা বাঙ্গালিদিগের সেবনোপযোগী হওয়া দুষ্কর। এই উনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতার যেরূপ মহত্ব এবং তেজস্বিতা তাহাতে পরানুকরণের নীচত্ব তাহার ত্রিসীমায় অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না; তাহার সাক্ষী—ইংরাজেরা জর্ম্মানদিগের নিকট হইতে দার্শনিক তত্বজ্ঞান আদায় করিতে কিছু মাত্র সংকোচ করিবে না কিন্তু জর্ম্মানদিগের আকার প্রকার ভাবভঙ্গী, রকম সকম, আপনাদের মধ্যে চালাইতে কিছুতেই সম্মত হইবে না; জর্ম্মনেরা ইংরাজদিগের নিকট হইতে বাণিজ্য ব্যবসায়ের রীতি পদ্ধতি আদায় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না, কিন্তু ইংরাজদিগের আকার প্রকার ভাবভঙ্গী কখনই আপনাদের মধ্যে প্রচলিত করিতে চাহিবে না। ইউরোপের সর্ব্বত্রই এইরূপ। †

পরানুকরণ তো আর তেজিয়ান্ বীর পুরুষের লক্ষণ নহে—তাহা লেজিয়ান্ বীর পুরুষেরই লক্ষণ! তাহার সাক্ষী—ইংরাজিতে Aping (হনুকরণ) বলিয়া যে একটি শব্দ আছে তাহা আপনিই আপনার বীর-বংশের পরিচয় দিতেছে! ইংরাজি তিল'কে যাঁহারা তাল দেখেন আর বাঙ্গালি তালকে যাঁহারা তিল দেখেন তাঁহারাই ইংরাজি ঢঙের কোর্ত্তাকে সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করেন, আর, দোধুয়মান সহজশোভন ধুতিচাদরের যে, একটি অকৃত্রিম শোভা, তাহার প্রতি তাঁহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ।"

† নিতান্ত কাছাকাছি দেশস্থ ব্যক্তিদিগের মনের ভাব যেহেতু অনেক অংশে সমান, এই জন্য তাহাদের মধ্যে বেশ-ভূষাদির অনুকরণ যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় তাহা প্রকৃত পক্ষে অনুকরণ নহে; কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সমান মনের ভাব হইতে সমান কার্য্য অভিব্যক্ত হইলে তাহা অনুকৃতি শব্দের বাচ্য নহে—তাহা প্রতিকৃতি শব্দেরই বাচ্য। ইহার দুইটি উদাহরণ দিতেছি; তাহা হইলেই এখানকার এই কথাটির

বাঙ্গালিরা যদি ইউরোপীয়দিগের আকার প্রকার ভাবভঙ্গীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শুদ্ধ কেবল উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাটি তাহাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন এবং সংগ্রহ করিয়া তাহাকে আপনাদের দেশের ছাঁচে ঢালিয়া আপনাদের মতো করিয়া গড়িয়া ল'ন, তবে তাঁহারা সাহেবিআনা রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া একটা জাতির মতো জাতি হ'ন। তাই আমরা বলি যে, উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাই সাহেবিআনা রোগের মহৌষধ।

উপসংহারকালে "মধুরেন সমাপয়েৎ" এই বচনটি আমার মনের সম্মুখে আসিয়া দুই হাত দুইদিকে প্রসারণ পূর্ব্বক পথ-রোধ করিয়া দণ্ডায়মান—ইহাকে আমি লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ। আর্য্যামি এবং সাহেবিআনার বিপক্ষে আমি অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু দোঁহার স্বপক্ষে একটি কথা যাহা আমার বলিবার আছে তাহাতেই উভয়ের সাত খুন মাপ! সেই কথাটি বলিয়াই আমি প্রস্তাব সাঙ্গ করিতেছি। আর্য্যামিকে আমি এই জন্য ভাল বলি যেহেতু তাহার গর্ব্তে আর্য্যোচিত কার্য্য ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় জাগিতেছে; আর, সাহেবিআনাকে আমি এইজন্য ভাল বলি যেহেতু তাহার গৃহাভ্যন্তরে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা গোকুলে বাড়িতেছে। আর্য্যামির গর্ব্ভ হইতে যখন আর্য্যোচিত কার্য্য ভূমিষ্ঠ হইয়া কালক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিবে তখন সে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার পাণিগ্রহণ করিবে; তাহার পরে আর্য্যোচিত কার্য্যের ঔরষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার গর্ভে তিলোত্তমার ন্যায় একটি পরমাসুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে; তাহার নাম পঞ্চ-

---

মর্ম্ম বুঝিবার পক্ষে আর কোনো গোল থাকিবে না। "নাচের উপযোগিতা" এই ভাব হইতে ইংরাজ এবং ফরাসীস্ উভয় জাতিরই মহিলাদিগের গাউনের ঢঙ (কের্ত্তাদিরও ঢঙ) উদ্ভূত হইয়াছে; উভয় জাতির মনের ভাব এইরূপ সমান হওয়াতে ইংরেজেরা পারিস্ ঢঙ্ অনুকরণ করিলে তাহাদের স্বপক্ষে এইরূপ একটি কথা বলিবার থাকে যে, সেরূপ ঢঙ্ তাহাদের নিজের মনের ভাবেরই প্রতিকৃতি। পক্ষান্তরে "নাচের উপযোগিতা" এ ভাবটি বাঙ্গালিদের মনে কোনো পুরুষেই নাই—এ অবস্থায় বাঙ্গালিরা যদি উঁহাদের দেখাদেখি ঐরূপ ঢঙের অনুকরণ করেন, তবে তাঁহাদের স্বপক্ষে কাহারো এরূপ কথা বলিবার জো থাকে না যে, সে ঢঙ্ তাঁহাদের মনের ভাবের প্রতিকৃতি; যেহেতু তাহা অনুকৃতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। তেমনি বাঙ্গালিদের সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন—"জল-খাবার" এই ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (কেননা মিষ্ট দ্রব্য জল-পিপাসার উদ্দীপক); পক্ষান্তরে—ইংরাজদের শুক্‌না বিস্কুট আদি ভক্ষ্য সামগ্রী "মদ-খাবার" এই ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (কেননা সেইরূপ সামগ্রীই মদ্যের চাটের উপযোগী); এ অবস্থায়—বাঙ্গালিরা যদি সন্দেশ-আদির পরিবর্ত্তে বিস্কুট-আদির ব্যবহার আপনাদের মধ্যে চালা'ন্—তাহা হইলে তাহা অনুকৃতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। তবে, এখন যেরূপ কাল পড়িয়াছে তাহাতে দ্বিতীয় উদাহরণটি অনেক স্থলে না খাটিবারই কথা।

বিংশ শতাব্দীয় সভ্যতা; এ সভ্যতার গাত্রে ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, এবং ইউরোপীয় আর্য্যদিগের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ দুইই একাধারে সম্মিলিত হইবে—এইটি যে দিন হইবে, সেই দিন ভারতের সমস্ত দুঃখদুর্দ্দিনের অবসান হইবে। এইখানেই শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরমহংস শিবনারায়ণ দেবের জীবন চরিত।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

মুদি কাঁদিয়া কহিল—"আমাদের মধ্যে মুসলমান একজনও ছিল না, আমরা বংশাবলি আনন্দ পূর্ব্বক ছিলাম। একজন মুসলমান বাদসাহ বল-পূর্ব্বক গ্রামের হিন্দু-দিগকে গোমাংস খাওয়াইয়া মুসলমান করিয়া দিয়াছে। আগে আমাদের হিন্দু নাম ছিল না, আর্য্য নাম ছিল। উহারা দেখিল যে আর্য্য নামের অর্থ শ্রেষ্ঠ, তাহারই জন্য গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে ঢেড়্‌রা ফিরাইয়া দিল যে অদ্য হইতে যাহার আর্য্য নাম শুনিব তাহাকে কাটিয়া ফেলিব। তোমরা হিন্দু নাম লও, হিন্দু নাম সকলের নীচ নাম এবং খোদার নাম জপ। গ্রামে হিন্দুদের ঘরের মধ্যে যদি কেহ মরিত এবং কান্না কাটি করিত তাহাদের হুকুম দিত যে তোমরা এরূপে কাঁদিতে পারিবে না। বুক্ চাপ্‌ড়াইয়া কাঁদিতে হইবে। যেরূপ আমরা মহরমের দিনে বুক চাপড়াইয়া কাঁদি সেইরূপ। মহারাজ! হিন্দুস্থানে কেহ হিন্দু রাজা নাই। হিন্দুরা সকলেই বলহীন মুখসর্ব্বস্ব কিন্তু কাজে কিছুই পারে না। অতএব আমাদের হিন্দুদিগকে ধিক্।"

শিবনারায়ণ ইহার পরে সেখান হইতে পঞ্জাবের এক গ্রামে আসিলেন। সেখানে আর এক কথা শুনিলেন। সেই গ্রামে দুই জন ব্রাহ্মণ সন্তান পেশোয়ারাভিমুখে গমন করিতেছিল। মুসলমানেরা তাহাদের যজ্ঞোপবীত কাড়িয়া লইয়া গোমাংস খাওয়াইয়া দেয়। তাহারা দুই জনে আপন গ্রামে আসিয়া তাহাদের পিতা মাতাকে সকল অবস্থা বলিলে মাতা পিতা পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে ইহার কি উপায় করিতে হইবে। পণ্ডিতেরা বলিলেন যে দুই শত করিয়া টাকা প্রত্যেককে আনিতে হইবে তাহা হইলে ইহারা শুদ্ধ হইয়া যাইবে নতুবা ইহাদের শুদ্ধ হইবার অন্য কোন উপায় নাই। সেই ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত গরিব। ভিক্ষা দ্বারা তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। দুই শত টাকা তাহারা কি প্রকারে দিবে।

তাহারা টাকা দিতে না পারাতে সেই সন্তান দুইটিকে ঘরে লইতে পারিল না, তাড়াইয়া দিল। তাহারা মুসলমানদের ঘরে গেল। এইরূপে মুসলমানদেরও দল-পুষ্টি হইতে লাগিল। শিবনারায়ণ এই সকল অবস্থা দেখিয়া বিচারকর্ত্তাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন, টাকা কি কখন জীবকে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ করিতে পারে? কেবল মনের ভ্রম ও সমাজের শাসন মাত্র। হিন্দুদের এই দুর্দ্দশার দৃষ্টান্ত পাশী অর্থাৎ শিউলিদের মধ্যে আছে। শিউলিদের মধ্যে যদি কেহ অখাদ্য বস্তু খায় অথবা কোন অপরাধ করে তাহা হইলে তাহাদের পণ্ডিতেরা এবং ভাই জ্ঞাতিরা বলে, যে যদি তুই আমাদের অর্দ্ধসের করিয়া তাড়ি প্রত্যেককে দিস্ তাহা হইলে তোকে শুদ্ধ করিয়া লইব। সেই ব্যক্তি যদি অর্দ্ধসের করিয়া তাড়ি প্রত্যেককে দেয় তাহা হইলেই সে শুদ্ধ হইয়া যায়, এবং যদ্যপি সে দিতে না পারে, তাহা হইলে সে অশুদ্ধই থাকে।

অনন্তর শিবনারায়ণ পঞ্জাব হইতে অম্বরসহর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় পুকুরের মধ্যে যে নানকজির মন্দির আছে তিনি তন্মধ্যে যাইয়া সেই মন্দিরের অর্থোপায়ের অবস্থা সকল দেখিলেন। দেখিলেন গ্রন্থ-সাহেবকে অর্থাৎ পুস্তক কাগজ কালীকে সকলে প্রণাম করিতেছে এবং কড়ি টাকা পয়সা দিতেছে। শিবনারায়ণ শুনিলেন, এই স্থানে লোকে যথার্থ সাধুদিগকে চিনিতে পারে, এবং তাহাদের সেবা করে। সেই পুষ্করিণীর চারিদিকে মোহান্তদিগের স্থান আছে, এবং তথায় সাধু-দিগের নিয়মিত সেবা হইয়া থাকে। শিবনারায়ণ অপরাপর সাধুদিগের সঙ্গে আহারের সময় মোহান্তদের বাসায় যাইতেন। যে সকল সাধুর রঙ্গিন কাপড় থাকিত, এবং মস্তকে জটা ইত্যাদি নানা প্রকার ভেকের চিহ্ন থাকিত মোহান্তগণ তাহাদিগকে যত্ন পূর্ব্বক বসাইতেন, এবং আহার করাইতেন। কিন্তু শিবনারায়ণের কোন রূপ ভেকের চিহ্ন ছিল না, তাঁহার জীর্ণ চাদর ও গায়ে ধূলা দেখিয়া তাড়াইয়া দিত।

পরে শিবনারায়ণ অম্বর সহর হইতে বাহির হইয়া এক ক্রোশ দূরে গুথাতলাও স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে আসিয়া তিনি দশ পনর দিন অবস্থান করিলেন। সেই গ্রামের দুই এক জন সাধু আসিয়া শিবনারায়ণের সহিত ঈশ্বর সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিত। তাহারা শিবনারায়ণের কথা বার্ত্তা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া সেই গ্রামের সকলকে বলিত, যে এক জন যথার্থ মহাত্মা আসিয়াছেন। পরে সেই গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিল, এবং উত্তম রূপে সেবা করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে অম্বর সহরের সেই মোহান্তরাও শিবনারায়ণের কাছে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল এবং ইঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল বলিয়া লজ্জিত হইতে লাগিল। সেই সহরের মধ্যে রাজারাম নামে একজন

ক্ষত্রিয় শিবনারায়ণকে প্রীতি পূর্ব্বক সেবা করিত। সেই ব্যক্তি যে দিবস শিবনারায়ণকে তলাওয়ের উপর দেখিল সেই দিবস বিছাইবার জন্য একটা কম্বল এবং গায়ে দিবার জন্য একটা লুই এবং একটা জলপাত্র রাখিয়া গেল। অনন্তর দুই এক দিবস পরে শিবনারায়ণ জঙ্গলের মধ্যে খালের ধারে বেড়াইতে গেলেন। ঐ সময় একজন সাধু শিবনারায়ণকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়া রাজারাম শিবনারায়ণকে যে সকল বস্তু দিয়াছিলেন সুযোগ পাইয়া সেই সকল বস্তু অপহরণ করিয়া লইয়া গেল এবং এক দোকানদারের কাছে পাঁচ টাকায় বন্ধক রাখিয়া বলিল আমি এই টাকা দিয়া এক সপ্তাহ মধ্যে ঐ বস্তু ছাড়াইয়া লইব।

মুদি সেই দ্রব্যাদি রাখিয়া পাঁচটি টাকা দিল। সাধু টাকা পাইয়া আফিন, গাঁজা, এবং নানাবিধ মিষ্টান্নে তাহা ব্যয় করিল। পরে শিবনারায়ণ বেড়াইয়া আপন স্থানে আসিয়া দেখিলেন যে, সে সকল বস্তু সেখানে নাই। কিছুক্ষণ পরে রাজারামও শিবনারায়ণকে সেবা করিবার জন্য তথায় আসিয়া দেখিল তাঁহার কম্বলাদি কিছুই নাই। সে শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ এই সকল বস্তু কি হইল। শিবনারায়ণ বলিলেন যে "যিনি দিয়াছিলেন তিনিই লইয়া গিয়াছেন"। রাজারাম বলিলেন, "মহারাজ বোধ হয় কেহ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, পুনরায় আমি আনিয়া দিতেছি, আপনার কষ্ট হইবে।

শিবনারায়ণ বলিলেন "আমার কিছু মাত্র কষ্ট হইবে না, আমার এক চাদরেই যথেষ্ট হইবে। অপর বস্তুর প্রয়োজন নাই।"

রাজারাম সেই কথা না শুনিয়া বাটিতে গিয়া পুনরায় সেইরূপ দ্রব্যাদি আনিয়া দিল। এদিকে যে সাধু কম্বলাদি অপহরণ করিয়া যে দোকানে বন্ধক রাখিয়াছিল, তথায় যাইয়া বলিল যে "আরো এক টাকা আমাকে দাও। আমি এখন দ্রব্যাদি ছাড়াইতে পারিতেছি না।" মুদি ক্রোধ প্রযুক্ত সেই সমস্ত বস্তু তাহাকে দিয়া বলিল, যে 'এই তোমার বস্তু লও আমার টাকা দাও। আমি আর রাখিতে পারিব না।" ঐ সময় সেই দোকানে রাজারামের চাকর বসিয়াছিল। সেই চাকর চিনিল যে এই সকল বস্তু তাহার মনিব স্বামীজীকে দিয়াছিল। এই সাধু চুরি করিয়া আনিয়াছে। তখন সে চুপে চুপে যাইয়া তাহার মনিবকে খবর দিল। রাজারাম তৎকালে আসিয়া সেই দ্রব্যাদির সহিত সাধুকে ধরিল। অপর অপর ব্যক্তি সেই সাধুকে মারিতে লাগিল এবং বলিল যে ইহাকে পুলিষে দেও! রাজারাম বলিল তোমরা ইহাকে মারিও না এবং পুলিষে দিও না। শিবনারায়ণ স্বামী আমার পুলিস, তাঁহার কাছে লইয়া চল।

পরে সকলে শিবনারায়ণের কাছে তাহাকে লইয়া আসিল এবং সকল অবস্থা বলিল। শিবনারায়ণ বলিলেন যে "রাজারাম তুমি এই সকল দ্রব্য আমাকে সুখভোগের জন্য দিয়াছিলে। কিন্তু এই ব্যক্তি আপনার সুখভোগের জন্য চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। কি

করিবে,উহার অপরাধ মাপ করিয়া উহাকে ছাড়িয়া দাও। কিন্তু দুষ্টস্বভাবসম্পন্ন মনুষ্যকে যদি দণ্ড না দেওয়া যায় তাহা হইলে এই প্রকৃতির অপর অপর ব্যক্তির ভয় হয় না এবং উত্তমরূপ ব্যবহার কার্য্য চলে না। আর উত্তম ব্যক্তিকে দুষ্টস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরা কষ্ট দেয়। এই জন্য দুষ্ট স্বভাব দূর করিবার জন্য তাহাদিগকে শাসন করা কর্ত্তব্য। একজনকে শাসন করিলে দশজনে দেখিয়া উত্তম পথে চলিবে। ইহাতে সকলের উপকার হয়। কিন্তু আমার কাছে যখন ইহাকে আনিয়াছ তখন ইহাকে ছাড়িয়া দাও।" রাজারাম এমন জ্ঞানবান এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি যে তিনি সেই চোরকে ছাড়িয়া দিলেন। এবং মুদিকে পাঁচ টাকা দিয়া সেই সকল দ্রব্য ছাড়াইয়া লইলেন।

পরে শিবনারায়ণ বলিলেন আমি এখান হইতে গমন করিব। এই সকল দ্রব্যাদি তুমি আপন বাটিতে লইয়া রাখিয়া দেও। যদ্যাপি কোন মহাত্মার অভাব হয় তাহা হইলে তাহাকে দান করিও। রাজারাম শিবনারায়ণকে বলিলেন আপনি কোন্ দেশে যাইবেন, আমি আপনাকে যাতায়াতের রেলভাড়া দিব। আপনি পুনরায় অনুগ্রহ করিয়া এখানে আসিয়া আমাকে দর্শন দিবেন। শিবনারায়ণ বলিলেন আমি সিন্ধুদেশে যাইব। তোমার রেলভাড়া দিতে হইবে না। আমি দেশের অবস্থা দেখিতে দেখিতে পদব্রজে চলিয়া যাইব।" রাজারাম শুনিলেন না। সিন্ধুদেশে ডূড়িশঙ্কর পর্য্যন্ত টিকিট করিয়া দিলেন এবং দুইটা মোহর কাগজেতে মুড়িয়া শিবনারায়ণের হস্তে এই বলিয়া দিলেন যে আপনার অন্য সাধুর ন্যায় কোন ভেক নাই, আপনাকে কেহ চিনিতে পারে না। আপনার কাছে ইহা থাকিলে আপনার যে সময় যে বস্তুর প্রয়োজন হইবে সেই সময় ইহা ভাঙ্গাইয়া সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। শিবনারায়ণ বলিলেন যে "হে রাজারাম! বুঝিয়া দেখ সাধু মহাত্মাদের টাকা পয়সার প্রয়োজন কি? আমাদের কন্যা পুত্রের কি বিবাহ দিতে হইবে যে টাকা পয়সা লইতে হইবে এবং রাখিতে হইবে? টাকা পয়সা গৃহস্থদিগের সঞ্চয় করিয়া রাখা চাই, কারণ টাকা পয়সা বিনা গৃহস্থ ধর্ম্মের কোন কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। সাধু মহাত্মাগণের টাকা পয়সা লওয়া উচিত নয় এবং গৃহস্থদের ও সাধুকে তাহা দেওয়া উচিত নয়। যিনি যথার্থ সাধু মহাত্মা, পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অন্তর্যামী যাহার ধন, তাহার এ মিথ্যা ধনে প্রয়োজন কি? তাহার প্রাণ রক্ষার জন্য কেবল মাত্র এক মুষ্টি অন্নের প্রয়োজন। আর উলঙ্গ অবস্থা নিবারণার্থ সামান্য বস্ত্রের প্রয়োজন। তিনি যেখানে যান গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে অন্ন বস্ত্র প্রস্তুত আছে। যে সময় যাহা প্রয়োজন হইবে সেই সময়ে অন্তর্যামি স্বয়ংই মনুষ্যের দ্বারা তাহা পাঠাইয়া দিবেন। যদ্যপি পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা এবং বিশ্বাস, থাকে, অন্তরে যদ্যপি তৃষ্ণা না থাকে, যদ্যপি কোন কারণবশত টাকারও প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সেই দেশে টাকাও মিলিবে। অতএব তুমি এই মোহর লইয়া যাও, এবং উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি কিনিয়া বাড়িতে আপনারা সপরিবারে খাও এবং ক্ষুধার্ত্তদিগকে দান কর।

এইরূপে শিবনারায়ণ মোহর ফিরাইয়া দিয়া রেলগাড়িতে চাপিয়া সিন্ধুদেশে চলিয়া গেলেন। সিন্ধুদেশে দুই চারি দিন ভ্রমণ করিয়া তথাকার অবস্থা দিখিয়া পুনরায় পঞ্জাবে ফিরিয়া আসিলেন। পঞ্জাবে আসিয়া পাতিওয়ালা ও নাভা হইয়া দিল্লি চলিয়া গেলেন। দিল্লি হইতে গোয়ালিয়ার রাজবাটিতে উপস্থিত হইলেন। পরে রাজাদিগের অবস্থা দেখিয়া ভরতপুরে এবং করালিতে, অনন্তর করালি হইতে জয়পুর রাজবাটিতে যাইলেন। সেখানেও অপর রাজাদের ন্যায় তাহাদের অবস্থা দেখিয়া, সেখান হইতে বিকানির মাড়োয়ার রাজ্য হইয়া, যোধপুর রাজবাটিতে উপস্থিত হইলেন। যোধপুরে রাজার অধীনস্থ একজন জমিদার ছিলেন। সেই জমীদার যোধপুরের রাজাকে কর দিতেন, কিন্তু সেই জমিদার কোন কারণ বশতঃ রাজাকে কয়েক বৎসর হইতে কর দিতে পারেন নাই। জমীদার বলিতেন, যে আমার কাছে টাকা উপস্থিত হইলেই আপনাকে দিব। রাজা বলিলেন, আমাকে এখনি টাকা দাও, আমি শুনিব না। যদ্যপি টাকা না দাও তাহা হইলে তোমাকে আমার রাজ্য মধ্যে বাস করিতে দিব না, তোপে উড়াইয়া দিব।

সেই জমিদার বলিলেন—আপনি রাজা, সমস্তই করিতে পারেন।

মন্ত্রীরা রাজাকে পরামর্শ দিল, যে পেড়াপিড়ি না করিলে সহজে টাকা দিবে না। রাজা তাহাই শুনিয়া সৈন্য সামন্ত তোপ গোলা গুলি লইয়া সেই জমিদারের ঘর বাড়ি তোপে উড়াইয়া দিল। যেমন তোপ ছাড়িতে লাগিল, অমনি তাহারা ভয়েতে বাটি হইতে বাহির হইয়া প্রাণ রক্ষার জন্য জঙ্গলে পলায়ন করিল। অনেক লোক রাজাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল, এবং ইংরাজেরাও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

সেই সময় শিবনারায়ণ একখানি জীর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া, দরিদ্রের ন্যায় সেখানে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা শিবনারায়ণকে দেখিয়া, চাকরদিগের উপর রাগ করিয়া বলিলেন যে এই দরিদ্রকে এখানে কেন আসিতে দিলে। ইহাকে বাহির করিয়া দাও।

শিবনারায়ণ দেখিলেন যে ক্রোধ প্রযুক্ত রাজা ভ্রমে অন্ধ হইয়া আছেন, এখন কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

রাজার চাকর শিবনারায়ণকে হাত ধরিয়া গলা ধাক্কা দিতে দিতে রাস্তায় তুলিয়া দিলেন। শিবনারায়ণ সেখান হইতে আবুপাহাড়ের দিকে চলিলেন। তিন পালিগ্রাম হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে রাস্তার ধারে জঙ্গলের মধ্যে সন্ধ্যার সময় বসিয়া আছেন তৎকালে যোদপুরের রাজার চাকর, তাহার পদবী গোঁসাই ভারতী, যোদপুর হইতে উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া পালিগ্রামে যাইতেছিল। সন্ধ্যাকালে দেখিল যে শিবনারায়ণ সেখানে বসিয়া আছেন। এখানে কোন গ্রাম নাই মনুষ্য নাই জল নাই

কেমন করিয়া রাত্রে এ ব্যক্তি এখানে থাকিবে এবং বাঁচিবে এই ভাবনায় করুণার্দ্র হইয়া সে শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে যে এখানে বসিয়া আছ? তুমি কোথায় যাইবে?

শিবনারায়ণ বলিলেন—আমি মনুষ্য আমি পালি যাইব।

ভারতী গোঁসাই বলিলেন—তুমি আমার এই উষ্ট্রে আরোহণ কর তোমাকে পালিতে ষ্টেসনের কাছে নামাইয়া দিব।

শিবনারায়ণ বলিলেন—আমি এখানে রাত্রে থাকিব, কল্য সকালে চলিয়া যাইব।

ভারতী তাহা শুনিল না, সে আপন উষ্ট্রে ইহাঁকে উঠাইয়া লইয়া পালিতে গমন করিল এবং আপনার বাসাতে লইয়া যাইয়া শিবনারায়ণকে সেবা শুশ্রূষা করিয়া সেই রাত্রে সেখানে বিশ্রাম করিতে দিল। ওখান হইতে শিবনারায়ণ আবু পাহাড়ে যাইলেন। অনেকের মুখে শুনিলেন যে বড় বড় ঋষি মহাত্মা আবু পাহাড়ে থাকেন। শিবনারায়ণ আবু পাহাড়ের চতুর্দ্দিকে গুহাতে এবং উপরে সর্ব্বত্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাধু মহাত্মাদিগকে দেখিলেন। যেরূপ প্রবাদ ছিল তাহার মধ্যে সেরূপ সাধু একটিও পাওয়া গেল না। যাহাকে দেখিলেন সেই ধন তৃষ্ণাতুর। চারিদিক হইতে গৃহস্থেরা তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া বলিতেছে আমাকে পুত্র দেন ধন দেন ইত্যাদি,—আর সাধু মহাত্মাগণ বলিতেছেন যে যখন তোমরা আমার কাছে আসিয়াছ তখন তোমাদের সকলই আমি দিব, কোন চিন্তা করিও না। তুমি বাড়ি গিয়া দশ টাকা শীঘ্র পাঠাইয়া দিও। আমি এমন ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিব যে তোমার পাঁচটী এমন পুত্র হইবে যে তাহাদের তেজে সম্মুখে কেহই দাঁড়াইতে পারিবে না এবং গাছের এমন একটা শিকড় দিব তাহাতে তোমার কৈলাশ লাভ হইবে এবং একটু বিভূতি ও সেই শিকড় একটু খাইলে যেখানে ইচ্ছা সেখানে উড়িয়া যাইতে পারিবে।

সেই কথা শুনিয়া গৃহস্থেরা পশু হইয়া কেহ দশ টাকা কেহ পঁচিশ টাকা লইয়া গুহার মধ্যে সেই প্রবঞ্চক সাধুদিগকে দিয়া আইসে।

সেই পাহাড়ের উপর একটা পুকুর জলে পরিপূর্ণ আছে ও ইংরাজেরা সেখানে কৈলাস ভোগ করিতেছেন।

শিবনারায়ণ সেখান হইতে বরদার রাজ্যে যাইলেন। রাজবাটীতে যাইয়া অন্য অন্য রাজাদের ন্যায় অবস্থা দেখিয়া সেখান হইতে গ্রীনাড়ী পাহাড়ে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

টগরকে দেখিয়া কথা বন্ধ করিল চারু, কিন্তু টগর রাগিয়া গেল স্নেহলতার উপর। স্নেহ টগরের সহিত থিয়েটার যাইতে চায় নাই, এই জন্য আগে হইতেই তাহার মেজাজ চটিয়াছিল, তাহার উপর এ ঘটনাটি—"একে মনসা তায় ধূনার গন্ধ"-স্বরূপ হইল। টগর তখনি মায়ের কাছে আসিয়া বলিল—"মা জানিস্—দাদা কনে-দিদির সঙ্গে বিয়ের কথা বলছিল।"

গৃহিণী শুনিয়া ভুল বুঝিলেন,—আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন "চারুর তবে বিয়েতে ইচ্ছা হয়েছে,—ছেলের এত লজ্জা? আমাদের কাছে বুঝি—"

টগর বলিল—"না না গো সে বিয়ে না; বিধবা বিয়ের কথা—?"

(টগর বারান্দায় প্রবেশের পূর্ব্বে আড়ালে দাঁড়াইয়া চারুর দু একটা কথা শুনিয়াছিল।) "বিধবা বিয়ের কথা! সে কি?"

গৃহিণী আকাশ হইতে পড়িলেন। স্নেহলতার সহস্র দোষ আছে,—তাহা গৃহিণী জানিতেন, প্রধান দোষ, জগৎ বাবু তাহাকে ভালবাসেন, তাহার পর সে লেখাপড়া করিতে ভালবাসে, সে দেখিতে ভাল, সে তাঁহাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে—ইত্যাদি ইত্যাদি,—কিন্তু এতদূরটা তিনি জানিতেন না!

গৃহিণী তখন কাপড় ছাড়িয়া গৃহে আসিয়া গামছা দিয়া মুখ মুছিতেছিলেন, রাগিয়া গামছাখানা ছুঁড়িয়া আনলায় ফেলিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—"বলিস কি,—বিধবা বিয়ের কথা! ওকি আমার ছেলেকে ভোলাতে চায় নাকি?—ডাক্ত একবার সে ডাইনিকে—এখনি বাড়ী থেকে দূর করে দি"

টগর দেখিল বড় বাড়াবাড়ি হয়, মায়ের রাগ দেখিয়া তাহার রাগটা তখন পড়িয়া গেল, সে বলিল—"অত রাগিস কেন? সেই জন্যত তোকে কোন কথা বলিনে। দাদা না হয় বিধবা বিয়ের কথা বলেছে, তা কনেদিদিকে ত আর বিয়ে করতে চায় নি—!"

গৃহিণী বলিলেন—"আমার ছেলে সুবোধ, শান্ত,—আজো গাল টিপলে দুধ বেরোয়, সে কেন বিয়ের কথা বলবে?—তা কি আমি জানিনে, বুঝেছি বুঝেছি—ডাইনিটারই কীর্ত্তি" গৃহিণী নাসিকা স্ফীত করিয়া, চক্ষু লাল করিয়া, বারান্দায় আসিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন "কমলি ও কমলি"। কমলি সাড়া দিল না, হারার মা তখন দোতলায় উঠিতেছিল, সে বলিল—'কি মা? সে বাজার গেছে।" গৃহিণী বলিলেন "হারার মা। এ সর্ব্বনাশীটাকে মিটমিটে ডাইনিটাকে ডাকত—একবার শীঘ্র ডাক—"

সে বুঝিল কাহার প্রতি গৃহিণীর এই আদর সম্ভাষণ—বুঝিয়া বলিল, "কেন মা—কি হয়েছে কি ?"

গৃহিণী বলিলেন—"যা হবার তা হয়েছে—এখন তাকে ডাক, পোড়ারমুখী একবার সামনে আসুক।"

কমলি তাহাকে ডাকিতে গেল, টগর ধমক দিয়া বলিল—"মা, থামবে ? আমি কি বলেছি কনেদিদিকে দাদা বিয়ে করতে চেয়েছে যে অত রাগ ! বিধবা বিয়ে ভাল কি মন্দ তাদের এই গল্প হচ্ছিল,—এতেই তুমি অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে উঠলে কেন ? তুমি যে কি বলতে কি বোঝ, তার ঠিক নেই, আর যদি আমি কোন কথা বলি।"

এই কথায় গৃহিণীর মনের ভয় কমিল না, কিন্তু তথাপি নরম হইয়া বলিলেন—"চারু অত বড় ছেলে, তার সাক্ষাতে ওরকম সব গল্প করা—সেওত কম বেহায়াপনা নয় ? মেয়ে বেহায়া হলে পুরুষ বেটাছে——

এই সময় স্নেহলতা আসিয়া হাজির হইল, তাহাকে দেখিয়া আর গৃহিণী ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, টগরের তিরস্কার দৃষ্টি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বলিলেন "সর্ব্বনাশী, ডাইনি, বলি তিনকূল খেয়ে শেষে আমার ধনে দৃষ্টি দিয়েছ ? আমার নিরীহ ছেলে—তাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা।" এরূপ তিরস্কার স্নেহলতার পক্ষে এই প্রথম, সে ইহার অর্থ বুঝিল না, এই অকারণ অনভ্যস্ত তিরস্কারে আপাদমস্তক কেবল তাহার কম্পিত হইয়া উঠিল।

গৃহিণী বলিলেন,—"মিটমিটে ডাইনি ! যেন ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানেন না। আমাদের কাছে মুখে রা নেই, এদিকে বড় ভাইয়ের তুল্যি পুরুষের কাছে বিয়ের কথা ! বুঝলি সর্ব্বনাশি, আর যদি চারুর সঙ্গে দেখা করবি—কি কথা কবি—ত বাড়ীর বার করে দেব !

টগর বলিল—"মা তোমার এ যে অন্যায় কথা ! কনে দিদির কি দোষ ? ওকে বকছ কেন ? দাদা যদি ওর কাছে আসে ও কি করবে ?

গৃহিণী জলিয়া উঠিয়া বলিলেন "ডাইনিতে ভুলিয়ে না আনলে পুরুষ বেটাছেলে আসবে কেন ? ওর দোষ না ত কার দোষ ! অমন অপয়া মেয়েও দেখিনি, কুলে বাতি দিতে কাউকে রাখলে না, এখান থেকে যে বিদায় করব তারও যো নেই—মরণও হয় না।

টগর দেখিল—মা এখন সহজে শান্ত হইবেন না ; সে স্নেহলতার হাত ধরিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। খানিক পরে একাকী মায়ের কাছে আসিয়া বলিল—"মা তোমার যদি একটুও বুদ্ধি আছে, দিদিকে অমন করে বকলে, দাদা শুনে যদি রাগ করে ? আজ কাল দাদা বাড়ী আসে, দু দণ্ড থাকে সে কেবল দিদির জন্য বইত নয়। দিদির কাছে আসতে বারণ করেছ শুনলে হয়ত আর দাদা বাড়ীমুখো হবে না। আগে যো যা করে দাদার বিয়েটা দাও তখন যা ইচ্ছা করো।"

টগরের এ কথায় ফল ধরিল, এ কথা শুনিয়া গৃহিণী ভাবিত হইয়া বলিলেন—"তাইত, তা বাছা আমার মাথার ঠিক নেই; তোর যা ভাল বিবেচনা হয় করগে, স্নেহকে বল—যেন চারুকে এসব কথা না বলে।"

টগর। তাত বারণ করবই, আর তুমিও দিদিকে গিয়া বল, তুমি রাগের মাথায় তাকে দু কথা বলেছ যেন কিছু মনে না করে, দাদার সঙ্গে দেখা শুনা যেমন কর্ত্তো যেন তেমনিই করে, বুঝলে?"

গৃহিণী ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অর্দ্ধ প্রাণে উত্তর করিলেন—"আচ্ছা তাই বলব, দেখিস বাছা, শেষে যেন হিতে বিপরীত না হয়।"

এদিকে চারু সন্ধ্যার দিকে বাড়ী ভিতরের সীমানায় পদার্পণ করিতেই প্রথমেই হারার মা তাহাকে চুপি চুপি বলিল—"দাদা বাবু তুমি কি বলেছ? দিদিমাণকে মাঠাকরুণ কত কৈফত করেছে। ছি বাবু বনের সঙ্গে বিয়ের কথা কি বলে?"

চারু বুঝিয়া লইল ব্যাপারখানা কি, টগর যে তাহার মায়ের কাছে কথাটা বিকৃত করিয়া বলাতেই এইরূপ ঘটিয়াছে তাহার তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। ক্রোধোত্তেজিত হইয়া সে স্নেহের গৃহের দিকে অগ্রসর হইল—কিন্তু কি ভাবিয়া কে জানে অর্দ্ধেক পথ না যাইতে তাহার মন ফিরিল, পাও ফিরিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময় টগর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, সুতরাং এই ক্রোধের তালটা প্রথমেই তাহার উপর পড়িল। চারু তাহাকে কতকগুলা বকিয়া বহির্ব্বাটীতে পিতার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল জগৎ বাবু তখন কোচে শুইয়া গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন, চারু নিকটে একখানি চৌকিতে বসিল। সেই মাত্র সে কিশোরীর বাড়ী হইতে আসিতেছে, মস্তিষ্ক বেশ সতেজ, হৃদয় উদ্দীপ্ত সুতরাং স্নেহের কষ্টের কথা তুলিয়া তাহার সুখের উপায় স্বরূপ পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়ার আবশ্যকতা তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল, মনের আবেগে যুক্তিদ্বার বেশ উদ্ঘাটিত হইয়া গেল।

পুত্রের যুক্তি,—ন্যায়পরতা,—করুণা ভাব দেখিয়া জগৎ বাবু মনে মনে তাহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন, অথচ তাহার প্রস্তাব-অনুযায়ী কাজ করিতে তাঁহার বল কোথা? সাহস কোথা? একদিন ছিল বটে, যখন জগৎ বাবু—এইরূপ উদারতায় উত্তেজিত হইয়া সমাজের বিরুদ্ধাচরণে মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন এই প্রৌঢ় বয়সে মনের সে উদারভাবই বা কোথায়? এখন বিধবা বিবাহ দিবার কথাও তিনি মনে আনিতে পারেন না। আজন্ম সংস্কার সূত্র—তাঁহার মনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে এরূপ জটিল ভাবে বিজড়িত হইয়াছে—যে সে সূত্র ছিন্ন করিতে গেলে তাঁহার হৃদয় ছিন্ন হইয়া যায়। স্নেহলতাকে যে বিবাহ করিয়াছিল—সে যেন তাহার ধন—তাঁহার কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছে মাত্র, তাহাকে অন্যের হস্তে সমর্পণ করিলে পরলোক হইতেও সে যেন তাহার দাবী করিবে। তিনি বলিলেন—"চারু বিবাহ কি দুবার হয়?"

চারু বলিল "অনেক বিবাহই সংসারে দুবার হয়। কেবল অনাথা নিরাশ্রয় বলিয়া বলপূর্ব্বক কি তাহাদিগকে—তাহাদের সুখের পথে যাইতে বাধা দিব? তাহা ছাড়া—স্নেহের পূর্ব্বের বিবাহ বিবাহই নয়।"

জগৎ বাবু বলিলেন—"স্নেহ নিজে কি কিছু বলিয়াছে? তাহার কি বিবাহে ইচ্ছা আছে?"

চারু। "না সে এরূপ কথা বলে নাই—আমি বলিতেছি।"

জগৎ বাবু যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন—বলিলেন—"আচ্ছা তবে ও কথা থাক আমি বিবেচনা করিব এখন।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চারু টগরকে বকিয়া বাহিরে গেল, টগর স্নেহলতার নিকটে আসিয়া কাঁদিয়া কহিল—

"দাদাকে আমার নামে কি লাগিয়েছিস?"

স্নেহলতা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"কই আমি ত কিছুই বলি নাই।"

টগর বলিল—"বলি নাই বই কি? আমাকে কত বকলেন তার ঠিক নেই—আমার যেন তোদের নামে মায়ের কাছে লাগান ছাড়া আর কর্ম্ম নেই! কেন তোর হয়ে মায়ের সঙ্গে এতক্ষণ লড়াই করলে কে? নেমক হারাম!

স্নেহলতা বলিল—"চারুর সঙ্গে আমার এর মধ্যে দেখাই বা কখন হোল—যে আমি বলব?"

টগর সে কথা বিশ্বাস করিল না, তাহার মিথ্যা বলিতে বড় একটা মুখে বাধে না, সুতরাং অন্যেও যে এরূপ সময় সত্য বলিবে—ইহাতে তাহার বিশ্বাস নাই। সে বলিল—"তুই বলিসনি—তবে কি আকাশ থেকে লোক বলতে এসেছিল? তোর জন্য আমার কোথাও নিস্তার নেই—শ্বশুরবাড়ী যাব, সেখানেও তোর জন্যে গঞ্জনা; সেদিন শাশুড়ি উনুন ধরাতে বলেছিলেন—তা উনুন ধরান কি আমার কর্ম্ম! চিরকাল লেখাপড়া করে এলুম, এখন কিনা বাটনা বাটব, আর উনুন ধরাব! তাই বলেছিলুম বলে শাশুড়ি কত কথা শুনিয়ে দিলেন, বল্লেন "বড়বৌমার মত লক্ষ্মী মেয়ে আর হবে না, ঐ রকম মেয়েতেই যেন লেখাপড়া শেখে।

সেখানে ত এইরূপ পোড়া জ্বালা, বাপের বাড়ী এসে দুদণ্ড জুড়ব, তাও হবার যো নেই। আমার বাপ আমার ভাই, এরা ত আর আমার কেউ নয়! তা তুই ই এখানে রাজত্বি কর, আমি চল্লুম।"

স্নেহলতা যদিও তিরস্কার অনাদরের মধ্যেই পালিত, কড়াকথা তাহার দৈনিক সম্ভাষণ,

সুতরাং দৈনিক কাজকর্ম্মের অনুষ্ঠানের ক্রটির ছুতানাতায় সে যে নিয়মিত আটপৌরে তিরস্কার পায় তাহাতে সে বড় একটা কাতর নহে—কেননা তাহাতে সে অভ্যস্ত,—কিন্তু মাঝে মাঝে সাদর পার্ব্বণী স্বরূপ যখনি সে এইরূপ পোষাকী মর্ম্মঘাতী ভৎসনা উপহার লাভ করে তখন তাহার বুকে বড়ই বাজে। তখন জগৎ বাবুর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া তাহার চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে, কেন তাহার মত হতভাগিনীর জন্য জগৎ বাবুর আপনার লোকের মনোবেদনা!

বিশেষ আজ গৃহিণীর তীব্র বাক্যজ্বালা এখনো সে ভুলিতে পারে নাই, তাঁহার উপর আবার এই লবণ ব্যবস্থায় সে বড়ই কাতর হইয়া পড়িল।

টগর বকিতে বকিতে চলিয়া গেল—স্নেহলতা নীরবে মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতে লাগিল।

সন্ধ্যাকাল মেঘমুক্ত আকাশে চন্দ্র উঠিয়াছে, কিন্তু জ্যোৎস্না হিমময় ম্লান, স্নেহের অশ্রুমুখ দেখিয়া জ্যোৎস্নাও যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। মুক্ত বাতায়নে চাঁদের আলোতে বসিয়া স্নেহ কাতর প্রাণে কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকে ডাকিতেছিল। সংসারে নিরাশ্রয় কে? যাহার কেহ নাই তাহার স্বয়ং ভগবান আছেন।

এই সময় হারার মা "দিদি বাবু কি হচ্ছে" বলিতে বলিতে গৃহ প্রবেশ করিল— স্নেহলতা তাড়াতাড়ি অশ্রু মুছিল। দাসী স্নেহের নিকটে মেঝের উপর পা ছড়াইয়া আরামে বসিয়া বলিল "এই দিদিমণি, এতক্ষণ পাট সেরে একটু দাঁড়াবার অবসর পেনু, আবার না ডাকে! বলব কি এই উনকুটি চৌষট্টি সব বামনীর হাতের কাছে বয়ে দিয়ে এয়েছি—তবু দেখনা আবার ডাক পড়ে,—তা পড়ুক আমি আর এখন যাব না, দিদি বাবু একবার রামায়ণখানা পড়না শুনি।"

হারার মার কথা শেষ না হইতে টগর আসিয়া উপস্থিত হইল, জানালায় দাঁড়াইয়া বলিল, "আঃ কেমন জ্যোৎস্না! ছেলের ঘর, আমার ত আর জানালা খোলার যো নেই'।

বলিয়া স্নেহের কাছে বসিল। কিছু পূর্ব্বে স্নেহের সঙ্গে সে যে ঝগড়া করিয়া গিয়াছে তাহার ভাবে কিছু মাত্র সে লক্ষণ প্রকাশ পাইল না—যেন কিছুই হয় নাই। স্নেহের ভাব তাহার নজরেও পড়িল না। তাহার মনে তখন একটা কথা গজগজ করিতেছিল, সে বসিয়াই বলিল—"দেখ ভাই দাদা যখন আমাকে বকছিলেন এমন মদের বার হচ্ছিল, দাদা ভাই বেশ মদ ধরেছে।" কথাটা শুনিবা মাত্র স্নেহলতা বিব্রত হইয়া পড়িল—নিজের কষ্ট দুঃখ ভুলিয়া গেল। ঘরে হারার মা—কি করিয়া কথাটা বন্ধ করিবে ভাবিয়া পাইল না, তাড়াতাড়ি বলিল "ঠাকুর পো এসেছেন?"

টগর বলিল—"অনেকক্ষণ। কাল আমাকে নিয়ে যেতে চাচ্চে যে"

দাসী বলিল "দিদি বাবুকে এমনি ভাল বাসেন যে একদিন বুঝি ছেড়ে থাকতে পারেন না? এই ত গা সেদিন আসছ!"

নেপথ্যে ডাক পড়িল "ও হারার মা কোথায় গেলি শীঘ্র আয়।" হারার মা বিরক্ত হইয়া বলিল "আ মলো ঐ ডাকছে—দুদণ্ডও বোসতেও দেবেনা"—দাসী চলিয়া গেল।

টগর বলিল "হ্যাঁ ভালবাসা ত কত! ভালবাসা কেবল পড়ার বেলা, না পড়লেই মুখ ভার করবে। একদিন যদি এসে দেখে দিনে ঘুমোচ্ছি অমনি তাহলে বলবে আলসেমি ভাল নয়,—এ সব বুঝি ভালবাসা!

স্নেহলতা। সে তোর ভালর জন্যই বলেন, ওতে ত আরো ভালবাসা টের পাওয়া যাচ্ছে।"

টগর। তবে তোর সঙ্গে হোলে ঠিক হোত। আমার যা ইচ্ছা তা করতে না দিলে আমার ভালবাসা মনে হয় না। কেন ক্ষীরর স্বামী, ক্ষীরকে ত কিছু বলেনা—সে যা ইচ্ছা করে। দেখনা দোকতা খাব তা টিকটিক করবে, টিবেটা কিনা সেদিন ফেলে দিলে; তা সামনে না পারি লুকিয়ে খেলে কি করবে?

স্নেহ। ওরকম লুকিয়ে কাজ করা কি ভাল?

টগর। না করব না! তোর ইচ্ছা হয় তুই করিসনে।"

স্নেহলতা দেখিল তাহাকে বুঝান বৃথা। সে ওকথা ছাড়িয়া বলিল "তা ভাই যা ইচ্ছা তুই করিস কিন্তু একটা কথা বলি শুনবি।" কথাটা শুনিবার জন্য টগর কুতূহল হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল—"শুনব বল।

স্নেহ বলিল—কথাটা রাখবি আগে বল—

টগর বলিল—হ্যাঁলো হ্যাঁ।

স্নেহ বলিল—ঘরে দাসী ছিল তার কাছে বল্লি দাদার মুখে মদের গন্ধ—ওরকম কি বলে? আমাকে কড়ার দে কারো কাছে আর ও কথা বলবিনে।" টগর শুনিয়া খুব খানিকটা খিল খিল করিয়া হাসিল, হাসিয়া বলিল "কেন তাতে কি হয়?"

স্নেহ। চারুর নামে মিথ্যা একটা বদনাম উঠবে সেটা কি ভাল? বাস্তবিক চারু ত আর মদ খান না।"

টগর। তবে গন্ধ কোথা থেকে এল?

স্নেহ। হয়ত ডাক্তার খানার কোন ওষুধ হাতে ঘেঁটে থাকবেন। আর যদি বা খেয়ে থাকেন ত লোকের কাছে ওরূপ করে বলা কি ভাল? তার চেয়ে যাতে তিনি না খান সেই চেষ্টা করা উচিত।"

টগর বলিল—"অত কিসে কি হয় আমি বুঝিনে—তুই বাবু এত বুঝিস।"

স্নেহ বলিল—"আচ্ছা সে যা হক্ তুই বল আর কাউকে বলবিনে"?

সে একটু টেপাহাসি হাসিয়া বলিল "আচ্ছা বলবনা।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

টগর স্নেহকে কথা দিল—"আচ্ছা বলিব না" কিন্তু ঘরে আসিয়া জীবনকে দেখিয়াই বলিল—"আহ্লাদে পণা দেখে আর বাঁচিনে!"

জীবন বলিল—"কার?"

টগর—"শোন না; দাদার মুখে মদের গন্ধ পেয়েছিলুম—বলতে কনেদিদির প্রাণে আর সইল না—বলে 'কাউকে বলবিনে'—কথা নিয়ে তবে ঠাণ্ডা; আমার চেয়ে দাদা যেন তারি আপনার—দরদ দেখে আর বাঁচিনে!"

জীবন বলিল—"সত্যি চারু মদ ধরেছে!"

টগর। তা পুরুষ বেটাছেলে—সবাই কি তোমার মত কাটখোট্টা হবে নাকি? ধরেছে ত হয়েছে কি? স্ত্রী নেই একটা ত উপলক্ষি চাই"।

জীবনের ঝগড়া করা অভিপ্রায় নাই—ইহার উপর একটা কথা কহিলে ঝগড়া বাধে—সুতরাং জীবন চুপ করিয়া গেল। পরদিন বিকালে অবসর খুঁজিয়া চারুকে বলিল—"একি—শুনছি চারু, তুমি নাকি মদ ধরেছ?" চারু সহসা একটু থতমত খাইয়া গেল—তাহার পর হাসিয়া বলিল—"কে বল্লে?

জীবন বলিল—যেই বলুক না—কথাটা সত্য কি না তুমিই বল না?

চারু বলিল—আপনি দেখছি কথাটা নেহাৎ Seriously নিয়েছেন—বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কখনো এক আধ গ্লাস খাওয়া কি আর মদ খাওয়া?

জীবন। কিশোরীও এক সময় ঐ বলত, তাপর শুনতে পাই তার মদ নইলে আর চলে না। তুমি কথাটা যতটা সহজ ভাবে দেখছ—জিনিস টা ত আর তত সহজ নয়। মদের মত সর্বনেশে জিনিষ আর নেই—মানুষকে পশুর অধম করে ফেলে। তা ছাড়া, ভেবে দেখ কথাটা তোমার বাপ মার কাণে উঠলে তাঁরা কতখানি কষ্ট পাবেন।"

চারু। যা হক এ সব বাজে কথা আপনার কাছে আসে কি করে?

জীবন। "টগর আমাকে বলছিল,"

চারু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"টগর? সে কি করে জানলে?"

জীবন। "তোমার মুখে বুঝি গন্ধ পেয়েছিল"—

চারু চিন্তাযুক্ত হইল, টগর যখন জানিয়াছে তখন কথাটা যে তাহার পিতা মাতার কর্ণে না উঠিতে পারে এমন নহে;—সে ব্যগ্রভাবে বলিল—"জীবনদা টগরকে বলবেন যেন কাউকে সে কথাটা না বলে, কিশোরী দা সেদিন এক গ্লাস খাইয়ে দিয়েছিলেন বটে—তা আর আমি সেদিকে যাচ্ছিনে, কিন্তু আপনি দেখবেন যেন টগর"—

জীবন। বোঠান যদিও তাকে আগেই বারণ করেছেন—আচ্ছা আমি আবার বারণ করব এখন—

চারু। বোঠান—স্নেহ? সেও কি জানে নাকি?

জীবন। হ্যাঁ টগরের কাছে তিনি শুনেছেন, শুনেই তিনি টগরকে কড়ার করিয়ে নিয়েছেন—যে সে কাউকে যেন না বলে। দেখ তুমি নিজের জন্য যত না ভাব অন্যে তোমার জন্য তার বেশী ভাবে।"

কথাটা চারুর হৃদয়ে প্রবেশ করিল। জীবন তাহাকে বিধিমত প্রকারে উপদেশ দিতে ত্রুটি করিলেন না—কিন্তু তিনি যখন চলিয়া গেলেন, তখন তাহার আর কোন কথা মনে রহিল না, কেবল ঐ কথাই মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিল। চারু আর সেদিন বাহিরে গেল না, সন্ধ্যা হইলে বহির্বাটীর দক্ষিণের খোলা ছাতে আসিয়া বসিল। জ্যোৎস্নাদীপ্ত স্বপ্নময় দৃশ্য সম্মুখে করিয়া চারু অন্য মনে সেই কথাই ভাবিতে লাগিল,—'স্নেহলতা তাহার জন্য এতদূর ভাবে? তাহার নিন্দা শুনিলে স্নেহের অতদূর প্রাণে বাজে? স্নেহ কি তবে তাহাকে ভাল বাসে?" বাল্যকাল হইতে স্নেহের সহিত একত্র বাস করিয়া কখনো একথা চারুর মনে হয় নাই, আজ সহসা এই জিজ্ঞাসায় সন্দেহে বিশ্বাসে চারুর মন আন্দোলিত হইতে লাগিল, ইহার উত্তরে স্নেহলতা তাহাকে ভালবাসে কি না সে তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না—কেবল ইহা বুঝিল সে নিজে তাহাকে ভাল বাসে—আজ হইতে নহে, মুহূর্ত্তে নহে, আজীবন চির দিন ধরিয়া সে তাহাকে ভাল বাসিয়া আসিতেছে। যে দিন স্নেহ প্রথম তাহাদের বাড়ী আসে, সেদিন ঠাকুর মা তাহার 'কণে' আনিয়া দেখাইলে তাহার কিরূপ আহ্লাদ হইয়াছিল, স্নেহ তাহার সহিত কথা না কহিলে তাহার সহিত খেলা করিতে সঙ্কোচ করিলে তাহার কিরূপ মন খারাপ হইয়া যাইত, চারুর একবার অসুখ করিয়াছিল, স্নেহ তাহার বিছানার কাছে বসিয়া অশ্রু পূর্ণ নেত্রে কিরূপ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, স্নেহ কাছ হইতে উঠিয়া গেলে চারু কিরূপ বিরক্ত হইত, এই সকল নানা কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে সে আপনার ২৫ বৎসরের লুকায়িত জীবন ভাবকে সহসা আবিষ্কৃত করিয়া ফেলিল। স্নেহের চির পুরাতন স্নেহময় কোমল মূর্ত্তি আজ তাহার কল্পনা চক্ষে নূতন বিস্ময়, নূতন আনন্দ, নূতন ভাবের তরঙ্গ তুলিল, সুখের কল্পনায়, নূতন স্বপ্নাবেশে বাহিরের দৃশ্য তাহার নিকট লুকাইয়া পড়িল। একটু পরে চারু উঠিল, তাহার পূর্ণ হৃদয় লইয়া একাকী এখানে বসিয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। স্নেহলতা তখন তাহার গৃহের সামনের ছোট বারান্দায় বেঞ্চে বসিয়াছিল—চারু সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ধ্যার পর চারু প্রায় বাড়ী ভিতর আসিত না, সুতরাং তাহাকে দেখিয়া স্নেহ যুগপৎ আনন্দ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। চারু বেঞ্চের একধারে বসিলে সে বলিল—"দেখ কেমন চাঁদ উঠেছে।"—

চারু বলিল "হ্যাঁ" কিন্তু কোন চাঁদের উদ্দেশে সে যে এই কথাটা বলিল, তাহা ঠিক বুঝা গেলনা, কেননা সে আকাশের দিকে না চাহিয়া স্নেহলতার দিকেই চাহিয়া রহিল।

আমাদের ত মনে হইতেছে—সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে স্নেহলতার সেই মধুর মুখে সে জগতের সৌন্দর্য্য সমাবেশ দেখিতে পাইল, আকাশে শত চন্দ্র একত্র উঠিলেও তখন তাহার মুগ্ধনেত্র আর সে দিকে ফিরিত না। চারু স্নেহের দিকে চাহিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, স্নেহলতা ততক্ষণ নত মুখে ভাবিতে লাগিল কি করিয়া চারুকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইতস্ততঃ করিয়া শেষে সহসা বলিল—"চারু একটা কথা বলব ? কিছু মনে করবে না ?"

চারু। না, কি বল না ?" সে আঁচলের খুঁটটা পাকাইতে পাকাইতে তেমনি নত মুখেই বলিল—"আমাকে ঠিক করে বলো চারু, তুমি কি মদ খেয়েছিলে ?"

চারু বলিল—"তোমাকে মিথ্যা বলব না, হ্যাঁ।"

স্নেহের চোখ ছল ছল করিয়া আসিল, সে বলিল—"আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় নি, তুমি না বল্লে বিশ্বাস হোত না। কেন চারু তুমি এমন কাজ কর ?"

চারু বলিল—"মদ খেলেই কি আর দোষ হয় ? বেশী খেলে বটে খারাপ; কিন্তু অল্প স্বল্প খেলে একটু বেশ নির্দ্দোষ আমোদ ছাড়া কোনই মন্দ ফল হয় না ;"

স্নেহ ! কিন্তু মদ যে ধরে সেইত উৎসন্ন যায়, পশুর মত হয়ে পড়ে।"

চারু। তুমি যেমন শোন। অপব্যবহার না করলে সবই উপভোগ করা যায় !"

স্নেহ। কিন্তু লোকে ত তা বোঝে না—কেউ শুনলে কিরূপ নিন্দা করবে ? আর মেশমশায় শুনলে কত কষ্ট পাবেন ?

চারু। লোকের কথা ছেড়ে দাও, ভাল কাজ করলেও ত তারা অনেক সময় নিন্দে করে। তবে বাবা, তা তিনি কি করে জানবেন ?

স্নেহ। যদি জানেন তাহলে ত কষ্ট হবে। তাঁকে লুকিয়ে ত তোমার একাজ করতে হচ্ছে, যে কাজ লুকিয়ে করতে হয় সেটা কি করা ভাল ? তিনি মনে জানছেন তুমি মদ ছোঁও না ; তাঁকে সেই ভুলে রেখে দিচ্ছ—এটা কি ছলনা নয় ?

স্নেহ। আমরা সংসারে এমন শতসহস্র কাজ করি—যা লুকিয়ে করতে হয়—ওরূপ ছলনার হাত থেকে মানুষ এড়াতে পারে না।"

স্নেহের চোখ দিয়া বড় বড় দুই ফোঁটা জল পড়িল, সে বলিল "চারু তোমার মুখে ওরূপ কথা শুনতে আমার বড় কষ্ট হয়, মানুষের কি করতে হয় না হয় জানিনে, কিন্তু তুমি—"

চারু বলিল "স্নেহ আর বলতে হবে না, তোমার যাতে কষ্ট হয় এমন কাজ আর আমি করব না, আমি আর মদ খাব না।"

স্নেহের সমস্ত মুখে, এক অপরিমিত আনন্দ জ্যোতি বিভাসিত হইয়া উঠিল, চারু বুঝিল স্নেহ তাহাকে ভাল বাসে !

স্বপনে !

এমনি মধুর কাল,
সাঁঝের অলক জাল
ছড়াইয়া পড়েছিল দিনের বদনে,
আকাশে একটি তারা,
হইয়া আপনা হারা,
চেয়ে ছিল ধরা পানে করুণ নয়নে।
এমনি পুষ্পিত বনে,
মৃদু মধু সমীরণে
স্বপনে কাহার গান পশেছিল কানে,
কত যে কি আকুলতা,
কত সুখ, কত ব্যথা,
শুনে সে মধুর গাথা জেগেছিল প্রাণে !
কি যেন কি মোহে ভুলে,
ফুটন্ত মাধবী মূলে
দু বিন্দু নয়ন বারি প'ড়েছিল ঝ'রে,
একটি লুকানো আশা,
একটি অস্ফুট ভাষা,
ফুটিতে অধর প্রান্তে গিয়াছিল ম'রে !
আজ, পুনঃ সেই ফুল বনে,
বসি' সেই ধরাসনে,
স্বপনের সেই কথা প'ড়িতেছে মনে,
চোখে আধ তন্দ্রা ঘোর,
স্মৃতিতে পরাণ ভোর,
কি এক নূতন সুর বাজিছে মরমে !
কেমন কেমন ধারা,
উদাস পাগল পারা,
হ'য়ে গেছে হৃদি খানি একটি স্বপনে,
কাহার অচেনা তান,
মধুর মদির গান,
মনে প'ড়ে শুধু জল আসিছে নয়নে !

শ্রীবিনয়কুমারী বসু।

ফুল কেন ভাল বাসি ?

তখনও ছিল কিছু যামিনীর ঘোর,
তখনও ভাল ক'রে হয় নাই ভোর।
সেই পুষ্পপুরে, সেই মাসীর ভবনে,
ছিনু ভোর শৈশবের গোলাপি স্বপনে !
রন্ধন গৃহের দিকে, আঙিনার মাঝে,
রাজিত শিউলি তরু অপরূপ সাজে।
চারি বরষের শিশু ছিলাম তখন।
এক দিন নিশাশেষে, না জানি কারণ,
গেলাম সে উঠানেতে ; শিউলির তলে
জোছনা হাসিতেছিল বসিয়া বিরলে !
তখনো ছিল গো কিছু রজনীর ঘোর,
তখনও ভাল ক'রে হয় নাই ভোর।
তরু হতে নেমে এল সুন্দরী অপ্সরী,
শিশুটির কর ধরি, গুণ গুণ করি,
কি মন্ত্র পড়িয়া দিল প্রাণেতে তাহার,
খুলে গেল ধীরি ধীরি প্রাণের দুয়ার !
অমনি হইল চিত্ত, হাসিময়, পুষ্পময়,
অতুল মাধুরীময়, সুরভি কবিতাময় !
তরুটির শাখ হ'তে ফুলগুলি ঝরি ঝরি,
শিশুটির প্রাণমাঝে পশেগেল ধীরি ধীরি !
এখনো আছে সে ফুল প্রাণের মরম মাঝে,
পাতে পাতে এখনও অতুল সৌন্দর্য্য রাজে।

তাই গো এখনো প্রাণ, হাসিময়, পুষ্পময়,
অপূর্ব্ব মাধুরীময়, সুরভি কবিতাময় !

অদ্ভুত—অভিসার।

মাধবের মন্ত্রসিদ্ধ মোহন মুরলী
ধ্বনিল রাধার চিত্ত নিকুঞ্জ মোহনে ;—
অমনি রাধার আত্মা দ্রুত গেল চলি
শ্যামতীর্থে, শ্যামাঙ্গিনী-যমুনা-সদনে।
গেল রাধা ; তবে ওই মন্থর গমনে
মঞ্জুল-বকুল-কুঞ্জে, কে যায় গো চলি ?
উড়িয়া বসিছে অলি গুঞ্জরি গুঞ্জরি ;
বিহ্বলা মেখলা চুম্বে চরণের তল!
আগে আত্মা, পরে দেহ, যাইছে তুহার,
রাধিকারে বলিহারি তোর অভিসার !
আকুল দুকুল ; ম্লান কুন্তল, কাঁচলি ;
ঘুম যেন লেগে আছে নিঝুম লোচনে !
নাহি জ্ঞান, নাহি সাড়া, টানে তরুদল
লুণ্ঠিত অঞ্চল ধরি ; মুখ পদ্মোপরি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

যদি হাসি চাও।

১

রাশিরাশি হলাহল সংসারের জ্বালা
তা হতে রহিতে দূরে যদি চাস বালা —
ত্যজো তবে ঐ বিন্দু-সুধা আকিঞ্চন,
প্রণয়ের পূর্ব্বরাগ প্রথম চুম্বন।

২

লভিতে চাও গো যদি আনন্দের হাসি,
খুঁজোনা তা অপরের মিলন পাথারে —
অকূল বিরহ স্রোতে শুধু যাবে ভাসি
প্রিয়ানন মরীচিকা ক্রমে দূর-দূরে।

৩

যদি বালা পেতে চাস—রোদনের সুখ,
প্রিয় বুকে মাথা রেখে চেয়োনা তাহারে,
কোমল সলিল ভারে ভেঙ্গে যাবে বুক,
আদর চাহিতে শুধু পাবে অনাদরে।

৪

হাসি-মুখ চাও যদি শোন তবে বালা,
দেখ ঐ দম্পতির মূর্ত্ত-ঝালাপালা !
সুখ যদি চাও, ছাড় ও সুখের তার,
হাস, যদি নাহি চাও ঐ কারাগার।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

কুড়ান।*

"কি রামধন বাবু, এবার তোমার ছেলে পাশ হলে কি করবে ?"

রাম। "তা এখন বলতে পারিনে,—তবে বড়মানুষের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলে হয়।"

---

* গতবারের ভৌগোলিক প্রশ্নের উত্তর।

কোন্নগর। কলিকাতা। যশোহর। ঢাকা। ভোজপুর। বেলুচিস্থান। দ্বারভাঙ্গা। রুষিয়া। আসাম। করুণা বা দয়ারামপুর।

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ রায় ও হরিভক্ত চট্টোপাধ্যায় ৯টি, বিপিনবিহারী ভৌমিক ও রামলাল ঘোষাল ৮টি, ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং প্রিয়নাথ ঘোষ ৭টি, তারকনাথ রায় এবং শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবী ৬টি প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

স্থানাভাবে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভৌমিকের ভৌগোলিক প্রশ্ন সমূহ ভারতীতে প্রকাশিত হইল না।

যাঁহারা প্রশ্ন পাঠাইবেন—সেই সঙ্গে উত্তরগুলিও সম্পাদিকাকে পাঠাইতে হইবে।

"দেখ দর্জি, শীঘ্র আমার একটা চাপকান করে দিতে হবে, তবে দামটা এখন দিতে পারব না,—তিন হপ্তা পরে মাইনে বার হলেই দেব। কবে চাপকানটা আনবে বল দেখি?"

দরজি। আজ্ঞে, এই হপ্তা তিন পরেই আনব।

স্বামী বিলাত যাত্রা করিবেন—

রোরুদ্যমানা স্ত্রী। বিশেষ সাবধানে থেকো—দেখো যেন জাহাজ থেকে পড়ে যেয়ো না।

স্বামী। তার জন্য ভাবনা নেই।

স্ত্রী। আর যদি জাহাজ ভেঙ্গে যায়—কি কিছু হয় ত অমনি টেলিগ্রাফে খবর দিয়ো,—মাথা খ'ও আমার এই কথাটি মনে রেখো।

দুই সম্পাদকে ঝগড়া চলিতেছে—

প্রথম। "যে লোক পাঁচ বছর আগে একটা মড়াখেকো গাধায় চড়ে বেড়াত; তার কাছে আর কি প্রত্যাশা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়। সহযোগী যা বলেছেন সত্য—পাঁচ বছর আগে মড়াখেকো গাধায় চড়ে বেড়াতুম বটে; কিন্তু সে গাধাটার যে এমন স্মরণ শক্তি আছে—তা জানতুম না।

একজন উকীল অন্য উকীলের প্রতি—

"ও লোকটা কে? তোমাকে যে নমস্কার করলে? দেখলে ত নেহাৎ গরীব মনে হয়—কিছু ভিক্ষা চায় বুঝি?"

দ্বিতীয় উকীল। ও আগে আমার একজন মক্কেল ছিল।

ময়রার স্ত্রী। হ্যা দ্যাখো—বাবুদের চাকর হরি চুরি করে পালিয়েছে।

ময়রা। সত্যি নাকি! তা তার কাছে আমার যে সন্দেশের ঢের দাম পাওনা আছে। হায় হায়! আগে যদি জানতুম যে সে এমন করে ফাঁকি দেবে—তা হলে তার কাছে সন্দেশে সের করা চার পয়সা করে বেশী ধার চড়াতুম।

ভদ্রলোক। (গাড়ী চড়িয়া) গাড়োয়ান, শীঘ্র গাড়ী হাঁকিয়ে দে, আমার বড় তাড়াতাড়ি, ১০ মিনিটে না পৌঁছলে নয়।

গাড়োয়ান। আপনি কোথায় যাবেন?

ভদ্রলোক। তোর সে খবরে কি দরকার?

মহাযজ্ঞের নিমন্ত্রণ।

বিগত পঞ্চম মহাযজ্ঞের উপসংহারকালে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে এ বৎসর বঙ্গদেশে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির পুনরধিবেশন এবং ষষ্ঠ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে। বঙ্গভূমির সুসন্তান শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় স্বদেশবাসিগণের প্রাতভূস্বরূপ সমবেত প্রতিনিধিগণকে বঙ্গদেশে শুভাগমন পূর্ব্বক মহাযজ্ঞে যোগদান করিতে সানন্দে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বঙ্গের কোন্ স্থানে আগামী মহাযজ্ঞের আয়োজন হইবে তাহা তৎকালে স্থিরনির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কিন্তু উহার কিছুদিন পরেই সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল যে দ্বিতীয় মহাযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা-ভূমি বৃটিশ রাজধানী সুবিখ্যাত কলিকাতা নগরে উহার মঙ্গলময় অনুষ্ঠান হইবে। পঞ্চম মহাযজ্ঞের পর দেখিতে দেখিতে আট মাস ভারতবাসীর কত শত সুখ দুঃখের অতীত ঘটনা বক্ষে লইয়া কালসাগরে নিমগ্ন হইল, 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' পবিত্র জন্মভূমির যথাবিধি পূজার দিন আবার নিকটবর্ত্তী হইতেছে; আর তিন মাস পরে ১১ই পৌষ তারিখে উহা আরম্ভ হইবে। সহৃদয় পাঠক, স্বদেশবাসী প্রিয় ভাই ভগিনী, আজি আমরা উৎসাহ পূর্ণ হৃদয়ে, সানন্দ অন্তরে আপনাদিগের নিকট উক্ত পবিত্র দিনের শুভ আগমনবার্ত্তা ঘোষণা এবং উক্ত মহাপূজার অনুষ্ঠানে যোগদানার্থে নিমন্ত্রণ করিতে উপস্থিত হইলাম। 'ভারতীর' সহিত ভারতীয় জাতীয় মহাযজ্ঞের একান্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ—ভারতীর উপাসকগণ বিগত কতিপয় বর্ষ প্রিয়তম স্বদেশবাসিগণের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে উহার গৌরব ও মহত্ব প্রচারে যত্নবান আছেন।

গত তিন বৎসর বিভিন্ন দূরদেশে উহার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, এবার আমাদের নিজ গৃহে উহার আয়োজন হইতেছে, তজ্জন্যেই আমাদের এত উৎসাহ এত আনন্দ। এস ভাই, এস বোন, যাহার যেরূপ ক্ষমতা, আমরা সকলে তদনুরূপ পূজার উপকরণ লইয়া জননীর পবিত্র চরণে ভক্তিভরে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হই। মাতৃপূজার এমন সুযোগ হয়ত আবার শীঘ্র উপস্থিত না হইতে পারে; এমন শুভদিন যেন আমাদের অবহেলা ও উপেক্ষায় পর্য্যবসিত না হয়।

শুভদিনে শুভক্ষণে কতিপয় স্বদেশপ্রেমিক সুসন্তান পরদুঃখ-কাতর মহাযোগী হিউমের সুমন্ত্রণা-পরিচালিত হইয়া বোম্বাইনগরে মাতৃ পূজার প্রথম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বৎসরের যে সময় ধরাতলে বিশ্বপ্রেমিক ত্যাজ্রীণ মহাসন্ন্যাসীর পবিত্র জন্মোৎসব বিঘোষিত হয়, বিগত ১৮৮৫ খৃষ্ট অব্দের ঠিক সেই সময়ে সভ্যতার আদি জননী, অধঃপতিত ভারতভূমির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিশুষ্ক কঙ্কালরাশি একত্র আহরণ পূর্ব্বক মন্ত্রৌষধ প্রয়োগে উহার হৃত গৌরব ও বিগত শ্রী পুনরুদ্ধারের জন্য

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে মাতৃপূজার প্রথম মঙ্গল-ঘট স্থাপিত হয়। সূক্ষ্মদর্শী ঐতিহাসিকের পক্ষপাতশূন্য সুস্পষ্টভাষী কঠোর লেখনী এবং সহৃদয় কবির কুসুম সুকোমল প্রাণারাম-কল্পতুলিকা তুল্যাংশে পরম সমাদরে চিরদিন এই মহা সাধনার প্রকৃত গৌরব বিস্তার করিবে।

যে সকল স্বদেশানুরাগী সুসন্তান মাতৃ পূজার অনুষ্ঠান জন্য প্রথমে বোম্বাই নগরে একপ্রাণে মিলিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের হৃদয় কতবার বিষাদময় সন্দেহে আন্দোলিত হইয়াছিল—শত শত বর্ষের কঠোর অধীনতার দুর্ভেদ্য অন্ধকারে যে দেশের মুখমণ্ডল কলঙ্কের কালিমায় সমাচ্ছন্ন, ঘৃণিত ক্ষতিলাভ গণনাই যে দেশের মনুষ্যসমাজের প্রধানতম শিক্ষা, কূট স্বার্থই যে দেশের নরনারীবর্গের হৃদয়ের একমাত্র উপাস্য দেবতা, অন্তঃসারশূন্য ভোগ-বিলাস-মত্ততা যেদেশে মনুষ্যত্ব নামে সমাদৃত, স্বার্থ ত্যাগের পরিবর্ত্তে আত্মপ্রতিষ্ঠাই যেখানে সম্মানের চিহ্ন, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, ঘৃণা দ্বেষ, ঈর্ষা ও উৎপীড়নই যে দেশে স্বজাতিপ্রেমের জীবন্ত পরিচয়, যে দেশের এক ভ্রাতা বিদেশীর চরণে দলিত ও নিষ্পেষিত হইলে অপর ভ্রাতা সেই চরণে পুষ্পাঞ্জলি দানে কৃতার্থ হয়, এবং স্বীয় উন্নতি কামনায় যে দেশের ক্ষীণপ্রাণ মনুষ্যগণ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পূর্ব্বক নিতান্ত আত্মীয় বন্ধুকেও বিদেশীয়ের নিকট লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত করিতে কিছু মাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না, সেই হতভাগ্য দেশে এই মহাপূজা সম্মান লাভ করিয়া কিছুকাল স্থায়ী হইবে কি না, এই সন্দেহে তাঁহারা বড়ই আকুল হইয়াছিলেন। মাতৃ পূজার দ্বিতীয় বৎসর হইতে তাঁহাদের সন্দেহ অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। কম কান্তি প্রাতঃসূর্য্যের অর্দ্ধ-বিকশিত মনোমুগ্ধকর কিরণ-মালা যেমন ধীরে ধীরে সুবিশাল জগতকে আলোকিত ও আশ্বস্ত করে, তাঁহাদের দ্বিতীয় বর্ষের যত্ন ও উদ্যম তেমনই সমস্ত শিক্ষিত জগতের দূরদর্শী লোকদিগের হৃদয় অনেক পরিমাণে সন্দেহ পরিশূন্য ও আশান্বিত করিয়াছে। এই সময় হইতেই জাতীয় মহা-সমিতির মঙ্গলময় উদার উদ্দেশ্যনিচয় দেশ দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইতেছে, এই সময় হইতেই সমগ্র ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান তদ্বিষয়ক বিরাট আন্দোলনে আন্দোলিত হইতেছে, এবং এই সময় হইতেই দিন দিন শত শত প্রতিভাশালী সুদক্ষ ভারত-সন্তান উহার গৌরব বর্দ্ধন ও উদ্দেশ্য সংসাধনে কৃতসংকল্প হইতেছেন!

এই অদৃষ্টপূর্ব্ব জাতীয় মহাযজ্ঞ ছলগ্রাহী, ছিদ্রান্বেষী, স্বার্থান্ধ বিদেশীয়গণ এবং স্বদেশ-দ্রোহী ক্ষীণপ্রাণ মনুষ্যবর্গের কঠোর সমালোচনারূপ অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এখন সভ্য জগতের চারিদিকে স্বকীয় অনিবার্য্য প্রভাব বিস্তার করিতেছে। মান্দ্রাজ নগরে তৃতীয় মহাযজ্ঞ অবাধে সুসম্পাদিত হইলে পর চতুর্থ মহাযজ্ঞের সম্মুখে কত বাধা, কত বিঘ্ন ও কতই অসুবিধা উপস্থাপিত হইয়াছিল—দেশের প্রধান প্রধান শাসনকর্ত্তা ও রাজকর্ম্মচারিগণের সমবেত শক্তি উহার শুভ উদ্দেশ্য বিফল

করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল—অনেকে গম্ভীর স্বরে উহার নিন্দাবাদ পূর্ব্বক উহার অনুষ্ঠাতৃগণকে কতই বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু দেবতার আশীর্ব্বাদে সমস্তবাধা ও সমুদায় বিভীষিকা হইতে বিমুক্ত হইয়া ভারতীয় চতুর্থ মহাযজ্ঞ পুণ্যতীর্থ ত্রিবেণী-সঙ্গম-স্থলে মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। সেই সময় হইতে ভারত-গগণ মেঘ পরিশূন্য হইয়া সুবিমল কান্তি ধারণ করিয়াছে—সেই দিন হইতে জাতীয় মহাযজ্ঞের প্রতিকূলে আর ভীম প্রভঞ্জন প্রবাহিত হইতে দেখা যায় না—সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে বিষাক্ত বায়ুর অত্যল্প বিকাশ অনুভূত হইলেও উহা তাপ দগ্ধ হৃদয়ে শূন্যমার্গে বিলীন হইয়া যাইতেছে, সুতরাং তাহা হইতে বিন্দুমাত্র অনিষ্ট সাধিত হয় নাই। অনুকূল অবস্থার গুণে সে দিন জাতীয় মহাযজ্ঞের জন্মভূমি সুপ্রসিদ্ধ বোম্বাই নগরে যেরূপ মহোৎসাহ পূর্ণ সমারোহে, ষোড়শোপচারে পঞ্চম মহাযজ্ঞ সুসম্পাদিত হইয়াছিল তাহা মনে হইলে কোন স্বদেশপ্রেমিকের হৃদয় অপার বিস্ময় ও অতুল আনন্দের সংমিশ্রন জনিত এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে উদ্বেলিত না হয়?

পঞ্চম মহাযজ্ঞের অধিনায়কবর্গ অভীষ্টসিদ্ধির জন্য একটী নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। গত চারি বৎসরের অভিজ্ঞতা তাঁহাদিগকে এই শিক্ষা দান করিয়াছে যে, জাতীয় আন্দোলন কেবল মাত্র ভারত-ক্ষেত্রে সংরুদ্ধ থাকিলে অচিরে কোন বিশেষ শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। যে প্রবল শক্তিশালী দেশের হস্তে ভারতের শাসন-দণ্ড শোভা পাইতেছে, ভারতভূমির উত্থান ও পতন এবং ভারতবাসীর অদৃষ্টের শুভাশুভ যে দেশের কৃপা-কটাক্ষের উপর নির্ভর করিতেছে, স্বাধীনতার লীলাস্থল সেই মহা পরাক্রমশালী দেশে উক্ত আন্দোলন-স্রোত প্রসারিত না হইলে জাতীয় সমিতির উদ্দেশ্য সাধন সহজ হইবে না। ভারতবাসী যতই কেন স্বাবলম্বন ও আত্ম-নির্ভরতা গুণের অধিকারী হইয়া আপনার পদে ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইতে শিক্ষা করুন না, তাঁহাদের বাস্তুভূমি ভারতবর্ষ এক্ষণে আর তাঁহাদের আয়ত্তাধীন নহে—উহার অস্থি, মজ্জা, রক্ত, মাংস সর্ব্বস্বই এক্ষণে বীরভূমি বৃটেনিয়ার। এক্ষণে ভারতের যদি কিছু মাত্র আশা ও ভরসা থাকে তাহা ঐ সুসন্তান প্রসবিনী, অনন্ত গৌরবশালিনী বৃটেনিয়ার—সহৃদয় সন্তানের উদারতা ও অনুগ্রহ ভিন্ন ভারত ভূমির পুনর্জীবন লাভের আশা বিড়ম্বনা মাত্র! বৃটেনিয়ার যে সকল প্রতিভাশালী সুদক্ষ লোকের হস্তে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত, তাঁহারা ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা বিষয়ে একান্ত অনভিজ্ঞ, এবং ভারতে সুশাসন-প্রথা প্রবর্ত্তন পক্ষে নিতান্ত উদাসীন; তাঁহারা স্বদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় লইয়া এত ব্যস্ত যে তাঁহাদের অধীনস্থ একটী সুবিশাল দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ২৫ কোটি নরনারীর সুখ দুঃখের বিষয় আলোচনা করিতে তাঁহাদের অবসর নাই, যাঁহার অবসর আছে তাঁহারও তদ্বিষয়ক প্রবৃত্তির অভাব। ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা তাঁহাদের নিকট সম্যক্রূপে জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহাদের নিদ্রিত সহানুভূতির চৈতন্য সম্পাদন ও প্রকৃত

সহায়তা আকর্ষণে স্বদেশের উন্নতি সাধন অভিপ্রায়ে বিগত পঞ্চম মহাযজ্ঞের অধিনায়কগণ বৃটেনিয়ায় কতিপয় সুযোগ্য প্রতিনিধি প্রেরণ যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছিলেন। অল্পদিন হইল সেই সকল নির্দ্দিষ্ট প্রতিনিধির মধ্যে কেহ কেহ তথায় গমন পূর্ব্বক একান্ত পরিশ্রম ও দক্ষতার সহিত স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। চারি বৎসরের যত্নে যে ফল না জন্মিয়াছিল মহাসমিতির পঞ্চমবর্ষের যত্নে সেই ফল আশার অতিরিক্ত পরিমাণে উৎপাদিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে ভারতীয় অবস্থার বিষয় আন্দোলন জন্য প্রতিনিধি প্রেরণপ্রথা নূতন নহে; ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে সুবক্তা শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ ভারত সভার প্রতিনিধি স্বরূপ ইংলণ্ডে গমন করিয়া অভিলষিত বিষয়ে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই; কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে সমগ্র ভারতের একপ্রাণভূত বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লক্ষ লক্ষ সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া ইতিপূর্ব্বে তথায় স্বদেশের কল্যাণার্থে আর কখনও এককালে অনেকগুলি সুযোগ্য প্রতিনিধি প্রেরিত হন নাই। ভারতের কোটি কোটি নির্ব্বাক প্রজাপুঞ্জের মুখস্বরূপ জাতীয় মহাসমিতি হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া যাঁহারা ইংলণ্ডে গমন পূর্ব্বক বিপুল উৎসাহ ও একান্ত দক্ষতা সহকারে স্ব স্ব অভিলষিত কার্য্য সাধন করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পরিচয় দান অনাবশ্যক। অতঃপর প্রতিবর্ষে এইরূপ দলবদ্ধ ভাবে প্রতিনিধিগণ বিশেষ ত্যাগ স্বীকার পূর্ব্বক ইংলণ্ডে গমন করিয়া স্বদেশের কল্যাণ সাধনে জাতীয় মহাযজ্ঞের মঙ্গলময় উদ্দেশ্য সফল করিতে সর্ব্বান্তঃকরণে যত্নবান হইবেন, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

গত পাঁচ বৎসরের জাতীয় মহাযজ্ঞ একাদিক্রমে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে এবং অধিকতর সমারোহে সুসম্পাদিত হইয়াছে; এক্ষণে ষষ্ঠ মহাযজ্ঞের দিন আগত প্রায়। "সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা" বঙ্গভূমির প্রধান নগর সমৃদ্ধিশালিনী কলিকাতায় উহার অনুষ্ঠান হইবে। ষষ্ঠ বর্ষের যত্ন ও উদ্যম বিগত পাঁচ বর্ষের একত্রীভূত যত্ন ও উদ্যমকে পশ্চাতে ফেলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুশৃঙ্খলা ও সমারোহের সহিত আগামী মহাযজ্ঞ সম্পাদিত না করিলে বঙ্গভূমির পক্ষে দুরপনেয় কলঙ্ক।

ষষ্ঠ মহাযজ্ঞের কৃতকার্য্যতার উপর মহাসমিতির ভবিষ্যৎ আশা অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে; এই শুভ সংবাদ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, ও আসামের প্রতিগৃহে প্রচারিত হউক। যিনি স্বদেশের দুরবস্থা এক দিনের জন্যও ব্যথিত হৃদয়ে নির্জ্জনে চিন্তা করিয়াছেন, স্বজাতীয় দুর্গতির বিষয় আলোচনা করিয়া বিনিঃ ক্ষণকালের জন্য ও দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে লোকচক্ষুর অগোচরে মর্ম্মস্থল হইতে ধীরে ধীরে অনন্ত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরাশার অশ্রুজল মোচন

করিয়াছেন, তাঁহারা এই সময় হইতেই মাতৃপূজার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন—যে মায়ের এত কোটি সন্তান তাঁহার পূজার কিসের ভাবনা? যাহার যেরূপ ক্ষমতা তিনি তদনুরূপ উপকরণ লইয়া মাতৃপূজার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসুন। অর্থ উপদেশ বা ব্যবস্থা এবং শারীরিক পরিশ্রম, যাহা যাঁহার সাধ্যায়ত্ত, তিনি অযাচিতভাবে অকাতরে তাহাই দান করিয়া ষোড়শোপচারে জননীর পূজার যথা বিহিত অনুষ্ঠান করুন। আর বঙ্গদেশের আশা ও গৌরবের স্থল, লক্ষ্মীর বরপুত্র সদৃশ ধনশালী মহাশয়গণ, আপনারাও কি এ সময় নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম থাকিবেন? এই মহা সুযোগে আপনারাও কি মাতৃপূজায় মুক্তহস্তে যথাসাধ্য অর্থ দান করিয়া আপনাদের ধন-গৌরবের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন না? আপনাদের পুঞ্জীকৃত অর্থ কত দিকে অজস্রধারে ব্যয়িত হইতেছে—অসার আমোদ-প্রমোদ, ভোগ-বিলাস এবং সাংসারিক ক্রিয়াকলাপে আপনারা কত অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতেছেন, আর স্বদেশের অক্ষয় সুখ-শান্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাযজ্ঞে আপনারা যথাসাধ্য অর্থ দান করিতে কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হইবেন, এ কথা মনে হইলেও হৃদয় বড়ই ব্যথিত হয়।

চির দিন কাহারও সমান যায় না, এবং ধন, মান, প্রভুতা ও পদমর্য্যাদা কখনই কাহারও চিরস্থায়ী নহে; একমাত্র কীর্ত্তিই এ জগতে অবিনশ্বর। "কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি;" যিনি এই মৃত্যুর জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া যাইতে পারেন, তিনি মরিয়াও চিরকাল জীবিত থাকেন—অমর ইতিহাস উজ্জ্বল সুবর্ণাক্ষরে চিরদিন তাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ ঘোষণ করিতে থাকে। স্বদেশের সেবা ও স্বজাতির কল্যাণ সাধনের ন্যায় পুণ্যকার্য্য পুণ্যকীর্ত্তি এজগতে আর কি আছে?

কতদেশ মরিয়া পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে; ভারত ভূমিই কি কেবল চিরকাল মৃতবৎ নিস্পন্দ, অচল ও অটল ভাবে পড়িয়া রহিবে? ইটালী, স্কট্‌ল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ সকল মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হইয়াও পুনরায় নবজীবন লাভ করিয়াছে। রায়েঞ্জী, ম্যাজিনি, গ্যারিবল্ডি ও ক্যাভুর প্রভৃতি স্বদেশ প্রেমিক ক্ষণজন্মা মনস্বী বর্গের মহা সাধনায় পুণ্যভূমি ইটালী ঘোর দুর্দিনেও সুখের সুদিন অবলোকন করিয়াছে; বীরবর ওয়ালেস্ ও উইলিয়ম টেল্ প্রভৃতি খ্যাতনামা মহাত্মাগণের অলন্ত ত্যাগ স্বীকার প্রভাবে স্কট্‌ল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ডের ললাট-কলঙ্ক প্রক্ষালিত হইয়াছে—ইঁহারা বিন্দু বিন্দু করিয়া হৃদয়শোণিত তর্পণে জন্মভূমির মৃতদেহে জীবনী দান করিয়াছিলেন। পুণ্যাত্মা ফ্রাঙ্কলিন্, জেফারসন্ ও ক্ষণজন্মা ওয়াসিংটন্ ও তদীয় মন্ত্রশিষ্যগণের কঠোর উদ্দীপনা পূর্ণ দীক্ষা প্রভাবে নব আমেরিকা অতুল ঐশ্বর্য্য ও অনন্তগৌরবশালিনী হইয়াছে। সংসার-বিরাগী যোগ-রত রবার্ট এমেটের অত্যাশ্চর্য্য শিক্ষা এবং তাহা হইতেও আশ্চর্য্যতর

দৃষ্টান্ত প্রভাবে ও'কনেল্ প্রভৃতি মহাত্মাগণ প্রবল পরাক্রম শালী ভূস্বামীদিগের নিষ্ঠুর অত্যাচার হইতে আয়র্ল্যাণ্ডকে রক্ষা করিবার জন্য কতই কঠোর আত্ম-নিগ্রহ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের পদ-চিহ্ন অনুসরণ পূর্ব্বক আয়র্ল্যাণ্ডের বর্ত্তমান প্রধাননেতা পার্ণেল্ এবং ও' ব্রায়েন্ প্রভৃতি মহা পুরুষগণ জাতীয় সমাজে স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিবার অভিপ্রায়ে কতই কঠোর সাধনার পরিচয় দান করিতেছেন।

বহুদিনের বিস্তর সাধনার ফল স্বরূপ ভারতের জীর্ণোদ্ধার ও গৌরব বর্দ্ধন কামনার দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলনে আজি এই যে জাতীয় সজীবতা ও একপ্রাণতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, স্বদেশের কৃতবিদ্য ও ধনশালী মহাশয়গণের আস্থা, অনুরাগ, যত্ন ও সহায়তা অভাবে তাহাও কি নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে? এই শোচনীয় বিড়ম্বনার কথা মনে হইলেও সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে! সভ্য জগতের ইতিহাসে পরাক্রমশালী জাতিগণের অভ্যুদয় ও উন্নতির বিষয় পাঠ করিয়াও কি চৈতন্য জন্মিবেনা? যে ইংলণ্ড আজি ভারতের অদৃষ্ট-বিধাতা রূপে সর্ব্বত্র পূজিত, তাহার বর্ত্তমান উন্নতিইতিহাস পাঠেও কি আমরা স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিষয়ক কোন শিক্ষা পাই নাই? ঊনবিংশশত বর্ষ পূর্ব্বে ইংলণ্ডের অবস্থা কি ছিল, আর আজিই বা কি হইয়াছে? যৎকালে ভারত-সন্তান শান্তির পবিত্র নিকেতন স্বরূপ নিভৃত তপোবনে, বিজন গিরি-গুহা অথবা কোন স্রোতস্বতীর মন-মুগ্ধকর সৈকত-ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে পরমার্থ-তত্বের জটিল চিন্তায় নিমগ্ন রহিতেন, অথবা সামাজিক দুরূহ সমস্যার মীমাংসার জন্য বিবিধ শাস্ত্রানুশীলনে ব্যাপৃত রহিতেন, তখন ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ অর্দ্ধ মনুষ্যের ন্যায় নিতান্ত অসভ্যবেশে কদর্য্য মৃণ্ময় কুটীরে বাস ও অর্দ্ধ দগ্ধ মাংস ও বন্য ফল মূল ভক্ষণে উদর পূর্ণ করিত, এবং নীল পীত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণে সর্ব্বাঙ্গ চিত্রিত করিয়া সর্ব্বদা আত্ম-কলহ ও আত্ম-বিচ্ছেদে একতার একশেষ প্রদর্শন, এবং ধর্ম্মের সিংহাসনে 'ড্রুইড্—ভূত-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেব-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিত! সংক্ষেপতঃ ভারতবর্ষ যখন উন্নতির উচ্চসীমায় উপনীত হইয়াছিল, ইংলণ্ড তখন নিবিড় অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন এবং ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ বন্য মনুষ্যের ন্যায় নিতান্ত হীনভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু নিয়তির কি বিচিত্রগতি! কাল-চক্রের পরিবর্ত্তনে সেই ব্রিটানিয়া আজি সসাগরা পৃথিবীর সাম্রাজ্ঞী। আজি ইংলণ্ডের সভ্যতা, জ্ঞান-গরিমা, ঐশ্বর্য্য, পরাক্রম ও প্রভু শক্তির তুলনা কোথায়? সেই অনন্তর অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন ইংলণ্ড কিরূপে কীর্ত্তি-শৈলের সমুচ্চ শিখরে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইল? ইতিহাস সুস্পষ্ট ভাষায় এই নির্দ্দেশ করে যে একদিনে অথবা একজনের যত্নে ইংলণ্ডের সৌভাগ্য-শ্রী এরূপ পরিবর্দ্ধিত হয় নাই—প্রাচীন গ্রীস্ ও রোমের নিকট হইতে ধীরে শিক্ষা লাভ করিয়া শত শত বর্ষের কঠোর সাধনায়, শত শত বর্ষের অগণ্য ত্যাগ-স্বীকার প্রভাবে এবং

শত শত হৃদয়ের অত্যুষ্ণ শোণিত তর্পণে ইংলণ্ডের এই অভাবনীয় অভ্যুদয় ও বৈভব সাধিত হইয়াছে।

খৃষ্টের আবির্ভাব সময় হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ-কাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কোন বিশেষ উন্নতির লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই। বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন বংশীয় লুণ্ঠনশীল ব্যক্তিগণের উপপ্লবে এই দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। ১২১৫ খৃঃ অব্দ হইতে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান উন্নতির সূত্রপাত হয়। ইংলণ্ডের তদানীন্তন নৃপতি-কলঙ্ক জনের অত্যাচারে উৎপীড়িত দল-বদ্ধ 'ব্যারণ' শ্রেণী অত্যাচারী রাজ-শক্তি চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে ১২১৫ খৃঃ অব্দের জুনমাসে যেদিন পরমেশ্বর ও ধর্ম্ম মন্দিরের নাম লইয়া রাণিমিড্ ক্ষেত্রে নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে ভীতি-প্রদর্শন পূর্ব্বক দুর্ব্বৃত্ত ভূপতিকে জাতীয় স্বাধীনতা ও সুখ-শান্তির ভিত্তি-ভূমি 'ম্যাগ্না চার্টা' সনন্দ স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিয়াছিল; সেই দিন হইতেই ইংলণ্ডের সৌভাগ্যের প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল। তৎপরে চারি শত বর্ষের কত ধর্ম্মনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন খরতরবেগে ইংলণ্ডের বক্ষের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে—ধর্ম্ম ও সমাজ-নীতির নামে কত অন্তর্বিপ্লব ও শোণিতপাতের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের তদানীন্তন অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়াছে। তদনন্তর কুশাসন জন পুনরায় ১৬৪১ খৃঃ অব্দে রাজ-শক্তির সহিত সমবেত প্রজা-শক্তির ঘোর সংঘর্ষণে প্রথম চার্লসের ক্ষমতা ধ্বংশ করিবার জন্য স্বাধীনতাপ্রিয় পরাক্রমশালী ক্রম্‌ওয়েল্ ও তদীয় প্রিয় অনুচর বর্গ ১৬৪১ খৃঃ অব্দে সমরবেশে সজ্জিত হইয়া রাজকীয় শক্তির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। নির্ব্বোধ চার্লস্ স্বীয় গ্রহ-বৈগুণ্যবশতঃ ১৬৪২ খৃঃ অব্দের ৪ঠা জানুয়ারি স্বাধীনতার প্রিয়উপাসক সুপ্রসিদ্ধ পিম্, হ্যাম্‌ডেন্ প্রভৃতি মনস্বীগণকে বৃটিশ সাধারণ মন্ত্র ভবন (House of common) হইতে বন্দীভাবে লাঞ্ছিত করিবার অভিপ্রায়ে ৫০০ অস্ত্রধারী সৈন্যের সাহত পার্লামেণ্টে উপস্থিত হইলেন। এই সময় হইতে একাদিক্রমে সাত বৎসর কাল রাজায় প্রজায় ঘোরতর বিবাদ চলিতে লাগিল। ক্রমে ১৬৪৯ খৃঃ অব্দের ৩০শে জানুয়ারি বিজয়োন্মত্ত প্রজাবর্গের সম্মুখে রাজ-মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। সেই হইতে আর অন্যূন দুই শত বর্ষের শিক্ষা ও সাধনাজনিত জাতীয় একতা ও আন্দোলন, সংযোজন ও সংগঠন-প্রভাবে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান চরমোৎকর্ষ ও অতুলনীয় গৌরব জন্মিয়াছে।

এই শান্তিময় যুগে আমাদিগকে ইংলণ্ডের ন্যায় কঠোরতম সাধনায় দীক্ষিত হইয়া জাতীয় মহত্ব লাভের জন্য রাজকীয় শক্তির বিরুদ্ধে উত্থান করিতে হইবে না—ইংলণ্ডের প্রদত্ত উদার শিক্ষা ও তৎ প্রদর্শিত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রভাবে স্বজাতির শ্রীবৃদ্ধি সাধনোদ্দেশে দেশ মধ্যে যে জাতীয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে, আমরা যদি তাহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করি, তাহা হইলে আমরা সহজেই অভি-

লক্ষিত উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইব। অতএব আমরা কৃতাঞ্জলিপুটে, সকাতরে, বিনীতভাবে সহৃদয় স্বদেশবাসিগণকে আগামী ষষ্ঠ মহাযজ্ঞে একপ্রাণে উৎসাহ ও সহায়তা দানার্থে নিমন্ত্রণ করিতেছি—অর্থে হউক, পরিশ্রমে হউক, অথবা সুদুপদেশ দানে হউক, যাঁহার যে রূপ ক্ষমতা, তিনি তদনুসারে মহাযজ্ঞের যথোপযুক্ত আয়োজনে যত্নবান হউন, এবং যাহাতে উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়—প্রতি-বর্ষে যাহাতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উহার যথাবিহিত আয়োজন হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে সর্ব্বপ্রযত্নে উদ্যোগী হউন। মান্দ্রাজ দক্ষতার সহিত স্বকর্ত্তব্য পালন করিয়াছে, এলাহাবাদ বিশেষ সুখ্যাতির সহিত স্বীয় গুরুতর কার্য্য-ভার সম্পাদন করিয়াছে এবং বোম্বাই সমারোহে স্বকার্য্য সাধনে একান্ত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে; এ বৎসর বঙ্গদেশের পালা। শিক্ষাভিমানী বঙ্গদেশের প্রতি এবার গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ভর করিতেছে। ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম মহাযজ্ঞে বঙ্গদেশীয় প্রতিনিধিগণের প্রতি যে রূপ সম্মানের সহিত আতিথ্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, এবার বঙ্গ সন্তানগণকে নানা দূর দেশ হইতে সমাগত বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সহস্র সহস্র প্রতিনিধিগণকে তাহার পর্য্যাপ্তপরিমাণে প্রতিদান দিতে হইবে। যিনি যেখানে আছেন ছুটিয়া আসিয়া এই সুমহৎ অনুষ্ঠানে যোগদান করুন। আর একাল পর্য্যন্ত যে সকল কৃতবিদ্য অথবা ধনশালী বঙ্গ-সন্তান উহার প্রতি অনাস্থা, অনাদর এবং বৈরীভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাও আজ জন্মভূমির অনুরোধে এই শুভানুষ্ঠানে উৎসাহ দান করুন।

অধঃপতিত ভারতের হিতের জন্য ইতিপূর্ব্বে অনেক অনুষ্ঠান হইয়াছিল, কিন্তু যথার্থ উদ্দীপনাপূর্ণ সাধনার অভাবে একটীও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই—সমস্তই কিছুদিনের পর জল-বুদ্বুদের ন্যায় দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় জাতীয়-মহাসমিতি ভারতবাসীর হিতসাধন পক্ষে একটী অভূতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য বিষয়—উহা বৃটিশ গবর্ণমেন্টের গৌরবময় সুশাসনের উজ্জ্বল ফল—উহার অনুষ্ঠিত বার্ষিক মহাযজ্ঞ শিক্ষিত ভারতবাসীর পক্ষে সুনির্ব্বচনীয় গৌরবের বিষয়।

আইস, সকলে মিলিয়া নীচ স্বার্থ ও তুচ্ছ অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া সাধ্যানুসারে জননী জন্মভূমির যথাযোগ্য পূজার আয়োজন করিয়া কৃতার্থ হই। ইংলণ্ডের অনুগ্রহ ও উদারতায় যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, সকলে মিলিয়া সভ্য জগতে সেই সুশিক্ষার পরিচয় দান করি—দেশ দেশান্তরে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের সুযশ-গৌরব পরিব্যাপ্ত হউক। আমরা দিব্য চক্ষে জন্মভূমির অভ্যুদয়ের সুদিন নিকটবর্ত্তী দেখিতে পাইতেছি। অমানিশার গভীর অন্ধকারের পর পৌর্ণমাসীর তরল জ্যোৎস্না-তরঙ্গ যেমন অনিবার্য্য প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপ দগ্ধ দুর্ব্বিসহ গ্রীষ্মের পর প্রাণ-প্রদ বর্ষার

সুশীতল বারিধারা যেমন অনিবারণীয়, পতনের পর উত্থান এবং দুঃখের পর সুখ তেমনই অবশ্যম্ভাবী। আমরা অবলম্বিতপথে স্থিরপদে একপ্রাণে দণ্ডায়মান থাকিলে মঙ্গলময় বিধাতার অনুগ্রহে ভারতভূমির সৌভাগ্য-তপন আবার অচিরে সুচারু ছটায় সমুদিত হইয়া সমুদায় সভ্যজগৎকে আলোকিত ও আশ্বস্ত করিবে। ঐ শুন, আশার মধুরমুরলী কি অপরূপ প্রাণারাম মোহন স্বরে নিনাদিত হইয়া সুষুপ্ত-ভারতের হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি রূপ উৎফুল্ল ও সতেজ করিতেছে! এস ভাই, এস বোন, মাতৃপূজার দিন ক্রমশঃ নিকটস্থ হইতেছে — আমরা এই সময় হইতে উহার যথাবিহিত আয়োজনে বদ্ধপরিকর হই। ঐ শুন নিশীথকালে নিদ্রামগ্ন প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুমধুর কণ্ঠে কে গাইতেছে, "বন্দে মাতরম্" !

উদাসীন।

ষ্টার থিয়েটার।

আমরা সেদিন ষ্টার থিয়েটারে "চণ্ড" অভিনয় দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। রাজস্থানের একটী ঐতিহাসিক উপন্যাস লইয়া নাটকখানি রচিত। চিতোরের ভূত-পূর্ব্ব মহারাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ডেরই রাজ সিংহাসন পাইবার কথা কিন্তু পিতার কোন সময়ের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হেতু বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বালক মকুলজীকে সিংহাসনে বসাইয়া চণ্ড স্বয়ং রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। চণ্ডের সুশৃঙ্খল রাজ্য শাসনের সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিল। রাঠোর রাজদুহিতা মুকুলজীর মাতা গুঞ্জমালা সপত্নী তনয়ের যশঃ গৌরবে স্থির থাকিতে পারিলেন না—মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া চণ্ডকে চিতোর হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। মুকুলজীর ধাত্রী এই সময়ে গুঞ্জমালাকে অনেক সদুপদেশ দিয়াছিল কিন্তু সে সব কথা কোন ফলোদায়ক হইল না।

রাঠোর রাজ রণমল্ল চিতোরে আসিয়া রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। রাঠোর-দিগের অত্যাচারে চিতোর অস্থির হইয়া উঠিল। বিলাস পরায়ণ স্বার্থপর রাঠোর-রাজ চিতোরের রাজ সিংহাসন আত্মসাৎ করিবার জন্য মুকুলকে বিষপানে গোপনে হত্যা করিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ এই সব কথা গুঞ্জমালার শ্রুতিগোচর হইল তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। বিশ্বাসী ধাত্রী, যাহার কথা গুঞ্জ-মালা একবার অবহেলা করিয়াছিলেন এখন তাহারই শরণাপন্ন হইয়া পূর্ণরাম ভট্ট দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিয়া চণ্ডকে পুনরায় নগরে থাকিতে অনুরোধ করিলেন।

চণ্ড আহেরী সৈন্য সহায়ে অনেক রকম সুকৌশল দ্বারা চিতোরে প্রবেশ করিয়া

কত মলয়ের গান, বিহগের মধু তান,
কত জোছনার হাসি পূর্ণ নভস্থল ;
জীবনের প্রতি পলে কত সুখ দে'ছে ঢেলে,
অতীত-স্মৃতির হারে নিবদ্ধ সকল।
যাহাদের ঋণ লয়ে এ প্রাণ চলেছে বয়ে,
তারা যদি কোন দিন চায় প্রতিদান ;
অনন্তের পানে চাহি বিরাম সঙ্গীত গাহি
সেই প্রাণ করিবে কি কটুবিষ পান ?

আমি রমণী। (কাব্য) একজন সরলা রমণীর জীবনের দুঃখ কাহিনী। বইখানি সহজ ভাষায় অনাড়ম্বর ভাবে লিখিত, বলিয়া ইহার বেশ একটি সরল-মাধুর্য্য আছে।

দার্জ্জিলি ভ্রমণ। (A guide to Darjeeling) লেখকের নাম নাই। দারজিলিংএর মোটামুটি বিবরণ ইহাতে সবই আছে। তাহা ছাড়া কাঞ্চনজঙ্ঘার একটি দৃশ্যও ইহাতে আছে। দার্জ্জিলিং যাত্রীগণের ইহা কাজে লাগিবে।

প্রেমবন্ধন বা কবিতার বিবাহ। নটেন্দ্রভূষণ মজুমদার প্রণীত। বইখানির একটি বিশেষ গুণ এই, ইহা পড়িলে না হাসিয়া থাকা যায় না। লেখকের নায়িকা বিরহ-বিধুরা কবিতা, সখীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া আঙ্গুল চুষিতে চুষিতে চাঁদের মুখ পানে চাহিয়া থাকেন,—পূর্ণিমা (কবিতার সখী) কবিতার মুখখানি ধরিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে তাহার সহিত কথা কহেন,—কবিতার মুখের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চকোর সুধা পান করেন—কবিতা ফুঁদিয়া চকোরা তাড়াইতে চাঁদের মুখ হইতে মেঘ অপসৃত করেন,—চাতকিনী উড়িতে উড়িতে কবিতার বুকে পড়িয়া বুকে বসিয়া ঠোঁটে তুলিয়া তুলিয়া চোখের ধারা পান করেন,—বকের ঝাঁক কবিতার মস্তকোপরি উড়িতে উড়িতে ডানা দিয়া কবিতাকে বাতাস দেন,—রাজহংসীদল কবিতাকে ঠোঁট বাড়াইয়া চুম্বন করিতে করিতে পদ্মগ্রাস তাহার মুখে তুলিয়া দেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহার উদ্ধৃত করিতে গেলে অনেক উদ্ধৃত করিতে হয়—যাঁহারা ইচ্ছা করেন বই খানি পাঠ করিবেন।

প্রাপ্তিস্বীকার।

আমরা আহ্লাদের সহিত ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে জানাইতেছি যে ত্রিপুরার শ্রীযুক্তা ফয়জন্নেষা চৌধুরাণী নবাবসাহেবা সখিসমিতির সাহায্যার্থে ২০০ শত টাকা দান করিয়াছেন। বঙ্গদেশে ইঁহার ন্যায় ধনশালী কত রাণী মহারাণী আছেন, কিন্তু কুচবেহারের মহারাণী সুনীতি, কাশিম বাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী এবং নলডাঙ্গার রাণী পতিতপাবনী ব্যতীত এ পর্য্যন্ত কেহই সমিতির প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া দেশের অনাথাদিগের সাহায্যে অগ্রসর হন নাই। নবাব সাহেবা একজন মুসলমান রমণী; তিনি বিনা-প্রার্থনায় অযাচিত ভাবে সমিতির শুভ উদ্দেশ্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া আপনার যে উদার করুণার পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহাতে সমিতি আনন্দ বিস্ময়ে পূর্ণ। আশা করি বঙ্গদেশের রাণী মহারাণীগণ ইঁহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া সমিতির মঙ্গল সাধিত করিবেন।

সুরধুনী।

বারাণসী—বরণা ও অসি নামক সরিতের মধ্যবর্ত্তী স্থান বর্ত্তমান কাশী নগরী। পূর্ব্বে বরণার বাম পারে এক্ষণে যেখানে সারনাথ প্রভৃতি স্থান, সেইখানে প্রাচীন কাশী ছিল। শাক্যমুনি প্রথমে এই খানেই আপন মত প্রচার করেন। নিজ জ্ঞানের উন্নতি করিয়া নির্ব্বাণ লাভ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কালক্রমে এই স্থানে মরিতে পারিলেই নির্ব্বাণ লাভ হইবে ইহাই বিশ্বাস দাঁড়াইল। তখন বরণার দক্ষিণ পারে জনপদ হইয়াছে। পৌরাণিক সময় উপস্থিত পাশুপৎ মন্দিরে নগর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ড যোজিত হইল। দিগ্‌দেশ হইতে কাশীধামে শরীর ত্যাগ করিবার জন্য বহুলোকের সমাগম হইতে লাগিল। কেহ বা ক্ষেত্র সন্ন্যাস করিলেন। তাঁহারা কাশী ছাড়িয়া আর অন্যত্র যাইতে পারিবেন না। যাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় আছে, তিনি প্রতিগ্রহ করেন না। অন্যে যদি ভোজনের নিমন্ত্রণ করে বা কোনও উপহার দেয়, তাহা গ্রহণ করেন না। সর্ব্ববিধায়ে নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করাই অভিপ্রেত হইয়া দাঁড়ায়। ডফরিণ সেতুর উত্তর বরণা সঙ্গমের পর মাতাজীর আশ্রম। কলিকাতার বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর এই আশ্রমপদ উত্তম পিল্লা দ্বারা বাঁধাইয়া দিয়াছেন। আমাদের নৌকা যখন ঘাটে পৌঁছিল, মাতাজী তখন গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। আগন্তুক দেখিয়া প্রসন্নমুখে তিরোহিত হইলেন। উপরে উঠিয়া দেখি, তিনি বৃক্ষমূলে নামাবলী গায়ে দিয়া জপমালা হস্তে বসিয়া আছেন। প্রবীণ বয়স, বিধবার বেশ, সৌম্যদর্শন এবং বচনে দাম্ভিকতা নাই। তিনি কহিলেন, যোগ এক্ষণে পণ্য দ্রব্যের মত সুলভ হইয়া পড়িয়াছে। কর্ণেল অলকট একটী উপকার করিয়াছেন, আমরা কহিলে দেশীয় ইংরাজি শিক্ষিত লোক স্বধর্ম্ম ও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগী হইতেন না, কিন্তু কর্ণেল কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া তাহাতে আস্থাবান হইয়াছেন। মাতাজীর নাম মনমন বাই। তিনি গুজরাতি নাগর ব্রাহ্মণ-কন্যা। আশৈশব কাশীতে আছেন। পিতার নিকট যোগ শিক্ষা করিয়াছেন। এই আশ্রম এক জন পেশয়া সন্ন্যাসী কর্তৃক স্থাপিত হয়। মাতাজীর পিতা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্য হন। ইনি স্ত্রীলোক বলিয়া সন্ন্যাসের অধিকারী নহেন। এজন্য গুরুর চীবর চিত্রপার্শ্বে পুটবদ্ধ করিয়া রক্ষিত হইয়াছে। যোগমঠ শাস্ত্রীয় প্রণালী ক্রমে নির্ম্মিত হইয়াছে। ভূগর্ভে পর পর তিনটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। সাধক অগ্রে প্রথমটীতে প্রাণায়াম অভ্যাস করেন, তদনন্তর প্রথমটীর কবাট বদ্ধ করিয়া দ্বিতীয়ে ক্রমশঃ বায়ুধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইলে, নির্ব্বাত তৃতীয় কোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া সাধন করেন। জীবিতের দেহতত্ত্ব বিদ্যা অনুসারে শোণিত শরীরাভ্যন্তরে প্রবাহিত হইয়া

আপন কার্য্য নির্ব্বাহ পূর্ব্বক পোষণানুপযুক্ত হইয়া পড়ে, এবং নানা অপরিষ্কার পদার্থ ইহাতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সকল অপরিষ্কার পদার্থ মধ্যে কার্বণিক অ্যাসিড্ নামক বায়ু অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকে বহির্গত করিয়া অক্সিজেন বায়ু শোণিত মধ্যে আনয়ন করা শ্বাস ক্রিয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য। কুম্ভক করিলে ঐ কার্বণিক বায়ু বহির্গত হইতে পারে না, এজন্য যোগীদিগকে এমন আহার বিহার অবলম্বন করিতে হয়, যাহাতে কার্বণিক অ্যাসিড্ অধিক পরিমাণে না জন্মে। আর কুম্ভকের অবস্থায় চৈতন্য রহিত হইয়া পড়ে ও শোণিত প্রবাহ স্থগিত হয়, সুতরাং তখন শ্বাস ক্রিয়া বন্ধ থাকায় বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু যে সকল যোগী বহুদিন অচেতন অবস্থায় ছিলেন দেখা গিয়াছে, তাঁহাদের শরীর কোনও প্রকারে রক্ষা পাইয়াছে মাত্র; বল বা কান্তি লুপ্ত হইয়াছিল। কোন কোন পশু আছে যাহারা ছয় মাস নিদ্রা যায়। মানুষেরও এমন পীড়া হইতে দেখা গিয়াছে. তিন মাস অনাহারে নিদ্রাভিভূত ছিল। যোগারূঢ় ব্যক্তি ঐরূপ অবস্থা আনয়ন করিতে পারেন। তাহা বলিয়া তাঁহাদের যে অমানুষিক দৈবী ক্ষমতা জন্মে, এমন বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। এই অভ্যাসের ফল এই মাত্র যে নিবৃত্তি মার্গের পথিকের পক্ষে চিত্তবৃত্তি নিরোধ সুখের বিষয় হয়। একজন থিয়সফিষ্ট কহিয়াছিলেন মাতাজী তিব্বত দেশীয় এক মহাত্মা অর্থাৎ লামা, এক্ষণে স্ত্রী শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

গাজিপুর। মাতাজীর আশ্রম হইতে ১৮ ক্রোশ দূরে "পবহারী" বাবার আশ্রম। ১৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী সমেনা গ্রাম নিবাসী নারায়ণ দাস তেওয়ারি নিজ পিতৃব্য কর্ত্তৃক স্থাপিত রামানন্দী দেব কুটীরে আসিয়া কয়েক বৎসর কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করত তীর্থ পর্য্যটনে গমন করেন। সেতুবন্ধ রামেশ্বর, দ্বারকা প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করতঃ পাঁচ ছয় বৎসর পরে যোগ অভ্যাস করিয়া যখন প্রত্যাগত হন, তখন তাঁহার পিতৃব্য গত হইয়াছেন। তিনি সেই পর্ণকুটীর খর্পর আচ্ছাদিত করিয়া তদভ্যন্তরে মৃত্তিকা স্তূপের মধ্যে গুহা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সাধনা আরম্ভ করিয়া "পবহারী বাবা" নাম প্রাপ্ত হইলেন। এক্ষণে লক্ষ্মণ ঠিকেদার মঠ সংলগ্ন প্রাচীর ও কয়েকটী চিমনি শোভিত উচ্চ ইষ্টকালয় প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। বাবাজী দেখা দেন না। বন্ধ দ্বারের ভিতর পিঠ হইতে বহিস্থ লোকের সহিত কথা কন—চিঠি দেন। রাত্রে পরিচারক পূজার দ্রব্য ও ফরহার রাখিয়া গেলে কবাট খুলিয়া লইয়া যান। যখন দেখা দেন, তখন মেলা লাগে। পুলিষকে শান্তি রক্ষা করিতে হয়। গোরক্ষপুরের নিকট পয়কৌলি গ্রামে অন্য পবহারীজী বৈরাগীর মঠ আছে। তাঁহাদের শিষ্য পরম্পরায় ঐ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সম্প্রতি সেই পবহারী বহু অনুচর সহিত রামানন্দী সম্প্রদায়ের তীর্থ স্থান ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। তিনিও ফরহারী। পরপারে ইন্দ্রপুর নামক স্থানে বহুকাল পূর্ব্বে একজন রেসম ব্যবসায়ী গোঁসাঞি গঙ্গার উপর নৌকায় বজ্রাহত হইয়া প্রাণ-

ত্যাগ করায় সমাহিত হন। পঞ্চাশ বৎসর পরে একজনের স্বপ্ন হইল। তিনি চৌরা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া যথারীতি পীড়া হইতে মুক্ত হইলেন। সেই স্থান বিজলিয়া বাবা নামে পূজিত হইতেছে। যব, সরিষা প্রভৃতি ক্ষেত্রের পার্শ্বে পার্শ্বে গোলাপের চাস হইতেছে। ফাল্গুন চৈত্র ব্যতীত এক্ষণে "সালিগুলাব" "সদাগুলাবের" মত হয় না। গঙ্গাতীর হইতে গাজিপুর দেখিতে কাশীর মত। ইহার ভাষাও তত্তুল্য। রামেশ্বর চিতনাথ খিড়কীঘাট প্রভৃতির মধ্যে রাজা গাধির কোষ্ঠ বা দুর্গ নামে উচ্চ পাহাড়ের উপর বউড়ইয়া সাহেব অঘোরির শ্বেত গৃহ দেখা যাইতেছে। কলিকাতা এখান হইতে কর্ড রেল পথে ৪৪৫ মাইল, স্থলপথে ৪৩১ মাইল, জলপথে ৭৮৪ মাইল হইবেক।

বক্‌সর। রামায়ণের তাড়কা বধ, বিশ্বামিত্রের তপোবন প্রভৃতি স্থান ও অহল্যা যেখানে মানবী হইয়াছিল সেই সকল স্থান ইহার সন্নিকট। রামরেখা ঘাটে বৈরাগীদের মন্দির আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কেহ কেহ বলেন রামায়ণের বিবরণ ঐতিহাসিক ঘটনা-মূলক নহে। রামচন্দ্র বৈদিক ইন্দ্র হইতে কল্পিত। জগদীশপুরের কুমার সিংহের দায়াদ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বক্সরে মৃৎদুর্গ আছে। এখান হইতে ভোজপুর অধিক দূর নয়। "তস্‌লা তেরা কি মেরা"—সকলেই শ্রুত আছেন পথিক অন্ন রন্ধন করিতেছেন, দস্যু আসিয়া উপস্থিত। যদি বলেন পাকপাত্র আমার, তাহা হইলে ভূমে অন্ন নিক্ষেপ করিয়া পাত্র লইয়া যায়; যদি বলেন তোমার, তবে কহে—খাইয়া পাত্র দাও। এক্ষণে সে কাল নাই, তথাপি কাশী হইতে কলিকাতার জলপথে এই প্রদেশটায় দস্যুভয় বিদ্যমান আছে। রাত্রে নাবিকেরা আমাদের নৌকা নঙ্গর করিয়া রাখিত, ভয়ে তীরে বাঁধিতে পারিত না। বলিয়া জেলা ভৃগুক্ষেত্রের এক মন্দির মধ্যে বেদীর উপর ভৃগু যে মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন, পদ্ম যন্ত্রে সেই গায়ত্রী লিখিত আছে। তাহারই পার্শ্বে আবার তদীয় পদচিহ্ন খোদিত হইয়াছে। এখানকার বিষয়ে দর্দ্দুর-মাহাত্ম্য নামক এক গ্রন্থ আছে। এদেশের মৃত্তিকা এমন দৃঢ়, যে গঙ্গার পাড় খুদিয়া সোপানাবলি প্রস্তুত করিয়া জলে নামিবার পথ করা হইয়াছে। এখান হইতে একখান ষ্টীমার দ্রব্যজাত লইয়া বক্সর যাতায়াত করে। উপরে উঠিয়া দুইটী চিনির কারখানা দেখিয়া আসিলাম। সরযু ছাপরা নগরের দুই ক্রোশ পশ্চিমে গঙ্গায় আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। তেলকাঘাট নামক স্থানে আমাদের রাত্রি যাপন হইল। প্রাতে অত্যন্ত কুজ্‌ঝটিকা দেখা গেল—দশ হাত দূরের বস্তু দেখা যায় না। ভ্রমণ না করিলেই নয়, এই জন্য উপরে উঠিলাম। সেই কুজ্‌ঝটিকা ভেদ করিয়া বহুদূর হইতে ঢেঁড়ি (মটরশুঁটী) বাহিনী রমণীগণ আসিতে দেখিলাম। তাহাদের আনাসিকা সিন্দূর ও রঞ্জিত কুলবস্ত্র এবং লাক্ষাচুড় দেখা গেল। ভাষা পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে বিহারী বেশ দেখা দিয়াছে। এখান হইতে পাটনার ভাষা ভিন্ন প্রকার। অযোধ্যা হইতে সরযুর উত্তর পার দিয়া

পশ্চিমা হিন্দী পূরবী হিন্দীর দেশে মুসলমাল কর্ত্তৃক বোধ হয় যেন প্রচারিত হয়। বিহারের ভাষা পার্শ্ববর্ত্তী ভোজপুরী বা মধ্যদেশী হিন্দী নহে।

পাটনা। দানাপুরে শোণ গঙ্গায় মিলিয়াছে। বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টারণ্ রেলওয়ে কোম্পানি শুখার সময় বালির উপর স্লিপার বিছাইয়া পরপার হইতে মাল সমেত গাড়ি জাহাজে তুলিয়া পার করত চালান করিতেছেন। পাটলীপুত্র প্রাচীন নাম ও জনপদ সহ গঙ্গাগর্ভে স্থান লইয়াছে। এখানে গঙ্গার পরিসর প্রায় ৩ ক্রোশ। অনেক ফলাও হইলে চড়া পড়িয়া যায়। পাটনার সম্মুখে গঙ্গা দুই ধারা হইয়া মধ্যে বৃহৎ চর রাখিয়া আবার একত্র হইয়াছে। পাটনা গঙ্গার উপর হইতে অতি সমৃদ্ধ দেখাইল। পাটন দেবীর মন্দির দর্শন করিতে গেলাম। এক দালানে ক্ষুদ্র একটী দেউল আছে, তাহার অভ্যন্তর ভাগ মৃত্তিকা দ্বারা পরিপূরিত। পূজারী কহিল এই স্থান সতী-অঙ্গ পতনের বাঁয়ান্ন পিঠের এক পিঠ। এখানে সতীর বস্ত্র অর্থাৎ পাট, পতিত হইয়াছিল বলিয়া পাটন দেবী নামে অভিহিত হয়েন। সেই জন্য নগরের নামও পাটনা। কোথায় সেই অঙ্গাধিপ বংশ? এখন বিস্মৃতি সলিলে নিমগ্ন হইয়াছে। এখানকার বাটীতে প্রস্তরের পরিবর্ত্তে বিবিধ কারুকার্য্যযুক্ত কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। প্রস্তরের এমনি অভাব, যে পাটন দেবীর মন্দিরে একটী শিব কাষ্ঠের গৌরিপট্টে আসীন দেখিলাম। একস্থানে শোণ নদীর কুল্যা গঙ্গায় আসিয়া পড়িতেছে। খালের জল বদ্ধ দ্বারের সুনির্ম্মিত ছিদ্র দিয়া মহাবেগে সমুদ্র নির্ঘোষে অতি সুন্দর দৃশ্য ধারণ করিয়া অনবরত নির্গত হইতেছে। প্রতিঘাত জন্য যে জলকণা উত্থিত হইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া সূর্য্য কিরণ কুল্যার দ্বারের বামদিকের প্রাচীর গাত্রে যেন ইন্দ্রধনু সৃষ্টি করিতেছে। বেলা সাড়ে এগারটার সময় বাঁকীপুর ত্যাগ করিয়া অনতিবিলম্বে গণ্ডকী নদীতে উত্তীর্ণ হইলাম। খরস্রোতা গণ্ডকী বর্ষীয়সী গঙ্গার সহিত মিলিতেছেন। স্থানটী কিছু ভয়ানক। গণ্ডকীর স্রোতে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বের মৃত্তিকা শিথিল লইয়া সশব্দে নদীগর্ভে পতিত হইতেছে। নাবিক কহিল, এখন পর্য্যন্ত নদী অধিক প্রবল হয় নাই। প্রতি বর্ষে এই পুর্ণিমার দিন সঙ্গম স্থানের স্রোত অত্যন্ত প্রবল হয়। তখন বিপরীত দিকে নৌকাচালনা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। হরিহর ক্ষেত্রে পৌছিয়া (শোনপুর) হরিহরনাথ দর্শন করিলাম। তাম্র নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ, তাহার সম্মুখে বিষ্ণুর মূর্ত্তি রহিয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থানের নাম পুলহাশ্রম ছিল। একদা মহর্ষি দুর্ব্বাসা দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ হা হা ও হুহুকে গান করিতে অনুরোধ করেন। তাহারা আদেশ পালন না করায় অভিশপ্ত হয়। ঐ দুই জন গজ ও কচ্ছপ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। গজরাজ এক দিন এই স্থানে জলপান করিতে আসিয়াছেন, এমন সময় কচ্ছপ তাহার হস্তধারণ করতঃ জল মধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিল। নিমজ্জন কালে হঠাৎ তাহার মুখ হইতে হরিহর শব্দ নির্গত হওয়ায়, বিষ্ণু ও শিব আসিয়া উদ্ধার করেন। হাহা ও হুহু শাপমুক্ত হইল। তদবধি এই

স্থান পুণ্যভূমি। এখানকার বিষয়ে "হরিহরক্ষেত্রমাহাত্ম্য" নামে এক পৌরাণিক গ্রন্থ আছে; বোধ হইতেছে, পাণ্ডার উদ্যোগে অত্যল্প দিন রচিত হইয়া লিঙ্গোপপুরাণের নামে প্রচারিত হইয়াছে। মেলার দোকান, বাসস্থান প্রভৃতি সমুদায় বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছে। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মেলায় আসিয়াছেন। প্রাতঃকালে ইং-রাজের ঘোড়দৌড়, অপরাহ্ণে পোলো নামক ক্রীড়া, রাত্রে বল বা নৃত্য। ছাপরা, পাটনা প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী স্থানের সমৃদ্ধ বিহারীদের এই মেলার কাল বার্ষিক আনন্দের সময়। কেহ বস্ত্রাবাসে কেহ নৌকায় থাকিয়া সঙ্গীত ও দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি আমোদে যাপন করিতেছেন। শালগ্রামীতে স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্র নগ্নঊর্দ্ধদেহ কৃষ্ণ মস্তক লোকারণ্য অতি জনতাবশতঃ বদ্ধ দ্বার হরিহরনাথের মন্দিরের সম্মুখে জলপাত্র হস্তে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব দৃশ্য বিস্তার করিয়াছে। শালগ্রামীর তট হইতে আপণ শ্রেণী আরম্ভ হইয়াছে। নানাবিধ দ্রব্য সম্ভার দেশ বিদেশ হইতে আনিত হইয়া যতদূর যাওয়া যায়, ততদূর জুড়িয়া রহিয়াছে। কাশী হইতে প্রস্তরের মন্দির, গয়ার পাথর-বাটী, পঞ্জাবের গজদন্ত নির্ম্মিত দ্রব্য, পিতল কাঁসার বাসন, পর্য্যঙ্ক, ডেস্ক, গাড়ি, পালকি, মেজ, চৌকী, ও বিবিধ বাদ্যযন্ত্রে সহস্র সহস্র পণ্যবীথি সজ্জিত হইয়া দর্শকের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। এক একটা শ্রেণী উত্তমরূপে দেখিতে হইলে, ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয়। তাহার পর হস্তী বিক্রয়ের স্থান, শত শত চিত্রিত ভাল কুন্কী, গুণ্ডা ও পাট্ঠা নিগড়বদ্ধ হইয়া প্রশান্তভাবে ক্রেতার অপেক্ষা করিতেছে। নেপাল ও আসাম হইতে এখানে হস্তী আসে। আরব বণিকগণ আসিবামাত্র ক্রয় করিয়া লয়, পরে মেলায় বিক্রয় করে। এবার কিছু আসে নাই, তত্রাচ এক সহস্র হস্তী আসিয়াছে। ঘোটক চারি সহস্র হইবেক, বলীবর্দ্দের বাজার সম্পূর্ণ দেখিয়া উঠিতে পারিলাম না, তাহারও সংখ্যা বোধ হয় চারি সহস্র হইবেক। সময়াভাবে মেষ, গর্দ্দভ ও কুকুরের হাট দেখিয়া উঠিতে পারিলাম না। নানাজাতীয় পক্ষীর বাজার দেখা হইল। এক সুচ্ছায় উপবনে নর্ত্তকীরা বায়নার প্রতীক্ষা করিতেছে। দানাপুরে যে হিন্দু বেশ্যা হয়, সেই মুসলমান হইয়া থাকে। বেশ্যা হইলে পরকালে হিন্দুর সদ্গতি রুদ্ধ হয়, বোধ করি মুসলমানের তাহা হয় না, সেই জন্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে।

ফতুহা। পুন্‌পুনা নদী গঙ্গায় সম্মিলিত হইলেন। প্রাতঃস্নান হইলে আমরা তরণী ছাড়িয়া দিলাম। দেড় প্রহর বেলা হইলে বায়ুর গতি ফিরিল। নৌকা উজা-ইয়া যায় দেখিয়া মাঝিরা "গিরাবী" ফেলিয়া রাখিল। উজনীয়া "মেল্‌হনী" "সলিনা" প্রভৃতি নৌকাগুলি, যাহা ফেরতা জলে "দোগার" অর্থাৎ একবার এপার একবার পরপার করিয়া অতি কষ্টে গুণ টানিয়া লইয়া যাইতে হইত, এক্ষণে পাল উড়াইয়া চলিয়াছে। আমাদের মাঝিরা অবকাশ পাইয়া স্বদেশ অভিমুখ পরিচিত নৌজীবীদের সহিত আলাপ আরম্ভ করিল। সকলেই জিজ্ঞাসা করে, খিলান্ নৌকা

ভাঁটি যাইতেছে কেন। একালে যে নৌকায় সওয়ারি যায় তাহা কিরূপে বুঝিবে। পশ্চিম হইতে ভুষা মাল লইয়া যায়, পূর্ব্ব হইতে চাউল বা লবণ পাইলে আনে, নতুবা খালি আসে। পশ্চিম হইতে খালি নৌকা যায় না। আমার চিকিৎসক কহিয়াছিলেন, "ঔষধে উপকার হইতেছে না, তবে উহা সেবন করিতেছ কেন? উপকার না হইলে সেই ঔষধ দ্বারা অপকার হয়।" তাঁহারই পরামর্শে নৌকা-যাত্রা করিয়াছি। দেওঘর বাস অপেক্ষা ইহা অধিক ফলপ্রদ হইয়াছে। নৌকার গতির সহিত শরীর চালনা হয়। যে দিন নৌকা অধিক চলে, সে দিন ক্ষুধাও অধিক হইয়া থাকে। দুগ্ধ প্রত্যহ আহরণ করিতে হয়। অন্যান্য বস্তু মধ্যে মধ্যে হাট বাজার পাইলে সংগ্রহ হয়। সামান্য গ্রামের দোকানে জনার ও তামাকমাত্র থাকে। আহার বিহার সমস্তই নৌকায়। নৌকা এক্ষণে আমাদের বাটী। বাটীতে যে সকল আততায়ীর সহিত বাস করিতে হয়, বালমূষিকা, লূতা, গৃহগোধিকা, গন্ধোলী, প্রভৃতি সকলই এখানে আছেন। বায়ু কিঞ্চিৎ অনুকূল হইলে চলা গেল। অপরাহ্নে ঈশানে মেঘ দেখা দিল, তাহাতে বিদ্যুৎ খেলিতেছে, জলের উপর মেঘের ছায়া পড়িয়াছে। নাইয়াদের হৃদয় কাঁপিতে লাগিল—প্রবল ঝড় আসিতেছে। মাঝিরা প্রাণপণে বলিয়া কহিয়া কূলের দিকে ক্ষেপণি চালন করিতে লাগিল। কিন্তু বৃথা হইল, ঝড় আসিয়াছে, সেই সঙ্গে বৃষ্টিও অতি নিকট হইয়া পড়িয়াছে—তটে নৌকা লাগাইতে পারিল না—বায়ুর ভরে দাঁড় কোনও কায করিতে পারিল না। একখানি পারঘাটের নৌকা বহু লোকপূর্ণ হইলেও ছই না থাকায় বায়ুর আঘাত লাগিতে পারিতেছে না বলিয়া অনায়াসে পারে আসিয়া লাগিল। আমাদের মাঝিরা উদ্যম ছাড়িয়া নারায়ণ যাহা করেন বলিয়া নিরস্ত হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কি হইবে? উত্তর দিল—এ পারে আর লাগান যাইতে পারে না। ঝড়ের গতি অনুসারে পরপার অভিমুখে আপনি নৌ চলিল, কর্ণধার কেবল দিক নির্দ্দেশ করিয়া রহিল। শীঘ্রই এক চরের নিকট উত্তীর্ণ হইল। তখন প্রধান কেয়ট্ নঙ্গর ফেলিতে কহিল। শীঘ্রই কিন্তু পবন শান্ত হইলেন, ঘনঘটা রহিল। আজিকার মত আমাদের এই স্থানে বিশ্রাম। কিয়ৎকাল পরে দেখিলাম বৃহৎকায় বাষ্পীয় তরি ঝঞ্ঝা তরঙ্গ না মানিয়া, বাণিজ্য দ্রব্য আনিতে মন্থর গতিতে পাটনা অভিমুখে চলিয়াছে।

রাঢ়। নৌকা লাগিলে মালাকার সুরধনীকে পুষ্পহার উৎসর্গ করিয়া গলুইয়ে পরাইতে আসে—দধি বিক্রেত্রি দর্শন দেয়—ভিক্ষুক মিলে। * রাঢ় নগরে চম্পা ফকির-

---

* ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভিক্ষা করিতে আসিলে প্রথমে ধনিকে কবিতা দ্বারা "মেস্মেরাইজ" করত পরে প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

"অর্দ্ধং দানব বৈরিণা গিরিজয়া প্যর্দ্ধং শিবস্যাহৃতং,
দেবেত্থং জগতীতলে পুরহরা ভাবে সমুন্মীলতি।

দের দৌরাত্ম্যে পূর্ব্বে মাঝিরা নৌকা লাগাইতে চাহিত না। তাহারা যাহা কহিবে, তাহাই দিতে হইবে। একজন ছুরিকা আঘাতে আপন শরীর হইতে রুধির বাহির করিয়া, বাঞ্ছিত যাচ্‌ঞা পূরণ করিতে কহিল। রজনী প্রভাত হইলে প্রাতঃস্নায়ীরা দেখা দিলেন। কেহ সীতরাম কহেন না, কেহ রাধাকৃষ্ণ শব্দ উচ্চারণ করিবেন না, তাহা লইয়া ঘাটে বিলক্ষণ আমোদ চলিল। প্রাতঃকালের কুয়াসার মধ্য দিয়া এক প্রকার অস্ফুট ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনুসন্ধানে জানিলাম কারণ্ডবযূথ ঐ শব্দ উৎপন্ন করিতেছে। নিস্তব্ধ পুলিনে রাজহংস মিথুন বসিয়া আছে। তাহারা একা থাকে না। বলাকাকুল আকাশে আলপনা দিয়া চলিয়াছে। তটোপরি শ্যামল ক্ষেত্র শস্যরাশি বক্ষে করিয়া নয়নানন্দ বৃদ্ধি করিতেছে। মধ্যে মধ্যে উচ্চবৃক্ষে শুকবায়স উড্ডীন সংডীন হইতেছে। কোথাও বা কঙ্ক, গৃধ্র বিচরণ করিতেছে। ক্রমে আমরা মোকামা সন্নিহিত হইলাম। পরপারে ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ে, পারাপারের সুবিধার জন্য ষ্টীম্ ফেরি রহিয়াছে। খুটিহা বড়িহার পরপারে বিষণপুর বেগুসরায়। রামদিঘি নামক স্থানে প্রত্যহ দুই শত মণ দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। খুটিহায় চারণ ভূমির অসুবিধার জন্য গো পার হইতেছে! সূর্য্যগড়ে একটী পার্ব্বত্য তটিনী বৃষ্টিপাত দ্বারা পাণ্ডুবর্ণ মৃত্তিকা লইয়া সুরধনীতে একটা ভিন্ন বর্ণের সুষমা টানিয়া বহুদূর চলিয়াছে।

মুঙ্গের। গত বৎসর যেখানে বজরা লাগিয়াছিল, এবার সেখানে আর পটইলা লাগিতে পারিল না। জল সাত হাত নিম্ন পড়িয়াছে। "পাতর" ভূমিকে বর্ষাকালে স্রোতজলে আনিত মৃত্তিকা "কছাড়" করিয়াছে। কাশী কানপুর অঞ্চলে গঙ্গার ক্রীড়া এত দেখি নাই। গঙ্গা পাটন হইতে প্রবলা হইয়াছেন। পূর্ব্বে শোণ সরযূ গণ্ডক সহায়তা করে নাই! তাহাদের বলে এখন কোথাও দ্বিধা কোথাও বা ত্রিধা মূর্ত্তি দেখাইতেছেন! সেই সঙ্গে নরভুক কুম্ভীর ও নৌভুক "মসিনার" আকর হইয়াছেন। মসিনা বালুকার এক প্রকার অতিদৃঢ় জলমগ্ন স্তর। তাহাতে নৌকা আহত হইলে বানচাল হইয়া যায়। স্রোত মুখে আনীত মৃত্তিকা উচ্চ হইয়া পড়িলে ভাগীরথী মুখ ফিরান। যে দিকে ভঙ্গুর মৃত্তিকা থাকে, ঘর বাড়ী, বৃক্ষ বিটপী গ্রাস করত পথ পরিষ্কার করিয়া সেই দিকে ধাবিত হন। পূর্ব্বে যেখানে নদী ছিল সেখানে এক্ষণে গ্রাম বসিয়াছে, গ্রামের স্থানে নদী হইয়াছে। নৌকায় যদি পাড় ভাঙ্গিয়া পড়ে এই ভয়ে রাত্রে মাঝিরা কাছাড়ের নিম্নে নৌকা রক্ষা করে না। বাঙ্গালার নবাব মীরকাসিম আলিসা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত পরিখার মধ্যে ভগ্নাবশিষ্ট দুর্গ, অধুনা সুন্দর দুর্ব্বাদল শোভিত মাঠ ইংরাজের ধর্ম্মাধিকরণ ও সৌরভ পূরিত বৃক্ষবাটিকা মধ্যস্থ বাসস্থানে পরিণত হইয়াছে। একটি ঘাটের নাম কষ্টহরণী।

গঙ্গাসাগর মম্বরং শশিকলা নাগাধিপ স্মাতলং
সর্ব্বজ্ঞত্ব মধিশ্বরত্ব মগমৎত্বাং মাঞ্চ ভিক্ষাটনং॥"

তৎসন্নিকটে মৌদ্‌গল্য আশ্রম ছিল। এখানকার পীরপাহাড় জল পথে আটক্রোশ দূর হইতে দেখা যায়। তৎসন্নিকটেই সীতাকুণ্ড। কথিত আছে ৭০ বৎসর পূর্ব্বে রামনবমী হইতে আষাঢ়ী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কুণ্ডের জল শীতল হইত, তখন বুদ্‌বুদ্‌ বা বাষ্প উত্থিত হইত না, তাহার পর কখন দুই চারি ঘণ্টাকাল শীতল হইতে দেখা গিয়াছে। দুই বৎসরের কথা, দেড় মাসের জন্ত একবার শীতল হয়। পাণ্ডারা ভাবিল, এইবার তীর্থ লোপ পাইয়াছে। সীতাকুণ্ডের জলে অন্নপাক হইতে পারে এমত উষ্ণ নহে। অন্তর উৎসেক বন্ধ হইলেই শীতল হয়। প্লীহা প্রভৃতি রোগীর পক্ষে এই জলপান বিশেষ উপকারী। মঙ্গলা বা বিক্রম চণ্ডীর আকার একখানি ক্ষুদ্র পর্ব্বত খণ্ড। তাহা মধ্যে রাখিয়া মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। "মধ্যদেশে মহামায়া" ইত্যাদি তন্ত্রোক্তি অনুসারে চণ্ডীস্থান নেত্রপীঠ অভিহিত হয়। শত বর্ষ পূর্ব্বে রামগিরি নামক জনৈক সিদ্ধ পুরুষ এখানে বাস করিতেন। এখানকার ভাষায় বাঙ্গালার গন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ভূ ধাতুর পরিবর্ত্তে অস ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। "ভবতি"র স্থানে "অস্তি" ক্রিয়া-পদের প্রয়োগ দেখা দিল। প্রাকৃত "হোই" পদ হইতে উৎপন্ন "হয়" শব্দের স্থানে প্রাকৃত "অচ্ছি" শব্দ জাত বাঙ্গালা "আছে" র মত "ছে" ক্রিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। তথাহি,—

পশ্চিমা হিন্দি—নহি হয়।
পূরবী বা ভোজপুরী হিন্দি—নই থয়।
মধ্যদেশী হিন্দি—ন ছে।

হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালীর মধ্যবর্ত্তী বলিয়া মধ্যদেশ নাম হইয়াছে। হিন্দির মধ্যে দিল্লীর ভাষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সেখানকার ভাষা আমার এমন মধুর লাগিয়াছে, যে কেবল তাহা শুনিয়া কর্ণ শীতল করিবার জন্য আর একবার তথায় যাইতে ইচ্ছা হয়।

জহ্নুগিরা। পুটবন্ধের বাহুল্য বশতঃ মূলধারা পরিত্যাগ করিয়া কিছু দূরে বাঘমতী সঙ্গম অতিক্রম করতঃ পুনর্ব্বার আমরা গঙ্গায় আসিয়া পড়িলাম। ৩।৪ ক্রোশ দূরে গ্রাম। চড়ার উপর মহিষের বাথান। স্থানে স্থানে মহিষের যূথ জলে পড়িয়া রহিয়াছে। এ প্রদেশে এক একজন গোপের (মহতোর) ২।৩ কুড়ি করিয়া গাভী থাকে। সুলতানগঞ্জে গঙ্গা গর্ভে দুইখানি গণ্ড শৈল। একটীর পার্শ্বে চড়া পড়িয়া গিয়াছে—তাহাতে মুসলমানের মস্‌জিদ আছে। পর্ব্বত গাত্রে হিন্দু মূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়। অপরটীতে উচ্চ শিবমন্দির ও মহন্তের বাসস্থান এবং বহুল দেবমূর্ত্তি খোদিত ও শেষশায়ী এবং হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তির উপর অর্দ্ধ দেবায়তন রচিত হইয়াছে। হরকে জহ্নুমুনি নাম দিয়া তীর্থজীবীরা জহ্নুক্ষেত্র আখ্যা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। মূর্ত্তিগুলির মধ্যে পাশুপত সম্প্রদায়ের সমসাময়িক কয়েকটী বৌদ্ধ বিগ্রহ আছে দেখা গেল। ইদানিং সরাউগীরা শেষশায়ীকে পার্শ্বনাথ বলিয়া পূজা করিতে

আইসে। অন্য স্থান হইতে কয়েকটা স্তম্ভ ও পুত্তলি আনিয়া গৈবীনাথের (গৌরী-নাথ) সন্নিকটে যোজিত হইয়াছে। এখান হইতে দেবগৃহ ৩০ ক্রোশ। বৈদ্যনাথ-যাত্রীরা জহাঙ্গিরা হইতে গঙ্গাজল "কামরে" লইবে বলিয়া হাঁড়ি ও শিশির বাজার বসাইয়াছে। শত শত লোক দলবদ্ধ হইয়া কামর উত্তোলন পূর্ব্বক "বোলো বম" শব্দের তরঙ্গ বিস্তারিত করিয়া চলিয়া থাকে। প্রত্যাবর্ত্তনের গীত "মাল খাজানা বাবা লেল ভর ভর কামর দিয়া দেল্।" নৌকায় যাইতে যাইতে একখানি গ্রামের নাম পাওয়া গেল "দুধেলা"। এদেশে ঘৃত দুগ্ধ যে অধিক পরিমাণে জন্মে, স্থানের এই নাম তাহা প্রকাশ করিতেছে।

ভাগলপুর। আমাদের দেশে যে দাতাকর্ণের কথা আছে, এখানে তাঁহার গড় ছিল। উক্ত গড় চম্পা নগরে অবস্থিত। বেহুলার উপাখ্যানে এই চম্পাই নগরের উল্লেখ আছে। কর্ণ গড়ে এক্ষণে কেবল রাজা কর্ণের উপাসিত মনোকামনানাথ শিব ব্যতীত তাঁহার আর কিছু স্মরণচিহ্ন নাই। জানপদগণ অভীষ্ট সিদ্ধি হইলে শত সহস্র কলস বারি দ্বারা শিবলিঙ্গ স্নান করাইবে মানসিক করিয়া থাকে। ক্লেভ্ল্যাণ্ড সাহেবের স্মরণ চিহ্ন দেখিলে হৃদয় পুলকিত হয়। তাহাতে লিখিত আছে ;—

"Without bloodshed or the terrors of authority, employing only the means of conciliation, confidence, and benevolence, he attempted and accomplished the entire subjection of the lawless and savage inhabitants of the Jungle Terry (forest frontier) of Rajmahal who had long infested the neighbouring lands by their predatory incursions, inspired them with a taste for the arts of civilised life, and attached them to the British Govt. by a conquest over their minds, the most permanent as the most rational mode of dominion."

ভাগলপুর বিস্তীর্ণ সহর। নগরের উপকণ্ঠে কিয়দ্দূর বিচরণ করিলে ধূলায় ধূসরিত হইতে হয়। বাষ্পীয় তরণী নিকটস্থ জনস্থানে যাত্রী লইয়া যাইবার জন্য নিযুক্ত আছে। কহোল ঋষির আশ্রম কাহোল গ্রাম সন্নিধানে, গঙ্গাগর্ভে যুগল শৈলখণ্ড অতিক্রম করিয়া শিলা সঙ্ঘের অনতিদূরে বটেশ্বরনাথের মন্দিরে উঠিবার উচ্চ সোপান শ্রেণী দেখা যাইতে লাগিল। নাতিদূরস্থিত শৈলমালা সুরধুনী ও তটভূমির সহিত একযোগে মোহনভাবে নয়নপথগামী হইতেছে। তাহার পর কুশী নদী গঙ্গায় আসিতেছেন। মণিহারীতে আসাম বাঙ্গালা লৌহপথের বাষ্পীয় শকটশ্রেণী দণ্ডায়মান, সাহেবগঞ্জ হইতে জাহাজে পার হইয়া যাত্রী আসিতেছে।

রাজমহল। বিন্ধ্য পর্ব্বতের একটী শাখা মোতিগড় হইতে আরম্ভ করিয়া মুঙ্গেরের নিকট হইতে গঙ্গার ধারে ধারে রাজমহলে আসিয়াছে। ভাগীরথী পার

হওয়া যেন নিষিদ্ধ। রাজা মানসিংহ এই নগর পত্তন করেন—এই জন্য রাজমহল নাম হইয়াছে। ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে সুবাদার সুলতান সুজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত "সঙ্গিদালান" জাহ্নবী তীরে অদ্যাপি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বাজারে সাঁওতাল নরনারী কাষ্ঠ বিক্রয় করিতে আসিয়াছে দেখিলাম। তাতার জাতীয় পাহাড়িয়ারা কৃষ্ণকায় নহে। তাহাদের স্ত্রী-লোককে "সুঁদরী" কহে। ইহারা মিথ্যা কথা কহে না। দামিনীকোহনিবাসী সাঁও-তালেরা মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করে নাই। অদ্ভুত ক্ষমতাবান ক্লিভল্যাণ্ড সাহেব শাসনভার তাহাদের নিজ হস্তে দিয়া ভূমির কর নামমাত্র নির্দ্ধারণ করত পর্ব্ব-তের নিম্নে বসতি করাইয়া অধীনতা স্বীকার করান। যিনি এই সুমহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বয়স ২৯ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। সাঁওতালের শরীরের গঠন দেখিলে বোধ হয় তাহারা যেন খাটিবার জন্যই জন্মিয়াছে, ভাবিবার জন্য নহে। কোন বিষয় সাঁওতালদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকৃত উত্তর পাওয়া ভার। যাহা জিজ্ঞাসা কর—হুঁ বলে। কোন প্রকারে হাত ছাড়াইতে পারিলে বাঁচে। তাহাদের মাঝিকে (প্রধান ব্যক্তি) আপন ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে কেহ দেখে নাই। ইংরাজেরা কহেন—সাঁওতাল বিদ্রোহ যে ঘটিয়াছিল তাহার কারণ প্রতিবেশী বাঙ্গালীর অত্যাচার। বন্যগণ কহিয়াছিল আমাদের কষ্টের কারণ কি বৃটিশরাজ জিজ্ঞাসা করিলে এ ঘটনা হইত না। এক্ষণে সাঁওতালের মধ্যে কেহ হিন্দু কেহ বা খৃষ্টান হইয়াছে। সেই সঙ্গে প্রতারণা প্রবঞ্চনা শিখিয়াছে। পর্ব্বত ইহাদের প্রধান দেবতা। তাঁহার নাম "মেরং বুরু।" আমাদের শিব বুঝিবা ঐ দেবতা হইবেন। চড়কের মত তাহাদের পোটা নামে এক উৎসব আছে। এখন আর বাণ ফুঁড়িতে পারে না। একজন সংবাদদাতা কহি-লেন বদনা নামক উৎসব কালে পিঠা, মাংস, মদ্য, নৃত্যগীত শেষ হইলে সন্ধ্যাকালে বৎসরের জন্য সেই একদিন স্ত্রী পুরুষে যদৃচ্ছা ব্যবহার হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানি হোলি পর্ব্বে গালিপাড়া কি এই মূল হইতে উৎপন্ন? সাঁওতালেরা আপনাদিগকে হড় কহে। হড় রমণীরা নৃত্য অতি প্রিয় বস্তু জ্ঞান করে। জমহির নামক নৃত্য রাসলীলার অনুরূপ। ঢাক মাদল ও বাঁশীর বাদ্যসহকারে দ্রাবিড় ধরণে সজ্জিত কেশা এক একটী স্ত্রী এক একটী পুরুষের হস্ত ধারণ করিয়া মণ্ডলাকারে নৃত্য করে। মহাজন সাঁও-তালের জমি বিক্রয় করিয়া লইতে পারে না। তাহারা কহে জমি যদি বিক্রয় হইবে তবে দেশের নাম সাঁওতাল পরগণা রাখিলে কেন? ক্রয়ার্থীকে কহে আমাকে মারিয়া ফেল তবে জমি পাইবে নচেৎ আমরাই তোমাকে মারিব বা লুটিয়া লইব। সাঁওতালী ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অপিচ প্রাকৃত ভাষায় সাঁওতাল শব্দ দেখা যায়। এরূপ বিজাতীয় শব্দ প্রবেশে ভাষার মূল গঠনের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না। বিভক্তি প্রত্যয় ও ক্রিয়াপদ লইয়া ভাষার অবয়ব। এ সকলের পরিবর্ত্তন ঘটিলে নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়। সকল ভাষাতেই বিভক্তিগুলি প্রথমে একটী পৃথক্ শব্দ

থাকে, তদনন্তর সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করত প্রকৃতির সহকারী হইয়া পড়ে। বাঙ্গালা ভাষায় এখনও এমন বিভক্তি আছে যাহা স্বাতন্ত্র্য হারায় নাই। যথা—

"এরা" বিভক্তি।

এরা শব্দের প্রয়োগ—যেমন "এরা যাইবে।" কর্ত্তা কারকে এরা একটী বিভক্তি হইয়া দাঁড়ায়। যেমন "পণ্ডিতেরা কহেন।" এই বিভক্তিরই সংক্ষেপে "রা" হইয়াছে, যথা—"শিশুরা কাঁদে।" করণে "দ্বারা" ও অপাদানে "হইতে" বিভক্তির আকার এখনও বৃহৎ রহিয়াছে। রাজমহলের পর পারে মালদহ দিনাজপুর প্রভৃতি স্থলে যাত্রী লইয়া যাইবার জন্য অনেকগুলি গোশকট রহিয়াছে। সেখান হইতে গৌড়ের জঙ্গল বহুদূর নহে। রাজমহল ছাড়াইলে পর্ব্বতের মধ্যে হিন্দুস্থানি দেশ অন্তর্হিত হইল। বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানির সন্ধিস্থান নয়ন গোচর হইল না। খোলার ঘরের পরিবর্ত্তে খড়ুয়া ঘর দেখা দিল। তিনপাহাড় হইতে একদল স্ত্রীলোক গঙ্গাস্নানে আসিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিলে সাঁওতালি ভাব মনে আসে। একহস্তে লাক্ষা ও অন্য হস্তে কাঁসার চুড়ি। নদীতটে চাঁই, কাহার, গোয়ালা, সোণার ও মোদি প্রভৃতি হিন্দুস্থানি উপনিবেশী কৃষকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম পাওয়া গেল। কথিত আছে চৌর্য্য প্রভৃতি কুক্রিয়া করিয়া পলায়ান করত ইহারা স্বয়ং বা ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষে বসতি স্থাপন করিয়াছে। এক্ষণে কঠিন মৃত্তিকার পাড় আর দেখা যায় না। বাঙ্গালার কোমল মৃত্তিকা পাওয়া গিয়াছে। ঘাটে কক্ষে কলসি বাঁকমল পরা কোঁচা বিরহিত স্ত্রীলোক দেখিয়া বাঙ্গালী চিনিতে হয়। আমরা ফরক্কা নামক গ্রাম সন্নিধানে মূলধারা (পদ্মা) ত্যাগ করিয়া শাখা নদীতে (ভাগীরথীতে) চলিলাম। ঘাটে হিন্দী ও বাঙ্গালা দুইই শুনিতে পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানীরা এদেশের বাঙ্গালায় যে একটা বিশেষ স্বর আছে তাহা সমেৎ বাঙ্গালা কহিতে পারে। ধুলিয়ানে একটি লোকের সহিত কথা কহার আবশ্যক হওয়ায় আমি বাঙ্গালা কি হিন্দী কহিব চিন্তা করিতে হইল। শুঁড়ী জাতীয় লোক একখানি নৌকা করিয়া নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিতেছে। পুরুষের বেশ বাঙ্গালীর মত—স্ত্রীলোকের হিন্দুস্থানীর ন্যায়। জলপথে জনপদ দেখা কেবল ঘট্ট মণ্ডল লইয়া হইতেছে। ঘাটে স্ত্রীলোকের ভাগই অধিক দেখা যায়। হাঁসুলী ও চুড়ি পরা দেখিলে মুসলমান ও রূপার পঁইছে, তাবিজ, নবাঁদা পরিহিত হইলে হিন্দু স্থির হয়। মাটি দিয়া মাথা ঘসার পদ্ধতি এখনও ছাড়ায় নাই। গ্রামে যদি কেহ দুর্গাপূজা করিয়া থাকেন, তাহার খড় জড়ান কলেবর মাটি ঝাড়িয়া ঘাটে তুলিয়া রাখিয়াছেন। এ গ্রামে যে পূজা হয় তাহা সম্বৎসর এ পথে যে চলিবে সেই দেখিতে পাইবে। ছাপঘাটীর মোহানা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এজন্য ফরাক্কা মোহানা দিয়া জঙ্গিপুর নগরে আসিতে হইল। পর পারে তুলসিবিহার দেখা যাইতেছে। এখানে নৌকার "কুৎ" হয়। ভাগীরথী যাহাতে নাব্য থাকেন সে জন্য কর সংগ্রাহক পূর্ত্তবিভাগ

বিশেষ যত্নবান থাকেন। যেখানে চড়া পড়িয়াছে তাহার সম্মুখে বংশ প্রোথিত করত বাঁধ দিয়া অন্যদিকে স্রোত চালান হইয়া থাকে। ছাপঘাটির প্রাদেশিক কথা শুনিতে কিছু অদ্ভুত। প্লুতস্বর ব্যবহার হইয়া থাকে। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা অনুযায়িক বাক্‌যন্ত্রের আকার ভেদ হইয়া থাকে বলিয়া উচ্চারণ পরিবর্ত্তন হয়। এই উচ্চারণ পরিবর্ত্তন হইতেই নব ভাষা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মুরসিদাবাদ। আজিমগঞ্জের অপর নাম সহর। এই জনপদ ও পরপারস্থ বালুচরপুরী বাণিজ্য নিরত ওসয়াল বণিকদিগের বসতিস্থান। নগরের সমৃদ্ধি তদুপযুক্ত দৃষ্ট হইল। মুরসিদাবাদে নবাবের হর্ম্ম্যরাজি ব্যতীত আর কিছু দেখিবার নাই। সৈয়দাবাদে মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া খাগ্‌ড়া বহরমপুর পাওয়া গেল। প্রাচীন জনপদ গৌরবচিহ্ন অঙ্কে করিয়া সুরধুনী তটে লীলা করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে চক্ষু ক্লান্ত হইয়া পড়িল, ইষ্টকালয় ফুরায় না। শিব মন্দিরের আরব্য গঠন, কেবল উপরিভাগে ত্রিশূল দেখিয়া চেনা যায়। স্ত্রীলোকের আভরণ, যথা—সাঁখা ও রূপার অনুকরণ সাঁখা ও মর্দ্দানা কাঠের মালার মাঝে মাঝে সোণার মালা ও মাঁদুলি। পলাশী ক্ষেত্র দেখিবার জন্য নৌকা ত্যাগ করিতে হইল। এক্ষণে তথায় বসতি হইয়াছে। সেখানে যাইয়া একবার চক্ষের জল ফেলিয়া আসা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিলাম। কোথায় জয়স্তম্ভ প্রোথিত রহিয়াছে অনুসন্ধান করিয়া লওয়া গেল। বিজয় প্রস্তরের অতি মসৃণ মর্ম্মর গাত্রে উৎকীর্ণ আছে—

"Plassey
Erected by the
Bengal government
—1883—

পুরাতন আম্রবৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া পলাশীর যুদ্ধকাব্য একসর্গ পাঠ করা হইল। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রশমিত না হইতে হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। কাটোয়ায় অজয় নদ দেখা দিলেন। মেটিরির নিকট বর্দ্ধমান অঞ্চলের মত বেশভূষা দেখা গেল।

নবদ্বীপ। গঙ্গার জলঙ্গীধারা ভাগীরথীতে আসিয়া মিশিল। এখান হইতে গঙ্গার ইংরাজি নাম হুগলি নদী হইয়াছে। ঘাটে কেহ শিখা বন্ধন করিয়া তর্পণ আরম্ভ করিতেছেন,কেহ বা সন্ধ্যাবন্দন সমাপন করিয়া উঠিয়া যাইতেছেন। কনৌজীয়া, মৈথিল, তৈলঙ্গী ও বাঙ্গালী বিদ্যার্থীগণ পাকা টোলে পাঠ লইবার জন্য অধিক বেলা করিয়া স্নান করিতে আসিয়াছেন। "ঘটাদ্য ভাবের প্রত্যক্ষ" কিম্বা "ধ্বংস, প্রাগ্‌ভাবের খণ্ডন" লইয়া কিছুক্ষণ বিতণ্ডা করিতে পারেন কারণ এখন আর ত্বরা নাই। অপরাহ্নে পুনর্ব্বার "পাঠ চাওয়া" হইবে। নিমাই কোন্ ঘাটে নৈবিদ্য তুলিয়া খাইতেন জানিবার জন্য কৌতূহল হইল। বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন এখানে গঙ্গাতীর বাস করিতেন। ১২০৩

খৃষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিলিজি তাঁহার রাজধানী আক্রমণ না করিয়া একবারে নবদ্বীপে আইসেন। যেখানে সেনা থাকিত না সেখানে বল পরীক্ষা আর কি হইবে। নদীয়া ছাড়াইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত পুলিনে বিল্বপত্র ও পুষ্পের নির্ম্মাল্য উৎক্ষিপ্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল। কাল্‌নায় বর্দ্ধমান রাজের সমাজবাটী ও লালজীর মন্দির দেখিয়া সুখী হইলাম। দারু ব্রহ্মকে মুগেরডালের নৈবিদ্য দেওয়া হয়। দেউলের ইষ্টক অতি পরিপাটী কারুকার্য্যময় ছাঁচে তুলিয়া যোজিত হইয়াছে। সুখসাগরে আমাদের দেশের (খাঁটুরার) মত কথা শুনিলাম। কিন্তু পরপারের ভাষা তদ্রূপ নহে। বাঙ্গালা লিখিতে যে ভাষা ব্যবহার হয় তাহার সংজ্ঞা রাঢ়ি সাধু ভাষা হইতে পারে। বাঙ্গালা ভাষায় আদিকালে বীরভূম বর্দ্ধমান অঞ্চলে গ্রন্থ রচনা হয়। কীর্ত্তন, যাত্রা, কথকতা ঐ দেশের সম্পত্তি। শ্রীরামপুরে প্রথম সংবাদ পত্র প্রচার হইয়াছিল, এবং কলিকাতা রাজধানীর ভাষা ও পুস্তক উক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভূত হওয়ায় এ প্রদেশের ভাষাই লিখিবার বাঙ্গালা হইয়া পড়িয়াছে। বীরভূমের এমন প্রাদেশিক পদ ও শব্দাংশ আছে যাহা আমাদের অঞ্চলে ব্যবহার হয় না; অথচ লিখিবার কালে প্রয়োগ করিতে হয়।

গঙ্গার পূর্ব্বপারের বাঙ্গালা	হরিরে ডাকিতে হইবে।
গঙ্গার পশ্চিমপারের বাঙ্গালা	হরিকে ডাকিতে হইবেক।

হিন্দিতে দ্বিতীয়ায় যে "কোঁ" বিভক্তি তাহাও আমাদের "কে" হয়ত এক মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। হিন্দুস্থানি ভাষায় ১৩ তেরটীর মধ্যে সাতটী ককারাদিক বিভক্তি দেখা যায়। ত্রিবেণীর বাঁধা ঘাট পাইলে জোয়ার ভাঁটা অনুধাবন করিবার পথ সমুপস্থিত হইল। খালের দক্ষিণভাগে একটী সুবৃহৎ প্রস্তর যোজিত দেবালয় অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। তাহাতে সংলগ্ন একখণ্ড সামান্য লৌহ কীলক আকর্ষণ করিলে কিঞ্চিৎ বহির্গত হইয়া থাকে। এ কারণ "দড়কা গাজির কুড়ুল নড়ে চড়ে পড়ে না" এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। বংশবাটী গ্রামের হংসেশ্বরী দর্শন করত হুগলি সেতুর নিকটবর্ত্তী হইলাম। আমাদের কর্ণধার কহে কালিকা ক্ষেত্র অর্থাৎ কলিকাতা ষোল ক্রোশ দীর্ঘ সহর। আমার ভৃত্য পূর্ব্বে কলিকাতা দেখে নাই, সে হুগলি হইতে কলিকাতা আরম্ভ হইয়াছে ভাবিল। বস্তুতঃ কলিকাতার সমৃদ্ধি হুগলি পর্য্যন্ত উছলাইয়া আসিয়াছে বলিতে পারা যায়।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত।

দুষ্মন্ত।

কালিদাসের শকুন্তলা দুই কারণে বিখ্যাত।

১ম। এরূপ নাটক সচরাচর দেখা যায় না। এ দেশে ত নহেই, পাশ্চাত্য দেশেও বিরল।

২য়। নাটক হিসাবে না দেখিলেও কাব্য হিসাবে ইহার সৌন্দর্য্য ন্যূন নহে। শকুন্তলার কাব্যও অতুলনীয়।

নাটকীয় সৌন্দর্য্য অভিজ্ঞানশকুন্তলের চরিত্র চিত্রণে এবং ঘটনার বৈচিত্র্য সম্পাদনে প্রকাশ পায়। উপাখ্যান ভাগ মহাভারত হইতে গৃহীত হইলেও বৈচিত্র্যে কালিদাসের শকুন্তলা অনেক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কালিদাসের চরিত্রগুলিও অবিকল মহাভারতের অনুরূপ নহে। তাহারা অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত ও শিক্ষাসম্পন্ন। তাহাদের মধ্যে সৌন্দর্য্যের সমধিক বিকাশ লক্ষিত হয়। সেগুলি যথোচিত ফুটিয়াছে। চরিত্রগত সামঞ্জস্য নাটকের প্রধান উপাদান। কালিদাসে তাহা যথেষ্ট। তাঁহার দুষ্মন্ত রাজ-চরিত্র। কালিদাস সর্ব্বত্রই রাজার রাজ-ভাব বজায় রাখিয়াছেন। কিন্তু রাজা হইলেও দুষ্মন্ত মানুষ ত বটে। সুতরাং কেবল রাজ-রূপে দেখাইলে দুষ্মন্তের চরিত্র চিত্রণে অসম্পূর্ণতা দোষ ঘটে। কালিদাস সেই জন্য রাজভাবের সহিত মানব-ভাব এমনি গাঁথিয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে দুষ্মন্ত-চরিত্র কিছুমাত্র অসংলগ্ন ঠেকে না। শকুন্তলাও একদিকে তপোবনপালিতা ঋষিকন্যা, অন্যদিকে রমণী মাত্র। এই উভয় ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন যে সে কবির কাজ নহে। কালিদাস শকুন্তলায় দুইভাব এক করিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু কোনও ভাবটীই চাপা পড়ে নাই।

কাব্য-সৌন্দর্য্য অভিজ্ঞানশকুন্তলের বর্ণনাগুলিতে বিশেষ পরিস্ফুট। শকুন্তলার রূপ বর্ণনায়, প্রকৃতির চিত্র অঙ্কনে, হৃদয়ের সৌন্দর্য্য বিকাশনে কালিদাসের অদ্বিতীয় কবিত্বশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকৃতির সহিত মানব-হৃদয়ের ভাবগত একীকরণ অল্পসংখ্যক কবিই তাঁহার মত অনুভব করিতে পারেন। তাঁহার ভাব যেমন গভীর, ব্যক্ত করিবার ধরণও তেমনি সুন্দর। রূপ বর্ণনায় অন্যান্য অনেক কবির মত কালিদাস নখশোভায় চন্দ্রকে ম্লান করিয়া, নয়নে খঞ্জনকে গঞ্জনা দিয়া, প্রত্যঙ্গ অপ্রত্যঙ্গ সর্ব্বাঙ্গের নিকট চরাচরের যাবতীয় সুন্দর পদার্থকে হার মানাইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন না। কালিদাস সুনিপুণ চিত্রকর। যেমন করিয়া ফুটাইলে শকুন্তলার রূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে ফুটে তিনি সেইরূপ করিয়া ফুটাইয়াছেন। স্বভাবেও দূর নিকট তাঁহার বর্ণনায় সুব্যক্ত। দূর অস্পষ্ট, সূক্ষ্ম, রেখাবৎ; নিকট স্পষ্ট, স্থূল, যেমন-তেমনি। অসঙ্গতি-দোষ কালিদাসে কোথাও দৃষ্ট হয় না। নাটকীয় চরিত্র চিত্রণে যেরূপ, কাব্য-

সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটনেও কালিদাস সেইরূপ সুসামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া থাকেন। এই কারণে নাট্যাংশে না ধরিলেও কাব্যাংশেও শকুন্তলা অসাধারণ রচনা। অভিজ্ঞানশকুন্তলে নাট্য এবং কাব্য দুই সৌন্দর্য্য মিশিয়াছে।

দুষ্মন্ত এই সৌন্দর্য্যময় কাব্য-নাটকের প্রধান চরিত্র—নায়ক। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে, দুষ্মন্ত এ নাটকের উপযুক্ত চরিত্র কি না এবং তাঁহার যোগ্যতা অথবা অযোগ্যতা কোথায়। দুষ্মন্ত ভারতের অধিপতি, সৎকুলোদ্ভব, শীলবান্। তিনি রাজার মত রাজা—প্রজাবৎসল, দুষ্টের দমন, শিষ্টপ্রতিপালক, বিদ্বৎসেবী। এ সকল গুণই নাটকের নায়কোপযোগী; এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলের নায়কের বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং দুষ্মন্তকে শকুন্তলা নাটকের নায়ক-অযোগ্য বলা যায় না। তবে কেবল মাত্র এই কয় গুণই শকুন্তলা-নায়কের পক্ষে যথেষ্ট কি না সন্দেহ। শকুন্তলা শৃঙ্গাররস-প্রধান নাটক। সংস্কৃত অলঙ্কারের নিয়মানুসারে নাটকে শৃঙ্গার অথবা বীররসের প্রাধান্য, অন্যান্য রস কেবল সহায় স্বরূপে। এখন শৃঙ্গাররস প্রধান নাটকে কেবল মাত্র প্রখ্যাত-বংশীয় প্রতাপশালী নায়ক হইলে চলিবে কিরূপে? স্ত্রীপুরুষের প্রণয়-ব্যাপার লই-য়াই শৃঙ্গার রসের কারবার। সুতরাং শৃঙ্গার-প্রধান নাটকের নায়ক তদুপযোগী হওয়া চাই। দুষ্মন্ত এ বিষয়েও হীন নহেন। প্রণয়-ব্যাপারেই ত শকুন্তলা নাটকে তিনি ফুটিয়াছেন।

দুষ্মন্তের চরিত্র সর্ব্বথা নায়কোপযোগী—বিশেষতঃ অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের। সাহিত্যদর্পণে ধীরোদাত্ত নায়কের যে সকল গুণের উল্লেখ দেখা যায় তাহা দুষ্মন্তে অনেকটা মিলে বোধ করি। আত্মশ্লাঘা তাঁহার অভ্যাস নহে, হর্ষ বা শোকে তিনি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন না, বিনয়ে তাঁহার গর্ব্ব প্রচ্ছন্ন, অঙ্গীকার প্রতিপালন তাঁহার ধর্ম্ম। ধীরোদাত্ত নায়কের প্রধান উদাহরণ, রামচন্দ্র এবং যুধিষ্ঠির। দুষ্মন্ত অবশ্য ঐ দুই চরিত্রের সম্পূর্ণ সমকক্ষ নহেন, কিন্তু উহাঁদের কতকগুলি প্রধান গুণ তাঁহাতে লক্ষিত হয়। দুষ্মন্ত ধর্ম্মপরায়ণ রাজা। তবে সংযম-বিষয়ে রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। একপত্নীনিষ্ঠ রামচন্দ্র স্বভাবতই সংযমী। রূপ তাঁহাকে টলা-ইতে পারে না। দুষ্মন্ত কিছু অধিক মাত্রায় রূপসীপ্রিয়। রূপের মায়া কাটান তাঁহার পক্ষে তত সহজ নহে। দুষ্মন্তের সংযম অনেকটা অবস্থা এবং শিক্ষাগত। রূপসী লইয়া এই জন্য তাঁহার স্বভাবের সহিত অবস্থা এবং শিক্ষার মধ্যে মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। শকুন্তলাকে লইয়াও হইয়াছিল। তাই প্রবল রূপতৃষ্ণার মধ্যেও শকুন্তলার বর্ণ এবং গোত্র জানিবার ঔৎসুক্য। এটুকু না থাকিলে তাঁহার রাজসম্মান দুই দিনে ভাঙ্গিয়া যাইত।

এখন দেখা গেল, দুষ্মন্ত নায়কোচিত গুণযুক্ত। এবং দুষ্মন্তকে শকুন্তলার নায়ক-পদে বরণ করিয়া কালিদাস অবিবেচনার কার্য্য করেন নাই। তবে দুষ্মন্ত সম্পূর্ণ

চরিত্র নহেন বটে। কিন্তু মানব-জীবন লাভ করিয়া অসম্পূর্ণতা কাহার না নাই? আর নাটকে মানব-প্রকৃতিই চিত্রিত হয়। সুতরাং নাটককার সম্পূর্ণ চরিত্র ভিন্ন আঁকিবেন না এমন কিছু নিয়ম নাই। অসম্পূর্ণতা রামচন্দ্রেরও আছে, যুধিষ্ঠিরেরও আছে, সেক্সপীয়রের চরিত্রগুলিরও আছে, কালিদাসের চরিত্রেরও আছে। তবে অসংলগ্নতা নাটকে বিশেষ দোষ। অর্থাৎ রাজা রাজার মত না হইলে, দুষ্মন্ত দুষ্মন্তের মত না হইলে, চরিত্র চরিত্রোপযোগী না হইলে নাটক ব্যর্থ। দুষ্মন্তকে রাজার মুকুট পরাইয়া কণ্বাশ্রমে নীবারধান্যাপহরণে নিযুক্ত করিলে এ দোষ ঘটিত। কিন্তু মানব-জাতির উপর চরিত্র-ব্যভিচারের প্রভাব নাটককারের সীমাবহির্ভূত নহে। একদিকে নাটককার যেমন বিবিধ অবস্থার মধ্যে মানব-চরিত্রের অটলতা দেখাইবেন, অন্যদিকে সেইরূপ চরিত্রের উপরে অবস্থার গুরুতর প্রভাবও দেখাইতে ত্রুটি করিবেন না। এই অবস্থার প্রভাবেই চরিত্র অনেক সময়ে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহাই চরিত্র-ব্যভিচার।

দুষ্মন্তে বড় গুরুতর চরিত্র-ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। তিনি এক জায়গায় বেশ দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার নড়ন চড়ন অনেকটা নির্দ্দিষ্ট স্থানবদ্ধ। এইবারে দেখা যাক্, অভিজ্ঞান-শকুন্তলে তিনি ফুটিয়াছেন কি রূপে। শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের প্রণয়-ব্যাপারই অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের মূল উপাদান। দুষ্মন্ত রাজা, দুষ্মন্ত ধর্ম্মপরায়ণ, কিন্তু প্রণয় বিনা দুষ্মন্ত শকুন্তলার কেহ নহেন। কালিদাস দেখাইয়াছেন, এই ধর্ম্মপরায়ণ রাজ-হৃদয়ে ধীরে ধীরে কিরূপে তাপসবালার রূপ অধিকার বিস্তার করিল, কিরূপে সুশীল শিক্ষাসংযত দুষ্মন্ত পূর্ণ অন্তঃপুরে পরিতৃপ্ত না হইয়া রূপসীর রূপমোহে আপনাকে ধরা দিলেন। ইহা অস্বাভাবিক অথবা অনন্যপূর্ব্ব নহে। ভোগবিলাসের মধ্যে গঠিত হৃদয় স্বভাবতই রূপসীপ্রিয় একটু অধিক হয়। বিশেষতঃ সেকালে রাজপরিবারে বহুদারপরিগ্রহ প্রচলিত ছিল। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ধর্ম্মপত্নীরূপেই অঙ্গীকার করেন। রূপসীপ্রিয় বলিয়া তিনি রমণী-হৃদয় লইয়া যথেচ্ছা ব্যবহার করিতেন না। হাজার হৌক্, দুষ্মন্ত হিন্দু রাজা। তাঁহার হৃদয় মুসলমান বাদ্শাহের ন্যায় নির্ম্মম পাষাণ নহে।

শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের যে প্রণয় তাহা কতকটা দৈবঘটিত। রাজা মৃগয়ার বাহির হইয়াছিলেন—শকুন্তলার কথা তিনি আদৌ জানিতেন না—ঋষিদিগের অনুরোধে মৃগবধ হইতে বিরত হইয়া কণ্বাশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কণ্ব সোমতীর্থে গিয়াছেন। অতিথি সৎকারের ভার শকুন্তলার উপরে। দুষ্মন্ত শকুন্তলার অব্যাজমনোহর যৌবনবিকশিত অতুলনীয় রূপমাধুরী দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। রাজা বলিয়া তিনি ত মানবধর্ম্মের অতীত নহেন। শকুন্তলাও দুষ্মন্তমুগ্ধা। উভয়েই পরস্পরের রূপে মজিয়াছেন। শকুন্তলা লতা—রমণী-সুন্দরী। দুষ্মন্ত সুবৃহৎ শালতরু—পুরুষশ্রেষ্ঠ। লতা স্বভাবতই তরুস্নেহে আশ্রয় চায়, তরুও লতাকে আশ্রয় দিয়া পরিতৃপ্ত হয়। সুতরাং

দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রণয় যথোপযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু শকুন্তলাকে রাজা কিরূপে লাভ করিবেন? জাতি কুল না জানিয়া ত আর বিবাহ হয় না। শকুন্তলা কণ্বপালিতা—সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ-কন্যা। দুষ্মন্তের পক্ষে তাহা হইলে শকুন্তলালাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু মন যখন টানিয়াছে তখন সহসা ব্রাহ্মণকন্যা স্থির করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হওয়া যুক্তি-সঙ্গত নহে। দেখা যাক্, ভাগ্যে কি উঠে।

দুষ্মন্ত কৌশলপূর্ব্বক সখীদিগের নিকট হইতে শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইলেন। কণ্ব মুনি যে শকুন্তলাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক তাহা জানিতেও তাঁহার বাকি রহিল না। আশার কথা বটে। নহিলে, এই অতুল সৌন্দর্য্য হইতে রাজধানীতে তিনি কেবল আশাটুকু মাত্র লইয়া যাইতেন। আশায় আশায় রাজধানীতে যাইতে তাঁহার বিলম্ব পড়িয়া গেল, কিন্তু যখন ফিরিলেন তখন শকুন্তলা তাঁহার। আশ্রম হইতে গিয়া মাধব্যের সহিত সে দিবস তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হইল। কি ছলে পুনর্ব্বার আশ্রমে যাইবেন তাহারও পরামর্শ হইতেছিল। এমন সময়ে কয়েকজন তপস্বী গিয়া উপস্থিত হইলেন—দুর্বৃত্ত রাক্ষসগণের অত্যাচার হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। দুষ্মন্তের সুবিধাই হইল। কর্ত্তব্য সম্পাদনের সহিত স্বকার্য্য উদ্ধারের অবসর পাইলেন। শকুন্তলার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইল। এবার একটু ঘনিষ্ঠতাও জন্মিয়াছে। কণ্বের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা দুষ্মন্তের পোষাইল না। শকুন্তলাকে বুঝাইয়া গান্ধর্ব্ব বিবাহে সম্মত করিলেন। অবশেষে বিবাহের নিদর্শন-স্বরূপ স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দিয়া গেলেন। রাজধানী হইতে শীঘ্রই শকুন্তলাকে লইতে লোকজন পাঠাইবেন।

দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রণয়ের ইহাই প্রথম পরিচ্ছেদ। রূপমূলক অনুরাগে দুইজনে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইলেন। তাহার পর শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান। দুর্ব্বাসার শাপে স্মৃতিভ্রষ্ট হইয়া রাজা শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন—রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া অবধি আর খোঁজখবর লয়েন নাই। কণ্ব মুনি ইতিমধ্যে সোমতীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার পরিণয়ে তিনি বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। এবং বিবাহের পর দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে বাস অকর্ত্তব্য বলিয়া সসত্ত্বা শকুন্তলাকে বিশ্বস্ত শিষ্যসঙ্গে স্বামীর আলয়ে পাঠাইয়া দিলেন। শকুন্তলার বিদায়-দৃশ্যটী বড় চমৎকার। কালিদাসের স্বভাবানুরাগ এইখানে বিশেষ প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু আপাততঃ বাহুল্যভয়ে তাহার আলোচনা হইতে আমরা নিবৃত্ত হইলাম। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে সহধর্ম্মিণী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেন না। শকুন্তলার স্মৃতি তাঁহার হৃদয় হইতে মুছিয়া গিয়াছে। শকুন্তলাও নিদর্শন-অঙ্গুরীয়কটী হারাইয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং দুষ্মন্ত তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। "স্ত্রীসংস্থানং জ্যোতিঃ" আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল। কিছুকাল পরে আবার উভয়ের মিলন হইল।

কিন্তু এ ত গেল দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রণয়ের মোটামুটি কথা। ইহাতে দুষ্মন্তের চরিত্র বুঝা যায় কিরূপে? সুতরাং আর একটু খুঁটিনাটি আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ দেখা যাক্, রূপ হইতে কিরূপে ধীরে ধীরে দুষ্মন্তের হৃদয়ে প্রেম সঞ্চারিত হইল। বিনীতবেশে দুষ্মন্ত তপোবনে প্রবেশ করিয়াছেন। অলঙ্কার, ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি রাজ-সজ্জা সারথির নিকটে। তপোবনে এ সকল শোভা পায় না। কালিদাসের নায়কের সামঞ্জস্য-জ্ঞান বেশ আছে। তপোবনে প্রবেশ করিয়া দুষ্মন্তের দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। দক্ষিণ বাহু স্পন্দন পরিণয়সূচক। দুষ্মন্ত ভাবিলেন, এই শান্তিনিকেতনে তাঁহার বাহুস্পন্দন হয় কেন? আবার মনকে প্রবোধ দিলেন, ভবিতব্য অনিবার্য্য—যাহা হইবার হইবেই। সংস্কারের সহিত লোকের মনে যে ভাব আন্দোলিত হয়, দুষ্মন্তেরও তাহাই হইয়াছিল। দুষ্মন্তের মন প্রচলিত সংস্কারের অতীত নহে। স্ত্রীলাভসূচক বাহুস্পন্দনে তাঁহার আনন্দ হইয়াছে। কিন্তু তপোবনে স্ত্রীলাভের তাদৃশ সম্ভাবনা না থাকায় ভবিতব্যতার উপরেই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইল। এ নির্ভরও কিন্তু সন্দেহজড়িত।

এমন সময়ে নেপথ্যে রমণীকণ্ঠ শুনা গেল—"ইদো ইদো সহীও।" দুষ্মন্ত দেখিলেন, ঋষি-কন্যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘট হস্তে বৃক্ষমূলে জলসেচন করিতেছেন। এ দৃশ্য দুষ্মন্তের বড়ই ভাল লাগিল। স্বভাবতই তাঁহার মনে হইল,

"অহো মধুরমাসাং দর্শনম্।
শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ॥"

এবারে উদ্যানলতা বনলতার নিকট হার মানিয়াছে। আশ্রমবাসিনীর এমন রূপ! রাজ-অন্তঃপুরেও যে এ রূপমাধুরী দুর্লভ। দুষ্মন্ত বিস্ময়-মুগ্ধ।

এই প্রথম শকুন্তলার রূপ দুষ্মন্তের হৃদয়ে আঘাত করিল। কিন্তু এ আঘাত তেমন কিছু নহে। রূপ মানব-হৃদয়ে অল্প বিস্তর আঘাত করেই। তাহার কারণ আমাদের সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা। সুন্দর পদার্থ সহজেই নয়ন আকর্ষণ করে, মন মুগ্ধ করে। সৌন্দর্য্যের ধর্ম্মই এই। দুষ্মন্তও শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু এ অবস্থা প্রেম নহে। তবে ইহা হইতেই প্রেম অনেক সময়ে জন্মে বটে। দুষ্মন্তের এখন বিস্ময়ের ভাব। ক্রমে ক্রমে শকুন্তলার প্রতি তাঁহার একটু দয়ার উদ্রেক হইল। শকুন্তলা জলসেচন করিতে করিতে সখীদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। দুষ্মন্ত ঠাহরাইলেন, শকুন্তলাকে আশ্রম-ধর্ম্মে নিযুক্ত করা কণ্বের অসাধুদর্শিতা। এ স্বভাব-সুন্দর অতুল্য রূপরাশি তপঃসাধনে ক্ষয় করিবার চেষ্টা নীলোৎপলপত্রধারে শমীবৃক্ষ ছেদনের ন্যায়। কিন্তু কি করিবেন? এ বিষয়ে তাঁহার ত হাত নাই। অগত্যা গাছের আড়ালেই চুপ করিয়া থাকিতে হইল। সেখান হইতে তিনি শকুন্তলার

সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছেন। বল্কলেও তন্বী মনোহারিণী। স্বভাবসুন্দরীর অলঙ্কারে প্রয়োজন কি? মলিন কলঙ্কেও চন্দ্রের সৌন্দর্য্য। রাজা শকুন্তলার এই অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট। এ সৌন্দর্য্যের তুলনা কোথা?

এতক্ষণ দুষ্মন্ত মোটামুটি শকুন্তলার রূপ দেখিলেন। শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে ভাবের প্রাধান্যই তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। এ ভাবপ্রধান সৌন্দর্য্যে কে না মুগ্ধ হয়? অলঙ্কারে নয়ন আকর্ষণ করিতে পারে মাত্র। অতুল-ঐশ্বর্য্য রাজার হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না। তাঁহার নয়নও সে দিকে ফিরিয়া দেখে না। রূপসীপ্রিয় রূপ খুঁজেন। সুতরাং দুষ্মন্তের পক্ষে স্বভাবসুন্দরীর রূপে মুগ্ধ হওয়া অস্বাভাবিক অথবা দুষ্মন্তের চরিত্রগত অসাধারণ বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে। সেলিম নুরজাহানের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তখন নুরজাহান দরিদ্রের কন্যা। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যই তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল বোধ করি। কালিদাসের হাতে পড়িলে তিনিও বলিতেন, সৌন্দর্য্য স্বভাবতই সুন্দর—অলঙ্কারে তাহার আর কি হইবে। ইহা হইতে চরিত্রগত বিশেষত্ব কিছুই প্রমাণ হয় না। তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, দুষ্মন্তের রুচি বিকৃত নহে। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে মোটামুটি দেখিয়াছেন; এইবারে একটু খুঁটিনাটি। শকুন্তলার অধর কিরূপ? বাহু কেমন সুন্দর? ইত্যাদি। ভাবিয়া চিন্তিয়া মোটামুটি হইতে দুষ্মন্ত খুঁটিনাটিতে নামেন নাই। যেমন চোখে পড়ে তিনি দেখিয়াছেন। এ সকল না দেখিয়া থাকিবার যো নাই। শকুন্তলার

"অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্॥"

কিন্তু এমন সুন্দরীকে পাওয়া যায় কিরূপে? দুষ্মন্ত যতই দেখিতেছেন, শকুন্তলা লাভস্পৃহা তাঁহার ততই বলবতী হইয়া উঠিতেছে। শকুন্তলা যদি কর্ণের অসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা হয়। হইতেও পারে। "সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ"। সন্দেহস্থলে অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিই প্রমাণ। কিন্তু তাহা বলিয়া ত আর শকুন্তলা লাভ হয় না। শকুন্তলার বৃত্তান্ত যথার্থ জানিতে হইবে। ব্রাহ্মণ-কন্যা হইলে ত আর বিবাহ হইবে না। দুষ্মন্ত বড় সমস্যায় পড়িয়াছেন। এইখানেই তাঁহার সংযম যাহা কিছু প্রকাশ পায়। তেমন অসংযত চরিত্র হইলে তিনি জাতি বিচার করিতে বসিতেন না। দুষ্মন্তের সংযমের পরিচয় প্রথম, বিবাহের বাসনায়, দ্বিতীয়, শকুন্তলার জাতিবিচারে। আত্মসুখের দুয়ারে শকুন্তলাকে তিনি বলি দিতে চাহেন না। ইহাতেই তাঁহার প্রেম বুঝা যায়। এবং এই অবধিই দুষ্মন্তের সংযম। আর অসংযম তাঁহার ভোগ-অধীরতায়। পূর্ণ অন্তঃপুরেও অপরিতৃপ্তিই তাহার প্রমাণ। রূপসী দেখিলে দুষ্মন্তের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। তিনি সহজে প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারেন না।

এখন দেখিতে হইবে, দুষ্মন্তের সংযম কতদূর স্বাভাবিক এবং কিরূপ প্রবল।

আমরা দেখিলাম, রূপের বশ হইয়াও তিনি শকুন্তলার জাতি বিচার করিতেছেন। কিন্তু এইখানে কথা আছে। দুষ্মন্ত ভারতের রাজা। প্রজাদিগের নিকট তাঁহার যথেষ্ট সম্মান আছে। প্রতাপশালী হইয়াও এই সম্মানটুকু রাখিবার জন্য তাঁহাকে সাবধানে চলিতে হয়। যথেচ্ছা ব্যবহার করিলে প্রজা অসন্তুষ্ট হইবে, সম্মান ত থাকিবেই না। এই কারণেই দুষ্মন্ত অনেকটা সংযত। রাজা না হইলে বোধ করি তাঁহার এতটা সম্মান চাহিয়া থাকিতে হইত না। সুতরাং সংযমও থাকিত না। রাজ-সম্মানই তাঁহার ইন্দ্রিয়শাসক। তবে স্মৃতিভ্রষ্ট হইয়া পরিণীতা শকুন্তলাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন কেন? ঋষিদের কথায় পর্য্যন্ত তিনি শকুন্তলাকে গ্রহণ করেন নাই। তেমন রূপসী-প্রিয় হইলে এ অবসর কি ছাড়িতেন? শকুন্তলাকে তখন গ্রহণ না করিবার দুই কারণ। এক, শকুন্তলা সসত্ত্বা। কাহার পুত্রকে দুষ্মন্ত আপনার বলিয়া গ্রহণ করিবেন? দ্বিতীয়, রাজ-সম্মানের সহিত শকুন্তলা গ্রহণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার সম্মান বজায় রহিল।

সুতরাং দেখা গেল, দুষ্মন্তের সংযম অবস্থা এবং শিক্ষাগত। শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহে সম্মত করাইবার সময়ে বুঝা যায়, স্বভাবতঃ তিনি বড় সংযত চরিত্র নহেন। শকুন্তলার সখীরা দূরে গিয়াছেন। শকুন্তলা তাঁহাদের নিকটে যাইতে চাহেন। দুষ্মন্ত ছাড়িতে চাহেন না। শিক্ষা এবং অবস্থার সহিত তাঁহার স্বভাবের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। স্বভাবের জয়। তবে একটা কথা। ইহা হইতে দুষ্মন্তকে কেহ নিতান্তই ইন্দ্রিয়ের ভক্ত সেবক না ঠাহরাইয়া বসেন। ইন্দ্রিয়জয়ে তিনি যত্নশীল এবং কতকটা সক্ষমও। তথাপি রূপ তাঁহাকে কিছু অস্থির করে। দুষ্মন্ত রামচন্দ্র নহেন বলিয়াই কিন্তু তাঁহার নিন্দা করা চলে না। প্রবল রূপাকর্ষণের মধ্যেও যে তাঁহার জ্ঞান কার্য্য করিতে থাকে ইহাই যথেষ্ট। দুষ্মন্ত যাহাই হউন, অসম্পূর্ণ মানব সন্তান। ত্রুটি একটু আধটু মার্জ্জনা করিতে হইবে। তবে রোমিওর সহিত তুলনা করিয়া আমরা তাঁহাকে বাড়াইতে চাহি না। কারণ, দুষ্মন্ত একজন গণ্য মান্য বিজ্ঞ রাজা, আর রোমিও বড় ঘরের ছেলে মাত্র। উভয়ের তুলনা নিতান্তই অসঙ্গত হয়।

আমরা দুষ্মন্তকে সন্দেহের অবস্থায় ছাড়িয়া আসিয়াছি। তিনি ভাবিতেছেন, শকুন্তলা ব্রাহ্মণী কি না। এদিকে শকুন্তলাকে একটা ভ্রমর বড় বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি সখীদিগকে সেই দুর্ব্বিনীত মধুকর হইতে তাঁহাকে পরিত্রাণ করিতে বলিতেছেন। সখীরা বলিলেন, তাঁহারা কে? তপোবন রক্ষা রাজার কার্য্য—শকুন্তলা দুষ্মন্তকে আহ্বান করুন। দুষ্মন্ত এইবার অবসর বুঝিয়া বৃক্ষান্তরাল হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, দুষ্মন্ত রাজা থাকিতে তাপসবালার প্রতি অবিনয় আচরণ করে কে? তাহার পর যথারীতি তপোবনের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অনসূয়া শকুন্তলাকে পর্ণশালা হইতে পাদোদক প্রভৃতি আনিতে বলিলেন। দুষ্মন্ত কহিলেন, তাঁহাদের মধুর বাক্যেই আতিথ্য

করা হইয়াছে। দুষ্মন্ত বাক্যালাপে বিলক্ষণ পটু। মধুরালাপচ্ছলে অল্পক্ষণমধ্যেই শকুন্তলার বৃত্তান্ত জানিতে তাঁহার বড় বাকি রহিল না। যতই জানিতেছেন শকুন্তলা দুষ্প্রাপ্য নহে শকুন্তলাকে পাইবার ইচ্ছা ততই প্রবল হইতেছে। এমন কি, শকুন্তলা যখন উঠিয়া যান দুষ্মন্তের হৃদয় তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতেও অগ্রসর হইয়াছিল। কেবল "বিনয়েন বারিতপ্রসরঃ।"

দুষ্মন্ত শকুন্তলায় মজিয়াছেন। শকুন্তলার প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি। শকুন্তলার প্রত্যেক ভাবভঙ্গী তিনি বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। সুন্দরী দুষ্মন্তে অনুরক্তা। কিন্তু সে অনুরাগ ত মুখে প্রকাশ পায় না। সে অনুরাগের প্রমাণ,

"বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ
কর্ণং দদাত্যবহিতা ময়ি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসম্মুখীনা
ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ ॥"

শকুন্তলা দুষ্মন্তের কথায় যদিও কিছু বলেন না, দুষ্মন্ত কথা কহিলে কাণ খাড়া করিয়া থাকেন। দুষ্মন্তের পানে তিনি যথেষ্ট চাহিয়া থাকেন না, কিন্তু অন্য দিকেও বড় দৃষ্টি নাই। দুষ্মন্তের শকুন্তলা-হৃদয় বুঝিতে বাকি নাই। তাঁহারা পূর্ণ অন্তঃপুর—সরলা আশ্রমবাসিনীর ভাব বুঝিতে কতক্ষণ লাগে।

বহুক্ষণ মধুরালাপানন্তর আশ্রমবাসিনীরা পর্ণশালায় প্রত্যাগমন করিলেন। দুষ্মন্তও বিদায় লইলেন। বিদায়কালে দুষ্মন্তকে সখীরা বেশ গুছাইয়া বলিলেন যে, তাঁহারা অতিথির যথাযোগ্য সৎকার করিতে পারিলেন না বলিয়া বড় লজ্জিত আছেন, কোন মুখে আর তাঁহাকে পুনরায় আসিতে বলেন, ইত্যাদি। দুষ্মন্তও আপ্যায়িত করিতে কম নহেন। তিনি বিনয় প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, তাঁহাদের দর্শনেই তিনি পুরস্কৃত। শকুন্তলা বল্কল কুরবকশাখালগ্ন হইয়াছে ছল করিয়া যতক্ষণ পারেন রাজাকে দেখিয়া লইলেন। দুষ্মন্ত ধীরে ধীরে চলিয়াছেন। নগরগমনে তাঁহার বড় ইচ্ছা নাই। শকুন্তলা হইতে তিনি মনকে ফিরাইতে অক্ষম। তপোবনের অনতিদূরেই তাই আপাততঃ থাকিবেন স্থির করিলেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রথম অঙ্ক এইখানেই সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষক মাধব্যের সহিত দুষ্মন্তের কথাবার্ত্তা। সে সকল কথাবার্ত্তার বিশেষ বিবরণ এখানে অনাবশ্যক। তবে শকুন্তলা সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল বটে। বিদূষকের সহিতই সেকালে রাজাদের মন খোলাখুলি। যে সকল কথা অপরকে বলা যায় না বিদূষক তাহা জানিতে পারেন। দুষ্মন্ত ব্রাহ্মণকে শকুন্তলার রূপ নানারূপে বুঝাইয়াছেন। রূপবর্ণনাগুলি কালিদাসেরই যোগ্য। তাহার আর সমালোচনা কি করিব। দুষ্মন্তই ত বলিয়াছেন, সে রূপ যে দেখে নাই তাহার নয়ন বৃথা। বিধাতা তাহাকে সৌন্দর্য্য মন্থন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সে দেহ স্রষ্টার সামর্থ্যের চূড়ান্ত পরিচয়।

সুতরাং এ রূপ দেখিয়া অবধি দুষ্মন্তের আর তৃপ্তি নাই। দুষ্মন্ত শকুন্তলার দর্শনের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। কি ছলে পুনর্ব্বার আশ্রমে যাইবেন মাধব্যের সহিত তাহাই পরামর্শ করিতেছেন। এই সময়ে রাক্ষসপীড়িত ঋষিগণের আগমনে তাঁহার সুবিধাই হইল। অত্যাচার প্রতীকারের ছলে তিনি সহজেই তপোবনে পুনঃপ্রবেশ করিতে পারিবেন। কিন্তু এক বিঘ্ন উপস্থিত। রাজমাতা ব্রত করিবেন। দুষ্মন্তকে রাজধানীতে যাইতে হইবে। দুষ্মন্ত বড় সমস্যায় পড়িলেন। দুই দিক রক্ষা করা সহজ নহে। অগত্যা স্থির করিলেন যে, মাধব্যকে রাজমাতাসন্নিধানে পাঠাইয়া নিজে ঋষিদিগের কার্য্যে তপোবনে যাইবেন। মাধব্যকে রাজমাতা পুত্রের মত স্নেহ করেন। সুতরাং তাহাকে পাইলে তিনি কথঞ্চিৎ শান্ত হইবেন। আর নিজে তপোবন রক্ষা দ্বারা ঋষিদিগকে সন্তুষ্ট করিবেন। অধিকন্তু তপোবনে শকুন্তলা দর্শন লাভ সম্ভাবনা। কিন্তু মাধব্য যদি রাজ-অন্তঃপুরে শকুন্তলার কথা বলিয়া বসেন! সেই জন্য দুষ্মন্ত মাধব্যকে বুঝাইয়া দিলেন যে, শকুন্তলার প্রতি তাঁহার অনুরাগ সত্য নহে—এতক্ষণ পরিহাস করিতেছিলেন মাত্র। ঋষিদিগের অনুরোধেই তাঁহাকে তপোবনে যাইতে হইতেছে। ইচ্ছা তেমন নয়।

এইরূপ বুঝাইয়া মাধব্যকে রাজা রাজধানীতে পাঠাইলেন। নিজে তপোবনে চলিলেন। দুষ্মন্ত বুঝেন, শকুন্তলা পরাধীনা, কণ্বের অনুজ্ঞা ভিন্ন তাঁহার সহিত শকুন্তলার বিবাহ হইতে পারে না। কিন্তু বুঝিলে কি হয়? মন যে বুঝিয়াও বুঝেনা। মানব দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। মালিনীতীরে শকুন্তলা সখীদিগের সহিত বিশ্রাম করিতেছিলেন। রাজা সেখানে গিয়া উপস্থিত। দুষ্মন্ত এবারেও বৃক্ষান্তরালে। শকুন্তলা কৃশ হইয়া পড়িয়াছেন, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। দুষ্মন্ত কারণ নির্দ্দেশ করিলেন আতপতাপ। আবার ভাবিলেন, হয়ত শকুন্তলারও মনের অবস্থা তাঁহারই মত। সখীরাও তাহাই ঠাহরাইয়াছেন। কিন্তু শকুন্তলার মুখ হইতে একবার না শুনিলে তাঁহাদের হৃদয় তৃপ্তি মানে না। সখীরা নানা উপায়ে শকুন্তলার মনের কথা জানিতে চেষ্টা করিতেছেন। শকুন্তলা মুখ ফুটিয়া বড় কিছু বলেন না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বলিয়াও ফেলিলেন। দুষ্মন্ত গাছের আড়াল হইতে সকল শুনিতেছেন। তিনি শকুন্তলার ভাব বুঝিলেন। শকুন্তলা রাজার জন্যই ব্যাকুল। রাজা বিহনে তাঁহার প্রাণ সংশয়। দুষ্মন্তের একটু আনন্দ হইল। ভালবাসার প্রতিদানে যথার্থই আনন্দ হয়। দুষ্মন্তও শকুন্তলা সম্মিলনের জন্য অধীর। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া দুষ্মন্ত বৃক্ষান্তরাল হইতে বাহির হইলেন। প্রেমালাপ আরম্ভ হইল। দুষ্মন্তই অনেক কথা বলেন। পাশ্চাত্য রমণীর মত শকুন্তলা প্রেমালাপে দক্ষ নহেন। লজ্জা-নীরবতাই তাঁহার প্রেম-ভাষা। সখীরাই এ প্রেমের ঘটক। বলিতে কি, তাঁহারই অর্দ্ধেক ভাষা।

অনসূয়া কথায় কথায় বলিলেন, শুনা যায় রাজারা বহুদার পরিগ্রহ করিয়া থাকেন,

শকুন্তলার অবস্থা যাহাতে শোচনীয় না হয় দুষ্মন্তকে এরূপ করিতে হইবে। দুষ্মন্ত উত্তর দিলেন, রাজাদের পত্নী সংখ্যা কিঞ্চিৎ অধিক বটে, কিন্তু সকলগুলি ত আর সমান নয়,

"পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্রবসনা চোর্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্॥"

প্রিয়সখী শকুন্তলার বিষয় ভাবিতে হইবে না। শকুন্তলা প্রধানা মহিষী হইবেন।

সখীরা এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে পাইয়া বসিলেন। শকুন্তলা উঠিয়া যাইতে চাহেন। দুষ্মন্ত বলপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত করেন। শকুন্তলা তখন বলিলেন, "পোরব রক্খ অবিণঅং মঅণসন্তত্তা বি ণহু অত্তণো পভবামি।" পৌরব! অবিনয় আচরণ করিও না। মদনসন্তপ্তা হইলেও আমার নিজের উপর আমার ক্ষমতা নাই। শকুন্তলা এ অবস্থায়ও একেবারে জ্ঞানহারা হয়েন নাই। লজ্জাশীলার কর্ত্তব্যজ্ঞান এখনও প্রবল। কিন্তু দুষ্মন্ত সংযম হারাইয়াছেন। শকুন্তলা পরাধীনা জানিয়াও তিনি আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। দুষ্মন্ত গান্ধর্ব্ব বিবাহের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে চাহেন। শকুন্তলা তথাপি বুঝেন না। দুষ্মন্ত তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি কখন ছাড়িয়া দিবেন? না— যখন শকুন্তলার অধর পানে তাঁহার পিপাসা নিবৃত্ত হইবে।

"অপরিক্ষতকোমলস্য যাবৎ
কুসুমস্যেব নবস্য ষট্‌পদেন।
অধরস্য পিপাসতা ময়া তে
সদয়ং সুন্দরি গৃহ্যতে রসোঽস্য॥"

এই কারণেই আমরা বলি, দুষ্মন্তের চরিত্র সংযম-প্রধান নহে। রূপমোহের প্রথমাবস্থায় জ্ঞানক্রিয়া অল্পবিস্তর সকলেরই প্রবল থাকে। ক্রমে ক্রমেই লোকে জ্ঞানহারা হয়। দুষ্মন্তও তাহাই হইয়াছেন। ভোগাবসর তিনি ছাড়িতে চাহেন না। তবে পদমর্য্যাদা তাঁহাকে সমাজ-নিয়মের গুরুতর অবমাননা হইতে রক্ষা করে। দুষ্মন্ত রূপমুগ্ধ হইয়াও দেখেন যে, সমাজের প্রচলিত নিয়মানুসারে এরূপ মিলন অসঙ্গত হইবে কি না। সমাজ-নিয়ম উল্লঙ্ঘন তাঁহার স্বভাব নহে। তবে রিপু তাঁহার কিছু প্রবল। চেষ্টা করিয়াও সকল সময়ে তিনি তাহাকে দমনে রাখিতে পারেন না। কিন্তু অন্যান্য নানাগুণে তাঁহার এ দোষ অনেকটা ঢাকিয়া গিয়াছে।

দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ব বিধানানুসারেই বিবাহ করিলেন। শকুন্তলা দুষ্মন্তের ইচ্ছা অতিক্রম করিতে অক্ষম। বিবাহানন্তর রাজা রাজধানীতে ফিরিয়া চলিলেন। শকুন্তলাকে স্বনামাঙ্কিত একটি নিদর্শন-অঙ্গুরীয়ক দিয়া গেলেন। শকুন্তলা আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছেন—তাঁহাকে লইতে কবে লোক আসে।

ইতিমধ্যে একদিন দুর্ব্বাসা মুনি আসিয়া উপস্থিত। শকুন্তলা একমনে দুষ্মন্তকে চিন্তা করিতেছেন। দুর্ব্বাসা আসিয়া দূর হইতেই বলিলেন, "অয়মহং ভোঃ।" অন্য মনস্ক থাকায় শকুন্তলা শুনিতে পাইলেন না। দুষ্মন্তই তখন তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া। দুর্ব্বাসা শাপ দিলেন, শকুন্তলা যাঁহার ধ্যানে মগ্ন তিনি শকুন্তলাকে বিস্মৃত হইবেন। সখীরা অভিশাপ শুনিতে পাইয়া দৌড়িয়া গিয়া ঋষিবরের চরণে পতিত হইলেন। অনেক কষ্টে দুর্ব্বাসার ক্রোধের উপশম হইল। তখন তিনি কহিলেন, শাপ ত ব্যর্থ হইবার নহে, তবে অভিজ্ঞানাভরণ দর্শনে দুষ্মন্তের স্মৃতি ফিরিয়া আসিবে। এই দুর্ব্বাসার শাপ অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের মেরুদণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এখন হইতে অভিজ্ঞানশকুন্তলের যাহা কিছু ঘটনা এই শাপপ্রভাবে।

এই শাপ প্রভাবে দুষ্মন্ত রাজধানীতে গিয়া শকুন্তলার কথা ভুলিয়া গেলেন। সুতরাং শকুন্তলাকে লইতে লোকজন কেহই আসিল না। কণ্বমুনি সোমতীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের পরিণয়ে আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। শিষ্য সঙ্গে তিনি শকুন্তলাকে স্বামীর আলয়ে পাঠাইয়া দিলেন। কারণ, বিবাহের পর স্ত্রীলোকের দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে বাস বাঞ্ছনীয় নহে। শকুন্তলার বিদায়-দৃশ্যটী বড়ই সুন্দর। কালিদাসের প্রকৃতিপ্রেম এই খানে বিশেষ প্রকাশ পায়। প্রকৃতির সহিত শকুন্তলা এক। শকুন্তলা প্রকৃতিরই কন্যা। বিদায়কালে প্রত্যেক তরুলতার জন্য শকুন্তলার মন ব্যাকুল। এ সকল কি আর কখনও দেখা ভাগ্যে ঘটিবে। কণ্ব যথা-সাধ্য শকুন্তলাকে শান্ত করিতে লাগিলেন। কণ্বের কথাগুলি শুনিলে হৃদয় জুড়াইয়া যায়। শকুন্তলাকে তিনি আশীর্ব্বাদের সহিত যে উপদেশ দিলেন তাহাপেক্ষা অল্প কথায় ঐরূপ সুন্দর উপদেশ বোধ করি কেহই দিতে পারেন না। তিনি কহিলেন,

"সা স্বমিতঃ পতিকুলং প্রাপ্য
শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥"

তুমি এখান হইতে পতিকুলে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীর প্রতি প্রিয় সখীর ন্যায় আচরণ করিবে, অপমানিতা হইলেও ক্রোধবশে স্বামীর প্রতিকূল-চারিণী হইবে না, সৌভাগ্যে অগর্ব্বিতা থাকিবে; পরিজনে অনুকূলা হইবে। যুবতীরা এইরূপেই গৃহিণীপদ প্রাপ্ত হয়েন। বিপরীতচারিণীরা কুলের যাতনাস্বরূপ।

শকুন্তলা এ উপদেশ কখনও বিস্মৃত হয়েন নাই।

শকুন্তলা রাজধানীতে চলিলেন। সঙ্গে গৌতমী, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত। দুষ্মন্তের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু রাজা শকুন্তলাকে চিনিতে পারিলেন না। শকুন্তলার

রূপ কেবল তাঁহার চক্ষু আকর্ষণ করিল। শকুন্তলাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, পাণ্ডুপত্রমধ্যে কিসলয়ের ন্যায় তপোধনদিগের মধ্যে নাতিস্ফুটশরীরলাবণ্যা অবগুণ্ঠনবতী ঐ রমণী কে? প্রতিহারী বলিল, ইহাঁর আকৃতি দর্শনীয় বটে। রাজা বলিলেন, কিন্তু পরস্ত্রী দর্শনার্হা নহে। শকুন্তলার হৃৎকম্প হইতেছে। এ অবস্থায় কাহার না হয়? শার্ঙ্গরব ধীরে ধীরে শকুন্তলার কথা বলিলেন। দুষ্মন্ত কিছুই বুঝিতে পারেন না। তিনি আবার তপোবনে বিবাহ করিয়া আসিলেন কবে? গৌতমীও শকুন্তলা পরিণয়ের বৃত্তান্ত বলিলেন। দুষ্মন্ত অবাক্। এখন গৌতমী শকুন্তলার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিলেন। দুষ্মন্ত তাহাতেও চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু সেই রূপরাশি দেখিয়া তিনি কি ভাবিলেন? তিনি যাহা ভাবিলেন তাহাতে তাঁহার চরিত্র ব্যক্ত।

"ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
প্রথম পরিগৃহীতং স্যান্নবেতি ব্যবসান্।
ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন চ খলু পরিভোক্তুং নৈব শক্নোমি হাতুম্॥"

এই অম্লানশোভা রূপরাশি এখানে আসিয়া উপস্থিত। পূর্ব্বে ইহাকে বরণ করিয়াছি কি না কে জানে। ভ্রমর যেমন প্রভাতে হিমাচ্ছন্ন কুন্দকুসুমকে ভোগ করিতেও পারে না ছাড়িতেও পারে না, আমিও সেইরূপ এই রূপরাশি ভোগ করিতেও পারিতেছি না ছাড়িতেও পারিতেছি না।

ক্রমে ক্রমে শকুন্তলাকেও মুখ খুলিতে হইল। তিনি অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু স্মৃতিভ্রষ্ট রাজার স্মৃতি ফিরিয়া আসিল না। তখন শকুন্তলা অভিজ্ঞানের উল্লেখ করিলেন। দুষ্মন্ত বলিলেন, বেশ কথা, অভিজ্ঞান দেখিলে সকল সংশয় ঘুচিবে। শকুন্তলা অঙ্গুলীতে হাত দিয়া দেখেন অঙ্গুরীয়ক নাই। বুঝিলেন, নিতান্তই তাঁহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। শকুন্তলা আপনাকে দুষ্মন্তপত্নী বলিয়া কিছুতেই প্রমাণ করিতে পারিলেন না। ক্রোধে অপমানে লজ্জায় এবং তদুপরি বন্ধুজনের কঠোর বচনে শকুন্তলা মর্ম্মে মরিয়া গেলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ভঅবই বসুহে দেহি মে বিঅরং।" বসুধা স্থান দিলেন না। শকুন্তলা কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া গেলেন। "স্ত্রীসংস্থানং জ্যোতিঃ" আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল। দুষ্মন্ত পুরোহিতের মুখে এ ঘটনা শুনিলেন। তাঁহার হৃদয় বড়ই কাতর। শকুন্তলাবিবাহের কথাও মনে পড়িতেছে না, হৃদয়ও শান্ত হইতেছে না। এমন সংশয়ে দুষ্মন্ত কখনও পড়েন নাই।

কিছুদিন পরে সেই অঙ্গুরীয়ক পাওয়া গেল। এক ধীবর মৎস্যের উদর হইতে অঙ্গুরীয়ক পায়। রাজকর্ম্মচারীরা ধীবরকে সন্দেহ করিয়া ধরিয়া আনে। দুষ্মন্ত অঙ্গুরীয়ক দেখিয়াই সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার স্মৃতি ফিরিয়া আসিল। ধীবর পুরস্কার পাইল। রাজা শকুন্তলার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অনু-

তাপানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু নিরুপায়। হাতের লক্ষ্মী তিনি পায়ে ঠেলিয়াছেন। এখন আর দুঃখ করিয়া ফল কি? শকুন্তলা কি আর মিলিবে? দুষ্মন্ত ভাবিয়া ভাবিয়া শুকাইয়া যাইতেছেন। সে দুষ্মন্ত আর নাই। রাজা এখন স্ফূর্ত্তিহীন, কোনও প্রকারে জীবন-ভার বহন করিতেছেন মাত্র।

কিন্তু শকুন্তলা মিলিল। দেবকার্য্যে রাজা দ্যুলোকে গমন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিবার সময়ে শকুন্তলার সহিত সাক্ষাৎ। শকুন্তলার পুত্র সর্ব্বদমনকে দেখিয়া রাজা একটু বিস্মিত হয়েন। শকুন্তলার পুত্র বলিয়া এ বিস্ময় নহে—রাজা তাহা জানিতেন না—এই তপস্বীপরিবৃত স্থানে চক্রবর্ত্তীলক্ষণাক্রান্ত বালক দেখিয়াই তাঁহার বিস্ময়। তাহার পর সর্ব্বদমনের পরিচয় শুনিয়া এবং তাহার মাতাকে দেখিয়া দুষ্মন্তের আনন্দের সীমা রহিল না। শকুন্তলা প্রথমে অনুতাপে জীর্ণ শীর্ণ রাজাকে চিনিতে পারেন নাই। পরে যখন পরস্পর পরস্পরকে জানিলেন তখন বহুদিনের শোক তাপ ঘুচিয়া গেল। দুষ্মন্ত পুত্রসহ শকুন্তলাকে স্বালয়ে লইয়া আসিলেন। সকল দুঃখ অবসান হইল।

এতক্ষণে আমরা প্রণয়ী দুষ্মন্তের চিত্র সম্পূর্ণ করিলাম। দুষ্মন্তের প্রণয়-ব্যাপার জানিতে আমাদের আর বাকি নাই। এখন একবার এতক্ষণ দুষ্মন্তের চরিত্র আলোচনা করিয়া যাহা দেখিলাম এইখানে সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করি।

১। দুষ্মন্ত কিছু অধিক মাত্রায় রূপসীপ্রিয়। রূপ দেখিলেই তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। শকুন্তলাকে তিনি যখন যেখানে দেখিয়াছেন তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছেন। এমন কি, শকুন্তলাকে পরের স্ত্রী মনে করিয়াও দুষ্মন্ত তাঁহার রূপে ঈষৎ কটাক্ষপাত করিতে ছাড়েন নাই।

২। কিন্তু রূপসীপ্রিয় বলিয়া দুষ্মন্ত দুরাচার নহেন। অর্থাৎ রূপসীর রূপরাশি কলঙ্কিত করিয়া তিনি মজা দেখেন না। রূপসীকে তিনি ধর্ম্মপত্নীরূপে বরণ করিয়া আনিয়া স্বীয় অন্তঃপুরের শোভা বর্দ্ধন করিতে চাহেন। কিন্তু বলপূর্ব্বক নহে।

৩। স্বভাবতঃ দুষ্মন্তের সংযমশক্তি বিশেষ প্রবল বলা যায় না। অধিক রূপসীপ্রিয়তা সংযমের বিপক্ষেই প্রমাণ দেয়। কিন্তু অবস্থা এবং শিক্ষাগুণে তিনি কতকটা সংযত। রাজ-সম্মান তাঁহাকে অনেক সময়ে বাঁচাইয়া দেয়। সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন না করিয়া এবং প্রজাদিগের বিরাগভাজন না হইয়া রূপ উপভোগের অবসর তিনি সহজে পরিত্যাগ করেন না। অন্তঃপুরের অভিমান তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন।

৪। রাজ-সম্মানই যে সকল সময়ে দুষ্মন্তের সংযমের কারণ তাহা নহে। ধর্ম্মও অনেক সময়ে। রূপের প্রলোভনে তাঁহার যাহা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ মনে হয় এরূপ কার্য্য

বোধ করি তিনি করেন না। যেমন, বলপ্রকাশ। তবে রূপসীর বিবাহে অসম্মতি তাঁহার ভাল না লাগিতে পারে। দুষ্মন্ত নিষ্ঠুর নহেন।

৫। প্রেমের সম্মানভাব দুষ্মন্ত বুঝেন। সেই জন্যই অনসূয়ার কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, শকুন্তলা বহু পত্নীর মধ্যে প্রধানা হইবেন। তবে সম্মানভাব বুঝিলেও রক্ষা করিবার সামর্থ্য তাঁহার কতদূর বলা যায় না। কারণ, রূপসীপ্রিয়তা এবং ভোগতৃষ্ণার প্রাবল্য নূতন পাইলে কি করে বলা দায়।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে রূপসীপ্রিয়তাই দুষ্মন্তের চরিত্রের লক্ষণ। অন্যান্য অনেক গুণ ইহারই ফল মাত্র।

প্রণয়ী দুষ্মন্তের বিষয় আলোচনা করিবার আর বড় আবশ্যক নাই। এইবারে দুষ্মন্তকে অন্যান্য ভাবে দেখা যাক্। প্রথমতঃ দুষ্মন্ত রাজা। আসমুদ্র ভারতবর্ষ তাঁহার প্রতাপে থরহরিকম্প। না হইবে কেন? দুষ্মন্ত পরিশ্রমকাতর নহেন। রাজকার্য্য সকলই তিনি নিজে দেখেন। রাজা বলিয়া তিনি বাবু নহেন। তাঁহার শারীরিক পরিশ্রম যথেষ্ট আছে। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের প্রথমেই তাহার পরিচয়। মৃগয়া দুষ্মন্তের প্রিয় ব্যায়াম। ধনুর্ব্বাণে তিনি সিদ্ধহস্ত। শারীরিক বলে তিনি কাহাপেক্ষা হীন নহেন। শারীরিক বলে যেমন, মানসিক শক্তিতেও দুষ্মন্ত সেইরূপ। নহিলে, এই বিস্তৃত সাম্রাজ্য সুশৃঙ্খলার সহিত শাসন করিতে পারেন? তাঁহার প্রহরী আছে, কোতোয়াল আছে, সেনাপতি আছে, অমাত্য আছে; সকলেই তাঁহার প্রবল রাজশক্তি অনুভব করিয়া থাকে। তিনি সকলকে চালাইয়া বেড়ান। কিন্তু কেহ তাঁহাকে সম্পূর্ণ বশ করিতে পারে নাই। এই কারণেই তাঁহার শাসনের সুশৃঙ্খলা। তাঁহার প্রবল প্রতাপ দেবলোকেও মধ্যে মধ্যে আবশ্যক হয়।

কিন্তু এই প্রবলপ্রতাপ নরপতি গর্ব্বিত নহেন—তাঁহার স্বভাব বিনয় নম্র। তিনি সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদান দ্বারা সংকৃত করেন। জ্ঞানী ধর্ম্মপরায়ণ ঋষিদিগকে তিনি দেবতার মত দেখেন, সাধারণ প্রজাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, যাহার যাহা অভাব যথাসাধ্য মোচন করিয়া ধন্য হয়েন। বিচার কার্য্যেও তিনি সুপণ্ডিত। মৃত বণিকের বিষয় ব্যবস্থায় তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। প্রজার ধন অপহরণ করিয়া তিনি ধনী হইতে চাহেন না। বৈতালিক তাঁহাকে যথার্থই বলিয়াছে,

"স্বসুখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ
প্রতিদিনমথবা তে বৃত্তিরেবংবিধৈব।
অনুভবতি হি মূর্দ্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্॥
নিয়ময়সি বিমার্গপ্রস্থিতানাত্তদণ্ডঃ
প্রশময়সি বিবাদং কল্পসে রক্ষণায়।

অতন্দ্রিষু বিভবেষু জ্ঞাতয়ঃ সন্তু নাম
ত্বয়ি তু পরিসমাপ্তং বন্ধুকৃত্যং প্রজানাম্॥"

বাস্তবিকই দুষ্মন্ত রাজার মত রাজা—প্রজারঞ্জক। দুষ্মন্ত আত্মসুখসর্ব্বস্ব নহেন।

এ হেন সংযত রাজ-চরিত্র রূপমোহ অতিক্রম করিতে পারেন না কেন? তাহার কারণ রাজ-চরিত্রও মানব। দুষ্মন্ত আর সকল বিষয়েই সংযত। রূপসীই কেবল তাঁহাকে বশ করিতে পারেন। এইখানেই দুষ্মন্ত-চরিত্রের দুই ভাব। কিন্তু ইহার কোথাও অসংলগ্নতা দৃষ্ট হয় না। বহিঃশাসনে দুষ্মন্তের প্রতাপ দুর্দ্দম্য। অন্তঃশাসন ক্ষমতা তাঁহার তাদৃশ প্রবল নহে। বোধ করি, অন্তর অপেক্ষা বাহিরের দ্বারা দুষ্মন্তও শাসিত হয়েন। রাজারও ত শাসন আছে। দুষ্মন্ত সভ্য ভব্য ভদ্র বিনয়ী। প্রচলিত সমাজ-নিয়মের দ্বারাই তিনি চালিত হয়েন। স্বাধীন চিন্তা তাঁহার প্রকৃতি নহে। রাজা রাজড়ারা স্বাধীন চিন্তাশীল অল্পই। স্বাধীন চিন্তা ব্রাহ্মণের স্বভাব। দুষ্মন্ত ক্ষত্রিয় রাজা। ব্রাহ্মণের বিধানই তাঁহার কার্য্যের মেরুদণ্ড। শুধু তাঁহার বলিয়া নহে, প্রাচীন সমাজ ব্রাহ্মণের বেদ-বাক্য অবলম্বন করিয়াই উন্নতিশিখরে উঠিয়াছিল। দুষ্মন্ত এই বিধানানুসারেই রূপসীপ্রিয়তা চরিতার্থ করিতে পারিয়াছিলেন। এবং এই বিধানের গুণেই তাঁহার যতটুকু সংযম। সে বিধান আর কিছু নহে—বহু বিবাহ এবং ব্রাহ্মণকন্যা-বিবাহ-নিষেধ।

অভিজ্ঞানশকুন্তলে রাজা দুষ্মন্ত মানব দুষ্মন্তের সহিত মিশিয়া সম্পূর্ণ। কালিদাস এক প্রণয় কাহিনীর মধ্যে দুষ্মন্ত-চরিত্রের সকল দিক ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। দুষ্মন্ত চরিত্র তিন ভাবে ফুটিয়াছে। দুষ্মন্ত রাজা, দুষ্মন্ত সমাজের একজন ব্যক্তি মাত্র, দুষ্মন্ত প্রণয়ী। আরও এক ভাবে দুষ্মন্তকে দেখা যাইতে পারে। দুষ্মন্ত পুরুষ। শকুন্তলায় দুষ্মন্ত চরিত্রে পুরুষ-জাতির ভাব বিশেষ ব্যক্ত হইয়াছে। দুষ্মন্ত শারীরিক বলে বলীয়ান বলিয়া নহে, তাঁহার মানসিক গঠন আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাব অনেকটা পরিস্ফুট হয়। শকুন্তলার সহিত তাঁহার ভাব মিলাইয়া দেখিলে এ বিষয়ে আর কোনও সংশয় থাকে না। শকুন্তলাও দুষ্মন্তের প্রেমে পড়িয়াছেন, দুষ্মন্তও শকুন্তলায় মুগ্ধ; কিন্তু স্ত্রী এবং পুরুষের স্বাভাবিক ভাব অনুসারে উভয়ের প্রেম কত বিভিন্ন। শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ভালবাসিয়া অবধি তাঁহাতেই তন্ময়। অতিথি দ্বারে আসিয়া ফিরিয়া যায়, শকুন্তলা তাহা জানেনও না; অভিশাপ উচ্চৈঃস্বরে শকুন্তলার সর্ব্বনাশ সাধন করে, শকুন্তলা তাহা শুনিতে পান না। ভালবাসার পাত্রের সহিত মিশিয়া শকুন্তলা আপনার অস্তিত্ব হারাইয়াছেন। শকুন্তলাপ্রেমে দুষ্মন্তের অস্তিত্ব আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। বহির্জ্জগতের সহিত তাঁহার সহস্র কর্ত্তব্য-সম্বন্ধ এই প্রেমের মধ্য দিয়া সুপরিস্ফুট। বাস্তবিক, রমণীহৃদয় একজনের প্রেমে যেরূপ অগাধ পরিতৃপ্তি অনুভব করে, পুরুষ-হৃদয় কিছুতেই তাহা পারে না। এই গভীর পরিতৃপ্তিতেই রমণীর অস্তিত্ব অনেকটা মিশাইয়া

যায়। পুরুষের স্বভাবই অতৃপ্তি। এই জন্যই তাঁহার অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্বে মিশিয়া এক হইয়া যায় না। অপরের অস্তিত্বই তাহাতে মিশিয়া থাকে।

দুষ্মন্ত রীতিমত পুরুষ-চরিত্র। তাঁহার হৃদয় আছে, কিন্তু সে হৃদয়ের সহিত মস্তিষ্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। হৃদয় তাঁহার বুদ্ধির হাত ধরিয়া চলে। রমণীর হৃদয় অনেকটা স্বতন্ত্র। মস্তকের সহিত তাহার বড় সম্বন্ধ নাই। এই কারণেই রমণীর চরিত্রে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণতার প্রাবল্য। আমরা রমণীর এই সঙ্কীর্ণতাটুকুর জন্য বড় দুঃখিতও নহি। রমণীর অর্দ্ধেক শ্রীই এইখানে। কিন্তু বিস্তৃতিপ্রধান পুরুষচরিত্রে উদারতা বিশেষ আবশ্যক। দুষ্মন্তের এ উদারতা না থাকিলে তাঁহার বিচারের প্রশংসা বোধ করি শুনা যাইত না। এই গুণেই তিনি রাজা। দুষ্মন্ত-চরিত্রের পুরুষ-ভাব তাঁহার রাজ-ভাবের মধ্য দিয়া বরাবর প্রবাহিত। কালিদাস স্ত্রী এবং পুরুষের ভাবের স্বাতন্ত্র্য বেশ বুঝিতেন। সেই জন্য তাঁহার নাটকের কোনও চরিত্রে এই ভাবের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। দুষ্মন্ত এই ভাবেই রাজা এবং এই ভাবেই শকুন্তলার সহিত তাঁহার প্রণয়-সম্বন্ধ। দুষ্মন্তকে পুরুষ করিয়াই কালিদাস তাঁহার চরিত্রগত সংলগ্নতা বজায় রাখিয়াছেন।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৌগোলিক প্রশ্ন।*

১। বঙ্গদেশে অনেকগুলি ব্রহ্মবাসী জুটিয়া কলরব তুলিয়াছে কোথায়?

২। পূর্ব্বাঞ্চলে কোন্ সহরে লোকে বঙ্গাব্দকে বরণ করে?

৩। গোস্বামীকুলের প্রবল শাসনে কোন্ পল্লীতে ভক্ষ্য এবং ভক্ষকের মধ্যে ব্যবধান স্থাপিত হওয়ায় পুঙ্গবেরা অনাহারে মরিতেছে?

৪। লোকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া জীবনকে উপেক্ষা করিয়া যায় কোন্ দেশে?

৫। কোন্ দেশে কৃষ্ণ বৈ আর বর্ণ নাই?

৬। পাশ্চাত্য নগরের নাম জিজ্ঞাসা করিলে ক্ষমতার পরিচয় গ্রহণ করা কোথাকার রীতি?

৭। ওলন্দাজ জাতি পৃথিবীর নিকট পরাজয় স্বীকার করে কোথায়?

৮। এবং কোথায়ই বা ফুলশরের নিজ সহর?

---

* শ্রাবণ মাসের ভৌগোলিক নবম প্রশ্নের উত্তর ভুলক্রমে "আসাম" ছাপা হইয়াছে। "আসাম" না হইয়া "আনাম" হইবে। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় ইহার ঠিক্ উত্তর দিয়াছেন।

প্রাচীন সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য।

মৃচ্ছকটিক প্রকরণ।

(৩)

চতুর্থ অঙ্ক।

যখন মদনিকা সর্ব্বিলকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"চল, আর্য্যা তোমায় ডাকিতেছেন," সর্ব্বিলক তখনি বড়ই সন্দেহের মধ্যে আলোড়িত হইতে লাগিল। ঘৃণা, লজ্জা, অনুশোচনা ইত্যাদি ধীরে ধীরে তাহার মনঃক্ষেত্র অধিকার করিল। সে ভাবিল আমিত চৌর্য্য বৃত্তি দ্বারা এই সমস্ত অলঙ্কার চারুদত্তের জীর্ণগৃহ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। অলঙ্কারগুলির প্রকৃত অধিকারিণী বসন্তসেনা, চারুদত্ত তাহার রক্ষকমাত্র। এরূপ স্থলে কেমন করিয়া অম্লান মুখে তাহার সম্মুখে গিয়া এইগুলি তাহাকে প্রত্যর্পণ করি? কিন্তু তাহার প্রণয়পাত্রী মদনিকার উপদেশ লঙ্ঘন করাও তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে সুতরাং সে কুণ্ঠিত চিত্তে বসন্তসেনার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"আপনার মঙ্গল হউক—আর্য্য চারুদত্ত আপনাকে জানাইয়াছেন যে তাঁহার গৃহ অতিশয় জীর্ণ সুতরাং এই সুবর্ণ ভাণ্ড রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে বড়ই দুরূহ কার্য্য। তিনি আপনাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন—আপনি পুনঃ গ্রহণ করুন।"

বসন্তসেনা অন্তরাল হইতে ইহাদের সব কথাই শুনিয়াছিলেন, প্রকৃত ঘটনা কি তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানিয়াছিলেন। সর্ব্বিলক রত্নভাণ্ড রাখিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া তিনি বলিলেন—"আর্য্য! আপনাকে একবার চারুদত্তের নিকটে আমার কয়েকটী কথা জ্ঞাপন করিতে হইবে।"

সর্ব্বিলক বড়ই সঙ্কটে পড়িল। সে চারুদত্তের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে—আবার কোন মুখে সেই মহানুভব দরিদ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইবে; সুতরাং সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। বসন্তসেনা তাহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন—"দেখুন আর্য্য চারুদত্তের সহিত আমার এই প্রকার কথা আছে—যে ব্যক্তি এই সমস্ত অলঙ্কারগুলি আমায় প্রত্যর্পণ করিবে, তাহার হস্তে আমি মদনিকাকে সমর্পণ করিব। অতএব কেবল আমি নহি—তিনিও তোমার হস্তে প্রকারান্তরে মদনিকাকে সমর্পণ করিতেছেন।" সর্ব্বিলক ভাবিল "এ ত বড় মন্দ নয়—আমি সেই ব্রাহ্মণের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিলাম—তাহার পুরস্কার স্বরূপ মদনিকারূপ আশাতীত রত্ন লাভ হইল। কিন্তু কথাটা বড় সোজা বোধ হইতেছে না—বসন্তসেনা নিশ্চয়ই কোন উপায়ে মদনিকার প্রতি আমার আসক্তি ও এইমাত্র যে সমস্ত কথোপকথন হইয়াছে, তাহার সমুদায়ই জানিতে পারিয়াছেন। ধন্য

বসন্তসেনা!! আর ধন্য সাধু আর্য্য চারুদত্ত। গুণোপার্জ্জনেই পুরুষের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য—কেননা নিগুর্ণ পুরুষ ধনবান হইলেও গুণবান দরিদ্র পুরুষের সমতুল্য হইতে পারে না। অমৃতবর্ষী চন্দ্রমা কেবল নিজগুণ প্রভাবেই দেবাদিদেব মহাদেবের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন।”

সর্ব্বিলক মনে মনে এই সমস্ত আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে বসন্তসেনা স্বীয় পরিচারককে একখানি কর্ণীরথ আনিতে আদেশ করিলেন। যান প্রস্তুত হইলে তিনি মদনিকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“মদনিকে! এই ব্রাহ্মণ কুমারের হস্তে তোমায় সমর্পণ করিলাম, তুমি রথে আরোহণ করিয়া ইহাঁর সহিত প্রস্থান কর। আজ হইতে তুমি দাসীত্ব হইতে মুক্ত হইলে। কিন্তু দেখো আমায় ভুলিও না।” মদনিকা এই কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল, বসন্তসেনা তাহাকে সুমিষ্ট সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ প্রদান করিয়া বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন। সর্ব্বিলক ও মদনিকা পরস্পরের অভীষ্ট লাভ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

সর্ব্বিলকের প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই ভৃত্য আসিয়া বসন্তসেনাকে সংবাদ দিল চারুদত্তের নিকট হইতে এক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন। এই সংবাদে বসন্তসেনা অতিশয় প্রফুল্লচিত্তা হইয়া কহিলেন—“চেটি! সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে অতি সমাদরে আমার নিকট লইয়া আইস।” আগন্তুক আর কেহই নহেন—স্বয়ং মৈত্রেয়। চারুদত্ত বসন্তসেনার অপহৃত অলঙ্কারের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যে রত্নাবলী প্রদান করিয়াছিলেন—মৈত্রেয় তাহাই লইয়া আসিয়াছেন। মৈত্রেয় বসন্তসেনার প্রকাণ্ড পুরীর কথা লোকমুখে শ্রুত ছিলেন, কিন্তু কখনও তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন নাই এবং তাহার কোন কারণও উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে পুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনে মনে মোহিত হইতে লাগিলেন। বসন্তসেনার পুরী আট মহল, ঐশ্বর্য্যের সহায়তায় যাহা কিছু রমণীয় বস্তুর একত্র সমাবেশ করা যাইতে পারে, এই পুরীতে তাহার সমস্তই একাধারে বর্ত্তমান। মৈত্রেয় প্রথম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—অত্যুন্নত অতি শুভ্র, অতিদীর্ঘ, গগনস্পর্শী তোরণ দ্বারা পুরী প্রবেশ পথ সূচিত হইয়াছে। সেই তোরণের অধোভাগ সুগন্ধি সলিল দ্বারা পরিসিক্ত এবং উপরিভাগ নানাবিধ সুগন্ধি মাল্য ও আম্র শাখায় পরিশোভিত। সেই প্রকাণ্ড তোরণ সুবর্ণ খচিত, তাহার উভয় পার্শ্বে মল্লিকা মালা দোদুল্যমান; দ্বার পার্শ্বে বেদির উপর স্ফটিক মঙ্গল কলস ও সর্ব্বাগ্রভাগ নানাবিধ ধ্বজ পতাকাদিতে সজ্জিত—মৃদুমন্দ বায়ুবেগে সেই সমস্ত পতাকা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে—মৃদুল পবনে সেই সুরভি কুসুমসম্ভার সম্ভূত মদগন্ধ পতাকাদির সহিত একত্র সঞ্চালিত হইয়া যেন আগন্তুকগণকে পুরীপ্রবেশ করিতে আহ্বান করিতেছে।

মৈত্রেয় প্রথম প্রকোষ্ঠে তোরণ পার হইয়া পুরী প্রবেশ করিলেন। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে

গো, মহিষ, অশ্বশালা। তিনি দেখিলেন—কোথাও বা তৈলাক্ত শৃঙ্গধারী কর্ণীরথবাহী বলীবর্দ্দ সকল সমীপস্থ তৃণ পত্রাদি ভক্ষণে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হইয়া বদ্ধ রহিয়াছে। কুত্রাপি এক একটি মহিষ, অবমানিত কুলীনের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। একদিকে যুদ্ধ সমাপনান্তে মল্ল পুরুষের ন্যায় মেষের গ্রীবা মর্দ্দিত হইতেছে, কোথাও বা অশ্ব সকলের গ্রীবা-লোমের সংস্কার হইতেছে। এক একটি শাখামৃগ অশ্বশালায় তস্করের ন্যায় দৃঢ়-রূপে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অন্য দিকে হস্তিপালকেরা ঘৃতমিশ্রিত অন্নপিণ্ড, হস্তি-বৃন্দকে ভক্ষণ করাইতেছে। দ্বিতীয় মহলের পর তৃতীয় মহল—এটী অভ্যর্থনা গৃহ বা Reception room। এখানে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের উপবেশনার্থ আসন সকল বিরচিত হইয়া রহিয়াছে। কোনস্থানে একখানি পুস্তক অর্দ্ধ পঠিত হইয়া আসনের উপরিভাগে অনাবৃত হইয়া রহিয়াছে। কোথাও বা মণিময় গুটিকার সহিত পাশ ক্রীড়ার বিচিত্র আসন সমূহ শোভা পাইতেছে। নায়ক নায়িকার প্রণয় ভঙ্গে ও সম্মিলনে সুচতুর গণিকা ও বৃদ্ধ বিট পুরুষেরা বিবিধবর্ণে চিত্রিত চিত্রপট হস্তে করিয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছে। ইহার পর মৈত্রেয় চতুর্থ মহলে প্রবেশ করিলেন। চতুর্থ মহলে বসন্তসেনার সঙ্গীতশালা। এখানে মৃদঙ্গ সকল যুবতীগণের কোমল কর নিপীড়নে বাদিত হইয়া শরৎকালীন জলধরের ন্যায় গুরু গম্ভীর শব্দ করিতেছিল। পুণ্য ক্ষয় হেতু গগন হইতে পতিত তারকা বৃন্দের ন্যায় সমুজ্জ্বল করতাল সকল পরস্পর মিলিত হইয়া কেমন সুমধুর শব্দ উৎপাদন করিয়া মৃদঙ্গ রবের সহিত মিশিতে-ছিল। মধুকর ধ্বনির ন্যায় সুমধুর বেণুধ্বনি গৃহভিত্তির চতুষ্পার্শ্ব পরিকম্পিত করিতেছিল। প্রণয় কোপে কুপিতা কামিনীর ন্যায় তানপূর্ণ বীণাগুলি কেমন মধুর নিনাদে গৃহ মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। গণিকাগণ মধুমত্ত মধুকরীর ন্যায় সুস্বরে গান করিতে করিতে ভূষণ-শিঞ্জনের সহিত তাল মান লয়ে নৃত্য করিতেছিল। কেহ কেহ বা মনের আবেশে নাট্য শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছে, এবং ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া শীতল বায়ু সঞ্চারে স্নিগ্ধ গবাক্ষ বক্ষস্থ পূর্ণকলস হইতে শীতল জল পান করিতেছে। মৈত্রেয় সঙ্গীতশালা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পঞ্চম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম প্রকোষ্ঠ রন্ধনশালা। উদরপরায়ণ ব্রাহ্মণ এখানে আসিয়া আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। রসনার জল সঞ্চারের সহিত তাঁহার মনে নানাবিধ ভাব সঞ্চার হইতে লাগিল। বিদূষক স্বয়ং পাকশালার কিরূপ বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন—পাঠক শুনুন। মৈত্রেয় বলিতেছেন অহো! এই পঞ্চম প্রকোষ্ঠে দরিদ্র জনের লোভজনক তৈলপক্ব হিঙ্গু গন্ধ ইতস্ততঃ প্রসৃত হইতেছে—বিবিধ গন্ধযুক্ত ধূমরাশি বহির্গত হওয়ায় নিরন্তর বহ্নিতাপে সন্তাপিত হইয়া পাকশালা যেন দ্বাররূপ মুখ দ্বারা ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়িতেছে। বহুবিধ অন্ন ব্যঞ্জনাদির সুরভি গন্ধ আমাকে সুরূপশালিনী যুবতী কামিনীর

ন্যায় প্রলোড়িত করিতেছে। কোথায় বা পশুঘাতক জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় হত পশুর উদর-চর্ম্ম প্রক্ষালন করিতেছে, কোথাও বা সূপকার রসনালোভনকারী নানাবিধ পিষ্টক ও পায়সাদি প্রস্তুত করিতেছে। হায়! আমাকে কেহ কি "এখানে কিছু আহার করুন" বলিয়া পাদ প্রক্ষালনার্থে জল প্রদান করিবে না? কিন্তু হায়! উদরপরায়ণ মৈত্রেয়কে কেহই সে প্রকারে সম্বর্দ্ধনা করিয়া পাদ প্রক্ষালনার্থে জল প্রদান করিল না দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠ বসন্তসেনার রত্ন গৃহ। এই প্রকোষ্ঠ নানাবিধ সমুজ্জল রত্নরাজিখচিত, ইহার দ্বার সমূহ হিরণ্ময়—গৃহভিত্তি নীল মণিতে পরিবেষ্টিত। সকলেই পরস্পরের মধুর জ্যোতি বিকাশ করাতে সেখানে ইন্দ্রধনুর শোভা সম্পাদিত হইয়াছে। কোথায় বা সেই রত্নখচিত গৃহ মধ্যে বণিকগণ বৈদূর্য্য, মৌক্তিক প্রবাল, পুষ্পরাগ পদ্মরাগ, মরকত, ইন্দ্র নীল, প্রভৃতি বহুল রত্নরাশি লইয়া পরীক্ষা করিতেছে। স্বর্ণকারেরা স্বর্ণ নির্ম্মিত অলঙ্কারে হীরকাদি বদ্ধ করিতেছে। কেহ কেহ রক্ত সূত্রে সুবর্ণালঙ্কার ও মণিময় হার গাঁথিতেছে। কেহবা বৈদূর্য্য প্রভৃতি মণি সমূহকে ও প্রবালাদিকে শাণিত শাণে ঘর্ষণ করিতেছে—কেহবা শঙ্খের মধ্যে ছিদ্র করিতেছে—কেহ বা আর্দ্র কুঙ্কুম ও অন্যান্য গন্ধ দ্রব্য শুষ্ক করিতেছে। কেহ বা নানাবিধ গন্ধ দ্রব্যের একত্র সমাবেশ করিতেছে। দাসীগণ নায়ক নায়িকাদিগকে কর্পূরপূর্ণ তাম্বুল দিতেছে—কোথাও বা হাস্য পরিহাসে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোথাও বা বহুজনে একত্রিত হইয়া মদিরা পান করিতেছে। চারিদিকে চেট্ ও চেটীগণ পরিভ্রমণ করিতেছে। * * *

সপ্তম প্রকোষ্ঠ চিড়িয়াখানা। মৈত্রেয় পক্ষীশালার মধ্যভাগে গিয়া দেখিলেন কপোত কপোতীগণ, পোত পালিকায় সুখে অবস্থান পূর্ব্বক প্রেমোন্মত্ত হইয়া পরস্পরকে চুম্বন করিতেছে। পিঞ্জরস্থ শুকপক্ষী দধি ভক্ষণে উদরপূরণ করিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় শুদ্ধ কণ্ঠে পাঠ করিতেছে। মদনশারিকা গৃহদাসীর ন্যায় নিয়ত ফুরফুর শব্দ করিতেছে। কপিঞ্জল প্রভৃতি যুদ্ধপ্রিয় পক্ষীগণ পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে, এবং ময়ূর ময়ূরীগণ প্রাসাদের উপরিভাগে মনের আনন্দে নৃত্য করিতেছে এবং সেই আনন্দবশে আহার পুচ্ছরাশি শত শত চন্দ্রকের শোভা অঙ্গে ধারণ করিয়া উন্মুক্ত ও ঈষৎ বায়ুভরে কম্পিত হওয়াতে বোধ হইতেছে—যেন আতপ তাপিত প্রাসাদকে ব্যজন দ্বারা শীতল করিতেছে। শশধর কিরণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ রাজহংস ও রাজহংসীগণ মৃদু মধুরগামিনী কামিনীগণের গতি শিক্ষা নিমিত্তই যেন উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিতেছে। কি চমৎকার এই গণিকা ভবন!! যথার্থই যেন নন্দন কাননের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এখন যাই কোন দিকে।

বসন্তসেনার প্রকাণ্ড পুরী দেখিয়া মৈত্রেয় মন্ত্র-বিমুগ্ধবৎ হইয়া উঠিলেন। এই আটটি প্রকোষ্ঠের কোনস্থলেই তিনি যখন বসন্তসেনাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন

সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন চেটি! তোমার আর্য্যা কোথায়? চেটী তাঁহাকে বৃক্ষবাটিকা দেখাইয়া দিল। কিন্তু বৃক্ষবাটিকার কি অনুপম সৌন্দর্য্য? শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত, পাটল, ধূমল, ধূসর, প্রভৃতি নানাবর্ণের কুসুমাবলী বিকসিত হওয়ায় তরু নিকর মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। যুবতীগণের কোমলাঙ্গ রক্ষিত হইবার উপযোগী দোলাযন্ত্র সান্দ্রপাদপ-বীথির মধ্যে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। স্বর্ণযুথিকা, শেফালিকা, মালতী, মল্লিকা, নবমল্লিকা, কুরুবক, মাধবীলতা প্রভৃতি নানাবিধ সুরঞ্জিত সুবাস প্রসূনসমূহ রত্ন প্রস্তরময় বেদির চতুষ্পার্শ্বে ইতস্ততঃ স্বত প্রক্ষিপ্ত হইয়া নন্দনের শোভা সম্পত্তিকে তুচ্ছ করিতেছে। এদিকে অভিনব সূর্য্য কিরণ সদৃশ রক্তবর্ণ কমল ও রক্তোৎপল বহুল পরিমাণে প্রফুল্ল হওয়ায় দীর্ঘিকা সন্ধ্যাকালীন শোভা ধারণ করিয়াছে। এই অশোক পুষ্প অভিনবোৎপন্ন রক্তবর্ণ পুষ্প ও পল্লবে বেষ্টিত হইয়া সমর মধ্যে ঘন ঘন রক্তচন্দনে চর্চ্চিতদেহ বীর-পুরুষের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

মৈত্রেয় দেখিলেন বসন্তসেনা রত্নময় বেদির উপর বসিয়া আছেন, মৈত্রেয়কে সহসা দেখিয়া বসন্তসেনা প্রফুল্লচিত্তে চারুদত্তের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে আসন প্রদান করিলেন। পরে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মৈত্রেয় বলিলেন— "চারুদত্ত শীর্ষে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া আপনাকে জানাইয়াছেন যে আপনার রক্ষিত সেই সুবর্ণভাণ্ড তিনি দ্যূত ক্রীড়ায় হারাইয়াছেন—এবং তৎপরিবর্ত্তে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এই রত্নাবলী প্রেরণ করিয়াছেন। বসন্তসেনা পূর্ব্বেই প্রকৃত ঘটনা অবগত হইয়াছিলেন সুতরাং তিনি মনে মনে বলিলেন হায়! সুবর্ণভাণ্ড চৌরে লইয়াছে কিন্তু অভিমান বশতঃ "দ্যূত ক্রীড়ায় হারাইয়াছি" চারুদত্ত এইকথা বলিয়াছেন। তাঁহার এত গুণ দেখিয়াই ত আমি তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছি। পরে প্রকাশ্যে বলিলেন "আর্য্য, আমি তৎপ্রদত্ত রত্নাবলী সাদরে গ্রহণ করিলাম, আপনি চারুদত্তকে জানাইবেন আমি অদ্য সন্ধ্যার সময় তাঁহার দর্শনার্থে যাইতেছি।"

মৈত্রেয় ভাবিয়াছিলেন বসন্তসেনার যখন এত ঐশ্বর্য্য তখন সে নিশ্চয়ই রত্নাবলী প্রত্যর্পণ করিয়া শীলতা প্রকাশ করিবে। কিন্তু এক্ষণে তাহাকে রত্নাবলী গ্রহণ করিতে দেখিয়া কিছু কুণ্ঠিত হইলেন, মনে মনে ভাবিলেন "আবার আমাদের বাড়ী যাইতে চাহিতেছে কেন, আরও কিছু লইবে নাকি? আমি আর্য্যকে গিয়া বলিব—যেন তিনি একেবারে এই বেশ্যার সংসর্গ পরিত্যাগ করেন।"

মৈত্রেয়ের ক্ষুব্ধ হইবার আরও অনেক কারণ ছিল। বসন্তসেনার প্রধান দোষ সে সামাজিকতা ও লোক লৌকিকতা কিছুই জানে না। বড় out of etiquette. তাহার কি এ বুদ্ধি জোগাইল না যে সদাশয়তা প্রকাশ করিয়া বলে—"আর্য্য মৈত্রেয়! আপনি শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন—পাদ প্রক্ষালনাদি করিয়া শ্রান্তি দূর করুন এবং কিঞ্চিৎ জলযোগ

করুন।” বস্তুতঃ আমরাও বলি এ অনুরোধ না করাতে বসন্তসেনার বড়ই প্রগল্‌ভতা হইয়াছিল।

পঞ্চম অঙ্ক।

বর্ষা ঋতু বিষাদের। প্রকৃতির ষড় ঋতুর ন্যায় মনুষ্য জীবনে ষড় ঋতু আছে। যখন নিতান্ত দুর্দ্দিন আসিয়া পড়ে—মানব চারিদিক হইতে ভীষণ দুঃখভারে আক্রান্ত হয়—অতীতের সুখস্মৃতি, মধ্যে মধ্যে প্রাবৃটের মেঘান্তরালবর্ত্তী সৌদামিনীর আবির্ভূত হইয়া তাহাকে আরও যন্ত্রনার পথে অগ্রসর করে—হৃদয় যখন বজ্রবিদগ্ধ পুষ্পের ন্যায় সম্পূর্ণ নীরস হইয়া যায়, তখন মানব-জীবনের বর্ষা আসে।

চারুদত্তের জীবনে বর্ষা সঞ্চার অনেক দিন হইতেই হইয়াছে—দারিদ্রতার ঘন মেঘ-জালে তাঁহার হৃদয় ঘোরতর সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। বর্ষা ঋতু স্বাভাবিক ধর্ম্মবশে যেমন প্রকৃতির মুখ হইতে আনন্দ কাড়িয়া লইয়া থাকে, সেইরূপ চারুদত্তের মনে, দারিদ্রতার বিষণ্ণতা আনন্দের স্থল অধিকার করিয়াছে। গগণে মধ্যে মধ্যে সৌদামিনী স্ফুরিত হইয়া যেমন সেই ভীষণাকার ঘোর কৃষ্ণ মেঘরাজিকে আরও ভীষণ মসীময় করিতেছে। চারুদত্তের মনে অতীত সুখস্বপ্ন-স্মৃতি মধ্যে মধ্যে তাঁহার বর্ত্তমান ঘোরতর নিরাশার তামসিকতা আরও বাড়াইয়া দিতেছে।

চারুদত্ত বিমর্ষ ভাবে চিন্তানিমগ্ন। বর্ষা তাঁহাকে চিন্তা আনিয়া দিতেছে। তাঁহাকে কেন—অনেককেই দিয়া থাকে। মেঘ আকাশে উঠিয়াছে, গৃহ ময়ূরগণ নব জলধর দেখিয়া আনন্দিত মনে, উন্মুক্ত চন্দ্রক রাশিবৎ পিচ্ছসজ্য বিস্তার করিয়া গগনমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিতেছে। চারুদত্ত মৈত্রেয়কে বসন্তসেনার নিকট পাঠাইয়া চিন্তাকুলিত চিত্তে নানা বিষয় ভাবিতেছেন। কখনও দেখিতেছেন মেঘ সকল জলার্দ্র মহিষের উদর ও ভ্রমর সদৃশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, তাহার মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ স্ফুরণ। তার পর মূষলধারে বৃষ্টি—সেই বৃষ্টি পবিত্র ধারা রজতময় হইয়াও অন্ধকারে কখনও বা অদৃষ্ট হইতেছে, আবার কখনও বা ক্ষণিক বিদ্যুৎ স্ফুরণে বিশেষরূপে পরিদৃশ্যমান হইতেছে। বিচিত্রাকার জলদজাল পবন বেগে উড্ডীয়মান হইয়া কোথাও বা চক্রবাক মিথুনের ন্যায়—কোথাও বা উড্ডীয়মান হংসাবলীর ন্যায়—আবার কখনও বা উর্দ্ধে বিক্ষিপ্ত মৎস্য মকরাদির ন্যায়—কোথাও বা প্রকাণ্ড অট্টালিকার শোভা বিস্তার করিতেছে। অম্বরতল মেঘ পটলে আচ্ছন্ন হইয়া ধৃতরাষ্ট্র সৈন্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে, ময়ুর মেঘ দর্শনে উন্মত্ত হইয়া দ্যূত ক্রীড়ার জয়লাভে গর্ব্বিত দুর্য্যোধনের ন্যায় আনন্দে শব্দ করিতেছে। কোকিলগণ বর্ষাকাল সমাগত দেখিয়া দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত যুধিষ্ঠিরের ন্যায় নিঃশব্দ হইয়া রহিয়াছে। হংসকুল পাণ্ডব গণের ন্যায় অরণ্য মধ্যে গিয়া অপরিজ্ঞাত স্থানে অবস্থান করিতেছে। চারুদত্তের মনে এই প্রকার নানাবিধ চিন্তা-তরঙ্গ বিশৃঙ্খল ভাবে—পর্ব্বতগাত্র প্রতিহত নির্ঝরণীর ন্যায় উঠিতেছে, পড়িতেছে—এমন সময়ে মৈত্রেয় আসিয়া দেখা দিলেন।

ক্রমশঃ।

ভারতে স্ত্রীশিক্ষার ফল।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে সময়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন,তখন ভারতে স্ত্রীজাতির কি শোচনীয় দুর্দ্দশা ছিল। সে বেশী দিনের কথা নয়—আজ সবে ৭০ বৎসর। তখন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা স্বপ্নবৎ ছিল। সহস্র মাইলের মধ্যে একটীও বালিকা বিদ্যালয় দৃষ্টিগোচর হইত না। পাড়াগাঁয়ে একথা বলে এমন সাধ্য কার। আর বিধবাগণ? আহা সে কথা মনে করিতেও এখন প্রাণ শিহরিয়া উঠে। যে নৃশংস প্রথায় জোর করিয়া অসহায়া নিরপরাধিনী বিধবাদিগকে মৃত স্বামীর সহিত জীবন্ত ভস্মসাৎ করিত, সে প্রথা মনে করিতে আমাদের আর প্রবৃত্তি হয় না। রামমোহনের পূর্ব্বে স্বপ্নেও কেহ অভাগিনীদের সুখের কথা ভাবিয়াছেন কি? শুভক্ষণে ইংরাজি শিক্ষা দেশে প্রচলিত হইল—ইংরাজি শিক্ষার সহিত দেশের অবস্থা আশ্চর্য্যরূপে ফিরিল। স্ত্রীগণ সমাজের প্রকৃত ভিত্তি ও সৌন্দর্য্য, ইহা অতি সত্য কথা। যাহা সত্য, তাহা পুরাণ ও বহু ব্যবহৃত হইলেও তাহার গৌরব যায় না। তাই "স্ত্রীয়শ্চ শ্রিয়শ্চগেহেষু ন বিশেশোঽস্তি কশ্চন।" হিন্দুদিগের সেই পুরাণবাক্য আজিও সমানভাবে আদৃত। হিন্দু সমাজে যতদিন এই নীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে, যতদিন রমণীগণের যথোপযুক্ত সম্মান ও যত্নের ক্রটি হয় নাই, ততদিন ইহা পবিত্রতা, সভ্যতা ও জ্ঞানানুশীলনে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। অদৃষ্টের বিষম তাড়নে মুসলমানদিগের পদানত হইয়া হিন্দুগণ যখন আপনাদের উচ্চ নীতি হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িলেন, তখন তাঁহাদের সামাজিক দুর্গতির আর শেষ রহিল না। স্বাধীন চিন্তার অন্তর্দ্ধান সামাজিক দুর্গতির অবশ্যম্ভাবী ফল। ভারতের ভাগ্যে ইহারা একে একে কিরূপে বিলোপ পাইল, ঐতিহাসিকের মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনায় তাহা জলন্ত অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—আমরা সে দিকে চাহিব না।

ভারতের বিষম দুর্দ্দশার মধ্যেও ভারত একটি রত্নহারা হয় নাই। সেটি ইহার অতুলনীয় স্ত্রীচরিত্র। ভারত রমণী কুশিক্ষা দুর্নীতি ও অজ্ঞানের মধ্যে সমাজের অতিনিকৃষ্ট আসন গ্রহণ করিয়াও কখনও আপনাদের স্বাভাবিক কোমলতা হারায় নাই—ইহা অতি আশ্চর্য্য, ভগবানের বিশেষ করুণা। পাশ্চাত্য শিক্ষায় এই চির প্রসিদ্ধ কোমল স্বভাবা স্নেহ-পরায়ণা হৃদয়গুলিতে কিরূপ ঘটিবে ইহা অতি গুরুতর চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ ছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় কার্য্যকারী শক্তির অতি আশ্চর্য্য উন্মেষ হয়। আমরা যখনই Primrose League ... ... প্রভৃতি আশ্চর্য্য কাণ্ড পাঠ করি, তখনই বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাই—পাশ্চাত্য মহিলা মণ্ডলীকে হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি না দিয়া থাকিতে পারি না। ভাবি আমাদের পোড়াদেশে কখন এরূপ হইবে? কখন আমা-

দের দেশে স্ত্রীদিগের কোমল স্নেহপ্রবণ উদার সরল হৃদয়ে সিংহের তেজ সংক্রামিত হইবে? এ মণি কাঞ্চন যোগ কোন দিন আমাদের ভাগ্যে ঘটিবে।

তাই আমরা সখিসমিতির ন্যায় সমিতির জন্মের জন্যে উৎকণ্ঠার সহিত প্রতিক্ষা করিতেছিলাম, এবং এই নবজাত কন্যার জন্মোৎসবে নীরবে আমাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছি। আর তাই পণ্ডিতা রমাবাইয়ের সারদাসদনের প্রথম বার্ষিক বিবরণ সমালোচনা করিতে আজ আমাদের এত আনন্দ। দেশীয় সমাজের উচ্চ আসনে যে সকল মহিলা উপবিষ্ট আছেন, উচ্চ শিক্ষার সুখভোগ যাঁহাদের সৌভাগ্যে ঘটিয়াছে—তাঁহারা যে শিক্ষার সৌভাগ্যের ক্রোড়ে আত্ম বিস্মৃত হন নাই, দেশের অপরাপর মন্দভাগিনী স্ত্রীলোকদের কথা ভুলেন নাই—বরং তাহাদের দুর্দ্দশা দূর করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা নিতান্তই শুভলক্ষণ বলিয়া আমাদের মনে হয়। আমরা যতদূর জানি, বাঙ্গালার সখিসমিতি ও বোম্বাইয়ের সারদাসদন আমাদের দেশীয় স্ত্রীদিগের সাধারণ হিত চিকীর্ষার প্রথম উদ্যম। আমরা পাঠকদিগকে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিব।

১৮৮৯ অব্দে বোম্বাই নগরে হিন্দু বিধবাদিগের জন্য রমাবাই সারদাসদন প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৮৬ খৃঃঅব্দে ইহার প্রথম সূত্রপাত হয়। ঐ বৎসর পণ্ডিতা রমাবাই তাঁহার জ্ঞাতি কন্যাবধু আনন্দবাই যোশীর উপাধি লাভ দর্শন জন্য বিলাত হইতে আমেরিকায় উপস্থিত হন। সেই বৎসরই আনন্দবাই উপাধি লাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই দেশীয় ও বিদেশীয় বন্ধুদিগকে শোক সাগরে ভাসাইয়া তাঁহার জীবন যাত্রা অকালে শেষ করেন। আমেরিকার স্ত্রীদিগের স্বাধীন ও সরল স্বভাবে রমাবাই মুগ্ধ হইয়াছিলেন—তিনি আমেরিকাতেই রহিয়া গেলেন, এখানেই সারদাসদনের আরম্ভ। আমেরিকায় থাকিয়া রমাবাই তাহার বিখ্যাত "উচ্চ জাতি হিন্দু মহিলা" পুস্তক প্রণয়ণ করেন। নির্জ্জীব ভারতে তাহার কোন ফল না হইতে পারে, ভারতলক্ষ্মী উদাস চক্ষে তাহাদের কুকীর্ত্তি চাহিয়া দেখিতে পারেন কিন্তু স্বাধীন প্রকৃতি সুশিক্ষিতা ও সুখী আমেরিকানদের হৃদয় এই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কন্যার মর্ম্মস্পর্শী কাতর বিলাপে গলিয়া গেল। এ দৃশ্য তাহাদের সহৃদয় প্রাণে বিষম বাজিল—এ দুঃখের কাহিনী তাহাদের হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশ আলোড়িত করিয়া দিল এবং ঘুচাইতে তাহাদের প্রাণ কাঁদিল। কেহ যাহার দুঃখে দুঃখিত নহে, ভগবান তাহার বিধান করেন। স্বদেশে হতভাগিনী বিধবাদিগের বন্ধু বেশী মিলিল না কিন্তু সমুদয় আমেরিকার সকল শ্রেণীর লোক ভারত বিধবাদিগের দুঃখ দূর করিতে আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইল। ফিলেডলফিয়ায় রমাবাই এসোসিএশন প্রতিষ্ঠা এই সহানুভূতির ফল। উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ অনায়াসে সংগৃহিত হইল—রমাবাই স্বচ্ছন্দে স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

প্রথমে পুনা নগরে স্কুল সংস্থাপনের কথা ছিল। পরে বোম্বাই নগরেই সংস্থাপিত হই-

য়াছে। দেশের অনেক গণ্যমান্য লোক রমাবাইয়ের উপদেষ্টা হইয়াছেন। আমেরিকা হইতে বিবি হামলিন রমাবাইয়ের সাহায্যার্থে এদেশে আগমন করিয়াছেন। তাহা বাদে আমেরিকার সভাপ্রেরিত বিবি ডেমন নিকেস ও সিলভা শিক্ষাকার্য্যে রমাবাইয়ের সহকারিণী। স্বয়ং রমাবাই সংস্কৃত মহারাষ্ট্রী ও প্রাণী-তত্ব শিক্ষা প্রদান করেন। এক্ষণে সমুদায় বিষয়ে এইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুবন্দোবস্ত করিয়া রমাবাই নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার এই শুভানুষ্ঠানে লোকের সাহায্য ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছেন।

প্রথমে একটি মাত্র ছাত্রী লইয়া স্কুলের কার্য্য আরম্ভ হয়। দেড়মাস চলিয়া গেল আর ছাত্রী জুটিল না। কিন্তু ক্রমে এক এক করিয়া ছাত্রী জুটিতে লাগিল। বর্ত্তমান সময়ের ছাত্রী সংখ্যা ২৫। যাঁহারা হিন্দু সমাজের প্রকৃত অবস্থা অবগত আছেন, তাঁহারা ছাত্রী সংখ্যা দেখিয়া রমাবাইয়ের অধ্যবসায়ের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। যাঁহারা হিন্দু সমাজের আশ্চর্য্য রক্ষণশীলতার বিষয় কিছুই জানেন না, এই বিপুল আয়োজন, অক্লান্ত পরিশ্রম, এবং অসাধারণ অধ্যবসায় সত্বেও ছাত্রী সংখ্যার এ ন্যূনতা দেখিয়া এরূপ কার্য্য কি দুরূহ ব্যাপার, তাহা তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। সচ্চরিত্রা হিন্দু বিধবাগণ এখানে বিনা ব্যয়ে পড়িতে পাইবেন। তাঁহার হিন্দু আচার ব্যবহার ও সংস্কার যাহাতে বজায় থাকে, তৎপক্ষে বিশেষ যত্ন লওয়া হইবে। পাঠের ব্যবস্থাও অতি সুন্দর। অল্প সময় মধ্যে যাহার যেরূপ ক্ষমতা সে সেইরূপ অগ্রসর হইতে পারে, এখানে এইরূপ বন্দবস্ত হইয়াছে। এমন কি এক বৎসরে একজন তিনখানি মহারাষ্ট্রী পাঠ্য পুস্তক শেষ করিয়াছে।

আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাবিত বিষয় সখিসমিতি। আজ প্রায় চারি বৎসর হইল কলিকাতা নগরীতে সখি সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে। উচ্চশিক্ষিতা সম্ভ্রান্ত বংশীয়া দেশের গৌরবস্বরূপিনী কতিপয় মহিলা সমবেত হইয়া এই সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারাই ইহার প্রাণ। দেশে অনাথা বিধবাদিগের আশ্রয় প্রদান ও স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিই ইহাঁদের উদ্দেশ্য। বরাহনগরের বিধবাশ্রমে দুইটি, বেথুন স্কুলেও দুইটি বালিকা ইহাঁদের ব্যয়ে আছেন। প্রায় ৫০০০ টাকা ইহাঁদের সংগৃহিত হইয়াছে। এই টাকা একেবারে ব্যয় করিয়া ফেলিলে দেশময় একটা হুজুক তুলিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু হুজুকেত আর কাজ হয় না! তাই ইঁহারা অতি সুবিবেচনা পূর্ব্বক একটা মূলধন ভাণ্ডার সংস্থাপন করিতে সংকল্প করিয়াছেন। মূলধন কখনও ব্যয় করিবেন না। মূলধনের সুদ ও সভার অন্যান্য আয় লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতি অল্প সময় ইহাঁরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে আপনাদের অস্তিত্বের শুভ সংবাদে এদেশীয়দিগের প্রাণে গভীর আশা ও আনন্দের সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আমরা অতি আশস্ত ও উৎকণ্ঠার সহিত ইহার ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া রহিয়াছি এবং সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার মঙ্গল কামনা করি।

সারদাসদনের সঙ্গে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সাবিত্রীসদনের উল্লেখও নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বাস্তবিক চারিদিক হইতে বিধবাদিগের দুঃখ দূর করিবার যেরূপ আয়োজন ও উদ্যোগ দেখা যাইতেছে, তাহা নিতান্তই সন্তোষজনক। অতি অল্পকাল হইল এই আশ্রম সংস্থাপিত হইয়াছে সুতরাং পাঠকবর্গের তৃপ্তিকর কোন বিবরণ দিতে পারিলাম না বলিয়া আমরা দুঃখিত। আমাদের আশা আছে শীঘ্রই ইহার উন্নতি সংবাদে পাঠকদিগকে সুখী করিতে পারিব।

বরাহনগরে হিন্দু মহিলাশ্রমের উল্লেখ না করিলে এই প্রবন্ধ নিতান্তই অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। এই আশ্রমের স্থাপয়িতা বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ই এই নূতন ক্ষেত্রে সর্ব্ব প্রথম পথ প্রদর্শক। অতি পূর্ব্বে প্রায় ২২ বৎসরের কথা—শশী বাবু বিধবাদিগকে সময়ে সময়ে তাঁহার অবস্থানুযায়ী সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। আমরা যতদূর জানি এরূপ একটি আশ্রমের আবশ্যকতা তিনিই প্রথমে উপলব্ধি করেন—অন্ততঃ কার্য্য ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম। আজ চারি বৎসর হইল এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; বাধা বিপত্তি ক্লেশ ও নিরাশার সময় চলিয়া গিয়াছে কিন্তু সকল পরীক্ষাই তিনি অবিচলিত চিত্তে সহ্য করিয়াছেন। নিঃসহায় নিঃসম্বল, দরিদ্র শশীপদ কিরূপে চারি বৎসর এরূপ ব্যয় ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার চালাইয়া আসিয়াছেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। নিয়মিত অর্থ যোগাইবার জন্য তাহার পৃষ্টপোষক কোন সমিতি নাই। একাকী তিনি অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, একাকী তিনি ইহার সমুদায় তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত আছেন। অন্য দেশ হইলে চতুর্দ্দিক হইতে অজস্র অর্থ সাহায্য আসিয়া পড়িত কিন্তু আমাদের দেশে সে আশা বিড়ম্বনা মাত্র। কবে যে আমাদের এ কলঙ্ক—সদ্ব্যয়ে এ কার্পণ্য দূর হইবে, তাহা ভবিষ্যতের আবরণে আবৃত। শশীবাবুর একমাত্র সাহায্যকারিণী তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী। বাস্তবিক তাঁহার আন্তরিক সাহায্য না পাইলে শশীবাবু এরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। স্বামী স্ত্রীতে ইহার জন্যে যেরূপ অকাতরে খাটিতেছেন, তাহাতে তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। এখানে অনেকগুলি ছোট ছোট মেয়ে আছে—শশীবাবুর স্ত্রী মায়ের ন্যায় তাহাদিগকে যত্ন করেন। ফলে বোর্ডিংএর নিয়ম তন্ত্রতার সহিত কোমল বাৎসল্যের মধুর সমাবেশ বড়ই সুন্দর হইয়াছে।

আমরা দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম সারদাসদনের ও বরাহনগর মহিলাশ্রমের কার্য্য প্রণালী একই রূপ। ছাত্রীগণের হিন্দু রীতি নীতি ও সংস্কারের বিরোধী কোনরূপ শিক্ষা প্রদান করা হয় না। বোর্ডিংএ তাহাদের আচার ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখার কোন বাধা হয় না। স্কুলে গভর্ণমেণ্ট-নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক পড়ান হয় বটে কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত পড়িতে বাধ্য করা হয় না। যে যত সময়ের মধ্যে যতটুকু অগ্রসর হইতে পারে, তাহার সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। এখানে একটী মেয়ে আছেন

তিনি যখন প্রথম আসেন, তখন তাঁহার সামান্য বর্ণজ্ঞান মাত্র ছিল। দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার ছাত্রবৃত্তি ষ্ট্যাণ্ডার্ড পড়া হইয়া গিয়াছে। তাঁহার উন্নতি দেখিয়া স্কুলের অ্যাসিষ্টাণ্ট ও ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহা ভিন্ন এখানে রমণীগণের অবশ্যকর্ত্তব্য রন্ধন প্রভৃতি গৃহকর্ম্ম অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে প্রথম একটী ছাত্রী আসেন, রন্ধন কার্য্যে তাঁহার আশ্চর্য্য অজ্ঞতা ছিল। তিনি এক্ষণে সুন্দর পাক করিতে পারেন। বিজ্ঞান, ইতিহাস, বিখ্যাত লোকের জীবনী, গৃহোপযোগী কৃষী ও সামান্য আবশ্যকীয় টোটকা ঔষধি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করা হয়।

নূতনত্বের কি এক মোহিনীশক্তি! ইংরাজি হাব ভাবে আকণ্ঠ নিমজ্জিত অথচ ষোলআনা হিন্দুয়ানীর জন্যে চীৎকার। ইহা এক অভিনব ব্যাপার বটে। এই দৃশ্যের কুহকের হাত অনেকে এড়াইতে পারিতেছেন না দেখিয়া বোম্বের সুবিজ্ঞ মিঃ টেলাঙ্গের ন্যায় প্রকৃত দেশ হিতৈষীগণ আতঙ্কিত হইয়াছেন। আশঙ্কার কথা বটে। বাস্তবিক বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা অনেক বিষয়ে গভীর নিরাশাজনক। এই নিরাশার সময় চতুর্দ্দিক হইতে আশার সংবাদে আমরা পুলকিত হইয়াছি।

আমেরিকা হইতে বিদায় গ্রহণ কালীন রমাবাই বলিয়াছিলেন—"বড় বড় সংস্কার কার্য্য জগতের তুচ্ছ লোকের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে—আমি বিশ্বাস করি এই অনাথা বিধবাগণ শিক্ষিতা হইলে ভারতের উদ্ধার সাধন করিবে।" রমাবাই, ভগবান তোমার কথা সফল করুন। বিধবাগণের মলিন বেশে আমাদের প্রাণ সংসার শ্মশান। তাঁহারাই যদি এই শ্মশান তুল্য সংসারকে স্বর্গ করিবার কারণ হন, তদপেক্ষা সুখের বিষয় কি হইতে পারে।

রামমোহন! তুমি জ্ঞান চক্ষে এ দৃশ্য দেখিয়াছিলে কি না জানি না—তোমার গভীর অন্তর্দাহ ভবিষ্যতের মোহিনী মূর্ত্তিতে কথঞ্চিত প্রশমিত হইয়াছিল কি না, জানি না—কিন্তু আমরা তোমারই কার্য্য ও চিন্তার সাক্ষাতে ও পরোক্ষ ফলভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

শ্রীনেপালচন্দ্র রায় বি, এ।

বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা।

১২৯৫ সালের আশ্বিন মাসের 'ভারতী'তে দেখান হইয়াছিল, যে শিল্প এবং খনিকার্য্যের বিস্তার ব্যতীত ভবিষ্যতে আমাদের জীবনধারণ দুরূহ হইবে, এবং ইহার জন্য বিজ্ঞান চর্চ্চার বিশেষ প্রয়োজন। অন্যান্য কারণেও বিজ্ঞান শিক্ষা বিশেষরূপে বাঞ্ছনীয়। প্রকৃতির পুস্তক পাঠে মন যেরূপ উন্নত ও প্রশস্ত হয়, বিজ্ঞানের আলোকে অজ্ঞানান্ধকার যেরূপ শীঘ্র তিরোহিত হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। বিজ্ঞানের রাজ্য চারিদিকে বিস্তৃত হইতেছে। ভাষা, ইতিহাস, প্রভৃতি পাঠ্য বিষয়েও বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রচলিত হইতেছে। বস্তুতঃ বিজ্ঞান শিক্ষার আবশ্যকতা আজকাল এরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়াছে যে, তদ্বিষয়ে অধিক কিছু বলা সময় নষ্ট করা মাত্র।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকাল বিজ্ঞান শিক্ষার যাহাতে বিস্তার হয়, তাহার চেষ্টা দেখা যাইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্রেরা অধিকবয়স্ক; এবং তাহাদের পঠিতব্য পুস্তক ইংরাজি। বিজ্ঞানের সম্যক চর্চ্চার জন্য তরুণ বয়সেই উহার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। এরূপ শিক্ষা মাতৃভাষাতেই উত্তমরূপে সম্ভব। তাহা ছাড়া, ছাত্রবৃত্তি এবং মাইনর পরীক্ষার্থী ছাত্রেরা বাঙ্গালা পুস্তকের উপর প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। অতএব বিজ্ঞান বিষয়ক বাঙ্গালা পুস্তকের প্রয়োজন। ইহা নূতন কথা নহে; অনেক দিন পূর্ব্বে এই প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে, এবং কতকগুলি বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকও বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে চলিতেছে। যতগুলি আমরা দেখিয়াছি, সমস্তই ইংরাজি বই হইতে অনুবাদিত বা সঙ্কলিত। কিন্তু অনুবাদ বা সঙ্কলন যে সহজ কাজ নহে, তাহা যিনি বিজ্ঞান বিষয়ে বাঙ্গালায় লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি বিলক্ষণরূপে জানেন। অতএব যাঁহারা যত্ন এবং কষ্ট করিয়া প্রথমে এই দুরূহ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন, বাঙ্গালা বিজ্ঞান ভাষা গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বঙ্গভাষা বিশেষরূপে ঋণী।

দিন দিন বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, নূতন নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে, কত পুরাতন মত বদলাইতেছে। অতএব, কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পুস্তক লিখিতে হইলে, তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি, ২।৪ বৎসরের মধ্যে এমন কি ২।৪ মাসের মধ্যে যে সকল নূতন আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক।

আবার, যাহা সত্য তাহা বরাবরই সত্য রহিবে, কখনও মিথ্যা হইবে না। কিন্তু সত্য ব্যতীত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পুস্তকে অনেক মতামত প্রকাশিত হয়, যাহা অনেকটা কল্পনাপ্রসূত, অতএব পরিবর্ত্তনশীল। ঐ সকল পুস্তক হইতে অনুবাদ এবং সঙ্কলন করিতে হইলে অপরিবর্ত্তনীয় সত্য হইতে এরূপ মতামতের প্রভেদ জানা

আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক পুস্তকে আর একটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। রচনা সাধ্যমত হৃদয়গ্রাহী করিতে চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু তাহা করিতে হইলে যদি সত্যকে বিকৃত করিতে হয়, তাহা করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। ভুল শিক্ষা করা অপেক্ষা অশিক্ষিত অবস্থায় থাকা ভাল, বিশেষতঃ সুকুমারমতি বালকদিগের পক্ষে।

বাঙ্গালা ভাষায়, কি অন্য যে কোন ভাষায়, বৈজ্ঞানিক পুস্তক রচনা করিতে হইলে, এই তিনটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ইহা অতিশয় শক্ত কার্য্য। যিনি যে বিজ্ঞানে পারদর্শী, তিনি সেই বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে ইহা ভালরূপ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। আমরা কয়েকখানি প্রচলিত গ্রন্থ হইতে আমাদের অর্থ পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব।

৺ অক্ষয়কুমার দত্ত বাঙ্গালাভাষার একজন স্রষ্টা। তাঁহার নিকট আমরা চির-ঋণী। তাঁহার ভাষা সরল এবং হৃদয়গ্রাহী, রচনা কৌশল অতি চমৎকার। তাঁহার চারুপাঠ নামক গ্রন্থ অনেক দিন হইতে বিদ্যালয়ে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। অক্ষয় বাবু বিজ্ঞান বড় ভাল বাসিতেন, বিজ্ঞান চর্চ্চার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। 'চারুপাঠে' বিজ্ঞান-বিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সকলগুলিরই বিষয় উত্তমরূপে বাছা হইয়াছে; সকলগুলিরই ভাষায় অক্ষয় দত্তের ছাপ লক্ষিত হয়। আমরা নিতান্ত বাধ্য হইয়াই উহাদিগের দোষ দেখাইতেছি।

চারুপাঠ প্রথম ভাগের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব,—'আগ্নেয়-গিরি'। উহার প্রথম ছত্র এই—

"কোন কোন পর্ব্বতের শিখরদেশে অতি গভীর গহ্বর থাকে, তদ্দ্বারা মধ্যে মধ্যে ধূম, ভস্ম, অগ্নিশিখা, প্রস্তর, কর্দ্দম, উষ্ণজল ও ধাতুনিঃস্রব প্রবলবেগে নির্গত হয়। সেই সকল পর্ব্বতের নাম "আগ্নেয়-গিরি।" *

'আগ্নেয় গিরি'র ইংরাজি প্রতিশব্দ 'বল্কেনো'। প্রথমতঃ, 'বল্কেনো' কখন কখন আদৌ গিরির আকার ধারণ না করিতে পারে। করিলেও, কেবল শিখরদেশেই যে 'বল্কেনোর' মুখ বিদ্যমান থাকে তাহা নহে। প্রকৃত পক্ষে, 'বল্কেনো' গিরির আকার ধারণ করিলে, ঐ গিরির চতুষ্পার্শ্বে ছোট বড় অনেক গহ্বরের মুখ লক্ষিত হয়। ভূপৃষ্ঠের নিম্নদেশ (অর্থাৎ ভূগর্ভ) হইতে আগত ঊর্দ্ধগামী অত্যুত্তপ্ত দ্রাবণ নিস্রাবের ধারা যেখানেই ফাটা ফুটা পাইবে, অথবা বলেতে ফাটাফুটা করিয়া লইতে সক্ষম হইবে, সেইখান দিয়াই বহির্গত হইবে—কোন একটি নির্দ্দিষ্ট মুখ দ্বারাই যে ক্রমাগত নির্গত হইবে, তাহা কোন ক্রমেই ঠিক নহে। গহ্বরই বল্কেনোর প্রধান অঙ্গ। ঐ

* চারুপাঠ, প্রথমভাগ, ত্রিচত্বারিংশবার মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৮৮৯। ৭০পৃষ্ঠা।

গহ্বর অত্যন্ত গভীর। উহা দ্বারা যে সকল ধাতব নিস্রব বা প্রস্তর খণ্ড নির্গত হয়, তাহা গহ্বরের চতুষ্পার্শ্বে জমাট বাঁধিয়া বা রাশীকৃত হইয়া সচরাচর গিরির আকার ধারণ করিয়া থাকে বটে। কিন্তু ঐ গিরি যে গহ্বর দ্বারা নিস্রবাদি উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহার ন্যায় 'বল্কেনো'র অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ নহে। উহা নিস্রব বা প্রস্তর খণ্ড সমূহের উৎক্ষেপের ফলমাত্র। কেঁচোর বাসস্থান সম্বন্ধে তাহার পায়ুপরিত্যক্ত মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত বল্মীক যেরূপ, 'বল্কেনো' সম্বন্ধে 'বল্কেনো' গিরিও অনেকটা সেইরূপ। গহ্বর ব্যতীত 'বল্কেনো' থাকিতে পারে না; কিন্তু 'বল্কেনো' গিরির আকার ধারণ না করিতেও পারে। অতএব 'বল্কেনো'কে আগ্নেয়গিরি বলা সঙ্গত নহে, এবং ঐ গরির শিখরদেশেই যে 'বল্কেনো'র গহ্বর থাকে তাহা নহে। 'আগ্নেয় গিরি'র পরিবর্ত্তে 'আগ্নেয় গহ্বর' শব্দটি ব্যবহার করিলে ভাল হয়।

দ্বিতীয়তঃ 'ধূম' 'ভস্ম' 'অগ্নি শিখা' দ্বারা সকলেই এরূপ বুঝিয়া থাকে যে, বল্কেনো'র ভিতর কি যেন পুড়িতেছে, এবং সেই দাহ্যমান পদার্থ হইতে 'ধূম, ভস্ম, অগ্নি শিখা' বাহির হইতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ 'বল্কেনো'র ভিতর দাহ্যমান কোনই পদার্থ নাই। উহা হইতে যে ধূম নির্গত হইতে দেখা যায়, তাহা আদৌ 'ধূম' নহে—প্রধানতঃ কুয়াসার ন্যায় জলীয় বাষ্প মাত্র। যাহা 'ভস্ম' বলিয়া বোধ হয়, তাহা পাথরের গুঁড়া। যাহা 'অগ্নি শিখা' বলিয়া আমাদের প্রতীতি হয়, তাহা আদৌ 'অগ্নি শিখা' নহে, অত্যুষ্ণ তরল নিস্রবের জ্যোতিঃ মাত্র; ইহা বাষ্পময় আকাশে প্রতিফলিত হইয়া অগ্নিশিখার ন্যায় দেখায়।

অতএব চারুপাঠে 'আগ্নেয় গিরি'র যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভ্রম সঙ্কুল বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। বাল্যকালে স্মরণশক্তি অতি প্রবল থাকে; ছাত্রেরা তখন যাহা শিখে তাহা শীঘ্র ভুলে না। তজ্জন্য অল্প বয়স্ক বালকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবের তৃতীয় প্যারা (৮ পৃষ্ঠা)

"পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা এই পর্ব্বতাগ্নি উৎপন্ন হইবার যেরূপ কারণ দর্শাইয়া থাকেন, তাহা লিখিত হইতেছে। ... ... নারিকেলের মধ্যগত জলভাগ যেমন কঠিন আবরণে আবৃত, পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ তরল বস্তুরাশিও সেইরূপ কঠিন আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। সাগরের জল যেমন কম্পিত হইয়া তরঙ্গ উপস্থিত করে, অবনীগর্ভস্থ উল্লিখিত অগ্নিময় মহাসাগরও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে কম্পিত হইয়া তরঙ্গমালা উৎপাদন করে। ঐ তরঙ্গ লাগিয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠ দেশের কোন কোন স্থান কম্পিত, স্ফীত, ও বিদীর্ণ হয়।" ইত্যাদি।

নারিকেলের মত পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ তরলপদার্থে পরিপূর্ণ কি না—তদ্বিষয়ে বিশেষ মতভেদ আছে। অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরা ঐ মতের বিরোধী। বস্তুতঃ, আজ

কাল উহা প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। কোন কোন ভূবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিত প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, যে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগও উপরিভাগের ন্যায় কঠিন ; তবে মধ্যে মধ্যে তরল পদার্থপূর্ণ গহ্বর থাকিতে পারে। আবার, কেহ কেহ বলেন যে, কঠিন অভ্যন্তরভাগ এবং কঠিন উপরিভাগের মধ্যে তরল বা অর্দ্ধতরল পদার্থের একটি পাতলা স্তর বিদ্যমান আছে। যে মত সর্ব্ববাদি বা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত নহে, তদ্বিষয়ে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া বিধেয় নয়। তাছাড়া এখানে এরূপ একটি মত শিখান হইতেছে, যাহার পরিপোষক আজকাল অতি বিরল।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে তরল পদার্থের 'অগ্নিময় মহাসাগর' আছে, স্বীকার করিলেও, উহার তরঙ্গ লাগিয়া ভূপৃষ্ঠের কম্পন, বিদারণ ও উদ্গমন হয় মনে করা কবির কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক মত নহে। ভূগর্ভের তাপাতিশয্য প্রযুক্ত, তৎপ্রবিষ্ট জল বাষ্পাকারে পরিণত হয়। এই বাষ্পের প্রসারণশক্তি কিরূপ তাহা কেৎলিতে জল ফুটাইলে কতকটা বুঝা যায়। কেৎলির জল ফুটিলে, তাহার কিয়দংশ বাষ্প হইয়া যায়, এবং ঐ বাষ্প স্বীয় প্রসারণ শক্তি বলে কেৎলির ঢাকনিকে ঠেলিয়া বহির্গত হইতে চেষ্টা করে, ও ঢাকনি কাঁপিতে থাকে। ভূপৃষ্ঠের অধঃস্থিত জল বাষ্পাকারে পরিণত হইলে, ঐ বাষ্প ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে চেষ্টা করে। ইহাতে ভূপৃষ্ঠে আঘাত লাগে, এবং ভূমিকম্প উৎপন্ন হয়। ভূমিকম্পের এই একটি প্রধান কারণ অনুমান করা যায়—স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ইহা অনুমান মাত্র। জলীয় বাষ্পের তেজে ভূপৃষ্ঠ কোথাও কোথাও বিদারিত হইতে পারে ; এবং এইরূপে যে সকল ফাটাফুটা জন্মে, তদ্দ্বারা জলীয় বাষ্পের সঙ্গে সঙ্গে তরল ধাতব-নিস্রবও উৎক্ষিপ্ত হইতে পারে।

"পুরুভুজ" শীর্ষক প্রবন্ধে (৩৭ পৃষ্ঠা) পুরুভুজ, পলা, ও স্পঞ্জ এক "শ্রেণীর অন্তর্ভূত বলিয়া গণ্য" করা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ শম্বুক এবং পলাতে যত প্রভেদ, পলা এবং স্পঞ্জে প্রায় তত প্রভেদ ! আবার স্পঞ্জ বাস্তবিক "জন্তু কি উদ্ভিজ্জ তাহা অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই" লেখা হইয়াছে। নিরূপিত বহুকাল হইয়াছে, অন্ততঃ ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে। স্পঞ্জ যে জন্তু তাহাতে সন্দেহ নাই।

"বৃক্ষ লতাদির উৎপত্তির নিয়ম" সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে লেখা হইয়াছে (৪৩ পৃষ্ঠা):— "বীজ-কোষস্থ বীজ সমূহের অঙ্কুরোৎপাদিকাশক্তি সম্পাদন বিষয়ে অনেক পুষ্পে এক প্রকার অতি মনোহর অদ্ভুত কৌশল দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার স্থূল বৃত্তান্ত পশ্চাৎ প্রকাশিত হইতেছে। যে পুষ্পের পরাগ-কেশর বড় আর গর্ভকেশর ছোট তাহা ঊর্দ্ধমুখ হইয়া থাকে, এবং যে পুষ্পের পরাগ কেশর ছোট গর্ভকেশর বড় তাহা ভূতলের দিকে অধোমুখ হইয়া থাকে। ইহাতে গর্ভকেশরের শিরোভাগ পরাগকেশরের শিরোভাগের অপেক্ষায় নীচে থাকে, সুতরাং পরাগকেশরস্থ রেণু পর্য্যাপ্ত সহজেই

গর্ভকেশরে পতিত হইয়া বীজ কোষস্থ বীজ সমুদায়ের উৎপাদিকা শক্তি সম্পাদন করে। এতাদৃশ সুচারু কৌশল না থাকিলে পুষ্প হইতে ফল উৎপন্ন হইবার বিলক্ষণ ব্যতিক্রম ঘটিত।"

কতকগুলি ঊর্দ্ধমুখ ফুলের পরাগ কেশর বড় এবং গর্ভকেশর ছোট; এবং কতকগুলি অধোমুখ ফুলের পরাগকেশর ছোট এবং গর্ভ কেশর বড়। ইহাদের কোন একটি ফুলের পরাগরেণু যে সেই ফুলটির গর্ভ কেশরে পড়িয়া উহার নিষেক কার্য্য সম্পন্ন করে তাহা অতীব সম্ভব। কিন্তু এই সকল ফুলেও পতঙ্গেরা বসিয়া থাকে, এবং তাহারা এক ফুলের পরাগরেণু লইয়া ভিন্ন ফুলের গর্ভকেশরে স্থাপিত করিয়া শেষোক্ত ফুলের নিষেক কার্য্য সংসাধিত করিতে পারে। বস্তুতঃ, প্রকৃতির 'অদ্ভুত' এবং 'সুচারু' কৌশল সাধারণতঃ আত্ম-নিষেক (self fertilisation) বন্ধ করিতে; আত্মনিষেকের পক্ষে নহে। যে সকল পুষ্পে পরাগকেশর এবং গর্ভকেশর উভয়ই বিদ্যমান থাকে, তাহাদের মধ্যেও যাহাতে কোন ফুলের পুষ্পরেণু সেই ফুলের বীজোৎপাদন না করিতে পারে, তজ্জন্য নানাবিধ চমৎকার চমৎকার কৌশল দৃষ্ট হয়।

উপরে যাহা বলা গেল তাহাতে চারুপাঠের ন্যায় উৎকৃষ্ট পুস্তকে কিরূপ দোষ আছে—পাঠক বুঝিতে পারিবেন। অক্ষয় বাবু বিজ্ঞান শিক্ষার যেরূপ উৎসাহী ছিলেন, তাহাতে তিনি জীবিতাবস্থায় বহুদিন ধরিয়া পীড়িত না থাকিলে, সম্ভবতঃ এ সকল দোষ লক্ষিত হইত না। আর একটি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। অক্ষয় বাবু বড় ধার্ম্মিক ছিলেন। চারুপাঠের প্রায় প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে তিনি জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তি উদ্রেক করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে উহা কতদূর ফলপ্রদ হইবে সন্দেহ। তৃতীয় ভাগ চারুপাঠে "জীব বিষয়ে পরমেশ্বরের কৌশল ও মহিমা" শীর্ষক প্রস্তাবে, 'বহুরূপ' নামক একটি প্রাণীর বর্ণ পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেন—"যিনি সমুদ্র-তটস্থ বালুকাবিন্দু ও দূর্ব্বাদলস্থ শিশির বিন্দু পর্য্যন্ত কোন বস্তু নিষ্প্রয়োজনে সৃষ্টি করেন নাই, তিনি যে এই অত্যদ্ভুত জন্তুকে, এই অদ্ভুত শক্তি নিরর্থক দিয়াছেন, অথবা কেবল মনুষ্যের কৌতুক সম্পাদনার্থ প্রদান করিয়াছেন, ইহা কদাচ যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। তাহার অবশ্যই কোন নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে তাহার সন্দেহ নাই। মক্ষিকাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ বহুরূপের স্বভাবসিদ্ধ খাদ্য। উহা বৃক্ষ ও গুল্ম আরোহণ ও রসনা প্রসারণ করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ ও ভক্ষণ করিয়া থাকে; কিন্তু উহার গতি অত্যন্ত মৃদু। পতঙ্গগণ উহাকে নিকটে দেখিলে, অবলীলাক্রমে পলায়ন করিতে পারে। বিশেষতঃ পতঙ্গের দৃষ্টিশক্তি বিলক্ষণ তেজস্বিনী, কোন হিংস্র জীব নিকটস্থ হইলে, তাহারা অনায়াসে দেখিতে পায়। অতএব, কোন প্রকার ছদ্মবেশ গ্রহণ ব্যতিরেকে বহুরূপের অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া কোন মতেই সম্ভবে না, এই নিমিত্ত সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান পরম-পুরুষ তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্ত্তনের শক্তি প্রদান

করিয়া অপার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন।” কিন্তু বালকদিগের নিকট ইহাতে পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশ হইবে কি না, তাহাতে আমাদের বিশেষ সন্দেহ হয়। আমাদের বিবেচনায় বিপরীত ফল হইতে পারে। ‘বহুরূপ’ ছদ্মবেশে ক্ষুদ্র পতঙ্গদিগকে না ঠকাইয়া আপনার উদরপূর্ত্তি করিতে অক্ষম, তজ্জন্য পরমেশ্বর তাহাকে ছদ্মবেশ দিয়াছেন, ইহা বড় ভয়ানক শিক্ষা! ইহা ধর্ম্মের মূলে, নীতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। কথাটা দাঁড়াইতেছে কিসে?—জগদীশ্বর প্রবঞ্চনা করিতেছেন! অথবা তাঁহার একটি জীবকে এরূপ করিয়া গড়িয়াছেন, যাহাতে সে প্রবঞ্চনা না করিয়া জীবন-ধারণ করিতে পারে না, এবং যাহাতে সে অক্লেশে প্রবঞ্চনা করিতে পারে। সে যে প্রবঞ্চনা করে তাহাই তাঁহার উদ্দেশ্য! এখানে যে কায ‘সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, পরমপুরুষের’ উপর আরোপিত হইয়াছে, তাহা কোন মানুষে করিলে তাহাকে আমরা ঘৃণা করিব না কি? মনে কর, কোন ব্যক্তি দেখিল যে কতকগুলি লোক প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্য পাইতেছে না। সে ইহাদিগকে এরূপ চাতুরী শিখাইল যাহাতে ইহারা ধরা না পড়িয়া, অন্যান্য লোককে ঠকাইয়া, বা অন্য লোকের বাড়ীতে চুরি করিয়া বিলক্ষণ দু পয়সা উপার্জ্জন করিতে এবং উদর ভরিয়া খাইতে পারে। ঐ ব্যক্তির কি আমরা বুদ্ধির এবং শক্তির তারিপ করিব? না উহাকে একবাক্যে ধিক্কার দিব? এ সকল প্রশ্ন কি ছাত্রদিগের মনে উদয় হইতে পারে না? আবার, ‘বহুরূপ’ যেরূপ ঈশ্বরের জীব, ক্ষুদ্র পতঙ্গও সেইরূপ ঈশ্বরের জীব। ন্যায়বান্ ঈশ্বর বহুরূপের এত পক্ষপাতী কেন হইবেন? ক্ষুদ্র বলিয়া বেচারি পতঙ্গ কি তাঁহার দয়ার পাত্র নহে?

বিজ্ঞান বিষয়ক আরও খান দুই বাঙ্গালা গ্রন্থ আমাদের নিকট রহিয়াছে। এই পুস্তক দুইখানি ছাত্রবৃত্তি এবং মাইনর পরীক্ষার্থী বালকদিগের জন্য। উপরে যে সকল দোষের উল্লেখ করা গিয়াছে, শেষোক্তটি ব্যতীত আর সকলগুলিই উহাতে বিদ্যমান আছে। অবশ্য কোন পুস্তকই নির্দ্দোষ হইতে পারে না; তবে মাত্রার ন্যূনাধিক্য আছে—উহাতে মাত্রা বেশি বলিয়া বোধ হইতেছে। উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে একখানি শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রণীত “ভূবিদ্যা বিষয়ক পাঠ অর্থাৎ, প্রাকৃতিক ভূগোল”। এ বৎসর ইহার অষ্টাবিংশ সংস্করণ হইয়াছে। ইহার ৫ম পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে—“ভূপঞ্জরের অধস্তন স্তরে কোন জীবশরীরের নিদর্শন পাওয়া যায় না।” পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে এখন মতভেদ প্রায় নাই বলিলেই হয়। এওজুন নামক এক প্রকার সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল ব্যতীত, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন স্তর সমূহে স্থানে স্থানে কয়লার ন্যায় এক প্রকার উদ্ভিজ্জ-সম্ভূত খনিজ পদার্থ (গ্র্যাফাইট্) দৃষ্ট হয়। ঐ পৃষ্ঠায়—“এক্ষণে আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গমকালে তন্মধ্য হইতে দ্রবময় পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হইয়া যেরূপ প্রস্তরে পরিণত হয়, অধস্তন স্তরগুলি তাদৃশ প্রস্তরময়; এ জন্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এক্ষণে আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতে যেরূপ প্রস্তর

উৎপন্ন হয়,পুরাকালে সেইরূপ ভূগর্ভস্থ ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতে অধস্তন স্তরাবলীর প্রস্তরসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকিবে, সুতরাং এই সকল স্তরকে অগ্নিসম্ভূত স্তর ও ইহাদের অন্তর্গত প্রস্তরকে আগ্নেয় প্রস্তর বলে।"

আগ্নেয় গহ্বরোৎক্ষিপ্ত নিস্রব ভূপৃষ্ঠে যেরূপ প্রস্তরে পরিণত হয়, ভূপৃষ্ঠের অধস্তন স্তর-সমূহ তাদৃশ প্রস্তরময় নহে। উহাতে জলজ প্রস্তর বিশেষ পরিমাণে আছে, আগ্নেয় প্রস্তর থাকিতে পারে, এবং আছে ; কিন্তু তদ্রূপ প্রস্তর উহার উপরিতন স্তরসমূহের মধ্যেও লক্ষিত হইয়া থাকে।

৮ পৃষ্ঠায়—"কোন কোন আরণ্য প্রদেশের ভূভাগ মৃত্তিকা-মধ্যে বসিয়া যাও-য়াতে তত্রত্য উদ্ভিদ্‌রাশি দীর্ঘকাল ভূগর্ভে থাকিয়া কালক্রমে পাথরিয়া কয়লারূপে পরিণত" হইয়াছে, ইহা পড়িয়া পাথরিয়া কয়লার প্রকৃত উৎপত্তি পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হওয়া দূরে থাকুক, তিনি যাহা বুঝিবেন সম্ভবতঃ তাহা একেবারে ভুল। ইহাতে এরূপ বুঝায় না কি যে, মাটির ভিতর জঙ্গল বসিয়া গিয়া, সেখানে অনেক দিন থাকিয়া পাথ-রিয়া কয়লায় পরিণত হইয়াছে? কোন নিবিড় জঙ্গলময় ভূভাগ অবনত হইয়া জলমগ্ন হইল ; পরে ঐ জঙ্গল নদীবাহিত পলি দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া, ক্রমে পাথরিয়া কয়লায় পরিণত হইবে। সকল পাথরিয়া কয়লা যে এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নয় ; কিন্তু সাধারণতঃ হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে, কোন জঙ্গল ভূগর্ভের ভিতর বসিয়া গিয়া কখনও পাথরিয়া কয়লা উৎপন্ন করিয়াছে কি না সন্দেহ।

৬১-৬৩ পৃষ্ঠা—"ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে পলি-মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। ইহা-তেই অনুমান হয়, গঙ্গার পলি মৃত্তিকা সাগরগর্ভে পতিত হইয়া এই ভূভাগ উৎপন্ন হইয়াছে। ... ... রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমির মৃত্তিকা এই পলি মৃত্তিকা অপেক্ষা কঠিন। বোধ হয়, পলি-মৃত্তিকাময় প্রদেশের পূর্ব্বে উহা উৎপন্ন হইয়াছিল। ... ... বিন্ধ্যপর্ব্বত তাহা [করহরবালীর কয়লার স্তর] অপেক্ষাও প্রাচীন। ... ... পঞ্চকোট, দামোদর, করহরবালী প্রভৃতি স্তরের নিম্নস্থ স্তরে কোন জীব কঙ্কাল দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে অনেক স্থলে শীত প্রধান দেশের উদ্ভিদের বিনাশাবশেষ নিহিত রহিয়াছে, ইহাতে বোধ হয় অতি পূর্ব্বকালে উক্ত প্রদেশ হিমময় ছিল। ... ... যে শক্তি প্রভাবে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে নর্ম্মদা হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সহ্যাদ্রির শত শত শৃঙ্গ দিয়া আগ্নেয় পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত করিত" ইত্যাদি।

পুস্তকখানির মধ্যে মধ্যে এই প্রকার নানা কথা আছে যাহা অসংলগ্ন, এবং যাহা ঠিক নহে। ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে পলিমাটি দেখা যায়, যথার্থ—সবই পলিমাটি। কিন্তু তাহা হইতেই অনুমান করা কি যুক্তিসঙ্গত যে, গঙ্গার পলিমাটি সাগরগর্ভে পড়িয়া এই ভূভাগ উৎপন্ন করিয়াছে? পলিমাটি নদীগর্ভে, বিলে, হ্রদে

শীতপ্রধান দেশেই হউক আর গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই হউক, চির তুষারসীমার উপর বৃষ্টির পরিবর্ত্তে তুষার পড়িয়া থাকে। হিমালয়ে ঐ সীমা সমুদ্রজল সীমা হইতে ১৬।১৭ হাজার ফুটের উপর; মেরু সন্নিহিত স্থানে উহা শেষোক্ত সীমার সহিত সমোচ্চ হইতে পারে। চিরতুষার সীমার উপর কথনও এরূপ গরম হয় না যাহাতে তুষার গলিতে পারে। তথাপি সেখানেও তুষার বৎসরের পর বৎসর জমিয়া "পর্ব্বতাকার" হইতে পারে না। তুষার (Snow) জমাট বাধিয়া বরফে (Ice) পরিণত হয়। মেরু সন্নিধানে, যেখানে চির তুষারসীমা এবং সমুদ্র জলসীমা সমোচ্চ বা প্রায় সমোচ্চ বরফরাশির সমুদ্র সন্নিহিতাংশ ক্রমে ক্রমে সমুদ্রে ভাসিয়া যায়। নাতিশীতোষ্ণ বা গ্রীষ্ম প্রধানদেশে চিরতুষারসীমার উপর যে বরফ সঞ্চিত হয়, তাহা দুই উপায়ে স্থানান্তরিত হয়। প্রথমতঃ, কথন কথন উচ্চ এবং খাড়া স্থান হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফখণ্ড স্খলিত হইয়া বেগে নিম্ন স্থানে অবতরণ করে। ইহাকে ইংরাজীতে "avalanche" বলে। গ্রন্থকার ইহাকে একস্থানে "হিমশিলা" বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, শীতকালে যে সকল নিম্নদেশ তুষার মণ্ডিত হয়, "গ্রীষ্মাগমে এই তুষাররাশি দ্রব হইয়া" "হিমশিলা" উৎপন্ন করে না। চিরতুষার সীমার উপর যে নীহার সঞ্চিত হয়, তাহার স্থানান্তর করণ যদি কেবল avalancheএর উপর নির্ভর করিত, তাহা হইলে উহার অতি অল্পাংশই স্থানান্তরিত হইত, তাহা হইলে কাঞ্চনজিঙ্গা প্রভৃতি পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর বৎসরের পর বৎসর সঞ্চিত হইয়া যে কত উচ্চ হইত, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু উহার স্থানান্তরিত হইবার একটি উৎকৃষ্ট উপায় আছে। উহা নিম্নস্থানে, উপত্যকায় অবতরণ করে, "avalanche"এর ন্যায় বেগে নহে, কিন্তু আস্তে আস্তে—এত আস্তে যে দেখিলে উহা যে আদৌ চলিতেছে তাহা বোধ হয় না। এই অতি-মন্দ গতি নীহাররাশিকে ইংরাজীতে 'Glacier" বলে; ইহাকে একটি প্রকাণ্ড বরফনদী বলা যাইতে পারে। ফর্ব্ নামক জনৈক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত গ্রীষ্ম এবং শরৎকালে ইউরোপে এইরূপ একটি বরফ নদীর দৈনিক গতি পার্শ্বে ১৩। ১৯½ ইঞ্চ এবং মধ্যস্থলে ২০। ২৭ ইঞ্চ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। কোন কোন গ্লেসিয়র (অথবা নীহার বাহ) ২০। ৩০ মাইল দীর্ঘ, ন্যূনাধিক ১ মাইল প্রশস্ত, এবং ৮০০ ফুট বা ততোধিক স্থূল দেখা যায়। নীহারবাহ চিরতুষার সীমার অনেক নীচে নামিয়া থাকে; হিমালয়ে ঐ সীমা যদিও ১৬। ১৭ হাজার ফুট, সেখানে নীহারবাহ প্রায় ১২০০০ ফুট পর্য্যন্ত নামিয়া থাকে। গ্রন্থকার উপত্যকায় যে "হিমশিলা জামিবার" কথা লিখিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ এই নিম্নদেশে অবতীর্ণ নীহারবাহ। নীহারবাহের প্রান্তভাগে বরফ গলিয়া বেগবতী নদী উৎপন্ন হয়। চিরতুষার সীমার উপর কাঞ্চনজিজ্ঞাদি পর্ব্বতাংশে যে তুষারপাত হয়, তাহার পরিণাম এই। তত্রস্থ তুষাররাশি সংহত হইয়া, আস্তে আস্তে সহস্র সহস্র ফুট নীচে নামিয়া গলিয়া জল হইয়া যায়।

প্রবন্ধটি দীর্ঘ হইতেছে; বোধ হয় আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। যাহা বলা হইল, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান পুস্তকের কিরূপ দোষ আছে বা থাকিবার সম্ভব, পাঠক বোধ হয় তাহার আভাস পাইবেন। ইহার প্রতিকার কি?

আজকাল নানারকমের সভা সমিতি হইতেছে—সুচিহ্ন। বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি সাধনের জন্য একটি সভা হইলে ভাল হয় না কি? এরূপ সভার সভ্যগণ অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যে একটি সবকমিটি ইতিহাসের ভার লইবেন; একটি সবকমিটি বিজ্ঞানের ভার লইবেন; এইরূপ কতকগুলি সবকমিটিতে সভার কার্য্য বিলি করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডের ন্যায় দেশে পুস্তক প্রকাশের কার্য্য পুস্তক বিক্রেতারাই করিয়া থাকে। ম্যাকমিলান, লংমান প্রভৃতি পুস্তক বিক্রেতারা ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ করিয়া থাকে। এখানে সেরূপ পুস্তক প্রকাশক নাই। এখানে বালকদিগের পাঠ্য পুস্তকের প্রচলন অনেকটা—প্রায় সম্পূর্ণরূপে ইনস্পেক্টর মহাশয়দিগের হাতে। ইঁহাদিগের দ্বারা—অজ্ঞানতই হউক, আর যাহাই হউক—ব্যক্তি বিশেষের উপর যেরূপ অন্যায়াচরণ সম্ভব, একটি সভার উপর সেরূপ সম্ভবে না; বিশেষতঃ যদি সভাটি ক্ষমতাশালী হয়। পুস্তক নির্ব্বচনের জন্য এখন কলিকাতায় টেক্সট্‌বুক কমিটি নামে একটি কমিটি আছে। ইহার ভিতর অনেক মান্য গণ্য পণ্ডিত লোক আছেন। কিন্তু প্রথমতঃ, ইঁহারা সব বিষয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, ইঁহারা পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন মাত্র, নূতন নূতন পুস্তক প্রকাশ করেন না।

উল্লিখিত সভাস্থাপনের প্রস্তাবটি বোধ হয় নূতন নহে। এখনও যে শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহার আশা করা যায় না; কিন্তু যতদিন না হইবে, ততদিন বাঙ্গালা ভাষার এবং বাঙ্গলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইবে না।

শ্রীপ্রমথনাথ বসু।

লিচ্ছবি রাজগণ।

ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদড়ুপেনাস্মি সাগরম্॥
কালিদাস।

সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ যে কয়েকটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হইয়াছিলেন, লিচ্ছবি তাহার অন্যতম। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগের বিবিধ গ্রন্থে এবং খোদিত লিপি সমূহে লিচ্ছবি রাজন্যবর্গের উল্লেখ রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহার তিন প্রকার বর্ণবিন্যাস দৃষ্ট হয় যথা নিচ্ছিবি, নিচ্ছবি ও লিচ্ছবি। আমাদের বিবেচনায় সংস্কৃতে নিচ্ছবি ও পালি ভাষায় লিচ্ছবি পাঠই সঙ্গত। ইক্ষাকুবংশীয় রাজা দশরথের অষ্টম উত্তর পুরুষ নিচ্ছবি নামক নরপতি হইতে এই রাজবংশের উৎপত্তি।

পালি গ্রন্থে লিখিত আছে "পূজাবলী" নাম্নী কাশী রাজমহিষী একটি মাংসপিণ্ড প্রসব করেন। তাহা গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সেই মাংসপিণ্ড ক্রমে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া তাহাতে একটি বালক ও একটি বালিকা সৃষ্টি হইল, জনৈক ঋষি তাঁহাদিগকে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন পূর্ব্বক লালন পালন করিতে লাগিলেন। শিশুদ্বয়ের আকৃতিতে কোনরূপ বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইত না, এজন্য তাহারা "নিচ্ছবি" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। উত্তরকালে তাহাদের বংশীয়েরা সেই আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইয়াছিলেন।" অদ্যাপি এদেশীয় ইতর লোকেরা কোন কোন শব্দের পূর্ব্বস্থিত 'ন' স্থানে 'ল' ব্যবহার করিয়া থাকে যথা, লৌকা (নৌকা) লয়া (নয়া-নূতন) ইত্যাদি। এইরূপে সংস্কৃত নিচ্ছবি, সাধারণের ব্যবহৃত (পালি) ভাষায় "লিচ্ছবি" হইয়াছে। পালিগ্রন্থ ও খোদিত লিপি সমূহে "লিচ্ছবি" বর্ণবিন্যাস দৃষ্ট হয়। তদনুসারে আমরা ইহাঁদিগকে "লিচ্ছবি" আখ্যা দ্বারা অভিহিত করিলাম।

বুদ্ধদেব শাক্যসিংহের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব্বে লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়গণ বিশেষ পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন। কোশল ও মিথিলা প্রভৃতি জনপদ সমূহ তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। মিথিলাবাসী লিচ্ছবিগণ এরূপ প্রবল হইয়াছিলেন যে, জনকবংশীয় রাজাদিগের প্রদত্ত আখ্যা পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের অধিকৃত প্রদেশকে "নিচ্ছবি" ("লিচ্ছবি") আখ্যা প্রদান করিতে সক্ষম হন। লিচ্ছবিদিগের প্রতি আমাদের ব্রাহ্মণ ঠাকুরগণ নিতান্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। এজন্য তাঁহারা লিচ্ছবিদিগের অধিকৃত মিথিলা ও তৎসন্নিহিত দেশকে "বর্জ্জিতরাজ্য" বলিতেন। কিন্তু বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণ এই "বর্জ্জিত" শব্দের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, কাশীশ্বরী পূজাবলীর যে শিশু পুত্র কন্যা ঋষি কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া নিচ্ছবি আখ্যা প্রাপ্ত হন, সেই ঋষি শিশুদ্বয়কে প্রতিপালন করা

কষ্টকর বিবেচনায় অনেক গৃহস্থকে দান করেন। গৃহস্থ তাঁহাদিগকে যত্নের সহিত প্রতিপালন করিতে লাগিল। ইহাঁরা ক্রমে বড় হইয়া গ্রামের অন্যান্য বালক বালিকার সহিত ক্রীড়া করিতে গেলে, তাহারা বলিত, লিচ্ছবিদ্বয় পিতৃমাতৃহীন সুতরাং ইহারা "বর্জ্জিতব্য" (বজ্জিতব্ব—পালি)। উত্তর কালে যখন সেই "বর্জ্জিতব্যের" বংশধরগণ ৩০০ যোজন বিস্তৃত একটি পরাক্রমশালী রাজ্যস্থাপন করেন, তৎকালে সেই রাজ্য "বর্জ্জিত" (পালি-বজ্জি) আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল, বিবিধ পালি গ্রন্থে সমগ্র মিথিলা দেশ "বজ্জি" নামে পরিচিত হইয়াছে। (১)

প্রোক্ত লিচ্ছবিগণ প্রথমতঃ যে নগর স্থাপন করেন, ক্রমে তাহার আয়তন অত্যন্ত পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে; এজন্য সেই নগর বিশাল (ক্রমে-বৈশালী) আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের মতে, সূর্য্যবংশীয় রাজা তৃণবিন্দু, অলম্বুষা নাম্নী পরমসুন্দরী অপসরার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন। তাহার নাম বিশাল। এই নরপতি বিশাল, বৈশালী নগরী নির্ম্মাণ করেন। (২) জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থ সমূহে বৈশালী নগরীর বিশেষ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধদিগের মতে এই নগরী তিন ভাগে বিভক্ত ছিল যথা, বৈশালী, কুন্দপুর ও বাণীয়াগাঁও। তদ্ব্যতীত "সহরতলী" ছিল। লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়দিগের দ্বারা বৈশালীর যথেষ্ট উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল। (৩) পুরাণে রাজা বিশালের যে বংশাবলী প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইতিহাসলেখক অবশ্যই তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না।

উত্তর কোশলবাসী লিচ্ছবিগণ তাঁহাদিগের প্রাচীন আখ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক "শাক্য" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। লিচ্ছবিগণ দুই শাখায় বিভক্ত হইলে পর, সেই দুই শাখায়

---

১ পালি গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদকগণ অন্তস্থ "ব" কারের স্থলে wa ব্যবহার দ্বারা বজ্জিকে wajji লিখিয়াছেন। বঙ্গীয় লেখকগণ ইহা বিশেষরূপে অনুধাবন না করিয়া সেই বজ্জিকে "উজ্জী" করিয়াছেন।

২ ততশ্চালম্বুষা নাম বরাপ্সরা তৃণবিন্দুংভেজে। তস্যামস্য বিশালো জজ্ঞে, যঃ পুরীং বৈশালং নাম নির্ম্মমে।

বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশ, ১ অধ্যায়।

৩ There were three districts in Vesali. In the first district were 7000 houses with golden towers, in the middle district were 14000 houses with silver towers, and in the last district were 21000 houses with copper towers; in these lived the upper, the middle and the lower classes according to their positions.

Rockhill's Life of the Buddha. p. 62.

The city was like the loka of Sekra (ইন্দ্রলোক) in the magnificence of its appearance and the happiness of its inmates.

Hardy's manual of Buddhism. p. 236.

See also Ralston's Tebetans Tales. p. 77.

দুই জন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের ন্যায় মহাত্মা জগতে আর কেহ আবির্ভূত হইয়াছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ রহিয়াছে। অদ্যাপি সমগ্র মানবমণ্ডলী তাহাদের নাম স্মরণ করিয়া ভক্তিকুসুমাঞ্জলি প্রদান করিতেছে। যে লিচ্ছবি বংশে জৈনধর্ম্ম প্রচারক ভগবান মহাবীর স্বামী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—যে লিচ্ছবি-কুলে জগৎপূজ্য শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যে লিচ্ছবিগণ জগৎবাসী মানবদিগকে সর্ব্বপ্রথম "সাধারণ তন্ত্র" শাসন প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছিলেন,—সেই লিচ্ছবি বংশকে ভারতের গৌরব বলিয়া স্বীকার করিতে বোধ হয় কোন ভারত সন্তান কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু শ্রবণ করুন আমাদের প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ হিংসার দংশনে অস্থির হইয়া, সেই ভারতের গৌরব—মানব সমাজের গৌরব লিচ্ছবি বংশকে কিরূপ অপমানিত করিয়া গিয়াছেন।

ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যা নিচ্ছিবিরেবচ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এবচ॥

মনু, ১০। ২২।

ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস, দ্রবিড় নামক পুত্র জন্মে, (দেশ ভেদে নাম ভেদ মাত্র)।

য়িহুদিগণ মহাত্মা যিশুকে ক্রুশ বিদ্ধ করিয়া যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, বৌদ্ধদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ সেইরূপ, খস দ্রবিড় প্রভৃতি অনার্য্য বর্ব্বরদিগের সহিত আর্য্য-জাতির গৌরব স্বরূপ নিচ্ছবি মল্ল, করণ প্রভৃতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া সেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। পণ্ডিত প্রবর বেবের মনুসংহিতা সমালোচনা করিতে যাইয়া বলিয়া-ছেন যে, ধর্ম্মবিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া মনুসংহিতা প্রণেতা লিচ্ছবিদিগকে এরূপ অপ-মানিত করিয়াছেন। (৪)

পুরাণ ও সংহিতাকার ঋষিগণ যখন দেবাসুরের যুদ্ধ বর্ণনা এবং প্রকারান্তরে বৌদ্ধ-দিগের উল্লেখ করিতে গিয়াছেন, তখনই তাঁহারা তাঁহাদের দেবভাবকে কর্ম্মনাশার জলে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। এস্থলে কোন পাঠক এরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, মনুসংহিতা মহাবীর কিম্বা বুদ্ধের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী, এমন কি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও মনুর বয়ঃক্রম ১২০০ হইতে ৯০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ অবধারণ করিয়াছেন। (৫) সুতরাং ভগবান মনুর প্রতি এরূপ বাক্যবাণ প্রয়োগ করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। তদুত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে, সেই স্মরণাতীত কালে যে "মানব সূত্র" রচিত হইয়া-ছিল, এবং যাহাকে আদিধর্ম্ম শাস্ত্র বলা যাইতে পারে, বৌদ্ধদ্রোহী ব্রাহ্মণেরা তাহার

---

৪ Weber's History of Indian Literature. pp. 276-7.

৫ স্যর উইলিয়ম জোন্স ১২০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে, স্লেগেল ১০০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে এবং এলফিনষ্টোন ৯০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ মনুর বয়ঃক্রম অবধারণ করিয়াছেন।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। নারদ সংহিতার উপক্রমণিকায় লিখিত হই-য়াছে যে, প্রাচীন মনু এক সহস্র অধ্যায় ও একলক্ষ শ্লোকে পরিপূর্ণ ছিল। তৎপর নারদঋষি তাহার সার সঙ্কলন পূর্ব্বক দ্বাদশ সহস্র শ্লোক পূর্ণ সংহিতা প্রচার করেন। তদনন্তর ঋষি পুঙ্গব সুমতি চারি সহস্র শ্লোকাত্মক আর একখানা মনু প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণ আমরা যে মনুসংহিতা দেখিতে পাই, তাহা ভৃগু সঙ্কলিত। ইহাতে ২৬৮৫ টি শ্লোক রহিয়াছে। সুতরাং মনুসংহিতার প্রথম তিনটি সংস্করণ করাল কাল কবলে নিপতিত হইয়া হিংসাপরায়ণ বৌদ্ধদ্রোহী ব্রাহ্মণ সঙ্কলিত চতুর্থ সংস্করণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রাচীন টীকাকারগণ যে বৃদ্ধ বা বৃহন্মনুর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি না। মহাভারতে মনুসংহিতা হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, ভৃগু সঙ্কলিত মানবধর্ম্ম শাস্ত্রে সেই সকল শ্লোক দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে "মানবসূত্রের" চতুর্থ সংস্করণ বৌদ্ধদ্রোহী ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। পণ্ডিত প্রবর মেক্সমূলার ইহার বয়ঃক্রম দুইশত পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে অবধারণ করিয়াছেন। (৬) আমাদের বিবেচনায় ভৃগু সংক-লিত মনুসংহিতা কোন মতেই ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে না, বরং পরবর্ত্তী হও-য়াই সম্ভব।

আধুনিক সভ্যজগতে যে সাধারণ তন্ত্র (৭) শাসন প্রণালীর গৌরব ও খ্যাতি দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়গণ জগতে তাহা প্রথম প্রদর্শন করেন। সে সময় মিথিলা অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে "সমগ্র বর্জ্জি(ত) রাজ্য ৭৭০৭টি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতিগণ সকলই স্বাধীন ছিলেন। কেহ কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতেন না। (৮) কিন্তু কোনরূপ যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলে আধু-নিক জর্ম্মাণ রাজন্যবর্গের ন্যায় পরস্পর সম্মিলিত হইয়া এরূপ সিংহনাদ করিতেন যে, তচ্ছ্রবণে সমস্ত উত্তর ভারত নিস্তব্ধ হইয়া যাইত। মগধের প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাটগণও তাহাদের সহিত কলহ করিতে সাহসী হইতেন না। "সম্মিলিত বর্জ্জিত" রাজ্যের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য বৈশালী নগরে একটি মহাসভা ছিল। সেই সভায় স্থিরীকৃত বিধি সমূহ দ্বারা "সম্মিলিত বর্জ্জিত" রাজ্য সুশাসিত হইত।

শক পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৈশালীর অন্তর্গত কুন্দগ্রাম বিভাগে সিদ্ধার্থ নামে এক

---

৬ Ancient Sanskrit Literature pp. 61, 244.

৭ Republican Government.

৮ ললিত বিস্তর গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় বৈশালীবাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে যে, ইহাঁরা কেহ কাহাকেও মান্য করেন না—সকলেই "অহং রাজা অহংরাজা" বলিয়া থাকেন, বোধ হয় গ্রামাধিপতিগণই রাজা উপাধি ধারণ করিতেন।

প্রধান ব্যক্তি (রাজা) ছিলেন, তাঁহার পত্নীর নাম ত্রিশলাদেবী। ত্রিশলার গর্ভে সিদ্ধার্থের কয়েকটি পুত্র কন্যা জন্মে। তাহার দ্বিতীয় পুত্র বর্দ্ধমান আখ্যা প্রাপ্ত হন। সিদ্ধার্থ ও তদ্বংশীয়গণ সকলেই জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার বাসভবনের নিকট পার্শ্বনাথের এক মন্দির ছিল।

ভগবান ঋষভনাথ জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। পুরাণকারগণ ইহাঁকে নারায়ণের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। (৯) তিনি নারায়ণের অষ্টম অবতার। অগ্নীধ্র পুত্র নাভির ঔরষে ও সুদেবীর গর্ভে ঋষভনাথ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে, ঋষভনাথ"স্বস্থ (১০) শান্তেন্দ্রিয় ও বিষয়াশক্তি শূন্য হইয়া সর্ব্বাশ্রম শ্রেষ্ঠ পরমহংস আশ্রমের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।"

ঋষভনাথ আদি জিন বা তীর্থঙ্কর। তৎপর আর ও একুশ জনের পর ত্রয়োবিংশতি জিন পার্শ্বনাথ আবির্ভূত হন। শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্যে (১১) লিখিত আছে যে, "কাশীধামের জৈন নরপতি অশ্বাসনের পত্নী বামা দেবীর গর্ভে পার্শ্বনাথ জন্মগ্রহণ করেন।" শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর অভ্যুদয়ের ১৭৮ বৎসর পূর্ব্বে পার্শ্বনাথ প্রাণত্যাগ করেন। তিনি যে পর্ব্বত শিখরে দেহত্যাগ করেন, তাহা অদ্যাপি "পার্শ্বনাথ" (পরেশনাথ) আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া একটি প্রধান তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে। (১২)

বৈশালী নগরে পার্শ্বনাথের যে মন্দির ছিল, বর্দ্ধমান সেই মন্দিরে যাইয়া জৈনধর্ম্মের উপদেশ লাভ করিতেন। ক্রমে তৎপ্রতি তাঁহার দৃঢ় অনুরাগ জন্মে। পিতৃবিয়োগের পর, ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমে বর্দ্ধমান স্ত্রী ও কন্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যতিধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে দুই বৎসর কাল তিনি শান্তেন্দ্রিয় হইয়া ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তদনন্তর আরও ১০ বৎসর কাল তপস্যা করিয়া তিনি জিনত্ব লাভ করত, ৪২ বৎসর বয়ঃক্রমে "মহাবীর স্বামী" আখ্যা প্রাপ্ত হন। তিনিই অন্তিম বা চতুর্বিংশতি জিন ও তীর্থঙ্কর। (১৩) তিনি স্বয়ং

---

৯ শ্রীমদ্ভাগবত। প্রথম স্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায় এবং দ্বিতীয় স্কন্ধ সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১০ স্বস্থ—আত্ম স্বরূপে অবস্থিত অর্থাৎ আত্মধ্যান নিমগ্ন।

১১ শত্রুঞ্জয় মহাত্ম্যে লিখিত আছে, ৪৭৭ শকাব্দে বল্লভীরাজ শিলাদিত্যের ধর্ম্মোপদেষ্টা ধনেশ্বর সূরি এইগ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু পণ্ডিত প্রবর বুলার বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন যে, প্রকৃত পক্ষে খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্য কালে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

১২ এই পর্ব্বত চুটিয়া নাগপুর প্রদেশে অবস্থিত। পরেশনাথ পাহাড় ৩১৭৮ হস্ত উচ্চ। ইহার সানুদেশে পার্শ্বনাথের এক মন্দির আছে।

১৩ চতুর্ব্বিংশ জিন বা তীর্থঙ্কর।

	নাম।	জন্মস্থান।	মৃত্যুস্থান।
১।	ঋষভনাথ	অযোধ্যা	গুর্জ্জর
২।	অজিতনাথ	ঐ	পর্ব্বতশিখর (পরেশনাথ)

দিগম্বর ছিলেন। তদনুসারে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ উলঙ্গ থাকিতেন, অন্যেরা শুক্ল বসন পরিধান করিতেন। জৈন ভিক্ষুদিগের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই উলঙ্গ থাকিতেন। ইহা হইতেই উত্তর কালে জৈনগণ "শ্বেতাম্বর" ও "দিগম্বর" নামক দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিলেন। (১৪) মহাবীর স্বামী বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সর্ব্বপ্রকার

৩। সম্ভবনাথ	সাবস্ত	পর্ব্বতশিখর (পরেশনাথ)
৪। অভিনন্দন স্বামী	অযোধ্যা	ঐ
৫। সুমতিনাথ	ঐ	ঐ
৬। পদ্মপ্রভা	কৌশম্বী	ঐ
৭। সুপার্শনাথ	কাশীধাম	ঐ
৮। চন্দ্রপ্রভা	চন্দ্রিপুর	ঐ
৯। সুবদ্ধনাথ (পুষ্পদন্ত)	কক্কেন্দ্রপুরী	ঐ
১০। শীতলনাথ	ভদলপুর	ঐ
১১। শ্রেয়াংশনাথ	সিন্ধুদেশ	ঐ
১২। বসুপূজ্য	চম্পাপুরী	চম্পাপুরী
১৩। বিমলনাথ	কমলপুরী	পর্ব্বত শিখর
১৪। অনন্তনাথ	অযোধ্যা	ঐ
১৫। ধর্ম্মনাথ	রত্নপুরী	ঐ
১৬। শান্তিনাথ	হস্তিনা	ঐ
১৭। কুন্তনাথ	ঐ	ঐ
১৮। অরুনাথ	ঐ	ঐ
১৯। মল্লিনাথ	মিথিলা	ঐ
২০। সুব্রতস্বামী	রাজগৃহ	ঐ
২১। নেমিনাথ	মিথিলা	ঐ
২২। অৰ্হতনেমি	দ্বারকা	গিরিনার
২৩। পার্শ্বনাথ	কাশীধাম	পর্ব্বতশিখর
২৪। মহাবীর (বৰ্দ্ধমান)	বৈশালী	পাওয়ানগরী।

১৪ মহাবীরের মৃত্যুর সার্দ্ধেক শতাব্দী পরে, মুরাকুলতিলক মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের শাসন কালে মগধ দেশে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া জৈন সম্প্রদায়ের তদানীন্তন নেতা স্থবির ভদ্রবাহু কতকগুলি ভিক্ষুকে লইয়া কর্ণাটে গমন করেন। যে ভিক্ষুদল মগধে রহিলেন, স্থবির স্থূলভদ্র তাহাদের নেতৃপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষের অবসানে পাটলিপুত্র নগরে জৈনদিগের এক মহাসভা হইয়াছিল। তাহাতে জৈনদিগের "একাদশ অঙ্গ" "চতুর্দ্দশ পর্ব্ব" "দিত্তি বাউ" (দৃষ্টিবাদ) প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ ও বিধি সমূহ স্থিরীকৃত হইয়াছিল। যে ভিক্ষুদল কর্ণাটে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই দিগম্বর ছিলেন। ইহাঁরা মগধে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের অনুপস্থিতে মহাসভায় যে সকল বিধি নির্ণীত হইয়াছিল, তাহা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিলেন না। ক্রমে ইহাঁরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া আত্ম কলহে নিযুক্ত হইলেন। অবশেষে শকাব্দের প্রথম কিম্বা দ্বাদশ বৎসরে স্থূল ভদ্রের মতানুযায়ীগণ শ্বেতাম্বরও ভদ্রবাহুর সহচরগণ দিগম্বর আখ্যা ধারণ পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া দাড়াইলেন।

বন্ধন ছেদন করিয়া "নির্গ্রন্থানাথ" (নিগণ্ঠনাথ) আখ্যা প্রাপ্ত হন। তদনুসারে তাঁহার শিষ্য (জৈন) সম্প্রদায় নির্গ্রন্থ নামে পরিচিত হইয়াছেন।

"ভগবতী সূত্র" নামক জৈন গ্রন্থের পঞ্চদশ শতকে লিখিত আছে যে, মঙ্খ (১৫) সম্প্রদায়ের জনৈক ভিক্ষুক ভ্রমণ কালে একদা রজনীতে গর্ভবতী পত্নীকে লইয়া এক গোশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথায় মঙ্খপত্নী একপুত্র প্রসব করে। গোগৃহে জন্মিয়াছিল বলিয়া সেই শিশু গোশাল আখ্যা প্রাপ্ত হয়। মহাবীর যৎকালে তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় গোশাল তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তৎপরে ছয় বৎসর কাল মহাবীরের নিকট উপদেশ লাভ করত, মহাবীরের জিনত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বেই গোশাল স্বয়ং জিনত্ব লাভ করিয়াছেন বলিয়া মহাবীরকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক "আজীবিক" নামক এক ধর্ম্ম সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অধুনা আজীবিক সম্প্রদায়ের কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মণ, আজীবিক ও নির্গ্রন্থ নামক সম্প্রদায়ত্রয় দীর্ঘকাল বৌদ্ধদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। "দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী" মহারাজ শ্রীধর্ম্মাশোকের (দিল্লীর) খোদিত লিপিতে ইহাদের (বাভনেসু, আজীবিকেসু, নিগ্‌গন্থেসু) উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (১৬) সিংহলদেশের বিখ্যাত ইতিহাস "মহাবংশ" গ্রন্থে আজীবিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ রহিয়াছে। (১৭) অন্যান্য বিবিধ গ্রন্থে আজীবিক সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং গোশাল যে একটি বৃহৎ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। গোশাল, মহাবীর ও তাহার শিষ্যগণের প্রবল শত্রু হইয়া উঠেন। ক্রমে ১৬ বৎসর স্বীয় মত প্রচার করিয়া অবশেষে শ্রাবস্তী নগরে গোশাল মহাবীর দ্বারা ধর্ম্মযুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

ক্রমে অনেক লোক জৈনধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবীরের শিষ্য শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়াছিল। বিম্বসার (১৮) এবং কৌশাম্বীপতি শাসনিক প্রভৃতি নরপতিগণ জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মহাবীর স্বামী দ্বারা জৈনধর্ম্মের প্রভূত উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল। তিনি ৭২ বৎসর বয়ঃক্রমে নরলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে আর একটি মহাশক্তি আসিয়া জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিল। সেই মহাশক্তি বৌদ্ধধর্ম্ম।

---

১৫ চিত্রপট দেখাইয়া যাহারা ভিক্ষা করিত, প্রাচীন কালে তাহাদিগকে মঙ্খ বলিত।

১৬ Cunningham's Corpus Inscriptionum Indicarum Vol. 1. plate XX. lines 4, 5.

১৭ মহাবংশ পঞ্চম পরিচ্ছেদ। (Tornour. p. 67.)

১৮ মগধরাজ শ্রেণী-বিম্বসার, মহাবীরের পিতৃব্য চেতকের কন্যা চেল্লনা(বাসিবী)কে বিবাহ করেন। তদ্গর্ভে বিম্বসারের দুইপুত্র জন্মে; জ্যেষ্ঠ কুনিক (অজাতশত্রু) ও কনিষ্ঠ বিহল্ল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়দিগের একশাখা শাক্য উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। সেই শাখা হইতে শাক্য বুদ্ধের উৎপত্তি। লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়গণ গৌতম গোত্রজ, তদনুসারে শাক্য সিংহ গৌতম নামে পরিচিত হইয়াছেন। কোন কোন পুরাতত্ত্ববিৎ পাণ্ডিত অনুমান করেন শাক্যসিংহ প্রথমতঃ মহাবীরের শিষ্য ছিলেন। এবং জৈন গ্রন্থে তিনি গৌতম নামে আখ্যাত হইয়াছেন। এই অনুমান সঙ্গত কি না, তৎসম্বন্ধে আমরা আপাততঃ কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে অভিলাষী নহি। পশ্চাৎ মহাবীর ও বুদ্ধের সময় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

লিচ্ছবিগণ যৎকালে জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, সেই সময় তাঁহারা বৌদ্ধদিগের প্রতি বিবিধ প্রকার অত্যাচার করিতেন। তদনন্তর তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সেই ধর্ম্মের উন্নতি ও প্রচারের জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। (১৯) লিচ্ছবিদিগের প্রধান নগরী বৈশালী বুদ্ধদেবের একটি প্রধান ধর্ম্ম প্রচারের স্থান। লিচ্ছবিগণ বৈশালী নগরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে "মহাবন" নামক উদ্যান মধ্যে বুদ্ধের অবস্থান জন্য "কূটাগার' বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (২০) এই বিহারে ভগবান শাক্যসিংহের মুখকমল হইতে অমৃতোপম "বিমলকীর্ত্তিসূত্র" প্রচারিত হইয়াছিল;—এই বিহারেই শারিপুত্র প্রভৃতি বুদ্ধের কয়েকজন প্রধান শিষ্য অর্হত পদবী লাভ করিয়াছিলেন। প্রবাদ অনুসারে এই বিহার মধ্যে বুদ্ধদেবের জলপান জন্য একদল বানর একটি সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তদনুসারে এই সরোবর "মর্কট হ্রদ" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। চীন পরিব্রাজক হিয়োনসাঙ "মর্কট হ্রদের" বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। কূটাগারী বিহারে অবস্থান কালে একদা একদল মর্কট বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্র লইয়া অরণ্য মধ্যে পলায়ন করে। কিছুকাল পরে তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বুদ্ধদেবের হস্তে সেই ভিক্ষাপাত্র প্রদান করিল। তখন দেখা গেল, ভিক্ষাপাত্র মধু দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

বুদ্ধদেব শাক্যসিংহ "সেচনক" নামক একটি প্রকাণ্ড হস্তী মগধরাজ বিম্বসারকে প্রদান করেন। বিম্বসার সেই হস্তী ও অষ্টাদশরত্নমণ্ডিত একছড়া হার তাঁহার

---

১৯ পণ্ডিত প্রবর বেবের বলেন—According to Buddhist legends, the Vaidehas and especially this Lichhavi family of them exercised a material influence upon the growth of Buddhism.

History of Indian Literature. page 275.

২০ প্রাচীন বৈশালীর ভগ্নাবশেষ অধুনা বেশাড় নামে পরিচিত রহিয়াছে। ইহার এক ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিকে বখরা নামক স্থানে এই মহাবন বিহার অবস্থিত ছিল। কিঞ্চিদূন সার্দ্ধ একবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের লীলাভূমি মহাবন বিহারক্ষেত্রে মহারাজ অশোক যে "সিংহ স্তম্ভ" নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি দণ্ডায়মান থাকিয়া দর্শকদিগের আনন্দ ও বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। ভূপৃষ্ঠ হইতে এই স্তম্ভ প্রায় ১০॥ হস্ত উচ্চ। সেই স্থানবাসী সাধারণ লোকে ইহাকে ভীমসেনের ডাণ্ডা বলিয়া থাকে

কনিষ্ঠপুত্র বেহল্লকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই ঘটনা দ্বারা বিম্বসারের জ্যেষ্ঠ পুত্র অজাতশত্রু স্বীয় পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি জাতক্রোধ হইলেন। সেই ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বুদ্ধের মৃত্যুর ৮ বৎসর পূর্ব্বে পিতৃরক্তে মগধ রাজসিংহাসন কলুষিত করিয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর স্বীয় পত্নীর উত্তেজনায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বেহল্লকে সেই গজ ও রত্নহার প্রদান করিতে আদেশ করেন। পিতৃহন্তা অগ্রজের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করা নিতান্ত দুরূহ বিবেচনায় পরাক্রমশালী মাতামহকুলের (লিচ্ছবিদিগের) আশ্রয় গ্রহণাভিলাষে বেহল্ল বৈশালীতে গমন করিলেন। সাধারণতন্ত্রপরায়ণ মাতামহকুলকে নির্যাতন করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে বিবেচনায় অজাতশত্রু চিন্তামগ্ন হইলেন।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে যৎকালে তিনি রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী "গৃধ্রকূট" (২১) পর্ব্বতাশ্রমে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় মগধরাজ অজাতশত্রু স্বীয় প্রধান মন্ত্রী বিশ্বকর নামক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "মন্ত্রিন্! আপনি ভগবানের (বুদ্ধের) নিকট গমন করুন। তাঁহার পাদপদ্মে আমার শত সহস্র প্রণাম জ্ঞাপন করিয়া কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন। তৎপরে তাঁহার পাদপদ্মে বিনীত ভাবে বলিবেন যে, ভগবন্! মগধরাজ অজাতশত্রু মহৎ ও পরাক্রমশালী (বর্জ্জিত) লিচ্ছবিদিগকে সমূলে উৎপাটন করিবেন।" ইহা শ্রবণ করিয়া ভগবান যাহা বলেন, তাহা বিশেষরূপে স্মরণে রাখিয়া আমাকে জানাইবেন, তথাগত কখনই মিথ্যা বলেন না।

যথাকালে মন্ত্রী বুদ্ধদেবের নিকট উপনীত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিলেন। বুদ্ধদেব মন্ত্রীর বাক্যের উত্তর প্রদান করিবার পূর্ব্বে প্রিয় সহচর আনন্দকে বলিলেন, "আনন্দ! তুমি অবগত আছ, বর্জ্জিত (লিচ্ছবিগণ) সর্ব্বদা সাধারণ সভায় সমবেত হইয়া, একতার সহিত সকল বিষয় নিষ্পত্তি করেন। তাঁহারা বয়োবৃদ্ধের প্রতি উপযুক্ত সম্মান করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রাচীন প্রথাগুলি বিনষ্ট করিতে বিমুখ এবং প্রাচীন প্রথাগুলি তাঁহারা সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে নারীজাতির প্রতি কোনরূপ অত্যাচার দেখা যায় না। তাঁহারা সর্ব্বদা চৈত্যের (২২) সম্মান ও পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহারা অর্হতদিগকে সম্মান ও রক্ষা করিয়া থাকেন।"

আনন্দ বলিলেন হাঁ, ভগবন, আমি ইহা অবগত আছি। তচ্ছ্রবণে বুদ্ধদেব বলিলেন তাহা হইলে কেহই তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারিবে না। তদনন্তর

---

২১ একদা নিশীথ কালে বুদ্ধদেবের প্রিয় শিষ্য ও সহচর খুল্লতাত ভ্রাতা আনন্দ এই পর্ব্বতে সমাধিমগ্ন ছিলেন। তৎকালে মাররাজ গৃধ্রবেশে তাঁহার সমাধি ভঙ্গের চেষ্টা করেন। এই জন্য ইহা গৃধ্রকূট নামে খ্যাত হইয়াছিল।

২২ এস্থলে চৈত্য অর্থ বৌদ্ধদিগের সমাজগৃহ।

মগধরাজমন্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "হে ব্রাহ্মণ! আমি বৈশালী নগরস্থিত সারন্দদ চৈত্যে অবস্থান কালে লিচ্ছবিদিগকে যে সাতটি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম, যতদিন তাঁহারা সেই সকল উপদেশ যত্নের সহিত প্রতিপালন করিবেন, ততদিন উত্তরোত্তর তাঁহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, কেহই তাঁহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিবে না।"

তদুত্তরে মন্ত্রী বলিলেন, হে প্রভু গৌতম! যতদিন লিচ্ছবিগণ আপনার সপ্ত আদেশ প্রতিপালন করিবে, ততদিন কেহই তাহাদিগের উন্নতি প্রতিরোধ করিতে পারিবে না; এজন্য আপাততঃ মগধরাজকে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া উপহার প্রদানে লিচ্ছবিদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে, নচেৎ তাহাদের "একতাবন্ধন" ছিন্ন করিবার জন্য যত্ন পাইতে হইবে। (২৩)

উল্লিখিত ঘটনার কিছুকাল পরে বুদ্ধদেব বৈশালী যাত্রা করেন। তিনি গঙ্গাতীরস্থিত পাটলি গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, লিচ্ছবিদিগকে নির্যাতন অভিপ্রায়ে মগধরাজের প্রধান মন্ত্রীদ্বয় বিশাকর ও সিন্ধু তথায় এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছেন। এই পাটলী দুর্গ হইতে জগদ্বিখ্যাত পাটলীপুত্র নগরীর উৎপত্তি।

বুদ্ধ বৈশালীতে উপস্থিত হইয়া এক উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। এক বারবিলাসিনী সেই উদ্যানের অধিকারিণী। তাহার নাম আম্রপালী। (২৪) বারাঙ্গনার কলুষিত বিলাস কানন অদ্য বুদ্ধের পাদস্পর্শে পবিত্র হইল। আম্রপালী স্বীয় উদ্যানে বুদ্ধের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। দ্রুত পদে যাইয়া বুদ্ধের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া স্বীয় জঘন্য জীবন পবিত্র করিল। আম্রপালী বুদ্ধকে তৎপর দিবস তাহার গৃহে যাইয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল, পতিত পাবন ভগবান শাক্য সিংহ সহর্ষ চিত্তে বেশ্যার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। ভগবান বৈশালীতে পদার্পণ করিয়াছেন; এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র লিচ্ছবিগণ তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। এবং যথা বিহিত অভিবাদন করিয়া জনৈক লিচ্ছবি তাঁহার গৃহে যাইয়া, ভিক্ষা গ্রহণ

---

২৩ মহা পরিনির্ব্বাণ সূত্র। প্রথম ভানবার।

২৪ A female, of extremely beautiful appearance, was born, by the apparitional birth at the foot of a mango (amba) tree, in a garden belonging to the Lichawi princes, near the city of Wisala. On account of the place of her birth she was called Ambapali and was a courtesan.

Hardy's Manual of Budhism. p. 456.

As this girl has been obtained from the Amra grove, her name ought to be Amrapali.

Ralston's Tebetan Tales. p. 85.

করিতে বুদ্ধদেবকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তিনি আম্রপালীর নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অক্ষম জানাইলেন। পর দিবস যথা সময়ে ভগবান শিষ্যগণ সহ আম্রপালীর ভবনে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। সেই সময় আম্রপালী দীনবেশে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, ভগবন্! পাপকর্ম্ম দ্বারা অতুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়াছি। আর পাপের বোঝা বহিতে পারি না। অদ্য হইতে পাপজীবন পরিত্যাগ করিলাম। যে উদ্যানে আপনি প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহা আপনার পাদপদ্মে উৎসর্গ করিলাম। আমার বিপুল ধনরাশি দ্বারা তথায় এক বিহার নির্ম্মিত হইবে। আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি ধর্ম্মের জন্য সমর্পণ করিয়া কপর্দ্দকহীন ভিখারিণী হইয়াছি। আপনার কৃপাকণা দ্বারা এ হতভাগিনীর পাপরাশি প্রক্ষালিত করুন। কলুষ সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছি—দয়া করিয়া উদ্ধার করুন। পাপীয়সীকে শিষ্য শ্রেণীতে স্থান প্রদান করুন। (২৫)

পতিতপাবন ভগবান শাক্যসিংহ আম্রপালীকে কলুষসাগর হইতে উদ্ধার করিলেন। তাহার জীবন ধন্য হইল। আম্রপালীর উদ্যান বিহার বৌদ্ধ জগতে তীর্থশ্রেণীতে পরিগণিত হইল। ইহার প্রায় সহস্র বৎসর অন্তে চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান ভারতে আসিয়া আম্রপালীর উদ্যান বিহারের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব কিছু কাল আম্রপালীর উদ্যানে বাস করিয়াছিলেন। এস্থলেই তিনি শিষ্যগণের নিকট প্রচার করেন যে আর তিন মাস অন্তে তিনি কুশী নগরে মহানির্ব্বাণ লাভ করিবেন। তদনন্তর যথা সময়ে বৈশালীর পশ্চিম দ্বার দিয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া তিনি স্বীয় গতি পরিবর্ত্তন করত বৈশালীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এই নগরে আমার মনুষ্য জীবনের শেষ ক্রিয়া সকল সম্পাদিত হইল।" বুদ্ধদেব যে স্থানে দাঁড়াইয়া এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, উত্তরকালে সেইস্থানেই এক প্রকাণ্ড স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বুদ্ধদেব মন্দগতিতে কুশীনগরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, বৈশালীর লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়গণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া সকলেই তাঁহার পশ্চাৎ চলিয়াছে। কিয়দ্দূর গমন করিয়া ভগবান লিচ্ছবিদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিলেন। বুদ্ধের প্রতি তাঁহাদের অকৃত্রিম আসক্তির উত্তেজনায় তৎকালে তাঁহারা বুদ্ধের বাক্য অবহেলা করিয়া তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। বুদ্ধদেব, "মনুষ্য দেহ ক্ষণস্থায়ী, সকলকেই মরিতে

---

২৫ কোন কোন লেখক আম্রপালী ও উৎপলবর্ণাকে অভিন্ন বিবেচনা করেন। কিন্তু উৎপলবর্ণা তক্ষশীলা নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এজন্য বিবিধ গ্রন্থে উৎপলবর্ণা "গান্ধারিণী" আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইয়াছে। আম্রপালী ও উৎপলবর্ণা নামক বারবিলাসিনীদ্বয় বুদ্ধের কৃপায় পবিত্র জীবন লাভ করিয়া, অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে।

হইবে” ইত্যাদি বাক্যে তাহাদিগকে বিবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন। লিচ্ছবিগণ কোন মতেই ক্ষান্ত হইলেন না। ক্রমে ১৪।১৫ ক্রোশ পথ এইরূপে অতিবাহিত হইল। কোন প্রকারে লিচ্ছবিদিগকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে যোগবলে এক গভীর নদী সৃষ্টি করিলেন। লিচ্ছবিগণ সেই নদী অতিক্রম করিতে অক্ষম হইয়া দুঃখে ম্রিয়মান হইলেন। তদ্দর্শনে বুদ্ধদেব মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া স্বীয় জীবনের একমাত্র সম্বল ভিক্ষাপাত্র তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। লিচ্ছবিগণ সেই ভিক্ষাপাত্র লইয়া বৈশালীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সেই ভিক্ষাপাত্র স্থাপন করিলেন। (২৬) যে স্থানে বুদ্ধদেব লিচ্ছবিদিগকে বিদায় দিয়াছিলেন, সেইস্থানে তাঁহারা একটি শিলাস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সেই বিদায় বৃত্তান্ত লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। (২৭)

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার “ধাত” (চিতা ভস্ম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড) লইয়া একটি লোমহর্ষণ কাণ্ডের সূত্রপাত হইয়াছিল। কুশীনগর, পাওয়ার মল্লউপাধিধারী ক্ষত্রিয় রাজাদিগের অধিকারভুক্ত। মল্লরাজগণ বলিলেন, “ভগবান আমাদের রাজ্য মধ্যে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, সুতরাং ধাতুসমূহের (অস্থি ও চিতাভস্ম প্রভৃতির) আমরাই অধিকারী।”

মগধের ক্ষত্রিয় নরপতি অজাতশত্রু, বৈশালীর লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়গণ, কপিলবস্তুর শাক্য ক্ষত্রিয়গণ, অলকাপুরের বলয় ক্ষত্রিয়গণ, এবং উথদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ মল্ল রাজাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন।

এইরূপ ভয়ঙ্কর কলহের সূত্রপাত দর্শনে দ্রোণ নামক জনৈক বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “হে প্রিয় সুহৃদগণ! আমার একটি বাক্য শ্রবণ কর। ভগবান বুদ্ধদেব শান্তির আদর্শ মূর্ত্তি ছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই এরূপ কলহে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের পক্ষে অতি গর্হিত কার্য্য। চল আমরা সকলে অন্তরের সহিত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এক মত হইয়া এই চিতাভস্ম প্রভৃতিকে ৮ ভাগে বিভক্ত করি। অনেক জাতি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, চল আমরা নানা দেশে বহুল পরিমাণে এই ধাতুখণ্ড সমূহ স্থাপন করিয়া তদুপরি স্তূপ নির্ম্মাণ করি।”

দ্রোণের বাক্যে সকলেই সম্মত হইলেন। একটি ক্ষুদ্র মৃণ্ময় পাত্র দ্বারা তৎ সমস্ত ৮ ভাগে বিভক্ত করা হইল। লিচ্ছবিগণ তাহার এক ভাগ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা

---

২৬ বুদ্ধদেবের ভিক্ষা পাত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহার অপূর্ব্ব ইতিহাস পশ্চাৎ লিখিত হইবে।

২৭ Beal's Fo-kow-ki. Ch. XXIV.

সেই অমূল্য পদার্থ বৈশালী নগরে সংস্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

"অথকথা" (অর্থকথা) নামক বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে, অজাতশত্রুর প্রধান মন্ত্রী (চানক্যের পিতামহ) কুটিল নীতিপরায়ণ বিশ্বাকর বুদ্ধদেবের নিকট লিচ্ছবিদিগের সাধারণতন্ত্র শাসন প্রণালীর বিবরণ অবগত হইয়া তাহাদিগের একতাবন্ধন ছেদন করিবার জন্য নানা প্রকার ঘৃণিত কৌশল অবলম্বন করেন। ক্রমে তিন বৎসর যত্ন ও চেষ্টা করিয়া লিচ্ছবিদিগের মধ্যে ভয়ানক আত্ম কলহ উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই সুযোগে, (বুদ্ধের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে) মগধরাজ অজাতশত্রু লিচ্ছবি রাজ্যে প্রবেশ করত বৈশালী নগর বিনষ্ট করেন এবং তিন শত লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়কে সপরিবারে বন্দী করিয়া রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

এইরূপে পরাক্রমশালী লিচ্ছবিগণ অজাতশত্রু দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনেকগুলি রাজ্য স্থাপন করেন। তন্মধ্যে নেপাল, তিব্বত ও লাদাকের লিচ্ছবি রাজবংশ উত্তর কালে বিশেষ খ্যাত হইয়াছিলেন। বৈশালী নগর বিনষ্ট হইলেও যে মিথিলাবাসী লিচ্ছবিগণ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। কারণ আনন্দের মৃত্যুকালে লিচ্ছবিদিগের সহিত মগধরাজের পুনর্ব্বার একটি লোমহর্ষণ কলহের সূত্রপাত হইয়াছিল। বুদ্ধের তিরোধানান্তে স্থবিরশ্রেষ্ঠ কশ্যপ বৌদ্ধ সমাজের নেতৃপদ প্রাপ্ত হন। তদনন্তর স্থবিরশ্রেষ্ঠ আনন্দ বৌদ্ধদিগের পরিচালক হইলেন। আনন্দ রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী কোন এক বিহারে বাস করিতেন। তৎকালে একদা ভ্রমণ সময়ে শ্রবণ করিলেন যে, জনৈক শ্রমণ অবিশুদ্ধভাবে একটি সূত্র আবৃত্তি করিতেছে। সেই ভ্রম প্রমাদগুলি 'অর্হত আনন্দের হৃদয়ে শেল স্বরূপ বিদ্ধ হইল। তিনি সেই শ্রমণের নিকটবর্ত্তী হইয়া ভ্রম সংশোধন' করিয়া দিলেন। শ্রমণ আনন্দের বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া বলিলেন, "আমার গুরুর নিকট যেরূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তাহাই বিশুদ্ধ ও সঙ্গত, আপনি ইহার অপ অর্থ করিতেছেন।" এই দারুণ বাক্য শ্রবণে আনন্দ এককালে নিস্তব্ধ হইলেন এবং নরলোকে আর অবস্থান নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় বৈশালীতে যাইয়া দেহত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে তথায় যাত্রা করিলেন। মগধরাজ এই সংবাদ শ্রবণমাত্র আনন্দকে আনিবার জন্য গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। লিচ্ছবিগণ আনন্দের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। আনন্দ তখন গঙ্গাবক্ষে ভাসমান নৌকায় অবস্থান করিতেছিলেন। মগধরাজ তাঁহাকে বিনয় পূর্ব্বক বলিতেছেন, "প্রভু! মগধে প্রত্যাবর্ত্তন করুন।" লিচ্ছবিগণ বলিতে লাগিলেন, "প্রভু! আপনি বৈশালীতে আগমন করুন।" এই রূপে প্রথমতঃ বাক্যযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া ক্রমে অস্ত্র যুদ্ধের উপক্রম হইল। তদ্দর্শনে আনন্দ যোগবলে আকাশ মার্গে উড্ডীন হইয়া

শূন্যমধ্যে দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার দেহ দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গঙ্গার দুই তীরে পতিত হইল। তখন উভয় দল যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সেই দেহ খণ্ড লইয়া যথোচিত সম্মানের সহিত সমাহিত করিয়া তদুপরি স্তূপ নির্ম্মাণ করিলেন। (২৮)

লিচ্ছবি কন্যার গর্ভ ও মগধরাজ নাগাশোকের ঔরসে মহারাজ "সুষুনাগের' উৎপত্তি। (২৯) তিনি মাতামহকুলের বিশেষ পক্ষপাতি ছিলেন। মগধেশ্বর সুষুনাগ আজাতশত্রু কর্ত্তৃক বিনষ্ট বৈশালী নগরী পুনর্নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মহারাজ কালাশোকের শাসন কালে বৈশালী নগরে বৌদ্ধদিগের দ্বিতীয় সঙ্গিতির অধিবেশন হইয়াছিল। ক্রমে দীর্ঘকাল বৈশালী মগধ রাজদণ্ডের অধীন ছিল। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী মহারাজ শ্রীধর্ম্মাশোক বৈশালীর স্তূপ উদ্ঘাটন করিয়া বুদ্ধদেবের ধাতুর ৭/১০ ভাগ স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

হর-শিঙ্গার। *

আমার বন্ধুরা সবে প্রায় বলাবলি
করে থাকে; স্নেহে কভু, কভু বা বিরাগে,
বিপুল ভ্রূকুটি করি, ভাল আকুঞ্চিয়া,
কহে থাকে—"মানে মানে ছাড় ওকালতি।
উকীলের হৃদয়টি মরুভূ সমান;
ফোটে না কুসুম তথা, দোলে না ব্রততী,
উছলে না উৎস—বালুরাশি—ধূধূ সুধু
হায় চতুর্দ্দিকে!—কহ হে উকীল কবি,
রচে কভু মধুচক্র উকীল-বরটী?"
তাই কি? তাই কি হায়? বল্ রে সংসার
নাহি কি তুমির্ নিত্য কক্করে তোর
বনপুষ্প, বাঁধিবারে সারস্বত মালা?
উদাস অরণ্য সুধু এ ব্রতে কি ব্রতী
হয়ে থাকে? বল্ বল্ ওলো উজ্জয়িনী!
বাণিজ্য ব্যবসাপূর্ণ, ভোগ স্পৃহাময়ী
তোর সেই নগরীর, অন্ধকাররাশি
হরিত কে? বিক্রমের নবরত্নাবলী
গেছে চলি, গেছে চলি।—কে দিবে গো পূরি
এ সমস্যা? আমি মূর্খ! জানিনা! জানিনা!
জানিবারে চাহ যদি—যাও শীঘ্র, যাও,
কুবেরের বরপুত্র, মঙ্গল সাহুজি,
আছে বসি—গিয়া তুমি সুধাও তাহারে।
সাহুজি মক্কেল মম; করিবে যতনে,
আতর এলাচ দিয়া, বসায়ে গদ্দীতে,

---

২৮ Beal's Fe-kwo-ki. Ch. XXVI.

২৯ পুরাণে—শিশুনাগ, বৌদ্ধ গ্রন্থে—সুষুনাগ।

* উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দুস্থানীরা শিউলিফুলকে হরশিঙ্গার বলিয়া থাকে।

শিষ্টালাপে, মিষ্টালাপে, যত্ন যথাবিধি !
ওই যে দেখিছ কুঠী— প্রকাণ্ড ভবন—
বাহিরে দেয়ালে হের কত কারিগরি !
নীরবে দোলায়ে শুঁড়, মাতোয়ারা হাতি,
কাড়ি লয়ে জলপূর্ণ পিত্তল কলসি
যুবতীর শির হ'তে,—দুরন্ত আহ্লাদে,
চারিধারে ছড়াইছে জলের ফোয়ারা !
যুবা বৃদ্ধ নরনারী, আকুলি ব্যাকুলি,
আর্দ্রকেশে, আর্দ্রবেশে, আগু পিছু চাহি,
রাস্তা ছাড়ি, গলিমুখে যাইতেছে ভাগি !
হে সখে বিস্ময়ে তুমি নেহারিছ ওকি ?
বাখানিছ মনে মনে শিল্পীর পটুতা ?
অথবা স্তম্ভিতভাবে, উৎকর্ণ হইয়া,
সংসার-ললাম আহা ! রজত মুদ্রার
শুনিতেছ মুহুর্মুহু ঝন্ ঝন্ ধ্বনি।
না, না—হেথা চারিধারে ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার !
দীপক, ঝালর, ঝাড়, দেয়ালগিরির
চারিধারে ছড়াছড়ি—আঙিনার মাঝে,
কি সাহসে সঙ্গীহারা একমাত্র তরু ?
কি সাহসে রুক্ষদেহ একটি শেফালি
আছে খাড়া ? হায় ! যার বিশাল ললাট
ভাবনার লেখাছলে মোহরে অঙ্কিত,
কুবেরের বরপুত্র, মঙ্গল সাহুজি,
কেন নাহি উপাড়িয়া ফেলিলা সুদূরে
এ জঞ্জালে ? মানি ইহা বিস্ময়ের কথা।
হায় ! কোন্ হিন্দুস্থানি ভ্রমে কি কৌতুকে,
নিজ বাস্তু ভবনের আঙিনার মাঝে,
রোপে কভু পুষ্পতরু ? কদাকার রীতি !
সে দোষেতে দোষী সুধু দুর্ব্বল বাঙ্গালি।
তাই সখে, ভাই বুঝি মানিছ বিস্ময় ?
শোন তবে মন দিয়া শেফালি-কাহিনী।
একদিন, কোন এক কার্য্যের উদ্দেশে,
গিয়াছিনু সাহুজির ওই সে কুঠিতে ;
সন্ধ্যাকাল। ওই দুঃখী শেফালির দিকে
তাকাইয়া, রাখি ভুজ মসৃণ উদরে,
সাহুজি বলিতেছিলা কুঠির মুনিবে—
"কতবার মুনিবজি দিয়াছি হুকুম
উপাড়ি ফেলিয়া দিতে এ হরশিঙ্গারে।
তবু কেন খাড়া আছে এ হরশিঙ্গার ?
ঘরের পরাণী তব ভাল কি হে বাসে
মুনিবজি ? ভালবাসে রঙাইতে সাড়ি
এই হরশিঙ্গারের বাসন্তী কুসুমে ?"
অধরের মৃদুহাসি গেল মিলাইয়া ;—
আবার কহিলা সাহু "কাল যেন আর
সন্ধ্যাকালে এ তরুরে পাই না দেখিতে
এই স্থানে"। ব্যস্ত ছিলা মুনিবশাসনে
সাহুজি ; আমার আসা পাননি দেখিতে।
আমিও ছিলাম ব্যস্ত—দেখিতে ছিলাম
মলিন মুখশ্রী আহা দুঃখী শেফালীর !
শুনিতেছিলাম আমি—শেফালি ভূষণ,
মোদা-আঁখি কুঁড়িগুলি, দুলি দুলি দুলি,
কহিছে সন্ধ্যারে যেন সকরুণস্বরে—
"শুনিলে'ত ? আর সখি কি হবে ফুটায়ে ?"
কি বলিলি, বল্ বল্ ? কি হবে ফুটায়ে ?
কি হবে ফুটায়ে ? হায় হায় রে পাগল !
বুকখালি, অঙ্কখালি করি প্রকৃতির,
করি খালি হায় তার ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার,
তোরা কি পলায়ে যাবি ? আমার নয়ন
সহসা হইল আর্দ্র ! বোধ হ'ল যেন,
প্রকৃতি নিজের হাতে, আদরে যতনে,
শামলা পরায়ে দিলা আমার মাথায় !
প্রকৃত উকীল কবি সাজিয়ে তখন,
অগ্রসরি ধীরে ধীরে সাহুজির কাছে,
করিনু সেলাম।

"এ যে উকীল সাহেব ;
লে আও, লে আও ঘূরা, পান ও এলাচি"—
আমি পুনঃ কহিলাম "কি দোষে সাহুজি
উপাড়ি ফেলিয়া দিবে এ হরশিঙ্গারে" ?
"কেঁও বাবু ?"—কহি সুধু এই দুটি কথা,
সজোরে তরুর দুটি ক্ষীণ শাখা ধরি,
সাহুজি দিলেন নাড়া।—দুই এক কুঁড়ি
মরমে আঘাত পাই, অভিমানে যেন,
খসিয়া শুইল গিয়া ধরণী উরসে !
"কই বাবু এত নাড়া দিলাম তরুরে,
মোহর খসিল কই ?" কঁহিলা সাহুজি।
বড় দুঃখে হাসি আসে, তাই শুষ্ক হাসি
হাসিলাম ; পুনঃ আমি কহিনু গম্ভীরে—
"মোহর বর্ষিল কই ? সাহুজি চাহিয়া
দেখ দেখ বৃক্ষপানে ; তরুরে যুড়িয়া,
শিরে চক্ষে স্কন্ধে বক্ষে দুলিছে যে কুঁড়ি,
প্রত্যেকটি হীরা চুন্নী পান্নার অপেক্ষা,
মূল্যবান ; কোথা লাগে তামা রূপা সোণা !
ভগবত্ নাম আছে প্রত্যেকে অঙ্কিত।
বৃক্ষের প্রসূনগুলি ফুটে উঠে যবে,
কি সৌন্দর্য্য, কি মাধুরী, আঙ্গিনার মাঝে
রাজে নিত্য ! - সত্য বলি মানিও সাহুজি,
তোমার অজ্ঞাতসারে, তোমার প্রাণেতে,
সেই সৌন্দর্য্যের মৃদু কমনীয় রশ্মি
প্রবেশি, করে গো হিয়া করুণা-প্লাবিত !
সেই সে নেশার ঘোরে, প্রতি শনিবারে,
দীন দুঃখী কাঙালেরে করে থাক তুমি
অন্নদান ; করে থাক মন্দির প্রতিষ্ঠা
দেবোদ্দেশে ; কত শত শীতার্ত্ত ব্রাহ্মণে
রেজাই বিলাও তুমি ; চঞ্চলা কমলা
তাই সে নিগড়ে বাঁধা তোমার দুয়ারে !
কি সৌরভ উথলিছে মহল্লা যুড়িয়া !
ওই যে মোহন কাঁছু, তব প্রতিবেশী,
যার সাথে মকোদ্দমা হয়েছিল তব
গত বর্ষে, শত্রুতা—সেও হয়ে যায়
মহামিত্র—পশে যবে নাসিকার রন্ধ্রে,
হরশিঙ্গারের গন্ধ, মকরন্দে ভরা !"—
বাক্য শুনি, মহোল্লাসে, মোর পানে চাহি,
মহাশব্দে সাহুশ্রেষ্ঠ উঠিলা হাসিয়া !
আমি পুনঃ কহিলাম "সৌরভে, সৌরভে,
যুড়ি এ সুষমাপূর্ণ অট্টালিকাপুরী,
সমীরের প্রতি কক্ষ গিয়াছে ভরিয়া !
শ্বেত কবুত্তর যথা পক্ষের ঝাপটে,
দূর করে আধিব্যাধি, এ পুষ্প তেমতি
ধরে গো অদ্ভুত শক্তি ! অদ্ভুত অমৃতে
দেয় ভরি প্রাণকুম্ভ। এই নেশাঘোরে,
আজিকে সাহুজি তুমি প্রবেশিবে যবে
অন্তঃপুরে ; পত্নী, ভগ্নী, তনয়, তনয়া
দ্বিগুণ সৌন্দর্য্যে হবে (তোমার চক্ষেতে)
ভাস্বর। চাহিয়া দেখ—অলীক কল্পনা
নহে সাহু !—চাহি দেখ বৃক্ষটির পানে।
কে ওই দাঁড়ায়ে হোথা দেবতাদম্পতি ?
হরশিঙ্গারের পার্শ্বে হরগৌরী মরি
দাণ্ডায়ে ! শুনহ আজ্ঞা চিত্তকর্ণ দিয়া,
"কিলাভ উপাড়ি এরে ? কি কাজ উখাড়ি?"
এইরূপে ছন্দোবন্ধে, বাক্যের বিন্যাসে,
ভিজাইনু সাহুজির রৌপ্যময় হিয়া।
সাহুজি কহিলা মোরে "উকীল সাহেব,
আমি মানিলাম হার (ধন্য ওকালতি) !
তোমারই ডিক্রি, মায় সমস্ত খরচা।"
এইরূপে দুরদৃষ্ট গরীব তরুর
খণ্ডায়ে, প্রকৃতি-দত্ত অদ্ভুত শাম্‌লা
রাখি মাথে, মহাহর্ষে ফিরিনু আলয়ে।
সে রাত্রে হ'ল না নিদ্রা। আত্মার প্রসাদে,

যে আহ্লাদে পূর্ণ হ'ল আমার এ হিয়া,
বর্ণের তুলিকা দিয়া চিত্রিব কেমনে ?
পরাজয়ি রাক্ষসেরে পপার-নালিশে, *
হৃতসর্ব্বস্বের ধন দিয়াছি ফিরায়ে
দরিদ্রে।—চিত্তের বিশ্বে,কেন্দ্রে কেন্দ্রে তাহে
ছুটিয়াছে হর্ষ এক হয়ে মাতোয়ারা !
সে আহ্লাদ তুচ্ছ কিন্তু এ আহ্লাদ কাছে।
একদা ভাদ্রের গঙ্গা তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে
লইয়া যাইতেছিল মরিয়া বালকে।
আমি ক্ষুদ্র জীবনেরে তুচ্ছজ্ঞান করি,
ঝাঁপ দিয়া ঘূর্ণ্যমান আবর্ত্ত মাঝারে,
মৃতকল্প বালকেরে টানিয়া সজোরে,
আনিলাম উপকূলে ;—তটে নর নারী,
সারি সারি দাঁড়াইয়া, অবাক্ লোচনে,
বাখানিছে বীরপণা !—আমি ধীরে ধীরে,
সরম বিনম্রশিরে সমর্পি বালকে
কৃতজ্ঞ স্বজনে তার, ফিরিলাম গৃহে।
তাহাতেও চিত্ত বিশ্বে, সদ্যোজাত শিশু,
(মহীরাবণের পুত্র অহির মতন)
ছুটিয়াছে হর্ষ এক হয়ে মাতোয়ারা।
তাহাতে এ তুচ্ছ প্রাণ (স্মরি বিশ্বনাথে)
মানিয়াছি ধন্য আমি।
কিন্তু সেইদিন,
মরণের হস্ত হ'তে, পাইল নিষ্কৃতি
ক্ষুদ্র শেফালিটি যবে ; আমার চিত্তের
গেল রে—গেল রে তৃষ্ণা বহুকাল ব্যাপী
মিটিয়া ! উপর হ'তে, বিন্দু বিন্দু করি,
কে যেন, সদয় হস্তে, দিলরে ঢালিয়া,
শুষ্ককণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, রসনা ভিজায়ে,
নন্দনের দ্রাক্ষালতা ফলের মদিরা !
সন্তাপিত চিত্তে মোর পড়িল সুধীরে,
যেন হরিচন্দনের প্রাণময়ী ছায়া !
মধুর করবীকুঞ্জ প্রাণের মণ্ডপে
মধুপে মধুপে ভরা ; বিরলে বসিয়া
রচে তারা মধুচক্র। হায় কিন্তু তারা,
নিত্যব্রত ত্যাগ করি, সেই দিন হ'তে,
ভাণ্ডারে, শয়ন কক্ষে, অলিন্দে, অলিন্দে,
পুঞ্জে,পুঞ্জে, ভ্রমে সদা গুঞ্জরি গুঞ্জরি !
কি আশে ? লুকান আছে শেফালি সৌরভ
নিভৃতে, (প্রকৃতি যাহা উকীল কবিরে
দিয়াছিলা সেই দিন পুরস্কার রূপে)
অন্ধ অলি ধায় সেই মকরন্দ আশে !

শ্রী——উকিল।

গান শিক্ষা।

শ্রীমতী মৃণালিনী দাসীর অনুরোধ মতে নিম্নলিখিত গানটির সুর সন্নিবিষ্ট হইল।

রাগিণী মিশ্র মল্লার—তাল রূপক।

চলেছে তরণী প্রসাদ পবনে, কে যাবে এস হে শান্তি ভবনে।
এ ভব সংসারে ঘিরেছে আঁধারে, কেনরে ব'সে হেথা ম্লান মুখ !
প্রাণের বাসনা হেথায় পূরে না, হেথায় কোথা প্রেম কোথা সুখ !
এ ভব কোলাহল, এ পাপ হলাহল, এ দুখ শোকানল দূরে যাক্,
সমুখে চাহিয়ে, পুলকে গাহিয়ে, চল রে শুনে চলি তাঁর ডাক্,
বিষয় ভাবনা লইয়া যাব না, তুচ্ছ সুখ দুখ পড়ে থাক্।

---

* Pauper Suit.

ভবের নিশিথিনী ঘিরিবে ঘনঘোরে তখন কার মুখ চাহিবে!
সাধের ধনজন দিয়ে বিসর্জ্জন কিসের আশে প্রাণ রাখিবে।

১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১
র র রগম। ম গমগ র র। র প ম। ম গ রগর স। র ম ম।
চ—লে—ছে ত————র-ণী প্র-সা-দ প— —ব—নে কে যা- বে

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১
প ধ ধর্স নোর্স নোধ। প ধ প। ম গ রগর স॥ ম প প। ন ন নধ ন।
এ—-স—হে শা—-স্তি ভ-—ব—-নে॥ এ ভ-ব সং-সারে

১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
স সন র্র। সন ধন ন র্স। ন র্স র্র। গো গোর্র স র্রস। নর্স র্র স।
ঘি-রে—ছে আঁ— —ধা-রে, কে—ন—রে ব—সে হে-থা ম্লা-——ন

১ ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২
নোর্স নো ধ। ধ নো ধ। নোর্স নোধ প ধ। নো র্স র। নোর্স নো ধ প।
মু————খ। প্রা-ণে-–র বা————স—না হে—থা-য় পূ————রে না

১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ৫ ১ ১ ১ ১ ১ ৩ ১ ১ ১
ধ প ম। গো গো র স। র পধপ ম। প॥ ম প পন। ন ন ন। স ম ম।
হে-থায় কো-থা প্রে-ম কো——থা সুখ॥ এ ভ—ব কোলাহল, এ পা প

১ ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১
ম পম প। প ধ প। ধ ধ ধ নো। ধনো র্স ন। ন র্সনো ধ নো। নো র্স ন।
হ—লা-হল, এ দু খ শোকা-ন-–ল দূ———রে যা—————ক্ স—মু-খে

১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
স নর্র র্স র্স। স ম ম। গম প ম প। প ধ প। ধ ধ ধ ধ নো।
চা—-–হি য়ে পু-ল-কে গা——হি-য়ে চ-ল-রে শুনে চ—লি

১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১
ধনো র্স ন। ন র্স নোর্সনো ধ॥ ম ধ ধ। ধনো র্সনোধ প ধ। নো র্স র্র।
তাঁ—-র ডা————ক্॥ বি-ষয় ভা—————ব-না ল—ই-য়া

১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ৫
র্সর্রর্স নো ধ প। ধ প ম। গো গো র স। র পধপ ম। প॥
যা———ব—না তু—-–চ্ছ সু——খ—দু—খ প———ড়ে থাক্॥

১ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
ম প প। ধ পধপ ম প। ধ র্স র্স। ধ প মপ মগো গো। গো রগো
ভ-বে-র নি-শি-–থি-নী ঘি-রি-বে ঘ-ন ঘো—রে ত——খ——

১ ২ ১ ২ ১ ১ ১ ৫ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
ম। র র স। র প ম। প॥ ম প প। ন ন ন নধ ন। র্স সন র্র।
ন কার মু-খে চা——হি—-বে॥ সাধে-র ধ-ন জ-–ন দি-য়ে বি-–

১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ৮ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সন ধন ন র্স। ন র্র র্স। নো নো ধ প ধপ। মপ ধনো ধ। প ম
স———র্জ্জ-ন কিসের আ-শে প্রা-ণ রা————খি—বে

১ ১ ১
গ রগর স॥
॥

শ্রীইন্দিরা দেবী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

টগরের কথা মত গৃহিণী কাজ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মন সুস্থির হইল না। আগে চারু বাড়ী ভিতর না আসিলে তিনি দুঃখিত হইতেন, এখন তাহাকে বাড়ী ভিতর মুখো হইতে দেখিলেই তিনি সর্ব্বনাশ গণিতে লাগিলেন। ইহার ফলে, বিবাহের অনুরোধের জ্বালায় চারুর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিল, কিন্তু তথাপি সে অটল; এদিকেও গৃহিণীর কসুর নাই, কি করেন, পুত্রকে কোন মতে বাগাইতে না পারিয়া অগত্যা একদিন জগৎবাবুর উপর মহা ক্ষাপা হইয়া উঠিলেন।

জগৎ বাবু সে দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিয়াছেন, মেজাজ অত্যন্ত প্রফুল্ল,—কেননা এ কয়েক দিন ধরিয়া তিনি যে মরণাপন্ন রোগীর চিকিৎসায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আজ তাহাকে নির্ব্বিঘ্ন দেখিয়া আসিয়াছেন। বাড়ীর ভিতর আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার খাবার প্রস্তুত, দীপ জ্বলিতেছে, স্নেহ তাহার নিকটে বসিয়া একখানি বই হাতে লইয়া পড়িতেছে—জগৎ বাবুকে দেখিয়াই স্নেহ বইখানি মুড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, প্রফুল্ল মুখে জিজ্ঞাসা করিল—"মেশমশায়, আজ যে একটু সকাল সকাল? তোমার রোগী কেমন আছে?" জগৎ বাবু তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন "বেঁচে গেছে রে বুড়ি, আঃ আমিও বেঁচেছি, এ কদিন ভাবনায় যেন মরে গিয়েছিলুম। যে ওষুধ দিই কোন ওষুধই"—

গৃহিণী এই সময় দ্বারদেশে আসিয়া বলিলেন—"খাবার যে শুকিয়ে গেল, গল্প কি আর ফুরুবে না ছাই!"

জগৎ বাবু ত্রস্তে বলিলেন—"আজ আমি আর খাব না, আজও খেয়ে এসেছি।"

গৃহিণী গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "তা খেয়ে আসবে না কেন? এখানে ত আর মটন চপ, রোষ্ট নেই? নেড়ের গন্ধ বড় মিষ্টি! তা নিত্যি নিত্যি এ সব নষ্ট কর কেন? বলে গেলেই ত হয়!"

জগৎ বাবু মাথা চুলকাইয়া বলিলেন—"যাবার সময় মনে করি বাড়ী এসেই খাব, কিন্তু তারা সেখানে না খাইয়ে ছাড়ে না। যাক এখন সে বেঁচে উঠেছে, কালথেকে—"

গৃহিণী। আচ্ছা বাবু, না খাবে নেই নেই; অত কথার দরকার কি? স্নেহ, থাল খানা নিয়ে যা, দেখ্ যদি টগরের খাওয়া না হয়ে থাকে ত তাকে দিগে।"

স্নেহ তাহার হাতের বইখানি কোলঙ্গায় রাখিয়া থাল লইয়া চলিয়া গেল। গৃহিণী বলিলেন—"চিরকালটা পর পর করেই গেলে! নিজের স্ত্রী পুত্রের কথা ত একবারও ভাবতে দেখলুম না? আমার ত মরণও হবে না! বলি, ছেলের বিয়ে থাওয়া দেবে?

হঠাৎ গৃহিণীর এরূপ রুক্ষভাবের কারণ জগৎবাবু খুঁজিয়া পাইলেন না, চোরের ন্যায় বলিলেন—"এই সেদিন এমন ঘটনা হোল, ছেলে না হয় দুদিন পরেই বিয়ে করবে"

গৃ। যত বুড় হচ্ছ যেন মতিচ্ছন্ন ধরছে! ঘরে কিন্তু ভাল মন্দ হলে আমার দায়দোষ নেই—তোমার ত চোখ নেই!

জগৎ। কেন ঘরে আবার কি ভাল মন্দ হবে?

গৃ। হবে আবার কি? ঘরে অমন সোমত্ত মাগী, ছেলেও কিছু ছোট নয়, সেটা আর বোঝ না?

জগৎ। স্নেহ চারুর বোনের মত, ছেলেবেলা হতে দুজনে এক সঙ্গে লালিত পালিত, চারু যদি এমন হতভাগা হয়, এখন স্নেহের প্রতি অন্য ভাবে দৃষ্টি দেয়, তাহলে তার মুখ দেখব না!" জগৎবাবু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নিজেই যে স্নেহের সহিত চারুর বিবাহ দিবার জন্য লালায়িত ছিলেন, তাহা এখন ভুলিয়া গিয়াছেন।

জগৎ বাবু মহা ক্রুদ্ধভাবে এই কথা বলিলেন—গৃহিণী ইহাতে একটু দমিয়া গেলেন। পাছে এ কথা বলিলে জগৎবাবু চারুরি দোষ দেখেন এই ভয়েই তিনি এতদিন এসব কোন কথা তাঁহাকে বলেন নাই। আজ রাগের মাথায় স্পষ্টাপষ্টি কথাগুলা বলিয়া এখন মনে মনে পশ্চাত্তাপ করিতে লাগিলেন, এবং পূর্ব্বের উগ্রভাব ছাড়িয়া নরম ভাব ধরিলেন—বুঝিলেন তাহা নহিলে এখন বিপরীত ফল হইবে। অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া আর্দ্রস্বরে বলিলেন—"আমি কি কিছু মন্দ কথা বলছি যে এত রাগ করছ? মনে কোন ভাবনা হলে তোমাকে ছাড়া আর কাকে বলি, তুমিই বল দেখি? তা তোমার যদি শুনতে এত কষ্ট হয়—ত আর বলব না—"

জগৎ বাবু বিপদে পড়িয়া বলিলেন—"না গো না, আমি রাগ করব কেন? চারুর যে অমন মন্দস্বভাব হবে, এ আমি মনে করতে পারিনে, তাই বলছি।"

গৃহিণী বলিলেন—"সকলেরিত বয়স ধর্ম্ম আছে—সেটাও ত তোমার বোঝা উচিত, শুধু ছেলের দোষ দিলেই কি হয়? আর দোষের কথা যে কিছু ঘটেছে তাও আমি বলছিনে। আমি বলছি সাবধানের বিনাশ নেই, ছেলের শীঘ্র বিয়ে দাও।"

জগৎ। তুমি তাকে বিয়ের কথা বল না?

গৃহিণী। আমি কি ছাই বলতে কসুর করি, তা তুমি একটা কথা বল্লে তার যতটা জোর হবে, আমার কথার কি আর তা হবে? আমি বল্লেই সে উড়িয়ে দেয়।

এইখানে তাঁহাদের কথা বন্ধ হইল। টগরের কাছে গিয়া স্নেহলতা এতক্ষণ আটকা পড়িয়া গিয়াছিল, জগৎ বাবু সকাল সকাল বাড়ী আসিয়াছেন, আজ সে অনেকক্ষণ তাঁহার সহিত পড়া শুনায় কাটাইতে পারিবে, এই আশায় সে অনেক কষ্টে টগরের হাত ছাড়াইয়া আসিল। আসিয়াই বলিল, "মেশমশায়, আজ পড়াবে না"।

জগৎ বাবু বলিলেন—"আজ থাক স্নেহ" বলিয়া তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন

তাঁহার সেই অস্বাভাবিক স্বরে, ত্বরিৎ গমনে, এবং গৃহিণীর স্তম্ভিত মূর্ত্তি দেখিয়া স্নেহ বুঝিল, জগৎ বাবুর কষ্টের কোন কারণ ঘটিয়াছে। তাহার কেমন মনে হইতে লাগিল তাহাকে লইয়াই তাঁহাদের মধ্যে কিছু ঘটিয়াছে। সে ব্যথিত হৃদয়ে কোলঙ্গা হইতে বইখানি লইয়া আপনার গৃহে গেল। গৃহের কোণে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহা নিভাইয়া দিয়া অন্ধকার গৃহে জানালার কাছে আসিয়া বসিল। চাঁদ উঠে নাই, নক্ষত্র খচিত আকাশের দিকে চাহিয়া দুই চক্ষু তাহার জলে প্লাবিত হইয়া উঠিল, সে কিছু দিন আগে চারুর নিকট তাহার রচিত এক গান শিখিয়াছিল—কাতর হৃদয়ে গুণগুণ করিয়া গানটি গাহিতে লাগিল।

এ হৃদয় বুঝিল না কেহ!
অনাদরে উপেক্ষায়, সেই ফিরাইল হায়—
যাহারে সঁপিতে গেনু, এত প্রেম এত স্নেহ।
এ মহাপাষাণ ভার, বহিতে পারিনে আর
কোথায় মরণ তুমি চরণে শরণ দেহ।
মৃত্যু না—জীবন তুমি, শূন্য না, আশ্রয় ভূমি,
তাপিত তারণ ওহে, দাও নিরাশ্রয়ে গেহ।
তুমিও না দিলে ঠাঁই! তোমারো সাড়া না পাই!
হোল না অভাগী বলে তোমারো করুণা লেহ।

নবম পরিচ্ছেদ।

জগৎ বাবু বাহিরে আসিয়া কোচে হেলান দিয়া গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন। তামাকের ধূম তাঁহার মুখ পরিত্যক্ত হইয়া যত ঘন ঘন কুণ্ডলাকারে পাক খাইতে খাইতে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, ততই তাঁহার চিন্তারাশি গাঢ়তর হইয়া মস্তিষ্ক মধ্যে জমাট বাঁধিতে লাগিল, অবশেষে যখন ভস্মাবশেষ তামাক্ হইতে আর ধূম উদ্গীর্ণ হইবার কোনই সম্ভাবনা রহিল না—তখন তিনি নলটা মুখ হইতে নামাইয়া ভৃত্যকে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। ভৃত্য আসিয়াই যথা নিয়মে বিনা বাক্য ব্যয়ে গুড়গুড়ি হইতে কলিকা তুলিয়া আবার দ্বারদেশাভিমুখী হইল, জগৎ বাবু বলিলেন—"চারুকে ডাকিয়া আন, তামাক চাইনে।"

জগৎ বাবুর এই নিয়ম বিরুদ্ধ আজ্ঞায় ভৃত্য বিস্মিত ভাবে একবার "যে আজ্ঞে" বলিয়া ফিরিয়া চাহিল, তাহার পর গুড়গুড়ি শুদ্ধ উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

চারু আসিলে জগৎ বাবু বলিলেন—"মান্দ্রাজের কনগ্রেসে পাঠাবার জন্য আমাকে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান থেকে ডেলিগেট নিযুক্ত করেছে। আমি ত যেতে পারব না, তুমি যেতে পারবে? যদি পার, তাহ'লে তাদের ব'লে আমার বদলে তোমাকে নিযুক্ত করাই।

শুনছি তাদের আরো ডেলিগেট নিযুক্ত হবে। চারু সানন্দে তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিল।

জগৎ বাবু বলিলেন—"কিন্তু তোমার ত তাতে পড়ার ক্ষতি হবে না? এই বছরেই ত তোমার শেষ পরীক্ষা?"

চারু বলিল—"ক্রিস্‌মাসের ছুটির সময় যাব, তাতে আর পড়ার কি ক্ষতি হবে! আপনি এবারকার Saturday Review খানা পড়েছেন?"

জগৎ। পড়েছি বই কি—ওরা ত গায়ের জ্বালায় গেল! সামাজিক উন্নতি কি আমাদের হচ্ছে না? এই কনগ্রেসই কি হতে পারত—যদি বাস্তবিক আমাদের সামাজিক উন্নতি না হোত!

চারু। কিন্তু আমার মতে কনগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে Social congress ও হওয়া উচিত, আমার ইচ্ছা আছে আমি এবার এই প্রস্তাব করব। অবিশ্যি সামাজিক উন্নতির দিকে আমাদের লক্ষ্য পড়েছে সন্দেহ নেই, আস্তে আস্তে আমরা অগ্রসরও হচ্ছি—কিন্তু এত আস্তে, যে তার বেগ না বাড়ালে তার গতি অনুভব করা সহজ নয়। সুতরাং ইংরেজেরা সে সম্বন্ধে যদি এককথা বলে ত সে কথায় রাগ না করে যাতে তারা ততটুকুও বলার সুবিধা না পায়, আমাদের সেই চেষ্টা করাই উচিত। এই দেখুন না, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার হয়েছে সত্য, কিন্তু বাস্তবপক্ষে আমাদের অন্তঃপুরে কত জন যথার্থ শিক্ষিত; বিধবা-বিবাহ ধর্ম্মসঙ্গত এ জ্ঞানটা আমাদের হয়েছে সত্য, কিন্তু কজন লোকে বিধবা বিবাহ দিতে সাহসী? আর সমাজে কে বিধবা বিবাহ দিয়ে জাতিচ্যুত হয় নি? আর বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে ত এত বক্তৃতা, এত আপত্তি চলেছে—তবু ত আর বাল্যবিবাহ রহিত হয় নি—"

জগৎ বাবু বলিলেন—"চারু, আমাদের সমাজের পক্ষে বাল্যবিবাহ ভাল কি মন্দ—বিধবা বিবাহ উচিত কি অনুচিত—ইহা নিশ্চয়রূপে বলা আমার মতে অসম্ভব। এক দিন আমিও তোমার মত ভাবতেম, কিন্তু আমার যত অভিজ্ঞতা বাড়ছে, ততই ওসকল সামাজিক বিষয় আমার নিকট দুরূহ সমস্যা বলে বোধ হচ্ছে, বাল্যবিবাহ যে মন্দ আর বিধবা বিবাহ যে ভাল এমনটা আর এখন নিশ্চয় করে বল্‌তে পারিনে। আর পুন-র্বিবাহ করা অপেক্ষা বিধবারা পূর্ব্বের মত যদি নিঃস্বার্থ জীবন বহন করেন, তাহলে তাঁদের পক্ষেও এবং সমাজের পক্ষেও কি অধিক মঙ্গলজনক নয়? আর বাল্যবিবাহ সমাজের যেরূপ অবস্থায় দোষণীয় আমাদের সমাজের সেরূপ অবস্থা এখনো আসে নাই। এখন যদি একেবারে বাল্যবিবাহ বন্ধ করে দাও—আমার মনে হয় তাহ'লে তাতে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হবে। প্রথমেত তাহ'লে মেয়েদের বিবাহ দেওয়াই দায় হ'য়ে উঠবে, অনেক মেয়েই অবিবাহিত থাকবে।"

চারু বলিল—"কিন্তু সকলেই যদি উপযোগী অবস্থার জন্য অপেক্ষা করে থাকে,

ত কখনই ত সে অবস্থা আপনা হ'তে আসতে পারে না। বাল্যবিবাহের প্রধান অমঙ্গল সন্তানের হীনবীর্য্যতা, সুতরাং বাল্যবিবাহ বন্ধ না হলে প্রকৃত প্রস্তাবে জাতির উন্নতি হতে পারে না, বরঞ্চ সমস্ত স্ত্রীলোকেরা অবিবাহিত থেকে জাতির লোপ হয়—সেও ভাল, তথাপি—"

জগৎ। চারু, তোমরা ছেলে মানুষ, তোমাদের মুখে ওরূপ উৎসাহের কথা শোভা পায়। কিন্তু আমাদের এই বৃদ্ধ বয়সে আমরা নাতি নাতনির মুখ দেখবার জন্য এত ব্যগ্র হয়ে পড়ি, যে আমাদের আর ও সকল কথা মনে আসে না। একটা কথা তোমাকে কিছুদিন হতে বলি বলি করে আর বলা হয় না—চারু, তুমি বিবাহ করছ না, এতে তোমার মায়ের বড়ই মনোকষ্ট।"

জগৎবাবু দেখিলেন, এইরূপ করিয়া কথাটা না পাড়িলে আর কথা বলিবার অবসর হয় না।

জগৎ বাবু এরূপ কথা কখনো বলেন না, হঠাৎ তাঁহার মুখে ইহা শুনিয়া চারু বড় আশ্চর্য্য হইল, কিছু উত্তর করিতে পারিল না। জগৎবাবু বলিলেন—"শুধু তোমার মায়ের ইচ্ছা কেন, আমারো ইচ্ছা তুমি আবার বিবাহ কর, কালী বাঁড়ুয্যের মেয়েটিও বেশ সুন্দরী!"

চারু থতমত খাইয়া বলিল—"বাবা নিদেন পরীক্ষাটা না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ না হওয়াই ভাল।"

জগৎ। সেজন্য তোমার কোন ভাবনা নাই। যতদিন পরীক্ষা না হয় মেয়ে বাপের বাড়ীতেই থাকবে—সে কিছু নিতান্ত বড় মেয়েও নয়?

চারু মুস্কিলে পড়িল, মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করা আর বাপের কথার বিরুদ্ধে কথা কওয়া বাঙ্গালীর ছেলের পক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। সে একটু পরে বলিল—"কিন্তু এত শীঘ্র!"

এই কথায় সে কি বুঝাইতে চায় তাহা জগৎ বাবু বুঝিলেন, বুঝিয়া বলিলেন—"চারু, সংসারে থাকিতে গেলে শোক তাপের হাত হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, কিন্তু তাহার মধ্যে থাকিয়াই আমাদের সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে হয়, ঈশ্বরের রাজ্যের ইহাই নিয়ম, জগতের ধর্ম্মই এই। চারু আমি তোমাকে কখনো কোন অনুরোধ করি নাই, এই অনুরোধটি রাখ, আবার বিবাহ কর।"

চারু ইহার কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না, তাহার বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পাইল, কেবল একটা অশান্তির ভাবে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল, সে মৌন হইয়া রহিল।

জগৎ বাবু বলিলেন—"চারু তবে আমি তোমার মাকে বলি, কালী বাঁড়ুয্যের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহের সম্বন্ধ করে ফেলুন।" বলিয়া জগৎবাবু উঠিয়া গেলেন, চারুর ইচ্ছা হইল তাঁহার প্রতিরোধ করিয়া বলে যে, "আমি বিবাহ করিব না, এ সম্বন্ধের আব-

শ্যক নাই।" কিন্তু পারিল না—তিনি চলিয়া গেলেন, সে মনের ভার লইয়া বসিয়া রহিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

সমস্ত রাত চারু প্রায় ঘুমাইল না। জগৎ বাবুকে কি করিয়া তাহার অনিচ্ছা জানাইয়া এ বিবাহ নিবারণ করিবে ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল—বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়া আসিল, অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া শেষ রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম ভাঙ্গিবার পর মস্তিষ্ক সাম্যাবস্থায় ফিরিয়া আসিবার পর তাহার এক সদুপায় মনে আসিল,সে ভাবিল,—পিতাকে তাহার অমত জানাইবার আবশ্যক কি, মাকে বলিয়াই ত এ বিবাহ নিবারণ হইতে পারে।

এই ভাবিয়া চারু তখনি বাড়ীর ভিতরে মায়ের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল, দেখিল মা গৃহে নাই, কাজেই পদদ্বয় আপনা হইতে স্নেহের গৃহাভিমুখী হইল। কিন্তু সে গৃহও শূন্য দেখিয়া সেখান হইতে যাইবে কি আরো একটু অপেক্ষা করিবে ভাবিতেছে এই সময় স্নেহলতা এলোচুলে স্নিগ্ধ মুখে একরাশ চাবির গোচ্ছা হাতে এইখানে আসিয়া দাড়াইল, দাঁড়াইয়াই হাসিয়া বলিল—"চারু, সুখবর মাঘ মাসের প্রথমেই বিয়ে স্থির—"

স্নেহকে হাসিমুখে,এই কথা বলিতে শুনিয়া চারু অত্যন্ত চটিয়া গেল, অস্বাভাবিক উগ্রস্বরে বলিল—"আমি কখনই বিয়ে করব না! এই সুখবর!—

স্নেহ শুনিয়াছিল চারু কালী বাঁড়ুয্যের মেয়েকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছে, সুতরাং তাহার এই ক্রুদ্ধ বাক্যে আশ্চর্য্যহইয়া বলিল—"সে কি চারু! বিয়ে করবেনা কি? তুমিইত বিয়ে করতে চেয়েছ?"

চারু বলিল—"তোমার তাই বিশ্বাস হয়েছে! নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর!"

স্নেহলতা তাহার কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিল না, ব্যথিত হইয়া বলিল—"চারু কি হয়েছে? আমি নিষ্ঠুর হলুম কিসে? তুমি রাগ করছ কেন?"

চারু বলিল—"আমি যদি তোমাকে এসে খবর দিই যে হরেধন ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, তুমি কি বড় খুসী হও?"

স্নেহ হাসিয়া বলিল—"আমার সঙ্গে তোমার সঙ্গে কি তুলনা? আমি স্ত্রীলোক—আমি বিধবা। আর কালীবাবুর মেয়ে কি তোমার হরেধন ভট্টাচার্য্য? তুমি ত তাকে পসন্দ করেছ?"

চারু বলিল—"ঢের হয়েছে,আর কেন? তোমার মুখে আমি আর ওরূপ কথা শুনতে পারি নে, স্নেহ আমি মনে করেছিলুম—তুমি আমাকে ভাল বাস"—

স্নেহ। সন্দেহটা হল কেন?

চারু। কেন তুমি আমার হৃদয় বুঝতে পার না? তুমি কেন বোঝ না আমি

তোমাকে কত ভাল বাসি? তুমি কেন বোঝ না, অন্যের সহিত বিবাহের কথা তুলেও আমার কিরূপ যন্ত্রণা হয়! স্নেহ, তুমি আমার সর্ব্বস্ব, তুমি যদি আমাকে বিবাহ কর ত করব—নহিলে বিবাহ করব না।”

একবার বাঁধ ভাঙ্গিলে আর নদীস্রোত কে রোধে? একবার বলিতে আরম্ভ করিয়া চারু আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, সমস্ত হৃদয় উদ্ঘাটিত করিয়া তবে ক্ষান্ত হইল। স্নেহলতা আশ্চর্য্যে অভিভূত হইয়া নীরব হইয়া রহিল। চারু তখন আবার বলিল— ‘স্নেহ, তুমি আমার পৃথিবী, তুমি আমার স্বর্গ, আমি তোমার জন্য আর সমস্ত বিসর্জ্জন দেব। যদি বাবা এ বিবাহে মত না দেন যদি তিনি এজন্য আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন সেও স্বীকার, তোমাকে নিয়ে আমি সামান্য কুটীরেও সুখী হব, কেবল তুমি বল তুমি আমাকে ভাল বাস কি না, তুমি আমাকে বিবাহ করবে কি না!”

স্নেহ তবুও চুপ করিয়া রহিল,—অনেকক্ষণ পরে বলিল—“চারু তুমি কি পাগল হয়েছ, আমি যে বিধবা, আমি যে তোমার বোন!” বলিতে বলিতে স্নেহের অবনত দৃষ্টি হইতে টপটপ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।

চারু তাহাকে অনুনয় করিয়া আরো কি বলিতে যাইতেছে, আর বলা হইল না, বারান্দায় টগরকে দেখিতে পাইয়া, তাড়াতাড়ি গৃহের বাহিরে আসিয়া বলিল—“টগর মা কোথা? আমি তাঁর কাছে এসেছি।”

সে বলিল—“তিনি রান্না ঘরে, তা কি দরকার কি!”

চারু কোন উত্তর না করিয়া নীচে গেল, টগর স্নেহের কাছে আসিয়া বলিল—

“দাদা কি বলছিল?”

স্নেহ কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া আত্ম সংযত হইয়া বলিল, “বিশেষ কিছু না আমি খবর দিচ্ছিলুম তার মাঘ মাসে বিয়ে হবে, তাই—তাই—”

টগর। তাই কি?

স্নেহ। তাই বলছিল—যে না তার তা ইচ্ছা নাই—

টগর। ওঃ বুঝেছি তাই বুঝি মাকে বলতে এসেছে। শুনে আসি কি বলছে।

টগর চলিয়া গেল, স্নেহলতা একাকী নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

চারু বলিল—সে বিবাহ করিবে না,—গৃহিণী অনুনয় বিনয়, তর্জ্জন, গর্জ্জন, ক্রন্দন প্রভৃতি নানা উপায়ে পুত্রকে নিজ মতে আনিতে সচেষ্ট হইলেন, কিন্তু সমস্তই বৃথা হইল, চারু অটল, দৃঢ় সঙ্কল্প, কিছুতেই সে বিবাহে সম্মত নহে—সুতরাং মাতা পুত্রে বাক্য সংগ্রাম সহজে শীঘ্র মিটিল না। টগর খানিকক্ষণ তাহা শুনিয়া আবার স্নেহের নিকট আসিয়া বলিল—“দিদি, দাদা ত কিছুতেই বিয়ে করবে না, মা কত বলছে

বোঝাচ্ছে কাঁদছে, কিছুতেই দাদা রাজি হচ্ছে না, তা ভাই তুই একবার বলে দেখ না?"

স্নেহ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, চারু যাহা বলিয়াছিল তখনো তাহা তাহার মনে জাগিতেছিল, তাহার মনে হইল, টগরও তাহা জানিয়াছে। সে লাল হইয়া উঠিয়া আস্তে আস্তে বলিল "তাঁর বিয়ে করতে ইচ্ছা নেই আমি বল্লেই কি করবেন?"

টগর। সবাই ত বলছে, দাদা তোর জন্যই বিয়ে করতে চায় না, তা ভাই সেত আর হতে পারে না, ভেবে দেখ এই বুড় বয়সে মা বাবার মনে তাহলে কি কষ্ট হবে, আর চিরদিন তোকে মেয়ের মত করে পালন করে এসেছেন, তুই কি এ কষ্ট তাঁদের দেখতে পারবি?

স্নেহ আর পারিল না, সে কাঁদিয়া কহিল "টগর আমি কি করব? আমার কি ইচ্ছা যে চারু বিয়ে না করেন?"

টগর। তা ত আমি বুঝছি, কিন্তু দাদার ত গতিক দেখছিস। তা ভাই এক কাজ করতে যদি পারিস ত সব ভালয় ভালয় চুকে যায়—তুই যদি দিন কতকের জন্য অন্য কোথায় যাস—

স্নেহ। আমি কোথায় যাব, আমার কি কোন স্থান আছে?

টগর। কেন শ্বশুর বাড়ী, দিন কতকের জন্য বইত নয়, তাপর দাদার বিয়ে হলে তখন চলে আসবি।

শ্বশুর বাড়ী! স্নেহ শিহরিয়া উঠিয়া বলিল "শ্বশুরবাড়ী! আমি থাকাতে তোদের যদি এতই অসুবিধা হয় ত আমি বরঞ্চ দাসীগিরি করে খেতেও রাজি আছি। টগর. সেখানে যাওয়ার চেয়ে আমার মরণই ভাল।"

টগর বলিল—"আচ্ছা তবে তুই দাদাকে বুঝিয়ে বিয়ে করতে বল। ঐ যে দাদা আসছে, বেশ ভাল করে একবার বল, তবে আমি যে সব কথা বলছিলুম তা যেন বলিস নে, আমি বরঞ্চ এখন যাই—"

টগর চলিয়া গেল, চারু আসিয়া দেখিল স্নেহ কাঁদিতেছে, ব্যথিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে স্নেহ?"

স্নেহ সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল—"চারু তুমি বিয়ে করতে চাচ্ছ না, মাসীমা মেশমশায় সকলের মনে এতে কত কষ্ট হচ্ছে, চারু লক্ষ্মীটি তুমি বিয়ে কর।"

চারু বলিল "আর সকলের কষ্টে তোমার কষ্ট হয়, কেবল আমার কষ্টই বুঝি তোমার কাছে কিছু নয়? স্নেহ সত্যি কি তুমি আমাকে একটুও ভাল বাস না!"

চারুর চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া উঠিল। স্নেহ কোন উত্তর করিল না—কেবল তাহার চোখের জল তাহার হইয়া নীরবে তাহার মনের ভাব ব্যক্ত করিল। কিছু পরে চারু সংযত হইয়া বলিল—"স্নেহ সত্যি করে বল তুমি আমাকে ভালবাস কি না! আমাকে বিয়ে করবে কি না?"

স্নেহ দেখিল এরূপ স্থলে স্পষ্ট করিয়া মনের ভাব খুলিয়া না বলিলে উপায় নাই। সে বাধো বাধো স্বরে, থামিয়া থামিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—চারু, "আমি যে তোমাকে ভালবাসি তা কি আজ নতুন ক'রে বলবার কথা! ছোটবেলা হতে তোমাদের বাড়ী এসেছি, তোমাদের দেখছি, তোমাদের ছাড়া আমার আপনার কেউই নেই—আমি তোমাদের ভাল বাসব না? কিন্তু তাই বলে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া অসম্ভব। তা হলে তোমার বাপ মা তোমাকে ত্যাগ করবেন, সমাজ ত্যাগ করবে, এখন তুমি যাকে সুখ ভাবছ, তা' তোমার চিরস্থায়ী অসুখের কারণ হবে, ঈশ্বরে বিশ্বাস করে ধৈর্য্য ধরে কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর, তোমার পিতা মাতার অসুখের কারণ না হয়ে তাঁদের ইচ্ছা মত আবার বিয়ে কর—ঈশ্বর নিশ্চয়ই তোমাকে সুখ শান্তি দেবেন। আমি জানি তুমি আমাকে নিষ্ঠুর ভাববে, কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় নাই।"

স্নেহের প্রতি কথা কঠিন প্রস্তরের মত চারুর হৃদয়ে গিয়া বাজিল। চারু তীব্র কষ্টে কাতর ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—"স্নেহ আমি তোমার উপদেশ শুনতে চাই নি, তোমার হৃদয় জানতে চেয়েছিলুম, বুঝলুম তুমি আমাকে ভালবাস না, তাই তোমার পক্ষে এ বিবাহ অসম্ভব। বেশ সেই ভাল। কিন্তু একদিন যদি দেখ আমি আর মানুষ নেই, আমি পশুর অধম হয়েছি তখন আমাকে অপরাধী করো না।"

চারু এই কথা বলিয়া তীর বেগে গৃহ হইতে চলিয়া গেল।

জাতি সমূহের অভ্যুদয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জাতীয় উৎপত্তি বিষয়ক তত্ত্বানুসন্ধানে আমরা তিন শ্রেণীস্থ লোককে কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিতে পাই, ১ম, প্রাণীতত্ত্ববিৎ (Zoologist) ২য়, ভূতত্ত্ববিৎ (Geologist) এবং ৩য়, ভ্রূণতত্ত্ববিৎ। (Embryologist) বহুদিবস পর্য্যন্ত ইঁহারা সকলে পৃথক ভাবে কার্য্য করিতেছিলেন বটে, কিন্তু ফলতঃ তাঁহাদের লক্ষ্য একই মহান্ সত্যের দিকে নির্দ্দিষ্ট ছিল; তাঁহারা অজ্ঞাতসারে একই বৃক্ষের পদমূলে জল সেচন করিতেছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে আর তাঁহাদের সেরূপ পার্থক্য ভাব বড় একটা লক্ষিত হয় না। বিজ্ঞানের রাজ্যে তাঁহাদের সমবেত পরিশ্রম যে বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন; তাঁহারা এখন আপন আপন অধিকারের মধ্যে থাকিয়া পরস্পরকে সাহায্য করিতে ব্যগ্র। এক দিকে প্রাণীতত্ত্ববিৎ বর্ত্তমান জীব সকলের মধ্যে একতা ও

বিভিন্নতা দেখাইয়া দিতেছেন তাহাদের জাতিগত উন্নতির ইতিহাস এবং আপাততঃ যে সকল জাতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বোধ হয় তাহাদের অন্তঃপাতী যে সকল জাতি আজিও উভয় সীমাস্থ জাতির সম্বন্ধ সূচনা করে তাহাদিগকে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছেন। অপরদিকে ভূতত্ত্ববিৎ ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া কোথায় কোন স্তরে কি প্রকারের জীব বাস করিত, কোন প্রকার জীবের পদচিহ্ন কোন স্তরে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা জানাইতেছেন এবং যুগ যুগান্তরের কঙ্কালরাশির পুনরুদ্ধার করিয়া বিলুপ্ত প্রাণীর জাতি নির্দ্দেশ করিতেছেন। আবার অন্য দিকে ভ্রূণতত্ত্ববিৎ বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর ভ্রূণ পরীক্ষা করিয়া তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন-ইতিহাস আমাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছেন এবং ভ্রূণ জীবনী যে তাহার জাতীয় জীবনীরই পুনরাবৃত্তি—তাহাও বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিতেছেন।

প্রাণীতত্ত্ববিৎ এবং ভূতত্ত্ববিৎ যে কি প্রকারে এই কার্য্য ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন তাহার কথঞ্চিৎ আমরা পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিয়াছি। এক্ষণে ভ্রূণতত্ত্ববিৎ কিরূপে এই মহান সত্য সকলের উদ্ভাবণে যত্নবান রহিয়াছেন তাহাই দেখা যাউক।

মনুষ্য এবং অন্যান্য প্রাণীদিগের গর্ভস্থ ভ্রূণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বিকাশ দর্শন করিলে আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব নিরূপিত হয়। আমরা উদাহরণ স্বরূপ কেবল ভেকের জীবন-ইতিহাস একটু বিশদরূপে পর্য্যালোচনা করিব এবং তাহা হইতে আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে যুক্তি সংগ্রহে চেষ্টা করিব। ভেককে আমাদের উদাহরণ স্বরূপ মনোনীত করিবার কারণ এই যে অনেকেই হয়ত ভেক ভ্রূণের ক্রমশঃ বিকাশ দর্শন করিয়া থাকিবেন এবং যাঁহারা কখনও দেখেন নাই তাঁহারাও অতি অল্প আয়াসে এ বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন। বর্ষাকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের নিকট মালার ন্যায় গ্রথিত কতকগুলি গোলাকার বস্তু অনেক সময় আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, সে গুলি যে কি তাহা জানিবার জন্য কাহারও বিশেষ ঔৎসুক্য থাকে না। কিন্তু পরদিন যদি কেহ সেখানে আসিয়া অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে সেই মালায় গ্রথিত বস্তুগুলির কোন চিহ্নই দেখিতে পাইবেন না। তৎ-পরিবর্ত্তে নিকটবর্ত্তী জলাশয়টি বেঙাচিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে দেখিতে পাইবেন। এই সময় বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও ভেকের সহিত তাহাদের কোন সাদৃশ্যই লক্ষিত হইবে না বরং কোন 'মৎস্য' জাতীয় জীব বলিয়া ভ্রম হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। মৎস্যের ন্যায় ইহাদের রক্ত পরিশোধন কার্য্য ফুলকা দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং পশ্চাদ্ভাগে একটি ক্ষুদ্র লাঙ্গুল দেখিতে পাওয়া যায়। সেই লাঙ্গুলের সাহায্যে ইহারা জলে অবলীলাক্রমে সন্তরণ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু তখনও হস্ত পদাদির কোনই চিহ্ন থাকে না। আরও কিছু দিন পরে প্রথমতঃ পশ্চাতের পা

দুটি তৎপরে সম্মুখের দুটি প্রকাশ হইতে থাকে; কিন্তু তখনও ইহারা জলেই অবস্থান করে। পরে পা গুলি সবল হইলে ইহারা জল ছাড়িয়া স্থলে যাইতে আরম্ভ করে আর যতই স্থলে বাস করে লাঙ্গুল ততই কমিয়া যায়। এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে ইহারা চারি পা বিশিষ্ট, লাঙ্গুলহীন ভেক রূপে পরিণত হয়। এই সময়ে একটি ভেকের দেহ ছেদন করিলে দেখা যায় তাহার ফুল্কা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে এবং তাহার স্থানে ফুস্‌ফুস্‌ রহিয়াছে।

ইহাতে দেখা যায় ভেকের জীবন-ইতিহাসে চারিটি অবস্থা আছে। ১ম, ডিম্বাবস্থা; ২য়, পদবিহীন সলাঙ্গুল ফুলকা বিশিষ্ট অবস্থা; ৩য়, পদযুক্ত লাঙ্গুলহীন ফুলকাযুক্ত অবস্থা; ৪র্থ, পদযুক্ত লাঙ্গুলহীন ফুস্‌ফুস্‌ যুক্ত অবস্থা অথবা প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থা। এখন দেখা যাউক এই জীবনইতিহাস আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিরূপে সাহায্য করে।

প্রাণিতত্ত্ববিদেরা সমুদয় উভচর জাতিকে চারিটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করেন। * তন্মধ্যস্ত যুরোডেলা নামক শ্রেণীকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম যাহাদের ফুলকা জীবনাবধি বর্ত্তমান থাকে, (Perennibrancheate) দ্বিতীয়, যাহাদের ফুলকা বয়োবৃদ্ধি সহকারে খসিয়া পড়ে (Caducibrancheate)। বর্ত্তমান সমুদয় উভচরের মধ্যে ভেক জাতিই (Anaura) সর্ব্বোচ্চ স্থানীয়। আমরা ভেকের জীবনইতিহাস পাঠ করিয়া অবগত হই যে বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহাকে কতকগুলি সোপান অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। সে সোপানগুলি আর কিছুই নয় কেবল অতীত ঘটনার পুনরাবৃত্তি মাত্র। ভেকের ২য় ও ৩য় অবস্থা যে যুরোডেলার ২টি শাখাশ্রেণীরই অনুলিপি তাহা আর বলিয়া দিবার আবশ্যক নাই। যে সকল নিম্ন শ্রেণীর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া ভেক জাতির উৎপত্তি হইয়াছে আমরা সেই সকল শ্রেণীরই পুনরাবৃত্তি তাহার বাল্য জীবনীতে স্পষ্ট দেখিতে পাই।

মনুষ্য ভ্রূণের বিকাশ কালীন তাহাকেও এইরূপে রূপান্তরিত হইতে দেখা যায়। তৃতীয় অথবা চতুর্থ সপ্তাহের একটী মনুষ্য ভ্রূণ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাহাকে সেই বয়সের অন্য কোন স্তন্যপায়ীর ভ্রূণ হইতে ভিন্ন বলিয়া আদৌ বোধ হয় না †। মনুষ্য জাতি যে অগণ্য সোপানাবলী পার হইয়া উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তাহার ভ্রূণ-জীবনীতে প্রকাশিত হয়।

---

* Ophiomorpha, Urodela. Anaura and Labyrinthodontia (Extinct.)

† Vide Haekel's Evolution of Man, illustrations comparing the embryo of hog, calf, rabbit and man at their successive stages of development.

প্রজাপতির রূপান্তর আরও বিশেষ আশ্চর্য্যজনক। এক প্রজাপতি যে কিরূপ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রাণী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ভ্রূণ তত্ত্ব সম্বন্ধে ভন বেয়ার কি বলিতেছেন দেখুন—"এক সময় আমার নিকট দুইটি ভ্রূণ স্পিরিটে রক্ষিত ছিল। সংগ্রহকালীন তাহাদের নাম লিখিয়া রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কিছু দিন পরে যখন তাহাদের দেখিলাম, তখন তাহারা যে কোন জাতীয় ভ্রূণ তাহা আর বুঝিতে পারিলাম না। তাহারা মনুষ্য ভ্রূণ কি অন্য কোন স্তন্যপায়ীর ভ্রূণ, কি কোন উরগ জাতীয় ভ্রূণ, তাহা জানিবার কোন উপায়ই ছিল না।" এইরূপে দেখা যায় সমস্ত জীবই তাহাদিগের ভ্রূণাবস্থায় অতি আশ্চর্য্য রকমে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। ক্রমাভিব্যক্তিবাদীরা ইহাকে একটি অব্যক্ত অথচ পূর্ণ ইতিহাস বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহা জাতীয় জীবনীর পুনরাবৃত্তি মাত্র।

আত্ম রক্ষার প্রয়াস জীব জগতে অতিশয় বলবতী। সামান্য প্রোটোজোয়া হইতে অত্যুন্নত মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই এই মহান উদ্দেশ্য সাধনে সর্ব্বদা তৎপর রহিয়াছেন। মনুষ্যের কার্য্য প্রণালী সকল "হিতাহিত বিবেচনা" (reason) দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতেছে, এবং নিকৃষ্ট প্রাণীরা তাহাদের "পশুজ্ঞান" (instinct) দ্বারা পরিচালিত। "পশুজ্ঞান"ই বল, আর "হিতাহিত বিবেচনা"ই বল, উভয়েরই উদ্দেশ্য এক, একটি অপরটির রূপান্তর মাত্র। যাবতীয় প্রাণী সমূহের কার্য্য কলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যেও ক্রমোন্নতির কার্য্য ক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় এবং যে উন্নত বুদ্ধির অধিকার লাভে মনুষ্য জাতি আজি গর্ব্বিত ও স্ফীত, তাহা যে কেবল "পশুবুদ্ধি"রই রূপান্তর মাত্র তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না। পশুবুদ্ধির কার্য্য ক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করুন। সেখানে মাকড়সার জালের কারুকার্য্য একবার দর্শন করুন। ঐ সূচিকর পক্ষী (Tailor bird) কেমন ধীরে ধীরে কার্পাস হইতে তুলা আহরণ করিয়া দুই তিনটি বৃক্ষপত্রকে একত্রে সংযোজিত করিয়া আপনার কুলায় নির্ম্মাণ করিতেছে। আবার অন্যদিকে দেখুন এক দল দাঁড় কাক সভা করিয়া একজন বিদ্রোহীর দণ্ড বিধান করিতেছে। পিপিলিকার কার্য্য প্রণালী দর্শন করিলে কে না তাহার বুদ্ধি শক্তির প্রশংসা করিবে? তাহারা আপনার বাসস্থান অতি পরিপাটি রূপে সজ্জিত করে, রাত্রিকালে গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখে। অসময়ের জন্য শস্য আহরণ করে এবং অতি আশ্চর্য্য উপায়ে শস্যের গাঁজিয়া যাওয়া (fermentation) নিবারণ করে; ক্রীত দাস রাখিয়া তাহাদের দ্বারা গৃহ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লয়। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভাব পরিবর্ত্তন, বহুদিন পরে বন্ধু সম্মিলনে উল্লাস, যুদ্ধ স্থলে স্বজাতির হিতের জন্য জীবন বিসর্জ্জন, নদী গর্ভে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ—এ সমুদয়ই উন্নত বুদ্ধির পরিচায়ক। ইহাতেও যদি তৃপ্তি না হয়, নদী তটে গমন করিয়া বীবরের গৃহ নির্ম্মাণ মনোযোগ করিয়া দেখুন, মনুষ্যের উন্নত বুদ্ধিও সেখানে হার মানিয়াছে। এই সকল দেখিয়া কি স্পষ্ট প্রতীয়-

মান হয় না যে, "হিতাহিত জ্ঞান" এবং "পশুবুদ্ধি" দুইটিই একই সামগ্রীর রূপান্তর মাত্র? এখন বিবেচনা করুন। দেখুন ক্রমাভিব্যক্তির প্রভাবে কেবল যে আকৃতিগত বৈলক্ষণ্যই সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহা নহে, বুদ্ধি শক্তিও সেই সঙ্গে পরিমার্জ্জিত হইতে থাকে। মনুষ্য ও ইতর প্রাণীদিগের মানসিক শক্তির মধ্যে যে প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল উন্নতির তারতম্য মাত্র, উভয়েই এক জাতীয়—বিভেদ পরিমাণগত—উৎপত্তিগত নহে। ভালবাসা, পরদুঃখ-কাতরতা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি যে সকল গুণের অধিকারী হইয়া মানুষ আপনাকে উন্নত বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন, সে সকলে যে কেবল তাঁহারই একাধিপত্য তাহা নহে। নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের মধ্যেও এই সকল গুণাবলী পরিস্ফুট বা অপরিস্ফুট অবস্থাতেই হউক বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার ভুরিভুরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। কেবল তাহাই নহে, অনেক মনুষ্যের মধ্যে যে সকল গুণাবলী দৃষ্টি গোচর হয় না, নিকৃষ্ট প্রাণীদের মধ্যে তাহা অতি উন্নত অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ।

কবিতা মালা।

চির-নব।

(১)
নিতিই ভোবের্ বেলা
কুহরে পিক কুল,
পবন খেলা করে
লইয়া ফোটা ফুল।

(২)
ক্রমশঃ ধরা খানি
সজীব হয়ে উঠে,
যে যার কায পানে
সম্মুখে যায় ছুটে।

(৩)
লোহিত রঙ মাখা
যে দিকে নভঃ খানি,
সে দিকে চেয়ে থাকি,
উঠিবে দিনমণি।

(৪)
হেরিয়া সেই শোভা
মোহিত হ'য়ে থাকি,
উথলি উঠে হিয়া,
ভরিয়া যায় আঁখি।

(৫)
নিতিই সাঁঝের্ বেলা
পবন বহে ধীরে,
সরসী-হৃদে তোলে
শতটি লহরীরে।

(৬)
বিষাদে দিনমণি
ক্রমশঃ লাল লাল,
সরোজি কাঁদে বসি
রাঙিয়ে ছুটি গাল।

(৭)
গাভীরা মাঠে থেকে
আবাসে আসে ফিরে।
কৃষক তার পাছে
লাঙল লয়ে শিরে।

(৮)
পাখীরা গাছে বসে
পূরবী গেয়ে গেয়ে,
ঘুমায়ে পড়ে ত্বরা
মাথাটি নীড়ে থুয়ে।

(৯)
সোণার চাঁদ খানি
আকাশে হাসে আসি।
সোহাগে ফুটে উঠে
বাগানে ফুল-রাশি।

(১০)
জোছনা, সরলতা
মাখিয়া মুখ ময়,
আমোদে ছেলে মেয়ে
"আয়রে চাঁদ" কয়।

(১১)
হেরিয়া সেই শোভা
মোহিত হ'য়ে থাকি,
উথলি উঠে হিয়া
ভরিয়া যায় আঁখি।

(১২)
গভীর নিশাকালে
কখনো জেগে উঠে,
হেরিতে চাঁদিমারে,
বাহিরে যাই ছুটে।

(১৩)
চাঁদের ক্ষীণ আলো
ধরণী গায়ে মাখা,
নিখিল চরাচর
ঘুমের কোলে রাখা।

(১৪)
কখনো দু একটি
মেঘেরা ছুটে এসে
নাচিয়া চলে যায়
চাঁদের গায়ে ঘেঁসে।

(১৫)
হেরিয়া সেই শোভা
মোহিত হয়ে থাকি,
উথলি উঠে হিয়া,
ভরিয়া যায় আঁখি।

(১৬)
গভীর নিশাকালে,
প্রভাতে, দিবাভাগে,
নিতি যা দেখি, শুনি,
নিতি তা ভাল লাগে।

(১৭)
প্রকৃতি প্রতিদিন
গাহেন এক(ই) গান,
নিয়ত সেই গান,
তবুও ভরে প্রাণ।

(১৮)
প্রকৃতি, এই গান,
শিখিল কাছে যাঁর,
তাঁহার পায়ে কবি
প্রণমে বার বার।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্মশান-সঙ্গীত।

১

অই শোন মূর্খ নর, ভীষণ শ্মশানে,
কে জানি গাইছে অই মরণের গান!
প্লাবিয়া ধরণী, স্বর ছাইছে গগনে,
কাঁপিয়া উঠিছে ভয়ে এ নির্জীব প্রাণ!

২

একভাবে দিবানিশি গভীর নীরবে
গাইছে সঙ্গীত, জীব আত্মহারা প্রাণে
লক্ষ্য করি সেই স্বর, একে একে সবে
ছুটিয়াছে প্রতিপলে, সে সঙ্গীত পানে!

৩

প্রকৃতির মর্ম্মস্থলে পশি সেই রব,
কি এক গভীর তত্ত্ব করিছে বিকাশ।
প্রতি তান বিশ্বব্যাপী, অথচ নীরব,
নীরবে, প্রাণের মাঝে মাখিয়া হুতাশ!

৪

এ গানের তালত্রয় "সৃষ্টি-স্থিতি-লয়,"
শূন্য-ফাঁক, জ্ঞানাতীত, রহস্য গভীর!
লয়-সম, এই স্থান চির মোহময়,
অপূর্ণতা ঢেলে দেয় প্রাণে প্রকৃতির!

৫

বধির মানব, তুমি শুনিবে কেমনে,
সংসারের সুখে দুঃখে সদা মুগ্ধ মন!
দেখিলে না,—বুঝিলে না প্রকৃতি-নয়নে
কেন ঝরে অশ্রুবিন্দু শিশির-রতন!

৬

আদি নাই, অন্ত নাই সদা এক ভাবে
কি যে গায়, জীবাত্মার বোধগম্য ভাব!
দেখি না গায়কে, কিন্তু নীরবে নীরবে
ঢে'লে দেয় এ পরাণে অনন্ত উদাস!

৭

অই শোন জল-নিধি শুনি সেই তান,
আপনার ক্ষীণ কণ্ঠে মৃদু মৃদু গায়
উলটি পালটি বিশ্ব, আত্মহারা প্রাণ,
অই কণ্ঠে নিজ কণ্ঠ মিশাইতে চায়!

৮

পাপী মোরা—তাই কাঁদি এই স্থানে আসি,
মনে পড়ে পিতামাতা শৈশব সখায়,
মনে পড়ে প্রেয়সীর সুধা-রূপরাশি
লুকায়েছে চির তরে এ মহা শয্যায়!

৯

হে হৃদয় শান্ত হও, জ্ঞানের নয়নে
চেয়ে দেখ এই বিশ্ব সংসারের পানে,
আত্মার ভিতরে তব হবে অনুমান
নীরব শ্মশানে উঠে কি সঙ্গীত তান।

১০

সমুদ্রের পর প্রান্তে, মলিন বদনে,
চেয়ে দেখ ভানু যবে ধীরে ডুবে যায়—
প্রকৃতি কাঁদিয়া উঠে, আকুল পরাণে!
দুর্ভেদ্য তিমির রাশি গ্রাসে এ ধরায়!

১১

অথবা শ্মশান-মাঝে কর্দম-শয্যায়,
অই যে রে মানবের কঙ্কাল ভীষণ—
বৃষ্টিতে ভিজিয়া দাহ আতপ-শিখায়,
আপনার ভাগ্য-লিপি করিছে স্মরণ!

১২

অই যে দুর্ভাগা, অই বিটপীর তলে,
—কুষ্ঠাক্রান্ত, বিকলাঙ্গ, মুষ্টি ভিক্ষা-আশে
যাপিয়া সমস্ত দিন, শোক অশ্রুজলে
ভাসিতেছে, ক্ষীণ দেহ নিত্য উপবাসে!

১৩

অথবা মনের দুঃখে গভীর হুতাশে,
পিতৃ মাতৃ হীন অই শিশুর ক্রন্দনে,
যেই ভাব অশ্রুসহ গণ্ডদেশে ভাসে,
দেখিও, সে মহাতান পশিবে শ্রবণে!

১৪

কিম্বা সুগভীর রাত্রে ঘোর নিরাশায়,
নিদ্রোত্থিত বিধবার শোক-তপ্ত মনে
যে ঝঞ্ঝা বহিয়া যায়, মুহূর্ত্তেক হায়
ভাবিও হৃদয়ে, স্বর পশিবে শ্রবণে!

১৫

বুঝিবে তখন এই সঙ্গীত মহান
নিরাশ্রয় জীবাত্মার প্রেম-নিকেতন!
চির শান্তি সুখপূর্ণ এ নীরব তান,
জাগায় বিস্মৃত স্মৃতি, পবিত্র জীবন!

১৬

রবি-শশী-গ্রহ-তারা অনন্ত গগন,
চে'য়ে আছে এক প্রাণে, সদা ঊর্দ্ধকাণ!
অই স্থানে জীবাত্মার পূর্ণ সংমিলন,
জীবনের শেষ স্মৃতি, মুক্তির সোপান!

শ্রীকায়কোবাদ।

দেবী প্রতিমা।

তোমার হৃদয়ে কেন এত স্নেহ, ভালবাসা,
কেন গো অধরে তব এত আদরের ভাষা,
স্বর্গের দেবতা কি গো এসেছ এ ধরণীতে
শান্তিবারি লয়ে সাথে শ্রান্ত জনে শান্তি দিতে?
সংসার তিমিরে ঘেরা আঁধার হৃদয়াকাশ,
এনছ স্বর্গের আলো ত্যায়াগিয়া স্বর্গবাস।
সংসার সমুদ্র মাঝে আজি দেবী দিকহারা,
ফুটিয়া রয়েছে তাই হৃদাকাশে ধ্রুবতারা।
আকুল হইয়া উঠে যখন এ ভাঙ্গা হিয়া,
তোমার চরণে দেবী মূরছিতে চায় গিয়া।
তোমারই আঁখি হ'তে চায় ছুটো অশ্রুকণা,
হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস, স্নেহভাষা, সে করুণা;
হৃদয় অরণ্য হ'তে যে ছুটো গো ফুল পাই,
তোমার চরণে দেবী পুষ্পাঞ্জলি দিতে চাই।

ফুরাবে যে দিন এই ভাঙ্গা ঘরে ধূলা খেলা,
যেতে হবে সে দেশেতে জীবনের সন্ধ্যাবেলা —
সে দিন আমার কাছে দাঁড়াইও হাসিমুখে,
স্বর্গীয় মাধুরী হেরে চলে যাব জ্যোৎস্নালোকে।
শান্ত হৃদি শান্ত প্রাণ, আলোকিত এই হিয়া,
নব প্রাণে মহাশূন্যে অসীমে মিলাবে গিয়া।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ।

নব পরিণয়ে।

ছুটেছিল তটিনী যে একেলা আপন মনে
আধ পথ যেতে যেতে মিশিল অপর সনে।
ছুটিতে সাগর পানে ছুটিল হরষে ভাসি,
স্বরগের দেববালা বরষে আশীষ রাশি।
এনেছিল পারিজাত নন্দন কানন হ'তে,
সে কুসুম ডোর দিয়ে বেঁধে দিল হাতে হাতে।
স্বরগের প্রেমফুলে বাঁধিল হৃদয় দুটি,
সহসা আঁধার মাঝে জ্যোছনা উঠিল ফুটি।
ভুলে গেল সংসারের ব্যাথা আর অভিমান,
জগতের মাঝে তারা স্বর্গ করে নির্মাণ।
প্রেমপূর্ণ আঁখিতারা নয়নের পানে চায়,
যেন সে দিঠিটি দিয়ে হৃদয় বিকায়ে যায়।
এমনি স্বপনে থাক তোমরা দুজনে ভোর,
হরষের মাঝ খানে বাঁধিয়া প্রেমের ডোর।
নব পরিণয়ে সখি কি দিব তোমারে আর,
হৃদয়ে উথলে আজি হরষের পারাবার।
একা ছিলে সংসারেতে এক হল দুটি প্রাণ,
নিখিলের মাঝে তবে সুখ শান্তি কর দান।
নন্দন সৌরভ বুকে সমীর বেড়াক ভাসি,
নয়নে উঠুক জেগে ত্রিদিবের সুখ রাশি।
আশীর্ব্বাদ করি আজ এক মন প্রাণ লয়ে,
যাও সেই সিন্ধু পানে ছুটিতে নীরবে ব'য়ে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

জগতের মৃত্যু।

যবে উথলিত অশ্রুনদী,
দোঁহার কপোলবাহী
চুম্বনের তলে মিশে,
তখনি জগত নাহি!

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

আলেখ্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রালোকিত যমুনাতীরে এক নিভৃত কুঞ্জবাটিকায় দাঁড়াইয়া দুইজনে কথোপকথন করিতেছিল। মধুর জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে, চন্দ্রের বিমল রজত-রশ্মি যমুনার ঘনকৃষ্ণ সলিলে, সৈকত ভূমিস্থ প্রস্তরময় সোপান সমূহে, আর সেই দুইজনের মুখে পড়িয়া বড়ই শোভা পাইতেছিল। প্রকৃতি নিস্তব্ধ, সুবিমল শশিকরে সুপ্ত নববল্লরী মধ্যে শ্বেত বর্ণ পুষ্পরাজি সেই নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে সুগন্ধ বিকীরণ করিয়া নীরবে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-তলে বিশ্রাম করিতেছিল।

একজন বলিতেছে "তিলোত্তমে! অসার আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া ফল কি? তাহাতে কেবল যাতনা বাড়িবে বই ত নয়? তোমার পিতার শেষ কথা ত তোমায় বলিয়াছি। আমি দরিদ্র—তুমি ঐশ্বর্য্যশালীর কন্যা। যদিও আমি তোমার সহিত বংশ গৌরবে সমকক্ষ, কিন্তু আমার কিছুই নাই। তোমার পিতা কেন তোমায় দরিদ্রের করে সমর্পণ করিবেন? তাই বলিতেছি বৃথা কেন আমার জন্য কষ্ট পাও? তুমি সুপাত্রে পরিণীতা হও, চিরজীবন তোমার সুখময় স্মৃতি, মধুর গুণাবলী স্মরণ করিয়া ভগিনীর ন্যায় তোমায় স্নেহ করিব।"

তিলোত্তমা এ কথার কোন উত্তর করিল না। যন্ত্রণার অনলাশ্রু রাশিতে তাহার নয়ন কেবল ভাসিতে লাগিল।

যুবক ধীরে ধীরে বালিকার সেই কৌমুদী বিধৌত অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"তিলোত্তমে! তোমার এক একটি অশ্রুবিন্দু আমার হৃদয়ে শত শত বিষাক্ত ছুরিকার আঘাত করিতেছে। আমি তোমার কষ্টের কারণ হইয়াছি—একথা ভাবিয়া আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমাকে দেখিয়া, আমাকে ভালবাসিয়া যেমন তোমার সুখ, আমারও ত সেইরূপ। আমাদের মিলন যদি বিধাতার অভিপ্রেত হয় ত কেহই আমাদের বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। আমি আজ দেশ ছাড়িয়া চলিলাম, যদি কখনও অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়, তবে আবার আসিয়া তোমার সঙ্গে

তিলোত্তমা আকুল স্বরে কহিল—"আমি তোমার সঙ্গে যাইব—তোমার জন্য আমি পিতার আশ্রয় পরিত্যাগ করিব।"

"তুমি আমার সঙ্গে যাইবে? একি কথা তিলোত্তমে? তোমার পিতা কি মনে করিবেন? প্রতিবেশীমণ্ডলী, সমাজ কি মনে করিবে? আর আমিই বা কোন সাহসে তোমায় লইয়া যাইব? এ প্রকার যথেচ্ছাচারিতায় যে তোমার পিতার সম্মানের পথে চিরকালের জন্য কাঁটা পড়িবে? তোমার জন্য আমার জীবনকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি, কিন্তু কৃতঘ্নতার পরিবর্ত্তে তোমায় লাভ করিতে চাহি না। এই ঘটনায় তোমার পিতা মনস্তাপ পাইয়া সমাজের ভয়ে হয়তঃ আত্মনাশ করিতে পারেন। তিলোত্তমে! ও কথা আর মুখে আনিও না। তোমার পিতার জীবনের মূল্যে, তাঁহার শোক সন্তপ্ত চিত্তের রুষ্ট অভিশাপের পরিবর্ত্তে, কৃতঘ্নতার বিনিময়ে তোমায় লাভ করা অপেক্ষা শত জন্ম তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর।"

কথাগুলি তিলোত্তমার মর্ম্মদেশ স্পর্শ করিল। তিলোত্তমা ঘোরতর নৈরাশ্যব্যঞ্জক স্বরে প্রশ্ন করিল—"তবে কি আর কোন উপায় নাই।"

"আছে—উপায় আছে। একমাত্র উপায় আমার অদৃষ্ট পরিবর্ত্তন। মনে করিয়া দেখ আমার বংশ গৌরবে তোমার পিতার কোন আপত্তি নাই। তাঁহার আপত্তি এই যে তাঁহার এক মাত্র কন্যা তিনি দরিদ্রের হস্তে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত নহেন। আমার জন্য তিনি এক বৎসর অপেক্ষা করিবেন—একথাও বলিয়াছেন। এই এক বৎসরের মধ্যে যদি ঘটনাবশে আমার অদৃষ্টে প্রচুর ধনলাভ হয়, তবেই আমি তোমায় লাভ করিতে পারিব। কিন্তু তিলোত্তমে! আমাদের উভয়ের প্রণয় যদি অকৃত্রিম, পবিত্র হয়, তবে নিশ্চয়ই জানিও বিধাতার হস্ত আমাদের মিলন অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিবে।"

কথাটা শেষ না হইতে হইতেই সেই চন্দ্রকিরণমণ্ডিত তরঙ্গরাজির উপর তীব্র ক্ষেপণী চালন শব্দ শ্রুত হইল। রঞ্জনলাল সোৎসুকে বলিলেন "তিলোত্তমে! আর না, আমার নৌকা আসিয়াছে, নৌকায় আর দুই জন সহযাত্রী আছে—আমি উহাদের সঙ্গে আগরায় যাইব। যদি জগদীশ্বরী কখনও দিন দেন, তবে অদ্য হইতে দ্বাদশ পৌর্ণমাসীর পূর্ব্বে তোমার সহিত এই স্থানে সাক্ষাৎ করিব। তোমার পিতা যখন এক বৎসর অপেক্ষা করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তাহার অন্যথা হইবে না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তিলোত্তমার পরিচয় দেওয়া একটু আবশ্যক। তিলোত্তমা এলাহাবাদের কোন এক বিখ্যাত শ্রেষ্ঠীর কন্যা। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে গৌরবান্বিত সাহানসা আকবর সাহ দিল্লীর সিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন। তিলোত্তমার পিতার নাম ধনশ্রী দাস। ধনশ্রী দাস আকবরের সভার একজন বিখ্যাত রত্নবণিক।

ধনশ্রীর সম্মানের যথেষ্ট পরিচয় এই যে, দিল্লীশ্বর তাঁহাকে চিনিতেন। তিলোত্তমা যখন আট বৎসরের বালিকা, তখন একবার পিতার সঙ্গে আগরায় গিয়াছিলেন। বাদসাহ সেই প্রভাত কমলবৎ অপরিস্ফুট বালিকার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"ধনশ্রী তোমার কন্যা এক দিন রূপ গৌরবে সমস্ত হিন্দুস্থান উন্মত্ত করিয়া তুলিবে।"

তিলোত্তমা পিতার একমাত্র সন্তান; অল্প বয়সে মাতৃহীনা, সুতরাং পিতার আরও আদরের সামগ্রী। ধনশ্রী তিলোত্তমার জন্য সুপাত্র অনুসন্ধানে কোন ত্রুটি করেন নাই। নানাস্থান হইতে সম্বন্ধও আসিয়াছিল কিন্তু কোনটিই তাঁহার মনোনীত হয় নাই। দূর দেশ হইতে দুই একটি সম্বন্ধ আসিয়াছিল, পাত্রও ধনশ্রীর মনের মত, কিন্তু দূর বলিয়া তিনি সে বিবাহে সম্মত হইলেন না।

রঞ্জনলাল আশ্রয়হীন, পিতৃ মাতৃ হীন যুবক। রঞ্জনের পিতাও ধনশ্রীর সমব্যবসায়ী। কিন্তু তিনি অতি উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক ছিলেন। ধনশ্রীর অপেক্ষা তিনি অধিক উপায় করিতেন, কিন্তু অপব্যয়ে তাঁহার সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইত। রঞ্জনলাল যখন দশ বৎসরের, তখন তাহার মাতৃ বিয়োগ হয়। তাহার পিতাও পর বৎসর ইহলীলা সম্বরণ করেন।

পিতার মৃত্যুর পর রঞ্জনলাল একাকী নিরাশ্রয় হইয়া সংসার সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। ধনশ্রী রঞ্জন লালের নিঃসহায় অবস্থা দেখিয়া তাহাকে নিজ গৃহে আনিয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

ধনশ্রীর গৃহিণী যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন রঞ্জনলাল মাতৃশোক ভুলিয়াছিলেন। বালক বালিকা দুইটি একত্রে আহার করিত, তিনি তাহাদের দুই জনকে দুই পার্শ্বে রাখিয়া ঘুম পাড়াইতেন। প্রভাতে প্রভাত-রশ্মি মাখিয়া যমুনা যখন মৃদুল বাতাসে লহরি তুলিয়া আপন মনে উজান বহিত, বালক বালিকা তখন রাশি রাশি ফুল কুড়াইয়া লইয়া যমুনার জলে ভাসাইয়া দিত। "ঐ আমার ফুলটা আগে ভাসিয়া গেল—রঞ্জন দাদার ফুল বেশী দূরে গেল না"—বালিকা এই কথা বলিয়া উচ্চরবে হাস্য করিত। গাছের উপর ঘন পল্লবাবৃত শাখায় বসিয়া পাপিয়া যখন ডাকিয়া উঠিত, সেই মধুর স্বর যখন প্রভাত বায়ুতে পরিচালিত হইয়া নীল গগনের কোলে চারিদিক ব্যাপিয়া ছড়াইয়া পড়িত, বালিকা তখন কোমল কর পল্লবে মুখখানি ঢাকিয়া পাপিয়ার স্বর অনুকরণ করিয়া ডাকিয়া উঠিত। রঞ্জন না খাইলে বালিকা খাইত না—রঞ্জনলাল পাঠ বলিয়া না দিলে বালিকা পড়িত না, রঞ্জন দাদা বাগানে বেড়াইতে না গেলে বালিকা সেদিকে যাইত না, রঞ্জন দাদা ফুল গুছাইয়া না দিলে বালিকা মালা গাঁথিত না। তাহাদের এই বাল্য সৌহার্দ্দ দেখিয়া গৃহিণী কখন কখন বলিতেন "ইহারা যেন এক বৃন্তে দুইটি ফুল—আমি ইহাদের বিবাহ দিব।"

গৃহিণী যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে ইহাদের বিবাহের কোন অসম্ভাবনাই থাকিত না। এমন কি যদি রঞ্জনলালের পিতাও জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলেও এই বালক বালিকার মিলন সুদূর পরাহত হইত না।

সংসারে কতকগুলি লোক আছে—পরের অনিষ্ট করিতে পারিলেই তাহাদের আনন্দ। পরের অনিষ্ট করিতে গেলে তাহাদের নিজের স্বার্থ অগ্রসর হয়—হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু না হইলেও তাহারা স্বভাব ছাড়িয়া পথ চলে না। ধনশ্রীর কাছে এই প্রকার কতকগুলি লোক আসিয়া এই সময়ে জুটিল। তাহাদের চেষ্টা রঞ্জনলালের সহিত ধনশ্রীর কন্যার বিবাহ না হয়। নানা প্রকার কাণাঘুষা চলিতেছে দেখিয়া ধনশ্রীর মনে মনে ইচ্ছা থাকিলেও তিনি রঞ্জনের সহিত তিলোত্তমার বিবাহ বিচ্ছেদে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন।

তিলোত্তমা বালিকা—তাহার কোন দোষ নাই; কিন্তু রঞ্জনলাল তাহার সম্মুখে প্রলোভনের মত কেন বসিয়া থাকে। ধনশ্রী ভাবিলেন রঞ্জনলালকে বাটী হইতে বিদায় করিতে না পারিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি দুরূহ হইয়া উঠিবে।

সাত পাঁচ ভাবিয়া তিনি এক দিন রঞ্জনলালকে ডাকাইলেন। বলিলেন "দেখ, তিলোত্তমা এখন বড় হইয়াছে—আর তোমাদের উভয়ের একত্রে থাকা ভাল দেখায় না। আর তোমারও নিশ্চেষ্ট হইয়া চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকাও ভাল নয়। এই বেলা হইতে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করা আবশ্যক। অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে [illegible] অদৃষ্ট প্রসন্ন হয় না। আমি জানিয়াছি তিলোত্তমা [illegible] তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে অন্তরাল না করিতে [illegible] তোমায় আমি এতদিন পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন [illegible] তোমায় অকর্ম্মণ্য করা আমার উদ্দেশ্য নহে। [illegible] খানি লইয়া আমার বন্ধুর নিকট [illegible] নিযুক্ত করিয়া দিবেন। তুমি যেরূপ [illegible] আর দেখ—তোমার জন্য আমি [illegible] নিজের অবস্থা উন্নত করিতে পার [illegible] হইবে না।"

রঞ্জনলাল নির্ব্বাক হইয়া নিস্তব্ধ [illegible] কথা শুনিলেন, কোন কথার উত্তর করিলেন [illegible] নতশিরে ধনশ্রী-প্রদত্ত অনুরোধপত্র ও [illegible] করিলেন।

রঞ্জনলালের সেই দিনের সেই অশ্রুপূর্ণ মুখখানি [illegible]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যমুনাকুল কুল রবে কৃষ্ণ সলিলরাশি হৃদয়ে ধারণ করিয়া সুবর্ণময় সৌর-কর অঙ্গে মাখিয়া অনন্ত উদ্দেশে চলিয়াছে। উপরে নীল আকাশ অনন্তের বিশ্বব্যাপী প্রতিকৃতি। সেই নীল আকাশের নীচে শুভ্র তুলারাশিবৎ মেঘ খণ্ড এদিক ওদিক উড়িয়া বেড়াইতেছে। যমুনার উপরেই লোহিতবর্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড দুর্গ। যেন কাল যমুনা ও নীল আকাশের মধ্যে একমাত্র প্রকাণ্ড ব্যবধান। রঞ্জনলাল আগরা দুর্গের ঘাটে অবতরণ করিয়া সহরে প্রবেশ করিলেন।

যমুনা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে—তাহার পার্শ্বে আকবর সাহের বিশাল দর্শন দুর্গ। দুর্গের উপর হইতে সেই সময়ে ভৈরবী রাগিণীতে মধুর নহবৎ বাজিতেছিল। রঞ্জনলাল যেমন দুর্গের সর্ব্বোচ্চ মিনারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে যাইবেন, অমনি তাঁহার মাথার পাগড়ী ভূতলে লুটাইয়া পড়িল। নিকটে কতকগুলি বালক খেলা করিতেছিল; তাহারা উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠাতে রঞ্জনলাল অপ্রতিভ হইয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

মোগল রাজত্বের এই সময়ে পূর্ণ বিকাশ অবস্থা—আগরা ধন জন ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। যেদিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই দিকেই ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ। আমীর ওমরাহগণের পতাকা চিহ্নিত অত্যুন্নত সৌধ, চকের পণ্যরাজিপূর্ণ সুবিস্তৃত পণ্যশালা, মনোরঞ্জক জনতা সংকুল প্রমোদ উদ্যান—চারিদিকেই ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ। কোথাও বা মধুর রাগ রাগিণীতে নহবৎ বাজিতেছে, কোথাও বা মৃদঙ্গের মৃদুগম্ভীর নিনাদের তালে কলাবৎগণ খেয়াল ধ্রুপদের আলোচনা করিতেছে, কোথাও বা যুবতীর কোমল কণ্ঠ সারঙ্গের সহিত মিশিয়া মধুর কাকলী উৎপাদন করিতেছে, আবার কোন স্থানে সৈনিকের অস্ত্র ঝনঝনায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

রাজপথে অগণ্য জনস্রোত। যেন অনন্তের সূক্ষ্ম রেখা কোথা হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কোথায় গিয়া শেষ হইবে কেহ বলিতে পারে না। কোথায় বা নানা বর্ণে চিত্রিত হস্তীবৃন্দ হস্তীপকের দ্বারা চালিত হইয়া দম্ভভরে রাজপথ অতিক্রম করিতেছে—কোথাও বা তাঞ্জামে চড়িয়া কোন ওমরাহ রাজসভায় চলিয়াছেন—আবার কোথাও বা শত শত অশ্বের হ্রেষা রব সৈনিকের কোষবদ্ধ তরবারি ঝনঝনার সহিত মিশিয়া রাজপথকে শব্দাকুলিত করিতেছে।

রঞ্জনলাল এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে আগরার চক্ অতিক্রম করিলেন। ধনশ্রী তাঁহাকে যে অনুরোধপত্র দিয়াছিলেন, তিনি তাহার কোন ব্যবহার করিলেন না। ধনশ্রীর আত্মীয়ের নিকট না গিয়া তিনি একবারে তাঁহার প্রিয়বন্ধু প্রতাপরামের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

বাড়ীর সন্ধান করিতে বিশেষ কষ্ট হইল না—কারণ প্রতাপরামের নাম আগরার ছোট বড় সকলেই জানিত। প্রতাপ আগরার একজন বিখ্যাত তসবীরওয়ালা। যত বড় বড় আমীর ওমরাহ—এমন কি স্বয়ং বাদসাহ পর্য্যন্ত তাঁহার খরিদ্দার।

প্রতাপের যশ তাঁহার নিজের সম্পত্তি নহে। তাঁহার পিতা দিল্লী ও আগরার একজন প্রধান চিত্রকর ছিলেন। চিত্র বিদ্যা অবলম্বনে তিনি যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। একমাত্র পুত্র প্রতাপই তাঁহার কারবারের উত্তরাধিকারী। প্রতাপও পিতার গুণ পাইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় অল্প বয়সে চিত্রাঙ্কণ কার্য্যে আগরায় কেহ অতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই।

প্রতাপ রঞ্জনের বাল্যকালের বন্ধু। অনেক দিনের পর দুই বন্ধুতে সাক্ষাৎ হইল। দুই জনেই যথেষ্ট প্রীতি লাভ করিলেন। রঞ্জনের মুখে তাঁহার স্বদেশ ত্যাগের কারণ অবগত হইয়া তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং প্রতিশ্রুত হইলেন যত শীঘ্র পারেন তাঁহার একটী কর্ম্ম করিয়া দিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দিনের পর দিন গেল—প্রতি দিন প্রভাতে যেমন প্রকৃতির [illegible] হিরণ্য প্রবাহ ঢালিয়া [illegible] সময় ঘোর রক্তাভ [illegible] রঞ্জিত করিয়া থাকেন, [illegible] সুবিধা হইল না।

অনন্তকালের [illegible] উঠিল।• তিলোত্তমা [illegible] রার বিশাল ভাবের [illegible] কখনও যমুনা-তীরে, [illegible] দেখিয়া, কখনও বা পুস্তক [illegible] লোককে রঞ্জনের জন্য অনুরোধ [illegible] উঠিতে পারেন নাই।

এক দিন মধ্যাহ্ন সময়ে তিনি [illegible] পুস্তক লইয়া পাঠ করিবার চেষ্টা করিতেছেন [illegible] না। তিনি ধীরে ধীরে পুস্তক ত্যাগ করিয়া [illegible] আগরার বাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন [illegible] এই বিশাল সৌন্দর্য্য ভাল লাগিল না; তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া [illegible] স্থিত হইলেন।

সুকুমার শিল্পের যতদূর চরমোৎকর্ষ দেখান যাইতে পারে, প্রতাপের চিত্র গৃহে তাহার একত্র সমাবেশ হইয়াছিল। চিত্রগুলি বর্ণ রঞ্জিত হইলেও যেন প্রকৃত সত্য বলিয়া উপলব্ধি হইতেছিল। এই জন্যই বোধ হয় কবি ও চিত্রকরের মধ্যে বিশেষ বিভিন্নতা নাই।

রঞ্জনলাল চিত্রগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন; ইহাতে তাঁহার উদ্বেলিত হৃদয় কতক শান্ত হইল। চিত্র গৃহের চারিদিক বিচিত্র চিত্র ও দর্পণাদিতে পরিশোভিত। মধ্যস্থলে বিবিধ কারুকার্য্য খচিত সৌন্দর্য্যপূর্ণ আসন। দর্শক ক্লান্ত হইলে এই আসনে উপবেশন করেন। রঞ্জনলাল যে গৃহে ছিলেন, তাহার পার্শ্বেই একটী দ্বার—তৎ পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র গৃহ। এইটী প্রতাপের চিত্র গৃহ। এই গৃহে বসিয়া প্রতাপ আলেখ্য চিত্র করিতেন। রঞ্জনলাল চিত্র পরিদর্শন শেষ করিয়া পাশের ঘরে গেলেন—বন্ধুর চিত্রকার্য্য দেখিবেন এই সাধ। কিন্তু গৃহ মধ্যে প্রতাপ নাই, তাঁহার পরিবর্ত্তে অপর এক ব্যক্তি সেই গৃহে উপবিষ্ট।

এই লোকটী রঞ্জনের নিকট পরিচিত নহে। কেননা প্রতাপের বাটীতে থাকিয়া রঞ্জনের সহিত অনেকের আলাপ হইয়াছিল। রঞ্জন দেখিলেন লোকটি চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার সম্মুখে অর্দ্ধ চিত্রিত অপরিস্ফুট বর্ণ বিন্যস্ত এক বৃহৎ আলেখ্য। আশে পাশে কতকগুলি তুলিকা ও ফলিত রং পড়িয়া আছে। প্রতিকৃতি সম্পূর্ণ উঠে নাই। যাহা উঠিয়াছে, তাহা সেই আগন্তুকের প্রতিমূর্ত্তির অব্যক্ত ছায়া মাত্র।

রঞ্জনলাল লোকটাকে দেখিয়া বড় আশ্চর্য্য হইলেন। এ ব্যক্তি অতি দরিদ্র। ইহার শরীর আদ্যোপান্ত ছিন্ন ও মলিন বস্ত্রে আবৃত। দেখিলে বোধ হয় যেন মূর্ত্তিমান দারিদ্র্য আসিয়া প্রতাপের চিত্রশালায় বসিয়া রহিয়াছে।

আগন্তুকের অঙ্গরাখাটি সম্পূর্ণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মলিন। মাথায় একটি পাগড়ী আছে, তাহা আবার তদধিক বিবর্ণ—যত রাজ্যের ধূলা ময়লা তাহার মধ্যে। তাহার গলায় একছড়া তবলকীর মালা। পায়ের জুতা জোড়াটি শত জায়গায় তালি দেওয়া। হাতে একটি ভিক্ষা পাত্র। রঞ্জনলাল দেখিলেন এই ছিন্ন কন্থা ভিক্ষুকেরই প্রতিকৃতি চিত্রিত হইতেছে। প্রতাপ কি উন্মাদ? এই হতভাগ্য ভিক্ষুকের চিত্র কার্য্যে এত পরিশ্রম, বর্ণ ও তুলিকার অপব্যয় কেন?

রঞ্জন প্রতাপকে মনে মনে নিন্দা করিলেন। কিন্তু এই দরিদ্র আগন্তুকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেন না। তাহার কাছে উপবিষ্ট হইয়া মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভাই! প্রতাপ কোথায় বলিতে পার।"

ভিক্ষুক যে রঞ্জনলালকে তাঁহার গৃহপ্রবেশের আরম্ভ হইতে আদ্যোপান্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল, তাহা তিনি দেখিতে পান নাই; রঞ্জনের প্রশ্ন শুনিয়া তাহার দৃষ্টি নিম্নে সংযত হইল, ভিক্ষুক ধীরে ধীরে উত্তর করিল—

"প্রতাপ কে ?"

"কেন এই বাটীর অধিকারী—যিনি তোমার চিত্র করিতেছেন।"

"প্রতাপ. ক্রতাপ জানি না—তবে যে মহানুভব ব্যক্তি আজ আমায় দয়া করিয়া ডাকিয়া আনিয়াছেন, তিনিই বুঝি প্রতাপ।"

"হাঁ—হাঁ তিনিই। তিনিই তোমার চিত্র করিতেছেন। আচ্ছা তুমি না এই বলিলে, সে তোমায় ডাকিয়া আনিয়াছে, এতলোক থাকিতে তোমায় ডাকিল কেন, আর তোমার ছিন্ন কন্থাবৃত প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াই বা তাহার কি লাভ ?"

ভিক্ষুক ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"মহাশয়! আমি অতি দুর্ভাগ্যবান, আমার কথা শুনিলে আপনি অশ্রু সংবরণ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। আপনি বোধ হয় তাঁহার আত্মীয় হইবেন—সুতরাং তিনি আমায় কেন এখানে আনিয়াছেন [illegible] আপনাকে বলিতে আমার আপত্তি নাই।"

"বল ভাই বল—আমি তোমার দুঃখের কাহিনী শুনিব, আমিও [illegible] জন পথে পরিত্যক্ত ভিক্ষুক।"

ভিক্ষুক নিজের কাহিনী বলিতে লাগিল—"মহাশয় আমি এই [illegible] সম্ভ্রান্ত বণিক্ ছিলাম—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে এইরূপ পথের ভিখারি হইয়াছি। [illegible] সময়ে প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বাস করিতাম কিন্তু এখন দ্বারে দ্বারে [illegible] বেড়াই। শত শত লোককে অন্ন দিতাম, এখন নিজে একমুষ্টি অন্নের [illegible] যে সকল লোক আগে আমায় দেখিলে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিত, এখন [illegible] দেখিলে মুখ ফিরায়। ভিক্ষার জন্য তাহাদের দ্বারে গেলে দ্বার বন্ধ [illegible] আজ আমি চারি দিন অনাহারী। পথে পথে বেড়াইতেছি—এক মুষ্টিও ভিক্ষা [illegible] কাল সমস্ত রাত্রিটা অনাহারে উন্মুক্ত রাজপথে কাটাইয়াছি। ধনীর রাশিকৃত [illegible] অন্ন কুক্কুরের কুক্ষিগত হইয়াছে—কিন্তু আমি একমুষ্টি পাই নাই। নিজের জন্য [illegible] না কিন্তু আমার ন্যায় হতভাগ্যকেও পরমেশ্বর স্ত্রী পুত্র দিয়াছেন। তাহাদের জন্যই আমার যত ভাবনা। আজ মধ্যাহ্নে এই বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গৃহ-স্বামী দয়া করিয়া আমায় উপরে ডাকিলেন। বলিলেন দেখ—"তোমায় লইয়া আমার একটু কাজ হইবে—তোমায় আমি তৎপরিবর্ত্তে পারিশ্রমিক দিব। আমার চিত্র-শালায় সব চিত্রই আছে—কিন্তু দারিদ্রের চিত্র নাই। আগরা সহরে আমি এত দিন আছি কিন্তু তোমার ন্যায় দরিদ্রতার জীবন্ত মূর্ত্তি কখন কোথাও দেখি নাই। আমি তোমার চিত্র প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলে নিশ্চয়ই প্রচুর অর্থ পাইব, এবং তোমায় যথেষ্ট পুরস্কার দিব। কাজেই আমি এখানে বসিয়া আছি। ঐ দেখুন আমার চিত্র হইতেছে—"

রঞ্জনলাল একবার সেই চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন—পুনরায় ভিক্ষুকের

প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"ভাই! তবে তোমার এখনও কিছুই খাওয়া হয় নাই।"

"খাওয়া চুলোয় যাক্ জলস্পর্শ করি নাই।"

"তবে একটা কাজ কর—এখন চুপ করিয়া বসিয়া আছ—এখনত চিত্র হইতেছে না—তুমি এই কয়টি পয়সা লও। এই বাড়ীর পার্শ্বে এক দোকান আছে, সেখান হইতে কিছু মিঠাই কিনিয়া খাও। আমি নিজে দরিদ্র, যাহা কিছু আনিয়াছিলাম, সবই খরচ হইয়াছে—নিজের খরচের জন্য এই কয়টি পয়সা মাত্র ছিল। ভাই! দরিদ্রের দান অবহেলা করিও না। আমার মিব্য—তুমি এই কয়েকটি পয়সা লইয়া জল খাইয়া আইস।" এই কথা বলিয়া রঞ্জনলাল কয়েকটি পয়সা সেই ভিক্ষুকের হাতে গুঁজিয়া দিলেন।

রঞ্জনের এই দয়া দেখিয়া, হৃদয়ের অস্বাভাবিক উদারতা দেখিয়া ভিক্ষুকের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। তাহার মুখমণ্ডলে কৃতজ্ঞতার ভাব প্রকটিত হইল—সে পয়সাগুলি লইয়া বলিল—"মহাশয় আমায় ত সব দিলেন কিন্তু আপনি কাল কি করিবেন?"

"আমার জন্য ভাবিও না—কালকের উপায় কাল হইবে।"

"আচ্ছা আপনার দয়ার জন্ত শত শত ধন্যবাদ। এই পয়সায় আপনি আমাকে খাইতে বলিতেছেন কিন্তু ইহাতে আমাদের সপরিবারের একদিন চলিবে।"

"আচ্ছা তবে বাটী লইয়া যাইও। আমার আর কিছু নাই" রঞ্জনলালের দৃষ্টি সহসা তাঁহার অঙ্গুলির উপর নিপতিত হইল।

"আমার আর কিছু নাই—কিন্তু এখনও এই অঙ্গুরীয়কটি আছে, তুমি ইহা লও, ইহা বিক্রয় করিয়া যাহা হইবে, তাহাতেও তোমার কিছু সাহায্য হইবে।"

"না ও অঙ্গুরীয়ক আমি লইব না, আমি শত জন্ম অনাহারে মরি সেও ভাল, কিন্তু ও দুষ্কার্য্য আমার দ্বারা হইবে না।"

"ভাই! তুমি বুঝিয়া দেখ, আমার উপহার প্রত্যাখ্যান করিও না। এই অঙ্গুরীয়ক থাকিলে আমার কি বিশেষ উপকার হইবে? তার চেয়ে যদি তোমার কাজে লাগে ত তাহাতে আমার যথেষ্ট সুখ হইবে। জানত দাতা ইচ্ছা ও ক্ষমতানুসারে দান করেন। গৃহীতার মতামতের অপেক্ষা করেন না।

"ভিক্ষুক কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল—পরে বলিল, "আমি দরিদ্র সকলেই জানে, ইহা বিক্রয় করিতে গেলে রত্নবণিক নিশ্চয়ই আমায় ধরাইয়া দিবে।"

"না—তাহার কোন সম্ভাবনা নাই—উহার দাম তত বেশী নয় যে কেহ তোমায় সন্দেহ করিবে। যদি করে ত তাহাকে আমার কাছে লইয়া আইস।"

"আচ্ছা মহাশয়! যদি আপনি ইহাতে সন্তুষ্ট হন, তাহাই হইবে।"

প্রতাপ তখনও গৃহে প্রবেশ করেন নাই, তিনি অন্য গৃহে কার্য্যান্তরে ব্যস্ত

ছিলেন। রঞ্জনলাল ভিক্ষুককে "তুমি অপেক্ষা কর আমি আসিতেছি" বলিয়া গৃহ ত্যাগ করিলেন।

প্রতাপ ইহার কয়েক মুহূর্ত্ত পরে গৃহ প্রবেশ করিলেন। সেই ছিন্ন কন্থাবৃত ভিক্ষুককে সসম্ভ্রমে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "জাহাপনা! অধম বড়ই কষ্ট দিয়াছে, রঙ্গের সামঞ্জস্য না হওয়াতে বড় বিলম্ব হইল। গোস্তাকি মাপ করিবেন"—

"না—না—তোমার কোন গোস্তাকি হয় নাই, স্থির হও—যা প্রশ্ন করি, তার উত্তর দাও।" তোমার বাটীতে যে একটি যুবক আসিয়াছে, উটি তোমার কে?

প্রশ্ন শুনিয়া প্রতাপের মুখ শুষ্ক হইল, তিনি বিনীত ভাবে কহিলেন "সাহান সা—ভারতেশ্বরের নিকট কি সে ব্যক্তি কোন অপরাধ করিয়াছে"?

"হাঁ—সে যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, তাহার আর মার্জ্জনা নাই"।

প্রতাপের মুখ আরও শুখাইয়া গেল, তিনি কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক নত জানু হইয়া সহসা বসিয়া পড়িলেন। ভিক্ষুকবেশী ধীরে ধীরে প্রতাপকে উঠাইলেন, বলিলেন "প্রতাপ আমি জানিয়াছি, আগন্তুক তোমার বন্ধু, তুমিই সৌভাগ্যবান, তা না হইলে, তোমার অদৃষ্টে এমন বন্ধু লাভ ঘটিবে কেন? তোমার বন্ধুর হৃদয় অতি উদার, অতি প্রশস্ত, প্রচুর মহত্ত্ব পরিপূর্ণ। এই দেখ তাহার নিদর্শন"—বলিয়া তিনি নিজ হস্তের অঙ্গুরীয়ক দেখাইলেন।

প্রতাপ দেখিলেন অঙ্গুরীয়ক রঞ্জনলালের। তাহার অঙ্গুরীয় ইহাঁর হাতে কিরূপে আসিল, ইহা তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না। শুষ্কমুখে প্রতাপ বলিলেন "জাঁহাপনা দাস উপহাসের যোগ্য নহে, সুতরাং আপনি যে উপহাস করিতেছেন তা, ইহা স্থির নিশ্চয়। প্রকৃত কথা খুলিয়া বলুন, নচেৎ কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না।"

ভিক্ষুকবেশী রঞ্জনলালের সহিত তাঁহার যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, কেন রঞ্জন তাঁহাকে অঙ্গুরীয়ক দান করিয়াছেন, সমস্তই প্রকাশ করিয়া বলিলেন। প্রতাপ শুনিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভিক্ষুক চলিয়া গিয়াছেন, প্রতাপ একাকী বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়াছে; উদ্বেগে ললাটের শিরাগুলি স্ফীত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাদের সমতা হইয়াছে। তিনি আপনা আপনি বলিতেছেন—"নির্ব্বোধ রঞ্জনলাল করিয়াছ কি? সমগ্র হিন্দুস্থান যাঁহার পদতলে—গোলকুণ্ডার হীরকের খনি যাঁহার ঐশ্বর্য্যের শতাংশের একাংশ, যিনি সময় বিশেষে, শত সহস্র, লক্ষাধিক স্বর্ণ রজত মণিমুক্তাদিতে তৌলিত হয়েন, তাঁহাকে তুমি দরিদ্র ভাবিয়া কয়েক খণ্ড তাম্র মুদ্রা দিয়াছ—ইহা অপেক্ষা তোমার বেশী প্রগল্‌ভতা আর কি হইতে পারে। যাঁহার

কৃপা কটাক্ষ পাইবার জন্য শত শত রাজন্যবর্গ আগ্রহের সহিত আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে কি না সামান্য ধাতুময় অঙ্গুরীয়ক দিয়া কৃপা দেখাইয়াছ—”

এই সময়ে রঞ্জনলাল একখানি পাত্রে করিয়া কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য আনিয়া প্রতাপকে সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভাই! সেই দরিদ্র ভিক্ষুক কোথায় গেল? সে অনাহারে তিন দিন কষ্ট পাইয়াছে বলিয়া আমি তাহার জন্য এই খাবার আনিয়াছি”

প্রতাপ বলিলেন—“রঞ্জন তুমি সর্ব্বনাশ করিয়াছ ভাই? একটুও বুদ্ধি নাই তোমার”

“কেন ভাই কি করিয়াছি—এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি? কই—না কিছুই ত করি নাই—তবে খাবার কিনিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছে। আমি বাজারে গিয়াছিলাম, কাজেই বিলম্ব হইয়াছে। তোমার চাকরদের পাঠাইলেত ভাই আরও দেরি হইত, যাক ও কথা, এখন সে ভিক্ষুক গেল কোথায়?

“রঞ্জন! তুমি কি বাতুল? তুঙ্গ শৃঙ্গ হিমাচলকে তা না হইলে মানুষ বলিবে কেন? যাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য, শত শত রাজন্যবর্গ যাঁর পদানত, হিন্দুস্থান যাঁর অসির ঝনঝনাতে শশব্যস্ত, সেই রাজার রাজা—সম্রাটের সম্রাটকে তুমি ভিক্ষুক বলিবে কেন?”

রঞ্জন এসব কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন—“ভাই? কেন বৃথা রহস্য করিতেছ—এখন রহস্যের সময় নয়, কোথায় সেই অনাহারী দরিদ্র ভিক্ষুক, বলিয়া দাও, আমি তাহাকে এইগুলি খাওয়াইয়া নিশ্চিন্ত হই।”

“সেই ভিক্ষুক এতক্ষণে যেখানে গিয়াছে, সেখানে প্রবেশ করিতে গেলে, হয়ত তোমার মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইবে।”

রঞ্জনলাল এ কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—কি যেন, কেমন হইয়া গেলেন। তখন প্রতাপ উত্তর করিলেন—“ভাই রঞ্জন আমি তোমার সহিত রহস্য করিতেছি না—যাহা প্রকৃত সত্য তাহাই বলিতেছি, তুমি যাহাকে ভিক্ষুক ভাবিয়াছ, তিনি বাস্তবিক ভিক্ষুক নহেন—তিনি স্বয়ং ছদ্মবেশী সম্রাট আকবর সাহ—”

আকবর সাহের নাম উচ্চারিত হইবামাত্রই রঞ্জনলাল মন্ত্রৌষধি, রুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্চল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রচুর স্বেদ নিঃসরণ হইতে লাগিল—মুখমণ্ডল মলিন হইয়া গেল—খাদ্যপাত্র হস্তচ্যুত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িল। কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন, তাঁহার মনে এ সমস্ত রহস্য বলিয়া বোধ হইল—একবার তিনি প্রতাপের মুখের দিকে চাহিলেন। প্রতাপও তাহার ন্যায় নিশ্চল ও স্থির! তবে ত প্রতাপ সত্য কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু সন্দেহ এই—আকবর সাহ এখানে আসিবেন কেন?

প্রতাপ রঞ্জনের মনের ভাব মুখে দেখিতে পাইলেন। বলিলেন—“ভাই! ভাবিতেছ আকবর সাহ এখানে আসিবেন কেন? আসিবার কারণ আছে। তুমি বোধ

হয় জান আমি বাদসাহের প্রধান চিত্রকর। বাদসাহের জীবনের প্রত্যেক সুখ ঐশ্বর্য্যের সময় তাঁহাকে কিরূপ দেখায়, তাহার সমস্ত অবস্থাই আমি চিত্রিত করিয়াছি। বাদসাহের সখ্ হইয়াছিল, ভিক্ষুকবেশে তাঁহাকে কিরূপ দেখায়, তাহা জানিবার জন্য। তাই তিনি আজ ভিক্ষুকবেশে আমার গৃহে আসিয়াছিলেন। কেবল আজ নয়—আজ তিন দিন এইভাবে আসিতেছেন। ভিক্ষুকবেশ আমিই তাঁহার জন্য সংগ্রহ করিয়াছি। তোমার সহিত তাঁহার যে সমস্ত কথা হইয়াছিল, সমস্তই তিনি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। তোমাকে একখানি পত্র দিয়াছেন, এই লও—"

রঞ্জনলাল পত্র পড়িবেন কি—তাঁহার তালু শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, মস্তিষ্ক ঘুরিতেছিল। তিনি স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেন কি জাগ্রত সত্যে পরিবেষ্টিত ছিলেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না।

প্রকৃতিস্থ হইয়া রঞ্জনলাল বাদসাহের পত্র পাঠ করিলেন। পত্রে লেখা ছিল—

"মহানুভব বন্ধো!

আগামী কল্য রাত্রে দরিদ্র ভিক্ষুকের কুটীরে পদার্পণ করিলে বড়ই প্রীত হইব। চিহ্নস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়ক রাখিয়া গেলাম। ইহার পর যাহা কর্ত্তব্য, প্রতাপ বলিয়া দিবেন।

জালাল উদ্দিন আকবর"

এ কি প্রহেলিকা! না জাগ্রত স্বপ্ন! রঞ্জনলাল ভাবিতে লাগিলেন—"আগরার প্রকাণ্ড লোহিত প্রস্তরময় দুর্গই কি ফকিরের কুটীর"।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তার পর দিন কাটিয়া গেল। সন্দেহে, বিস্ময়ে, আবেগে, উৎকণ্ঠায়, কৌতুহলে রঞ্জনলাল সে দিন কাটাইলেন। সন্ধ্যার পর প্রতাপ বলিলেন "রঞ্জন! বাদসাহের সহিত সাক্ষাতের জন্য যাত্রা কর, এই উপযুক্ত সময়। আমি তোমাকে দুর্গ দ্বার পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিব। দুর্গ দ্বারে একজন তাতার দেশীয় খোজা তোমার জন্য অপেক্ষা করিবে—এই অঙ্গুরীয়ক তাহাকে দেখাইলেই সে তোমায় বাদসাহের নিকট লইয়া যাইবে, বাদসাহের এই নিদর্শন লও" বলিয়া আকবর সাহের নামাঙ্কিত এক বহুমূল্য অঙ্গুরীয়ক তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই প্রতাপের সহায়তায়, উপযুক্ত পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া দুইজনে দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দুর্গদ্বারে এক তাতার বালক রঞ্জনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বালক দুইজন আগন্তুক দেখিয়া বলিল—"নিদর্শন কই? একজনের বেশী প্রাসাদের মধ্যে লইয়া যাইবার হুকুম নাই।"

প্রতাপ বলিলেন—"আমি যাইব না, ইনিই সঙ্গে যাইবেন।" প্রতাপ চলিয়া গেলেন।

রঞ্জনলাল "দর্শন দরওয়াজা" দিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কি ভয়ানক উন্নত তোরণ ! ! উপরে দেখিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়। তোরণের আদ্যোপান্ত লোহিত প্রস্তর খণ্ডে গ্রথিত, দ্বারে ভীমকায় প্রহরীগণ উন্মুক্ত তরবারি হস্তে পাহারা দিতেছে। দরওয়াজার পর হইতে পথ ক্রমশঃ উচ্চ হইয়াছে, রঞ্জনলাল এই উচ্চ পথ ধরিয়া কিয়দ্দূর অতিবাহিত করিয়া এক প্রকাণ্ড সৌধের নিকট উপস্থিত হইলেন। সৌধের অতুল সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক। মহলের প্রবেশ দ্বারে প্রহরী নিদর্শন চাহিল, তাতার বালক অঙ্গুরীয়ক দেখাইলে তাহারা দ্বার ছাড়িয়া দিল।

রঞ্জন ভাবিলেন এ কি ! কোথায় আসিলাম—এমন মনোহর পুরীত কোথাও দেখি নাই ! শত শত খিলানে, সহস্র সহস্র স্তম্ভে প্রাসাদের অতুল সৌন্দর্য্য। চারিদিকে সুগন্ধময় দীপাবলি জ্বলিতেছে—দালানের দুই পাশে, খিলানের নিম্নে নানাবিধ প্রস্তর খচিত প্রতিমূর্ত্তি ভাস্করের কারু কার্য্যের জীবন্ত দৃষ্টান্তরূপে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাতার বালক বলিল "এই মহলের নাম "যোধবাই মহল"। বাদসাহের প্রধান রাজ্ঞী যোধবাই—কুমার সেলিমের গর্ভধারিণী এই প্রাসাদে বাস করেন। ইহা প্রাসাদের বহির্ব্বাটী।" কিয়দ্দূর আসিয়া বালক বলিল "মহাশয় দাঁড়ান"। রঞ্জনলাল দাঁড়াইলেন, সে একখানি রেশমী রুমালে তাঁহার চক্ষুদ্বয় আবদ্ধ করিল। রঞ্জন প্রাসাদের সৌন্দর্য্য দর্শনে বঞ্চিত হইলেন বলিয়া বড়ই সংক্ষুব্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কতক্ষণ এইরূপ অন্ধের ন্যায় থাকিতে হইবে ?"

তাতার বালক হাসিয়া উত্তর করিল "বাদসাহের হুকুম এ মহলে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ—আপনাকে কেবল এই উপায়ে লইয়া যাইবার আদেশ হইয়াছে। এই মহল পার হইলেই আবার চক্ষু খুলিয়া দিব"। রঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহা ব্যতীত কি আর পথ নাই ?"

"পথ থাকিবে না কেন—শত সহস্র। কিন্তু বাদসাহ সন্ধ্যার পর "দেওয়ানখানে" অবস্থান করেন—তাই আপনাকে এই পথে লইয়া যাইতে আদিষ্ট হইয়াছি।" রঞ্জনলাল বিনা বাক্যব্যয়ে মহল পার হইলেন। মহল পার হইয়াই এক প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ—বালক সেইখানে তাঁহার চক্ষু খুলিয়া দিল।

রঞ্জনলাল দেখিলেন এক অপূর্ব্ব বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, বোধ হয় তাহাতে দুই সহস্র লোকের সমাবেশ হইলেও অকুলান হয় না। প্রাঙ্গণের চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতাবিতান। লতা বিতানে শত সহস্র সুগন্ধি কুসুম ফুটিয়া চারিপার্শ্ব আমোদিত করিতেছে। মাঝে মাঝে মর্ম্মর প্রস্তরময় বসিবার আসন, বিস্তৃত রত্নবেদী। রত্নবেদীর আশে পাশে ছায়াময় ফল ফুলপূর্ণ বৃক্ষরাজি ; তাহাদের শাখায় শাখায় পিঞ্জরাবদ্ধ শুক, শারী, হীরামন প্রভৃতি নিজ নিজ বুলি বলিতেছে; স্থানে স্থানে ফোয়ারা হইতে মৃদু মধুর শব্দে জলোচ্ছ্বাস হইতেছে—কোথায় বা কৃত্রিম পুষ্করিণীতে হংস,

বক, সারস, ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি বিচরণ করিতেছে—কোথাও বা ময়ূরগণ শত শত চন্দ্রকখচিত পক্ষরাশি বিকশিত করিয়া নৃত্য করিতেছে। তাহার মধ্যে একটি বৃক্ষের মূলভাগ সুন্দর মণি খচিত প্রস্তর বেষ্টিত। তাহার উপর একখানি বিচিত্র আসন পাতা রহিয়াছে। আসনের উপর কতকগুলি পণ্যজাত, ঈষৎ মলিন ও ধূলি-সিক্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে একখানি রত্নখচিত শিবিকা, আর সেই শিবিকার পার্শ্বে একটি উন্নত [illegible] উপর বাদসাহের পুরাতন উষ্ণীষ। সেই স্থানের চারিদিকে [illegible] বৃক্ষের আশেপাশে সুরভি কুসুম মালায় বেষ্টিত হইয়া [illegible] করিতেছে। চারিদিকে তাতার রমণীগণ [illegible]

রঞ্জনলাল সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"[illegible]

তাতার বালক বলিল—"[illegible] সাহের সহিত যোধপুর রাজকুমারীর [illegible] কার আসিয়াছিলেন, সেই শিবিকা [illegible] বহুমূল্য বস্ত্রখণ্ডের উপর সজ্জিত হইয়া [illegible] বিক্রীত হইতে আসিয়াছিল। আর ঐ যে [illegible] উষ্ণীষ আকবর সাহ যোধপুর রাজকুমারীর [illegible] ছিলেন। রঞ্জনলাল এই সব শুনিতে শুনিতে [illegible] এই প্রাঙ্গণে কতই না সমারোহ হয়? প্রাঙ্গণ পার হইয়া [illegible] দৃষ্ট হইল, বালক রঞ্জনলালকে লইয়া সেই ফটকে প্রবেশ [illegible]

ফটকের প্রথমটা বড় অন্ধকার। রঞ্জনের অন্ধকারে [illegible] তাতার বালক তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। [illegible] আলোক পাইলেন। এইখানে শাণিত বর্ষাফলক হস্তে [illegible] প্রহরীর কার্য্য করিতেছে।

বালক বাদসাহের নিদর্শন দেখাইয়া তাহাদের চুপি চুপি কি বলিল, রঞ্জন [illegible] শুনিতে পাইলেন না কিন্তু বুঝিলেন তাঁহারই কথা হইতেছে। কথা শেষ হইবার [illegible] একজন প্রহরী আঙ্গরাখা হইতে স্বীয় রুমাল লইয়া তাঁহার চক্ষু বদ্ধ করিল, এবং এক ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া বলিল—"ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করুন। কোন প্রকারে ভয় পাইবেন না বা নড়িবেন না। ভয় পাইবেন বলিয়া আমি চক্ষু বাঁধিয়া দিয়াছি।"

রঞ্জন তাহাদের আদেশ ক্রমে সেই স্থানে বসিবামাত্রই আসনটি সহসা নড়িয়া উঠিল, ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। রঞ্জনলাল ঘোর অন্ধকার মধ্যে একবার চক্ষুর বাঁধন খুলিলেন, দেখিলেন চারিদিকে সূচীভেদ্য নিবিড় অন্ধকার। তিনি সেই

অন্ধকারের মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছেন। উপরে অন্ধকার, নীচে অন্ধকার, চারি পার্শ্বে অন্ধকার। রঞ্জন ভাবিলেন অন্ধকারেই সমাধি হইবে না কি? তিনি পুনরায় চক্ষু আবরণ করিলেন।

খানিক দূর উঠিয়া উঠা বন্ধ হইল। তীব্র আলোকচ্ছটা রঞ্জনলালের আবদ্ধ চক্ষুর মধ্যদিয়া চারিদিকে সঞ্চারিত হইল। রঞ্জনলাল দেখিলেন একটি বিস্তীর্ণ কক্ষে উত্তীর্ণ হইয়াছেন—চারিদিকে দুগ্ধফেণনিভ মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা সমাবৃত—স্তম্ভ, খিলান, ছাদ সবই উজ্জ্বল মর্ম্মরময়। তাহাতে শত সহস্র আলোকচ্ছটা পতিত হইয়া তাহা আরও মনোরম দেখাইতেছে। খিলান হইতে বড় বড় স্বর্ণমণ্ডিত দণ্ডে স্ফটিক দীপ রাজি স্নিগ্ধভাবে চারিদিকে সুগন্ধ বিকীরণ করিয়া জ্বলিতেছে—গৃহের আশে পাশে চারিদিকে নানাবিধ সুন্দর আলেখ্য—আলেখ্যের নিম্নে স্তম্ভের গাত্র লোহিত বর্ণ রত্ন রাজি খচিত মখমল দ্বারা মণ্ডিত—ভিত্তিমূল নানাবিধ বহুমূল্য প্রস্তরের লতাপাতা ফল পত্রাদিতে পরিশোভিত। স্তম্ভে স্তম্ভে নাগকেশর, গন্ধরাজ, গোলাপ, চম্পক, যুথী, চন্দ্রমল্লিকার মালা ঝুলিতেছে। হর্ম্ম্যতল এক লোহিত বর্ণ বসোরার গালিচায় মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। গৃহের চারিদিকে সুবৃহৎ মুকুররাজি। সেই মুকুরে সেই সমস্ত কক্ষের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। হর্ম্ম্যের মধ্যস্থলে নানাবিধ বিচিত্র আসন ইতস্ততঃ সংন্যস্ত রহিয়াছে। আসনের পার্শ্বে লোহিত প্রস্তরময় ফুলদানে ফুলের তোড়া। সকলের মধ্যে এক দ্যুতিময় রাজসিংহাসন। তাহাতে কত শত মণিমুক্তা জ্বলিতেছে।

রঞ্জনলাল এই সমস্ত দেখিয়া আত্মহারা হইলেন। তিনি আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিলেন—ভাবিলেন আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি! একবার করদ্বয় দ্বারা চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া দেখিলেন—বাস্তবিক ঘুমের ঘোর নয়। তবে কি মস্তিষ্কেরই বিকৃতি ঘটিল? না সন্ধ্যার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সবই ত মনে পড়িতেছে!

রঞ্জনলাল ধীরে ধীরে এক পদ অগ্রসর হইয়া গালিচার উপর দাঁড়াইলেন—কক্ষ নির্জ্জন কেহই নাই, কেবল দীপের আলো—মুকুরের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব—মণিমুক্তার ঝলসিত অঙ্গ জ্যোতিঃ ভিন্ন আর কিছুই নাই। তিনি আর একটু অগ্রসর হইলেন—মুকুরে তাঁহার প্রতিবিম্ব পড়িল—একা রঞ্জনলাল আটটি হইয়া পড়িয়াছেন—ভাবিতেছেন কি করি, এমন সময়ে মুকুরে আর একটি প্রতিবিম্ব পড়িল। এ মূর্ত্তি যে তাঁহার পরিচিত। মূর্ত্তি দেখিয়া রঞ্জনলাল শিহরিয়া উঠিলেন—স্তম্ভিত হইয়া স্থির নেত্রে দেখিতে লাগিলেন সেই মূর্ত্তি তাঁহার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া মূর্ত্তি স্থিরভাবে তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল, বলিল—"বন্ধু তুমি আসিয়াছ দেখিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। বোধ হয় আসিবার সময় কোন কষ্ট হয় নাই, যদি কিছু হইয়া থাকে তজ্জন্য কিছু মনে করিও না—"

রঞ্জনলাল ভাবিলেন এ স্বপ্ন নয়। এ যে কঠোর সত্য—সত্য অপেক্ষাও পরিস্ফুট।

দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এ মূর্ত্তি কার ? এ যে সেই ভিক্ষুক মূর্ত্তি ! ! প্রতাপের গৃহে আলেখ্য মধ্যে যে ভিক্ষুক চিত্রিত হইতেছিল—এ যে সেই ভিক্ষুক ! ভিক্ষুক যে আর কেহই নহেন—স্বয়ং ভারতেশ্বর আকবর সাহ !

দর্পণে সেই ভিক্ষুক মূর্ত্তি দেখিয়া রঞ্জন ভাবিতেছিলেন—ঐশ্বর্য্য যেন দারিদ্র্যের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—প্রমোদ কানন যেন শ্মশানের ভাব ধরিয়াছে—তেজ যেন ধূমাচ্ছাদিত হইয়াছে—দীর্ঘকায় পর্ব্বত যেন তুষারের মলিন আচ্ছাদনে ভূষিত হইয়াছে, সুখ যেন দুঃখকে আলিঙ্গন করিয়াছে।

মূর্ত্তি আরও নিকটস্থ হইল। রঞ্জন আর থাকিতে পারিলেন না, নতজানু হইয়া, ঊর্দ্ধ মুখে, যুক্তকরে বলিতে লাগিলেন—"সাহান সা অধমের সহিত এ বিড়ম্বনা কেন ? তুচ্ছাদপি তুচ্ছের সহিত এ কঠোর রহস্য কেন ? দরিদ্রকে বন্ধু সম্বোধন কেন ? না বুঝিতে পারিয়া যে দোষ করিয়াছি—তাহা কি হিন্দুস্থানের গৌরব স্বরূপ আকবর সাহের নিকট উপেক্ষণীয় নহে ?"

"কে বলিল আমি আক্‌বর সাহ ? হাঁ তবে আমি আকবর সাহকে চিনি বটে—তিনি আমার পরম বন্ধু বটেন। এখানে তিনি এখন উপস্থিত নাই। একটু পরেই এই গৃহে আসিবেন। আইস ভাই তুমি এই আসনে উপবেশন কর।"

আবার ভ্রম—আবার বিস্মৃতি—আবার প্রহেলিকা। রঞ্জনলাল সন্দেহে পড়িলেন। ভাবিলেন তবে কি ভিক্ষুক আকবর সাহ নহেন—প্রতাপ কি আমায় রহস্য করিয়াছে ? রঞ্জন স্থির, নিস্তব্ধ, নির্ব্বাক হইয়া চিত্রপুত্তলীর ন্যায় ভাবিতে লাগিলেন। ভিক্ষুক ধীরে ধীরে প্রতাপের হস্ত ত্যাগ করিয়া আবার সেই দর্পণ রাশির মধ্যে দিয়া অপসৃত হইল।

সেই বিশাল সুসজ্জিত শিল্পখচিত, মখমল মণ্ডিত হিরণ্যময় দীপালোকিত কক্ষে দাঁড়াইয়া একমাত্র রঞ্জনলাল, আর তাঁহার পার্শ্বে ঘোর নিস্তব্ধতা ! ! সহসা আর এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া ধীরে ধীরে দাঁড়াইল। তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না।

এবার ছিন্নকন্থা স্বর্ণ ও হীরক খচিত বাসে পরিভূষিত, শূন্য মস্তকে দীপ্তিমান উষ্ণীষ, মলিন বস্ত্রাবৃত কটিদেশে মণিখচিত তরবারি, কর্ণে সুন্দর মুক্তাময় বীরবৌলি, মুখে তেজ, প্রতিভা, দীপ্তি, ঐশ্বর্য্য একাধারে বিরাজমান।

এবার এই আশ্চর্য্য মূর্ত্তি সমুখীন হইয়া [illegible] ধীরে ধীরে এক আসনের নিকট উপস্থিত হইল—তাহাকে উপবেশন [illegible] ধীরে ধীরে তাঁহার হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিল—"রঞ্জনলাল, আর আমি তোমায় কুহেলিকাবৃত রাখিব না—আর তোমার সন্দেহের কষ্ট দিব না কিন্তু তোমায় আমার একটি অনুরোধ রাখিতে হইবে,—আমি যাহা বলিব বা করিব তাহা তোমার বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করিতে হইবে। তুমি অতি দরিদ্র ভাবিয়া যাহাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার

করিয়াছিলে, তাহাকে ধনী বলিয়া জানিতে পারিলেও সেইরূপ স্বীকার করিতে হইবে।" আমার পরিচয় শুন—আমার নামই জালাল উদ্দিন আকবর। আমিই ভিক্ষুকবেশে হইবার জন্য চিত্রকর প্রতাপের গৃহে গিয়াছিলাম—সেইখানেই তোমার অমূল্য বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি পাইয়াছি।"

"পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আমার ন্যায় অধমের প্রতি এই বিশাল হিন্দুস্থানের শাসন ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। আমি হিন্দুস্থানের প্রজার অধীশ্বর নহি—বস্তুত তাহাদের দাস মাত্র। দোষের দণ্ড দেওয়া আমার যেমন কর্ত্তব্য কার্য্য, গুণের পুরস্কারও তদ্রূপ উপযুক্ত কর্ত্তব্য। রঞ্জনলাল! পরমেশ্বর তোমায় অনেক অমানুষিক গুণাবলী দ্বারা শোভিত করিয়াছেন—তোমাতে যাহা আছে, হয়তঃ আমাতে তাহা নাই। আমি তোমার গুণের পুরস্কার করিব।"

"যাও, পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে তোমার জন্য লোক অপেক্ষা করিতেছে—সেখানকার যাহা কর্ত্তব্য তাহারাই বলিয়া দিবে।"

রঞ্জন মন্ত্রমুগ্ধবৎ বাদসাহের আদেশ পালন করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে বহু মূল্য বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া আসিয়া বাদসাহের পাদমূলে বসিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু সম্রাট পুনরায় তাঁহাকে নিজের আসনে হাত ধরিয়া বসাইলেন। বাদসাহ আবার বলিতে লাগিলেন—

"রঞ্জন! তোমার জীবনের সমস্ত ঘটনা আমি প্রতাপের মুখে শুনিয়াছি; তোমার আগরায় আসিবার কারণও শুনিয়াছি। যাহাকে তুমি হৃদয় সমর্পণ করিয়াছ—যাহার জন্য তুমি এই বিশাল সমুদ্রে ভাসিয়াছ, যাহার জন্য তোমার মনের সুখ গিয়াছে—তাহাকে তোমার সহিত আমি অগ্রে মিলিত করিব। তিলোত্তমার সহিত আমি তোমার বিবাহ দিব। ধনশ্রী আমার আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহস করিবে না—বরঞ্চ আপনাকে সৌভাগ্যবান জ্ঞান করিবে। আর একটি কথা—আগরায় তোমার বিবাহ হইবে। আমি স্বয়ং সেই বিবাহ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিব ও তোমার যৌতুক দিব। ইহাতে অস্বীকৃত হইলে আমার মর্ম্ম পীড়া হইবে। আমি আজ হইতে তোমাকে পাঁচ হাজারি মনসবদারের পদে উন্নীত করিলাম—রাজা টোডরমল্ল কাল তোমার নামে নিয়োগপত্র পাঠাইয়া দিবেন।" কথা শেষ হইল। রঞ্জন নিস্তব্ধ ও নির্ব্বাক—কিন্তু তাঁহার হৃদয় কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। তাঁহার ন্যায় সামান্য দাসানুদাসের প্রতি বাদসাহের এত অনুগ্রহ, এই ভাবিয়া তিনি আকবরের উদারতায় বিস্মিত হইতে লাগিলেন।

বাদসাহ বলিলেন "রঞ্জন, এই মণিহার আমি বন্ধুত্বের চিহ্ন স্বরূপ তোমার গলদেশে অর্পণ করিলাম। ভরসা করি এই সামান্য উপহার তুমি কখনও বিস্মৃত হইবে না।" বলিয়া বাদসাহ স্বহস্তে মণিময় হার তাঁহার গলদেশে শোভিত করিয়া দিলেন।

বাদসাহ আবার বলিলেন—"রঞ্জন রাত্রি হইয়াছে—আজ এই পর্য্যন্ত, আবার সাক্ষাৎ হইবে। তুমি যে স্থান দিয়া আসিয়াছ, চল সেইখানে তোমায় পৌঁছাইয়া দি—।"

রঞ্জনলালের চক্ষে কৃতজ্ঞতার অশ্রু বহিতে লাগিল। আকবরের দেবতুল্য উদারতা দেখিয়া তিনি অতিশয় বিস্মিত হইলেন। নতজানু হইয়া বাদসাহের বস্ত্র প্রান্ত চুম্বন করিলেন—তাঁহার মুখে কথা ফুটিল না।

বাদসাহ বলিলেন "বন্ধো! তোমার দরিদ্র বন্ধু জালাল উদ্দিন যেন তোমার স্মৃতি পথ হইতে, তোমার পূর্ব্ব দুঃখের মধ্যে কখনও যেন বহির্ভূত না হয়—এই তাহার শেষ অনুরোধ।"

বাদসাহ রঞ্জনকে সেই আসন দেখাইয়া দিলেন। রঞ্জন তাহাতে বসিবামাত্র তিনি সহসা অদৃশ্য হইলেন এবং সেই উজ্জ্বল দীপাবলী সহসা নির্ব্বাণ হইল। রঞ্জনের উজ্জ্বল স্বপ্ন আবার অন্ধকারে ডুবিল।

রঞ্জনলাল সেই দিন প্রভাতে প্রতাপের বাসায় আসিয়া পৌছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বাসায় আসিয়া প্রতাপকে সকল কথা বলিয়া রঞ্জনলাল হাঁফ্ ছাড়িলেন। সকল কথা শুনিয়া বন্ধুর এই অসম্ভবনীয় অদৃষ্ট পরিবর্ত্তনে প্রতাপ অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন। রঞ্জনলাল মন্সবদার হইয়াছেন শুনিয়া তাহার আনন্দরাশি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

ঠিক মধ্যাহ্ন সময়ে বাদসাহের চারিজন অশ্বারোহী প্রতাপের বাসায় আসিয়া পৌছিল। তাহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল "এখানে রঞ্জনলাল বলিয়া কোন ব্যক্তি আছেন কি না"। প্রতাপ নীচে আসিলেন, তাহারা রক্তবর্ণ বস্ত্র মণ্ডিত কতকগুলি কাগজ তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। তিনি সেইগুলি লইয়া উপরে গেলেন, অশ্বারোহীরাও সেলাম জানাইয়া প্রস্থান করিল।

রক্তবর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদনী খোলা হইল, তাহার ভিতর একখানি ফারমান ও অপরখানি আদেশ পত্র। দুই খানিই আকবরের নামাঙ্কিত ও রাজা টোডরমল্লের সহি সম্বলিত। তাহার মধ্য হইতে একখানি পত্রও বাহির হইল, পত্রখানি এই—

১। সাহান সা, পরম গৌরবান্বিত হিন্দুস্থানের জলন্ত সূর্য্য স্বরূপ আকবর সাহের আদেশ ক্রমে আমি আপনাকে জানাইতেছি, অদ্য হইতে আপনি বাদসাহের সরকারে তৃতীয় শ্রেণীর মনসবদারের পদে উন্নীত হইলেন। বাদসাহ আপনার বাসের জন্য আগরার সেলিমবাগ নামক উদ্যান-বাটী নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।

২। এই পদের মর্য্যাদানুরূপ জায়গীর আপনি স্বদেশেই হউক, বা অন্য কোন স্থানেই হউক, ইচ্ছা করিলেই পাইবেন। জায়গীরের বার্ষিক আয় দেড় লক্ষ টাকা। আপনার মতামত জানাইলে সরকার হইতে আমি আমিন পাঠাইয়া নিশানদিহী করিয়া দিব।

৩। সম্মানের চিহ্ন স্বরূপ বাদসাহ আপনাকে একপ্রস্থ বহুমূল্য পোষাক, একখানি তরবারি ও একখানি ঝালরদার পাল্কী দিবেন। এই সমস্ত বস্তু আপনার বিবাহের পর প্রকাশ্য দরবারে আপনি পাইবেন।

৪। সরকারের মুকিম এলাহাবাদ ছত্রপটী নিবাসী ধনশ্রী শ্রেষ্ঠীর উপর সরকার হইতে হাজিরা পরওয়ানা গিয়াছে। সেই পরওয়ানানুসারে ধনশ্রী দাস এই সপ্তাহের মধ্যেই আগরায় পৌছিবেন। তাহার পর সেলিমবাগে আপনার বিবাহ উৎসব সম্পাদিত হইবে।

৫। আপনার বিবাহের দিন সরকার হইতে অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু আমীর ওমরাহ নিমন্ত্রিত হইবেন। অম্বররাজ মানসিংহ ও আমি উপস্থিত থাকিয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করাইব এবং স্বয়ং বাদসাহ বরকর্ত্তার কার্য্য করিবেন।

৬। আপনাকে প্রকাশ্য দরবারে সনন্দ না দেওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন আপনার "আমখাসে" উপস্থিত হইবার আবশ্যকতা নাই।

সহী—শ্রীতোডর মল্ল।

পত্রখানি পাঠ সমাপ্ত হইলে প্রতাপ রঞ্জনের গলা জড়াইয়া বলিলেন "ভাই! সার্থক তুমি, ধন্য তোমার হৃদয়ের উদারতা, যথার্থ গুণের পুরস্কার তুমিই লাভ করিলে।" সেই রাত্রি দুই বন্ধুতে বড়ই সুখে কাটাইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বাদসাহের পরওয়ানা পাইয়া ধনশ্রী তিলোত্তমাকে লইয়া আগরায় উপস্থিত হইলেন। তিলোত্তমা আসিয়াছে শুনিয়া রঞ্জনের হৃদয় শতগুণ স্ফীত হইয়া উঠিল। সে দিন রাত্রে আনন্দে তাঁহার নিদ্রা হইল না।

বাদসাহের আদেশ ক্রমে বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হইল। ধনশ্রী বাদসাহের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া প্রতাপের বাসায় রঞ্জনের সহিত দেখা করিলেন। ধনশ্রীর মুখে আর আনন্দ ধরে না—তিনি রঞ্জনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন "বৎস! আমি তোমার প্রতি অতিশয় অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। তুমি এরূপ ভাবিও না যে তোমার ঐশ্বর্য্য হইয়াছে বলিয়া আমি তোমায় স্তোক বাক্যে ভুলাইতে আসিয়াছি। তোমার আসার পর আমার তিলোত্তমার দশা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। আমি যে কন্যাকে ফিরিয়া পাইব এমত আশা আমার ছিল না। বাদসাহ না বলিলেও আমি তোমার সহিত কন্যার বিবাহ দিতাম। আমি তোমায় পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছি—বোধ হয় আমার উপর তুমি এই কঠোর ব্যবহার জন্য কোনরূপ কষ্ট হও নাই।"

রঞ্জনলাল তাঁহাকে আর বলিতে দিলেন না। ধনশ্রীর পদধারণ করিয়া তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

* * * * *

বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে—সেলিমবাগে তাহার আয়োজন চলিয়াছে। শুভ দিন উপস্থিত হইল, রঞ্জনলাল শুভক্ষণে শুভ মুহূর্ত্তে তিলোত্তমার সহিত মিলিত হইলেন।

সে মিলনের আনন্দ কেবল নব পরিণীত দম্পতিই যে উপভোগ করিলেন, এমত নহে—স্বয়ং বাদসাহ সেই বিবাহে উপস্থিত হইয়া আনন্দে মাতিলেন এবং যৌতুক স্বরূপ বর কন্যাকে নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করিলেন।

বিবাহের উৎসব শেষ হইলে রঞ্জনলাল প্রকাশ্য দরবারে "মনসবদারের" পদে অভিষিক্ত হইলেন। পরে বাদসাহের নিকট অনুমতি লইয়া কয়েক দিনের জন্য ধনশ্রী ও তিলোত্তমার সহিত আলাহাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। একদিন আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে—যমুনা-বক্ষস্থ তরঙ্গরাজিতে তাহার জ্যোতিঃ শত শত আয়নায় মণির ন্যায় খেলা করিতেছে। প্রস্তরময় সোপানরাজি, বলুকাময় নদী সৈকত জ্যোৎস্নায় হাসিতেছে—মাঝে মাঝে এক একটি পাপিয়া দিবাভ্রমে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে—এমন সময়ে দুইজন সেই যমুনা তীরস্থ সোপানরাজিতে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদের মুখে চন্দ্রের আলোক পড়িল। একজন অপরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—রঞ্জন! সেই একদিন, আর এই এক দিন। সেই দিন বিরহের, আর আজ মিলনের। সে দিন বিদায়ের—আজ আলিঙ্গনের। এই খানেই না আমরা সেই দিন দাঁড়াইয়া ছিলাম। এই খানেই না তুমি নিষ্ঠুরের ন্যায় আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে?"

"আবার তিলোত্তমে! আবার এই কথা! ছি তুমি বড় নির্দ্দয়! বলিয়া তিনি আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে আদরের সহিত তিলোত্তমাকে আলিঙ্গন করিলেন।

শ্রী হরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

পরমহংস শিবনারায়ণদেবের জীবন চরিত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

নীচে জুনাগড়ের নিকট যেখানে শবদাহ করে সেইখান হইতে গ্রীনাড়ি পাহাড়ে উঠিবার পথ আছে। সেইস্থানে অনেক দেবমূর্ত্তি লইয়া একজন ব্রহ্মচারী ছিলেন। শিবনারায়ণ সেখানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মচারী, বা ব্রহ্মচারীর ঠাকুরকে প্রণাম না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ব্রহ্মচারী রাগ করিয়া বলিলেন, "বেটা, তুই কে যে আমার ঠাকুরকে প্রণাম করিলি না ?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "ঠাকুর কোথায় আছেন ? ও সকল তো দেখিতেছি পাথর এবং পিত্তলের পুত্তলি উহাদিগকে প্রণাম করিতে গেলে [illegible] পাহাড় পর্ব্বত ইত্যাদি সকল বস্তুকেই ত প্রণাম করিতে হয় ?" [illegible]

"তুমি কে, [illegible] সাধু ?" শিবনারায়ণ বলিলেন

"আমি [illegible] সাধু কাহাকে বলে তাহাও আমি জানিনা।" [illegible] কে বসিবার জন্য একটী কম্বল পাড়িয়া [illegible] কোন্ কোন্ শাস্ত্র পড়িয়াছেন ?" [illegible] এবং সকল শাস্ত্রই পড়িয়াছি। [illegible] বিরাট পরব্রহ্মের নেত্র [illegible] স্বরূপকে নমস্কার [illegible] দাও। [illegible]

ব্রহ্মচারী [illegible] আমাদের [illegible] তেও পারি [illegible] দেখিলেন [illegible] ঠাকুর দর্শন [illegible] পয়সা দিয়া যায়। [illegible] একজন [illegible] ছিল। শিবনারায়ণ [illegible]

মোহান্তকে তিনি [illegible] তুমি কোন সম্প্রদায়ের সাধু ?"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "সম্প্রদায় কাহাকে বলে তাহা আমি জানি না, আমি মনুষ্য (আদ্‌মি) তুমি যেমন মনুষ্য আমিও সেইরূপ মনুষ্য।" মোহান্ত বলিলেন, "দেখিতেছি ত' যে তুই বেটা মনুষ্য। তোর হাত পা আছে। তবে তুই কে, কি জাতি?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি বলিলে তবে ত তুমি জানিতে পারিবে যে আমি কে—আমি যাহা ইচ্ছা তাহা বলিয়া তোমাকেত ভুল বুঝ ইতেও পারি।" মোহান্ত রাগ করিয়া বলিলেন, "তুই এখান হইতে যা, দূর হ'।" শিবনারায়ণ সেখান হইতে উঠিয়া মনে করিতে লাগিলেন যে, শুনিয়াছি গ্রীনাড়ির উপর বড় বড় অঘোরি ঋষি মহাত্মা আছেন; একবার চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিব তাঁহারা কোথায় আছেন। প্রথমেই তো এই এক শ্রেষ্ঠ মহাত্মাকে দেখিলাম!

শিবনারায়ণ সেখান হইতে ক্রমশঃ একজন আচারী * ও একজন ব্রহ্মচারীর নিকট গেলেন। সেখানেও পূর্ব্বকার মোহান্তের ন্যায় কথাবার্ত্তা হইল। পরে সেখান হইতে গ্রীনাড়ির উপর অম্বিকা ভবানী দেবীর মন্দিরেতে যাইয়া দেখিলেন একজন গৃহী সাধু বসিয়া আছেন; একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে ও কুণ্ডে বিভূতি এবং একটী প্রস্তরে সিন্দুর মাখান রহিয়াছে। যাত্রীরা যাইয়া সেখানে পয়সা কড়ি চাল ও আটা ইত্যাদি দেয়। এবং ঐ প্রদীপের আলোকে ঐ প্রস্তরখণ্ডকে দর্শন করিয়া উহাকে দেবী মাতা বলিয়া পূজা করে। মন্দির হইতে শিবনারায়ণ দত্তাত্রেয় ঋষির কমণ্ডলু নামক এক পুকুরের ধারে গেলেন। সেখানে উলঙ্গ সাধু মহাত্মা নাগাদিগের বাস। কেহ আসিলে তাহারা জিজ্ঞাসা করে, "তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ও কোন মঠের সাধু; গিরিপুরি না ভারতী?" যে মহাত্মা ঠিক উত্তর করিতে পারেন তাঁহাকে সেখানে এক রাত্রি থাকিতে দেয়, না পারিলে হাত পা বান্ধিয়া কাপড় চোপড় সমস্ত কাড়িয়া লয়। এবং লঙ্গুটী মাত্র পরাইয়া তাড়াইয়া দেয়। যে দিবস শিবনারায়ণ সেখানে যান সে দিন নাগারা চারিজন সাধু মহাত্মার সেইরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছিল। অনেক সাধু, মহাত্মা, গৃহস্থদের উপর এইরূপ অত্যাচার হওয়াতে তাহার নামে জুনাগড়ের মুসলমান নবাবের নিকট নালিশ উঠিল। গ্রীনাড়ী পাহাড় নবাবের অধিকার ভুক্ত। নবাব নালিশ শুনিয়া অতিশয় রাগ করিয়া বলিলেন, "অনেকে আসিয়া নালিশ করে কিন্তু আমি মিথ্যা ভাবিয়া এতদিন কিছু করি নাই। বোধ হয় সত্যই ইহারা সাধুদিগকে কষ্ট দিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়।" তিনি সিপাই পাঠাইয়া তাহাদিগকে ধরিয়া আনাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কেন এরূপ দৌরাত্ম্য করিয়া গরিবদিগের জিনিস পত্র কাড়িয়া কুড়িয়া লও? গ্রীনাড়ের মধ্যে সকলেই তোমাদিগকে মহাত্মা বলিয়া জানে। এবং তোমরা উলঙ্গ অবস্থায় থাক। সেই মহাত্মা নামের কি এই পরিচয় যে লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়া ডাকাতের ন্যায় কাড়িয়া কুড়িয়া লও।"

* আচার্য্য শব্দের অপভ্রংশ।

নাগারা নবাবের মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া দোষ অস্বীকার করিল। নবাব তখন তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"যদি তোমরা স্বীকার না কর তাহা হইলে তোমাদিগকে দণ্ড দিব।" তাহাতে নাগারা বলিল, "ধর্ম্মাবতার আমরা কি করিব, আমাদের অপরাধ কি, পরম্পরা ক্রমে আমাদের পরমগুরুর এইরূপ আজ্ঞা।" নবাব শুনিয়া বলিলেন, "ইহারা গরিব লোক; যেরূপেই ইহারা খোদাকে অর্থাৎ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর গুরুকে ভজনা উপাসনা করে করুক না কেন, যে মঠের নাম লউক না কেন, তাহাতে তোমাদের হানি কি? এখন আমি হুকুম দিতেছি যে এখনি ইহাদের দ্রব্য সামগ্রী ফিরাইয়া দাও এবং ১৫ দিনের মধ্যে গ্রীনাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাও; যাহা বলিলাম তাহা যদি না কর তাহা হইলে তোমাদের কয়েদ করিব।" নাগা সন্ন্যাসিরা নবাবকে সেলাম করিয়া গেল ও তাঁহার আজ্ঞামত সেই চারিজন সাধুর যাহা কাড়িয়া লইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া দিল কিন্তু গ্রীনাড়ী হইতে বাহির হইল না; এবং নবাবও পরে তাহার কোন খবর লইলেন না। শিবনারায়ণ তাহার পর গোরক্ষ নাথের (ছাতা) অর্থাৎ সমাধিস্থানে গেলেন। এবং [illegible] স্থান দর্শন করিয়া গ্রীনাড়ী পাহাড়ের উপর নীচে চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া দেখিতে [illegible] মহাত্মারা সেখানে আছেন কি না। পাহাড়ের সকল [illegible] দুই এক জন মহাত্মা ভক্তজন দেখিতে পাইলেন। [illegible] দেখিলেন। শিবনারায়ণ দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, "[illegible] মধ্যে পরব্রহ্ম বিরাজমান আছেন। সকলই স্বরূপেতে [illegible] ব্যক্তির স্বরূপেতে বোধ নাই সে ব্যক্তিকে অবোধ বলা হয়। [illegible] নিষ্ঠা হইয়াছে অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মাতে অভেদ দেখিতেছেন [illegible] একরূপ দেখিতেছেন তাহাকেই সিদ্ধ পুরুষ বলে। সেইস্থানের [illegible] দিগকে নানা প্রকারের মিথ্যা ভয় দেখাইয়া চলিত যে সেখানে [illegible] তাহারা মনুষ্যদিগকে ধরিয়া ধরিয়া খাইয়া ফেলে। তাহাতে গৃহস্থ [illegible] যে—"আপনারা রাত্রে এখানে থাকেন কি প্রকারে?" সাধুরা [illegible] সিদ্ধপুরুষ আমাদের খাইবে না—তোমাদের খাইয়া ফেলিবে।" [illegible] বলা মিথ্যা, সেস্থানে এক আধ জন যে আঘোরি থাকিতেন [illegible] মনুষ্য। যদ্যপি একেবারে খাদ্য সামগ্রী না পাওয়া যায় তাহা হইলেই [illegible] কোন কোন স্থানে আঘোরিরা মরা মানুষ অথবা পশুদিগের মাংস খায় তাহাতে [illegible] কোন ঘৃণা নাই। সাধনের জন্যও অনেকে ঐরূপ খাইয়া থাকে। কিন্তু জীবিত [illegible] তাহারা খায় না। শিবনারায়ণ গ্রীনাড় পাহাড়ের উপর কিছু দিন বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সেইস্থানের নিকট শরাওগি নামে এক সম্প্রদায় আছে ও তাহাদের সেখানে কিল্লার মতন একটা বৃহৎ ঠাকুরবাড়ি আছে। তাহার ভিতর হইতে ঝুনাগড় পর্য্যন্ত নামিবার

দীর্ঘ এক সোপান স্তর। সেই পথে সিড়ির ১০। ১২ হাত অন্তরে জঙ্গলের মধ্যে এক পাথরের নীচে গুহার ন্যায় এক স্থান আছে। শিবনারায়ণ তাহার ভিতরে থাকিতেন। সেখানকার সাধু ও গৃহস্থেরা তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিত যে, তুমি কে? শিবনারায়ণ বলিতেন—আমি মনুষ্য। তাহারা শুনিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া চলিয়া যাইত। তাহারা যে ঘৃণা করিত তাহার কারণ এই, শিবনারায়ণ তাহাদের নিকট সাধু মহাত্মা অথবা পরমহংস বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন না ও তাহারা তাঁহাতে গেরুয়া কাপড় বা সাধুর অপর কোন চিহ্ন দেখিতে পাইত না। তিনি দুই এক দিন পর্য্যন্ত সেখানে বসিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে কোন গৃহস্থ কিম্বা সাধু কেহই জিজ্ঞাসা করিত না যে, আপনি এখানে কেন থাকেন ও কি আহার করেন। শিবনারায়ণ সেখানে সঞ্জীবনী নামক বৃক্ষের পত্র খাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতেন। তিনি দেখিলেন যে গৃহস্থ ও সাধুদের সত্যে নিষ্ঠা নাই, কেবল মিথ্যা ভেক ও প্রপঞ্চতে তাহারা সন্তুষ্ট। এই অবোধগণ কত অল্পে প্রতারিত হয় শিবনারায়ণ এক দিন তাহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি যেখানে থাকিতেন সেখান হইতে সিঁড়ি পর্য্যন্ত জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া পাঁচটা ছোট বড় চিক্কন পাথর লইয়া সেখানে পুঁতিয়া রাখিলেন। এবং একটা পাথরে ইটের গুঁড়া মাখাইয়া তাহার নাম রাখিলেন মহাবীর। অপর পাথর গুলির মধ্যে কাহাকেও বিষ্ণু ভগবান কাহাকেও দেবীমা এবং কাহাকে গণেশ জী নাম দিয়া মধ্যের প্রস্তরটীর নাম ভুবনেশ্বর বলিয়া কল্পিত করিলেন এবং সেই জায়গার নাম রাখিলেন পঞ্চতীর্থ। পঞ্চতীর্থ লেপিয়া পুঁছিয়া উত্তম রূপে পরিষ্কার করিয়া দিলেন এবং জঙ্গল হইতে পত্র পুষ্প তুলিয়া সেই পাঁচটা পাথরের উপর উত্তমরূপে চাপাইলেন। যাত্রীরা আধ্‌লা পয়সা চাল ডাল ময়দা ইত্যাদি সেই পাথরের ঠাকুরের নিকট রাখিতে লাগিল এবং পত্র পুষ্প দিয়া সেই ঠাকুরের পূজা করিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিতে লাগিল। কোন কোন যাত্রী জিজ্ঞাসা করিল—এই ঠাকুরের নাম কি? কোন কোন যাত্রী বলিল—"কয়েকবার আমি উপরে দর্শন করিয়া গিয়াছি কিন্তু এখানে তখনত এ তীর্থ দেখি নাই. বোধ হয় ইহা নূতন হইয়াছে।"

সন্ধ্যা নাগাইত এক দিনেতে পৌনে নয় আনা পয়সা এবং ১৫।১৬ সের আন্দাজ চাল, ডাল, ময়দা ইত্যাদি জমিল। ঐ পাহাড়ের উপর একজন মুদি দোকানদার ছিল। শিবনারায়ণ তাহাকে ডাকিয়া সেই সকল দ্রব্য তাহার কাছে রাখিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে যখন আমার প্রয়োজন হইবে তখন তোমার নিকট হইতে লইব। মুদি বলিল আপনার যত আবশ্যক হয় আমার নিকট লইবেন। শিবনারায়ণ সেই স্থানে দুই চারি দিন বসিয়া থাকিবার পর জুনাগড়ের বাবু, এবং মহাজন লোক শুনিতে পাইলেন একজন মহাত্মা কয়েক দিবসাবধি পাহাড়ে আছেন, আহার হয় নাই এবং কাপড়ও তাঁহার কাছে নাই কেবল মাত্র একখানি ছেঁড়া চাদর আছে। সেই

কথা শুনিয়া বাবু এবং মহাজন প্রভৃতি এক মন ময়দা, চাল, ডাল, ঘৃত, ছোলা, গুড় ইত্যাদি তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। শিবনারায়ণ সেই মুটিয়াকে বলিলেন—'বাবা, তুমি যে স্থান হইতে এ সমস্ত দ্রব্য আনিয়াছ সেই স্থানে ফিরাইয়া লইয়া যাও, আমি এখানে থাকিব না, এ স্থান হইতে চলিয়া যাইব। সেই লোক ফিরাইয়া লইয়া গেল না; এবং "আমার উপর বাবু রাগ করিবেন"—এই বলিয়া সেই সমস্ত দ্রব্যাদি সেইখানে রাখিয়া সে চলিয়া গেল। শিবনারায়ণ একজন সাধুকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে এখানে এই সমস্ত দ্রব্য আছে, তোমাদের খাইতে ইচ্ছা হয় তো লইয়া যাও, আমি এখন যুনাগড়ে যাইতেছি। শিবনারায়ণ এই বলিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া যুনাগড় গেলেন। যুনাগড় হইতে সুদামাপুরের [illegible] সেখান হইতে দ্বারকাধাম যাইলেন।

দ্বারকাতে যেখানে কৃষ্ণ ভগবানের [illegible] শিবনারায়ণ পাণ্ডাদের বলিলেন—"আমি কৃষ্ণ ভগবানকে দর্শন করিব, আমাকে [illegible] করাইয়া দাও।" এক জন পাণ্ডার [illegible] তিনি বলিলেন [illegible] বানকে প্রণামী স্বরূপ ২॥০ টাকা দাও [illegible] শিবনারায়ণ বলিলেন, "তুমি বলিতেছ যে আগে ২॥০ [illegible] হইবে; যাহার নাম কৃষ্ণ ভগবান [illegible] চরাচরকে ভোগ্য বস্তু দিতেছেন এবং [illegible] হইয়া কি দিব, আমাদের কি আছে, [illegible] বস্তু দিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া [illegible] উৎপত্তি করিতে পারি না ও আমরা [illegible] ঠাকুরকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে দিতেছি। [illegible] আপনারা দিবারাত্রি সেই ঠাকুরের কাছে থাকেন [illegible] আপনাদের ভ্রান্তি অজ্ঞানতা লয় হইতেছে না, এবং তৃষ্ণাও [illegible] তৃষ্ণা এবং অজ্ঞানতা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে।" [illegible] করিয়া বলিল—"তুই কে, যে আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে আসিয়াছিস, [illegible] আসিয়াছিস না আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে আসিয়াছিস? দর্শন করিস তো [illegible] নতুবা এখান হইতে চলিয়া যা।" শিবনারায়ণ মনে মনে বলিলেন, যে, [illegible] জ্ঞানের কথা বলিলাম, কিন্তু তৃষ্ণার জন্য ইহারা জড় হইয়া আছে, একটিও সত্যকথা গ্রহণ করিতে পারিল না। যেমন ইহারা জড়কে ইষ্টদেব বলিয়া মানে. ইহাদের তো সেইরূপ বলহীন শক্তিহীন তেজহীন বুদ্ধি হইবে। শিবনারায়ণ সেই পাণ্ডাকে বলিলেন, "যাহার কাছে পয়সা না থাকিবে সে কিরূপে দর্শন পাইবে?" পাণ্ডারা তাহা শুনিয়া বলিল, "যাহার কাছে পয়সা না থাকিবে সে দর্শন পাইবে না।" শিবনারায়ণ

বলিলেন, "আমার নিকটে তো পয়সা নাই, তবে কি আমি দর্শন পাইব না?" পাণ্ডারা বলিল, "বিনা পয়সায় দর্শন পাইবি না।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "এইখানে মন্দিরের মধ্যে যে কৃষ্ণ ভগবান আছেন, তাহা পাথরের না কাষ্ঠের না কোন ধাতুনির্ম্মিত না মৃত্তিকার? যদ্যপি পাথর কাষ্ঠ অথবা ধাতুনির্ম্মিত কিম্বা মৃত্তিকার হয় তাহা হইলে তো সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে উহা আছে, তোমাদের এখানে দর্শন করিবার প্রয়োজন কি? পৃথিবীতে যত তীর্থে মন্দিরের মধ্যে প্রতিমা নির্ম্মাণ করা আছে, তাহা কোন ঠাঁই মৃত্তিকা কোন ঠাঁই প্রস্তর ও কোন ঠাঁই ধাতু ইত্যাদির নির্ম্মাণ। এই প্রস্তরাদি ব্যতীত কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইতে পারে না। যদ্যপি ইহা ব্যতীত অন্য পদার্থের হয়, তাহা কেবল মাত্র অল্প সময়ের জন্য। বরফেও মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতে পারে। এই সকল ধাতুর মধ্যে এই কৃষ্ণ ভগবান কোন ধাতুর? তিনি নিরাকার না সাকার ব্রহ্ম? যদ্যপি সাকার ব্রহ্ম হন তাহা হইলে ত এই সমস্ত সাকার ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ আছেন; যথা পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা এবং সূর্য্যনারায়ণ। বল দেখি ইহার মধ্যে কোনটা কৃষ্ণ ভগবান এবং কোনটাই বা না, অথবা ইহার সমষ্টিই কৃষ্ণ ভগবান? যদ্যপি সাকার ব্রহ্মকে তোমরা বল যে ইনি কৃষ্ণ ভগবান, তবে তোমাদের সাকার ব্রহ্ম কৃষ্ণ ভগবান কোথায়? তাঁহার স্বরূপ কি?—আমাকে দেখাইয়া দেও এবং বুঝাইয়া দেও।" তখন একজন পাণ্ডা অন্য একজন পাণ্ডাকে বলিল যে, "এ বেটাকে কোন উপায়ে এখান হইতে তাড়াইয়া দেও, নতুবা কোন যাত্রী যদি এই সকল কথা শুনে তাহা হইলে সকল যাত্রী বুঝি বা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে; তাহা হইলে আমাদের রোজগার বন্ধ হইবে।" পাণ্ডারা এই পরামর্শ করিয়া শিবনারায়ণকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিল। শিবনারায়ণ মনে মনে বলিলেন যে, দেখ অর্থলোভের জন্য ইহারা জড় পাথরকে চেতন বলিয়া পূজা করিতেছে, সকলকে করাইতেছে, এবং প্রত্যক্ষ চেতন কৃষ্ণকে তাড়াইয়া দিতেছে। ইহারা কি নির্ব্বোধ! শিবনারায়ণ, যেখানে যাত্রীদিগকে ছাপ দেয় সেইস্থান দেখিতে যাইলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন যে, চারিদিকে যাত্রীরা এবং পাণ্ডারা ও কোম্পানির তরফের লোক সকল বসিয়া আছে। কোম্পানির লোকেরা যাত্রীর নাম ও কত যাত্রী আসিল এবং কত পয়সা টাকা আদায় হইল, তাহার হিসাব নিত্য নিত্য সরকারে দাখিল করে। যাত্রীদের নিকট হইতে যত টাকা আদায় হয় সকল তীর্থেই কোম্পানি তাহার অংশ পান। শিবনারায়ণ মনে মনে বলিলেন যে, এত কষ্ট পাইয়া যাত্রীরা এই তীর্থে আসে এবং টাকা পয়সা অনর্থক ব্যয় করিয়া যায়!

সেই যাত্রীরা যেখানে বসিয়া আছে, সেই খানে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাম্রের এবং লৌহের তপ্ত ছাপ লইয়া সেই সকল যাত্রীদের হস্তে শীঘ্র শীঘ্র লাগাইয়া দেয়। কত যাত্রী ছাপ লাগাইবার সময় কাঁদিতে থাকে, কত যাত্রী ভয়েতে উঠিয়া যায় এবং

কত যাত্রী কষ্ট সহ্য করিয়া ছাপ লয়। এই ছাপ দেখিলে সকলে বলিবে যে, ইনি দ্বারকায় গিয়াছিলেন। শিবনারায়ণকে পাণ্ডারা বলিল যে "তুমি পয়সা দাও ও ছাপ লও।" শিবনারায়ণ বলিলেন "আমার কাছে একটীও পয়সা নাই যে আমি ছাপ লইব।" পাণ্ডারা বলিল, "যদি তোর কাছে বেশি পয়সা না থাকে, তবে তুই আনা পয়সা দে তোকে ছাপ দিব।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমার কাছে একটীও পয়সা নাই এবং আমি ছাপও লইব না।" পাণ্ডারা বলিল "তুই যদি ছাপ লইস তো মরিলে তোর মুখাগ্নি করিতে হইবে না।"

ক্রমশঃ।

পালিতা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সত্যই কি চারুর প্রতি স্নেহের ভালবাসা প্রকৃত প্রেমানুরাগ নহে,—তাই সে তাহাকে বিবাহে অস্বীকৃত? যে ভালবাসায় ভালবাসার বস্তুকে আপনার করিবার,—নিতান্ত আপনার করিবার উন্মত্ত বাসনা জন্মে, যে বাসনার সফলতার উপর সমস্ত জীবনের সুখাসুখ নির্ভর করে, তাহার সম্যক অভাবেই কি স্নেহের অন্যান্য সঙ্কোচ এত গুরুতর? না তাহা ঠিক নহে। শিক্ষা, স্বভাব, অবস্থানুসারে প্রেমের স্ফূর্ত্তির, প্রেমের আকাঙ্ক্ষারও তারতম্য হয়। স্নেহের আশা-ভরষাহীন পরাধীন জীবনে, তাহার সহিষ্ণু মৃদুস্বভাবে এরূপ বিবাহের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত মনে উদয় হওয়া নিতান্ত দুরাকাঙ্ক্ষা, সুতরাং এরূপ আকাঙ্ক্ষাই তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক, তাহার পর তাহার আজন্ম সংস্কার, বিশ্বাস, শিক্ষা, কৃতজ্ঞতা, এ সমস্তই এ বিবাহের বিরুদ্ধ পক্ষ; সকলেই একবাক্যে বলিতেছে এ বিবাহ গর্হিত কার্য্য। এরূপ স্থলে তাহার ভালবাসা সুগভীর হইলেও চারুর মত উদ্দাম, অতৃপ্ত, সর্ব্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষাময় হইবার নহে। সুতরাং সে অল্পেতেই সন্তুষ্ট, তাহার প্রেম সুগভীর হইয়াও এক অর্থে নিষ্কাম, উচ্চতর; সে নিজে তাহাকে সমস্ত প্রাণে ভালবাসিয়া আর প্রতিদানে একটু ভ্রাতৃস্নেহ পাইয়াই কৃতার্থ, আজীবন এইরূপ ভ্রাতা ভগিনীর মত একত্র কাটাইতে পারিলেই সে যথেষ্ট বিবেচনা করে, ইহাই তাহার চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা, ইহা হইতে অধিক প্রত্যাশা তাহার নাই। কিন্তু যখন হইতে চারুর জলন্ত আবেগময় প্রেম তাহার নিকট প্রকাশিত হইল, তাহার নৈরাশ্যপূর্ণ মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা বাক্য তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল,

তখন হইতে তাহার হৃদয়ে বিপ্লব সমুত্থিত হইল। সত্যই কি স্নেহকে বিবাহ করিতে না পাইলে চারুর সমস্ত জীবন দুর্ব্বহ যন্ত্রণাময় হইবে? এই এক প্রশ্নে তাহার হৃদয় অবসন্ন, পীড়িত হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়ান্যায় বিবেচনা এবং যাহাকে ভালবাসে তাহার সুখের জন্য অন্য সমস্ত বিসর্জ্জন দিবার ইচ্ছা—এই উভয়ের মধ্যে প্রবল সংগ্রাম বাধিল।

আকাশে চন্দ্র নাই, রজনী অন্ধকার, কিন্তু চৌদিক মেঘশূন্য কুয়াশাহীন নির্ম্মল। সুতরাং ছায়াপথের আভা এবং নক্ষত্র ভাতির প্রশান্ত আলোকে সেই অন্ধকারের ভীষণতা লোপ করিয়া চৌদিক রমণীয় মৃদু মধুর উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। এইরূপ তারকাদীপ্ত প্রশান্ত রাত্রি স্নেহলতার বড় ভাল লাগে। এইরূপ কত রজনীতে, নক্ষত্র খচিত সুগম্ভীর আকাশের দিকে চাহিয়া নীরব বিশ্বসঙ্গীতে তাহার আত্মা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ক্ষুদ্র মানব হৃদয়ের সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া তাহার দুঃখতাপ-পীড়িত হৃদয় অপূর্ব্ব শান্তিরসে ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ বাহিরের স্নিগ্ধ জ্যোতি তাহার হৃদয় স্নিগ্ধ করিতে অক্ষম,—দুর্ভেদ্য যন্ত্রণা স্তরে তাহার অন্তস্তল বর্ম্মাবৃত, অসীমবেদনার অশ্রুজলে তাহার নয়ন অন্ধ। বাগানের সীমানার ঘনসংলগ্ন অন্ধকার বৃক্ষাবলীতে তাহার অন্ধকার-দৃষ্টি সংলগ্ন হইয়া তাহার চৌদিকে কেবল এক নিবিড় অন্ধকার সৃজিত হইয়াছে। অন্ধকার অতি মহান, অতিভীষণ। দেখিতে দেখিতে তাহা সর্ব্বগ্রাসী বিশ্বব্যাপী মূর্ত্তিতে বিস্তৃত হইয়া উচ্চনীচ দিকবিদিক একাকার করিয়া ফেলিল, স্নেহ সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল। আবার কিছু পরে চাহিয়া দেখিল স্বতন্ত্র দৃশ্য! সেই অনন্ত ভীম অন্ধকারে প্রলয়ের-মহাশ্মশান ব্যাপ্যমান, রাশি রাশি শব দেহ, বিকট মূর্ত্তিতে জীবন্ত হইয়া উঠিয়া স্নেহকে বেষ্টন করিয়া উন্মত্ত ভাবে নৃত্য করিতেছে। (কিছুদিন পূর্ব্বে স্নেহ একখানি শ্মশান চিত্র দেখিয়াছিল)। স্নেহ সহজে ভয় পায় না, কিন্তু এই দৃশ্য তাহার নিকট আজ এমন সত্যের মত প্রতিভাত হইতে লাগিল যে এই শীত রাত্রেও তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, হৃদয় সশব্দে কাঁপিতে লাগিল তথাপি সে মোহমুগ্ধের ন্যায় স্থিরনেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। সহসা সেই অন্ধকার মহাশ্মশানের একস্থান ঈষৎ আলোকিত হইয়া উঠিল, ক্রমে সুস্পষ্ট হইয়া ধূধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। স্নেহ দেখিল তাহা চিতালোক এবং সেই প্রজ্বলন্ত চিতায় এক শবদেহ শয়ান। শবদেহ সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, স্নেহ আপনাকে চিনিতে পারিয়া শিহরিয়া উঠিল। শবদেহ জ্বলিতে লাগিল, ধূধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, ক্রমে জ্বলন্ত চিতাগ্নিতে বিলীন হইয়া পড়িল! স্নেহের চমক্ ভাঙ্গিল, দেখিল আর অন্ধকার নাই, মহাশ্মশান বিলুপ্ত, চিতাগ্নি নিভিয়া গিয়াছে, কেবল একখানি পরিপূর্ণ চন্দ্র বৃক্ষাবলির মস্তকের উপর শোভিত হইয়া চারিদিক সমুজ্জ্বল করিতেছে। স্নেহ অঞ্চলে ওষ্ঠাধরের ঘর্ম্ম মুছিল, এই সময় কাহার যেন ধীর ন্যস্ত পদ শব্দ তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল, দেখিল চারু।

একি সত্যই চারু। না স্নেহ ইহাও স্বপ্ন দেখিতেছে ?

পরিষ্কার জ্যোৎস্নালোকে চারুর মূর্ত্তি সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, চারুর গতি টলমল, দৃষ্টি বিহ্বল অথচ প্রদীপ্ত, সমস্ত মূর্ত্তি অস্বাভাবিক। স্নেহ দেখিয়া কষ্টে চক্ষু মুদ্রিত করিল। চারু বিকৃত অসংলগ্ন স্বরে বলিল—"স্নেহ দেখ, আমার ভবিষ্যৎমূর্ত্তি চাহিয়া দেখ ! তুমি আমার এই দশা করিয়াছ।"

স্নেহ বুঝিল চারু মদ খাইয়াছে, ভগ্ন হৃদয়ে বলিল—"চারু তুমি যে বলিয়াছিলে—আর মদ খাব না ?"

চারু। তখন মনে করিয়াছিলাম—তুমি আমাকে ভালবাস। স্নেহ, স্নেহ, এখনো বল তুমি আমার, এখনো তাহা হইলে আমাকে এই নরক হইতে উদ্ধার করিতে পার।"

স্নেহের হৃদয় যন্ত্রণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল—যাহাকে ভালবাসে নিজের জীবন প্রাণ সুখ হইতেও যে প্রিয়তম, যাহাকে দেবতা বলিয়া মনে করে, সম্মুখে তাহার এই অমানুষিক হীন মূর্ত্তি, আর ইহার কারণ সে নিজে, সে ইচ্ছা করিলে ইহা নিবারণ করিতে পারে। স্নেহের অন্যান্য সঙ্কোচ আর হৃদয়ে স্থান পাইল না সমস্ত বিবেচনা লোপ পাইল, সে কাঁদিয়া কহিল "চারু আমি তোমার, চিরদিনই তোমার, তুমি বল আর এরূপ কাজ করিবে না, তোমার এ মূর্ত্তি আমি দেখিতে পারি না।"

চারুর হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, মুহূর্ত্তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহার নিকট একাকার, এক মূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইল, সে কম্পিত হস্তে স্নেহলতার হাত ধরিয়া বলিল—"স্নেহ, সত্যই তুমি আমার ! বল বল আবার বল স্নেহ।" স্নেহ কাঁদিতেছিল, কোন কথা কহিল না, কেবল আস্তে আস্তে চারুর হাত ছাড়াইবার প্রয়াস পাইল। প্রফুল্ল রজনী, নির্জ্জনস্থান, চন্দ্রের মধুরালোকে স্নেহের মধুর বিষণ্ণমুখ অতি মধুরভাবে প্রদীপ্ত, চারুর হৃদয় আশা বিহ্বল, আনন্দ বিহ্বল, সে আর আত্ম সম্বরণ করিতে পারিল না স্নেহের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল,—অতি নিকটে—আরো নিকটে,—সহসা চমকিয়া স্নেহ সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তাহার আগেই তাহার ওষ্ঠাধর স্নেহের ওষ্ঠাধরে মুদ্রিত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পাশ্চাত্য কবিগণ প্রেমের প্রথম চুম্বনের যে মাহাত্ম্য গাহিয়াছেন, তাহা যে দেশ বিশেষের বা কাল বিশেষের সত্য নহে,—সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে তাহার জয়, ইহা অস্বীকার করা যায় না ; তবে কি যেখানে তাহা দোষ সংলিপ্ত নহে। সুতরাং অবস্থা ভেদে কাহারো অদৃষ্টে সুধাও গরল হইয়া উঠে। আবাল্য ব্রহ্মচর্য্য পালনে যাহার জীবন অতিবাহিত, পর পুরুষ স্পর্শও যাহার সংস্কারে অঙ্গার, অধর্ম্ম, এরূপ ঘটনা তাহার জীবনের প্রথম নীতিভঙ্গ অর্থাৎ প্রথম পাপ, সুতরাং ভিন্ন স্থলে যাহাই হউক এরূপ স্থলে তাহা পুণ্যময় আনন্দ প্রদানের পরিবর্ত্তে কি রূপ অশান্তি—কি রূপ কষ্টের কারণ

হইয়া উঠে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। চারুর ব্যবহারে স্নেহলতা নিতান্ত ব্যথিত হইল, কিন্তু যতক্ষণ চারু নিকটে রহিল ততক্ষণ সেই ব্যথাও অন্য নানা ভাবের মধ্যে প্রশমিত আকারে তাহার হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন রহিল, কিন্তু চারু চলিয়া যাইবা মাত্র এক অসহ্য যন্ত্রণা তাহাকে অধীর করিয়া তুলিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার পুরাতন সঙ্কোচও সমস্ত ফিরিয়া আসিল।

চারু—যাহাকে সে দেবতুল্য বলিয়া জানে, তাহার এইরূপ মতিভ্রম, এইরূপ অধঃপতন! এ কেন? তাহার জন্যই কি নহে? তাহার মত হতভাগিনীকে ভালবাসার ত এই পরিণাম! আর তাহার সহিত বিবাহ হইলে কি চারুর মঙ্গল হইতে পারে। পিতামাতার পরিত্যজ্য, সংসারের ঘৃণার বস্তু হইয়া তাহার জীবনের সুখ শান্তি কি অক্ষত থাকিতে পারে? আর জগৎ বাবু যিনি স্নেহকে পিতা অপেক্ষাও অধিক স্নেহে প্রতিপালন করিয়াছেন, তাঁহার স্নেহের কি শেষে এই প্রতিফল! ছিঃ ছিঃ সংসারে তাহার জন্ম হইয়াছিল কেন? জীবনে কাহারো সুখের কারণ হইতে পারিল না; কেবল তাহার সংস্পর্শে যে আসিয়াছে সংক্রামক রোগের ন্যায় তাহার শান্তি নষ্ট করাই তাহার যেন কাজ! তাহার হৃদয়ের শিরা নিঙড়িয়া নয়নে অশ্রুজল বহিতে লাগিল।

প্রভাতচন্দ্রের মলিন জ্যোৎস্না আর শুক্র তারার মলিন জ্যোতি তাহার সেই বিষাদ কাতর অশ্রু সিক্ত বিবর্ণ মুখের ম্লান ভাব আরো সুস্পষ্ট করিয়া তুলিল। পাখীরা সেই সুখময় প্রভাতে তাহারি বিষাদ সঙ্গীত গাহিয়া উঠিল। স্নেহ বুকফাটা কান্না কাঁদিয়া, করযোড়ে প্রাণপণে ঈশ্বরকে ডাকিয়া কহিল—"ভগবান কোথায় তুমি? এ বিপদ হইতে রক্ষা কর? দুঃখ তাপ যাহা সহিতে হয় আমাকেই সহিতে দাও পিতা, আমা হইতে তাঁহাদের যেন শান্তি ভঙ্গ না হয়, দয়াময় এই প্রার্থনা আমার পূর্ণ কর, তাঁহাদের সুখী করিয়া তোমার এই জন্ম দুঃখিনী কন্যার চিরজীবনের বাসনা পূর্ণ কর"। কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করিতে করিতে সে উঠিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। হৃদয়ের অতিরিক্ত আবেগে নীত হইয়া সে তখনি চারুকে একখানি পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল।

"চারু, আমার হৃদয় যন্ত্রণায় পুড়িতেছে, আমি কি লিখিতেছি জানি না, যদি অন্যায় "কিছু লিখি, পড়িয়া যদি তোমার মনে কষ্ট হয়—এই হতভাগিনীকে মার্জ্জনা করিও,— "আমি হতভাগিনী, যাহাকে ভালবাসি যে আমাকে ভালবাসে তাহার উপর অভি- "সম্পাৎ আনয়ন করি—তাহাকে পুণ্য পথ হইতে ভ্রষ্ট করি। তুমি এই নিরাশ্রয়, "অভাগিনীর প্রাণ হইতেও প্রিয়তম, তুমি আমার সর্ব্বস্ব, তোমা হইতে দূরে বাস করা "আর নরকে বাস করাও আমার পক্ষে সমান, 'কিন্তু"—

আর হইল না, ইহার পর লিখিতে যাইতেছিল—"কিন্তু আমার সহিত বিবাহে তোমার সুখ শান্তি নাই ইত্যাদি।

কিন্তু সহসা চমকিয়া উর্দ্ধমুখী হইয়া দেখিল, সম্মুখে চারুর মূর্ত্তি, অমনি লেখনী অঙ্গুলি স্খলিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। চারু সেই অর্দ্ধ লিখিত পত্রখানি

তুলিয়া লইল, এই সময় বারান্দা হইতে টগর ডাকিল "দিদি, বলি এখনো ঘুমচ্ছিস নাকি, রোদ উঠেছে যে," বলিতে বলিতে সে গৃহ প্রবেশ করিল, চারু পত্র লইয়া অন্য দ্বার দিয়া চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

চারুর নিকট পরাস্ত হইয়া গৃহিণী অস্বাভাবিক ভাব ধারণ করিলেন। সে চলিয়া গেলে, তাঁহার বকাবকা কান্নাকাটি সমস্ত শেষ হইল, এমন কি টগরের সঙ্গে পর্য্যন্ত তিনি ইহার পর একটি দুঃখের কথা কহিলেন না; মনের মধ্যে ক্রোধের জ্বলন্ত বহ্নি, রুদ্ধ রাখিয়া ঝটিকার পূর্ব্ব প্রকৃতির ন্যায় গোঁ হইয়া রহিলেন। সমস্ত বিশ্ব তাঁহার বিপক্ষে উত্তেজিত বলিয়া মনে হইল, তিনি তাহার বিপক্ষে একাকী সংগ্রাম করিতে মনে মনে বল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, কাহারো নিকট ইহা প্রকাশে তাহার সান্ত্বনা অনুভব করিলেন না।

চারু চলিয়া যাইবার পর রান্নাঘর হইতে উপরে আসিয়া দেখিলেন—তাঁহার ঘরের সামনের দালানে খুকীর দাসী ক্ষেন্তি 'আলুই' প্রস্তুত করিবার সরঞ্জাম সমস্ত গুছাইয়া রাখিয়া খুকীকে কোলে লইয়া বসিয়া আছে। (গৃহিণী নিজের হাতে আলুই প্রস্তুত করিতেন।) গৃহিণী আসিতেই দাসী বলিল "দিদিমা, শিল নোড়া ধুয়ে সব জিনিষ পত্র নিয়ে সেই অবধি বসে আছি।"

গৃহিণী কোন কথা না কহিয়া মেজের উপর শিল নোড়ার কাছে আসিয়া বসিলেন, এবং উদ্যোগ পর্ব্বের আরম্ভেই দাসীর প্রতি অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া তাহাকে গালাগালি পাড়িতে লাগিলেন, তাহার অপরাধ—সে এতদিন দেখিয়া আসিতেছে এখনো ওষধি-দ্রব্যের ভাগ ঠিক বুঝে নাই, কতকগুলা অনাবশ্যক অতিরিক্ত বড় এলাচের খোলা কি৷৷৷ আনিয়া রাখিয়াছে!

যাহা হউক সেজন্য কাজ বাধিল না, এক দিকে জিহ্বা চলিতে লাগিল—অন্যদিকে জোরে জোরে সিলের উপর লোড়ার ঘর্ষণ শব্দ আরম্ভ হইল। দাসী ইত্যবসরে খুকীকে মাটীতে বসাইয়া বলিল—"লেপ গুলো রোদে দিয়ে ঝট করে আসছি, খুকী এইখানে বসে থাক্।"

খুকী তাহার হাতের ঝুমঝুমিটা মাঝে মাঝে মুখে পুরিতে পুরিতে, মাঝে মাঝে মাটীতে ঠক ঠক করিতে করিতে ক্রমে দিদির দিকে পা ঘেঁসিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং পূর্ব্ব পরিত্যক্ত এলাচের খোসা দুএকটি হাতের কাছে পাইয়াই তাহা গালে পূরিয়া দিল। ইহার পরিণামে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার 'ওয়াক ওয়াক' শব্দে গৃহিণীর মনোযোগ আকৃষ্ট হইল, গৃহিণী তাহার দিকে চাহিয়াই চীৎকার আরম্ভ করিলেন—"ভাল গের হয়েছে, আমার যেমন দশা, কিছুতেই নিস্তার নেই, আর পারিনে।"

চীৎকার শুনিয়া দাসী দৌড়িয়া আসিল এবং ক্রন্দমান খুকীকে কোলে লইয়া সান্ত্বনা

আরম্ভ করিল, বলা বাহুল্য এলাচের খোসাগুলি মুখ হইতে ইতিপূর্ব্বেই থুকী ফেলিয়া দিয়াছিল। চীৎকার শুনিয়া টগরের বড় ছেলে এক-টুকরা পাঁউরুটি খাইতে খাইতে ছুটিয়া আসিল, তাহা দেখিয়া গৃহিণী আরো জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন,—এই সব নইলে খাওয়া হয় না, যা ত ক্ষেন্তি ঐটে হাত থেকে ফেলে দিয়ে ওকে গঙ্গাজলে চুবিয়ে আনত। এমন ছেলেও দেখিনি!

এই কথা শুনিয়া সে দৌড় মারিল, ক্ষেন্তিও গৃহিণীর কাছ ছাড়িতে পারিলে বাঁচে—তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

গৃহিণী তখন আলুই বাঁটিয়া একটি পাথরে বড়ি দিয়া দালানের ধারে রোদে রাখিয়া কমলিকে ডাকিতে লাগিলেন। কমলি আসিলে বলিলেন—"সেই যে চুলের দড়ি গাছা তোকে বুনতে দিয়েছিলুম—হোল কি? নিয়ে আয় দেখি?"

গৃহিণী অনেক দিন আগে একগাছি চুলের দড়ি বুনিতে আরম্ভ করিয়া, আরম্ভ অবস্থাতেই ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই দড়ির কথা আজ এতদিনে তাঁহার মনে পড়িল। কমলি বলিল "ওমা কবে গো—আমাকে আবার বুনতে দিলে কবে? তুমিই ত থেই কতক করে ফেলে রেখেছ—"

গৃহিণী নাক ফুলাইয়া বলিলেন—"তোদের দিলে ঐ রকমই হয়; আমার যেমন গের! তা নিয়ে আয়; আমিই করব।"

কমলি উচ্চ বাচ্য না করিয়া সেই দড়ি, তেল জল ও একরাশ চুল আনিয়া উপস্থিত করিল। গৃহিণী দড়ি গাছা দালানের বারান্দায় কাঠের গরাদে বাঁধিয়া গম্ভীর ভাবে দড়ি বুনিতে বসিলেন; কাজ যে বেশী দূর অগ্রসর হইল তাহা নহে, হাত আস্তে চলিতে লাগিল, কিন্তু ঘন ঘন নাসিকা কুঞ্চিত, ও কপাল কুঞ্চিত হইতে লাগিল, আর মনের মধ্যে চিন্তাটা এত তেজে চলিতে লাগিল যে, তাঁহার এক থেই দড়ি শেষ না হইতেই তাঁহার ভাবনার শেষ হইল, তিনি এক অমোঘ-উপায় আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন।

বাড়ীর সকলের খাওয়া দাওয়া হইলে, কমলিকে ডাকিয়া দুজনের লুকাইয়া কি কথাবার্ত্তা হইল, কমলি কুঞ্জ বাবুর বাড়ী চলিয়া গেল। সন্ধ্যার দিকে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"ওরে বাবারে! সে মাগী, বৌকে ঘরে নেবে না, মাগী যেন রণচণ্ডী, আমি ওকথা বলতেই আমাকে যেন খেতে এল, তবুও আমি ঢের বল্লু, শেষে বেটী আমাকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ীর বার করতে চায়।" গৃহিণী ইহাতে একটু দমিয়া গেলেন তথাপি তাঁহার সঙ্কল্প অটল রহিল, যেন তেন প্রকারে তাহা সিদ্ধ করিতে তৎপর হইলেন। কেবল নিজের মনের মধ্যে কথাটা না রাখিয়া টগরকে তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য আবশ্যক দেখিলেন। সন্ধ্যাকালে টগরকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন—"টগর দেখছিস ত কি কাণ্ড বেধেছে, ওকে বিদায় করা ছাড়া আর ত কোন উপায় দেখিনে।"

টগর বলিল—তাত বুঝছি কিন্তু ঠাবে কোথায়?

গৃহিণী। তাইত ভাবছি কোন চুলোয়! সব ত খেয়ে বসে আছে, তা শ্বাশুড়ী মাগীর কাছেই পাঠাব। একবার ফেলেএলে ত আর তাড়াতে পারবে না, মুখ ঝাঁমটা দিয়েও দুটি দুটি ভাত দিতে হবে।”

ট। কিন্তু দিদি যাবে কেন? অত কষ্টের মধ্যে মানুষে কি সাধ করে যেতে চায়?

গৃ। না যাবে না, ওর ঘাড় যাবে। ওকে যে বলতে যাবে যে শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছে— তোর সঙ্গে তোর শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাব [illegible] অমনি সেই খানে লোক দিয়ে পাঠাবি”—

এই কথায় টগরও আঁতকিয়া উঠিল, [illegible] তাহার ঝমনো ঝুমনোর গল্পের বলবাসের [illegible] কিন্তু মা সেটা—ভাল হবে না,—অমন করে [illegible]

গৃহিণী। জানলে ত? আর আমি ত [illegible] ভাল দেখব না, আমি দুধ ভাত দিয়ে [illegible] কালই সকালে তাকে সঙ্গে করে শ্বশুরবাড়ী যা। [illegible] যায়।”

কাজটা করিতে তাহার সঙ্কোচ হইতে লাগিল [illegible] বা উপায় কি! স্নেহ এখান হইতে না গেলে [illegible] একটা কেলেঙ্কার হইয়া পড়িবে। সে বলিল—“[illegible] তুই বোঝ, শেষে যেন একটা কেলেঙ্কার না হয়, [illegible] করে।

সেই দিন স্থির হইয়া গেল, টগর পরদিন সকালে শ্বশুর বাড়ী [illegible] লতাকে তখনি আর টগর তাহার সহিত যাইবার প্রস্তাব করিতে [illegible] কেমন সঙ্কোচ হইতে লাগিল। সে গৃহে গিয়া স্নেহলতার জন্য অপেক্ষা করিতে [illegible] আর তাহার নিকট কিরূপে কথাটা পাড়িবে মনের মধ্যে তাহা তোলাপাড়া করিতে লাগিল, কিন্তু সে রাতে স্নেহ তাহার ঘরে আসিল না। দেখিয়া অধিক রাত্রে সে নিজেই স্নেহলতার ঘরে আসিয়া দেখিল, স্নেহ ঘরে নাই; বারান্দায় যেন কে কথা কহিতেছে। চারুর স্বর চিনিতে পারিয়া সে আস্তে আস্তে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল; কিছু পরে চারুকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া সে আস্তে আস্তে চলিয়া গেল, সে দিন আর স্নেহকে কিছু বলা হইল না।

প্রভাত হইতেই গৃহিণী পাল্কী ডাকাইয়া টগরকে যাইবার জন্য ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। টগর স্নেহকে ডাকিতে আসিয়া চারুকে গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিল।

রাত্রি হইতে সে রাগে গরগর করিতেছে— [illegible] ছিল—সে [illegible]

উঠিয়া কহিল—"দাদা না গেল! দিনে রেতে যখন তখন আসা—ও কিরূপ বাবু!" স্নেহ কোন উত্তর করিল না, টগর তীব্র স্বরে বলিল "কে জানে বাবু! তুই যে কি বুঝিস তুই জানিস! আমার ত এ সব ভাল বোধ হয় না। নিজের আর সকলেরি কষ্ট টেনে আনছিস!"

স্নেহলতা নিজের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইল, সে লজ্জাবতীর মত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, টগর কি সবই জানে নাকি! টগর বলিল "যদি ভাল চাস যা বলছি এখনো শোন, দিন কতক এখান থেকে সর। যদি তুই দাদাকে সত্যি ভালবাসিস তাহলে তাঁর মঙ্গলের জন্য কষ্ট করেও দিন কতক অন্য জায়গায় চল।"

স্নেহের আজ বিবেচনার সময় নাই, স্নেহের নিজের কষ্টের কথা ভাবিবার সময় নাই, তাহার কেবল মনে হইল "তাইত, টগর যাহা বলিতেছে—সব ঠিক;" সে বলিল—"যাব, কিন্তু কোথায় যাই।"

টগর। "আমার সঙ্গেত চল আমি শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছি, তাপর কোথায় যাবি ঠিক, করব।"

স্নেহ বলিল—"আচ্ছা তাই যাব,—একবার মেসো মশায়কে ডেকে বলে যাই—"

চারুর কথা আর বলিল না। টগর বুঝিল—তাহা হইলে ত যাওয়া হইবে না। সে বলিল—"আমার সঙ্গে যাবি তা আর বলবি কি? আর বল্লে যদি নাই যেতে দেন, তুই ত তাঁকে আর সব কথা খুলে বলতে পারবিনে, যদি যেতে চাস ত অমনিই চল। মা বলবে এখন তুই আমার সঙ্গে গেছিস। আয় ভাই আমার পাল্কী এসেছে—সেখানে গিয়ে তখন মুখ হাত ধুস"

টগর স্নেহলতার হাত ধরিয়া মাটি হইতে তুলিল—সে কোন কথা বলিতে পারিল না, আস্তে আস্তে তাহার সঙ্গে আসিয়া পাল্কীতে উঠিল, বেহারারা যখন পাল্কী তুলিয় বাড়ীর বাহির হইল, স্নেহ তখন আর পারিল না—টগরের কোলে শুইয়া পড়িয়া শিশুর মত ফুঁকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিছু পরে শান্ত হইলে টগর বলিল—"দিদি কাঁদিসনে; দিনকতক পরে দাদা একটু শান্ত হয়ে বিয়ে থাওয়া করলে আবার তো আসবি?"

এই প্রথম এই কথায় স্নেহলতার হৃদয় বিদ্ধ হইল। যখন সে নিজে ইচ্ছা করিয়া তাহাকে ছাড়িতেছে—তখন এ কথায় তাহার হৃদয়ে আঘাত লাগে কেন? চারু বিবাহ করুক ইহা ত তাহার অন্তরেরই ইচ্ছা। ইহার উত্তর—মানুষ অসংখ্য ভাবের সমষ্টি, তবে যে ভাব যাহার স্বভাবে প্রাধান্য গ্রহণ করে।

টগর বলিল "যাকে ভাল বাসিয়াছ তার সুখে সুখী হওয়াই ত আসল ভালবাসা, দেখ সূর্য্যমুখী কুন্দকে নিজে বিয়ে দিইয়ে দিলে—তবে ভাই দাদার জন্য তুই আর দিন কতক আলাদা থাকবিনে।"

"কোথায় থাকব ?"

"তোর শ্বশুর বাড়ি। একবার গিয়ে পড়লে ত আর ফেলতে পারবে না।

স্নেহলতা আর তাহাতে কোন কথা কহিল না, নিরাশ কাতর হৃদয়ে কষ্টের তীব্র যাতনায় ভাবিল "তাহাই হউক, আমার মত অভাগিনীর শান্তির আশা কেন ? অনলে ভয় কেন ? তাহাই হউক, আমি যখন সেই আশ্রয় ছাড়িলাম—তাহার সেই আকুল প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলাম, তখন তাহাই হউক। ভগবান যাহার সুখের জন্য আমি এই অগ্নিতে আশ্রয় লইতে আসিলাম তুমি তাহাকে সুখী কর।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

টগর স্নেহলতাকে উপরে বসাইয়া রান্না ঘরে শ্বাশুড়ির কাছে আসিয়া বলিল—"দিদি এসেছে—বিকালে এখান থেকে শশুর বাড়ী যাবে।"

এইখানে বলা আবশ্যক—জীবনের মার সহিত টগরের ব্যবহার ঠিক সাধারণ বঙ্গ গৃহের শ্বাশুড়ি-বধূর ব্যবহার নহে।

প্রথমতঃ—ছেলে বেলা হইতে জীবনের মার সহিত তাহাদিগের নিতান্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক, এক হিসাবে সে তাঁহার ঘরের মেয়ে—সুতরাং বিবাহ হইতে হইতে কিছু আর তাহার শ্বাশুড়িকে দেখিয়া লজ্জার উদয় হয় নাই, তাহার পর জীবনের মাও তাহাকে লজ্জা করিতে শিক্ষা দেন নাই—তাঁহার একমাত্র পুত্রবধূ বলিয়া তিনিও বৌকে লইয়া মেয়ের সাধ মিটাইতে গিয়াছেন, কাজেই শ্বশুর গৃহে আসিয়া বৌয়ের চিহ্নের মধ্যে শ্বাশুড়ির সাক্ষাতে তাহার মাথায় অল্প কাপড় উঠে আর তাঁহার সহিত কথা কহিবার আরম্ভে তাহার স্বাভাবিক উচ্চস্বর কিছু সংযত হইয়া আসে।

স্নেহলতা শ্বশুরবাড়ী যাইবে, শুনিয়া জীবনের মা আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন "কিশোরী বৌকে ডেকেছে নাকি ? বাপ মরে বুঝি ছেলের সুবুদ্ধি হয়েছে ?"

বৎসর খানেক হইল কুঞ্জ বাবুর মৃত্যু হইয়াছে, এখন কিশোরীই বাড়ীর কর্ত্তা।

টগর আধঘোমটার মধ্য হইতে মাথা নাড়িয়া বলিল—"না গো না, তা নয়!

শ্বাশুড়ি বলিলেন—"তা নয়ত কি ?

টগর বলিল—"দাদা ওকে বিয়ে করতে যায়, আমাদের বাড়ী থাকলে ত আর চলে না শ্বশুরবাড়ী না গিয়ে করবে কি ?" জীবনের মা কতকটা বুঝিলেন ব্যাপার খানা কি ? দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন—"তা আমাদের এখানে থাক না—সেখানে যাওয়া আর আগুণে ঝাঁপ দেওয়া সমান। আহা বাছার কেউ নেই গো" জীবনেরমার চোখ দিয়া জল পড়িল।

টগর বলিল—"সে কি করে হবে ? এখানে কি আর দাদা আসতে পারবে না ?"

জীবনের মা আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। তিনি যদিও গৃহিণী, কিন্তু সংসারে

ভাল মানুষের পরাজয় সর্ব্বত্র। টগর কোথা। তাঁহার মতামত বুঝিয়া কাজ করিবে—না তাহার বদলে তিনিই তাহার মন বুঝিয়া, তাহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। উপরে আসিয়া স্নেহলতার সেই বিবর্ণ বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া তাহার বুক ফাটিয়া চোখে জল আসিতে লাগিল।

বিকালে স্নেহলতার জন্য পালকী আসিল। স্নেহ চোখের জলে ভাসিয়া জীবনের মাকে অনুরোধ করিয়া বলিল—"জ্যেঠাইমা আমি একলা যেতে পারব না, তুমি আমাকে রেখে এস"।

অনেক দিন হইতে দুই বাড়ীর মধ্যে মনান্তর চলিতেছে—সেখানে অযাচিত যাওয়া তাঁহার পক্ষে একরূপ অপমান, তথাপি তিনি এই অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, স্নেহলতার দুঃখ এমনি তাঁহার মর্ম্মে প্রবেশ করিল।

পালকী বেহারারা অপূর্ব্ব ঐক্যতান করিতে করিতে যখন কুঞ্জ বাবুর বাড়ীর উঠানে পালকী নামাইল, তখন উপরের বারান্দা হইতে একজন কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কে এল? কার পালকী!" সেই স্বরে মুহূর্ত্তে স্নেহের নিকট দশবৎসর পিছাইয়া পড়িল—সেই বিবাহের দিন হইতে শ্বশুর বাড়ী বাস কালের সমস্ত পীড়ন যন্ত্রণা সে আজিকার দিনের ঘটনার মত করিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

জীবনের মা বলিলেন—"আমি দিদি" বলিয়া অবগুণ্ঠনবতী স্নেহের হাত ধরিয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন। স্নেহ শাশুড়িকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল, জ্যেঠাইমা মালা জপিতে জপিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে?"

জীবনের মা বলিলেন—"তোমারি বৌ!"

জ্যেঠাইমা গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"আমার বৌ কে? মোহনের বৌটা বুঝি! সব খেয়েদেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার এখানে! দূর হ, দূর হ। যে দাসীটা কাল বলতে এসেছিল তাকে ত বলেদিলুম এখানে ঝাঁটা ছাড়া আর কিছু মিলবে না।"

জীবনের মা বলিলেন—"দিদি ওকথা বলোনা, ওর মাবাপ নেই, তোমরাই ওর সব। তোমরা ওকে ফেল্লে কি চলে?

জ্যেঠাইমা সপ্তমে স্বর চড়াইয়া বলিলেন—"আপনার যারা ছিল—তারা বুঝি আর রাখলে না।"

জীবনের মা। "রাখবেনা কেন,—তবে মেয়ে বড় হয়েছে, শ্বশুরকুল থাকতে সেখানে থাকাটা কি ভাল দেখায়? পাঁচ জনে এ-ত তোমাদেরি যে নিন্দা করে, মেয়ে কি আর তা বোঝে না; বড় হলে কে আপন কে পর তাত আর বুঝতে বাকী থাকে না। ও নিজে ইচ্ছা করেই এসেছে।"

জ্যেঠাই। "ওরে আমার আপনার রে! এমন আপনার চাইনে। দূর দূর।"

জীবনের মা। দেখ দিদি, ঘরের কুকুর বিড়ালটাকেও ভাত দিতে হয়,. আর আপনার বৌকে তুমি ভাত দিতে পারবে না, সেও কি কথা!"

এই সময় একজন ডাকিল "জ্যেঠাইমা, কি গোলমাল হচ্ছে,—একবার শুনে যাও"—

জ্যেঠাই মা বলিলেন—কিশোরী এসেছিস, যাচ্ছি।"

জীবনের মা ও স্নেহ বারান্দাতেই দাঁড়াইয়া রহিলেন জ্যেঠাইমা ঘরের মধ্যে যেখান হইতে কিশোরী ডাকিয়াছিল সেইখানে উপস্থিত হইলেন, নিকটে আসিতে কিশোরী বলিল—"জ্যেঠাইমার সঙ্গে ও কে ?

জ্যেঠাই মা বলিলেন "আবার কে ? আবাগীর বেটী তিনকুলখাকী, সোহাগ কাঁড়িয়ে এখন থাকতে এসেছে। বড় যে জেদ করে স্বামী নিয়ে গেলি ! খ্যাঙরা মারব আর তাড়াব।" কিশোরী আশ্চর্য্য হইল বলিল—"কে থাকতে এসেছে ? বৌ ! জগৎ বাবু যে পাঠালেন ?"

জ্যেঠাইমা। ধেড়ে মেয়ে হয়েছে, পাঁচজনে নিন্দে করে, বলে—শ্বশুর বাড়ী থাকতে মেয়েকে পাঠায় না,তাই পাঠিয়েছে। যদি সেই পাঠাবি তবে তখন রাখতে বলেছিল কে?"

কিশোরী বলিল—"না জ্যেঠাইমা, বৌ এসেছে ভালই হয়েছে, ওকে তাড়িও না, রেখে দাও, বরঞ্চ আর যেতে দিওনা। একবার হাতে পেয়ে ছাড়ে। জগৎ বাবু ইচ্ছা করলেই মকদ্দমা করে দাদার বিষয়ের ভাগ ওকে দিতে পারে—এসেছে ভালই, আমাদের ভাগ্যের জোর।"

জেঠাইমা বলিল—"বটে! তা আমাকে আগে বলতে হয় ? বেটা মকদ্দমা করে বিষয় নেবে ! রাখব এই খ্যানে, খ্যাঙরা মারব আর ছুটি ছুটি করে ভাত দেব।"

কিশোরী বলিল—"সে যাই কর—কিন্তু যেতে দিওনা। আমি আজ শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছি, তাকে রাতে নিয়ে আসব। আমি এখন যাই, তুমি দেখো যেন বৌ না যায়।"

কিশোরী গেলে জ্যেঠাইমা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "অমন সুবোধ দেওর পেয়েছে তাই এযাত্রা বেঁচে গেল,—কিশোরী বল্লে—বৌ এসেছে, ওকে কি আমরা ফেলতে পারি, আমাদের এক মুঠা জোটে ত ওরও জুটবে। তবে থাক চলানী, আবার যেন চলিয়ে জগৎবাবুর বাড়ী যাসনে।"

এইরূপ সম্ভাষণে স্নেহ আবার শ্বশুর বাড়ীর অন্তর্ভুক্ত হইল।

যশোদা।

বৈষ্ণব সাহিত্যের আর একটী প্রেমের চরিত্র যশোদা। রাধার সহিত যশোদার প্রেম অবশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন—এক জনের প্রেম স্ত্রীপুরুষঘটিত যৌবনের প্রণয়, অপরের সুগভীর সন্তানস্নেহ—কিন্তু আমাদের প্রেমানুশীলনে যশোদার প্রভাব

নিতান্ত সামান্য নহে। যশোদা গোপকন্যা, গোপপত্নী, কৃষ্ণকে জন্মাবধি আপন পুত্র জানিয়া লালন পালন করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং স্বভাবতই কৃষ্ণের উপরে তাঁহার মায়া পড়িয়াছে—তিনিই কৃষ্ণের জননী। যশোদার প্রেম এই ভাবেই আলোচিত হইয়া আসিতেছে। যশোদা কন্যাও বটে, সহধর্ম্মিণীও বটে, কিন্তু ফুটিয়াছেন মাতৃ-রূপে। স্নেহবৃত্তিই তাঁহার সমধিক বলবতী। কৃষ্ণকে দুই দণ্ড না দেখিলে তিনি অধীর হইয়া পড়েন। কৃষ্ণ তাঁহার প্রাণাধিক। কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে ধেনু চরাইতে যান, যশোদা প্রহর গণিতে থাকেন; কৃষ্ণ খেলিতে খেলিতে প্রাঙ্গণের বাহির হইলে যশোদা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া দেখিতে আসেন; কৃষ্ণের পাছে কোনও কষ্ট হয় এই ভয়ে নন্দরাণী সর্ব্বদাই ব্যাকুল। যশোদার এই স্নেহভাবে এমন একটী সরল স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখা যায়, তাহা অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। আমাদের চক্ষের সম্মুখে সেই আভীরপল্লীর ছায়া-সুপ্ত গ্রাম্য ছবি ফুটিয়া উঠে। সেখানে গিয়া হৃদয় যেন মাতৃস্নেহ অনুভব করিয়া আসে। যশোদার স্নেহ বড়ই মধুর। সে স্নেহ পরিপূর্ণ মাতৃহৃদয় হইতে নিঃসৃত।

যশোদায় আধ্যাত্মিকতার বড় গোলযোগ নাই। এই কারণে যশোদার চরিত্র আলোচনার কতকটা সুবিধা হইয়াছে। রূপক হিসাবে না দেখিলেও সে সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ। রাধার চরিত্রের মত যশোদা-চরিত্র জটিল নহে। রাধার একদিকে প্রবল আধ্যাত্মিকতা, আর একদিকে সুশৃঙ্খল সমাজ-নিয়মের গুরুতর ব্যভিচার। কৃষ্ণের সহিত রাধিকার সম্বন্ধ বিশেষ জটিল। একে ত দাম্পত্য-সম্বন্ধই সহজে রহস্যময়, তাহাতে আবার রাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধ সম্পর্ক এবং নীতি বিরুদ্ধ। এই কারণেই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যারও রাধাকৃষ্ণের প্রয়োজন অধিক। কারণ, রাধাকৃষ্ণের সাধারণ্যে যেরূপ প্রতিষ্ঠা, তাহাতে এরূপভাবে রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা না করিলে দেশের নৈতিক অবস্থার শোচনীয় পরিণাম সম্ভাবনা। রাধাকৃষ্ণভক্ত কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনই নৈতিক বন্ধন যথেষ্ট শ্লথ। এই দেবলীলাকে অনেকে অনেক ভাবে দেখেন। সম্প্রদায়বিশেষে ইহা পার্থিব জীবনের অনুকরণীয় আদর্শ মাত্র। সুতরাং এই সকল সম্প্রদায়ে নীতিবিগর্হিত অনুষ্ঠান কিরূপে প্রশ্রয় পায় বলা বাহুল্য। যশোদার প্রেম মাতৃহৃদয়ের অগাধ স্নেহ। ইহাতে যৌবন নাই, পূর্ব্বরাগ নাই, জ্বালা নাই, জঞ্জাল নাই। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কর বা না কর যশোদা যেমন তেমনি—তাঁহার অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। সে শুভ্র সরল প্রকৃতি স্নেহময় সৌন্দর্য্যে সর্ব্বদাই সুপরিস্ফুট। তাহা বুঝিবার জন্ত অসাধারণ পাণ্ডিত্য বা প্রতিভার আবশ্যক করে না।

কিন্তু এইখানে আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে দু'একটা কথা সারিয়া যাওয়া ভাল। যশো-দারও রূপকে ব্যাখ্যা হয় কিনা। তবে জটিলতা-অভাবে রাধার মত ব্যাখ্যাবাহুল্য কাহারও বোধ করি নাই। প্রথমতঃ দেখা যাক্, যশোদার অভ্যুত্থান কিসের মধ্য হইতে? রূপক-ধর্ম্ম না লোক-কথা? এ বিষয়ে রীতিমত প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে

যতদূর বুঝা যায়, যশোদা রাধার পশ্চাদনুসারিণী। অর্থাৎ রাধা যেরূপে ধীরে ধীরে বিবিধ অবস্থার মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছেন, যশোদারও সেইরূপ বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া বর্ত্তমান পরিণতি। সম্ভবতঃ সাধারণের মধ্যে প্রাচীনকালে পিতৃপিতামহাগত কতকগুলি সরস কাহিনী প্রচলিত ছিল। রাধা এবং যশোদা উভয়েই এই সকল গ্রাম্য কাহিনীর অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন। ক্রমে কবি এবং সংস্কারকদিগের হস্তে পড়িয়া হয় কাব্য হইতে আধ্যাত্মিক রূপকে নয় আধ্যাত্মিক রূপক হইতে কাব্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। শুধু রাধা এবং যশোদা বলিয়া নহে, শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি অনেকেরই বোধ করি সেকালের বিবিধ প্রচলিত গল্পের মধ্য হইতে আবির্ভাব। কৃষ্ণ এই সকল গল্পের কেন্দ্রস্থল। বন্ধুরূপে, প্রণয়িণীরূপে, জননীরূপে তাঁহার চারিপার্শ্বে বিবিধ চরিত্র জড় হইয়া একটা সুশৃঙ্খল বৃহৎ আধ্যাত্মিক রূপক রচিত হইয়াছে। রূপক-ব্যাখ্যা প্রথমে কে করেন জানি না, কিন্তু ইহা অতি প্রাচীন—বঙ্গ সাহিত্যের বীজ বপনেরও বহু পূর্ব্বে। এবং এই আধ্যাত্মিক রূপকই বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তি।

এখন আধ্যাত্মিকতা অস্বীকার না করিলেও এই সকল চরিত্রের মধ্যে কাব্য যেরূপ পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহাতে কাব্য-সৌন্দর্য্য হিসাবে সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিলে ইহাদিগের সৌন্দর্য্যহানি অথবা আধ্যাত্মিকতার প্রতি অবিচার করা বোধ করি হয় না। কাব্যে আমরা যে সৌন্দর্য্যটুকু দেখিতে পাই তাহার আলোচনায় দোষ কি?* কাব্য সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটনে বঙ্গ সাহিত্যের বৈষ্ণব কবিরাই প্রধান। তাঁহারা যে আধ্যা-

---

* রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় পৌরাণিক কথার ঐতিহাসিক তত্ত্ব অথবা উদ্ভবের প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইলেও শিক্ষিত সমাজে উহা রূপক বলিয়া খ্যাত। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বধর্ম্মের মধ্যেই এরূপ রূপকের অস্তিত্ব দেখা যায়, আর সরল ভাবে দেখিতে গেলেও ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। সরল হৃদয়ে মানবপ্রেম ঈশ্বর প্রেমের ছায়া স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়—উভয়েই সেই এক তন্ময় ভাব। ভক্ত ভগবানে তন্ময় কিন্তু ভগবান ভক্তের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইলেও তাহাতে তন্ময় নহেন, সকলকেই যথাযোগ্য প্রেম বিতরণে পরিতুষ্ট করিয়াও আপনাতে আপনি সংযত। এই ভাবকে মানব ছাঁচে ঢালিলে তাহা রাধা কৃষ্ণের প্রেমের ভাব ধারণ করে না কি?

কাব্য রচনার পর যদি আধ্যাত্মিক রূপকের সৃজন হইত তাহা হইলে কোন না কোন শ্রেণীর লোকের মধ্যে ইহা কেবল কাব্য ভাবেই আবদ্ধ থাকার সম্ভাবনা, কিন্তু ইহার কোন রূপ নিদর্শন ত এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যদি ইহা রূপক হয় তবে আধ্যাত্মিক রূপক এবং এই ভাবে, ইহা কোন মতেই সাধারণ কাব্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না, ভক্তি-কাব্য সাধারণ কাব্য হইতে স্বতন্ত্র। দুগ্ধকে জল হিসাবে দেখিলে যেমন তাহার বিশেষত্ব প্রকাশ পায় না—তাহাতে জলের অংশ থাকিলেও তাহাকে প্রকৃত ভাবে দেখিতে চাহিলে যেমন দুগ্ধ হিসাবে দেখাই আবশ্যক তেমনি আধ্যাত্মিক রূপককে সাধারণ কাব্য হিসাবে দেখিলে তাহার [illegible] তাহার প্রকৃত ভাব প্রকাশ পায় না। ভাং সং।

ত্মিক রূপক সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন এমন নয়, কিন্তু কবিস্বভাববশতঃ কাব্যই সমধিক পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই—এরূপ হইয়াই থাকে। তবে এক কথা, আধ্যাত্মিকতাকে সর্ব্বত্র বর্জ্জন করা যুক্তিসঙ্গত না হইতে পারে। তাই বলিয়া সর্ব্বত্র তাহাকে খাড়া করিয়া রাখাও যুক্তিসঙ্গত নহে। যেখানে মূল উদ্দেশ্য লইয়া টানাটানি সেখানেই আধ্যাত্মিকতা বিচার্য্য। কাব্যসৌন্দর্য্য-অভিব্যক্ত চরিত্রগত রস-ভাব আলোচনাকালে কথায় কথায় আধ্যাত্মিক রূপক-চাতুর্য্যের উল্লেখ-বাহুল্য কেবল মাত্র অনাবশ্যক নহে, অনেক সময়ে সৌন্দর্য্য-উপভোগের বিশেষ ব্যাঘাতক। বলা বাহুল্য, ধৈর্য্যচ্যুত পাঠকেরা এখানেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইতেছেন। আর অধিকদূর গড়াইলে যশোদা তাঁহাদের মন হইতে অনেকটা মুছিয়া আসিবার সম্ভাবনা। এইবারে দেখা যাক্, বৈষ্ণব কবির যশোদার অবস্থা কিরূপ।

যশোদা আমাদের দেশের স্নেহময়ী জননীর চিত্র। বৈষ্ণব সাহিত্যে ঈশ্বরপ্রেমের মানবীকরণ হইয়াছে—যশোদায় বাৎসল্য রসের অনুশীলন। বৈষ্ণব কাব্যে উমার স্থান তিনি অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু উমার সহিত যশোদার প্রভেদ বিস্তর। নগেন্দ্রনন্দিনী শক্তিরূপিণী—শক্তির পরিচয়স্থল। যশোদা শক্তির বড় ধার ধারেন না। তিনি বৈষ্ণব ভক্তের স্নেহময়ী জননীমাত্র। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গেই কোমলতা। বৈষ্ণব ধর্ম্ম কোমল ভাবে পূর্ণ। এই জন্যই বোধ করি সমতলক্ষেত্রে তাহার সমধিক প্রাদুর্ভাব। নগেন্দ্রনন্দিনীর চরিত্র পাষাণের তুষার-স্নেহে গঠিত। কোমলতার মধ্যেও তাহাতে একটা দৃঢ় বল প্রকাশ পায়। পার্ব্বতী তেজস্বিনী। শিবের সহধর্ম্মিণী এরূপ হইবারই কথা। যশোদা গোপবধূ, গোপগৃহিণী—ত্রিশূলও নাই, নন্দীও নাই, ভৃঙ্গীও নাই, নাই সুরাসুরসম্পর্ক, নাই কোনও গণ্ডগোল—আভীরপল্লীর শ্যামল সৌন্দর্য্যে কৃষ্ণের মুখখানি দেখিয়া পরিতৃপ্ত। অহিংসার ধর্ম্ম শক্তি লইয়া কি করিবে? বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রেম চাহে। এই জন্য বৈষ্ণব সাহিত্যে ভাষা, ভাব, গঠন, বৃত্তি সকলই কোমল। এমন কি, অনেক স্থলে কঠিন ভাবকেও কোমল ভাষায় গলিয়া যাইতে দেখা যায়। কঠিনতা বুঝি বৈষ্ণবের মর্ম্মে আঘাত করে। তাই হিরণ্যকশিপুবধও তরল ভাষায়, ললিত ছন্দে, কুসুম উপমায় সভ্রূভঙ্গ নদীর মত বিলাসে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। বৈষ্ণব হৃদয় কোমল রসে ভরপুর।

এই কোমল বৈষ্ণব হৃদয়ের কোমলাঙ্গিনী সৃষ্টি—যশোদা। উপরে আমরা বলিয়াছি, যশোদায় বাৎসল্যের স্ফূর্ত্তি। আরও বলি, যশোদায় কেবলমাত্র বাৎসল্য—অন্যান্য রসের বিকাশ হয় নাই। নগেন্দ্রনন্দিনী বিবিধ অবস্থায় বিভিন্ন ভাবে সুন্দরী। তিনি কন্যারূপে, সহধর্ম্মিণীরূপে, মাতৃরূপে ফুটিয়াছেন। যশোদা বরাবর এক। সেই কৃষ্ণগতপ্রাণা নন্দগৃহিণী। বৈষ্ণব সাহিত্যে এক একটী বিভিন্ন চরিত্রে প্রেমের এক একটী বিশেষ ভাব আলোচিত হইয়াছে। একই চরিত্রে বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ

বড় দেখা যায় না। আমার বোধ হয়, বৈষ্ণব সাহিত্যের গীতিকাব্যে শ্রেষ্ঠতার কারণই এই। বৈষ্ণব চরিত্রগুলি বিশেষরূপে গীতিকাব্যোপযোগী। তাহারা যেন তরল ভাববিশেষকে জমাইয়া গঠিত। এবং সে ভাবগুলি কেবলই কোমল প্রেমজ। কোমল প্রকৃতি, কোমল হৃদয়, কোমল সৌন্দর্য্যে বৈষ্ণব কাব্য রচনা। বৈষ্ণব ধর্ম্মই প্রেম এবং কোমলতা। তাহাতে কেমন একটা বিশেষ তরল lyrical ভাব। এ ভাব তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রবাহিত। বাঙ্গালার প্রকৃতিও ইহার অনুকূল।

প্রকৃতির সহিত মানব-ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বৈষ্ণব কবিদিগের রচনায় পরিস্ফুট। তাঁহাদের চরিত্রগুলি অনুকূল প্রকৃতির মধ্যে গঠিত। যমুনা, নিকুঞ্জ, পল্লবিত শ্যাম-লতায় কাঠিন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। এ সৌন্দর্য্যে বরং কেমন যেন ঢলঢল আলস ভাব। বৈষ্ণব কাব্যেও এই তরল আলস। রাধার রূপ বর্ণনা দেখ, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর স্বর শুন, যশোদার পুলক-স্নেহ অনুভব কর, এ ভাবের ব্যতিক্রম কদাচ দৃষ্ট হইবে। অলস মধ্যাহ্ন, দূর বনপ্রান্তে বৃক্ষচ্ছায়ায় দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিতেছেন। সে উদাস বাঁশীর স্বরে মন যেন কেমন করে। রাধিকার হৃদয় আকুল—ঢলঢল যৌবন যেন বাহিরিতে চায়। শুধু ইহাই নহে, কৃষ্ণের দাঁড়াইবার ভঙ্গীতেও এই আলস-ভাব—কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কৃষ্ণের বাঁশী যে হৃদয়ে বাজিয়াছে সেখানেও এই ভাবানুকূলতা। রাধা প্রাচ্য সুন্দরী। প্রাচ্য রূপসীর গঠনে বর্ণে ভাবে তরলতা। তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তরলভাবে ঢলঢল। গজেন্দ্রগমনে, আধ চাহনিতে তাহা অভিব্যক্ত। এই সুগোল গঠন, তরল সৌন্দর্য্য বাঁশীর উদাস স্বরে শিথিল। সমস্ত ভাবের মধ্যে কেমন সামঞ্জস্য।

যশোদাও বৈষ্ণব হৃদয়ের এই কোমল ভাবে গঠিত। তাঁহার ভাবের সহিত প্রকৃতির মিলন না হইবে কেন? তিনিও ত এই প্রাচ্য রূপসী। তবে প্রেয়সীরূপে তিনি ফুটেন নাই বলিয়া রাধার মত তাঁহার রূপ লইয়া এত নাড়াচাড়া হয় নাই। যশোদার সমস্ত সৌন্দর্য্য তাঁহার স্নেহভাবে ঢলিয়া পড়িয়াছে। তাহাতেই যশোদাকে বেশ বুঝা যায়। অন্ততঃ বুঝিতে বিশেষ বিলম্ব হয় না। আভীরপল্লীর সহিত যশো-দার কল্পনা অবিচ্ছেদ্য—দুগ্ধ ঘৃত নবনীতের সহিত তাঁহার বুঝি কি যোগ আছে। কিন্তু যশোদায় শিথিল আলস-ভাব কোথায়? বৈষ্ণব কাব্যে তাঁহার স্নেহের মধ্যেই এ ভাব সুপরিস্ফুট। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত বুঝি এ ভাব জড়িত। তাই বৈষ্ণব ধর্ম্ম যেখান দিয়া বহিয়া গিয়াছে সেখানে সমাজ-বন্ধন অপেক্ষাকৃত শিথিল, বৈষ্ণব সাহিত্য যে জাতির হৃদয় ভেদ করিয়া উঠিয়াছে সে জাতির বসন-ভূষণেও আঁটাসাঁটা ভাবের অভাব। এমন বলি না যে, ধুতি চাদরের দোধুল্যমান শোভা বৈষ্ণব ধর্ম্মের ফল, কিন্তু ইহা যে বাঙ্গালী জাতির বৈষ্ণব ভাবের ফল সে বিষয়ে সন্দেহ বড় নাই। বাস্তবিক, আমাদের বসনেও একটা আলস ভাব, একটা বিশেষ lyrical কিছু আছে। আমরা বৈষ্ণবই বটে।

আমার বোধ হয়, বৈষ্ণব কল্পনা শাক্তের মত জম্‌কালো সৌন্দর্য্যপ্রিয় নহে। সরল সৌন্দর্য্যই বৈষ্ণবের বিশেষ প্রিয়। শাক্ত কল্পনা দুর্গার জন্য বাহন সিংহ আনিল, একই অঙ্গে দশটী বাহু যোজনা করিল, চারিপার্শ্বে অসম্ভব অমানুষিক অনেক ব্যাপার না জুড়িয়া পরিতৃপ্ত হইল না। বৈষ্ণব হৃদয় বাহন সিংহ ছাড়িয়া ধেনু চরাইয়া পরিতৃপ্ত, সিংহাসন ছাড়িয়া গোপগৃহে আশ্রয় খুঁজে। যশোদার সৌন্দর্য্যে একটী কেমন সরল দীন-ভাব আছে। সে ভাব জননীতেই সম্ভবে, শক্তিতে সম্ভবে না। তাঁহার স্নেহে বিশেষ সুকুমারতা। বৈষ্ণবেরাই এ সৌকুমার্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম। নগেন্দ্র-নন্দিনীর সৌন্দর্য্যে তাই বলিয়া সরল স্নেহের অভাব প্রমাণ হয় না। কিন্তু তিনি যেমন কখনও অন্নপূর্ণা, কখনও বা পাষাণী, যশোদা সেরূপ নহেন। পাষাণ তাঁহার মধ্যে আদবে নাই। যশোদার বোধ করি গুমরিয়া থাকার ভাবের বিশেষ অভাব। তাঁহার অশ্রু মর্ম্মের মধ্যে সহজে জমাট বাঁধে না। কৃষ্ণকে সাজাইয়া দিয়া তাঁহার সুখ, কৃষ্ণকে দুধটুকু ক্ষীরটুকু খাওয়াইতে পারিলেই পরিতৃপ্তি। যশোদার জীবনে আর কোনও সাধ আহ্লাদ নাই।

যশোদার স্নেহে সর্ব্বদাই যেন কি হারাই হারাই ভয়। হইবারই কথা—কত কষ্টে কৃষ্ণ বাঁচিয়াছেন। তাঁহার পাঁচটী সন্তান নাই—সবে ধন নীলমণি। যশোদার সমস্ত হৃদয় কৃষ্ণে কেন্দ্রীভূত। হয়ত এই জন্যই সহধর্ম্মিণী এবং কন্যারূপে তিনি ফুটিতে পারেন নাই। যশোদা জননী এবং স্নেহময়ী। কিন্তু শুধু এইটুকু বলিলে বিশেষ কিছু বলা হয় না। যশোদার স্নেহের প্রকৃতি আলোচ্য। মাতা স্নেহময়ী কে নহেন? আপন সন্তানের প্রতি পরিপূর্ণ স্নেহ থাকিলেও ব্যক্তি বিশেষের মানসিক অবস্থানুসারে স্নেহের বিকাশ স্বতন্ত্রভাবে। স্নেহে ব্যক্তিগত বিশেষত্বের ছায়া পড়ে। যশোদার চরিত্র হইতেই আমরা তাহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইব। যশোদার সহিত অপর কতকগুলি মাতৃহৃদয়ের তুলনা করিয়া দেখিলেই আমাদের কথা সপ্রমাণ হইবে।

প্রথমতঃ কৃষ্ণ যশোদার গর্ভজাত নহেন। তাঁহার জননী দেবকী। কিন্তু আশৈশব যশোদার স্নেহেই কৃষ্ণ লালিতপালিত হইয়াছেন। সুতরাং যশোদাই তাঁহার মাতৃস্থান অধিকার করিয়াছেন। এখন যশোদাকেই কৃষ্ণের জননী বলা যায়। জনয়িত্রী নহেন বলিয়া যশোদার স্নেহ মাতৃস্নেহ অপেক্ষা এক তিল ন্যূন নহে। বাস্তবিক, তিনি কৃষ্ণকে যেরূপ অগাধ স্নেহে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন সেরূপ স্নেহ পরিপূর্ণ মাতৃহৃদয় ব্যতীত কোথাও মিলে না। যশোদার নিকট কৃষ্ণ ত আর পরের পুত্র নহেন। যশোদার কৃষ্ণস্নেহে তাঁহার প্রকৃতিগত সন্তানস্নেহ প্রকাশ পায়। আপন সন্তানকে প্রাণাধিক ভাল বাসিলেও সকল রমণীর প্রকৃতি এরূপ স্নেহগঠিত নহে। মহিলারা মার্জ্জনা করিবেন, আমার বোধ হয়, স্বাভাবিক সঙ্কীর্ণতাবশতঃ রমণী-হৃদয় অনেক সময়ে পরের সন্তানের প্রতি অল্প বিস্তর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকে।

আপন সন্তানকে ভালবাসা এবং সন্তানমাত্রকে ভালবাসা স্বতন্ত্র বৃত্তি। রমণী স্নেহময়ী হইলেও তাই বুঝি তাহার হিংসার তীব্রতা।

যশোদার স্নেহে হিংসা কোথাও নাই। তাঁহার চারিপার্শ্বে শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি কৃষ্ণের সখাগণ। আভীরপল্লীর বালকেরা বোধ করি যশোদাকে বিশেষ ভালবাসিত। ইহাতেই তাঁহার কোমল স্নেহ পরিস্ফুট। বিরক্তি শিশুহৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না। হাসি হাসি মুখ, মৃদু মধুর সম্ভাষণ, স্নেহ-প্রফুল্ল চিত্ত সরল শৈশবের চুম্বক। যশোদার এ সকল ছিল। স্নেহগঠিত হৃদয় এইরূপই হইয়া থাকে। সন্তানস্নেহ তাঁহার বিশেষ প্রবল। তাই তাঁহার চারিদিকে এতগুলি বাল-চরিত্র। যশোদা সকলগুলিকেই স্নেহ করেন। তাই বলিয়া কি কৃষ্ণের মত ? তাহা অবশ্য নয়। কৃষ্ণ তাঁহার প্রাণাধিক। কৃষ্ণের মত অপরকে ভালবাসিবেন কি করিয়া ? তাহা যে নিতান্তই প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে ধেনু চরাইতে বাহির হইলে যশোদা সকলকে বলিয়া দেন যে, কৃষ্ণকে লইয়া সকাল সকাল যেন তাহারা ফিরিয়া আসে। তিনি কি সহজে কৃষ্ণকে ছাড়িতে চাহেন ? বলরামকে এমন কতবার বুঝাইয়াছেন, কৃষ্ণ দুধের ছেলে, মায়ের বসন ধরিয়া ফিরে, দণ্ডে দণ্ডে খায়, তাহাকে বনে ছাড়িয়া দিয়া জননীহৃদয় কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে ? বলরাম অনেক আশ্বাস দিয়া বলেন, তাহা বলিলে কি হয়, গোপকুলে থাকিয়া গোচারণ না শিখিলে নিরুপায়। যশোদা দায়ে পড়িয়া কৃষ্ণকে সাজাইতে বসেন। কিন্তু হাত সরে না। কেবলই

"স্তনক্ষীরে আঁখিনীরে বসন ভিজিয়া পড়ে, বেশ বানাইতে কাঁপে কর।
কান্দি গদগদ কহে, আজি রাখি যাহ সবে শূন্য না করিয়ে মোর ঘর॥"

কৃষ্ণের বেশভূষা আর শেষ হয় না। যশোদা চুম্বনে চুম্বনে গোপালকে ছাইয়া ফেলিলেন। অবশেষে বলাই চূড়া বাঁধিয়া দেয়, শ্রীদাম ললাটে তিলক। যশোদা তখন রক্ষামন্ত্র পড়িয়া কৃষ্ণকে সাবধান করিয়া দিলেন যে,

"আমার শপতি লাগে, না ধাইহ ধেনুর আগে, পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু, পুরিহ মোহন বেণু, ঘরে বসি আমি যেন শুনি।
বলাই ধাইবে আগে, আর শিশু বামভাগে, শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও, সঙ্গ ছাড়া না হইও, মাঠে যাদু নানা ভয় আছে।
ক্ষুধা হৈলে চাহিয়া খাইও, পথপানে চাহিয়া যাইও, অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইহ কানু, হাত তুলি দেহ মোর মাথে।
থাকিহ তরুর ছায়ে, মিনতি করিছে মায়, রবি যেন না লাগয়ে গায়ে।"

ক্রোড়ে থাকিতেই যশোদা কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল, থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠেন, চোখের আড়াল হইলে ত ভাবিবারই কথা। "এ বয়সে গোষ্ঠে গেলে প্রাণ কি ধরিতে পারে মায় ?"

যশোদার স্নেহের প্রকৃতি ইহাতে অনেকটা বুঝা গেল। গর্ভধারিণী না হইলেও কৃষ্ণ-জননী বলিয়াই তিনি গণ্য। যশোদার কখনও এমন মনে হইত না যে, তাঁহার গর্ভে নন্দের একটী পুত্র জন্মিলে ইহাপেক্ষা কত সুখ হইত। এরূপ মনে হইবার কারণ ও ছিল না। তিনি কৃষ্ণকে তাঁহার গর্ভজাত নন্দনন্দন বলিয়াই জানিতেন। দেবকী-তনয় জানিলেও কৃষ্ণের উপর রাগ করিয়া তিনি কখনও ক্ষণিকের জন্য কৃষ্ণকে পরের ছেলে ভাবিতে পারিতেন না। তাঁহার স্নেহ অগাধ এবং অকপট। অকপট এই জন্য যে, এ স্নেহে কোথাও আত্মপ্রবঞ্চনা নাই। অর্থাৎ কল্পনায় তিনি আপনার স্নেহকে বাড়াইয়া দেখিতেন না। কৃষ্ণকে ভালবাসা তাঁহার প্রকৃতি—ভাল না বাসিয়া থাকিবার যো নাই। তাই বলিয়া কৃষ্ণকে স্নেহ জানাইতে তিনি ব্যস্ত নহেন। অথবা কৃষ্ণ তাঁহার স্নেহের মর্য্যাদা কতদূর বুঝেন না বুঝেন হিসাব করিয়া দেখেন না। যশোদার স্নেহ-উৎস চির-উৎসারিত। কৃষ্ণকে ভাল বাসিতেন বলিয়াই আমরা যশোদার স্নেহ-ভাবের সম্পূর্ণ পরিচয় পাই না। তাঁহার কথাবার্ত্তায়, ধরণধারণে, পরের সন্তানের প্রতি সরল দৃষ্টিতে এ ভাব ধরা দেয়। কৈকেয়ী-প্রকৃতির সহিত তাঁহার ভালবাসার বিস্তর তফাৎ। রাজ-অন্তঃপুরের প্রাচীররক্ষিত জটিলতা যশোদা-চরিত্রে দেখা যায় না। যশোদার স্নেহ মধুর। তিনি কাহাকেও ব্যথা দিতে পারেন না। সন্তানটীকে বুকে করিয়া রাখিয়াই তাঁহার চূড়ান্ত শান্তি। এবং এই অবস্থাতেই তিনি পরিতুষ্ট। পরের সন্তানে তাঁহার দৃষ্টি কখনও তীব্র নহে। যশোদার অন্তর নির্ব্বিবাদী, অসূয়াশূন্য, স্নেহগঠিত। কোমলতা তাঁহার প্রকৃতি, স্নেহ তাঁহার প্রাণ।

যশোদার শাসন হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মনে পড়ে, কৃষ্ণ যে দিন নবনী চুরি করিয়া খাইয়াছিলেন, যশোদা তাঁহাকে ধরিতে যান। কৃষ্ণ এ ঘর ও ঘর দিয়া ছুটিয়া পলাইলেন। যশোদা তখন গোপালকে না দেখিয়া ব্যাকুল। শাসন ঘুরিয়া গেল—কৃষ্ণ আসিলে হয়। যশোদা কাঁদিতে বসিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে আমরা শিক্ষিতা জননীর মধ্যে সন্তানের চরিত্রগঠনসমর্থ যে সকল গুণ দেখিতে চাহি তাহা যশোদায় বোধ করি মিলে না। কিরূপেই বা মিলিবে? গোপগৃহিণীতে তাহা আশা করাই অন্যায়। শিক্ষা ত যশোদার চরিত্রে কোথাও অভিব্যক্ত নহে। যশোদার যাহা কিছু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। গোপগৃহিণীর আত্মবিস্মৃত পরিপূর্ণ স্নেহ মাতৃস্নেহের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যশোদাকে জননীর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আদর্শ বলিতে পারি না। অর্থাৎ সন্তান-গঠনের জন্য স্নেহময়ী জননীর চরিত্রে যে সংযত দৃঢ়তা আবশ্যক যশোদায় তাহা অভাব আছে বোধ হয়। বলা বাহুল্য, সংযত দৃঢ়তার সহিত দণ্ডতাড়নার কোনও সম্বন্ধ নাই। প্রেম দণ্ডের একান্ত বিরোধী। এক দিনের একটু মুখভারই তাহার প্রবল শাসন। যশোদার স্নেহ কৃষ্ণের শিক্ষার জন্যও কাঠিন্য অবলম্বন করিয়া এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারে না। শাসন করিতে গিয়া তিনি

চুম্বন করিয়া বসেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈষ্ণব হৃদয় কঠিনতা সহিতে পারে না। কাঠিন্যে বৈষ্ণবেরা কোমলতা মিশাইয়া দেয়।

বৈষ্ণবের সহিত শাক্ত হৃদয়ের প্রভেদই এইখানে। বৈষ্ণবেরা কাঠিন্যকে কোমল রসে গলাইয়া ফেলিতে চায়; শাক্ত কোমলতার অন্তরে কঠিনতার প্রতিষ্ঠা করে। এই জন্য কোমলাঙ্গিনী রমণীর অন্তরেই শক্তি। উমাও গৃহিণী, যশোদাও গৃহিণী; উমাও জননী স্নেহময়ী, যশোদাও স্নেহময়ী মাতা; এক শক্তিতে উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ ঘটিয়াছে। যশোদা গৃহিণী। গৃহকার্য্যে নিপুণতাই তাঁহার গৃহিণী নামের একমাত্র কারণ। উমাও সুনিপুণা গৃহিণী। কিন্তু উমা শক্তিমতী। স্বামীর উপরে তাঁহার যেরূপ প্রভাব যশোদার তাদৃশ নহে। অন্ততঃ এ সম্বন্ধে কাহারও বড় কিছু জানা নাই। উমা অন্নপূর্ণা। এখানেও সেই শক্তির পরিচয়। উমার সহিত যশোদার প্রভেদ হইবারই কথা। অবস্থাভেদই তাহার প্রধান কারণ। উমা কৈলাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; যশোদা গোয়ালিনী অবলা। বৈষ্ণব কল্পনা সৌন্দর্য্যের মধুরতাতেই তৃপ্ত। মধুরতাই তাহার উপভোগ্য। এই কারণেই গোপবধূ যশোদা চণ্ডীও নহেন, মহিষীও নহেন; যশোদার কোনও জাঁকজমক নাই—তিনি নিছক কোমল রসে কোমলহৃদয় বৈষ্ণবের স্নেহময়ী জননী।

বৈষ্ণব সাহিত্যে শক্তির যে নামগন্ধ নাই এমন বলা চলে না। মথুরাপতি কৃষ্ণে শক্তি-ভাব আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু সে অতি সামান্য। বৈষ্ণব হৃদয় প্রেমে বিগলিত। শক্তি সেও অনুভব করে। কিন্তু প্রেমেই সে ডুবিবার স্থান পায়। তাই বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণকে মথুরাপতিরূপে অধিকক্ষণ দেখিতে পারেন না। মথুরার কৃষ্ণ অপেক্ষা তাঁহারা যশোদার কৃষ্ণকে দেখিতে চাহেন, যশোদার কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধার কৃষ্ণকে প্রাণের মধ্যে উপভোগ করেন। মধুর রসেই বৈষ্ণব প্রেমের চূড়ান্ত অনুশীলন। মথুরাপতি ক্ষমতাশালী—তাঁহার যান আছে, বাহন আছে, সেনা আছে, সেনাপতি আছে। রাধিকারঞ্জনের মধুর নিকুঞ্জ, মধুর বংশীধ্বনি, মধুর জ্যোৎস্না, আর এই মধুরতার মধ্যে সুন্দরী প্রেয়সীর সহিত মধুর মিলন। বৈষ্ণব হৃদয় এই মধুর মিলনে ভোর হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের দণ্ডধর প্রচণ্ড রাজভাব এই মধুরতায় বিলুপ্ত। কায়ক্লেশে তিনি কেবল রাজা। নহিলে তাঁহার সর্ব্বত্রই কোমল রস। অত কথায় কাজ কি, শ্রীকৃষ্ণের দেহবর্ণনায়ও কঠিন পুরুষ-ভাবের অভাব মনে হয়। তবে মধ্যে মধ্যে দৈবাৎ এক আধবার শুনা যায় বটে যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত বক্ষ, তমাল-দেহ। দায়ে পড়িয়া যেন এ কথার উল্লেখ করিতে হইয়াছে, পাছে লোকে কৃষ্ণকে পুরুষ অথবা স্ত্রী ঠাহরাইয়া উঠিতে না পারে।

কৃষ্ণ যখন রাজরূপে বিরাজ করিতেছেন, তখন মধ্যে মধ্যে যশোদা তাঁহাকে দেখিতে যান শুনিতে পাই। দ্বারী যশোদাকে চিনে না; সুতরাং সহজে দ্বার খুলে না। যশোদা বাপু বাছা করিয়া দ্বারীকে বুঝাইতে থাকেন। দ্বারীর সহিত কথাবার্ত্তায়ও

যশোদার সেই সরল স্নেহভাব অভিব্যক্ত। শিবগৃহিণী হইলে দ্বারী তাঁহার প্রভাব অনুভব করিত। বৈষ্ণব-জননী যশোদার ত শক্তি নাই। তাঁহার স্নেহে কেমন দীন-ভাব। তাই বলিয়া পাষাণতনয়া কি স্নেহময়ী নহেন? স্নেহবিষয়ে উমা যশোদাপেক্ষা হীন অথবা যশোদা উমাপেক্ষা হীন এরূপ বলা যায় না। দুই জনের স্নেহের প্রকৃতি কেবল কতকটা বিভিন্ন। স্নেহ সেইই। প্রভেদ কেবল অবস্থা এবং চরিত্রগত বিশেষত্ব লইয়া। দ্বারীর সহিত কথাবার্ত্তায় স্নেহের তারতম্য তেমন বুঝা যায় না। তবে এখানে কোমলতার তারতম্যে এইটুকু বুঝা যাইতে পারে যে, চরিত্র স্নেহগঠিত কি না এবং তাহাতে কি ভাবের প্রাধান্য। যশোদার কথাবার্ত্তায় বুঝা যায়, তাঁহার হৃদয় দুঃখসিক্ত এবং সহজে ক্রোধোদ্রেক হয় না। শিবগৃহিণী যশোদার মত নীরবে সহিবার পাত্রী নহেন। বৈষ্ণব প্রেম সহিতেই আসিয়াছে।

উমার সহিত যশোদার স্নেহ তুলনা করিলে বোধ হয়, উমার উষার কনক-ভাবের আভাস পাওয়া যায়। যশোদার মত তাঁহার স্নেহে সর্ব্বদাই হারাই হারাই ভয় প্রবল নহে। যশোদার স্নেহে ভয়, উমার স্নেহে সাহস। নগেন্দ্রনন্দিনার ক্রোড় হইতে তাঁহার শিশুকে লইতে আসিয়া বোধ করি কেহ সহজে ফিরিতে পারে না। সম্ভবতঃ এ অবস্থায় তিনি উন্মাদিনী হইয়া উঠেন। এবং বোধ করি নিকটে শিবের ত্রিশূল থাকিলে তাহার ত্রিজিহ্বা শোণিততৃষা মিটাইতে কুণ্ঠিত হয়েন না। যশোদা হইলে শিশুকে বুকের মধ্যে করিয়া হিম হইয়া যান। মিনতিই তাঁহার স্বভাব। তবে স্নেহে যে বল আসে সে কেবলমাত্র বুকের মধ্যে সবলে ধরিয়া রাখিবার। বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে গেলে হয়ত যশোদার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যায়। উমার স্নেহে বালিকা-ভাবে বল আছে। যশোদার স্নেহ শীতল। ভূমিই তাহার প্রধান কারণ। যশোদার বাস সমতলক্ষেত্র। নগেন্দ্রনন্দিনী পার্ব্বতীয়া। তাই বোধ করি, বর্ষার দিনে যশোদার স্নেহই আমাদের মনে পড়ে। উমার স্নেহ বর্ষাপেক্ষা বসন্তে ফুটে। আমাদের দেশে বসন্ত ত অধিকক্ষণ থাকে না।

এখন যশোদা-চরিত্র আলোচনার একরূপ শেষ হইল বলা যাইতে পারে। কারণ, স্নেহ ব্যতীত যশোদার আলোচনার আর বড় কিছু নাই। স্নেহেই তিনি ফুটিয়াছেন। তাঁহার প্রণয়ে বিশেষ কিছু দেখা যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যশোদা সতী সাধ্বী পতিব্রতা। নন্দঘোষের সহিত তাঁহার বনিত ভাল। পতি পত্নীর মধ্যে অনৈক্য, অবিশ্বাস, বিবাদ কলহ শুনা যায় না। নন্দঘোষের পরিবার প্রেমপূর্ণ। ইহা ভিন্ন তাঁহার সম্বন্ধে আমরা বড় কিছু জানিতে পারি না। জননীর সহিত তাঁহার যেখানে যতটুকু সম্বন্ধ বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে তাহাই পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, যশোদা কন্যাও বটে, সহধর্ম্মিণীও বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্রবিকাশ মাতৃরূপে। নাই ভ্রূভঙ্গ, নাই মর্ম্মবেধী দারুণ চাহনি, নাই অধরের যৌবন-তৃষা, নাই হৃদয়হরণী

মুচকি-হাসি। সুতরাং বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার রূপের তরঙ্গ উঠে নাই, বিরহ ধ্বনিত হয় নাই, মান এবং ভঞ্জন লইয়া টানাটানি পড়ে নাই।

কিন্তু তথাপি যশোদার রূপ সম্বন্ধে আমরা দুই চারি কথা বলিতে পারি। তাঁহার নয়ন খঞ্জনের সহিত উপমেয় অথবা মৃগাক্ষির সহিত জানি না, কিন্তু ভাবে দৃষ্টি খুব স্নিগ্ধ বলিয়া বোধ হয়। এবং সম্ভবতঃ হরিণ-নয়নে প্রশান্ত স্নিগ্ধভাব অধিক। খঞ্জন-লোচন চাঞ্চল্যেরই পরিচায়ক। খঞ্জনের গতির সহিত নয়নের সাদৃশ্য কি না। আর হরিণ-আঁখির সহিতই নয়নের তুলনা হয়। বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধার নয়ন-বর্ণনায় খঞ্জন এবং মৃগ-নয়ন উভয়ের সহিতই উপমা দেখা যায়। দুইই সৌন্দর্য্যের লক্ষণ বটে। কিন্তু রাধার বোধ করি খঞ্জন নয়নই ঠিক। যতদূর মনে পড়ে, বৈষ্ণব কবিদিগের রাধার রূপবর্ণনায় খঞ্জন-নয়নেরই উল্লেখ অধিক। যশোদার নয়ন খঞ্জনগতি জিনিয়া নহে। উপমাপ্রিয় পাঠকেরা অলঙ্কার শাস্ত্র খুঁজিয়া উপমা গড়িয়া লইবেন। আমরা যথাসাধ্য ভাবটুকু ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব।

যশোদার অধরও সুরঙ্গ। বর্ণও বোধ করি গৌর। তবে রাধার সহিত তুলনায় তাঁহার বর্ণ হয়ত ঈষৎ ম্লান। যশোদা সুন্দরী—তাঁহার গঠন পারিপাট্য বেশ আছে। উমার সহিত মিলাইয়া দেখিলেও তাঁহার সৌন্দর্য্যের নিন্দা করা চলে না। তবে উমা যশোদাপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি বলিয়া বোধ হয়। যশোদা কিন্তু খর্ব্বকায়া নহেন। যশোদার গঠন সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলা চলে না। কারণ, তাঁহার রূপ লইয়া বড় আন্দোলন কখনও হয় নাই। আমরা সকল খুঁটিনাটি জানিব কোথা হইতে? মনে হয়, তাঁহার সৌন্দর্য্যে সন্ধ্যার ঈষৎ আভা আছে। কিন্তু তথাপি সে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ সান্ধ্য নহে। আমরা গুণ হইতে টানিয়া টানিয়া যশোদার সৌন্দর্য্য যতদূর পারিয়াছি ফুটাইতে ক্রটি করি নাই। এখন কবি পাঠকেরা আমাদের চিত্রের দোষ বর্জ্জন এবং অসম্পূর্ণতা পূরণ করিয়া লউন।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কৈফিয়ৎ।

বৈষ্ণব কবির রচনা যে আধ্যাত্মিক ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে আমরা তাহা কোথাও অস্বীকার করি নাই। কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে দেখা যায় বলিয়া সাহিত্যের হিসাবে বৈষ্ণব কাব্য আলোচনা করিলে যে কোনও দোষ ঘটে আমাদের এরূপ বিশ্বাস নহে। ভারতীতে কিছুদিন হইতে আধ্যাত্মিকতার প্রতি বিশেষ ঝোঁক দেওয়া

হইতেছে, এবং বৈষ্ণব কাব্যের চরিত্র সমালোচনায় আমরা আধ্যাত্মিকতাকে বর্জ্জন করিয়াছি বলিয়া আমাদের প্রতি দোষারোপও শুনা যাইতেছে। দোষ ক্ষালনার্থে আমরা সম্পাদকীয় নোটের উপর দুইচারি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

১। বৈষ্ণব কবি রাধাকৃষ্ণের সম্পূর্ণ মানব-রূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের প্রতি অঙ্গের যৌবনসম্বন্ধ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ রূপবর্ণনা কোথাও আধ্যাত্মিক নহে—কেবলই দেহজ ভাবভঙ্গী এবং গঠনের পারিপাট্য লইয়া। টানিয়া বুনিয়া ইহার মধ্য হইতে যে আধ্যাত্মিক রূপক বাহির করা না যায় এমন নহে, কিন্তু কাব্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সহজে বোধ করি কেহ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া দিতে পারেন না। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, বৈষ্ণব কবি কবিতারচনা-কালে সর্ব্বদা প্রবল আধ্যাত্মিকতায় পরিচালিত হয়েন নাই। হয়ত মূলে আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য, কিন্তু লিখিবার সময়ে মানব-ভাবে ভোর হইয়াই লিখিয়াছেন। সুতরাং কাব্যে মানব ভাবই উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। এখন কবির হৃদয় ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি উদ্দেশ্যগত আধ্যাত্মিকতাকে টানিয়া আনিয়া ব্যাখ্যা করিতে যাইবার প্রয়োজন কি? সাহিত্যে ইহা নিষ্ফল। আমরা তাহাই বলি। যেখানে উদ্দেশ্য লইয়া টানাটানি সেখানেই আধ্যাত্মিকতা বিচার্য্য। নহিলে, কথায় কথায় আধ্যাত্মিক খোঁচা দিয়া কাব্যকে অস্থির করিয়া তুলিবার কোনও আবশ্যক নাই। আমরা কেবল আধ্যাত্মিক সমালোচনা না করিয়া কাব্যের সমালোচনা করিয়াছি মাত্র, ইহাতে দোষ কি বুঝা গেল না।

২। কাব্যের সমালোচনা কি করা চলে না? তাহা হইলে বিদ্যাপতির রাধিকার সহিত চণ্ডীদাসের রাধার তুলনা হয় কিরূপে? আধ্যাত্মিক হিসাবে দুই জনেই সমান ভক্ত। দুই জনেই প্রেমে তন্ময়—সুতরাং ছোট বড় করা যায় না। কিন্তু দুই বিভিন্ন কবির হস্তে পড়িয়া দুই জনের মধ্যে প্রকৃতিগত অনেক প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে; তাহা দেখিতে হইলে সাহিত্যের দিক দিয়া কাব্য হিসাবেই দেখিতে হয়। সুতরাং আধ্যাত্মিকতাকে খাড়া করিয়া পাঠককে অন্যমনস্ক করা চলে না। আমরা বরাবরই তাই বলিতেছি যে, আধ্যাত্মিকতার বিশেষ স্থান আছে। যখন তখন তাহাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিলে সেও অধিকদিন সসম্মানে টিঁকিবে না, কাব্যও সঙ্কোচে বড় একটা স্ফূর্ত্তি পাইবে না—সর্ব্বদাই ভয়, কখন্ আধ্যাত্মিকতার সহিত ধাক্কা লাগে।

৩। পূজনীয়া সম্পাদিকা মহাশয়া বলেন, কাব্য রচনার পূর্ব্বে আধ্যাত্মিক রূপক রচিত হইয়াছে। বেশ কথা। কিন্তু তাহাতে বৈষ্ণব কাব্যের সাহিত্য হিসাবে আলোচনায় বাধা কি? আমরা রূপকের উল্লেখ করিয়াছি, সমালোচনা করি নাই। কারণ, আমাদের তাহা আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু সে জন্য যে সমালোচনার অঙ্গহীনতা হইয়াছে তাহার কোনও পরিচয় পাই না। লেখকের অক্ষমতার জন্য ত্রুটি হইতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেকেই

হোমরের ইলিয়াদ্ নামক কাব্যকে রূপকে আলোক এবং অন্ধকারের যুদ্ধ বর্ণনা বলিয়া থাকেন। তাহা সত্য কি না জানি না। কিন্তু যদি হোমরের এই ভাব সত্য হয়, তাই বলিয়া একিলিসের চরিত্রবিশ্লেষণ বন্ধ করিতে হইবে, হেলেনের রূপ বর্ণনা আলোচনা করা যাইবে না, গ্রীস এবং ট্রয়ের যুদ্ধবর্ণনায় রণসজ্জা প্রভৃতি রূপক বলিয়া বাদ দিতে হইবে এরূপ কোনও কথা নাই। কবি আমাদের সম্মুখে যে চিত্র ধরিয়াছেন তাহাকে নগণ্য করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। তিনি মূলে যাহাই ঠাহরাইয়া থাকুন, যেরূপ ভাবে চিত্রটীকে খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন সেরূপ ভাবে আমরা দেখিতে পারি। প্যারাডাইজলষ্টের সয়তানকে যে তাহার স্বাধীনতা-প্রিয়তার জন্য আমাদের অনেক স্থলে ভাল লাগে। তখন কিছু আর আমরা তাহাকে পাপের রূপক-প্রতিমা বলিয়া ধরি না। আমরা তাহার নরক-যন্ত্রণার মধ্যেও অসাধারণ দৃঢ়তা দেখিয়া মুগ্ধ হই। এ ভাব ব্যক্ত করিলে যে কোনও হানি হয় তাহা বোধ হয় না। তবে সয়তানকে নাকি কবি নিতান্তই পাপমতি দেখাইয়াছেন, তাই তাহার জন্য অনেকস্থলে অনুকম্পা উপস্থিত হইলেও তাহাকে পাপী বলিতে হয়। তথাপি রূপক হিসাবে তাহার সয়তানী যত অধিক, কাব্যের চরিত্র হিসাবে তত নহে। এবং শেষোক্ত হিসাবে ধরিয়া তাহার সমালোচনা করিলে স্থানে স্থানে প্রশংসা করিতে হয় বলিয়া সমালোচনার দোষ দেওয়া চলে না। বোধ করি, এস্থলে সয়তানের এক আধটু প্রশংসা করার জন্য পাপের প্রশংসা গাহাও হয় না। ধর্ম্মের সহিত সাহিত্যের যোগ থাকিলেই যে সাহিত্য-সমালোচনা বন্ধ করিতে হইবে এমন কোনও নিয়ম নাই।

৪। দুগ্ধকে আমরা কোথাও জল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহি নাই। সম্পাদিকা মহাশয়া আমাদিগকে ভুল বুঝিয়াছেন। আমরা জলেরই বিশ্লেষণ করিয়াছি; সে জল কেবল মন্ত্রপূত। আমরা তাহা অস্বীকার না করিয়া জলজান এবং অম্লজান নামক রাসায়নিক পদার্থের নাম উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। ইহাতে মন্ত্রের অবমাননা করা হইয়াছে অথবা জল বিশ্লেষণে দোষ ঘটিয়াছে বলা যায় না। *

"যশোদা" লেখক।

---

* লেখক যদি বৈষ্ণব কবির রচনায় আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য স্বীকার করেন—তাহা হইলে আর আমাদের উত্তর দিবার বিশেষ কিছুই নাই। কেননা উদ্দেশ্যকে স্বতন্ত্র করিয়া কোন বিষয়ের প্রকৃত সমালোচনা হইতে পারে না। ধান ভানা কেমন হইয়াছে বিচার করিতে গিয়া আমরা যদি ধানভানক সেই সময়ে যে গীত গাহিয়াছিলেন তাহার বিচার করিতে বসি তাহা হইলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা আসিয়া পড়ে। তবে সেই গানের যতটুক মাত্র ধানভানার সহিত যোগ ছিল, অর্থাৎ সে গীতে ধানভানার কতটাই বা সহায়তা করিয়াছে কতটাই বা অসুবিধা করিয়াছে, তাহাই মাত্র প্রাসঙ্গিক। সুতরাং লেখক যদি বৈষ্ণব কবির রচনায় আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য অস্বীকার না করেন—

তাহা হইলে সেই উদ্দেশ্য কাব্যে কিরূপ প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা না দেখিয়া বিশুদ্ধ কাব্যহিসাবে ইহার সমালোচনা করিলে কি ইহা নির্দ্দোষ সমালোচনা বলা যাইতে পারে ?

জলের বিশ্লেষণ আবশ্যক হইলে সহস্র জলাশয় হইতে সে কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু আমরা যদি দুধের জলটুক বাহির করিয়াই তাহার অম্লজান ও জলজান পদার্থের বিশ্লেষণ করিতে যাই তাহা হইলে কি দুধের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয় ? না তাহা হইলে দুধের দুগ্ধত্বই থাকে ?

লেখক এ প্রসঙ্গে ইলিয়াদ্ কাব্যের যে তুলনা আনিয়াছেন তাহা এখানে ঠিক সঙ্গত নহে। প্রথমতঃ ইলিয়াদের রূপক সর্ব্ববাদী সম্মত নহে, দ্বিতীয়তঃ রূপক হইলেও সাধারণ কাব্য হিসাবেও ইহার স্থান আছে। মহাভারত রূপক বলিলেও বলা যায়, কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক ভিত্তিও রহিয়াছে, সে হিসাবে মহাভারতের ন্যায় ইলিয়াদ একদিকে ইতিহাসমূলক মহাকাব্য। সুতরাং সাধারণ কাব্যহিসাবে দেখিলেও ইহার অর্থ শূন্য হয় না। কিন্তু কৃষ্ণ রাধার প্রেম যদি সাধারণ কাব্য হিসাবে দেখা যায় তাহা হইলে ইহার মধ্যে কতটুকু কবিত্ব-মাহাত্ম্য পাওয়া যায় ?

আর মিলটনের প্যারাডাইস লষ্টের তুলনাও এখানে অসংগত। কেননা সয়তান ত পাপের রূপক নহে, খৃষ্টানের বিশ্বাস-মূলক প্রকৃত চরিত্র।

বৈষ্ণব কবিগণের রচনা আধ্যাত্মিকতাময় বলিয়া তাঁহাদের পরস্পরের সহিত তুলনা চলিতে পারে না এ কাহার কথা! তবে এখানেও তাঁহাদের কবিত্বে তাঁহাদের উদ্দেশ্য কতদূর প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা লইয়াই কবির শ্রেষ্ঠত্ব বিচার্য্য। এরূপ রূপকের উদ্দেশ্য কি—না কোন মহৎ ভাবকে মনুষত্ব প্রদান করা, এবং সেই মহৎভাবের মধ্যে ডুবিতে পারিলে কিরূপ মহৎ আনন্দ লাভ করা যায় তাহাই হৃদয়ঙ্গম করাইতে প্রয়াস পাওয়া। এই হিসাবে যাঁহার রাধিকায় এই ভাব অধিকতর পরিস্ফুট তাঁহারি জয়।

লেখক বলেন, বৈষ্ণব কবির রচনার মূলে হয়ত আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য, কিন্তু লিখিবার সময় মানব ভাবে ভোর হইয়াই লিখিয়াছেন—কবিতা রচনাকালে সর্ব্বদা প্রবল আধ্যাত্মিকতায় পরিচালিত হইয়া লেখেন নাই। প্রমাণ—বৈষ্ণব কবি রাধাকৃষ্ণের সম্পূর্ণ মানবরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—তাহাতে তাঁহাদের প্রতি অঙ্গের যৌবন সম্বন্ধ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, এরূপ বর্ণনা কোথায় আধ্যাত্মিক নহে—কেবলই দেহজ ভাবভঙ্গী এবং গঠনের পারিপাট্য লইয়া। ইত্যাদি।

কিন্তু ইহাতেই ত বিপরীত প্রমাণ।

তাঁহারা মানব, সুতরাং মানব ভাবে ভোর হইয়াই লিখিয়াছেন সত্য—কিন্তু ভক্ত মানব ভাবে। সুতরাং তখন তাঁহারা মনুষ্যের দেহজ সৌন্দর্য্য দেহজ প্রেমের বর্ণনার মধ্য দিয়াই আধ্যাত্মিক মহৎভাবের তুলনার সহজ পথ দেখিয়াছেন। যদি ইহা না মানা যায় তাহা হইলে তাঁহাদের কাব্য অতি নিকৃষ্ট কাব্য—তাহা বিদ্যাসুন্দরের দলভুক্ত—তাঁহারা কবি নামেরি অযোগ্য—এবং তাহা হইলে রূপকেরি বা সার্থকতা কি ? ভাঃ সং

কিণ্ডর-গার্টেন শিক্ষা প্রণালী।

কিণ্ডরগার্টেন একটী জর্ম্মন কথা, উহার বিস্তারিত অর্থ—খেলা ও আমোদের সঙ্গে শিশুকে কাজ ও জ্ঞান শিখান। জর্ম্মনী দেশে পণ্ডিত ফ্রোবেল ঐরূপ শিশুশিক্ষা প্রথম প্রচলন করেন, সেজন্য সর্ব্বত্রই ঐ প্রকারে শিক্ষা দিবার স্কুলগুলি ঐ জর্ম্মান নামে প্রসিদ্ধ। দুঃখের বিষয়, ভারতীয় পিতামাতারা ঐ মহৎ শিক্ষার উপকার সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নহেন বলিয়া আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত একটীও কিণ্ডরগার্টেন খোলা হয় নাই। ঐ শিক্ষা প্রণালীর সুফল হৃদয়ঙ্গম করিলে অন্যান্য সভ্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও যে অবিলম্বে কিণ্ডরগার্টেন শিক্ষাপ্রথা প্রচলিত হইবে, এই আশায় আশ্বস্ত হইয়া আমি এই প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অবশ্য একটি প্রবন্ধে এরূপ গুরুতর বিষয়ের সম্যক পর্য্যালোচনা করা অসম্ভব, সে জন্য আমি এই পত্রে কেবল মহাত্মা ফ্রোবেলের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও দুএকটী উদাহরণ দেখাইবার চেষ্টা করিব। অবশিষ্ট ভবিষ্যতে জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

'কেবল সুস্থ শরীরেই সুস্থ মন বাস করিতে পারে,—এই উৎকৃষ্ট বাক্যের উপর ফ্রোবেলের শিক্ষা প্রণালী স্থাপিত হইয়াছে। শরীর ও মনের সমভাবে ও সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টিসাধন তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। আর ঐ উদ্দেশ্য পূরণের উপায় তিনি স্বাভাবিক শিক্ষা ও উপদেশ হইতেই পাইয়াছেন। জীবনারম্ভ মাত্র প্রকৃতি নিজের কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত, সুতরাং তিনিও ঐকাল হইতে শিশুকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার ইন্দ্রিয় সকল খুলিয়া যায়, ও উহার দ্বারা বহির্দৃশ্য ও ভাব তাহার মনে অঙ্কিত হয়। এইরূপে সে যে সব নূতন ধারণা ও জ্ঞান লাভ করে সদুপায়ে ক্রমশ তাহার পুষ্ট সাধন করিয়া উহার মনোবৃত্তি হৃদয়বৃত্তি প্রভৃতির স্ফূর্ত্তিসাধনে সহায়তা করা ফ্রোবেলের প্রধান লক্ষ্য। ঐ কাজে তিনিই প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান শিক্ষক। তাঁহার পূর্ব্বে ফরাসী দার্শনিক রুসো ও জর্ম্মন পেস্টেলোজি ইউরোপের শিশুশিক্ষার অসম্পূর্ণ ও অনিষ্টকারী পুরাতন ধারার বিরুদ্ধে অনেক লিখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মা ফ্রোবেলই প্রথম শিশুস্বভাব উত্তমরূপে বুঝেন, ও সামান্য বস্তু বা ক্রীড়া দ্বারা শিক্ষাদিবার রীতি প্রচার করিয়া বহু যত্নে ও পরিশ্রমে জর্ম্মনীর পুরাতন শিক্ষাপ্রথার স্থানে নূতন কিণ্ডর গার্টেন প্রণালী চলিত করেন।

সাধারণ বালকবালিকার প্রকৃত শিক্ষার প্রতি আমাদের দেশের কথা দূরে থাকুক, উরোপেরও অনেক দেশে অত্যন্ত অবহেলা দেখা যায়। সচরাচর বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়েরা যে শিক্ষা পায়, তাহাতে কেবল মস্তিষ্কেরই চালনা হয়; কিন্তু শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সমূহ, হৃদয়বৃত্তি ও মনোবৃত্তিগুলি এরূপ অপুষ্ট ও দুর্ব্বল থাকে, যে সমস্ত জীবন

তাহার কুফল ভুগিতে হয়। প্রাপ্ত বয়সেও কেহ একটী অন্ধকার ঘরে থাকিলে বা কোন গুপ্ত শব্দাদি শুনিলে ভয়ে কিরূপ উপস্থিত বুদ্ধি হারায় ও অজ্ঞান শিশুর অপেক্ষাও অধিক-তর অসহায় হইয়া পড়ে, তাহা কাহারও অজানা নাই। এমন কি এক ইন্দ্রিয়ের অভাব যে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সম্যক চালনা ও পরিপুষ্টি দ্বারা অনেক পরিমাণে দূর হইতে পারে তাহা আমরা অন্ধলোকের দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্ট জানিতে পারি। খেলার সাহায্যে আমা-দের অবয়বাদি ও ইন্দ্রিয় সকল কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে রুসো তাহা উত্তমরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। ফ্রোবেল তাঁহারই উপদেশ ও চারদিকের স্বাভাবিক সংকেত বুঝিয়া জীবনারম্ভ হইতেই শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের পুষ্টি সাধনে যত্নবান হইতে শিক্ষা দেন। দেখা, শুনা ও ছোঁয়া—ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের জ্ঞান, মধুর বা কর্কশ শব্দের ধারণা এ সমস্তই তাঁর শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে। দোলার ভিতর শিশুর মুখের কাছে কোন উজ্জল রঙের একটা গোলা বা ঝুমঝুমি বাঁধিয়া রাখিলে উহার মনে রং ও আকারের জ্ঞান সঞ্চার হয়, ক্রমে শিশুর ধরিবার বয়স হইলে উহা হাতে করিয়া সে স্পর্শ জ্ঞান লাভ করিতে পারে। ছেলেদের মন ও ধারণাশক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছোট বড়, শক্ত নরম, নানা রকমের গোলা দ্বারা অনেক প্রকার ক্রীড়া সাধিত হয়; ঐ সব খেলা হইতে শিশুরা অজ্ঞাতসারে যে সব দ্রব্যের জ্ঞান ও আভাস পায়, তাহা চিরকাল মনে বসিয়া থাকে।

ফ্রোবেল নিগূঢ়ভাবে স্বাভাবিক বিধান পর্য্যালোচনা করিয়া উহার তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়াছেন। বীজের মধ্যে যেমন গাছের অঙ্কুর ঢাকা থাকে, তাহা কালে ডালপাতা শিকড়যুক্ত একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয়; ডিমের ভিতরের লুকান জীবনবীজ যেমন সময়ে পাখী ও উহার আশ্চর্য্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পাখাদিতে পরিপুষ্ট হয়; পাথর যেরূপ আরম্ভ কালে-প্রাপ্ত আকার ও রঙ ব্যতীত অন্য কোন রূপ গ্রহণ করিতে পারে না; প্রত্যেক জীব যেমন অলঙ্ঘ্য বিধানানুসারে ক্রমে ক্রমে পুষ্ট, বর্দ্ধিত, বিক-শিত ও মৃত হয়; আর যে স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত দিকে যাইতে কাহারও এক মুহূর্ত্তের জন্য সাধ্য নাই—সেই বিশ্বব্যাপী বিধানের অধীন হইয়া মানবজীবন ও মানব স্বভাবও অনবরত চলিতেছে। ঐ সব স্বাভাবিক নিয়ম কি ও কিরূপে উহার দ্বারা প্রকৃত উপকার পাওয়া যাইতে পারে, তাহাই কিণ্ডরগার্টেন আমাদিগকে দেখাইয়া ও শিখাইয়া দেয়।

মনে যাহা কিছু প্রবেশ করে সকলি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; আর ঐ সব ইন্দ্রিয়-প্রাপ্তভাব ও জ্ঞান মনের উপর একান্ত আধিপত্য করে—এই ধারণা ফ্রোবেলের শিক্ষারীতির মূল। প্রাপ্ত বয়স্ক লোকেরা যেমন বিজ্ঞানের শিক্ষা বা সাহায্য বিনাও নিজেদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলকে ঠিকরূপে চালাইতে পারেন; শিশুও সেইরূপ অজ্ঞানভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার শিখে। বিজ্ঞান আমাদিগকে কেবল স্বাভাবিক

নিয়ম শিক্ষার সাহায্য করে; পৃথিবী ও বিশ্বমণ্ডলের মধ্যে বৃদ্ধি, স্থিতি ও হ্রাসের কারণ নির্দ্ধারণে সক্ষম করে। আর যদিও আমরা কখন সম্পূর্ণরূপে জগতের সৃষ্টিজ্ঞান বুঝিতে না পারি, যদিও অন্যান্য অনেক অপার্থিব কাণ্ডের ন্যায় উহাও চিরকাল মানুষের কাছে অপরিজ্ঞেয় রহস্য স্বরূপ থাকিবে, তথাপি পরীক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা আমরা স্বাভাবিক শক্তির উপর ক্ষমতা চালাইবার জ্ঞান লাভ করি।

সকলেই জানেন, এক কালে জল ও আগুণ—এই দুটী ভূতকে লোকে কত ভয় করিত; কিন্তু এখন বিজ্ঞান বলে উহারা মানুষের যে কিরূপ ভৃত্যের ন্যায় খাটিতেছে, তাহা আশ্চর্য্য ধোঁয়াকলের কাজ হইতে আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাই। অবশ্য, বীজ ব্যতীত বৃক্ষ সৃজন করিতে মানুষের ক্ষমতা নাই; কিন্তু উদ্ভিদ জীবনের জ্ঞানের দ্বারা মানুষে তরুলতাদির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতে পারে; এমন কি পশুজীবনও বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা ও যত্নের দ্বারা মানুষ অধিকতর উৎকৃষ্ট করিতে পারে। বৃক্ষরোপণ বা উৎপাটন, ভূমি শুষ্ক বা সজল করার দ্বারা মানুষ বাতাস ও মেঘকেও অনেক পরিমাণে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারে। যে শক্তি হইতে অদ্ভুত বিদ্যুতের উৎপত্তি, সেই তাড়িত আমাদের দূতস্বরূপ হইয়া দেশে দেশে সমস্ত জগতে সংবাদ বহিতেছে। তবে শুধু মানুষের মন কি মানবজাতির অন্বেষণের কাছে একেবারে অগম্য ও অজ্ঞেয় থাকিবে? মনের নিয়ম সকল যে শারীরিক বিধানের উপর একান্ত নির্ভর করে তাহার প্রমাণ আমরা নিরন্তর দেখিতে পাই। সুতরাং বিশ্বজগতের স্বাভাবিক বিধান-জ্ঞান ও উহার অনুশীলন দ্বারা ঐ উন্নত মানবজীবনকে যে আরো সুন্দর ও মহৎ করা যায়, তার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের চারিদিকস্থ প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের অজ্ঞতা ও বিকৃতি বশতঃ প্রকৃত শিক্ষার বিদ্যা অন্যান্য অনেক মহা উপকারী বিজ্ঞানের ন্যায় অবহেলিত হইয়া অতি নীচে পড়িয়া রহিয়াছে। মহাত্মা ফ্রোবেল প্রথম যখন তাঁহার শিক্ষা প্রণালী ব্যক্ত ও জর্ম্মনীদেশে প্রচার কামনা করেন, তখন তিনি যত ইউরোপীয় বিশেষ জর্ম্মন জননীদিগকে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ প্রকার নিস্বার্থ আগ্রহ দেখিয়া জর্ম্মন মাতারা তাঁহার কাজে যোগ দেন, ও তাঁহাদের যত্ন ও পরিশ্রমেই ফ্রোবেলের উত্তম শিক্ষা প্রণালী জর্ম্মনদিগের ঘরে ঘরে, পিতামাতার কানে কানে ও শিশুদের মুখে মুখে সর্ব্বত্র ধ্বনিত হয়। সেইরূপ ভারতবর্ষে ঐরূপ উন্নত ও প্রকৃত শিশুশিক্ষার রীতি সর্ব্বস্থানে জ্ঞাপন ও প্রচলিত করিবার সময় স্নেহময়ী ভারতীয় মাতাদের সাহায্য প্রার্থনা করা একান্ত প্রয়োজন। হাজার বিদ্বান পুরুষকে ঐ মহাশিক্ষার কথা বুঝাইলে যত না উপকার হইবে, একজন জননী অনায়াসে উহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অল্পদিনের মধ্যে তাহার অধিক সুফল দেখাইতে পারিবেন। শিশু মাতার প্রাণের ধন, তাহাকে শিখাইতে হইলে মা ছাড়া আর কে অধিক মনোযোগী ও সফল হইবে?

ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা শিশু মাতৃপ্রেম ও মার স্বভাবের আভাস পায়, আর ঐ প্রেম ধীরে ধীরে শিশুর আধঘুমন্ত আত্মায় প্রবেশ করে। মা বুকে করিয়া ছেলেকে ঘুম পাড়ান, অতি যত্নে তাহাকে দোলায় শোয়াইয়া রাখেন, আবার সে জাগিবামাত্র বুকে রাখিয়া দুধ দেন। ঐ রূপে জননীর ঐ নিঃস্বার্থ স্নেহ, আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা শিশুর আত্মায় প্রবেশ করিয়া পবিত্র, মহৎ ও উন্নত মানব স্বভাবের ভিত্তি স্থাপন করে। মাতা-সন্তানের স্নেহালাপের সঙ্গেই মানবহৃদয়ে সর্ব্ব প্রথম ধর্ম্মভাব উদয় হয়। জননীর স্নেহময় গান ও কথা সকল সতত শিশুর সহিত ঘুরিয়া বেড়ায়; কাণে সর্ব্বদা ঐ মধুর শব্দ শুনিতে শুনিতে ও চোকে নিরন্তর ঐ প্রেমময়ী দৃশ্য দেখিতে দেখিতে শিশুর ঘুমন্ত আত্মা স্বর্গীয় ভাবে জাগিয়া উঠে।

শারীরিক পুষ্টি সাধনের জন্যও ফ্রোবেলের শিক্ষাধারা অতি উপকারী। ক্রমে মার গান শুনিতে শুনিতে শিশু যত বড় হইতে থাকে ও চলিতে শিখে, তখন ঐ গানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে খেলিতে শিখানও আবশ্যক। কি প্রকার গান, ব্যায়াম ও ক্রীড়া শিশুর পক্ষে আনন্দদায়ক ও উপকারী, তাহা আমরা আর একটী প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব। এই কোমল বয়সে যখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি নমনীয় থাকে, সেই সময়ে উপযুক্ত ব্যায়াম ও শরীরের চালনা দ্বারা প্রত্যেক ভাগের সম্পূর্ণ রূপে পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধন করা যায়। ক্রীড়া শিশুজীবনের প্রথম ইচ্ছা ও প্রধান কাজ। সুতরাং খেলা দ্বারা ছেলেদের শরীর পুষ্ট করা ও মন প্রশস্ত করার ন্যায় ঔষধ আর নাই। নানা প্রকার বিধিমত ক্রীড়া ও ব্যায়ামাদির দ্বারা বালক বালিকাদের শরীর ও মন উভয়ই একভাবে চালিত হয়; উহা তাহাদিগকে সকল জিনিসের আকার প্রকার ও কাজের শৃঙ্খলা শিখায়; তাহাদের শরীর সবল ও মন দৃঢ় করে আর ঐ কোমল জীবনকে ভবিষ্যতের বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য উত্তম রূপে প্রস্তুত করে।

জননীর মিষ্ট ও সরল গাত ও গার্হস্থ্য খেলার মধ্যে শিশুর তিন বৎসর কাটিয়া যায়, পরে চার বৎসরের প্রথম হইতে তাহাকে কিণ্ডরগার্টেনে পাঠান কর্ত্তব্য। অবশ্য, যে ছেলেরা মার কাছে কিণ্ডরগার্টেনের সব শিক্ষা পায়, যাহাদের গৃহই স্কুল, তাহাদের আর ভিন্ন স্থানে যাইবার কোন দরকার নাই। তবে যাহাদের বাড়ীতে ঐ রূপ শিক্ষার কোন উপায় নাই বা মাতা ঐ বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ ও অপারগ, তাহাদের জন্যই কিণ্ডরগার্টেন স্কুলের আবশ্যক। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত সন্তানদিগকে অত অল্প বয়সে স্কুলে পাঠাইতে ভারতীয় পিতামাতারা প্রথম প্রথম আপত্তি করিতে পারেন; কিন্তু আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যে তাঁহারা উহার উপকার যথার্থরূপে বুঝিতে পারিলে ও ঐ শিক্ষার ফলে তাঁহাদের প্রাণাধিক বৎসগণকে সর্ব্বদা সুস্থ ও প্রফুল্ল দেখিলে, তাঁহারা উহাতে কখনই বিমুখ হইবেন না।

এমন কি, ফ্রোবেল জর্ম্মনী দেশে যখন এই নূতন শিক্ষাবিধির প্রথম প্রচার করেন,

তখন সাধারণ লোকেরা তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক, রাজদ্রোহী বলিয়া স্বদেশ হইতে তাড়াইয়া দেয় ও জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্ট, অধিবাসী সকলেই তাঁহার সহিত সংস্রব ত্যাগ করে। কিন্তু যাঁহারা মহাত্মা ফ্রোবেলের জ্ঞান, সদাশয়তা, শিশুপ্রেম ও পরোপকারের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে অতি ধর্ম্মশীল ও ন্যায়পরায়ণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে তাঁহার শিক্ষাধারা ও গভীর মহত্ব যখন শিক্ষিত সম্প্রদায় উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা পুনরায় তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার উপদেশ চাহিলেন ও তাঁহাকে সাহায্য করিয়া জর্ম্মণীর সর্ব্বত্র কিণ্ডরগার্টেন খুলিলেন। এখন ফ্রান্স, ইংলণ্ড ইটালী প্রভৃতি ইউরোপের অনেক দেশে ঐ নূতন শিক্ষারীতির স্কুল খোলা হইয়াছে আর আমেরিকায় পর্য্যন্ত উহার অনেক সুফল দেখা যাইতেছে।

এখন পাঠক পাঠিকারা আসুন, আমরা একত্র কিণ্ডরগার্টেনে প্রবেশ করিয়া উহার উদ্দেশ্য ও শিক্ষাপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করি। এখন প্রাতঃকাল, বেলা ৯টা। শিক্ষয়িত্রী স্কুলাগত শিশুদিগকে আগে চক্রাকারে দাঁড় করাইয়া নিজে মাঝখানে হাঁটু গাড়িয়া জোড়হাতে একটী ছোট প্রার্থনা বলিতেছেন। অতি মৃদু ও করুণ স্বরে উহা উচ্চারিত হইল, পরে গত রাত্রে নিরাপদে নিদ্রার জন্য পরম পিতাকে ধন্যবাদ দিয়া সকলে মিলিয়া একটী ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিতে লাগিল।

গানের পর শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "এখন, বাছারা সকলে, নিজ নিজ জায়গায় বস, তোমরা স্থির হইবামাত্র আমি একটী গল্প বলিব।" মহা আনন্দে তাহারা স্ব স্ব স্থানে গিয়া বসিল ও আগ্রহে গল্প শুনিতে চাহিল। কিন্তু আমোদের সঙ্গে সঙ্গে ভাল অভ্যাস শিখান তাঁহার উদ্দেশ্য, সে জন্য তিনি আবার বলিলেন, "যতক্ষণ তোমরা সকলে এমন স্থির না হইবে যে, মাটীতে ছুঁচ পড়ার শব্দ শুনা যায়, ততক্ষণ আমি গল্প আরম্ভ করিব না।" এই বলিয়া তিনি একটী ছুঁচ ভূমিতে ফেলিতে উদ্যত হইলে, শিশুরা সকলে অতি স্থির ও একমনা হইয়া কাণ পাতিয়া রহিল। এখন বসন্তকাল; তিনি তাহাদিগকে বকের গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন; শীতকালে কেমন তাহারা জড়ভাবে ছিল, অধিক খাদ্য পাইত না, এখন যত গরম হইতেছে তত তাহারা ঝোপঝাপ হইতে বাহির হইয়া পুকুরের ও নদীর ধারে গিয়া মাছের অন্বেষণে বেড়াইতেছে। তাহারা কেমন বাসা নির্ম্মাণ করে, কত যত্নে শাবকদিগকে খাওয়ায় ও ছানারা বড় হইলে তাহাদিগকে লইয়া বেড়ায় ও খাবার খুঁজিতে শিখায়—ইত্যাদি। শিশুরা গল্প শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। ক্রমে তিনি একে একে সকলকেই ঐ গল্পটী শিখাইবার জন্য একটী বকের গান দ্বারা তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

তাহারা প্রথম কথা মুখস্থ করে, পরে গাইতে শিখে; গানের পর সকলে বক্ বক্ খেলা করে। ঐ ক্রীড়া শেষে শিক্ষয়িত্রী তাহাদিগকে একটী গোলা দ্বারা ঐ পদার্থের আকার, গতি ও পরিমাণাদি শিক্ষা দেন। শিশুরা অতি উল্লাসে উহাতে যোগ দেয়।

অবশ্য আমাদের দেশে কিণ্ডরগার্টেন প্রচলিত করিতে হইলে ইউরোপীয় গল্প ও খেলা সকল পরিবর্ত্তিত করিয়া দেশের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে।

তার পর তিনি একখানা চারকোণ্ কাঠ ধরিয়া ছেলেদিগকে উহা কি, উহার কটা কোণ্ আছে ও কটা পিঠ আছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আর তাহারা নিজে যাহাতে ঠিক করিয়া উত্তর দিতে পারে সে বিষয়ে উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

ঐরূপ কাঠ ও গোলা খেলা হইতে শিশু আপনা আপনি গণনা ও কিছু কিছু পদার্থ-বিদ্যা শিখে। ঐ ক্রীড়ার পর তাহাদের নিজে নিজে কাজ করিবার সময় আসিল। ক্ষুদ্র শিশুগুলি বাড়ী বা পোল ইত্যাদি নির্ম্মাণের বাক্স ও অপেক্ষাকৃত বড় বালক বালি-কারা ছোট ছোট কাঠের টুক্রা দ্বারা ঘর বাড়ী ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল।

প্রথম তাহারা অতি সরল কাজ শিক্ষা পায়। উহা দ্বারা ছেলেরা সোজা ও বাঁকা রেখা, ত্রিকোণ ও গোল প্রভৃতি জ্যামিতির রেখা টানিতে অভ্যস্ত হয়। অল্প দিনের মধ্যে তাহারা নিজেরাই ঐ সব কাঠ লইয়া খেলার সঙ্গে কাজ আরম্ভ করে। তাহারা নিজে যাহা প্রস্তুত করে, নিজ নিজ ক্ষুদ্র কল্পনানুসারে তাহার নাম দেয়। শিশুরা আত্ম সাহায্যে যাহা কল্পনা ও নির্ম্মাণ করে, তাহা কখন ভুলিয়া যায় না। সুতরাং ঐ বাল্য শিক্ষা ও নির্ম্মাণ অভ্যাস বালক বালিকাদের যৌবন কালে জ্ঞানোপার্জ্জনের অনেক সহায়তা করে। কাঠের দ্বারা ঐ সব বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ শিক্ষাকে 'অঙ্কশাস্ত্র প্রণালী' কহে। তাহা ছাড়া 'জীবন্ত প্রণালী' ও 'সৌন্দর্য্য প্রণালী' নামে আর দুটী শিক্ষা ধারা আছে। তার মধ্যে প্রথমটীর দ্বারা যত শিল্প ও স্বাভাবিক দ্রব্যের নকল প্রস্তুত করিতে শিখান হয়; আর শেষেরটী হইতে ছেলেরা সকল জিনিস অতি সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে সাজাইতে ও গড়িতে শিখে। শিশুরা ঐ সামান্য কাঠের খণ্ড দ্বারা চৌকী, টেবিল, বাড়ী, বাগান, সাঁকো ও এমন কি জাহাজ,কলের গাড়ী পর্য্যন্ত—যাহা তাহার ক্ষুদ্র কল্পনায় আসে তাহাই নির্ম্মাণ করিতে পারে। অবশ্য, ঐ সব কাজে প্রথম প্রথম বেশী শিল্প কৌশল দেখা যায় না; কিন্তু উহা দ্বারা কোন্ দ্রব্য ও কাজের প্রতি শিশুর মন আসক্ত হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি, ও তদনুসারে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়াও সহজ হইয়া আসে। আর প্রথম হইতেই সকল বিষয়ে নিয়ম ও শৃঙ্খলা অভ্যাস করায় অবিলম্বে তাহাদের হাত ও চোখ সমানভাবে সুন্দর কাজে পারক হয়।

ছোট ছেলেরা বালির ঘর প্রস্তুত, মাটী খোঁড়া প্রভৃতি স্বাস্থ্যজনক ও আনন্দ দায়ক অতি সরল কাজে নিযুক্ত হয়। কাঁচের মালাগাঁথা, কাগজের বাক্স তয়ের, তুলা বাছা, পুতুলগড়া ও পুতুলের বিছানা সেলাই ইত্যাদি নানা প্রকার কাজ শিশুরা খেলার সঙ্গে সঙ্গে শিখে। সংক্ষেপে, কিণ্ডরগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা শিশুদের স্বাভাবিক ও স্বাধীন কল্পনা, রুচি ও বুদ্ধি সকলের পুষ্টির জন্য প্রচুর উপায় দেওয়া হয়, ও উহা

হইতে পিতা মাতারা সন্তানদের বিশেষ বিশেষ মনোগত ভাব ও অভিরুচি বুঝিয়া উপযুক্ত শিক্ষাদানে সক্ষম হন।

কোন কোন কিণ্ডরগার্টেনে বাদ্য শিখান হয়। উহা দ্বারা শিশুদের শ্রবণশক্তির উৎকর্ষণ লাভ হয়। ঢাক, ঢোল, ভেঁপু, সানাই প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র শিক্ষয়িত্রী ছেলেদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন; ও নিজে গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজান। বাজ্‌নার মত আনন্দ-কর ক্রীড়া শিশুদের আর কি আছে? তারা উল্লাসে উহাতে যোগ দেয় ও অতি অল্প দিনে গান বাজনায় পটু হয়। সকাল বেলা তিন ঘণ্টা খেলিবার পর জলখাবার সময় আসে। ছেলেরা একত্র হইয়া খাবার ও দুধ খায়। ভোজনের পর আধ ঘণ্টা বিশ্রাম। আবার বিকালবেলা খেলা ও গল্পের সময়।

শিশুরা উঠানে সার বাঁধিয়া দাঁড়ায়; শিক্ষয়িত্রী তাহারা কি খেলা খেলিবে তাহাদি-গকে জিজ্ঞাসা করেন। যে খেলা অধিক ছেলে পছন্দ করে, তাহাই তখন আরম্ভ হয়। "চাষা কিরূপে শস্য বোনে জান্‌তে চাও?" শিশুরা চক্রাকারে নাচিতে নাচিতে কৃষকের ভূমি চষা ও শস্য রোপণের গান গায়। তারপর কাজ শেষে চাষী কিরূপে লাঙ্গল ঘাড়ে গৃহে ফিরে; কি প্রকারে গরুর গাড়ীতে ফসল বহিয়া গোলায় রাখে, নূতন খন্দ কাটার পর তাহারা কেমন আনন্দে নবান্নর ভোজ লাগায়; মাঠের কাজ ও পরিশ্রমের শেষে কত শান্তিতে বিশ্রাম করে—প্রভৃতি কৃষকের যত কাজ শিশুরা অভিনয় দ্বারা জানিতে পারে। প্রতি বালক বা বালিকা এই অভিনয়ের এক এক ভাগ খেলিতে শিখে, তাদের হাতপা বাজনার সঙ্গে তালে তালে দুলিতে থাকে, আর সকলে মিলিয়া গান গায়। কৃষকের খেলা শেষে কতকগুলি ছেলে গোল হইয়া একটী বন কল্পনা করে, আর অব-শিষ্টেরা পাখী হইয়া এদিক ওদিক উড়িয়া বেড়ায়। ছেলেরা ছুটিতে ছুটিতে হাত নাড়িয়া পাখীর ডানার অনুকরণ করে। সকলে উড়িয়া ক্লান্ত হইলে হাত ধরাধরি করিয়া হাঁটু পাতিয়া বসে ও পাখীর বাসার নকল করে; ও পরস্পরের কাঁধের উপর নিজেদের ছোট ছোট মাথা রাখিয়া পাখীরা যেন ঘুমাইতেছে, এইরূপ দেখায়। ঐ সময়ে অন্যান্য ছেলেরা আস্তে আস্তে একটী নিদ্রার-সঙ্গীত গায়। ক্রমে যেন রাত পোহাইল। পাখীরা ঘুম হইতে উঠিয়া আনন্দে আবার চারদিকে উড়িতে থাকে। পাখীর পর খরগোসের খেলা, হাঁসের খেলা, ঘোড়া ঘোড়া খেলা ইত্যাদি ক্রীড়ার পালা আসে। সকলগুলিই সব ছেলেদের সমান ব্যায়ামের জন্য বার বার খেলা হয়।

ক্রীড়াগুলি শিশুদিগকে মানুষ ও জন্তুদের কাজ ও পরিশ্রম দেখায় ও শিখায়। কল প্রস্তুত, পোলনির্ম্মাণ, বাড়ী তয়ের, গাছকাটা, জাহাজ গড়া প্রভৃতি বড় বড় কাজও উহাদিগকে ক্রীড়াচ্ছলে দেখান ও শিখান হয়। ছেলেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা ও গান গাওয়া ব্যতীত এ সব খেলায় আর কিছুরই আবশ্যক হয় না। ঐ সব ছোট ছোট খেলা অভিনয়ের পূর্ব্বে বালক বালিকাদিগকে খেলিবার নিয়ম শিখাইয়া দেওয়া হয়;

আর সকল ক্রীড়াতেই আমোদ ও কাজ একত্র থাকায় শিশুগণ কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করে না।

শিশুদের দ্বারা ঐ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটকাভিনয়ের প্রধান উদ্দেশ্য শরীর ও মনের সমচালনা। উহাতে হাতপা, আঙ্গুল বাহু, কোমর বুক, শিরা ধমনী প্রভৃতি শরীরের প্রত্যেক অংশের যথোচিত ব্যায়াম হয়। আর মনও চালিত হওয়াতে মনোবৃত্তি সকল কর্ষিত ও সবল হয়। গানবাদ্যে সঙ্গীতশাস্ত্রের চর্চ্চা হয়। অভিনয়ে ভাবাজ্ঞান ও মনোভাব প্রকাশের শক্তি এক সঙ্গে জন্মায়। ঐ সকল ক্রীড়ায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উত্তমরূপে পুষ্টি সাধন করিয়া শরীর ও মনকে সবল ও সুস্থ রাখে। শরীরের চালনা ভিন্ন মনের চালনা, বা মনোবৃত্তি কর্ষণে উপেক্ষা করিয়া শরীরের পুষ্টিসাধনে চেষ্টা করা যে অনভিজ্ঞের কাজ, তাহার আমরা প্রত্যহ প্রমাণ দেখিতেছি। শরীর ও মন উভয়ই একরূপ যত্ন ও চালনা দ্বারা পরস্পরের সমান কার্য্যযন্ত্র না হইলে কোন মানুষ বা কোনজাতির প্রকৃত শিক্ষা ও উন্নতি হওয়া অসম্ভব। ফ্রোবেল শরীর ও মনের ঐরূপ একান্ত সংস্রব বুঝিয়াই বলিয়াছেন—সুস্থ শরীরেই সুস্থ মন থাকিতে পারে।'

ইন্দ্রিয়াদির চালনার জন্ত কতিপয় ক্রীড়া হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে কাণা মাছির মত একটী ক্রীড়ার দ্বারা বালক বালিকাদের শ্রবণ ও স্পর্শ শক্তি কর্ষিত হয়। আর দুএকটী নিস্তব্ধ ও নিঃশব্দ ক্রীড়ার দ্বারা শিশুরা আত্মসংযম ও চিত্ত দমন প্রভৃতি মহৎ গুণে অভ্যস্ত হয়। এইরূপে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সঙ্গে নৈতিক গুণেরও উৎকর্ষ সাধন হইয়া থাকে।

আর, ঐ সব আনন্দময়ী ক্রীড়াতে শিশুরা অপরিসীম উল্লাস ও স্বাধীনতা ভোগ করিলেও সকলে স্কুলের আইন মতে চলিতে বাধ্য। খেলা ভঙ্গ বা বিশ্রাম যখন তখন করিবার যো নাই। গোলাকারে দাঁড়ান প্রভৃতি কাজে বালক বালিকারা শরীরকে অতি সোজা ও স্থির রাখিতে বাধ্য হয়। সামান্য গান ও ব্যায়ামেও বিন্দুমাত্র স্কুলের নিয়ম অন্যথা হয় না। কেহ নিজের ইচ্ছামত খেলায় যোগ বা ভঙ্গ দিতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়ার অংশ নির্দ্দিষ্ট শিশুদের দ্বারাই কৃত হইয়া থাকে। আর অন্যেরা, যতক্ষণ না তাহাদের পালা আসে, ততক্ষণ ধীরভাবে অপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে তাহারা কাজের সঙ্গে নিয়ম পালন, আইন রক্ষা, নম্রতা, বশ্যতা ও বিনয় প্রভৃতি গুণে অভ্যস্ত হওয়ায় উহাদের সদ্‌গুণ গুলির স্ফূর্ত্তি ও মন্দ অভ্যাসের নিরাকরণ হইয়া থাকে। স্কুলের বড় ছেলেরা ছোট শিশুদিগকে কাজে সাহায্য করে ও শিক্ষয়িত্রীকে দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিতে আনুকূল্য করে। ক্ষমতা বা পীড়নের দ্বারা স্বার্থ লাভের ইচ্ছা তাহাদের কখন প্রশ্রয় পায় না, কেন না, কিণ্ডরগার্টেনে ছোট বড় সব সমান। কোন শিশু দুর্ব্বল বা ভীত হইলে তাহার বলিষ্ঠ সঙ্গীরা তাহাকে রক্ষা করিতে বাধ্য হয়। এই

আনন্দময় স্কুলে ছেলেদের কখন কোন শাস্তি দিবার রীতি নাই; দুষ্ট বা একগুঁয়ে ছেলেদিগকে ক্রীড়াতে যোগ দিতে না দেওয়াই তাহাদের একমাত্র দণ্ড।

আমরা কিণ্ডরগার্টেন প্রণালী ও শিশুদিগকে দেখিয়া আনন্দে একেবারে বিহ্বল হইয়া বসিয়া আছি—ওদিকে স্কুল বন্ধের ঘণ্টা বাজিল; শিশুদের দাসীরা তাহাদিগকে যে যার গৃহে লইতে আসিয়াছে, কিন্তু তাহারা ওরূপ সুখের খেলা ছাড়িয়া বাড়ীতে মার কাছে যাইতেও ইচ্ছুক নয়। কেননা, তাহাদের ঐ সব ক্রীড়াতে ক্লান্তি বোধ হওয়া দূরে থাক, মনের স্ফূর্ত্তি ও শরীরের শক্তি অধিকতর বৃদ্ধি পায়। আর আমরাও ঐ সব সুন্দর শিক্ষাদায়ী ক্রীড়া ও সুস্থ শিশুদের উল্লাস দর্শনে এত নিবিষ্ট ছিলাম যে বেলা ৪টা বাজিয়াছে, তাহা জ্ঞান ছিল না।

পিতামাতারা হয় ত ভাবিতে পারেন যে কচি বয়সে অত প্রকার খেলা ও শিক্ষাতে শিশুদের মনের ও শরীরের অতিরিক্ত চালনা হয়। কিন্তু তাহা নহে। কারণ, কাজের শেষে খেলা, আর শারীরিক চালনার পর মনোবৃত্তির কর্ষণ ইত্যাদি পরিবর্ত্তন ও স্বাধীন ভাবে অবাধে লাফান, দৌড়ান প্রভৃতি দ্বারা কোন বিষয়েরই অতিরিক্ত চালনা হইবার সম্ভাবনা নাই। একটী কিণ্ডরগার্টেনে প্রবেশ করিয়া যদি একবার আপনারা ক্রীড়া নিযুক্ত বালক বালিকাগণের প্রফুল্ল ভাব দেখেন, তাহা হইলে সে মনোহর, চিত্তমুগ্ধকারী দৃশ্য কখন ভুলিতে পারিবেন না। দেখুন, তাদের শ্রমদক্ষ ছোট ছোট হাতগুলি কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কাজে রত রহিয়াছে। কত আগ্রহের সঙ্গে তাহারা নূতন গল্প শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতেছে। কত সহজে তাহারা জ্যামিতির রেখা টানিতেছে আর ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের আকার আঁকিতেছে। তাহারা কেমন একদণ্ডের জন্যও খেলা ও কাজ ছাড়িতে চায় না, অথচ শিক্ষয়িত্রী ডাকিবামাত্র নিজ নিজ খেলা-সামগ্রী গুছাইয়া তাঁর কাছে ছুটিয়া যায় ও অন্য প্রকার খেলা বা গল্পে যোগ দান করে। বাস্তবিক এ সব দেখিয়া আমরা যে কত দূর আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। আমি ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়া ও উহাদের উদ্দেশ্য পাঠক পাঠিকাদিগকে বুঝাইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু স্বচক্ষে না দেখিলে এ মহৎ শিক্ষার সুফল বোধগম্য হওয়া দুষ্কর।

শিশুদের শেষ খেলা প্রায় সম্পূর্ণ হইল, আর সমাপ্তির গান গাওয়া হইল। ঐ গানে ছেলেরা পরস্পরকে সম্ভাষণ করিয়া বলে, "এখন আমরা খেলা ও কাজ শেষে নিজ নিজ বাপমায় কাছে যাইতেছি, আবার কাল সকালে এক সঙ্গে মিলিয়া খেলিব।"

তার পর তাহাদের জামা ও পোষাকাদি ঠিক করিয়া পরা হইলে তাহারা শিক্ষয়িত্রীকে চুম্বন করিয়া ও তাঁর হাত ধরিয়া তাঁর কাছে বিদায় লয়। আমরা অপরিচিত দর্শক হইলেও তাহারা আমাদের কাছে বিদায় লইতে আসিল। আমরা সানন্দে তাহাদিগকে

চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলাম। তখন শিশুরা নাচিতে নাচিতে যে যার দাসীর সঙ্গে চলিয়া গেল। আমরা এক দৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম ও ঐ সুন্দর দৃশ্যে মনে কত ভাবের উদয় হইল।

স্কুলের পাঠের ন্যায় কিণ্ডরগার্টেনের ক্রীড়াদিও প্রত্যহ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। রোজ নূতন নূতন খেলা ও গল্পের নিয়ম আছে। উহা দ্বারা সাধারণতঃ স্বাভাবিক নিয়ম, মানুষের কাজ, ভিন্ন ভিন্ন ঋতু, নীতিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ছোট বড় সকল বিষয়ের কথা ও জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। তাছাড়া, পশুপক্ষিদের গল্প, ঈশ্বরের কথা ও ধর্ম্মোপদেশও তাহাদের সরল বুদ্ধির উপযোগী করিয়া বলা হয়। প্রকৃতি ও জীবন হইতে ঐ সকল ক্রীড়া ও গল্প লওয়া হয় বলিয়া উহার কখন শেষ নাই।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাসী।

কবিতা মালা।

লজ্জাবতী।

মরে যায় প্রাণখানি তার,
একটু কথার উপেখায়,
একটু ঘৃণার চাহনিতে,
কচি প্রাণ গলে তার যায়।

হাসিটুকু অতি মৃদু, ক্ষীণ,
বেশি কথা কহিতে পারে না,
কিসে পাছে লোকে কিছু বলে,
ভয়ে যেন স্বর বাহিরে না।

একা থাকে আপনার মনে,
ফিরেও চাহে না কেহ তারে;
করুণ দৃষ্টির কাঙালিনী,
গলে যায় একটু আদরে।

শ্রীমতী সরলাবালা সরকার।

দুজনায়।

আমরা দুইটি পাখী বিজন কাননে
মুখোমুখি করি রব তমালের ডালে।
অদূরে বহিয়া যাবে নীরবে তটিনী
সুনীল মেঘের ছায়া ভেসে যাবে জলে।
সন্ধ্যা সমীরণ ধীরে ফুলবন হ'তে
ছড়াইবে ফুলরেণু আকুলিত প্রাণ,
দুইটি হৃদয় তন্ত্রি উঠিবে বাজিয়া
দুইটি হৃদয় গাবে একই প্রেম গান।
সন্ধ্যা তারা নীলাকাশে উঠিবে ফুটিয়া
সাজাইতে রজনীর শ্যাম কলেবর,
চন্দ্রমা উঠিবে ধীরে রজত-কিরণে
ছড়াইবে শান্তি-সুধা, শান্ত চরাচর।
আমাদের দুটি প্রাণ, দুটি শান্ত প্রাণ
ঘুমাইবে প্রকৃতির শান্তিময়ী ক্রোড়ে
শশাঙ্ক কিরণ-ধারা ঢালিবে নীরবে
তারকা জাগিয়া রবে আমাদের তরে।

অনন্ত আকাশে মোরা বেড়াইব ভাসি,
কনক-বরণ উষা হাসিবে যখন
অদূরে পড়িয়া রবে নিখিল ধরণী,
জীবন স্বপন হবে, মরণ মিলন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ।

লক্ষ্ণৌর আতা।

চাহি না 'আনার'!১—যেন অভিমানে ক্রুর
আরক্তিম গণ্ড, ওষ্ঠ ব্রজসুন্দরীর!
চাহিনা'ক "সেউ"—যেন বিরহ বিধুর
জানকীর চিরপাণ্ডু বদন রুচির!
একটুকু রসে ভরা, চাহি না আঙ্গুর;
সলজ্জ চুম্বন যেন নব বধূটির!
* চাহি না "গণ্ডার" স্বাদ!—কঠিনে মধুর
প্রগাঢ় আলাপ যেন প্রৌঢ় দম্পতির!
দাও মোরে সেই জাতি সুবৃহৎ আতা,
থাকিত যা নবাবের উদ্যানে ঝুলিয়া!
চঞ্চলা বেগম্ কোন হয়ে উল্লাসিতা
ভাঙিত; সে স্পর্শে হর্ষে যাইত ফাটিয়া!
অহো কি বিচিত্র মৃত্যু!—আনন্দে গুমরি
যেত মরি রসিকার রসনা-উপরি!
না গো—কলিকাতা নহে প্রাসাদ-নগরী;
চৌরঙ্গী-ঘাঘ্‌রা-পরা বিবিয়ানা সার!
আজি এ বৈধব্য!—তবু বেগম-ঈশ্বরী
লক্ষ্ণৌ লো তোর কাছে জারিজুরি কার?
"কয়শরবাগ্" ও "হোসেনাবাদ" বেড়ি,
মরি কি কিন্‌খাপে মোড়া অঙ্গের বাহার!
চক্ষু যায় ঝলসিয়া, চুন্নি, পান্না হেরি;
স্থপতি দেবীর যেন রত্নের ভাণ্ডার!
আরব্যের উপন্যাস, অলীক কাহিনী
নহে ও বুদ্ধের বাণী।—গোমতীর ধারে
অসংখ্য "মচ্ছিভবন" ছিল শ্রেণী শ্রেণী!
অগণ্য "ছত্রমঞ্জিল" কাতারে, কাতারে!
নাহি ঠুংরি!—অলক্ষ্মী "বাউল" সুরে গায়!
লক্ষ্ণৌ লক্ষ্ণৌ তবু ঐশ্বর্য্য প্রভায়!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

১ দাড়িম্ব।
* লক্ষ্ণৌ সহরে ইক্ষুকে "গণ্ডা" বলে।

প্রভাতে।

দেখ কে দাঁড়ায়ে হেথা
প্রভাতে কুসুম-বনে,
জিনিয়া উষার বিভা
ললাটে লাবণ্য কিবা,
ফুটাইছে যেন দিবা
সে কিরণ বরিষণে!

শিশুর আনন্দে যেন
মাখায়ে মায়ের স্নেহ,
যুবার উৎসাহ দিয়া
গঠিত সে চারু দেহ।
চাহিলে সে মুখপানে
হৃদি ভেসে যায় গানে,
এ বিশ্ব মিশায় প্রাণে
বাহিরে থাকে না কেহ।

দেখে যেন হাসি তার
হেসে ফোটে বনে ফুল,
শুনে সে ললিত বীণা
গেয়ে ওঠে পাখীকুল।
মধুর নিশ্বাস-বাসে
অলি আসি ভ্রমে পাশে,
ধরা-সে সঙ্গীত-ভাষে
জেগে ওঠে প্রেমাকুল।

আকাশের কোলে কোলে
  সাগরের তীরে তীরে,
তারি কথা গেয়ে যায়
  বায়ু যেন ধীরে ধীরে।
সুদূর মেঘের ঘর
ছাড়ি যেন রবি-কর
হাসে তার কেশ'পর
  মুকুট সাজাতে শিরে।

শ্যামল পল্লব পত্র
  ল'য়ে পুষ্প উপহার,
আগ্রহে প্রকৃতি থাকে
  মুখ পানে চেয়ে তার।
তবুও ত তার চিত,
নহে মদ-কলুষিত,
মধু ঋতু বিরাজিত
  রাখিয়াছে চারিধার।

প্রাণের বাসনা যত
  ছড়াইয়ে ফুল-বনে,
চির ফুল্ল ফুলে মালা
  গাঁথিতেছে মনে মনে।
স্বর্গীয় সুরভি ঘ্রাণ
জাগাইছে হৃদে গান,
যেতেছে মিশিয়া প্রাণ
  স্বপ্নময় জাগরণে।

——

সন্ধ্যায়।

দেখ কে দাঁড়ায়ে হেথা
  সন্ধ্যার বর্ত্তিকা ল'য়ে,
প্রাণের শোণিত বহে
  নয়নের অশ্রু হ'য়ে।

কথাবার্ত্তা হেথাকার
  ফুরা'য়ে গিয়েছে তা'র,
কোথাকার সমাচার
  মনে পড়ে র'য়ে র'য়ে।

আকাশ-সমুদ্র পারে
  কি আছে তা ভাবে মনে,
গগনে ফুটিছে তারা
  আনমনে তাই গণে।
বায়ু-স্পর্শে অনিবার
কেঁপে ওঠে হৃদি তার,
সভয়ে অদূরে কার
  পদধ্বনি যেন শোনে।

হৃদি ফুল-বন ছিন্ন
  শোভাশূন্য একেবারে,
শুষ্ক চিতাকাষ্ঠ রাশি
  জাগে শুধু চারিধারে।
বিশ্বের জীবন গ্রাসি'
উঠিছে ধ্বংসের হাসি,
নাচিছে মরণ আসি
জীবন-সর্ব্বস্ব শূন্য
  দিবসের ঘোর রণে,
আঁধারে পথের সঙ্গী
  খোঁজে তাই প্রাণপণে।
আকুল হৃদয় তার
বিক্ষোভিত পারাবার,
নাহি শ্রান্তি, ঝটিকার—
  দীর্ঘশ্বাস ক্ষণে ক্ষণে।

নাহি কি দেবতা মর্ত্ত্যে
  দাঁড়ায়ে সাগর-তীরে;

আশার সুবর্ণ দণ্ড
সঞ্চালিতে সিন্ধু-নীরে ?
চাহিয়া স্বর্গের বর
ঘুচাতে আর্ত্তের ভয়,
মস্তকে সঞ্চালি কর
শান্তি দিতে ধীরে ধীরে ?

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

লিচ্ছবি রাজগণ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

উদীচ্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে শক পূর্ব্ব একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করেন। * বংশাবলীলেখক তাঁহাদিগকেও অতিক্রম করিয়া শাক্যসিংহের শিষ্য ভূমিবর্ম্মণের রাজ্যাভিষেক কাল ১৩৮৯ কলিগতাব্দ (১৮৯০ পূর্ব্ব শকাব্দ লিখিয়াছেন। কিন্তু দক্ষিণ দেশীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতানুসরণ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শক পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধের তিরোভাব কাল নির্ণয় করিয়াছেন। সুতরাং শাক্যসিংহের শিষ্য ভূমিবর্ম্মণকে শক পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়া সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অজাতশত্রু কর্ত্তৃক বৈশালী বিনষ্ট হওয়ার পর ভূমিবর্ম্মণ নেপালের রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে আমরা বংশাবলী লেখকের মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূমিবর্ম্মণের অভিষেক কাল বুদ্ধের অন্ততঃ ৫ বৎসর অন্তে (৫৫৬—৫)=৫৫১ পূর্ব্ব শকাব্দ—বা অজাতশত্রুর বৈশালী বিনষ্টের ২ বৎসর পর (৫৫৩—২=) ৫৫১ পূর্ব্ব শকাব্দ) নির্ণয় করিতে পারি।

---

* তিব্বতদেশীয় লামা পদ্মকল্পের, (শকাব্দের পঞ্চদশশতাব্দীতে ইনি জীবিত ছিলেন) মতে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণকাল ... ১১৩৬ পূর্ব্ব শকাব্দ।

কাশ্মীরের বিখ্যাত ইতিহাস লেখক কহ্লনের মতে বুদ্ধের নির্ব্বাণ কাল ... ১৪১০ „

চীন দেশীয় ইতিহাস লেখকদিগের মতে বুদ্ধের নির্ব্বাণ কাল ১১১৪ „

মাতোয়ালীনের মতে (ইনি শকাব্দের একাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন) বুদ্ধের নির্ব্বাণ কাল ... ১১১৫ „

জাপান দেশীয় বৌদ্ধদিগের মতে বুদ্ধের নির্ব্বাণ কাল ১০৩৮ „

মোগলদিগের তালিকা অনুসারে বুদ্ধের নির্ব্বাণ কাল ১০৩৬ „

নেপালের পঞ্চম রাজবংশ।

সূর্য্যবংশীয় (লিচ্ছবি) রাজগণ। †

১। ভূমিবর্ম্মণ। ৫৫১ পূর্ব্ব শকাব্দ।
বাণেশ্বর নগরে রাজপাট স্থাপন করেন।

২।	চন্দ্র বর্ম্মণ।	রাজ্যকাল	৬১	বৎসর।
৩।	জয় বর্ম্মণ।	,,	৮২	,,
৪।	বর্ষ বর্ম্মণ।	,,	৬১	,,
৫।	সর্ব্ব বর্ম্মণ।	,,	৭৮	,,
৬।	পৃথিবী বর্ম্মণ।	,,	৭৬	,,
৭।	জ্যেষ্ঠ বর্ম্মণ।	,,	৭৫	,,
৮।	হরি বর্ম্মণ।	,,	৭৬	,,
৯।	কুবের বর্ম্মণ।	,,	৮৮	,,
১০।	সিদ্ধি বর্ম্মণ।	,,	৬১	,,
১১।	হরিদত্ত বর্ম্মণ।	,,	৮১	,,

ইনি ৫টি দেব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

১২।	বসুদত্ত বর্ম্মণ।	,,	৬৩	,,
১৩।	পতি বর্ম্মণ।	,,	৫৩	,,
১৪।	শিববৃদ্ধি বর্ম্মণ।	,,	৫৪	,,
১৫।	বসন্ত বর্ম্মণ।	,,	৬১	,,
১৬।	শিব বর্ম্মণ।	,,	৬২	,,
১৭।	রুদ্রদেব বর্ম্মণ।	,,	৬৬	,,

১৮। বৃষদেব বর্ম্মণ। ইনি অনেকগুলি বিহার ও লোকেশ্বর প্রভৃতি বুদ্ধগণের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইঁহার ভ্রাতা বালরচন একজন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ ছিলেন। এই নরপতির শাসনকালে শঙ্করাচার্য্য নেপালে গমন করিয়া বৌদ্ধদিগকে তর্কযুদ্ধে পরাজয় করেন। তদ্দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতি আরম্ভ হয়।

ইঁহার রাজ্যকাল ৬১ বৎসর।

১৯।	শঙ্করদেব।	,,	৬৫	,,
২০।	ধর্ম্মদেব।	,,	৫৯	,,
২১।	মানদেব।	,,	৪৯	,,

† Wright's History of Nepal. pp. 113—132.

ইনি চক্রবিহার ও খাসা চৈত্য নির্ম্মাণ করেন।

২২। মহীদেব। ,, ৫১ ,,

২৩। বসন্তদেব। ,, ৩৬ ,,

২৪। উদয় দেব বর্ম্মণ। ,, ৩৫ ,,

২৫। মানদেব বর্ম্মণ। ,, ৩৫ ,,

২৬। গুণকামদেব। ,, ৩০ ,,

২৭। শিবদেব বর্ম্মণ। ,, ৫১ ,,

ইনি দেব পত্তন নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজপাঠ স্থাপন করেন। তিনি শক্তি উপাসক ছিলেন, এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজদণ্ড প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং বাণপ্রস্ত আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র পুণ্যদেব পিতার সহিত সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

২৮। নরেন্দ্র বর্ম্মণ। ,, ৪২ ,,

২৯। ভীমদেব বর্ম্মণ। ,, ৩৬ ,,

৩০। বিষ্ণুদেব বর্ম্মণ। ,, ৪৭ ,,

৩১। বিশ্বদেব বর্ম্মণ। ,, ৫১ ,,

ইঁহার শাসনকালে বিক্রমাদিত্য (হর্ষবর্দ্ধন) নেপাল জয় করিয়া তথায় স্বীয় অব্দ প্রচলিত করেন।

বংশাবলীলেখক যে কেবল অস্বাভাবিকরূপে নরপতিবর্গের রাজ্যকাল লিখিয়াছেন এমত নহে, আমাদের বিবেচনায় রাজাদিগের নামগুলিও উলটপালট করিয়াছেন। কারণ মালবরাজ সুবিখ্যাত বিক্রমাদিত্য ও কান্যকুব্জপতি হর্ষবর্দ্ধন ইঁহারা উভয়েই শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী সুতরাং শঙ্করের সমসাময়িক বৃষদেব বর্ম্মণকে, হর্ষের সমসাময়িক বিশ্বদেবের বহু পূর্ব্বে স্থাপন করা হইয়াছে। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী, ত্রিপুরার রাজমালা, উড়িষ্যার মাদলাপাঞ্জী প্রভৃতি যে কয়েক খানা প্রামাণ্য ইতিহাস আছে, তাহার সকলগুলিতেই এবম্প্রকার ভ্রমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হয়। এস্থানে আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত আর একটি কথা উল্লেখ করিতে পারি। গুপ্তসম্রাটদিগের ভারত শাসন কালে নেপালের লিচ্ছবি রাজগণ তদানীন্তন ক্ষত্রিয় সমাজে বিশেষ সম্মানার্হ ছিলেন। গুপ্ত বংশীয় তৃতীয় নরপতি মহারাজাধিরাজ চন্দ্র গুপ্ত (প্রথম) বিক্রমাদিত্য লিচ্ছবি রাজকন্যা মহাদেবী কুমারদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায় মহারাণী কুমার দেবীর নামের সহিত "লিচ্ছবয়" শব্দসংযুক্ত রহিয়াছে। মহারাণী কুমারদেবীর গর্ভে সম্রাট সমুদ্র গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। গুপ্ত নরপতিগণের খোদিত লিপি সমূহে যে স্থানে সমুদ্র গুপ্তের উল্লেখ হইয়াছে, সেই স্থানেই তাঁহাকে গৌরবের সহিত "লিচ্ছবি

দৌহিত্র" লেখা হইয়াছে। ‡ নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, গুপ্ত নরপতিদিগের খোদিত লিপি সমূহে যেরূপ ভারতেশ্বরী কুমারদেবীর পিতার নাম লিখিত হয় নাই, বংশাবলী লেখকও মহারাণী কুমার দেবীর সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করেন নাই।

শকাব্দের চতুর্থ শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান বৈশালী দর্শন করেন। কিন্তু তিনি লিচ্ছবিদিগের কোন উল্লেখ করেন নাই।

শকাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে সুবিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিয়োনসাঙ ভারত ভ্রমণ করেন। তৎকালে মিথিলা দুইটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তিনি সেই দুইটী রাজ্যের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

১। বৈশালী—এই রাজ্যের পরিধি ৫০০০লি (৮৩৩ হইতে ১০০০লি)। ভূমি উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী। নানাবিধ ফল ও পুষ্প প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। আম্র ও মোচা (৩০) অতি প্রশংসনীয়; এই দুইটি ফল অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জল বায়ু ও উত্তাপের সাম্যভাব পরিলক্ষিত হয়। অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার সরল ও পবিত্র। ইহারা ধর্ম্ম ও বিদ্যানুরাগী। স্বধর্ম্মী (বৌদ্ধ) ও বিধর্ম্মীগণ (হিন্দু, জৈন) একত্র বাস করে। কয়েক শত সঙ্ঘারাম আছে, তাহার অধিকাংশই ভগ্নদশা প্রাপ্ত। কেবল ৪।৫ টি সঙ্ঘারাম ভাল আছে। তাহাতে কতিপয় শ্রমণ বাস করেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেকগুলি দেবমন্দির আছে। জৈন সম্প্রদায়ের সংখ্যাই অধিক।

প্রধান নগর বৈশালী ভগ্নদশা প্রাপ্ত; তাহার পরিধি (৬০।৭০লি) ১০।১২ মাইল। রাজ ভবনের পরিধি কিঞ্চিদূন একমাইল (৪।৫লি) তন্মধ্যে অল্প লোক বাস করিতেছ। রাজবাটীর একমাইল (৫।৬ লি) দূরে একটি সঙ্ঘারাম আছে, তাহাতে কয়েক জন শ্রমণ বাস করেন। তাঁহারা হীনযান সম্প্রদায়ের মতানু যায়ী গ্রন্থ সমূহ পাঠ করিয়া থাকেন।

---

‡ "মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত পুত্রস্য লিচ্ছবি দৌহিত্রস্য মহাদেব্যাং কুমার দেব্যামুৎপন্নস্য
মহারাজাধিরাজ শ্রীসমুদ্র গুপ্তস্যঃ"

দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের মুদ্রার ২, ৩ পংক্তিতে; প্রয়াগ লাট প্রস্তর লিপির ২৮, ২৯ পংক্তিতে, গয়ার তাম্র শাসনের ৫, ৬, ৭ পংক্তিতে, মথুরার প্রস্তর লিপির ৬, ৭, ৮ পংক্তিতে; বিলসাড় শিলা স্তম্ভলিপির ৩, ৪ পংক্তিতে; বিহার শিলা স্তম্ভলিপির (দ্বিতীয় অংশের) ১৮, ১৯ পংক্তিতে এবং ভিটারীর শিলা স্তম্ভ লিপির তৃতীয় চতুর্থ পংক্তিতে এই বর্ণনা দৃষ্ট হয়। অন্য কোন গুপ্ত সম্রাটের মাতামহকুলের এবম্প্রকার উল্লেখ নাই। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, তদানীন্তন ক্ষত্রিয় সমাজে "লিচ্ছবি" গণ বিশেষ সম্মানিত ছিলেন।

৩০ বোধ হয় হিয়োনসাঙ মোচার ফল আকার করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

বৈশালী হইতে ৫০০ লি (৮৩ হইতে ১০০ মাইল) উত্তর-পূর্ব্ব দিকে গমন করিয়া আমরা "বর্জ্জি" রাজ্যে উপনীত হই।

"২। বর্জ্জি (৩১) এই রাজ্যের পরিধি ৪০০০ লি (৬৬৬—৮০০ মাইল)। পূর্ব্ব পশ্চিমে এই রাজ্য সুদীর্ঘ। উত্তর দক্ষিণে ইহার পরিসর অতি অল্প। এই রাজ্য উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী, তাহাতে ফল পুষ্প প্রচুর পরিমাণে জন্মে। জলবায়ু শীতল। অধিবাসীগণ নিতান্ত চঞ্চল প্রকৃতি, অধিকাংশই বিধর্ম্মী (হিন্দু ও জৈন) বৌদ্ধের সংখ্যা অতি অল্প। এই রাজ্যে প্রায় দশটি সঙ্ঘরাম আছে, তন্মধ্যে প্রায় সহস্র শ্রমণ বাস করেন। তাঁহারা মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। বিধর্ম্মীদিগের অনেকগুলি দেব মন্দির আছে। এই রাজ্যের রাজধানী জনকপুর (চন-সু-লো) ভগ্নদশা প্রাপ্ত। প্রাচীন রাজধানীর মধ্যে তিন সহস্র গৃহ দৃষ্ট হয়। ইহাকে নগরের পরিবর্ত্তে গ্রাম বলা যাইতে পারে।"

তৎকালে মিথিলা রাজ্যে যে লিচ্ছবিদিগের কোনরূপ প্রভুত্ব ছিল, এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বোধ হয় এই সময়ে মিথিলা কান্যকুব্জের রাজদণ্ডের অধীন ছিল।

এক্ষণে আমরা নেপালের লিচ্ছবি রাজবংশের কথা উল্লেখ করিব। পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রজী নেপাল হইতে ২৩ খানা শিলা লিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (৩২) তাহার ১৫ নং খোদিত লিপিতে লিচ্ছবি বংশের উৎপত্তি বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

প্রজাপতি ব্রহ্মার পৌত্র সূর্য্য হইতে মনুর উৎপত্তি। মনুর পুত্র ইক্ষাকু, তস্য পুত্র বিকুক্ষি, তৎপুত্র বিশ্বগশ্ব। তদনন্তর ২৮ জন রাজা গত হইলে পর পৃথিবীপতি সগর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র অসমঞ্জ, তৎপুত্র অংশুমত (অংশুমান), তস্যপুত্র দিলীপ। দিলীপ হইতে ভগীরথের উৎপত্তি। তদনন্তর রাজা—(প্রস্তর লিপির এই অংশ বিনষ্ট

---

৩১ হিয়োনসাঙ ইহাকে "ফ লো ছি" লিখিয়াছেন, তদনুসারে "বরজি" বলা যাইতে পারে। কিন্তু হিয়োনসাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত (Si-yu-ki) গ্রন্থের ফরাসী ও ইংরেজি অনুবাদকগণ ইহাকে "বৃজি" করিয়া ফেলিয়াছেন। সংস্কৃত কিম্বা পালি কোন গ্রন্থেই এইরূপ অর্থহীন "বৃজি" শব্দ দৃষ্ট হয় না। বিজ্ঞবর কনিংহাম সাহেব "বৃজি" বর্ণ বিন্যাস স্থির রাখিবার জন্য টীকা করিয়া বলিতেছেন, "বৃজি শব্দই ঠিক, কেননা এই নামে একটি স্থান অদ্যাপি মথুরার নিকট বর্ত্তমান রহিয়াছে।" পাঠকগণ বুঝিতে পারিলেন, কনিংহাম সাহেব আমাদের বৃন্দাবন—অর্থাৎ ব্রজধামের কথা উল্লেখ করিতেছেন। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে, যে সূত্র অনুসারে ব্রজ—"বৃজি" হইয়াছে, বোধ হয় সেই সূত্র অনুসারেই "বর্জ্জি" "বৃজিতে" পরিণত হইয়াছে।

৩২ Twenty three inscriptions from Nepal collected at the expense of His Highness the Nawab of Junagadh. Edited under the patronage of the Government of Bombay. By Pandit Bahgaban Lal Indiaji Pp. D. (Bombay: 1885.)

হইয়া গিয়াছে। রঘু হইতে অজের উৎপত্তি। তৎপুত্র দশরথ। তদনন্তর ৮ জন রাজা গত হইলে পর লিচ্ছবি আবির্ভূত হন। সেই লিচ্ছবি হইতে "চন্দ্র কলা কলুষ ধবল গঙ্গা প্রবাহোপম লিচ্ছবি নামক রাজ বংশের উৎপত্তি।

"শ্রীমত্তুঙ্গরথস্ততো দশরথঃ পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈস্সমং
রাজ্ঞোষ্টাবপরান্বিহায় পরত শ্রীমানভূল্লিচ্ছবিঃ ॥৫॥
আস্যাবক্ষিতি মণ্ডনৈকতিলকো লোক প্রতীতোমহানা—
... ... প্রভাব মহতাম্মান্যঃ সুরাণামপি।
স্বচ্ছং লিচ্ছবিনাম বিভ্রদপরো বংশ প্রবৃত্তোদয়। (৩৩)
শ্রীমচ্চন্দ্র কলাকলাপ ধবল গঙ্গা প্রবাহোম ॥ ৬ ॥

সেই লিচ্ছবি বংশে "ক্ষিতিপতি সুপুষ্প শ্রীমান পুষ্পপুর" নগরে জন্ম গ্রহণ করেন, এই সুপুষ্প নরপতি হইতে নেপালের লিচ্ছবি রাজ বংশের উৎপত্তি। কিন্তু লিচ্ছবি রাজবংশীয় কোন ব্যক্তি নেপালের রাজদণ্ড প্রথম ধারণ করিয়াছিলেন খোদিত লিপিতে তাহার কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং এক্ষণে আমাদিগকে "বংশাবলী" গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রায় একশতাব্দী অতীত হইল, ললিতপত্তনস্থিত মহাবুদ্ধবিহারের বৌদ্ধগুরু নেপালের রাজাদিগের ইতিবৃত্ত মূলক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন, ইহার নাম "বংশাবলী"। এই গ্রন্থ খানা সম্পূর্ণ প্রামাণ্য ইতিহাস না হইলেও ইহাকে এককালে মূল্যহীন বলা যাইতে পারে না। ইহাতে রাজাদিগের সময় ও শাসন কাল কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিকভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ডাক্তার রাইট সাহেব প্রধানতঃ এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া "নেপালের ইতিহাস" নামক একখানা উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই গ্রন্থে লিচ্ছবি রাজন্যবর্গের যে তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা এস্থলে লিখিত হইল। উক্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, নেপালের চতুর্থ রাজবংশ চন্দ্রান্বয়জাত ছিলেন। উক্ত বংশীয় শেষ নরপতি ভাস্করবর্ম্মা পশুপতিনাথ সমীপে প্রার্থনা করেন যে, তাহার যেন পুত্র সন্তান না হয়। এজন্য তাহার কোন সন্তান হয় নাই। অপত্যহীন প্রবল প্রতাপশালী নরপতি ভাস্করবর্ম্মা সূর্য্য (লিচ্ছবি) বংশীয় রাজপুত্র ভূমিবর্ম্মণকে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ইনি ভগবান শাক্য

---

৩৩ ফ্লিট সাহেব বলেন (Corp. Inscr. Ind. Vol III. p. 185.) পণ্ডিত ভগবান লাল যেস্থানে "অপর বংশ" পাঠ করিয়াছেন, আমার বিবেচনায় সেস্থানে "অপরং নাম" হইবে। কিন্তু আমরা শিলা লিপি পাঠ করিয়া দেখিলাম পণ্ডিতজীর পাঠই সঙ্গত বোধ হইতেছে। শ্লোকের অর্থ ফ্লিট সাহেবের নিকট ভাল বোধ না হওয়াতেই তিনি পাঠ পরিবর্ত্তন চেষ্টা করিয়াছেন।

সিংহের শিষ্য ছিলেন। ভাস্কর বর্ম্মার মৃত্যুর পর সূর্য্যবংশীয় ভূমি বর্ম্মণ রাজ দণ্ড ধারণ করেন। ইনিই নেপালের লিচ্ছবি রাজবংশের স্থাপনকর্ত্তা। (৩৪)

পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রজী প্রস্তর লিপিসমূহ অবলম্বন করিয়া নেপালের লিচ্ছবি রাজগণের যে বংশাবলী প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

১। জয়দেব। শকাব্দ প্রচলিত হইবার ৭৮ বৎসর পূর্ব্বে সিংহাসনে আরোহণ করেন। (১৫নং প্রস্তর লিপি।)

২ হইতে ১২ } ১৫নং প্রস্তরলিপিতে একাদশ জন রাজার নাম পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

১৩। বৃষদেব। ১৮২ শকাব্দ। (১ এবং ১৫ নং প্রস্তর লিপি।)

১৪। শঙ্করদেব। (পুত্র) (১) ২০৭ শকাব্দ। (১ এবং ১৫ নং প্রস্তর লিপি।)

১৫। ধর্ম্মদেব। (পুত্র) রাজ্ঞী রাজ্যবতী। ২২৭ শকাব্দ। (১ এবং ১৫ নং প্রস্তরলিপি)

১৬। মানদেব। (পুত্র) ৩৮৬—৪১৩ সম্বৎ (২৫১—২৭৮ শকাব্দ) ১ (১, ৩ এবং ১৫ প্রস্তর লিপি।)

১৭। মহীদেব। (পুত্র) ২৮২ শকাব্দ।

১৮। বসন্তদেব বা বসন্ত সেন। } (পুত্র)। ৪৩৫ সম্বৎ (৩০০ শকাব্দ,) (৪ এবং ১৫নং প্রস্তর লিপি)

১৯। উদয়দেব। ৩২২ শকাব্দ। (১৫ নং প্রস্তর লিপি।)

২০। হইতে ২৭। } ১৫ নং প্রস্তর লিপিতে এই সকল নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে।

২৮। শিব দেব। (৫নং প্রস্তর লিপি) ৫৩২ শকাব্দ। অংশু বর্ম্মণের সমসাময়িক।

২৯। ১৫নং প্রস্তর লিপিতে এই নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে।

৩০। ধ্রুবদেব। (হর্ষ) অব্দ ৪৮ বা ৫৭৭ শকাব্দ। ৯নং প্রস্তর লিপি।

বিষ্ণুগুপ্তের সমসাময়িক।

৩১। ৩২। } প্রস্তর লিপিতে নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে।

---

৩৪ (Bhashkar Barma, therefore appointed as his successor one Bhumi Barman a chhatri of the solar race of Rajputs of the Goutam Gotra, who had been one of the followers of Sakya sinha Buddha of Kapilvastu.
Wright's History of Nepal. page 113.

১। যে সকল নরপতির নামের অন্তে (পুত্র) শব্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার পুত্র বিবেচনা করা হইবে।

৩৩। নরেন্দ্র দেব। ৬২২ শকাব্দ। (১৫নং প্রস্তর লিপি।)

৩৪। শিবদেব। (পুত্র) (দ্বিতীয়) ১২, ১৪ এবং ১৫ নং প্রস্তর লিপি।
ইনি মৌখরি বংশীয় ভোগবর্ম্মার কন্যা ও মগধেশ্বর আদিত্যচরণের দৌহিত্রী বৎস দেবীকে বিবাহ করেন। ১১৯—১৪৫ (হর্ষ) সম্বৎ। ৬৪৮—৬৭৪ শকাব্দ।

৩৫। জয়দেব পরচক্রকাম। (পুত্র) ১৫৩ (হর্ষ) সম্বৎ। (৬৮২ শকাব্দ।) ইনি গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ, কোশল প্রভৃতি দেশাধিপতি ভগদত্ত বংশীয় হর্ষদেবের (২) কন্যা রাজ্যমতি দেবীকে বিবাহ করেন।

নেপালাধিপতিগণের খোদিত লিপি সমূহ পর্য্যালোচনা দ্বারা অনুমিত হইতেছে যে শকাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে নেপাল রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। পূর্ব্ব ভাগের রাজধানী মানগৃহ লিচ্ছবিদিগের দণ্ডাধীন ছিল। পশ্চিমাংশ "ঠাকুরী" বংশের করায়ত্ব হইয়াছিল। তাহাদের রাজধানী "কৈলাসকুট ভবন"। ঠাকুরী বংশের স্থাপনকর্ত্তা অংশুবর্ম্মণ। ইনি প্রথমতঃ লিচ্ছবিদিগের জনৈক সামন্ত ছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞবর ফ্লিট সাহেব বলেন, অংশু বর্ম্মণ মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধনের অধীনস্থ সামন্ত ছিলেন। দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, আমরা ফ্লিট সাহেবের মতানুসরণ করিতে অক্ষম। আমাদের বিবেচনায় লিচ্ছবি বংশীয় রাজকন্যা বিবাহ করিয়া মহা সামন্ত অংশুবর্ম্মণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি শিবদেবের ভগিনীপতি এবং শিবদেবের বাল্যাবস্থায় তাহার রক্ষক ছিলেন। এ জন্যই শিবদেবের খোদিত লিপিতে অংশুবর্ম্মণ নাম সংযুক্ত রহিয়াছে। * আধুনিক জংবাহাদুরদিগের ন্যায় সমগ্র নেপাল রাজ্যে তাঁহার অসাধারণ প্রভুত্ব ছিল।

---

২ পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রজী বলেন "ভগদত্ত বংশীয় শ্রীহর্ষদেব অবশ্যই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি ছিলেন এবং তিনি হর্ষ বর্দ্ধনের সমসাময়িক কুমার রাজের বংশধর হইবেন।" পণ্ডিতজীর এই সিদ্ধান্ত আমাদের বিবেচনায় সঙ্গত বোধ হইতেছে না, কারণ কুমার রাজ ব্রাহ্মণ বংশজ। ক্ষত্রিয় নরপতি জয়দেব অবশ্যই ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তৎকালে কামরূপ ও সমতট (বঙ্গ) ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজাদিগের অধীন ছিল। সুতরাং জয়দেবের শ্বশুর শ্রীহর্ষদেবকে কামরূপের রাজা বলা যাইতে পারে না। তৎকালে উত্তর ও পশ্চিম বাঙ্গলা ক্ষত্রিয় নরপতিদিগের দণ্ডাধীন ছিল। রাজতরঙ্গিণী পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, কাশ্মীরাধিপতি জয়পীড় (৬৫৫ শকাব্দ) গৌড়েশ্বর জয়ন্তের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। এস্থলে যে কোশলের কথা উল্লেখ হইয়াছে তাহা অযোধ্যা নহে। আধুনিক কটকেই প্রাচীন কোশল বা দক্ষিণ কোশল। (মহারাজ যযাতী কেশরীর তাম্রশাসন দেখ। (J. A. S. K. XLVI. I. 149.) সুতরাং বোধ হইতেছে গৌড়েশ্বর হর্ষদেব জয়ন্তের উত্তরাধিকারী হইবেন।

* । স্বস্তি মানগৃহাজ্জ্যুতনর বিনয় শৌর্য্যধৈর্য্যবীর্য্যাদ্যনেক—

ফ্লিটকৃত নেপালের প্রাচীন রাজন্যবর্গের তালিকা।

(Corpus Ins. Indicarum. III. 189.)

লিচ্ছবি—সূর্য্যবংশ রাজধানী মানগৃহ।		ঠাকুরীবংশ। রাজধানী কৈলাসকুট ভবন।	
	১। জয়দেব ৩৩০—৩৫৫ খৃঃ।		
	২ হইতে ১২ } ৩৫৫—৬৩০ খৃঃ।		
শিবদেব (প্রথম) মহারাজ—৬৩৫ খৃঃ।	১৩। বৃষদেব। ৬৩০—৫৫ খৃঃ।	অংশুবর্ম্মণ মহাসামন্ত, তৎপর মহারাজাধিরাজ। ৬৩৫—৫০ খৃঃ।	
ধ্রুবদেব মহারাজ। ৬৫৩ খৃঃ।	১৪। শঙ্করদেব (পুত্র) ৬৫৫—৮০ খৃঃ।		
	১৫। ধর্ম্মদেব (পুত্র) ৬৮০—৭০৪ খৃঃ।	বিষ্ণুগুপ্ত। ৬৫৩ খৃঃ।	উদয়দেব। ৬৭৫—৭০০ খৃঃ।
	১৬। মানদেব (পুত্র) ৭০৫—৭৩২ খৃঃ।		নরেন্দ্রদেব। ৭০০—৭২৪ খৃঃ।
	১৭। মহীদেব (পুত্র) ৭৩৩—৭৫৩ খৃঃ।		শিবদেব (দ্বিতীয়) (পুত্র মহারাজাধিরাজ।
	১৮। বসন্তদেব বা বসন্ত সেন (পুত্র) মহারাজ ৭৫৪ খৃঃ।		জয়দেব (দ্বিতীয়) (পুত্র)৭৫০-৫৮ খৃঃ।

২। সক্রণগণাধারো লিচ্ছবিকুলকেতুর্ভট্টারক মহারাজ শ্রীশি—
৩। বদেবঃ কুশলী … … পিতা নরসিংহো ভয় … …
৪। নিবাসিনো যথা প্রধানং গ্রামকুটুম্বিনঃ কুশলমাভাষ্য—
৫। সমাজ্ঞা পয়তি বিদিতম্ভবতু ভবতাং যথানেক পৃথুস—
৬। ময় সম্পতি বিজয়াধিগত শৌর্য্য প্রতাপাপ হতসক
৭। ল শত্রুপক্ষ প্রভাবেন সম্যক প্রজাপালন পরিশ্রমোপার্জ্জি
৮। ত শুভ্রযশোভিব্যাপ্ত দিঙ্মণ্ডলেন শ্রীমহাসামন্তাংশু বর্ম্ম—
৯। ণা যুমহিতবিধানায় বিজ্ঞাপিতেন ময়া তদেগারবা—
১০। … … … … ন্যধিকৃতানা সমুচিত—

ফ্লিট সাহেবেরকৃত তালিকা আমরা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কারণ এই তালিকা অনুসারে শিবদেব ও ধ্রুবদেবকে বুষদেবের স্কন্ধে সংস্থাপন করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ যদি নরেন্দ্রদেব, শিবদেব (দ্বিতীয়),জয়দেব প্রভৃতি নরপতিগণ ঠাকুরী বংশজাত হইতেন, তাহা হইলে লিচ্ছবি বংশের (১৫নং) প্রস্তর লিপিতে কখনই তাঁহাদের বিবরণ লিখিত হইত না, সুতরাং আমাদের বিবেচনায় পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রজী লিচ্ছবি রাজাদিগের যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাই বিশুদ্ধ হইয়াছে। প্রস্তর লিপি সমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা পণ্ডিতজীর মতানুসরণ করিতেছি। অংশু বর্ম্মণ ও বিষ্ণুগুপ্ত উভয়ই "ঠাকুরী" বংশজ, তৎপক্ষে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। *

চীন পরিব্রাজক হিয়েনসাঙ নেপাল রাজ্যের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। †

বর্জ্জি হইতে উত্তর পশ্চিমদিকে প্রায় ২৫০ মাইল গমন করিয়া নেপালে উপনীত হওয়া যায়। এই রাজ্যের পরিধি৪০০০লি (৬৬৬—৮০০ মাইল) রাজধানীর পরিধি প্রায় ৪মাইল। এই রাজ্য পর্ব্বত ও অধিত্যকা পূর্ণ। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে পার্ব্বত্য উদ্ভিদ ও ফল, পুষ্প এবং চামরী ও চকোর জন্মিয়া থাকে। এই রাজ্যে তামা উৎপন্ন হইয়া থাকে, ‡ জলবায়ু নিতান্ত শীতল। ইহার অধিবাসীগণ অসাধু ও অবিশ্বাসী, নির্দ্দয় ও ভীষণ প্রকৃতি সম্পন্ন। সত্য ও সম্মানের প্রতি তাহাদের কিছুমাত্র আস্থা নাই। তাহারা অশিক্ষিত কিন্তু শিল্প কার্য্যে সুনিপুণ। তাহাদের আকৃতি কুৎসিৎ ও ঘৃণাজনক। তথায় হিন্দু ও বৌদ্ধগণ একতার সহিত একত্রে বাস করে। বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের পার্শ্বেই দেবমন্দির সকল সংস্থাপিত। এই রাজ্যে প্রায় দুই সহস্র শ্রমণ বাস করেন। ইঁহারা মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিধর্ম্মী (হিন্দু)দিগের সংখ্যা করা যায় না। এই দেশের অধিপতি ক্ষত্রিয়, তিনি লিচ্ছবিকুল হইতে উৎপন্ন। রাজা অভিজ্ঞ, তাঁহার চরিত্র পবিত্র ও মহৎ। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তিনি অকৃত্রিম অনুরক্ত।

কিছুকাল পূর্ব্বে তথায় অংশুবর্ম্মণ নামে একজন নরপতি ছিলেন। ইনি বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিলেন। তিনি শব্দ বিদ্যা সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তিনি বিদ্যোৎসাহী এবং ধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন। তাঁহার যশ দিগন্তব্যাপী।

রাজধানীর দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ও হ্রদ আছে। তাহাতে অগ্নিকণা

---

* পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রজীর সংগৃহীত ৯ নং প্রস্তর লিপি পাঠে ঠাকুরী বংশের তিনজন নরপতির নাম প্রাপ্ত হইতেছি। যথা অংশুবর্ম্মণ, বিষ্ণুগুপ্ত ও জিষ্ণুগুপ্ত। উক্ত প্রস্তর লেখে বিষ্ণুগুপ্ত "যুবরাজ" আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইয়াছেন।

† হিয়েনসাঙ নেপালে গমন করিয়াছিলেন বোধ হয় না, তিনি বর্জ্জি হইতে নেপালের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

‡ Red copper.

নিক্ষেপ করিলে প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। অন্য কোন পদার্থ তাহাতে প্রক্ষেপ করিলে তাহা দগ্ধ হইয়া বিকৃত হইয়া যায়।

চীনদেশীয় বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ মাতোঁয়ালীন বলেন যে, হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর কান্যকুব্জে যে ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা নিবারণ জন্য নেপালাধিপতি সপ্ত-সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করেন। সম্ভবতঃ এই ঘটনা ৫৭১—২ শকাব্দে ঘটিয়াছিল। এই সময় ধ্রুবদেব নেপালের রাজসিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন।

মৃত মহাত্মা প্রিন্সেপ ও বিজ্ঞবর হরেন্লী সাহেব নেপালের লিচ্ছবি রাজাদিগের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ প্রিন্সেপের প্রকাশিত তালিকা বিশেষ প্রামাণ্য বলিয়া বোধ হয় না। হরেনলি ফ্লিট সাহেবের মতানুসরণ করিয়াছেন।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

দুইটি।

চিন্তা।

শ্যামল ধরণী এই, নীলীম আকাশে ছাওয়া,
　　মনে হয় একখানি গেহ!
ওই লক্ষ লক্ষ জন,　　করিছে যে বিচরণ,
　　ওঁরা কি আপন নহে কেহ?
কেন ওরা কিসে পর, কে করেছে স্বতন্তর!
　　অতি মূঢ় সঙ্কীর্ণ জ্ঞেয়ান!
এক দিবা এক নিশি—একই তপন শশি
　　এক বায়ু একনীর সকলেরি প্রাণ।
একেরি সন্তান, বিশ্ব সবারি সমান।
শ্বেত কৃষ্ণ ভাগ ভাগ,　আত্ম পর ভিন্ন দাগ
　জাতি জাতি অনুরাগ না জানি কিসের।
　সংসারের চালে চলি, যা বলায় তাই বলি,
　　সূক্ষ্মে গেলে এ সকলি
　　　বুঝিবার ফের!

শ্রীমতী—

অদ্ভুত বাউলে গান।

(আমায়) কে রে করে এক ঘরে ?
(ও তোর) আর্য্যামি ভণ্ডামি রাখ্, জলে ভরা দুধের কেঁড়ে !
আমায় কে রে করে এক ঘরে ?
(সে দিন) গিয়ে তোদের পাড়া গাঁয়,
বসে আছি চণ্ডিতলায়—
(এক) চাঁড়ালেদের সোণার যাদু নাচ্‌তে লাগ্‌ল' আমায় হেরে।
ঝাঁপিয়ে এল আমার কোলে,
(আমি) যত্নে তারে নিলাম্ তুলে ;
তোরা বল্লি ছি ছি কি কর কি, তোদের কথা শুন্‌লাম কি রে ?
(আমায়) কে করে রে এক ঘরে ?
ওরা সবাই ঢালা এক ছাঁচে,
(ওরে) ছেলেদের কি জাত্ আছে ?
তোদের মুখে আছে মোহের মুখস্, এসব কথা বুঝবি কিরে ?
(আমায়) কে করে রে এক ঘরে ?
(সেই) চাঁড়াল শিশুর চুমো খেয়ে,
বসেছিনু অবাক্ হয়ে ;
আর কাঙাল বন্ধু গুহক সখা দেখা দিলা অন্তরে !
(আমার) আঁখির বাঁধন্ গেল খুলে,
যুবা ছিলাম, হলাম ছেলে,
(এখন্) যুবমি বুড়ুমি ছেড়ে, ছেলুমি করি পেট ভরে !
(আমায়) কেরে করে এক ঘরে ?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

আলো ও ছায়া।

আলো ও ছায়া নামক একখানি কবিতা পুস্তক কয়েক মাস হইল প্রকাশিত হইয়াছে। কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার একটী ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ভূমিকাতে কবিবর যেরূপ প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে

পুস্তকখানি পাঠ করিতে স্বভাবতঃ কৌতূহল জন্মে; একটু সন্দেহও হয়, বুঝি বা বৃদ্ধ কবি অতি স্তুতিবাদ দোষে দূষিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ পুস্তকখানি পাঠে আমাদের সে আশঙ্কা বিদূরিত হইয়াছে।

হেম বাবু লিখিয়াছেন, "কবিতাগুলি আজ কালের "ছাঁচে" ঢালা"। ইহা দ্বারা এই নবীন কবির প্রকৃতি কতক পরিমাণে নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু আজ কালের এই ছাঁচ কি? নূতনে পুরাতনে পার্থক্য কোথায়? বঙ্গের কাব্য কাননে মাইকেল, হেমচন্দ্র নবীন এই পুরাতন সুরের গায়ক; রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তয়িতা। আমাদের এই নবীন কবি এই বর্ত্তমান যুগেরই লোক—অনেক পার্থক্য থাকিলেও ইনি রবীন্দ্রনাথেরই স্বজাতি। এই দুই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে বিষয়গত ও তাহার বাহ্যিক আকার গত বৈষম্য বিদ্যমান রহিয়াছে। পুরাতন কবিরা এমন সমস্ত বিষয় লইয়া তাঁহাদের কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা সাধারণের আয়ত্তাধীন। সাধারণ জিনিষের উপর তাঁহাদের কল্পনার সৌন্দর্য্যরাশি ঢালিয়া দিয়া তাহাকে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আকর করিয়া তুলিয়াছেন; তাঁহারা যে সমস্ত ভাব লইয়া মানব প্রাণকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক সীমান্ত রেখা আমাদের নয়নগোচর হয়। তাঁহাদের ভাষাও ইহার অনুরূপ। তাঁহারা এমন কোন বিষয়ের অবতারণা করেন নাই, যাহা তাঁহাদের ভাষা সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। মধ্যাহ্ন সূর্য্য কিরণে উদ্ভাসিত হইলে যেমন প্রাকৃতিক পদার্থের সর্ব্বাঙ্গ সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়; কিছু আর অপ্রকাশিত রহিল বলিয়া সন্দেহ হয় না, তেমনই তাঁহাদের ভাব অনুরূপ ভাষায় আবৃত হইয়া পাঠকের চিত্তক্ষেত্রে উদিত হয়, কিছু বুঝা হইল না বলিয়া আর ক্ষোভ থাকে না। তাঁহাদের ভাব ও ভাষার মধ্যে এই সামঞ্জস্য থাকাতে তাঁহাদের কবিতাতে এমন একটি গাম্ভীর্য্য, অচঞ্চল সৌম্যভাব রহিয়াছে যাহা বর্ত্তমান যুগের কবিদের মধ্যে পাওয়া যায় না। অন্য পক্ষে, আধুনিক কবিরা অতি ধীরপদে অন্তরের অতি নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়া যে সমস্ত কোমল ভাবের ক্রীড়া দেখিতে পান; যে যে ভাব পরীর ন্যায় সুমধুর গানে প্রাণকে মুগ্ধ করিতে থাকে, কিন্তু ধরিতে গেলে আর ধরা যায় না, হাত হইতে সরিয়া যাইয়া দূরে ক্রীড়া করিতে থাকে—সেই সমস্ত ভাব লইয়াই ইহাঁদের ব্যবসায়। স্বপ্ন দৃষ্ট স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য রাশির ন্যায়, নিশীথকালে মৃদু মধুর পবন-সঞ্চালিত দূর সমাগত বংশী নিঃসৃত সঙ্গীতের ন্যায়, অতীব সুখের স্মৃতির ন্যায়, ইহা প্রাণ স্পর্শ করিয়া, প্রাণ মুগ্ধ করিয়া, প্রাণটাকে উদাস করিয়া দিয়া চলিয়া যায়—ধরিবার ছুঁইবার যো নাই। এ ভাব ভাষায় প্রকাশ হয় না। সন্ধ্যা গগনের সতত পরিবর্ত্তনশীল কোমল সৌন্দর্য্যরাশি কেহ কখনও কি চিত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন? গোধূলি সময়ে যখন প্রাকৃতিক জগতের সীমান্ত রেখাগুলি অল্পে অল্পে

বিলীন হইতে থাকে, তখন যেমন অনন্তের ছায়া আসিয়া প্রকৃতির মুখে পড়িয়া প্রকৃতির মধ্যে এক অপার সৌন্দর্য্য স্রোত ঢালিয়া দেয়, যাহা প্রকাশ করিতে ভাষা মূক, তেমনই এই সমস্ত কোমল' ইথিরীয়' ভাবগুলি প্রকাশের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট অর্থ বিশিষ্ট কথাগুলি নিতান্তই অক্ষম। এই জন্য বর্ত্তমান যুগের কবিদের ভাষা ভাবাভিভূত, ভাবের আবেগে ভাষা ক্ষুব্ধ, জড়সড়। ভাব ও ভাষার অসামঞ্জস্য জনিত সে গাম্ভীর্য্য, সে সৌম্য-ভাব বিনষ্ট হইয়াছে; পৃথিবী গর্ভে উত্তপ্ত বাষ্পরাশি জমিলে যেমন ভূমিকম্প হইতে থাকে তেমনই ভাবের প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া এ ভাষাও কম্পিত। ভাষাকে অতিক্রম করিয়া ভাব উধাও হইয়া অনন্ত রাজ্যে বিচরণ করিতেছে। যাঁহারা এ ভাবের ভাবুক নহেন, তাঁহাদের নিকট এরূপ কবিতা অধিকাংশ স্থলেই অর্থহীন প্রলাপ মাত্র।

বাণীর বরপুত্র সেলি স্বর্ণবীণা করে ধরিয়া প্রথমে এই সুরে গান করিয়াছিলেন। আজ প্রায় ৭০ বৎসর হইল সেলির স্বর্ণবীণা নীরব হইয়াছে, কিন্তু সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত লহরী আজও থামে নাই, বরং দিন দিনই তাহার প্রভাব বৃদ্ধি হইতেছে। সেই সঙ্গীত লহরী আসিয়া এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশকেও স্পর্শ করিয়াছে এবং তাহার ফলে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পাইয়াছি। অবশ্য ইহার দ্বারা আমি রবীন্দ্রনাথকে সেলি বলিতেছি না, তাহা আমার উদ্দেশ্যও নহে। বাঙ্গালী জাতি কিছু ইংরেজ জাতি নহে, বাঙ্গালী সাহিত্যও ইংরাজী সাহিত্য নহে, রবীন্দ্রনাথও সেলি নহেন। তবে যে ভাবে উদ্ভিজ্জতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা সামান্য তৃণ ও বাঁশকে একই জাতিভুক্ত বলিয়া মনে করেন, আমিও সেই ভাবে রবীন্দ্রনাথ ও সেলিকে জ্ঞাতি বলিয়া মনে করি। বাঙ্গালা দেশীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এ নূতন যুগের প্রবর্ত্তয়িতা। তাঁহার সুললিত কণ্ঠরবে তিনি দেশকে মুগ্ধ করিয়াছেন। এক নূতন সৌন্দর্য্যের দ্বার খুলিয়া দিয়া তিনি আমাদের দেশের নর নারীকে এক নূতন সুখের রাজ্যে, এক নূতন আকাঙ্ক্ষা ও উন্নতির রাজ্যে লইয়া যাইতেছেন। প্রকৃতির মাধুর্য্য বর্ণনে তিনি আমাদের দেশে অদ্বিতীয়। পাখীর কলকণ্ঠে, শিশিরসিক্ত প্রভাত কুসুমের সুমধুর সৌরভ,নীল গগনে পরিশোভমানা প্রকৃতিরাণী চন্দ্রমার সুবিমল জ্যোৎস্না তাঁহার গানের সঙ্গে যেন মিশিয়া রহিয়াছে। ইহাও রবীন্দ্রনাথের বাহ্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রধান ভাব এক অনন্ত অতৃপ্তি ও অনন্ত পিয়াস। জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে ক্ষুদ্র আঁখিটাকে ডুবাইয়া দিয়া, একেবারে আত্ম বিস্মৃত। সেই অনন্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ করাই তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য। তাঁহার অন্য সমস্ত ভাবই এই মহা ভাবের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। মনুষ্য যতই চেষ্টা করুক না কেন, সম্পূর্ণ রূপে আত্মহারা হওয়া অসম্ভব। এরূপ আকাঙ্ক্ষা কেবল একদেশ দর্শী Idealismএর ফল। এই একভাবে গা ঢালিয়া দেওয়াতে তাঁহার অন্যান্য ভাবের উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি হয় নাই। ইহা এক দিকে

যেমন রবীন্দ্রনাথের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক, অপর পক্ষে, ইহাই আবার তাঁহার ক্ষমতার ও পরিচায়ক বটে। তাঁহার প্রাণ যে সর্ব্বক্ষণই এই এক সুরে বাঁধা রহিয়াছে তাহা তিনি তাঁহার "হৃদয়ের গীতধ্বনিতে" স্বীকার করিতেছেন :—

"হৃদয়রে! আর কিছু শিখিলিনে তুই
শুধু অই গান
প্রকৃতির শত শত রাগিণীর মাঝে
শুধু অই তান।"

রবীন্দ্রনাথের পরে তাঁহার পদানুসরণ করিয়া আমাদের দেশে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবি দেখা দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বীণার দুই একটী তান ধরিয়া দিবা নিশি এমনিভাবে বাজাইতেছেন যে দেশের লোক কবিতা রসে অনুরাগী হওয়া দূরে থাক, বীতস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছেন। এই দুদিনে আমরা একটী প্রকৃত কবির স্বাধীন তন্ত্রীর মধুর নিক্বনে আশ্বস্ত হইয়াছি। এখানে আর কেবল নির্জ্জীব অনুকরণ নাই, নিজ হৃদয়ের সজীব শোণিত প্রত্যেক শিরায় শিরায় সন্তাড়িত হইয়া, প্রত্যেক মাংসপেশীকে সবল করিয়া তুলিয়াছে। মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের সহিত ইঁহার নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও ইঁহাদের মধ্যে প্রভেদও সামান্য নহে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেম ইঁহাতে নাই, আমরা কোথায়ও সেরূপ প্রকৃতির মধুর ভাবের বর্ণন পাই নাই। যে গভীর সর্ব্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের কেন্দ্রস্থানীয় সে ভাব তত তীব্র ভাবে ইঁহার ভিতর প্রকাশ পায় নাই। "তারকার আত্ম হত্যা" ও "পরাজয় সঙ্গীতে," রবীন্দ্রনাথ যে দুঃখের গান গাহিয়া প্রাণ বিগলিত করিয়াছেন, সে হৃদয়-মন্থন কারী দুঃখ ইঁহার সঙ্গীতে প্রকাশ পায় নাই। যে অভিজ্ঞতা থাকিলে সঙ্গীতে সে ভাব প্রকাশ পায়, সে অভিজ্ঞতা হয়ত ইঁহার নাই। ইনি ও "সুখ," "নিরাশ" "দুঃখ পথে" প্রভৃতি কয়েকটী কবিতাতে নৈরাশ্যের কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু এ নিরাশায়, এ দুঃখে সে গভীরতা নাই, সে হৃদয় দ্রাবণী শক্তি নাই। তাই বলিয়া এ কথা সত্য নহে, যে, যে কোন ব্যক্তি নিজ ব্যক্তিগত জীবনের শোক দুঃখ অবলম্বন করিয়া কবিতা লেখে সেই কবি। Our sweetest song are those that tell of saddest thought কিন্তু যাহা ভীম যাহা ভয়ানক, যাহা বীভৎস তাহাতে সৌন্দর্য্য ফুটান সহজ কার্য্য নহে। যতক্ষণ আমার শোক, আমার দুঃখ, আমার শোক দুঃখ রহিল, ততক্ষণ তাহা কবিতা নহে। তাহা হইলে কবির সংখ্যা এত অল্প হইত না। কবিত্ব পূর্ণ করিতে হইলে ব্যক্তিগত যাহা কিছু তাহা সম্প্রসারিত করিয়া ব্যক্তিগত জীবনকে এই বিশ্বের মহাপ্রাণের একটী তন্ত্রী করিতে হইবে। আমার শোক দুঃখ জগতের শোক দুঃখ হইবে, আমার গান বিশ্বের গান হইবে। যতক্ষণ না ইহা হয় ততক্ষণ কবিতা লিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদের দেশে

বর্ত্তমান সময়ে এরূপ কবিও দু এক জন দেখা দিয়াছেন। ইঁহারা জানেন না যে নিজ পারিবারিক ঘটনাকে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া তাঁহারা কেবল সেই পারিবারিক জীবনের পবিত্র রহস্য নষ্ট করেন ও নিজেরা উপহাস ভাজন হয়েন।

আমাদের হৃদয়ের প্রত্যেক গভীর ভাবের সহিত অনন্তের ছায়া বিজড়িত রহিয়াছে। যদি ভাবের মধ্যে এ অনন্তত্ব না থাকে যদি এই অতলস্পর্শী ভাব না থাকে, তাহা হইলে আমাদের প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না। যে কবি তাঁহার কবিতাতে এ অনন্তত্ব ঢালিতে না পারেন, তিনি কখনই এ রাজ্যে উচ্চ সিংহাসন লাভ করিতে পারিবেন না। তাঁহার প্রেম অনন্ত হইবে, আশা অনন্ত হইবে, শোক অনন্ত হইবে, সুখ ও অনন্ত হইবে। ঘরকন্না চালাইবার জন্য সীমাবিশিষ্ট ভাব তো জগতে অপ্রতুল নাই তাহার জন্য কবির নিকট যাইবার প্রয়োজন কি! নিজের পূর্ণতা লাভ করাই ভাবের চরম লক্ষ্য। সেলি, রবার্ট ব্রাউনিং এই মন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া, তাঁহারা জগতের শ্রেষ্ঠ কবি হইয়াছেন। অপর পক্ষে টেনিসন অন্যান্য বিষয়ে ইঁহাদের সমকক্ষ হইলেও এই এক বিষয়ে ইঁহাদের নিকট হীন। তাঁহার অনেকগুলি প্রধান কবিতা পাঠ করিয়া শেষে এই এক অতৃপ্তি থাকিয়া যায়। পাছে মানুষ ভাবের আবেগে গা ঢালিয়া দিয়া জীবনের নিয়মিত কক্ষচ্যুত হইয়া সমাজের শান্তি নষ্ট করে, এই আশঙ্কায় তিনি সর্ব্বদাই ভাবের পূর্ণতা লাভে বাধা দিয়া কবির ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়াছেন। আমাদের এই নবীন কবির মধ্যেও স্থানে স্থানে এই দোষ দৃষ্ট হয়। তাঁহার সুখ নামক কবিতাতে তিনি ছিন্নবীণা, ভগ্ন হৃদয়, নিরাশার পৈশাচ রবের, কথা বলিতে বলিতে অমনি আবার আশা ও উৎসাহের তান ধরিলেন। ইহাতেই মনে হয় তিনি এতক্ষণ যে দুঃখের গান গাহিতেছিলেন তাহা প্রকৃত নহে। ইহা কাব্য শাস্ত্রের নিকট বিষম দোষ।

ইনি দুঃখের মন্ত্রে দীক্ষিত নহেন। অপার আশা, অদম্য উৎসাহ ও সমুজ্জল ভবিষ্যতের প্রাণোন্মাদকারী ভাবে ইঁহার হৃদয় তন্ত্রী বাঁধা। ইহাঁর পক্ষে নৈরাশ্যের গান স্বাভাবিক নহে। যেখানে আশার কথা, সেখানেই ইঁহার হৃদয় তন্ত্রী স্বতঃই বাজিয়া উঠে। "যৌবন তপস্যান্তে" কবি আপন প্রাণের এই অনন্ত আশার গানই গাহিয়াছেন।

ইঁহার অগ্রগামী সমসাময়িক কবি রবীন্দ্রনাথের তুলনায় ইঁহার যে সমস্ত প্রধান অভাব সে সমস্ত আমি সংক্ষেপতঃ বিবৃত করিয়াছি। কিন্তু ইহাতেই কাব্যের সকল অঙ্গ পর্য্যবসিত হইল না। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবের শিশু। শিশুর ক্রীড়া, শিশুর হাসি শিশুর ক্রন্দনের ন্যায় তিনিও প্রাণের আবেগে গান গাহেন, গান্ গাওয়া তাঁহার স্বভাবঃ "গান আসে বলে' গান নাই।" আমাদের এ নবীন কবি সে বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন, শিশুর সুখ দুঃখে আর তিনি পরিতৃপ্ত নহেন। জ্ঞানের গরিমা জীবনের নৈতিক আদর্শের গাম্ভীর্য্য ইঁহার প্রাণে সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

চাহিনা ফিরিতে আর, শৈশবের লীলাগার
তরুণ কল্পনাভূমি অর্দ্ধ অন্ধকার,
তৃষিত নয়ন আগে, যে দিব্য আলোক জাগে,
তাহারই লক্ষ্য করি চলি অনিবার,
ধর ধর ক্ষীণ হস্ত, তুমি হস্ত বিধাতার।

ব্যক্তি গত জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ যে আমাদের আদর্শ জীবনের নিয়ামক নহে, আমাদের জীবনের লক্ষ্য যে উচ্চতর, আমাদের জন্য যে সমুজ্জল ভবিষৎ রহিয়াছে তাহা কবি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং মধুর তানে সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র গান করিয়াছেন।

পরের কারণে মরণেও সুখ ;
'সুখ' 'সুখ' বলি' কেঁদোনা আর,
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে
ততই বাড়িবে হৃদয় ভার"
সকলের মুখ হাসি ভরা দেখে
পারনা মুছিতে নয়ন ধার ?
পর হিত-ব্রতে পারনা রাখিতে
চাহিয়া আপন বিষাদ ভার ?
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

এইরূপে সামাজিক জীবনে আত্ম জীবন ডুবাইয়া দিয়া জীবনের চরম লক্ষ্য লাভের কথা এই পুস্তকের সর্ব্বত্রই বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনের সুখ দুঃখে গা ঢালিয়া দিলে যে বিলাসের আবিলতা, যে দুঃখের অবসাদ উপস্থিত হয়, তাহা তাঁহার কোথায়ও পরিলক্ষিত হয় না ; বরং ইঁহার কবিতা পাঠ করিলে প্রাণ সবল হইয়া উঠে, নূতন তেজ হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।

আলো ও ছায়া প্রণেতার প্রতিভা বিশাল মানব হৃদয়ের বিশেষ কোন ভাবে আবদ্ধ নহে। তিনি আপনার সবল পক্ষযুক্ত কল্পনা বলে মানব হৃদয়ের সহিত গভীর সহানুভূতির সাহায্যে জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে আপনাকে পাতিত করিয়া মানবের গূঢ় হৃদতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং অধিকাংশ স্থলে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তাঁহার সহানুভূতি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নহে। মানবের সকল অবস্থাতেই তাঁহার সহানুভূতি অসঙ্কুচিত ভাবে প্রধাবিত। ভ্রান্ত, পতিত, মানব তাঁহার

পর নহে, তাহার জন্য তাঁহার স্নেহের হস্ত প্রসারিত। "চাহিবেনা ফিরে?" ও "ডেকে আন" এই দুইটী কবিতাতে তাঁহার গভীর মানব প্রেম প্রকাশ পাইতেছে। এ কবিতা দুটি এতই সুন্দর হইয়াছে যে পাঠককে সমগ্র কবিতা দুটি উপহার দিতে ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু স্থানাভাবে তাহা হইল না। পাঠক নিজেই কবিতা দুটি পাঠ করিবেন এ আমার অনুরোধ। দুর্ব্বল পরাজিত মানব হৃদয় মধ্যে যে ঘোর সংগ্রাম তাহা তিনি যে ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। তাঁহার "বেশী কিছু নয়" শীর্ষক কবিতাটীতে তিনি আপনার শক্তিকে অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। নিজে সবল হইয়া অপরের দুর্ব্বলতাকে স্নেহের চক্ষে-সহানুভূতির চক্ষে দর্শন করা সামান্য কথা নহে। বিশুদ্ধ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করা ও চিত্র করা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াস সাধ্য; কিন্তু যে হৃদয়ে দেব দানবের সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা বর্ণনা করা গভীর অন্তর্দৃষ্টি-উচ্চ শ্রেণীর কবিত্বের পরিচায় এই কবিতাটিতে নবীন কবি সেই ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। এই ক্ষমতার উপযুক্ত রূপ উৎকর্ষ সাধিত হইলে যে ইনি একদিন উচ্চশ্রেণীর মহা কাব্য লিখিতে সমর্থ হইবেন এরূপ আশা করা যায়। এ কবিতাটি পাঠ করিলে কেহ আর মানব হৃদয়ের গভীর সুখ দুঃখ সম্বন্ধে কবির অভিজ্ঞতার অভাব আছে বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না।

এই নবীন কবি যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া আমাদের অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন, তাহার দুই একটীর পরিচয় দিয়া আমি এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তাঁহার "পঙ্কক" শীর্ষক কবিতা স্তবকের এক একটি কবিতা এক একটি অমূল্য রত্ন। তাহা যত বারই পাঠ করা যায়, ততবারই নূতন বলিয়া অনুভূত হয়। তাঁহার মধুময়ী কল্পনার অপর একটী অপূর্ব্ব কুসুম "চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ।" ইহাতে ইনি যে অপূর্ব্ব আদর্শ, যে গভীর অথচ মধুময়ী ভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহারই অণুপ্রাণিত লেখনীতে প্রকাশ পাইয়াছে; আমি তাহার পরিচয় দিতে যাইয়া তাহার মাধুর্য্য নষ্ট করিব না। পাঠক সেই মূল প্রস্রবণে সুধা পান করিয়া আপন কৌতূহল চরিতার্থ করিবেন। যে ভাব মানব হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে বাস করে, যাহা মানব সন্তানকে তাহার আধিপত্যের ক্ষুদ্র সীমা ভাঙ্গিয়া দিয়া স্বর্গের পথে লইয়া যায়, যাহা প্রাণে প্রবেশ করিলে ক্ষুদ্র মলিন কীটও দেবতা হইয়া যায়—সেই পবিত্র প্রেম সম্বন্ধে এ কবির আদর্শ যত উচ্চ যত নির্ম্মল, পাঠক দেখুন—

এত কি কঠিন তব প্রাণ!
তোমারে আপনা দিয়া, অতি তিয়াপিত হিয়া,
আমি ত চাহিনা প্রতিদান।
দূরে রও, উর্দ্ধে রও, দেবী হ'য়ে পূজা লও,
পূজিবার দেহ অধিকার;

তার বেশী চাহি নাই, তাও কেন নাহি পাই;
তাও কেন অদেয় তোমার ?
... ...
পবিত্র পরশে যার, মলিন হৃদয়
আপনাতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবালয়,
ভকতি বিহ্বল, প্রিয় দেব-প্রতিমারে
প্রণমিয়া দূরে রহে নারে ছুঁইবারে ;
আলোকের আলিঙ্গনে, আঁধারের মত
বাসনা হারায়ে যায়, দুঃখ পরাহত ;
আপনারে বিকাইয়া আপনাতে বাস,
আত্মার বিস্তার ছিঁড়ি ধরণীর পাশ।
... ...
প্রণয় সে আত্মার চেতন,
জীবনের জনম নূতন,
মরণের মরণ সেথায়।

আলো ও ছায়ার চতুর্থাংশের ও অধিক, মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীক নামক দুটী দীর্ঘ কবিতাতে পূর্ণ। এ দুটি চিত্র বানভট্ট প্রণীত ভারত বিখ্যাত কাদম্বরী নামক গ্রন্থের দুইটী প্রধান চরিত্র অবলম্বনে লিখিত। এই চিত্র দুটী মূল গ্রন্থের চিত্র দুটির পার্শ্বে রাখিয়া বিচার করিলে এ নবীন কবির অসাধারণ লিপি চাতুর্য্য স্পষ্টই দেখা যাইবে। এচিত্র দুটী মূল চিত্রের লিখিত চর্ব্বন নহে, অথবা তাহার "ক্ষীণতর প্রতিধ্বনি"ও নহে। মূল ঘটনার একত্ব না থাকিলে ইহাকে সম্পূর্ণ নূতন কবিতা বলা যাইত। বস্তুতঃ যাহা কাব্যের প্রাণ, সেইভাব ও আদর্শকে লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া বিচার করিলে ইহাকে কবির নূতন সৃষ্টি বলাই বিহিত। মহাশ্বেতার জীবনে তিনি যে প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ আধুনিক, পুরা জগতে কুত্রাপি এ আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায় না। কাদম্বরীতেও তাহা নাই। সংস্কৃত কবি আপন বিচিত্র প্রেমকে চিত্ত বিকার আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহা বিশেষ অন্যায় ও হয় নাই ; কিন্তু বঙ্গের নবীন গায়ক আপন কবিতাতে এক স্বর্গের মত্ততা ঢালিয়া দিয়াছেন, অতি কোমল হস্তে তুলিয়া ধারণ করিয়া আপন চিত্রে বর্ণচাতুর্য্য অতি আশ্চর্য্য রূপে প্রতিফলিত করিয়াছেন। মূল গ্রন্থে বর্ণিত আদিরসের স্থূলত্ব ও মলিনতা অতি যত্ন সহকারে অপসারিত করিয়া কবি আপন সুখার্জ্জিত রুচি ও সুশিক্ষিত চিত্ত বৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। মহাশ্বেতার কুমারী হৃদয়ের সেই সুকোমল সকরুণ ভাব, সে সরলতা, সে গভীর, উদ্বেলিত, পবিত্র প্রেম, সে ঐকান্তিক আত্মোৎসর্গ চির দিনই বঙ্গসাহিত্য কাননে একটী অপূর্ব্ব

রত্ন রূপে শোভা পাইবে। মহাশ্বেতার চিত্র মূলের সহিত যতটুকু সৌসাদৃশ্য আছে, পুণ্ডরীকের চিত্রে তাহাও নাই। এখানে কবি আপন কল্পনা শক্তির যথেষ্ট পরিচালনা করিবার অবসর পাইয়াছেন এবং তাহাতে আপনার উচ্চ শ্রেণীর ক্ষমতার পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছেন। মহাশ্বেতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অনেক কথাই এখানে প্রযুজ্য।

কবি যে সমস্ত সৌন্দর্য্য প্রসূন সৃষ্টি করিয়া আমাদের সাহিত্য কাননকে সুশোভিত করিয়াছেন, তাহার সমস্তগুলির পরিচয় দেওয়া এরূপ প্রবন্ধে অসম্ভব, তাহা হইলে একখানি গ্রন্থ হইয়া পড়ে। কাজেই আমাকে দুই চারিটির পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইল।

নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা কবির কার্য্য। যিনি নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া মানবের সুখের দ্বার খুলিয়া দেন, তিনি সমস্ত মানব সমাজের পরম উপকারী বন্ধু ও সমগ্র মানব তাঁহার কাছে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। মুক্ত কণ্ঠে এ উপকার স্বীকার করা আমাদের কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্য সম্পাদনে আমি আজ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কবি যে তাঁহার সকল চেষ্টাতেই সিদ্ধ মনোরথ হইয়াছেন, একথা বলিতে আমি সাহস করি না। আর না হইলেই বা কি! স্বয়ং প্রকৃতি রাণী একটী সুন্দর বস্তু সৃষ্টি করিতে যাইয়া কতবার অকৃত কার্য্য হইয়া পরে সফল কাম হন; তাহাতে কেহ দোষ দর্শন করেন না। যদি কেহ করেন তবে তাহাকে আমরা চিত্তরোগগ্রস্ত বলিয়া মনে করি। মনুষ্যের পক্ষে স্বতন্ত্র নিয়ম হইবে কেন? এমন উপকারী বন্ধুর ত্রুটী প্রদর্শন করিতে যাওয়া নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের পরিচায়ক।

শ্রীসীতানাথ নন্দী।

শাপাবসান নাটকাভিনয়।

সংস্কৃতাভিজ্ঞ কতিপয় সম্ভ্রান্ত যুবক কর্ত্তৃক শাপাবসান নামক সংস্কৃত নাট্য অভিনীত হইয়াছিল। গত ২৩ অগ্রহায়ণ সোমবারে আমরা তাহা দেখিতে গিয়াছিলাম। অভিমন্যু বধ আশ্রয় করিয়া গ্রন্থখানি রচিত। পুস্তকখানির ভাষা এত সহজ এবং অভিনেতৃদিগের উচ্চারণ এত সুস্পষ্ট সুন্দর, যে সংস্কৃত বলিয়া কথা বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা হয় নাই। অভিনয় দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম, বলিতে কি, অভিনয় এত ভাল দেখিব এরূপ প্রত্যাশা করিয়া আমরা যাই নাই। স্ত্রীলোকের অংশ পুরুষে অভিনয় করিলে তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর না হইবারই কথা;

কিন্তু এখানে তাহাও মন্দ অভিনীত হয় নাই। আর পুরুষ চরিত্র সকলগুলিই সুন্দর হইয়াছিল, কেবল দুর্য্যোধন ও ভীমের আস্ফালন স্থলে স্থলে একটু বাহুল্য হইয়া পড়িয়াছিল। পুরুষদিগের মধ্যে অভিমন্যুর অভিনয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাঁহার স্বরে কিছুমাত্র অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায় নাই, তাঁহার বীরত্বে কিছুমাত্র বাহুল্য ভাব ছিল না। স্বাভাবিক, সহজভাবে অভিনয় করিয়া তিনি দর্শকদিগকে নিতান্ত পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। শকুনিকে তাঁহার নীচের পদবী দান করা যাইতে পারে। অবশেষে নাটক সম্বন্ধে বক্তব্য এই, অভিমন্যু বধেই নাটকের শেষ হইলে আমাদের মতে "ষ্টেজ এফেক্‌ট্" অনেক অধিক হইত। অভিমন্যুর মৃত্যু সময়ের উক্তি; তাহার ভূপতিত দেহে শকুনির পদাঘাত, হৃদয় দ্রব করে। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী দৃশ্যে যুধিষ্টির হইতে উত্তরার কান্না কাটিতে সেই করুণ ভাব বৃদ্ধি না করিয়া, উল্টা সমস্তটা হাস্যকর করিয়া তুলে। তবে ইহা স্বীকার করিতে হয়—শেষ দৃশ্যে কৃষ্ণের অটল গম্ভীর ভাব তাঁহার উপদেশ, ভীমার্জ্জুনের শপথ হৃদয়গ্রাহী। যদি এইগুলি রাখিয়া কোন উপায়ে লেখক কান্নাকাটির অংশগুলি বাদ দিতেন ত হইত ভাল।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকট এবং ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি ও গুরুদাস বাবুর মেডিকেল লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

দীপনির্ব্বাণ (উপন্যাস) (দ্বিতীয় সংস্করণ)	... ...	১৲
বসন্তউৎসব (গিতী নাট্য)	... ..	।৵০
মালতী (উপন্যাস)	... ...	।০
গাথা (কাব্যোপন্যাস)	... ...	॥৵০
পৃথিবী	... ...	১৲
হুগলীর ইমামবাড়ী (উপন্যাস)	...	১।০
মিবার-রাজ (উপন্যাস,)	... ...	॥০
গল্প স্বল্প (স্কুল পাঠ্য) (দ্বিতীয় সংস্করণ)	... ...	॥০
বিদ্রোহ (নবপ্রকাশিত উপন্যাস)	. ...	১।০

ছিন্নমুকুল (দ্বিতীয় সংস্করণ কেবল ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ষ্ট্রীট মেডিক্যাল লাইব্রেরী শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

কাশিয়াবাগান, বাগান বাটী,
অপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
ভারতী ও বালক কার্য্যাধ্যক্ষ।

পঁচিশ টাকা

মুক্তোর সাটী। নূতন প্রস্তুত করাইয়াছি। রেসমের পাড় ও পাছা সুতার কাপড়, ফরাসডাঙ্গার কাঁচি বুনন। ১১ হাত লম্বা আড়াই হাতের কিছু অধিক বহর। আমার নিকট ৫।৬ খানি আছে। এক এক খানির মূল্য ১২॥০। ডাক খরচা লাগিবে না। অনুমতি পাইলে অধিক সংখ্যক তৈয়ারি করাইয়া দিতে পারি।

৫ নং তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর,
কলিকাতা।

শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র।

পালিতা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

জগৎ বাবু রাত্রে আসিয়া স্নেহকে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "স্নেহ কোথায়" শুনিলেন টগরের সঙ্গে তাহার শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে। পরদিন আবার তাহাকে না দেখিয়া বলিলেন—"স্নেহ আসে নি?"

গৃহিণী বলিলেন—"না"

জগৎ বাবু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—"আনিতে পাঠান হয় নি বুঝি? কুটুম বাড়ী কদিন থাকবে?"

গৃহিণী বলিলেন—"আনতে পাঠান হয়েছিল—সেখানে সে নেই।"

জগৎ। সেখানে সে নেই! কোথায় গেছে?

গৃহিণী। কোথায় গেছে আমি কি করে জানব?"

জগৎ বাবু রাগিয়া বলিলেন—"তুমি কি করে জানবে? তবে তুমিই তাকে তাড়িয়েছ?

স্নেহকে বিদায় করিয়া গৃহিণী একটু নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, সুতরাং নাক তুলিয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া সুর টানিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ আমি তাড়াব বই কি? আমি যদি তাকে তাড়াতুম ত এতদিন তাকে রাখত কে? এমনি বেইমানই বটে! সে মেয়ের কি আর ঘরে মন আছে? সে নেকাপড়া শিখেছে, সে এখন বিবি হবে, বিয়ে করবে, সে কি এখানে আর থাকতে পারে? এখানে ত ওসব কিছু হবার যো নেই, তাই বুঝি নিজের পথ নিজে খুঁজতে গেল! তুমি ত চেন না তাকে, আমি ত বরাবরই বলেছি, অমন ধূর্ত্ত মেয়ে আর নেই।

তাঁহার কথায় জগৎ বাবুর সন্দেহ বাড়িল বই কমিল না। তিনি উগ্রস্বরে বলিলেন—"সে কোথায় তুমি না জান—আমি সন্ধান করে এখনি আনতে যাব। আমি টগরের বাড়ী চল্লেম।"

গৃহিণী দেখিলেন—স্নেহ কোথায় তাহা লুকাইয়া রাখিবার নয়, বলিলেন—"টগরের বাড়ী গিয়ে কি করবে? সে না কি সেখান থেকে শ্বশুর বাড়ী গেছে।"

শ্বশুর বাড়ী! খানিকক্ষণ জগৎ বাবু নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। স্নেহ যে ইচ্ছা করিয়া, তাঁহাকে না বলিয়া কহিয়া অমনি শ্বশুর বাড়ী যাইবে, ইহা অসম্ভব,—গৃহিণী যে চারুর ভয়ে তাঁহাকে বিদায় করিয়াছেন সে বিষয়ে তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না, ক্রোধে তাঁহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত চন চন করিয়া উঠিল, কম্পিত স্বরে বলিলেন—"সে নিজে থেকে কখনই শ্বশুরবাড়ী যাবে না এ তোমারি কীর্ত্তি!"

গৃহিণী তখন তাঁহার নির্ঘাত অস্ত্র দু এক ফোটা চোখের জল বাহির করিয়া নরম স্বরে বলিলেন—"আমি যতই পরের জন্য মরি, তুমি ততই আমার দোষ দেখ! তা দেখবে না কেন? সবই কপালের দোষ"!

সঙ্গে সঙ্গে কপালে করাঘাত পড়িল—তাহার পর ফুঁপাইয়া বলিলেন—"তুমি বলছ আমি তাকে তাড়িয়েছি, কিন্তু সে যে গেছে তা আমাকে বলে পর্য্যন্ত যায় নি। পাছে বল্লে বুঝি আমরা যেতে না দিই। শ্বশুর বাড়ী মেম আসে, খিরিষ্টান হবার সুবিধে, এটা আর বুঝছ না!"

জগৎ বাবু অধীর ভাবে বলিলেন,"কি সুবিধে অসুবিধে তা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নি, তার যাওয়ার উপস্থিত কারণটা কি—কেন সে গেল সেইটে আমি শুনতে চাই"

গৃহিণী। এ ত ভাল জ্বালায় পড়লুম! বলছি যে আমাকে বলে পর্য্যন্ত যায় নি, তবু ঐ এক কথা, কেন গেল কেন গেল! যেন আমি জানি!"

জগৎ বাবু। তোমাকেও বলে যায় নি? সত্যি!

গৃ। সত্যি না ত কি আমি মিথ্যা বলছি নাকি? জিজ্ঞাসা করনা দাসী বাঁদি আর পাঁচ জনকে। টগর আমাকে প্রণাম করে গেল, সেও বল্লে না যে স্নেহ যাবে, বুঝি সেও তখন জানত না, সে পালকিতে উঠবার সময় বুঝি তার সঙ্গে অমনি উঠে পড়েছে"

গৃহিণী যে সুবিধা বুঝিলে মিথ্যা বলেন না জগৎ বাবু এরূপ মনে করেন না, তবে আপাততঃ এ মিথ্যাটা বলিয়া তাঁহার কি লাভ তাহা তিনি তলাইতে পারিলেন না, সুতরাং তাঁহার তখন আর এক সন্দেহ উপস্থিত হইল। স্নেহ যে তাঁহাকে না বলিয়া গৃহিণীকে পর্য্যন্ত না বলিয়া হঠাৎ চলিয়া গেল চারু ত তাহার প্রতি এমন কোন অযথা আচরণ করে নাই যাহা প্রকাশে অক্ষম হইয়া এবং যাহা পুনরাচরিত হইবার ভয়ে সে জগৎ বাবুর আশ্রয় ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে? ইহাই তাঁহার নিতান্ত সম্ভব বলিয়া মনে হইল, কেন না স্নেহের প্রতি চারুর অনুরাগ নিতান্ত বাড়াবাড়ি ধরণের না দেখিলে গৃহিণী কিছু আর সে কথা তাঁহাকে বলিতে যান নাই। জগৎ বাবু স্তম্ভিত ভাবে বাড়ী ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া চারুর সহিত দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"চারু, স্নেহ শ্বশুর বাড়ী গিয়াছে শুনিতেছি, তোমাকে বলিয়া গিয়াছে?"

চারুও আগের দিন এবং আজ সকালে স্নেহের খোঁজ করিয়াছিল, তাহাতে শুনে যে স্নেহ টগরের সহিত টগরের শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে। কিন্তু জগৎ বাবুর মুখে এখন অন্যরূপ শুনিয়া বিস্ময়ে সে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়া উত্তেজিত ব্যাকুলস্বরে বলিল—"শ্বশুর বাড়ী গিয়াছে? কই আমাকে ত বলে যায় নি!"

জগৎ। তুমি কি তাকে এমন কিছু বলেছিলে—যাতে তার মনে কষ্ট হয়?"

চারু। "আমি এমন কিছু বলব! যাতে তার মনে কষ্ট হবে!"

জগৎ। তা কি আর হতে পারে না না কি? সেটা কি এমনি অসম্ভব?"

চারু মুখ নত করিল, এই কথায় সেই রাত্রির শেষ ঘটনা তাহার মনে পড়িল, তাহার পর হইতে স্নেহের সহসা পরিবর্ত্তন তাহার অস্বাভাবিক ভীত, বিষণ্ণ স্তম্ভিত ভাব, চারুর সহস্র প্রশ্নের শেষে এক একটি অতি মৃদু, চকিত, অসংলগ্ন উত্তর, এবং পর-দিনের অসম্পূর্ণ আকুল পত্র, এ সমস্তই একের পর একে আবার তাহার মনে উদয় হইল, ইতি পূর্ব্বে ইহার সে অন্যরূপ অর্থ করিয়াছিল, কিন্তু এখন তাহার যেন ভুল ভাঙ্গিল, তাহার হৃদয় চমকিয়া উঠিল, সে নিরুত্তর হইয়া রহিল। জগৎ বাবু তাহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বলিলেন—"ব্যাপারটা কি হয়েছে আমি তদন্ত করতে ছাড়ব না—যদি কিছু অন্যায় প্রকাশ পায় ত তুমি আমার ত্যজ্য পুত্র হবে।"

জগৎ বাবু তখনি কিশোরীর বাড়ী গেলেন। তিনি স্নেহলতাকে লইতে আসিয়াছেন শুনিয়া কিশোরী মুস্কিলে পড়িল। স্নেহলতাকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া সে বড়ই নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। জগৎ বাবুর কথা-মত কাজ করিলে তাহার সমস্ত অভিপ্রায় ব্যর্থ হয়, অথচ তাঁহাকে মুখের উপর কিছু তাহা বলাও যায় না, কাজেই সে কৌশল অবলম্বনে বাধ্য হইল। সে জগৎ বাবুর নিকট হইতে অন্তঃপুরাভিমুখে গেল, তাহার কিছু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"বৌ দিদি বল্লেন তিনি এইখানেই থাকবেন, তিনি আর যাবেন না।" জগৎ বাবুর নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল, তিনি প্রাণ পণে সংযত হইয়া বলিলেন—"তা না আসুক আমি একবার দেখা করিতে চাই।"

কিশোরী বলিল—"সে কথা আমি আগেই বলেছি—তিনি তাতেও রাজি নন।"

জগৎ বাবুর আর কথা কহিবার সামর্থ্য রহিল না তাঁহার প্রাণ যেন বাহির হইয়া আসিতে চাহিল, তিনি বিদায় অভিবাদন পর্য্যন্ত করিতে ভুলিয়া গিয়া দ্রুত গতিতে গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এ দিকে গৃহিণী বড় ভাবিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। জগৎ বাবু যে তখনি কুঞ্জবাবুর বাড়ী গিয়া স্নেহ পোড়ারমুখীকে আবার এখনি বাড়ী লইয়া আসিবেন—তাঁহার সমস্ত কৌশল বিফল হইবে, এই চিন্তায় তাঁহাকে জর্জ্জর করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সহসা জগৎ বাবুকে বিষণ্ণ, ম্লান ভাবে একাকী বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া তিনি যেমন আশ্চর্য্য হইলেন, তেমনি প্রফুল্ল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হোল গো?"

জগৎ বাবু কাতর স্বরে বলিলেন—"তার সঙ্গে দেখা হোল না।"

গৃহিণী বুঝিলেন, কিশোরী দেখা করিতে দেয় নাই, 'বাবুকে' হাতে পাইয়া এইরূপে অপমান করিয়াছে; বলিলেন—"তোমার ত জ্ঞান কাণ্ড নেই! পরের বাড়ী কেবল অপমান হতে যাওয়া। তাদের সঙ্গে হোল চিরকেলে ঝগড়া—তোমাকে হাতে পেলে অপমান করতে ছাড়বে কেন?"

জগৎ বাবু যন্ত্রণা পীড়িত স্বরে বলিলেন—"তারা না গো তারা না, স্নেহ নিজে আমার সঙ্গে দেখা করলে না!"

এই কথায় গৃহিণী যদিও একটু বিস্মিত হইলেন তবে বুঝিলেন কোন গোল হইয়াছে—কিন্তু তাঁহার যন্ত্রণা দেখিয়া হিংস্র পশুর ন্যায় তাঁহার আনন্দ হইল, তিনি হাসি মুখে বলিলেন "তা দেখা করবে কেন? তাহলে ত আবার এই ঘরে আসতে হবে, তাহলে ত আর তার বিয়ে করা হবে না। দেখ আমি যা বলেছিলুম ঠিক হোল কি না!"

গৃহিণীর সেই তীব্র উপহাস হাসি জগৎ বাবুর অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি নীরবে বাহিরে চলিয়া গেলেন, বাহিরে আসিয়া নির্জ্জন গৃহে একাকী পদশ্চারণ করিতে করিতে আত্মহারার ন্যায় ভাবিতে লাগিলেন—"স্নেহ আমার সহিত দেখা করিল না! তাহাকে এতদিন পালন করিয়া এই প্রতিদান পাইলাম! সংসারে কি সত্যই কাহাকে বিশ্বাস করিতে নাই? কাহাকে চেনা যায় না? সত্যই কি স্ত্রীলোক সর্পের জাত? পুরুষকে মন্দ পথে লইয়া যাইতেই কি তাহাদের জন্ম! তাহাদের কি উচ্চভাব মহৎভাব, আদর্শ ভাব সমস্ত আকাশ কুসুম?" অনুতাপহীন কষ্টের ভাবে ক্রোধের ভাবে তাঁহার কোমল-করুণ ভাব বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল, কঠোর অবিশ্বাসে তাঁহার চিরদিনের বিশ্বাস গ্রাস করিতে উদ্যত হইল, তিনি তখন কাতর হইয়া বলিলেন—"ভগবান, এ যন্ত্রণার মত আর যন্ত্রণা নাই—আমার অদৃষ্টে কি শেষে এই লিখিয়াছিলে! আমি শেষে হৃদয় হীন পাষাণে পরিণত হইলাম? ভগবান আজীবন কন্যা স্নেহের এই ফল প্রভু! দয়াময়, আমাকে রক্ষা কর, আমি এ কি হইয়া গেলাম!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

চারু ভাবিতে লাগিল—সত্যই কি স্নেহলতা তাহার জন্য গিয়াছে? সেই রাত্রের আনুপূর্ব্বিক ঘটনা, স্নেহের সমস্ত হাবভাব ব্যবহার বারবার করিয়া সে মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিল, স্নেহের সেই অসম্পূর্ণ পত্রখানি অনেকবার করিয়া সে পড়িয়া দেখিল, সমস্ত লইয়া তাহার মনে হইল, স্নেহ তাহার উপরই রাগ করিয়া গিয়াছে।

চারুর হৃদয়ে বজ্র জ্বলিল, যন্ত্রণাকাতর হইয়া সে ভাবিতে লাগিল,—"আমি কি করিয়াছি? তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিয়াছি—এই আমার অপরাধ? তাহার জন্য পিতামাতা বিষয় সম্পত্তি সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত এই আমার অপরাধ? এই অপরাধে সে আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল! যদি এরূপই করিবে—তবে বিবাহে সম্মতি প্রকাশ করিল কেন? তাহাকে আপনার ভাবিয়া আনন্দের উচ্ছ্বাসে না হয় আদর করিয়াছিলাম—যদি তাহাতে অপরাধ হইয়াই থাকে—তাহার কি মার্জ্জনা ছিল

না? এই অপরাধে সে আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল, আমাকে ভাল বাসিলে কি সে ইহা পারিত? সমস্ত হৃদয় তাহার চরণে উৎসর্গ করিয়াছি বলিয়াই কি এই অবহেলা? সমস্ত প্রাণে তাহাকে ভালবাসিয়াছি বলিয়াই সে ভালবাসার এত অনাদর?

চারু মর্ম্মে মর্ম্মে অপমানিত জ্ঞান করিল, স্নেহকে ভালবাসে বলিয়া অকৃত্রিম অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে লাগিল, অথচ এই মর্ম্মান্তিক অনুতাপের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে দেখিবার ইচ্ছায় তাহার চরণে ধরিয়া মার্জ্জনা চাহিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার ইচ্ছায় ব্যগ্র হইয়া উঠিল, তাহাকে হারাইয়া সমস্ত জগৎ শূন্যময় দেখিতে লাগিল।

নিজের এই দুর্ব্বলতায় নিজের উপর তাহার ক্রোধের সীমা রহিল না, দুই হাতে বুক চিড়িয়া এই অপদার্থ ভালবাসাটাকে যদি হিরণ্যকশিপুর মত করিয়া সে বধ করিতে পারিত—তাহা হইলে তাহার কি ভীষণ পরিতৃপ্তি হইত! কিন্তু এই দানব ভালবাসার নিকট সে নিতান্ত নিরুপায় দুর্ব্বল শিশু, তাহার প্রাণপণ সংগ্রাম এখানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

বিকালে সে কিশোরীর বাড়ী গেল, দেখিল কিশোরী বাড়ী নাই, শুনিল সে বাগানে গিয়াছে দুএক দিন আসিবে না। সেই আকুল তৃষ্ণা, সেই দগ্ধ যন্ত্রণা লইয়া চারু আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিল—স্নেহের সহিত এক মুহূর্ত্তের সাক্ষাৎও এখন অসাধ্য সাধনা!

চারু অনন্যোপায় হইয়া তাহাকে পত্র লিখিতে বসিল। লিখিতে লিখিতে তাহার হৃদয় উৎসারিত হইয়া তাহা অক্ষররূপে পরিণত হইতে চাহিল, কিন্তু পাছে এ চিঠি অন্য কাহারো হাতে পড়ে এই ভয়ে বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া চারু অবশেষে এইরূপ লিখিল।

"স্নেহ, তুমি কেন এখান হইতে চলিয়া গেলে? সেজন্য বাবা বড়ই দুঃখিত, আমরা সকলেই দুঃখিত! তোমার যাইবার কারণ জানিতে আমরা বিশেষ উৎসুক, কবে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে লিখিলে আমি যাইব। যদি কোন দোষ করিয়া থাকি মার্জ্জনা কর। 'ভাই' অপরাধ করিলে কি বোন মার্জনা করে না? যদি তুমি ফিরিয়া আসিতে চাও—জানিলাম মার্জ্জনা করিলে। তোমার পত্রের জন্য বড় আগ্রহে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।—চারু"

চারু পত্র ডাকে দিয়া উত্তরের জন্য হা প্রত্যাশ করিয়া রহিল। একদিন গেল দুদিন গেল, প্রতি ঘণ্টা চারুর যুগের মত মনে হইতে লাগিল—কিন্তু কোনই উত্তর আসিল না, তৃতীয় দিনে চারু আবার কিশোরীর নিকট গেল।

বিকালবেলা। কিশোরী বাবু বারান্দায় চৌকিতে বসিয়া আছেন, সম্মুখে একটি টেবিল, টেবিলে রীতিমত "পান সরঞ্জাম"! চারু আসিতেই তিনি হাল্লো বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া হাত ধরিয়া পাশের একখানি চৌকিতে বসাইলেন—তাহার পর পূর্ণগ্লাস নিকটে

বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—"একি এতদিনে যে ? আরত এদিকে পা-ই পড়ে না। হোক তবে এক গ্লাস। এমন যে বিষণ্ণ দেখছি—কোন love matter নাকি ?"

চারু গ্লাসটা মুখে ছুঁয়াইয়া বলিল—'আর পড়তে পড়তেই সময় গেল, ওসবের সময় কোথা" ? কিশোরী ভবিষ্যদ্বক্তার মত মাথা নাড়িয়া বলিল—লোকে পড়তে পড়তেই ত 'পড়ে।"

চারু একটু হাসিয়া বলিল—"তা পড়ে থাকি—ত পড়েছি। আপনি কি কনগ্রেসে যাচ্ছেন ?

কিশোরী। না, ওসব হুবাকি ব্যাপার, ওতে আমি যাইনে, তুমি যাচ্ছ নাকি !

চারু। মনে ত করছি যাব, আপনি গেলে বেশ এক সঙ্গে যাওয়া যেত। আমি পরশুও এখানে এসেছিলুম—দেখলুম আপনি বাড়ী নেই !"

কিশোরী। আর কাঁহাতক একলাটি বাড়ী থাকি—তুমি ও ত আর আস না। তা ছাড়া বাড়ীতে কথা শুনতে শুনতে প্রাণ ওষ্ঠাগত, আগে ত একজনের ছিল, এখন বৌ-দিদি এসে আবার দুজনের লেকচারের পাল্লায় পড়েছি। সব সয়, মেয়েমানুষের আচার্য্যগিরি সয় না।"

চারু বলিল—"আমি একবার স্নেহের সহিত দেখা করতে চাই। আমি তাকে একখানা চিঠি লিখেছিলুম, পেয়েছে কি ?

কিশোরী। হাঁ৷ পেয়েছিলেন বই কি। ইংরাজ রাজ্যে ডাকের চিঠির কি গোল হয় ?"

কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, স্নেহের চিঠি স্নেহের নিকট আদবেই পৌঁছায় নাই, কিশোরী তাহা পাইয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য তাহা পড়িতেও বাকী রাখেন নাই।

কিশোরীর কথায় চারু আশ্বস্ত হইয়া বলিল—"কিন্তু আমি ত উত্তর পাইনি ?"

কিশোরী। "তার কারণ ত আমার জানার কথা নয়।"

চারু। "কিশোরী দা, তাহলে স্নেহকে একবার বলুন—আমি তার সঙ্গে দেখা করব।"

কিশোরী। সে ভাবনা কি ? আমি বরঞ্চ তাঁকে এই খানেই ডেকে আনছি। এখানে ত অন্য লোক কেউ নেই।"

বলিয়া সে উঠিয়া গেল, এবং পূর্ব্ব কৌশল অবলম্বন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"এ কি ব্যাপার কিছুইত বুঝতে পারিনে—বৌ কোন মতে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন না। আমি যে কত অনুরোধ করলুম তার ঠিক নেই। কিন্তু জোর করে ত আর আনতে পারিনে।"

সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চারুর মাথার মধ্যে ঘুরিয়া উঠিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

স্নেহ চারুর সহিত এতদূর নৃশংস ব্যবহার করিবে তাহা সে স্বপ্নেও জানিত না, মর্ম্মা-

হত হইয়া চারু ক্রমাগত আপনাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল, সে যখন আমাকে ভাল বাসে না—আমি কেন তাহাকে ভাল বাসিব। তাহার উপেক্ষায় আমার কি আসে যায়?

Shall I wasting in despair
Die, because a woman's fair:
If she be not fair for me
What care I how fair she be.

কিন্তু এরূপ চিন্তায় তাহার যন্ত্রণা কিছুমাত্র শমিত হইলনা, স্নেহলতার উপেক্ষা সে সমানই অনুভব করিতে লাগিল। ক্রোধ ও ঘৃণা দিয়া তাহার নিরাশ প্রেমকে সে চাপিয়া মারিতে চাহে, কিন্তু রক্তবীজের ঝাড়ের মত তাহার প্রত্যেক রক্তবিন্দু তাহাতে জীবন্ত হইয়া উঠিয়া তাহার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত করিয়া তুলিতে লাগিল। দুএক দিন পরে আবার চারু স্নেহকে একখানি পত্র লিখিল।

স্নেহ—সত্যই কি তোমার সহিত দুদিনে আমাদের এত দূর-সম্পর্ক হইয়াছে! এখন দেখা করিতে চাহিলেও তোমার দেখা মেলে না! আমি মনে করিতাম—তুমি আমাকে ভালবাস, সেই মনে করিয়াই তোমাকে আমার ভালবাসা জানাইয়াছিলাম—আগ্রহ ভরে আত্মবিস্মৃত হইয়া তোমাকে আদর করিয়াছিলাম, তাহাতে যদি এতই অপরাধ হইয়া থাকে—অন্তত মার্জনা করিতে পারিতে, এত নিষ্ঠুর হইবার আবশ্যক ছিল না।

যাহা হউক আমি এই পত্রে তোমার মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিতেছি। যাহা হইয়াছে ভুলিয়া যাও—যদি ইহার উত্তর পাই—বুঝিলাম মার্জনা করিলে। আমি আর বিবাহের কথা বলিয়া তোমাকে জ্বালাতন করিব না। তুমি চলিয়া এস—আমি কথা দিলাম, তুমি ইচ্ছা না করিলে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিব না। বোধ হয় এ কথা অবিশ্বাস করিবে না। আমি তোমার কাছে যতই অপরাধ করিয়া থাকি কখনো মিথ্যা বলি নাই, কখনো বলিব না।

চারু।

পত্রখানি ডাকে দিয়া উত্তরের আশায় আবার চারু দিন গণিতে লাগিল। তাহার অন্তরের অন্তরে সে এখনো স্নেহকে অবিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, মনে হইতেছিল যেন কোন একটা অজ্ঞাত ভ্রান্তি রহস্যে এ সমস্ত ব্যাপার ঘটিতেছে, এ পত্র পড়িলে স্নেহের ভ্রম ঘুচিয়া যাইবে, চারুর হৃদয় স্নেহ বুঝিতে পারিবে—তাহা হইলে সে কি মার্জ্জনা পাইবে না?

কিন্তু বৃথা আশা বৃথা বিশ্বাস! দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, তবু ও সে কোন উত্তর পাইল না।

চারু ভগ্ন হৃদয়ে আবার কিশোরীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। চারুকে

দেখিয়া কিশোরী একটু মুচকি হাসিয়া বলিল—"ব্যাপার খানা কি হে? দিন দিন যে একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছ? তুমি মান না মান আমি দেখছি তোমার অবস্থা বড়ই মন্দ।"

চারু বলিল—"দাদা পৃথিবীর গতিকই এই, কারো অবস্থা মন্দ—কারো ভাল, কেউ হাসে কেউ কাঁদে, আপনি যত পারেন হেসে নিন।

কিশোরী। রাম রাম! তোর দুঃখে আমি হাসব! তবে এ যে হাসি দেখছিস—এ চড়কি হাসি। যাহক ভাই সাবধান! ও আগুণে পুড়েছ কি মারা গেছ।"

চারু। Many thanks for the kind sympathy—তবে আমার মনের কথা যদি শুনতে চান আমি ও sympathyর কোন প্রয়োজন দেখিনে,—আমার মতে It is better to have loved and lost than never to have loved at all.

কিশোরী। তোমরা কবি মানুষ—তোমাদের কথা স্বতন্ত্র—তবে কি আমরা সামান্য mortalরা ও আগুণের নামে ডরিয়ে উঠি!"

চারু। কিন্তু আপনার কাজে কথায় ত মিল দেখিনে:

কিশোরী! হাহাঃ, ভায়া কবিতাই লিখছ, আর এদিকে এত কাঁচা! Cupid ছোকরা কি বাঁধা ছাঁদায় থাকেন? বাঁধতে গেছ কি তিনি পালিয়েছেন। চোখের আগুণ, হাসির ফাঁসি তখন আর নেই। তখন জ'ল'-চোখ আর গোমশা মুখ নিয়েই তোমার কারবার, তাতে কি আর প্রাণ হারাবার ভয় আছে?

চারু। আপনি তাহলে দেখছি safe"

কিশোরী। সম্পূর্ণ। যদি পরামর্শ শোন তুমিও বিয়েটা করে ফেল। সব জ্বালা যন্ত্রণা ঘুচে যাবে।

চারু। অমৃতে অরুচি কার? তবে পাই কই?

কিশোরী। বটে পাচ্ছনা? তুমি দেখছি তাহলে ভুল পথে গেছ। ভাইরে, এইটে মনে রেখো Woman is like your shadow: follow her she will fly from you, fly from her—she will follow you.

চারুর মনে কথাগুলি ঠিক লাগিল—মনে হইল কিশোরী যেন তাহার মনের কথাই টানিয়া বলিতেছে। চারু বলিল—"আচ্ছা দাদা আমার সময় আসিলে আপনার পরামর্শ মতেই কাজ করা যাইবে। এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—স্নেহ কি আমার চিঠি পেয়েছে, আমি কদিন হোল তাকে একখানি চিঠি লিখেছি। কিন্তু এবারো উত্তর পাইনি।

কিশোরী কিছুক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল—তাহার পর বলিল—"ভাই তুমি আমার বন্ধু, চিরকাল তোমাকে ভাল বাসিয়া আসিতেছি—তোমাকে সবখুলিয়া বলাই কর্ত্তব্য"—বলিয়া আবার কিশোরী থামিল, চারু বুঝিল—স্নেহের সম্বন্ধেই কোন কথা কিশোরী বলিতে চায়। রুদ্ধশ্বাসে সে অপেক্ষা করিয়া রহিল। কিশোরী গম্ভীর ভাবে বলিল "ভাই,

মেয়েমানুষকে বিশ্বাস করিও না, তা সে কেন যতই মিষ্টমুখ হউক না। এইটা জানিও যাহার যত মিষ্টমুখ সে তত অবিশ্বাসী” বলিয়া বাক্স হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া চারুর হাতে দিয়া বলিল “এই দেখ।”

চারু দেখিল—সে তাহারি পত্র, যেখানি সে স্নেহকে লিখিয়াছিল সেইখানি। সে বলিল—‘কি অন্যায় কিশোরী দা! আপনি তাহার চিঠি খুলিয়াছেন?”

কিশোরী। আমি খুলিয়াছি! বৌ পড়িয়া এই চিঠি জগৎবাবুকে পাঠাইতে যাইতে ছিল, আমি পাঠাইব বলিয়া অনেক করিয়া পত্রখানি তাহার কাছ হইতে লইয়াছি। ভায়া স্ত্রীলোক বিশেষতঃ মন্দ স্ত্রীলোক সর্পিণী। আমি বেশ বুঝিতেছি সেই তোমাকে প্রলোভনের পথে লইয়া গিয়াছিল, এখন তোমাকে হাতে পাইয়া নিজের ভালমানষি জানাইতে উদ্যত।”

চারু আর কথা কহিতে পারিল না বজ্রাহত হইয়া রহিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

চারু চোখ মেলিয়া দেখিল, তাহার বাড়ীর লোকেরা সকলে তাহাকে ঘিরিয়া তাহার শয্যার আশে পাশে বসিয়া আছেন। তাহাকে চাহিতে দেখিয়া গৃহিণী—“হরি তুমিই সত্য, তারকনাথ তোমার জয় হউক বাবা,” বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,—জগৎ বাবু চারুর নাড়ি টিপিয়া ধরিয়াছিলেন, হাত উঠাইয়া একবার বুক একবার মাথা পরীক্ষা করিয়া প্রফুল্লমুখে আবার নাড়ি টিপিয়া বলিলেন—“আর ভয় নেই, কেঁদোনা, চুপ কর” টগর আস্তে আস্তে চোখ মুছিয়া বলিল—“দাদা চিনতে পারছ?” চারু এই সকল ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—“চিনতে পারব না কেন? কি হয়েছে?”

গৃহিণী আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন—“বাবা, আবার তুই যে কথা কবি, চিনবি যাদু, তা কি আর আশা ছিল? আজ যে তুই তিন দিন শয্যাগত, কিশোরী সেই যে ভোর বেলা তোকে গাড়ী করে থুয়ে গেল, সেই অবধি কি তোর হুঁস আছে?”

চারু বলিল—“কি হয়েছিল কি?”

জগৎ বাবু উঠিবার উদ্যোগ করিয়া বলিলেন—“হয়েছিল খুবই ভাল, সেসব এখন থাক। ওকে তোমরা আর বেশী বকিওনা, আমি ডাক্তার সন্ডার্সকে একবার খবরটা পাঠিয়ে আসি?” তিনি চলিয়া গেলেন, টগর বলিল—“তোমার কিছু কি মনে নেই দাদা? তুমি যে মদে চুরচুর হয়ে এসেছিলে। বেহুঁসে কেবলি বকেছ—বাবা বলেন তোমার ডিলিরিয়া ট্রিমেন্স হয়েছিল।”

চারুর তখন পূর্ব্ব কথা মনে পড়িতে লাগিল, কিশোরী স্নেহের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিল তাহাও মনে পড়িল, কিন্তু তাহা কি সত্য? না তাহা অসুস্থ অবস্থার মোহ?

চারু জিজ্ঞাসা করিল—"স্নেহ কোথায় ? আমার অসুখ হইয়াছে আমাকে দেখিতে আসে নাই ?

টগর বলিল—"দাদা সব ভুলিয়া গেছ ? সে যে শ্বশুর বাড়ী, সে কি আর এখানে থাকে ?

চারু বুঝিল, তাহার স্মৃতি স্বপ্ন নহে, তাহা সত্য নৃশংস ব্যবহার। আবার সেই যন্ত্রণায় তাহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল—স্নেহ কি না তাহার পত্র জগৎ বাবুকে পাঠাইতে গিয়াছিল! সে যন্ত্রণায় নয়ন মুদ্রিত করিল।

গৃহিণী ভয় পাইলেন—বলিলেন "আবার এ কি হোল! হরি দীনবন্ধু, তোমার নামে পাঁচ টাকার লুট, রক্ষা কর।"

চারু আবার চোখ মেলিল। গৃহিণী বলিলেন "বাবা আমার, বিয়ে কর, কত কষ্টে গর্ভে ধরেছি—লালন পালন করেছি—বাবা এই কথাটা রাখ।"

চারু চুপ করিয়া রহিল।

গৃহিণী বলিলেন—"সে কি তোকে তুক করলে নাকি ? সে ত না বলে ক'য়ে চলে গেল, আর তার জন্য তুই প্রাণ দিবি, তোর শরীরে কি একটু পুরুষের তেজ নেই। বাবা, বিয়ে কর, যদি বড় মেয়ে চাস, ত বল আমি তাই জোগাড় করব ?"

টগর বলিল "দাদা তুমি বিয়ে না করলে ত দিদি ফিরবে না, কেন আর তার জন্য"—

চারু এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়াছিল, তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

গৃহিণী কাঁদিয়া বলিলেন—"বাবারে, তোর চোখের জল কি প্রাণে সয়, বল বাবা বিয়ে করবি,"

চারু বুকে হাত আঁটিয়া চোখ বুজিয়া ভাবিতে লাগিল "ভুলিতে চাই, ভুলিতে চাই, তাহাকে ভুলিতে চাই, সেই নিষ্ঠুরতা, সেই বিশ্বাসঘাতকতা ভুলিতে চাই। কি করিয়া ভুলিব ? কাহাকে পাইয়া কখনও কি এ যন্ত্রণার শেষ হইবে ?

আর কিছু না—শান্তি, বিরাম, বিস্মৃতি! ভুলিতেই হইবে, যেমন করিয়াই হোক ভুলিব, নূতন ঘটনায়, নূতন সুখে নূতন দুঃখে নূতন স্মৃতিতে যেমন করিয়াই হোক এই ভয়ানক স্মৃতি লোপ করিব। বিস্মৃতি কিম্বা মৃত্যু।"

গৃহিণী বলিলেন—"চুপ করে রইলি কেন ধন, কথা ক, বল বাবা বিয়ে করবি"—

চারু প্রাণপণে বল সংগ্রহ করিয়া বলিল—"করব"

গৃহিণী আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিলেন—"তবে এই মাসেই হোক এখনো মাসের দিন আষ্টেক আছে, আবার পৌষ মাস এলে আর এক মাস হবার যো নেই, লক্ষ্মী বাবা বল, আমি এখনি সব ঠিক করে ফেলি ?

চারু অতি ধীরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের মত বলিল—"আচ্ছা"

গৃহিণী আহ্লাদের আবেগে অধীর হইয়া অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে চারুর হাত ধরিয়া বলিলেন "এমন ছেলে যার তার সার্থক জন্ম!"

চারু সে কথা শুনিল না, সে তখন অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে নিবিষ্ট হইয়া ভাবিতেছিল—শান্তি, বিশ্রাম, বিস্মৃতি, মৃত্যু!

ক্রমশঃ।

শরৎ ও বসন্ত।

যাহাদের হৃদয় স্বভাবতই স্নেহসিক্ত তাহাদের মুখে কেমন একটী করুণ স্নিগ্ধ ছায়া পড়ে। বিশেষতঃ সে হৃদয় যদি দুঃখগঠিত হয়, এই স্নেহময় ভাবে তাহার প্রশান্ত শ্রী সমধিক বিকশিয়া উঠে। এ কোমল সান্ধ্য-শ্রীতে কোথাও বিহ্বল মদির-বিলাস নাই, রবি-কিরণের প্রখর তীব্রতা নাই, বাহির হইবার দুর্দ্দম্য প্রবল উদ্যম নাই; এ সৌন্দর্য্য যেন নীরবে আপনার দারুণ হৃদয়বেদনা বহিয়া চিরদিন সহিতে প্রস্তুত। শরৎ এই বেদনাময় অর্দ্ধস্ফুট সৌকুমার্য্যে সুন্দরী। অর্দ্ধোন্মুক্ত অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে পাণ্ডুশ্রী বিভাসিত যৌবনের স্নিগ্ধ লাবণ্য ফুটিয়া পড়িয়াছে। নয়ন নীরব, দৃষ্টি স্থির, মুখশ্রীতে কোথাও চাঞ্চল্যের পরিচয় নাই। সমস্ত সৌন্দর্য্যে কেমন কোমল নীরব সংযত ভাব। নয়নের কোণে, অধর-প্রান্তে যে করুণ কাতরতা প্রকাশ পায় তাহাতে অধৈর্য্যও ধীর। শরৎ বিলাপ গাহিতে জানে না, চিরদিন নিভৃতে আপন গভীর অন্তরের মাঝে দারুণ রুদ্ধ বেদনা সহিয়া আসে। বর্ষার মত সে অন্তর-জ্বালায় গুমরিয়া মরে না, বসন্তের মত সুখতৃষ্ণ বিলাপে যৌবন-জ্বালা ঢালিয়া দিয়া তৃপ্তি অনুভব করে না। শরৎ দুঃখিনী—দুঃখিনীর মতই তাহার ভাব। বিলাস তাহার স্বভাব নহে।

আর বসন্ত? বসন্ত-সুন্দরী আপন কনক-রূপযৌবনে গরবিনী। চঞ্চল দৃষ্টি ক্ষণে ক্ষণে নয়ন-কোণ অনুসরণ করে, চারু অধর মৃদু হাসিতে তরল চুম্বন-লালসা ফুটাইয়া তুলে, তৃষিত যৌবন আপন বিবশ অধীরতায় হেলিয়া দুলিয়া ঢলিয়া পড়ে। শরতের মত সংযত সলজ্জ ভাব বসন্তের নহে। বসন্ত প্রবল যৌবন-বন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে—পথে যে পড়ে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। সে আপনাকে আপনি ধরিয়া রাখিতে পারে না—দুর্দ্দম্য বেগে আপনার মধ্য হইতে অধীরে বাহির হইয়া পড়ে। বসন্তের সুখের প্রাণ; সে সুখ চাহে, সুতরাং তাহাকে বাহির হইতেই হয়। তাহার প্রণয় যৌবনের—বাধা মানে না, বিঘ্ন মানে না, ঠেলিয়া ফেলিয়া বাহির হইয়া যায়। শরৎ প্রণয়ে ভাসিয়া যায় না, ডুবিয়া যায় বটে। তাহার প্রেম জীবনের, উল্লসিত চঞ্চল যৌবনের নহে। এই জন্যই শরৎ জগৎকে আপনাতে টানিয়া আনে, বসন্ত আপনাকে

জগতে বাহির করে। বসন্ত ত দুঃখ সহিতে পারে না ; বিলাস হৃদয় সুখভরা ধরণীতে লঘু আপনাকে ছড়াইয়া দেয়, ফুলের গন্ধে, মলয়-হিল্লোলে, কোকিল-কূজনে বিভক্ত হইয়া মন বেদনা মুছিয়া ফেলে।

বসন্ত ও শরৎ উভয়ের শ্রীতেই একটী কোমল মাধুরী আছে। কিন্তু কোমলতার মধ্যেও উভয়ের পার্থক্য যথেষ্ট। বসন্তের কনক-মাধুরী, ঢলঢল বিলাস-ভাব, শরৎ অপেক্ষা যেন ঈষৎ তীব্রতা দেখা যায়। নবীন বাসনায় চারিদিকে প্রকৃতির ধনেধান্যে পত্রপুষ্পে উৎফুল্ল যৌবন-বিকাশ। শরতের মাধুরী রজত-জ্যোৎস্নাময়ী। স্বভাবের বিস্তৃত সৌন্দর্য্যের উপর শরতের সন্ধ্যাময় প্রভাব ঘনাইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত প্রকৃতিতে একটা 'অব্যক্ত অস্ফুট অবগুণ্ঠনবতী নীরব লাজ-মাধুরী। প্রকৃতি প্রশান্ত। আঁধারে আলোকে মিশামিশি, আকাশে ধরণীতে বিবাহ, প্রকৃতির এক নব-শ্রী। নদীর চঞ্চল আলোক-হৃদয়ের উপর দিয়া ম্লান ছায়ার মত এই নীরব সন্ধ্যা-শ্রী অতি মৃদুকম্পনে বহিয়া যায়। সে কম্পন অতি মৃদু—অতি মৃদু। যেমন মৃদু শিহরণে রূপসীর তরল লাবণ্য বাহিয়া বিষণ্ণ ক্ষীণ পাণ্ডুচ্ছায়া বহিয়া যায়, জ্যোৎস্না-নিশির বিমল রজত-ঔজ্জ্বল্য স্পর্শ করিয়া ম্লান বিরহ-চাঞ্চল্য ভাসিয়া যায়।

শরতের মাধুরী ম্লানভাবে। শরৎকালের সূর্য্যালোকও ম্লান। এবং হয়ত এই জন্যই তাহা মধুর। বাসন্তী সূর্য্যালোক পূর্ণ উজ্জ্বল—তাহাতে ছায়াময়ী পাণ্ডু-অস্পষ্টতা নাই, ক্ষীণ কুজ্ঝটি-অবগুণ্ঠন নাই। তাই বলিয়া তাহা কি মধুর নহে? বসন্তের রবিকর প্রকৃতির শ্যামল যৌবন-স্পর্শে কোমল, মলয়-সেবনে মধুর। সুতরাং তাহার ঢলঢল কনক-বিলাসে মদির-বিহ্বলতা অনুভব হয়। শরতের সৌন্দর্য্য প্রশান্ত, গভীর। বোধ করি, ম্লান-ভাবে কেমন একটু বিশেষ গভীরতা আছে। এই জন্যই উষাপেক্ষা সন্ধ্যার গাম্ভীর্য্য, মিলন অপেক্ষা বিরহ গভীর। এ গাম্ভীর্য্য কিন্তু রুদ্র নহে। ইহাতে করুণ কোমল ভাব বিশেষ প্রবল। বসন্তের মাধুরী মিলন-মথিত। মিলন কল্লোলময়—তাহার চুম্বন আছে, হাসি আছে, বাঁশী আছে, কাহিনী আছে। নীরবতা তাহার ধর্ম্ম নহে। অভাব বোধ হইলে সে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বিলাপ করিতে থাকে, কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়। বিরহ বিজনে বসিয়া আপনার মনে নীরবে প্রেম-কাব্য রচনা করে। সহমর্ম্মিতায় জগৎ তাহার অন্তঃপুরে সরিয়া আসে। বিলাপে তাহার হৃদয়-ভার লঘু হয় না।

বসন্ত কিছুতেই বিজন বিরহ সহিতে পারে না। তাহার চরিত্র মিলন-গঠিত—হৃদয় সুখপ্রধান। বসন্তকালে যে বিরহযন্ত্রণা থাকে না এমন নহে—নহিলে, বাসন্তী বিরহ লইয়া এত কাব্য রচনা হইবে কেন?—কিন্তু বসন্তের হৃদয় বিরহ-রচিত নহে। বাসন্তী বিরহ মিলন-হৃদয়ের। এই জন্যই তাহা লঘু এবং বাহির হইয়া পড়ে। বিরহে বসন্ত আপনাকে কিছুতেই ভুলিতে পারে না—আপনাকেই সারাক্ষণ চক্ষের সম্মুখে দেখে,

আপনারই প্রতিমা খাড়া করিয়া রাখে, আপনারই অবস্থা তাহার মনে পড়ে, বাকি যেটুকু মিলিলে হৃদয় পূর্ণ হয় সেটুকু কেবল আপন সুখ তৃষা মিটাইবার জন্য না চাহিলে নয়। আপনার মধ্যে চাপা থাকিতে না পারিয়া বসন্ত আপনাকে ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু আপনার কথা বিস্মৃত হয় না। শরৎ আপনাকে অনেকটা ভুলিয়া যায়। আপন হৃদয়ের মধ্যে সে পরের দুঃখ কষ্ট বেদনা অনুভব করে। কিন্তু বসন্তের মত সে আপনার মধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়ে না—শরতে জগত গুটাইয়া আসে। এইখানেই তাহার সন্ধ্যার সহিত সাদৃশ্য।

বসন্তের সহিত বোধ করি উষার সাদৃশ্য থাকিতে পারে। উষা ঘন অন্ধকারের হৃদয়ে আলোকের প্রথম আবির্ভাব; বসন্তও তাহাই—দীর্ঘ হিম-রজনী অবসানে বসন্তেই প্রথম অরুণ-উৎসব। নবীন কিরণ পানে জগৎ জাগিয়া উঠিয়াছে—তাই সহসা বহু-দিনের নিবিড় স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া প্রভাত-বিহঙ্গ গাহিয়া উঠে, হৃদয় টুটিয়া প্রথম রবিকিরণে কনককুসুম ফুটিয়া পড়ে, পুলক-অধীর মলয়-সমীর ফুলে ফুলে চুম্বন রাখিয়া বহিয়া যায়। উষা জগতে বাহির হইয়া পড়ে, বসন্তও বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু উভয়ের গতি ঠিক এক নহে। উষা বালিকা; বসন্তসুন্দরী তরল-যৌবনা। যৌবনের হেলিয়া দুলিয়া আধ চলন—বসন্তের চলন ঢল ঢল। ভাবেও এইখানেই বিশেষ অনৈক্য। যৌবনের আকাঙ্ক্ষা আছে, প্রণয় আছে, মদির-মত্ততা আছে; বালিকা সরলা—এ সকল ভাব তাহার হৃদয়ে জাগে নাই। প্রথম যৌবনে বসন্তের হৃদয়ে তরঙ্গ উঠিয়াছে—দুর্দ্দম্য আবেগ, প্রবল কল্লোল, উচ্ছ্বসিত অধীরতা। উষার চাঞ্চল্য বালিকাসুলভ। তাহাতে অন্তরের অধীর আবেগ নাই, যৌবনের মদির-চাঞ্চল্য নাই।

বসন্তে প্রকৃতি খুব স্পষ্ট। শরতের মত ছায়াময় ভাব নাই। আকাশ, ধরণী আপন পূর্ণ গৌরবে অভিব্যক্ত। প্রত্যেক বর্ণের স্বতন্ত্র বিকাশ। গায়ে গায়ে মিশিয়াছে, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ। শরতের পাণ্ডু-স্নেহে সমস্ত প্রকৃতি যেন কেমন মিশিয়া যায়। আকাশ, ধরণী, বিভিন্ন বর্ণ এক জায়গায় গুটাইয়া আসে। সন্ধ্যায়ও এইরূপ। উষায় বসন্তের মত সকলই ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু বসন্তকে তবে মিলনের কাল বলে কেন? মিলনেই একীকরণের ভাব; সুতরাং হিসাবমত বসন্তেই জগতের গুটাইয়া আসা সঙ্গত। কিন্তু তাহা নহে। বসন্তে হৃদয় মিলিতে চাহে বলিয়াই বাহির হয়—মিলনের জন্য কাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। তাহার দেখা না পাইলে পাঁচজনকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করে, মিলন হইলে উৎসবে আনন্দ প্রকাশ করে। বসন্তের মিলনে ঘটা আছে, সহচরী আছে, হুলুধ্বনি আছে। শরতের নীরব মিলন—কেবল দুইটী হৃদয়ের একীকরণ। বাসন্তী মিলনের অধরে কনক-হাসি সুখ বিলাইতেছে সুখ ছড়াইতেছে—দুইটী হৃদয়ই আপনার সুখ জানাইতে চাহে। শরতের মিলন সুখ জানে না—মিলনে দুইটি হৃদয় ভোর।

বসন্তের আকাশ হাসিয়া দেখাইয়া দেয়, তাহার পার্শ্বে ঐ শ্যামল-যৌবনা ধরণী। আপনার হৃদয়ে রূপসীকে পাইয়া সে একটু গর্ব্ব অনুভব করে। সুতরাং দশ জনের নয়ন আকর্ষণ না করিলে তাহার তেমন পরিতৃপ্তি জন্মে না। বসন্তের মিলন বিলাসে ঢলঢল। শরতের মিলন কেবল নয়নে নয়নে, অধরে অধরে, হৃদয়ে হৃদয়ে। শরতের আকাশ যেন ধরণী-হৃদয়ে খানিকটা নামিয়া আসে, ধরণী আকাশ-হৃদয়ে হারাইয়া যায়। বসন্তে দুই জনে বরাবর পাশাপাশি। শরতে পরস্পরের পূর্ণ আলিঙ্গনে মরিয়া সুখ। মরিলে দুই জনেই মরিবে—এত ঘনাঘনি, এমনি একীকরণ। সন্ধ্যায়ও কতকটা এইরূপ মিলন। এইরূপেই দুইটী হৃদয় এক হইয়া যায়, এইরূপেই পরস্পরকে পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ উপভোগ করে, সহচরী থাকে না, হুলুধ্বনি থাকে না, শান্ত নীরবতা। সন্ধ্যার সহিত শরতের হৃদয়গত অনেকটা ঐক্য আছে। উভয় উভয়কে বুঝিতে পারে। কিন্তু উষা বসন্তকে সেরূপ বুঝিতে পারে না। উষার সহিত বসন্তের সাদৃশ্য হৃদয়গত নহে, কেবল বাহিরের। যৌবনাবির্ভাবে বসন্তের হৃদয় বালিকা-হৃদয় হইতে বিস্তর তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার সুখ দুঃখ স্বতন্ত্র। সুতরাং উষা বসন্তের সহমর্ম্মী হইবে কিরূপে?

সন্ধ্যা বরঞ্চ বসন্তের ভাব বুঝিতে পারে। কিন্তু বয়সের তারতম্য হেতু উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সখী-ভাব নাই। সন্ধ্যা বসন্ত অপেক্ষা প্রবীণা—তাহাতে মাতৃভাব সমধিক বিকশিত। বসন্তের মত তাহার যৌবন-অধীরতা নাই। বসন্তের প্রথম যৌবন, স্বভাবও কিছু অধীর। শরতের সহিত তাহার প্রকৃতিগত ভিন্নতা। তাহার উপর বয়সের প্রভেদ। এ প্রভেদ কিন্তু তত গুরুতর নহে। মানসিক গঠনেই উভয়ের প্রধান অনৈক্য। এমন কি, সুখ দুঃখ, স্মৃতি স্বপ্ন, কল্পনা কবিতায়ও উভয়ের বড় মিল দেখা যায় না। অনুরাগ বিরাগের কথা বাহুল্য মাত্র।

কিন্তু সেই কথাটাই প্রথম আলোচ্য। আমরা যেরূপ ভাবে শরৎ এবং বসন্তের তুলনা করিয়া আসিয়াছি তাহাতে উভয়ের প্রেমের প্রকৃতি বোধ করি অনেকটা পরিস্ফুট হইয়াছে। অন্ততঃ এতদূর চরিত্রগত বিশেষত্ব দেখিয়া উভয়ের প্রেম সম্বন্ধে আমরা দুই চারি কথা বলিতে পারি। বসন্তের অধীর প্রণয়—চির দিন নিভৃতে নীরবে সে সহিয়া আসিতে পারে না। তাহার লঘু হৃদয়, সুখের প্রেম, শরতের মত তাহা ভাবগত নহে, অনেকাংশে বস্তুগত। শরৎ দূরে দূরে ভাল বাসিতে পারে। কারণ, সে প্রেম হইতে সুখটুকু ছাঁকিয়া লইতে চাহে না। শরতের প্রেম প্রেমের জন্যই। আপনার মধ্যে প্রেম উপভোগ করিয়া সে প্রেমে মজিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া বসন্তের যে ভালবাসা নাই এমন নহে। কেবল শরতের হৃদয়ের মত তাহার হৃদয় গভীর নহে বলিয়াই প্রেমে সে তেমন মগ্ন হইয়া প্রেম উপভোগ করিতে পারে নাই। বসন্ত প্রণয়ের নৈরাশ্যে আত্মহত্যা করিতে পারে—যদিও এবিষয়ে তেমন কিছু

প্রমাণ পাওয়া যায় না—কিন্তু জ্বালাবিদ্ধ দুর্ব্বহ জীবন-ভার সে বোধ করি প্রশান্ত ভাবে বহিতে পারে না।

শরতের চরিত্রে প্রশান্ত ভাব। আত্মহত্যা তাহার পক্ষে অসম্ভব। ঘৃণা তাহার স্বভাব নহে—আপনাকে অথবা পরকে শরৎ কখনও ঘৃণা করিতে পারে না। তাহার স্বভাবে উদ্দাম বৃত্তির সম্পূর্ণ অভাব। সুতরাং এমন কোনও কার্য্য যাহাতে তীব্র উৎকটতার আবশ্যক শরতের দ্বারা সাধিত হইবার সম্ভাবনা বিরল। প্রেমেও শরতের এই চরিত্রগত প্রশান্ত গভীরতা টলে নাই। তাহার প্রেম নীরবে রচিত হইয়াছে, নীরবেই ফুটিয়াছে, নীরবে অন্তিম দিবসে তাহার সহিত ঝরিয়া যাইবে। বসন্তের প্রণয়ে কত বঙ্কিম চাহনি, মৃদু কনক-হাসি, কত রূপ, কত যৌবন, কত ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস, কত সাধাইবার ছলছল মান; শরতের সেই সরল নীরব মাধুরী, সেই অশ্রুসিক্ত বিমল স্নেহ-সৌন্দর্য্য, সেই চিরমধুময় ভাব। বেশভূষার বাহুল্য নাই। সন্ধ্যাভ শুভ্র অঞ্চল-প্রান্ত বাহিয়া একটী অতি ক্ষীণ মৃদু ধান্য-ঔজ্জ্বল্য তরঙ্গভঙ্গে বহিয়া গিয়াছে—অঞ্চ-লের সান্ধ্য ভাঁজে ভাঁজে কোথাও ঈষৎ কনক চাঞ্চল্য, কোথাও বা সমধিক ছায়া।

শরৎ আপনার প্রেম জানাইতে ব্যস্ত নহে। এই জন্য তাহার পূর্ব্বরাগেও নীরবতা, বিরহেও নীরবতা, প্রেমেও নীরবতা। বসন্তের মত তাহার প্রণয়ে সহচরী-বাহুল্য নাই। ব্যাখ্যা করিয়া, বিলাপ গাহিয়া, নাকে কাঁদিয়া ত তাহাকে প্রেম ব্যক্ত করিতে হয় না। বসন্ত যাহাকে ভালবাসে তাহাকে আপনার অধীন করিতে চায়। সুতরাং তাহার জন্য আয়োজন করিতে হয়। বসন্তের সাজসজ্জা আবশ্যক—পরের হৃদয়ে আপনাকে লইয়া যাইতে হইবে। শরতের এসব কিছুই চাহি না। শরতের ভালবাসা আত্মময়। সে কেবল ভালবাসিয়া যায়—ভালবাসার পাত্রকে আপনার দ্বারা আড়াল করিয়া রাখে না। বসন্তের প্রণয়ে ভয় আছে, পাছে আর কেহ তাহাকে বঞ্চিত করে। সে একেলা ভালবাসিতে চায়—তাহার প্রণয়ীকে পাঁচজনে তেমন করিয়া ভালবাসিলে সে মনে মনে একটু যেন বিরক্ত হয়। এই জন্যই বাসন্তী প্রণয়ে অনেক সময়ে উদ্দেশে অভিশাপ শুনা যায়। বসন্তের মত শরতের হিংসাভাব প্রবল নহে। বসন্তের প্রণয় সুখ-তৃষ্ণ এবং কতকটা দেহবদ্ধ—সন্দেহ-ভয়ও তাই অধিক। বসন্ত-সুন্দরীর স্বভাবে সর্ব্বত্রই চাঞ্চল্য। শরতের কেমন একটী নববধূ-ভাব। তাহার প্রণয়ে গার্হস্থ্য সৌকুমার্য্য আছে। বসন্তের প্রণয়ে বিলাস-ঔদাস্য—কোথাও দাঁড়াইবার স্থান নাই। শরতের সহিত বসন্তের এইখানে বিশেষ তফাৎ। শরৎ প্রণয়ের দুয়ারে আপনাকে বলি দিয়া অমর। সে আর কিছু চাহে না। শরতের প্রণয়ে স্বাধীনতা—কাহাকেও আপনার অধীন করা তাহার উদ্দেশ্য নহে। সেই জন্যই বোধ করি তাহার কোকিল নাই, মলয় নাই, কুসুমশর নাই। এ সকল, তাহার তেমন আবশ্যক হয় না। সে বেদনায় আছে ভাল। তাহার সুখে কাজ নাই।

এই বেদনা দিয়াই শরতের কল্পনা এবং কবিতা-রচনা। বসন্তের মত শরতেরও গীতি কবিতা। কিন্তু তাহাতে একটী বিশেষ ম্লান বেদনাময় ভাব। শরতের হৃদয়ের মত তাহা গভীর এবং প্রশান্ত। বসন্তের কবিতা উচ্ছ্বাসময়ী—তরঙ্গে তরঙ্গে বহিয়া গিয়াছে; তাহাতে বিকশিত যৌবন, নবীন আবেগ, ফুল্ল প্রকৃতি, পূর্ণ কল্লোল। সে কবিতা মলয়-সমীরণের মত হুহু বহিয়া যায়, বাসন্তী জ্যোৎস্নার মত স্মৃতিতে ছাইয়া ফেলে, প্রবল বন্যার মত হৃদয় প্লাবিত করিয়া দেয়। শরতের কবিতা হৃদয়কে প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণে, বিহঙ্গ-কল্লোলে, নব যৌবনে বাহির করিয়া লইয়া যায় না। শরৎ জগৎকে অন্তরে আনিয়া দেখে। এই জন্য তাহার কবিতায় অনেক সময়ে চিন্তার গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। শরতে ভাব কেন্দ্রীভূত। এক একটী ভাব যেন মনের মধ্যে ঘনাইয়া ঘনাইয়া বাহির হইয়াছে। শরতের কবিতা বোধ করি অনেকটা সনেট ধরণের। বসন্তের কবিতায় কল্পনার অধীর প্রবাহ, বর্ণনার সুকুমার সৌন্দর্য্য। কচি কিসলয়ের বিকাশমান প্রথম শ্যামল আনন্দে, কুসুম-কোরকের মলয়-চুম্বিত মৃদু কনক-শিহরণে, জ্যোৎস্না-নিশির বিরহবিদ্ধ কাতর কোকিল-কূজনে বসন্তের কবিতা। শরতের কবিতায় ঝরা-ভাব, এত যৌবন-কল্লোল নাই।

শরৎ প্রকৃতির ভাব হইতে এক একটী ভাব ফুটাইয়া তুলে। বসন্ত প্রকৃতির উপর দিয়া বহিয়া যায়—কোথাও হৃদয় টুটিয়া, কোথাও সৌরভ লুটিয়া। এই জন্য বসন্তের ছন্দ দ্রুত এবং অনেক স্থলে তরঙ্গায়িত—মলয়-হিল্লোলে উঠিয়া নামিয়া চলিয়াছে। শরতের ছন্দ বসন্ত অপেক্ষা ধীর এবং নিয়মিত। ক্রমাগত উঠা নামা নাই—কতকটা একভাবে গড়াইয়া গিয়াছে। বসন্তের মত তাহার অনুপ্রাস জমে না, তরল ললিত শব্দও তত অধিক নহে। বসন্তে কত শব্দ, কত বর্ণ; বর্ণে বর্ণে, শব্দে শব্দে অনুপ্রাস। শরতের কবিতায় কঠিনতা বড় দেখা যায় না। তবে, কোমল হইলেও ঢল ঢল তরলতা শরতের কবিতায় অল্প। শরতের ভাব বিশুদ্ধ, কোমল, শান্ত। শরৎ-কবিতার তুলনা এক শরতের জ্যোৎস্নায়—শুভ্র বিমল রজত-অমৃতনিস্যন্দী। বসন্তের কবিতা সভ্রভঙ্গ, কনকদীপ্ত, যৌবন-ঢলঢল। অন্তর আপন যৌবন-উল্লাসে বাহির হইয়া প্রকৃতিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্য বসন্তের কবিতায় দীর্ঘ ক্রন্দন-বিলাপ শুনা যায়; শরতের নীরব রুদ্ধ-নিশ্বাস। শরতের ভাষা নীরবে বেদনাময়ী। শরৎ যত না বলে তত বেদনা ব্যক্ত করে। তাই বুঝি তাহার কাব্যে কেমন একটু অস্পষ্ট ছায়া-ছায়া ভাব।

শরতের স্মৃতিও অস্পষ্ট। তাহার স্মৃতিতে একটা আবছায়া যেন-কবে-কোথায়-কি ঘটিয়াছে। বসন্তের স্মৃতি বেশ স্পষ্ট—সেই কোন্ মদিরমিলনময়ী রজনীর অগাধ বিলাস-সুখ। বসন্ত সুখে ভোর। তাহার স্মৃতি অতীতের সুখ মন্থন করিয়া। শরৎ অতীতের দুঃখের মধ্যে আনন্দ উপভোগ করে, সুখে সুখে তাহার মন বিচরণ করিতে

পারে না। শরতের স্মৃতিতে একটা অস্পষ্ট দুঃখের ছায়া-সুখ; কোন্ বিরহ-রজনীতে এমনিতর ম্লান জ্যোৎস্না ফুটিয়াছিল, এমনিতর নিঃশব্দে ক্ষীণ-সৌরভে বাতাস মৃদু বহিয়াছিল, আকাশের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শুভ্র মেঘখণ্ড পানে চাহিয়া শরৎ সারানিশি বাতায়নে বসিয়া। বিস্মৃত স্বপ্নের মত সেই কুজ্ঝটি-অবগুণ্ঠিত নিশি ম্লান জ্যোৎস্নালোকে শরতের বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ে মৃদু ছায়া-কম্পনে ঈষৎ জাগিয়া উঠে। তাহাতে এই বর্ত্তমানে যেন সেই অতীতের আভাস। বসন্তের স্মৃতিতে কেবলই বিলাপ—সেই অতীতের মত সব হইল না কেন? বর্ত্তমানে অতীতের ছায়া অনুভব করিয়া বসন্ত সুখ পায় না, অতীতের মদির-সুখপানে চাহিয়া সে বিহ্বল।

কাব্যে এই স্মৃতি লইয়া বসন্ত ও শরতের ভাবের অনেক তফাৎ। বসন্তের কবিতায় পুরাতন দিনের যখন উল্লেখ দেখা যায় তখন সেই সুখ-বিলাপ। কোথা সেই অধরমিলিত চুম্বন-বিহ্বলতা, কোথা সেই সহচরীবেষ্টিত নিকুঞ্জ-মিলন? বর্ত্তমানে সে সুখ সম্পূর্ণ মিলিতেছে না কেন? শরতের কাব্যে পুরাতন দিনের উল্লেখ স্বতন্ত্র ভাবে। তাহাতে কি অতীতের সুখ-রজনীর কথা নাই? আছে, কিন্তু এতটা নয়। সে সুখও যেন দুঃখসিক্ত। যেন কবে বিদায়ের পূর্ব্বে দু'জনে কোথায় মিলিয়াছিল, সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, সঙ্গী কেহ নাই, দুটী ফোঁটা অশ্রুজলে দু'জনের নীরব প্রেমালাপ। এ মিলনে যেন কি অবসান-ভাব। শরতের কাব্যেও কেমন একটী ম্লান মধুর ভাব। তাহাতে সকল সময়ে যে বিস্তর দুঃখের কথা আছে তাহা বলা যায় না, কিন্তু সমস্ত ভাবে সেই বিষণ্ণ ম্লান পাণ্ডু-স্নেহ অভিব্যক্ত। শরতের কাব্যের মর্ম্ম-স্থলে বেদনা। এ বেদনায় সুখের তীব্র মদির-অধীরতা নাই, এ বেদনা বসন্তের বিরহবিদ্ধ বিলাপ-সুকণ্ঠ বিহঙ্গের নহে। শরতের শুকতারাই এ বেদনার নীরব প্রতিমা।

শরতের কাব্যে প্রেমের সুখ নাই, জ্বালা আছে। কিন্তু এ জ্বালায় জগতের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ পায় না। তৃপ্তি তাহার নাই—কোথা হইতে থাকিবে? সে জীবনে যাহা চাহিয়াছে তাহা পায় নাই—কিন্তু অতৃপ্ত বাসনার মধ্যেও এমন প্রশান্ত সহিষ্ণুতা। সহৃদয়তা শরতের কাব্যে বিশেষ প্রবল। এই জন্য বিজন বেদনায় শরতের কবিতা পাঠে মন অনেক সময়ে প্রশান্ত হইয়া আসে। যেন কোথায় কে আমার বিজন সহমর্ম্মী কাতর করুণ-কণ্ঠে আমারি হৃদয়-ব্যথা রজত-স্বরে গাহিয়াছে, অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রে কে যেন দূরে দূরে বহু স্বপ্নময়ী রজনী অতিবাহিত করিয়া তাহার নীরব সহানুভূতিতে আমাকে আহ্বান করিয়াছে। তাহার বেদনা আপন গভীর অন্তরের মাঝে অনুভব করিয়া হৃদয় ধীর। শরতের কাব্যে দুঃখ আছে, জ্বালা আছে, অতৃপ্তি এখানেও, কিন্তু খুঁৎখুঁৎ বড় নাই। শরৎ সহিতেই আসিয়াছে। দুঃখ আসে, সে সহিয়া যায়; সুখ আসে, সে সহিতে থাকে। এই জন্য শরতের কাব্যে সুখের প্রচণ্ড উল্লাস নাই, দুঃখের অনুনাসিক বিলাপ নাই।

বসন্তের কাব্যে প্রেম-জ্বালা প্রশান্ত নহে। তাহাতে অবিশ্রান্ত ছট্‌ফটানি। বসন্ত ক্রমাগত খুঁৎ খুঁৎ করিতে থাকে—তাহার কিছুতেই মন উঠে না, জগতের পরে একটু রাগও হয়। পরের শ্রী দেখিয়া বসন্ত অন্ধকারে থাকিতে পারে না। এই জন্য বসন্তে রূপচর্চ্চা খুব প্রবল। বসন্তের কাব্যে রূপের তরঙ্গ উঠিয়াছে। উপমারও প্রাচুর্ভাব। বসন্তের কবিতায় তুলনা করিয়া রূপ ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। নয়ন খঞ্জন জিনিয়া, অধর বিম্বফলকে লজ্জা দেয়, বাহুর সহিত মৃণালের তুলনা নিতান্ত দায়ে পড়িয়া। বসন্তে রূপ রস গন্ধ কূলে কূলে; কাব্যেও তাহাই।

এইবারে কাব্যালোচনা ছাড়িয়া শরৎ ও বসন্তের তুলনা শেষ করা যাক্। উভয়ের প্রেম এবং কাব্য আমরা তুলনা করিয়া দেখিলাম। তাহাতে স্বভাবও অনেকটা বুঝা গেল। শরৎসুন্দরী স্নেহময়ী গৃহিণী—প্রিয়জনের দর্শন বিরহেও নীরবে ম্লান মুখে কর্ত্তব্য সাধন করিয়া চলিয়াছে। তাহার রাগ নাই, ধীর স্বভাব, স্নেহ-গঠিত হৃদয়। বসন্ত সুন্দরী কিছু উতলা-প্রকৃতি। নবীন যৌবন এইরূপ হইয়াই থাকে। কিন্তু উভয়েরই প্রকৃতি কুটিল নহে। তবে দুঃখে ও সুখে দুই জনের চরিত্র স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। আমরা তাহা যথেষ্ট দেখাইয়াছি। বাকিটুকু পাঠকবর্গের উপরে নির্ভর করিয়া রাখিয়া দিতে পারি—তাঁহারা গড়িয়া লইবেন।

এখন প্রিয়-বারতা লইয়া বসন্ত বিরহী-হৃদয়ে ঘনাইয়া আসুক, শরৎ ধীরে ধীরে নিভৃতে নীরবে আপন বেদনা লইয়া ঝরিয়া যাক্।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরমহংস শিবনারায়ণ দেবের জীবন চরিত।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

দ্বারকাতীর্থের পাণ্ডাগণ শিবনারায়ণকে ছাপ দিতে চাহায় শিবনারায়ণ বলিলেন "এই স্থূল শরীর কি অপরাধ করিয়াছে? কেন অনর্থক তাহাকে দাগ দেওয়া। স্থূল শরীরকে দাগ দিলে বা না দিলে আমার সূক্ষ্ম শরীরের কি ক্ষতি বৃদ্ধি? যদ্যপি স্থূল শরীরে দাগ দিলে মুক্তি হয় তাহা হইলে ঘোড়া গরু প্রভৃতি যে সকল পশুদিগকে দাগ দেওয়া যায় তাহারা ত সকলেই মুক্ত। অনর্থক তোমরা কেন ভ্রমে পতিত হইতেছ ও প্রজাদিগকে ভ্রমে ফেলিয়া কষ্ট দিতেছ। যাঁহার নাম কৃষ্ণ ভগবান অর্থাৎ যিনি পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, তাঁহাতে যাঁহার ভক্তি শ্রদ্ধা নিষ্ঠা আছে তাঁহার স্থূল শরীরে

ছাপ লইবার প্রয়োজন কি? তাঁহার জ্ঞানরূপ ছাপ অন্তরে বাহিরে লাগান আছে। যে ব্যক্তি পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে বিমুখ হইবেন সেই ব্যক্তি এই ছাপ লইবার ইচ্ছা করিবেন।

শিবনারায়ণ দ্বারকানাথের সমস্ত অবস্থা দেখিয়া সমুদ্র পার হইয়া কচ্ছ ভুজ দেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কচ্ছ ভুজ হইতে আন্দাজ ৩০।৪০ ক্রোশ দূরে নারায়ণ সরোবর তীর্থ। সেই সরোবরে যাত্রীরা যাইয়া স্নান করে এবং বক্ষঃস্থলেও ছাপ লয়। ইহার পরিবর্ত্তে পাণ্ডারা মূল্য গ্রহণ করে। একটী পাণ্ডা এক যাত্রীর নিকট হইতে অন্য অন্য পাণ্ডা অপেক্ষা এক পয়সা বেশি পাইয়াছিল। ইহাতে অন্য পাণ্ডারা বলিল—"তুমি এক পয়সা বেশি পাইয়াছ তাহা হইতে আমাদিগকে ভাগ দেও।"

সেই পাণ্ডা বলিল—"তোমরা যখন বেশী পাইবে আমাকে ভাগ দিওনা। এক পয়সা এখন কি করিয়া ভাঙ্গাইব?"

অপর পাণ্ডারা একথা গ্রাহ্য করিল না—তাহারা বলিল—"ঐ পয়সার কড়ি ভাঙ্গাইয়া তাহা আমাদের অংশ করিয়া দাও।"

সে তাহাতে রাজি না হওয়ায় তাহার সহিত অন্য সকলের ঝগড়া বাধিল। গালাগালি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সকলে মিলিয়া তাহাকে মারিতে আরম্ভ করিল, মারিতে মারিতে সেই পাণ্ডাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিল এবং পয়সা কড়ি যাহা কিছু তাহার কাছে ছিল সে সমস্ত কাড়িয়া লইল। শিবনারায়ণ এই সমস্ত অবস্থা দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, যাঁহারা নারায়ণ সরোবরে দিবারাত্র বাস করিতেছেন এবং পূজা ও স্নান করিতেছেন তাহাদের তো এই অবস্থা, এককড়া কড়ির জন্য তাঁহারা মনুষ্যকে হত্যা করিতেছেন। যাত্রীরা আসিলে তাহাদের না জানি কি অবস্থাই ঘটে। যে জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরের নাম নারায়ণ সরোবর, সেই সরোবরে যে ব্যক্তি স্নান করিবেন তিনি সদা মুক্ত আনন্দ স্বরূপ থাকিবেন। বক্ষঃস্থলে ছাপ লইবার অর্থ, বিরাট পরব্রহ্মের আকাশরূপী বক্ষঃস্থল মধ্যে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ-স্বরূপের ছাপ দিবারাত্রি প্রকাশমান আছে। এই জ্যোতির্মূর্ত্তি ঈশ্বরের ছাপ রাজা প্রজাদিগকে বক্ষঃস্থলে অর্থাৎ হৃদয়েতে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক ধারণ করা চাই, তাহা হইলে সকল ভ্রম কষ্ট নিবারণ হয়।

পরে সেখান হইতে শিবনারায়ণ জাহাজে উঠিয়া সমুদ্র পার হইয়া সিন্ধুদেশে করাচি বন্দর সহরে যাইলেন। সেখান হইতে নগরঠাট্টা নামে এক গ্রামে যাত্রা করিলেন। এই গ্রামে সাধু সন্ন্যাসি যাত্রীগণ জল ও পাথেয় দ্রব্যাদি লইয়া সেথোর সঙ্গে উষ্ট্রের পৃষ্ঠে চড়িয়া হিংলাজ তীর্থ দর্শনে যাত্রা করে। নগরঠাট্টা হইতে হিংলাজ যাইতে এবং আসিতে ১২।১৪ দিন লাগে, পথি মধ্যে কেবল জঙ্গল এবং বালুকাময় মরুভূমি। যদিবা কোন স্থানে দৈবাৎ একটি গ্রাম পাওয়া যায় তাহাতে কেবল মুসল-

মানের বাস। সুতরাং যাত্রীরা যদ্যপি কেহ উষ্ট্রে চাপাইয়া জল ও খাদ্যাদি না লইয়া যায় তাহা হইলে কষ্টের পরিসীমা থাকে না।

হিংলাজ তীর্থে যাইয়া যাত্রীরা কি দর্শন করেন? সেখানে একটা ছোট কুণ্ড আছে; এবং তাহার নিকটে একটী মুসলমানের বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। যে দিবস যাত্রিদিগের সেখানে পৌঁছিবার কথা—সেই দিবস সেই বৃদ্ধা সেখানে একটা প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখে। দিবারাত্র সেই প্রদীপ জ্বলিতে থাকে। সেই খানে যাইয়া যাত্রীরা স্নানান্তে বিভূতি মাখিয়া সেই প্রদীপের জ্যোতি দর্শন, দান পুণ্য এবং আহারাদি করিয়া আবার সিন্ধুদেশে ফিরিয়া আইসেন। হিংলাজ তীর্থে যাত্রীগণ যাহা ব্যয় করে নগরঠাট্টার মোহান্ত তাহা গ্রহণ করে—এবং যে সেখো পথ দেখাইয়া লইয়া যায় আর সেই মুসলমান বৃদ্ধাকে তাহা হইতে কিছু ভাগ দিয়া থাকে।

শিবনারায়ণ কাহারও সঙ্গে যান নাই, একাকী যাইয়া সমস্ত দেখিয়া সিন্ধুদেশের মধ্যে হায়দারাবাদ সহর ঘুরিয়া আসিলেন। হায়দারাবাদ হইতে রোড়িশক্কর সহরে গিয়া দেখিলেন, সেখানে সাত ভেলা নামে একটি নদী আছে তাহার মধ্যে একটী ছোট দ্বীপে একটী ঘর নির্ম্মাণ করিয়া কতকগুলি ভেকধারী সাধু বাস করিতেছেন। তাঁহাদের ভেকের সহিত শিবনারায়ণের মিল না হওয়াতে এক জন মোহান্তের চেলা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল। শিবনারায়ণ নদী পার হইয়া ক্রমে ক্রমে মুলতান সহরে চলিয়া আসিয়া দেখিলেন, যে মুলতান সহরের নিকট যে কেল্লা আছে তাহার মধ্যে মুসলমানদিগের বড় বড় মস্‌জিদ আছে ও কেল্লার নিকটে হিন্দুদিগের একটা মন্দিরও আছে। সেই মন্দির মধ্যে প্রহ্লাদ, সুদামের এবং শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি স্থাপিত। সেই মন্দির পূর্ব্বে ছোট ছিল। হিন্দুরা তাহাকে বড় করিয়া নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলে মুসলমানেরা তাহাতে আসিয়া বাধা দিয়া বলিল, তোমরা বড় মন্দির তুলিও না, যদ্যপি তোমাদের মন্দির বড় কর তাহা হইলে আমাদের মস্‌জিদ ছোট দেখাইবে। তোমরা আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, আমরা তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তোমাদের পূজার স্থান ছোট এবং আমাদের বৃহৎ হওয়া চাই।

হিন্দুরা বলিল "যত দিন তোমাদের উপরে ঈশ্বরের কৃপা ছিল ততদিন রাজ্য ভোগ করিয়াছিলে এবং বড় বড় মস্‌জিদ তুলিয়াছিলে। এখন পরমেশ্বর আমাদের টাকা দিয়াছেন আমরাও বড় মন্দির তুলিব।" এই কথা বলিয়া হিন্দুরা মন্দির তুলিতে লাগিল। পরে অনেক মুসলমান একত্র হইয়া মন্দিরে আসিয়া গরু কাটিয়া একটা কূপে ও মন্দির মধ্যে ঠাকুরের কাছে ফেলিয়া দিল এবং সেখানে যত সাধু ছিল তাহাদিগকে ভয়ানক প্রহার করিতে লাগিল। সাধুরা প্রহারে অজ্ঞান হইয়া পড়িল এবং সেখানে যাহা কিছু ছিল মুসলমানেরা তাহা কাড়িয়া কুড়িয়া লুঠিয়া লইল। এক জন স্ত্রীলোক সেই স্থানের মোহান্ত ছিলেন, তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিবার জন্য মুসলমানেরা অন্বেষণ করিতে

লাগিল। কিন্তু সেই স্ত্রীলোক প্রাণ রক্ষার জন্য একটা অন্ধকার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে ধরিতে পারিল না। এই সকল ঘটনার কিছুক্ষণ পরে একথা হিন্দুরা শুনিতে পাইয়া গ্রাম হইতে দৌড়িয়া আসিল এবং মুসলমানেরাও অধিক পরিমাণে জুটিয়া আসায় উভয় দলে মারামারি হইতে লাগিল। কিন্তু সেই দেশে হিন্দুর ভাগ অতি অল্প এবং হিন্দুরা অতি ধীরপ্রকৃতি সেই কারণে মুসলমানেরা তাহাদিগকে অত্যন্ত প্রহার করায় হিন্দুদিগের মধ্যে হাহাকার রব উঠিল। একথা কোম্পানির পল্টনের মধ্যে খবর হওয়াতে অনেক সিপাহী হিন্দুস্থানী এবং পঞ্জাবী আসিয়া মুসলমানদিগকে মার ধর করিয়া তাড়াইয়া দিয়া হিন্দুদিগকে রক্ষা করিল, এবং উভয় পক্ষে আদালতে ফৌজদারী মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। ভগলপুরের মুসলমান নবাব এই কথা শুনিয়া আপনার রাজ্য মধ্যে গ্রামে সহরে হিন্দু প্রজাদিগকে নানা প্রকারে কষ্ট দিতে লাগিলেন এবং গরু কাটিয়া হিন্দুদিগের দোকানে দোকানে টাঙ্গাইয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। নবাবের হিন্দু চাকরদিগের বাসাতেও গোমাংস টাঙ্গাইয়া দিতে লাগিল; তাহাতে হিন্দু চাকরেরা চাকরী ছাড়িয়া দেশে দেশে পলাইতে লাগিল। এ সকল কথা শুনিয়া সাহেব হাকিম আসিয়া নবাবকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "যদি তুমি এই রকম দৌরাত্ম্য কর তাহা হইলে তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়া লাহোরে লইয়া যাইয়া কয়েদ করিব।" পরে যে কি কি ঘটনা হইয়াছিল তাহা শিবনারায়ণ জানেন না, কেননা শিবনারায়ণ এই পর্য্যন্ত দেখিয়া সেখান হইতে লাহোর চলিয়া আসিলেন।

শিবনারায়ণ স্বামী যখন সিন্ধু দেশ হইতে মুলতান প্রত্যাগমন করিতেছিলেন সেই সময় একজন শ্রীবৈষ্ণবও মুলতানে আসিয়া স্বামিজীর সহিত একত্রিত হইলেন। তাঁহার স্কন্ধে আন্দাজ ৩০। ৩৫ সের ওজনের বহু সংখ্যক ধাতু ও প্রস্তর নির্ম্মিত ঠাকুর এবং তদ্ব্যতীত তাঁহার প্রয়োজনীয় বাসন ও বস্ত্র ইত্যাদি ছিল। সেই সকল দ্রব্যাদি ঘাড়ে করিয়া তিনি দেশে দেশে পর্য্যটন করিতেন। সেই দুঃখ দেখিয়া শিবনারায়ণ তাঁহাকে সৎ উপদেশ দিতে লাগিলেন। কহিলেন,—হে মহাত্মা তুমি শুন এবং গম্ভীর ও শান্তভাবে বিচার করিয়া দেখ, তুমি যে ভেক ধরিয়াছ সেটা বোঝা ফেলিবার জন্য না বোঝা ধারণ করিবার জন্য ?

সাধু বলিলেন, হাঁ, বোঝা ফেলিবার জন্য ধারণ করিয়াছি।

শিবনারায়ণ বলিলেন, তবে তুমি অত বোঝা বহিয়া কেন কষ্ট পাইতেছ। উহার মধ্যে যা কিছু নিতান্ত দরকার তাহাই কেন রাখ না।

সাধু বলিলেন, মহারাজ আমার ব্যবহার্য্য থাল গেলাস বাটি লোটা কাপড় ইত্যাদি ইহাতে আছে। আর গুরু আমাকে যে সকল ঠাকুর দিয়াছেন তাহা এবং যে তীর্থে গিয়াছি সেই খানে ভাল ভাল ঠাকুর যাহা পাইয়াছি তাহাও ইহাতে আছে। এখন গুরুদ্বারে যাইব এবং এই সকল ঠাকুর তাঁহাকে দিব।

শিবনারায়ণ বলিলেন, গুরুকে সকল তীর্থের ঠাকুর দিবে ইহা ভাল কথা। কিন্তু বিচার করিয়া দেখ ঠাকুর কি বস্তু এবং তুমি কি বস্তু আর তুমি কি বস্তু হইয়া তুমি কোন্ বস্তু ঠাকুরকে পূজা করিতেছ। এই আকাশের মধ্যে এবং তোমার ভিতরে বাহিরে তোমা হইতে কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু আছেন? আপনা হইতে যে শ্রেষ্ঠ হয় তাহার সংগ্রহ করিতে হয় এবং তাহাকে পূজা করিতে হয়, কারণ তিনি জ্ঞান দিবেন, ইহাতে তুমি মুক্ত স্বরূপ হইয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবে। আর এই যে বস্তু তুমি ঘাড়ে করিয়া বহিয়া কষ্ট পাইতেছ ইহাত পিত্তল, তাম্র এবং পাথর, ইহাকে তো ঈশ্বর নির্ম্মাণ করিয়াছেন কেবল তোমাদের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য। তোমা হইতে সে শ্রেষ্ঠ, না তুমি তাদের হইতে শ্রেষ্ঠ। তুমি সৎ অসৎ সকল বস্তুকে বিচার করিতেছ অতএব তুমি সৎকে ধারণ কর এবং ভক্তি প্রীতি কর তাহা হইলে তুমি জ্ঞান পাইয়া মুক্ত স্বরূপ থাকিবে।

সাধু বলিলেন, মহারাজ, আমি এই ধাতু পাথরে ভগবান্কে কল্পনা করিয়া পূজা করিতেছি। শিবনারায়ণ বলিলেন, হে সাধু, যখন তুমি এই জড় পদার্থে ভগবানকে বিশ্বাস করিয়া পূজা করিতেছ তখন তুমি বিচার করিয়া দেখ যে তুমি প্রত্যক্ষ চেতন ষোলকলায় পূর্ণ আছ—তুমি আপনার অন্তরে তাঁহাকে না বিশ্বাস করিয়া আর উল্টা ধাতুতে বিশ্বাস করিতেছ। যখন ধাতু জড় পদার্থতে তিনি আছেন তখন তোমাতে কেন তিনি নাই? আপনার মধ্যে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে ভক্তি প্রীতি কর।

সাধু বলিলেন, আমি যেমন ঈশ্বরের স্বরূপ জড় পদার্থও তো তেমনি ভগবানের স্বরূপ? তবে তাহাতে পূজা করিলে কি দোষ!

শিবনারায়ণ বলিলেন, তাহা বটে, যত বস্তু দৃশ্যমান আছে সকলি তো তাঁহার স্বরূপ এবং তুমিও তো তাঁহারি স্বরূপ, কিন্তু বিচার করিয়া দেখ যে, যদিও গঙ্গাজল নর্দ্দামার জল স্বরূপে একই পদার্থ, কিন্তু তাহা বলিয়া কি আমি তোমাকে সেই নর্দ্দমার জল খাইতে বলিব? নর্দ্দমার জলে নানা প্রকার রোগ ইত্যাদি জন্মিবে আর গঙ্গাজলে তোমার পিপাসা নিবৃত্তি করিয়া তোমার শরীর মন সুস্থ রাখিবে। মাটি অন্ন ও বিষ্ঠা একই পদার্থ, তাই বলিয়া কি তোমাকে আমি মাটি ও বিষ্ঠা আহার করিতে বলিব, না অন্ন আহার করিতে বলিব? মূর্খ, চোর ডাকাইত ও পণ্ডিত মহাত্মা স্বরূপেতে একই, কিন্তু তাই বলিয়া মূর্খ, চোর ডাকাইতের মতন দুর্ব্বুদ্ধি না জ্ঞানী পণ্ডিত ও মহাত্মাদিগের ন্যায় সৎবুদ্ধি প্রার্থনীয়? আর প্রত্যক্ষ বিচার করিয়া দেখ তোমার শাস্ত্র বেদেতে সাকার ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ আছেন। ইহাও লেখা আছে আত্মা নিগুর্ণ জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সূর্য্যনারায়ণ বিরাট বিষ্ণু ভগবানের নেত্র ও চন্দ্রমাজ্যোতি মন, আকাশ. হৃদয়, বায়ু প্রাণ, জল তাঁহার নাড়ি ও পৃথিবী তাঁহার চরণ। এখন ভাবিয়া দেখ, যখন প্রত্যক্ষ

তোমার সাকার ব্রহ্ম আছেন তখন তুমি ইহাঁকে পূজা না করিয়া কাহাকে ভাবনা করিতেছ? সকল শাস্ত্রে ধ্যান ধারণার স্থানে এই তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপকে ধারণ করিতে লেখা আছে। অতএব এই তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপকে তোমার প্রেম ভক্তি দ্বারা ধ্যান ধারণা কর। ঐ তেজ জ্যোতি ভাবিতে ভাবিতে যখন তুমি এক স্বরূপ হইয়া যাইবে, তখন সহজে তুমি নির্গুণ পরব্রহ্মতে লয় পাইয়া আনন্দরূপ থাকিবে। এই তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের আত্মা গুরু মাতা পিতা। ইহাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি না করিয়া অনর্থক তোমরা দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। মিথ্যা পদার্থতে আসক্ত হইয়া বলহীন হইয়াছ। যে যে নামে উপাসনা কর না কেন কিন্তু এই তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপকে ধারণা করিয়া উপাসনা কর। আপনার স্বরূপ এবং আপনার ইষ্টগুরু অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু একরূপ ভাবিয়া ধ্যান ধারণা কর। যেরূপ পিতাপুত্র ভাব, পিতা হইতে পুত্র হইয়া স্বরূপে একই, কিন্তু সুপাত্র পুত্র কন্যার ধর্ম্ম এই যে মাতা পিতাকে ভক্তি প্রেম করা ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করা।

শ্রীবৈষ্ণব সাধু বলিলেন—যে ঠিক বলিতেছেন। মহারাজ, এরূপ আর একজন পরমহংস বলিয়াছিলেন কিন্তু বিশ্বাস হয় নাই। কিন্তু আপনার বলাতে আমার নিষ্ঠা বিশ্বাস হইয়াছে যে এই আকাশের মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপ ছাড়া আর তো কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। ইহাঁকে না বিশ্বাস করিয়া বৃথা ভ্রমেতে পতিত হইয়া বেড়াই। অতএব আপনি আমাকে কৃপা করিয়া কিছু দিন সঙ্গে রাখুন, যাহাতে আমার অজ্ঞানতা দূর হইবে। এত দিন এই যে সব পাথর ও ধাতু নির্ম্মিত ঠাকুর লইয়া বেড়াইতেছি ইহা এখন আমি কি করিব? অনর্থক এতদিন আমি বোঝা বহিয়া বহিয়া কষ্ট পাইতেছি।

শিবনারায়ণ বলিলেন যে, অন্তর্যামী তোমার অন্তরেতে প্রেরণ করাইয়া যাহা তোমাকে বিশ্বাস করান তাহাই তুমি কর।

সাধু বলিলেন মহারাজ, আমার তো এই বিশ্বাস ও বিচার আসিতেছে যে ইহার মধ্যে ভাল ভাল পাথরের ঠাকুর যা আছে সে সকল এই পুকুরেতে ফেলিয়া দেই।

শিবনারায়ণ বলিলেন যাহা তোমার মনে আইসে তাহাই কর। সাধু এই কথায় কয়েকটা মূর্ত্তি রাখিয়া আর সকলগুলা পুকুরেতে ফেলিয়া দিলেন, এবং সাকার ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হইলেন। কিছু দিন পরে সাধু শিবনারায়ণকে বলিলেন যে এই কয়েকটা পাথর যাহা লইয়া বেড়াইতেছি তাহাতে বড়ই কষ্ট বোধ হইতেছে। যখন আমার প্রত্যক্ষ সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ আছেন তখন অনর্থক আমি কেন এই গুলি বহিয়া মরি। কাপড়ে বাঁধিয়া এ সকল গাছে ঝুলাইয়া দেই, যাহার ইচ্ছা হয় লইয়া লইবে।

পরে সাধু তাহাই করিলেন এবং আবশ্যক মত রাখিয়া থাল ঘটী কাপড় প্রভৃতি অন্য যে সকল বোঝা ছিল তাহাও ক্রমে ক্রমে বিতরণ করিতে লাগিলেন। পরে শিবনারায়ণকে

করযোড়ে বলিলেন যে আপনাকে কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি যে আপনি এই মহাজাল হইতে আমাকে বাহির করিয়াছেন। এখন এই আশীর্ব্বাদ করুন যে সর্ব্বদা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতাতে যাহাতে ভক্তি প্রেম থাকে এবং উনি ভিন্ন অপর পদার্থ আমার হৃদয়েতে না ভাসে।

শিবনারায়ণ তাঁহাকে এবং তাঁহার কুল ও দেশকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, পূর্ণ পরব্রহ্মে যখন তোমার এরূপ প্রেম হইয়াছে ইহা হইতে অধিক সৌভাগ্য আর কি আছে।

শিবনারায়ণ লাহোর হইতে মুশুরি পাহাড়ে যাইয়া পাহাড়ের উপরে এক গাছের নীচে বসিয়া আছেন ও বৃষ্টি পড়িতেছে এমন সময় একজন শীক্ আসিয়া তাঁহাকে জলে ভিজিতে দেখিয়া বলিল, "মহারাজ আপনি কে, কেন এখানে বসিয়া ভিজিতেছেন, গ্রামের মধ্যে যাইয়া কোন ঘরের মধ্যে বসুন। শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি বন্য জন্তু, আমাকে গ্রাম্য জন্তরা স্থান দিবে না। দেখিলেই বিরোধ ঘটিবে।" শীক্ বলিল, "মহারাজ আপনি আমার সহিত আসুন, একজন উদাসীন মহাত্মার স্থান আছে, সেখানে আপনাকে রাখিয়া দিব, সুখে স্বচ্ছন্দে রাত্রি যাপন করিবেন।" শিবনারায়ণ তাহার সহিত বাজারের মধ্যে যে সাধুর স্থান আছে সেখানে উপস্থিত হইলেন। সাধুদিগকে বলিয়া দেওয়ায় তাঁহারা শিবনারায়ণকে থাকিবার জন্য স্থান দেখাইয়া দিলেন। শিবনারায়ণ কিছুকাল বসিয়া থাকিয়া পা ছড়াইয়া শয়ন করিলেন। তাহাতে সেইখানকার একজন সাধু মহাত্মা শিবনারায়ণকে গালি দিয়া বলিলেন "বেটা ওদিকে মহাত্মার সমাধি (কব্বর) আছে।" শিবনারায়ণ সে দিক হইতে পা ফিরাইয়া অপর দিকে রাখিলেন। সেই মহাত্মা বলিলেন, "বেটা দেখিতে পাইতেছিস না, ওদিকে যে গ্রন্থ সাহেব আছেন।" নানককৃত ধর্ম্মউপদেশের পুস্তকের নাম গ্রন্থ সাহেব। শিবনারায়ণ অন্য দিকে পা ছড়াইয়া শুইলেন। সাধু বলিলেন, "ওদিকে মোহান্ত সাহেবের বসিবার সিংহাসন আছেন। তুই বেটা কোথাকার বোকা, দেখিতে পাস্ না?" শিবনারায়ণ সেদিক হইতে পা ফিরাইয়া অপরদিকে রাখিলেন। তখন যেই সাধু রাগ করিয়া মারিতে উঠিলেন। বলিলেন, "বেটা তুই দেখিতে পাইতেছিস্ না ওদিকে গ্রন্থ সাহেবের চৌকি আছেন। ঐ চৌকিতে রাত্রি ১০ টার পর গ্রন্থ সাহেবকে শয়ন করাইতে হয়, বেটা এখান হইতে ওঠ, এখান হইতে দূর হইয়া যা।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "ভাই বল পা টা কোথায় রাখিব, দাঁড়াইয়া থাকিব না পাটা আকাশে তুলিব। এবং তোমরা কোন্ দিকে পা করিয়া শয়ন কর?" সাধু বলিলেন "বেটা আমার সহিত তর্ক করিতেছিস্! আমরা যখন গ্রন্থ সাহেবকে এদিক হইতে ও দিকে চৌকির উপরে শয়ন করাইয়া দিই তখন এদিকে আমরা পা করিয়া শুই।" শিবনারায়ণ বলিলেন,বেস্ তোমরা সেই প্রকারে শয়নকর তাপর আমি শুইব।" শিবনারায়ণ মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে ইহারা নিরাকার পূর্ণ পরব্রহ্মকে

মানে,কিন্তু এমন জড়ীভূত পশু হইয়া আছে যে এ বিচার নাই যে নিরাকার পরব্রহ্ম কোন স্থানেতে আছেন এবং কোন্ স্থানেতে নাই, কোন্ দিকে আছেন কোন্ দিকে নাই, এবং কোন্ বস্তুতে আছেন, কোন্ বস্তুতে নাই। তিনি পায়ের মধ্যেও আছেন এবং গ্রন্থ সাহেব অর্থাৎ পুস্তক কাগজ কালীর মধ্যেও আছেন। উত্তম মধ্যম সকল স্থানেই তিনি পরিপূর্ণ আছেন এবং সকলই তিনি—এই ভাব না বুঝিয়া ইহারা পশুতুল্য হইয়া আছে। প্রত্যক্ষ চেতনকে এদিক ওদিক পা করিতে দিতেছে না। পুস্তক কাগজ কালী এবং মৃত দেহ যাহাকে পুতিয়া রাখাতে মাটি হইয়া গিয়াছে এই সকল মিথ্যা বস্তুকে শ্রেষ্ঠ গুরু বলিয়া মান্য করিতেছে, এবং প্রত্যক্ষ সত্য যে চৈতন্য, যিনি সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া অপমান করিতেছে। এই জন্যই রাজা প্রজা এবং সাধুরা বলহীন তেজোহীন শক্তিহীন হইয়া সকল বিষয়ে পরাধীন হইয়া আছে, কষ্টের পরিসীমা নাই এবং তাহাতেও জ্ঞান হইতেছে না, অহংকারে মত্ত হইয়া সকলে পশুবৎ হইয়া আছেন। কিন্তু কি করিবেন কেহ স্ববশে নাই। নেত্র থাকিতেও অন্ধকার ঘরে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, এইরূপ অজ্ঞানাবস্থা থাকিলে কিছুই বোধাবোধ থাকে না ও কিছুই দেখিতে পায় না। পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুকে চিনিতে পারে না এবং আপনাকেও জানিতে পারে না যে আমি কে?

পরে সেখান হইতে শিবনারায়ণ ঐ প্রকার অপর এক উদাসীন সাধুর স্থানে গিয়া দেখিলেন যে সেখানকার মহাত্মা গ্রন্থ সাহেবের সম্মুখে একটী কলসী পুতিয়া রাখিয়াছেন এবং সেই কলসীর তলায় একটী ছিদ্র করিয়া একটী সরু নর্দ্দামার সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন। কলসীটী মাটির ভিতর এরূপ ভাবে পোঁতা যে কেহ সহজে আসল ব্যাপার না জানিতে পারে। কলসীর মুখে একটী তাম্র পাত্র তাহার উপর একটী ঘটি। দেখিলে মনে হয় এই ঘটি কেবল মাত্র মাটির উপর বসান আছে। সেই ঘটিরও তলায় একটী ছিদ্র। সেই ছিদ্র সহজে বন্ধ করিবার জন্য এরূপ উপায় করিয়া রাখিয়াছে যে কেহ কোন প্রকারে টের না পায়। যাত্রীরা সেই গ্রন্থ সাহেবকে দর্শন করিতে যাইলে গ্রন্থ সাহেবের জন্য সরবৎ ও মোহনভোগ লইয়া যায়। মহাত্মারা যাত্রীদের হস্ত হইতে সরবতের ঘটি লইয়া ঘটির মধ্যে ঢালিয়া দেন। এবং যাত্রীদিগকে বলেন যে নিরাকার নানক জি খাইয়া ফেলিলেন। মহাত্মা যে যাত্রীকে কিছু ধনী বলিয়া বোধ করেন তাঁহার কাছে কিছু অর্থ লইবার অভিপ্রায়ে সেই কৌশলযুক্ত ঘটীর ছিদ্র বন্ধ করিয়া সেই যাত্রীর সরবৎ ঐ ঘটীর মধ্যে ঢালিয়া দিয়া বলেন, "তোমাতে পাপ আছে সেই কারণে তোমার সরবৎ নিরাকার নানক বাবা খাইলেন না। তুমি দশ কুড়ি টাকা গ্রন্থ সাহেবকে দান কর তাহা হইলে তোমার সকল পাপ উনি মোচন করিয়া সরবৎ পান করিবেন। যাত্রীরা এই কথা শুনিয়া যথাসাধ্য ক্ষমতানুসারে দশ পাঁচ টাকা দান করে। যখন যাত্রীরা দান করিতে থাকে সেই সময় সেই ঘটির ছিদ্রটী কৌশলের দ্বারা খুলিয়া দেয় এবং সেই সরবৎ

ঘটি হইতে কলসীর মধ্যে পড়িয়া যায় এবং কলসী হইতে মর্দ্দমার গিয়া অপর কোন পাত্রে যাইয়া পড়ে। সেই সাধু তখন যাত্রিদিগকে ঘটি দেখাইয়া বলেন, "দেখ নানক বাবা তোমার সরবৎ খাইয়া ফেলিলেন। তোমার অতি সৌভাগ্য" যাত্রীরা তাহা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হয়।

যাহারা মোহনভোগ লইয়া যায় তাহাদের মোহনভোগের উপর কৌশল দ্বারা তামা হাতের পাঁচটী অঙ্গুলির ছাপ পড়ে। মহাত্মা বলেন, "নানক বাবা তোমার মোহনভোগের উপর ছাপ দিয়া দিয়াছেন।" যাত্রীরা শুনিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করে। তবে যাত্রীর নিকট টাকা আদায় করিতে হইলে এস্থলেও পূর্ব্বমত কৌশল অবলম্বনে প্রথমে টাকা আদায়, তারপর ছাপ। রামসিং নামে একজন শিক অতি বুদ্ধিমান ছিলেন। বহু দিবস পরে তিনি সাধুদিগের এই সকল চাতুরী জানিতে পারিয়া অপর দুই চারি জন শিকের সহিত মিলিয়া তাহাদের সেই সকল মিথ্যা চাতুরী তুলিয়া দিলেন ও তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন যে, তোমরা পুনরায় এরূপ করিও না। সেখানে গুরুমুখ সিং নামে এক-জন বুদ্ধিমান মহাত্মা শিক ছিলেন। তিনি শিবনারায়ণকে বলিলেন, মহারাজ, আমাদের হিন্দুদিগের মধ্যে তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি যে কত প্রকার ছল কপটতা প্রয়োগ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে তাহার সীমা নাই, তাহাদের মনুষ্যের উপর কিছুমাত্র দয়া ধর্ম্ম নাই।

ক্রমশঃ।

সমাজ ও সমাজ-সংস্কার।

জীব ও তরু অঙ্কুর কালে অতি সরল অবস্থায় থাকে, কিন্তু বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে ঐ সরল পদার্থটী ক্রমে যেরূপ দুই চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অবয়ববিশিষ্ট একটী জটিল পদার্থ হইয়া উঠে, সেইরূপ মানব সমাজও অভ্যুদয়কালে এক এক পরি-বারে গঠিত হইয়া ক্রমে উহার বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন বহু পরিবারের সমষ্টি সম্পন্ন একটী বিপুল ও জটিল সমাজগৃহ প্রস্তুত করে।

মানবজগতে বিবাহ যেমন পরিবারের মূল, সেইরূপ ঐ সমাজগৃহ সকল জাতিরই ভিত্তি স্বরূপ। ভিন্ন ভিন্ন জাতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রথানুসারে ঐ ভিত্তি গাঁথিয়া থাকেন, কিন্তু সকলের উদ্দেশ্য একই—কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট রীতিনীতির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পরি-বারবর্গকে এক সূত্রে গ্রথিত রাখা। যে সমাজের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার যত বহু সংখ্যক ও অলঙ্ঘনীয় ব্যবস্থায় আবদ্ধ, সে সমাজগৃহ তত দৃঢ় ও সংকীর্ণ; আর যে

জাতির সমাজ অধিকতর উন্মুক্ত ও প্রশস্ত, তাহার সভ্যেরাও তদনুরূপ বিশুদ্ধ ও মার্জিত। শিশুর জন্মমাত্র ডাক্তারেরা তাহাকে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত গৃহে রাখিতে বলেন, ঐ উপদেশ অগ্রাহ্য করিলে শিশুর যে পীড়া বা প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা, তাহা সকলেই জানেন। সেইরূপ কোন জাতিকে মানসিক সুস্থতা ও সবলতা প্রদান করিতে হইলে তাহাদের সমাজগৃহকেও মধ্যে মধ্যে কালোপযোগী সুসংস্কার দ্বারা পরিষ্কার ও মার্জ্জিত করা আবশ্যক। এই স্বাভাবিক বিধানে অবহেলা করিলে উহার সভ্যেরা যে পীড়িত ও কালে বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা, তাহাও কেহ অস্বীকার করিবেন না।

ভিন্ন দেশের ভিন্ন স্বভাবাপন্ন মানুষ হইতেই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে, কিন্তু স্বতন্ত্র রূপ সমাজ ব্যবস্থাই ঐ সকল ভাল মন্দ মানুষ এবং তাহাদের বিভিন্ন অবস্থা গঠনের হেতু। সে জন্য এ জগতে আমরা কেবল সামাজিক রীতিনীতির দ্বারাই নানা জাতিকে সভ্য, অসভ্য, মার্জিত, বর্ব্বর—নাম দিয়া থাকি। আর মানুষ কেবল ঐ সমাজ বন্ধনের দ্বারাই প্রথম হইতেই সকল জন্তুর উপরে উঠিয়াছে। যে জাতির সমাজ ব্যবস্থা যত নিকৃষ্ট আচার ব্যবহারে তাহারা পশুদের তত নিকটবর্ত্তী, আর যে লোকের সামাজিক জীবন যত উৎকৃষ্ট তাহারা তদনুরূপ শ্রেষ্ঠতর জাতি। সমাজ ব্যবস্থায় অষ্ট্রেলিয়ার বুস্‌ম্যানেরা ওআফ্রিকার পশ্চিমভাগস্থ কয়েকটী জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অসভ্য ও অমার্জ্জিত; আর ইউরোপের নরওয়েজিনরা সকলের অপেক্ষা উন্নত ও মার্জিত। এই উচ্চতম ও নিম্নতম দুইটী মানব জাতিকে মিলাইয়া দেখিলে, ঐ দুই প্রকার জীবনে কত প্রভেদ, তাহা আমরা সম্যকরূপে বুঝিতে পারি। একটীতে স্ত্রী পুরুষ, ধনী দরিদ্র, শিক্ষিতাশিক্ষিত, সকলেই কেমন সমানভাবে নিজ নিজ স্বত্ব ও অধিকার ভোগ করিতে পায়, ও তাহাদের জীবন কত প্রশস্ত, উন্নত ও শান্তিময় দেখা যায়। অপরটীতে পরস্পরের মধ্যে পশুদের মত নিজ নিজ খাদ্যসামগ্রী ও বাসস্থান লইয়া অনবরত বিবাদ বিসম্বাদ যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়া থাকে, আর স্ত্রীলোক, বালক ও দুর্ব্বলেরা অপেক্ষাকৃত বলবানদিগের ভয়ে সর্ব্বদা ভীত ও ত্রস্ত থাকে।

নরওয়েবাসীদিগের উন্নত রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা অনুসারে স্ত্রী পুরুষ সবল দুর্ব্বল, সকলেই সমস্ত বিষয়ে সমান স্বত্ব ও ক্ষমতা ভোগ করে, পরস্পরের সাহায্য করে ও সমান ভাবে সাধারণ কার্য্যে সহায়তা করে। উহাদের মধ্যে জাতিভেদ শ্রেণীভেদ বা ধনী দরিদ্রের বিভিন্নতা না থাকাতে সমাজের সকল লোকই সংসারে যেরূপ এক প্রকার মান্য ও অধিকার পায়, সেইরূপ সাধারণ কার্য্যেও তাহাদের সমান ক্ষমতা ও অধিকার। ঐ দেশে কেহ কাহারও দাসত্ব করে না, কেহ কাহারও প্রত্যাশী নহে; সকলেই এক প্রকার স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও আত্মনির্ভর। উহাদের সংসার অতি মার্জ্জিত, সুশৃঙ্খল ও আনন্দময়। অন্যদিকে আফ্রিকার কোন কোন অসভ্য জাতি ও অষ্ট্রে-

লিয়ার বুসম্যানের মধ্যে স্বত্বজ্ঞান ও সমাজ ব্যবস্থা নাই বলিলেই হয়। তাহাদের সমাজ কেবল এক এক পরিবার লইয়া গঠিত, আর ঐ আত্মীয় স্বজনের মধ্যেও প্রকৃত একতা বা সহানুভূতি দেখা যায় না। উহাদের পরস্পরের যত স্বত্ব ও অধিকার কেবল নিজ নিজ বাহু বলানুসারেই রক্ষিত বা লুণ্ঠিত হইয়া থাকে। বড় ভাই রুগ্ন বা অক্ষম হইলে ছোট ভাই তাহাকে মারিয়া তাহার সম্পত্তি লইতে পারে; কোন বলবান যুবক নিজে ইচ্ছামত একজন স্ত্রীকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে বিবাহ করিতে পারে; আর সুবিধা পাইলে প্রতিবাসীদিগের উপর শত্রুতা ও অত্যাচার করিতেও তাহারা ছাড়ে না। অবশ্য, সংসারে এমন কোন জাতি নাই, যাহাদের মধ্যে ঐ রূপ পশুভাব একেবারে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু পারিবারিক ও সমাজিক শিক্ষানুসারে সভ্য জাতির লোকেরা ঐ সকল মন্দ ইচ্ছা বা বাসনাকে দমন করিয়া রাখিতে শিখে; আর অসভ্য জাতিরা প্রকৃত সামাজিক বন্ধন ও ব্যবস্থার অভাবে অনায়াসে ঐ সকল মন্দ অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া পশুতুল্য নানা জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। আর দৃঢ় সমাজ বন্ধন নাই বলিয়াই আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসীরা অন্যান্য জাতির সংস্রবে আসিয়া একে একে বিলুপ্ত হইতেছে।

অতীত ও বর্ত্তমান সকল জাতির সামাজিক ইতিহাস খুঁজিলে আমরা ঐ রূপ জাতি নিঃশেষের কত প্রমাণ পাই, উহা দ্বারা ইহাই আমাদের স্পষ্টরূপে প্রতীতি জন্মে যে জগতের গতির সঙ্গে মানব অবস্থার যেমন নিরন্তর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, সেইরূপ তাহাদের সমাজগৃহও সময়ে সময়ে সংস্কৃত ও পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত; নতুবা একটী বর্দ্ধনশীল শিশুকে যেমন একটী ছোট দোলায় বরাবর শোয়াইয়া রাখিলে সময়ে তাহার হাত পা বাঁকিয়া সে নুলো বা খোঁড়া হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা, সেইরূপ সমাজগৃহের উপযুক্ত প্রশস্ততার অভাবে কালে তাহার সভ্যেরাও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হারাইয়া একটী অকর্ম্মণ্য জাতিতে পরিণত হইবে; আর ঐ পতনের সঙ্গে সঙ্গে অবশেষে সে জাতিরও লোপ পাইবার সম্ভাবনা।

বলা বাহুল্য, য়িহুদীদের বাদ দিলে সমস্ত জগতের মধ্যে হিন্দুজাতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, আর তাঁহাদের সমাজ ব্যবস্থা অতি পুরাতন ও সুশৃঙ্খল। সেই কারণে ঐ অলঙ্ঘনীয় সমাজ প্রথা হইতেই নানা প্রকারের অসংখ্য ঝড় ঝপ্পাট, অত্যাচার ধাক্কা খাইয়াও হিন্দুজাতি এখনও ভারতবর্ষে বিরাজমান। হিন্দুদের প্রাচীন অভ্যুদয় হইতে এখন পর্য্যন্ত কত জাতি উঠিল ও নামিল; কত পুরাতন জাতি সমূলে নির্ম্মূল হইল, কিন্তু হিন্দু নাম এখনো সমস্ত সংসারে জীবিত রহিয়াছে। আমরা আপন ধন, মান, দেশ, যশ—সমস্তই হারাইয়াছি, তথাপি পৃথিবীতে হিন্দুর নাম কেবল আমাদের অখণ্ড্য ও সুশৃঙ্খল সুসম্পন্ন সমাজ ব্যবস্থা হইতেই এখনো সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতেছে। যে দিন যে পাষণ্ড ভারতের অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় অমাদের সমাজকেও বিদে-

শীর হস্তে সমর্পণ করিবে, সে দিন এই প্রাচীন আর্য্য নাম এ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে।

মানব সমাজ অতি সূক্ষ্ম প্রাসাদ, উহা একবার দৃঢ়রূপে গঠিত হইলে উহাকে ভাঙ্গিয়া পুনরায় বনিয়াদ হইতে গাঁথা নিতান্ত সহজ নহে ; আর উহার উপর অপরিচিত জাতির হস্তক্ষেপ বা গবর্ণমেণ্টের আইন চালনাও খাটে না। আমাদের সমাজ এরূপ সূক্ষ্ম অথচ দৃঢ়রূপে গ্রথিত বলিয়াই সমাজ সংস্কারকেরা উহার প্রকৃত সংস্কার করিতে গিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িতেছেন। আর গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ, বাল্য বিবাহ সম্বন্ধে পক্ষে বিপক্ষে আইনজারি করিলেও সে সব পাথরের ঘরে নুড়ি মারার মত ঠিক্‌রে পড়িয়া ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। এখন দেখা উচিত ঐ সব সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা যখন প্রস্তুত হইয়াছিল তখন হিন্দুরা কিরূপ ছিলেন, আর এখনই বা তাঁদের কি অবস্থা। মহর্ষি মনু যে দুচার শ নয়—প্রায় দুহাজার বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুদের জন্য সমাজ ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন—তাহা ভুলিয়া গিয়া অনেকে বলেন, ‘হিন্দুরা সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ঐ সামাজিক আইন অনুসারে একভাবে জীবন কাটাইয়া আসিতেছেন, সে জন্য তাঁদের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই, সুতরাং সমাজ সংশোধনেরও আবশ্যকতা নাই।” কিন্তু তাঁহারা একটু চোক খুলিয়া চাহিলেই দেখিতে পাইবেন যে প্রাচীন কালের সঙ্গে প্রাচীন হিন্দুরাও তাঁহাদের রুচি, ইচ্ছা বাসনাদি সব লোপ পাইয়াছে ; আর আধুনিক আসিয়া ও ইউরোপীয় অধিবাসীদের মধ্যে যত প্রভেদ,—এমন কি, আকাশ পাতালে যত বিভিন্নতা দেখা যায়—অতীত ও বর্ত্তমান হিন্দু জাতির মধ্যে তাহা অপেক্ষাও অধিক অসাদৃশ্য ঘটিয়াছে। কেননা, আকাশ পাতালের প্রভেদ বাহ্যিক, আর প্রাচীন ও আধুনিক হিন্দুদের ভিন্নতা আন্তরিক। আসিয়িক ও ইউরোপীয়দের বিভিন্ন অবস্থার কারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক, কিন্তু এই দুই কালের হিন্দুজাতির বিভিন্নতা রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক।

উন্নতি প্রতিরোধক বিজ্ঞেরা ঐ মহা প্রভেদে অবহেলা পূর্ব্বক হিন্দু সমাজকে ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় রাখিতে চাহেন বলিয়াই উহার সভ্যদের মধ্যে আমরা এত বিশৃঙ্খলা ও শোচনীয় ঘটনা দেখিতে পাই। ছেলেরা যেমন দিবারাত্রি অযথা শাসনে থাকিলে চুরী করিয়া সন্দেশ খায় ও লুকিয়া খেলানা ভাঙ্গে ; হিন্দু যুবকদের মধ্যে আমরা সেইরূপ অনেক কুসংস্কার সচরাচর দেখিয়া থাকি। কিন্তু প্রতিরোধকেরা যতই চেষ্টা পান না কেন—সময় ও অবস্থা ভেদে তাঁহাদের সে প্রয়াস কতকটা বিফল হইবেই হইবে। এই কারণে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, যে সকল সামাজিক ও গার্হস্থ্য আইন হিন্দু রাজ্যে প্রাচীন কালের সরল হিন্দুদের পক্ষে অতি উত্তমরূপে খাটিত, মুসলমানদের কালে সে সকল অনুপযোগী হইয়াছিল, সুতরাং সে সময়ে দেশের অবস্থা অনুসারে হিন্দুরা নিজ নিজ পরিবার ও সমাজে দুচারটী নূতন রীতি নীতি চালাইয়া উহাকে সেইকালের

উপযুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। সেইরূপ যে সব সামাজিক প্রথা ও আচার ব্যবহার মুসলমান রাজত্বকালে ভারতবর্ষীয়দের জন্য আবশ্যকীয় --আমি বলিতেছি না যে উত্তম— হইয়াছিল, শাসনের ও সভ্যতার পরিবর্ত্তন বশত এখন সে সমস্ত অনাবশ্যক ও অপকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কোন প্রকৃত দেশহিতৈষী এ প্রভেদ অস্বীকার করিতে পারেন না! সুতরাং আমরা কেবল বহিরাকারে—হায়! তাও বুঝি কোন্ দিন চলিয়া যাইবে!—সেই প্রাচীন মহাত্মা আর্য্য জাতির অনুসরণ করিয়া চলিলেও শত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিবর্ত্তন আমাদের অন্তর্গত হইয়া আমাদিগকে তাঁদের ঠিক বিপরীত করিয়া তুলিয়াছে। এখন আমরা কয়জন ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন প্রাতে বেদাধ্যয়ন করিতে দেখি? আর কয় জনই বা গার্হস্থ্য ধর্ম্মের পর বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন? কয়জন হিন্দু যথার্থ জ্ঞান ও বিদ্যায় পারদর্শী? কয়জন যুবক হলুদমাখা ও উল্কীপরা স্ত্রীলোককে স্ত্রী বা ভগিনী বলিতে ইচ্ছুক? কয়জন ভদ্রলোক বিঘে দশ জমি ও গোটাকতক বলদ লইয়া সন্তুষ্ট থাকেন? কয়জন হিন্দু ছেলেদের ইস্কুলের বদলে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে পাঠাইতে রাজি হন? আর কয়জন পিতাই বা পুত্র কন্যাদের শিক্ষিত করিয়া উপযুক্ত বয়সে বিবাহ দেন?— তবে আমরা যখন সমাজের সভ্যদের মধ্যে, ভাল হোক, মন্দ হোক, এত মনের পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, তখন তাঁদের সমাজগৃহকে কিরূপে সেই পূর্ব্বের ন্যায় অপরিবর্ত্তিত ও স্বল্পায়তন রাখা যাইতে পারে? অবশ্য, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ও দাক্ষিণাত্যের হিন্দুদের বাঙ্গালীদের মত এত দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটে নাই; তাছাড়া, তাঁদের সামাজিক দুচারটী রীতি—স্ত্রীদের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা ও বিবাহের পর বালিকা ও বালক স্ত্রীপুরুষের সহবাস নিষিদ্ধ—প্রভৃতি কয়েকটী রীতি বঙ্গসমাজের অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট ও মার্জ্জিত; সে জন্য বঙ্গসমাজের ন্যায় তাহাদের সমাজ এখনো ততটা বর্ত্তমান সভ্যদের অনুপযুক্ত হয় নাই ও বঙ্গযুবকদের ন্যায় অন্যান্য স্থানের হিন্দুরা সেরূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছেন না।

আমাদের বঙ্গদেশের বর্ত্তমান কালের ন্যায় পারিবারিক অন্তর্বিবাদ, পরস্পরের হিংসা, শত্রুতা, মিথ্যাড়ম্বর, শিক্ষার ও ধর্ম্মের ভান, অসার বাবুয়ানা ও ঘৃণিত বিলাস প্রভৃতি যে সব জঘন্য আচার সর্ব্বত্র, গ্রামে, নগরে, ছোট বড় সকল সংসারে দেখা যায়, এরূপ আর কোন সভ্য দেশে দৃষ্টিগোচর হয় না। সে জন্য আমরা দিন দিন বাহ্যিক রূপে মার্জ্জিত ও সভ্য হইলেও কার্য্যতঃ যে প্রত্যহ ও প্রতিকর্ম্মে অমার্জ্জিত ও বর্ব্বর লোকদের কাছে ঘেঁসিতেছি তাহা দেখিলে কোন্ স্বদেশভক্ত লোকের হৃদয় না দগ্ধ হয়? অনেকে বলিবেন, উহা আমাদের সমাজের এই দুরবস্থার একমাত্র কারণ নহে। উহা একমাত্র কারণ নহে সত্য, কিন্তু উহাই প্রথম ও প্রধান কারণ। কেহ কেহ বলিতে পারেন, নীতিজ্ঞান অভাবে বা পৌত্তলিক ধর্ম্মবশত 'আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি; কিন্তু চারিদিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা বোধ হয়,

না। কেন না, আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের অনেক অবনতি হইলেও উহার ন্যায় নীতিজ্ঞান শিক্ষা দিবার ধর্ম্ম ও সাধারণ হিন্দুদিগের ন্যায় ধর্ম্মনীতিশীল লোক পৃথিবীতে অতি অল্পই দেখা যায়। আর যদিও হিন্দুধর্ম্ম কুসংস্কারময় ও জাতীয় উন্নতির পক্ষে মহা বাধা; তথাচ আমাদের সমাজ ব্যবস্থা যদি ভাল হইত তাহা হইলে ঐ পৌত্তলিক ধর্ম্মে আসক্তি ও শঠ পুরোহিতদের প্রভাব অল্পদিনের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইত।

ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন প্রভৃতি কয়েকটী ইউরোপীয় দেশের রোমান কাথলিক ধর্ম্ম বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম হইতে অধিক কুসংস্কার শূন্য নহে; হিন্দুরা যেমন রামকৃষ্ণ ইত্যাদিকে ঈশ্বরের অবতার ভাবিয়া নানা দেবদেবীর পূজা করেন, কাথলিকরাও সেইরূপ নানা লোককে ঈশ্বরের চর বা দূত ভাবিয়া তাঁহাদের আরাধনায় আসক্ত হন। বিশেষ হিন্দুদের পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রন্থে যেরূপ অসম্ভব ঘটনা ও কাণ্ডের বর্ণনা আছে, খৃষ্টানদের বাইবলও সেইরূপ অনেক অনেক অদ্ভূত ও অলৌকিক গল্পে পূর্ণ। তবে এক ধর্ম্মাবলম্বীরা মন হইতে অধিকাংশ কুসংস্কার তাড়াইয়া অপেক্ষাকৃত অনেক উঁচুতে উঠিয়াছেন, আর অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা একেবারে নীচে পড়িবার যো হইয়াছেন—ইহার কারণ কি? আমার মতে ঐ ভিন্ন ভিন্ন জাতির উন্নত অবনত অবস্থার কারণ—স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থা। সেই কারণে, আমার মনে হয় আমাদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা দূর করিতে হইলে আগে আমাদের সমাজ গৃহের সংস্কার ও সংশোধন করা প্রধান কাজ। নতুবা যতদিন হিন্দুসমাজ পক্ষপাতী ও কেবল অর্দ্ধেক অধিবাসী লইয়া গঠিত আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জাতি উপজাতিতে বিভক্ত থাকিবে; যতদিন উহা পাপাচারী কুলাঙ্গার পুরুষদের নিঃশব্দে ক্রোড়ে স্থান প্রদান করিবে; আর যতদিন একজন নরাধম লোক হাজার হাজার কুলস্ত্রীর সর্ব্বনাশ করিয়া অর্থের বলে সমাজের চূড়ামণি হইয়া বসিবেন; আর অন্যদিকে একজন যথার্থ ধর্ম্মভীরু পিতা বিধবা যুবতী কন্যাকে পাপ প্রলোভন হইতে রক্ষার অভিপ্রায়ে তাহাকে আবার বিবাহ বা উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া পুনরায় সংসারে শিক্ষয়িত্রী কাজে পাঠাইলে সমাজ তাঁহার প্রতি খড়্গাহস্ত হইয়া উঠিবে, যতদিন কোন নূতন ভাল রীতিনীতি সমাজে প্রবেশ করান ভার হইবে—ততদিন আমাদের মধ্যে প্রকৃত একতা, প্রকৃত সভ্যতা, প্রকৃত বল ও প্রকৃত তেজ কিছুই আসিবে না।

হিন্দুসমাজের অনেক মন্দ রীতিনীতিই যে বর্ত্তমান হিন্দু যুবকের ধর্ম্মজ্ঞান ও চরিত্র বলের পক্ষে প্রধান শত্রু স্বরূপ হইয়াছে-তাহারও কোন সন্দেহ নাই। নহিলে, বিদ্যালয়গামী বালকদের মনে যে অধ্যবসায়, সাহস, ও কর্ম্মশক্তি দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত ও আনন্দিত হই, বঙ্গীয় যুবকদের মধ্যে তার এক বিন্দুও দেখি না কেন? ঐ বিবশতা, জড়তা ও সকল বিষয়ে অনাস্থার কারণ কি আমাদের সমাজ নহে? যতদিন বালকেরা অল্পবয়স্ক ও অবিবাহিত থাকে, যতদিন তাহারা প্রকৃতরূপে সমাজে প্রবেশ না করে,

সমাজ ও সংসারের অসংখ্য ক্ষুদ্র রীতিনীতির প্রতি মন রাখিতে বাধ্য না হয়; যতদিন তাহারা অবাধে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, যেথানে খুসী যাইতে পারে, সে জন্য তাহাদের শরীর ও মন উভয়ই সর্ব্বদা উদ্যোগী ও কর্ম্মক্ষম থাকে; কিন্তু বালকেরা যুবক হইয়া উঠিবামাত্র তাহাদের সে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন কর্ম্মে বাধা পড়ে। বালক অবস্থায় কত দেশীয় বিদেশীয় গ্রন্থ পড়িয়া তাদের মনে যে বল, উদ্যম, উৎসাহ ও জ্ঞানের উদ্রেক হইয়াছিল, প্রকৃত জীবনের কার্য্যক্ষেত্রে তাহারা ঐ সব উদ্যম ও জ্ঞান চালনার কিছুমাত্র স্থান বা উপায় দেখে না। কাজেই তাহারা ঐ সব মানুষোচিত গুণ সকলকে হিন্দু জীবনে নিতান্ত গলগ্রহ শিক্ষামাত্র ভাবিয়া উহাতে জলাঞ্জলি দেয় ও একে একে ধীর, গম্ভীর, বিবশ, অলস, ও নিরুৎসাহ হিন্দুতে পরিণত হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয় বালকের মন প্রশস্ত ও মার্জ্জিত হয়, আর প্রচুর বিদ্যা জ্ঞানের সঙ্গে তাহারা স্বভাবত আপানাদিগের অবস্থা সংশোধন করিয়া আরো উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চাহে। একজন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লোক যেমন তাঁহার চারিদিকের সকল দ্রব্য ও স্থানকে বিমল ও পরিপাটী দেখিতে ইচ্ছা করেন, একটী মার্জ্জিত মনও সেইরূপ উহার নিকটস্থ সকল লোক ও রীতিনীতিকে বিশুদ্ধ দেখিতে অভিলাষী হন। কিন্তু সমাজ ক্রমাগত তাহাদিগকে পায়ে দড়ি দিয়া টানিয়া সেই পূর্ব্ব-সীমায় ও অমার্জ্জিত আচার ব্যবহারে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। সুতরাং "ঘর শত্রুতে যেমন রাবণ নষ্ট" সেইরূপ আমাদের দেশের যুবকেরা বাহির হইতে স্কুলে অনেক শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিলেও আমাদের অন্তর্শত্রু সমাজ সে সমুদায় যুবকদের মন হইতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। বালকদের মন ফুটিতে না ফুটিতেই আবার বুজিয়া যায়, তাদের হৃদয় খুলিতে না খুলিতেই পুনরায় সংকীর্ণ হইয়া পড়ে, তাদের শরীর বিকাশ পাইতে না পাইতেই শুকাইয়া পড়ে। এইরূপে আমাদের হিন্দু জীবনের প্রধান আশা ভরসা, ও জাতীয় জীবনের প্রধান উপায়—সহৃদয় বালকদের মন সমাজ বেদীতে জন্মের মত বলি দেওয়া হয়।

আজ কাল দেশের অনেক শিক্ষিত লোক অন্তরে অনেক মন্দ রীতিনীতির বিদ্বেষী হইলেও সমাজের ভয়ে তাহা দেখাইতে পারেন না; অনেক পিতা মেয়েদের উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত কুমারী রাখিতে ইচ্ছা করেন, কত মাতা বিধবা বালিকা কন্যাকে পুনরায় সধবা দেখিবার জন্য ব্যাকুল হন, কত স্বামী স্ত্রীদের স্বাধীনতা দিতে চান—কিন্তু সমাজ তাঁহাদের ঐ সব সদিচ্ছার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁরা প্রকাশ্যে ঐ সব বাসনা কার্য্যে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইবামাত্র সমাজ তাঁহাদের ধিক্কার দিতে আরম্ভ করে! যে সকল মহৎ ইচ্ছা বা দৃষ্টান্তের জন্য সমাজের তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত—না উহাই তাঁহাদের কুৎসার কারণ হইয়া পড়ে! আর দুই একজন যদি ঐ ধিক্কার ও উপহাস অগ্রাহ্য করিয়া সাহস পূর্ব্বক নিজেদের বাল্য জীবনের যত বাসনা,

কল্পনা ও ভাবকে যৌবনকালে কার্য্যে পরিণত করেন তাহা হইলে আর রক্ষা নাই; আমাদের অচেতন প্রায় সমাজ হঠাৎ সজীব ও সতেজ হইয়া উঠে, ও যেরূপে হউক ঐ সব 'বিপ্লবকারী' সভ্যদের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া আবার নিশ্চল নিদ্রায় অভিভূত হয়। সুতরাং সমাজের ঐ সকল কঠোর আচরণ দেখিয়া অনেক মহোদয় ব্যক্তিও এরূপ হতাশ হইয়া পড়েন যে, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও তাঁহারা অবশেষে অলস ও বিবশ সভ্যদের মত নিষ্কর্ম্মা থাকিতে বাধ্য হন। এই সকল কারণে ভারতবর্ষকে পুনরায় জীবন দিতে হইলে, হিন্দুজাতিকে আর্য্যজাতির উচ্চপদে বসাইতে হইলে হিন্দুসমাজের সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করা আমাদের প্রথম ও প্রধান কার্য্য।

কিন্তু ঐ সংস্কার সাধনের জন্য আমাদের অতি সতর্কভাবে চলা উচিত। আজ কাল অনেক পাশ্চাত্য সভ্যতাভিলাষী যুবকেরা আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আগাগোড়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উহা ইউরোপীয় বা ইংরেজী ধরণে নূতন করিয়া গড়িতে চান; উহার কমে তাঁহাদের মন উঠা ভার। কিন্তু 'ফ্রাইং প্যানে' লুচি ভাজায় যেমন ঘিয়ের শ্রাদ্ধ করা হয়, ইউরোপীয় বা ইংরেজী আদর্শ সমুখে রাখিয়া ভারতীয় সমাজ নির্ম্মাণের চেষ্টা পাইলে সেইরূপ পরিশ্রমের অপব্যয় করা হইবে। চ্যাপ্টা ফ্রাইংপ্যানে চপ্ কট্‌লেট্ ভাজাই খাটে, লুচিভাজার জন্য কিন্তু খুপ্‌ড়োলো কড়া না হইলে চলে না। সেইরূপ যে সকল সমাজ ব্যবস্থা ইউরোপীয়দের পক্ষে বেশ, ভারতবর্ষীয়দের জন্য তাহা নিতান্ত অনুপযোগী। বিশেষ, একটা প্রাসাদকে চূরমার করিয়া আবার ভিত্তি হইতে গাঁথা ও তাহাতে মাঝে মাঝে চুণকাম বা বালি ধরাইয়া তাহার সংস্কার করা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। আমাদের সমাজগৃহে সেইরূপ চুণকাম বা বালি ধরাণ ও দুই একখানা আল্গা ইট খসাইয়া উহাকে আরো মজবুদ ও পরিষ্কার করাই একান্ত আবশ্যক। সে কারণে উহার জন্য বিদেশীয়দের কাছ হইতে সম্পূর্ণ নমুনা ধার করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষেরই নানা প্রদেশ খুঁজিলে, বঙ্গসমাজের সংস্কার জন্য যে সকল উপাদানের আবশ্যক, তাহা অনায়াসে পাওয়া যাইবে।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

রমণীর শিক্ষা ও কার্য্য।

জীবনের সমস্ত লক্ষ্য যাহাতে সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে তাহারই উপযোগী করিয়া শরীর মন আত্মার বিকাশ সাধনের চেষ্টার নামই শিক্ষা। কাহার পক্ষে কিরূপ শিক্ষা বিধান করা উচিত, তাহা তাহার জীবনের কার্য্যক্ষেত্র অগ্রে নিরূপিত না হইলে বলা যায় না। কতকগুলি বিষয়ে মানব মাত্রেরই জীবনের লক্ষ্য এক, সুতরাং শিক্ষাও এক

প্রকার হইবে। সুবিমল জ্ঞানের জ্যোতিতে মনের অন্ধকার দূর করা, বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও নীতি জ্ঞান দ্বারা জীবনকে ধর্ম্ম ও নীতির অনুগত করা যে পুরুষ রমণী উভয়েরই জীবনের চরমলক্ষ্য, তাহা সমস্ত সুসভ্য জগৎ আজকাল একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু জ্ঞানের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিবার উপযুক্ত শক্তি রমণীর আছে কিনা, এবিষয়ে অনেকের মনে আজও সন্দেহ আছে। তবে এরূপ সন্দেহের কোন যুক্তিযুক্ত ভিত্তি আছে কিনা তাহা আজও সুস্পষ্টরূপে কেহ দেখাইতে পারেন নাই। বরং যে অল্পকাল রমণী জ্ঞানের উচ্চতর ক্ষেত্রে আপনার শক্তির পরিচয় দিবার উপযুক্ত অবসর পাইয়াছেন, সেই অল্প কালের মধ্যে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাতে এপ্রকার সন্দেহ নিতান্তই অমূলক বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান্ হইয়া এরূপ আপত্তি তুলিয়া থাকেন, তাঁহারা দেখাইয়া থাকেন যে গড়ে পুরুষের মস্তিষ্কের আয়তন ও ওজন অপেক্ষা রমণী মস্তিষ্কের আয়তন ও ওজন অল্প। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে অপেক্ষাকৃত অল্পায়তন মস্তক বিশিষ্ট ব্যক্তিও এবিষয়ে তাঁহার সৌভাগ্যশালী ভ্রাতা অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধি ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়া থাকেন। ব্যক্তিগত কথা ছাড়িয়া দিয়া জাতিগত বৈষম্যের আলোচনা করিলেও এ মীমাংসা সম্পূর্ণ সন্দেহ বিবর্জ্জিত বলিয়া বোধ হয় না। ইউরোপীয়দিগের সহিত তুলনায় ভারতবর্ষবাসী লোকদিগের মস্তিষ্ক আয়তন ও ওজনে কম। কিন্তু তাহ বলিয়া কেহ কি সাহস করিয়া বলিতে পারেন, ভারতবাসীরা বুদ্ধির তীক্ষতা অংশে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা হীন? যদি কেহ পারেন, তাহা হইলে তাহার সাহস যে অত্যন্ত অধিক, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। যাহাই হউক, এ বিষয়ে মীমাংসার ভার বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতের হাতে, আমাদিগের এ বিষয়ে কথা কহিতে যাওয়া অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। আর যদিই বা মস্তিষ্কের অল্পতা বুদ্ধি বৃত্তির অল্পতার পরিচায়ক হয়, তাহা হইলেও ইহা রমণীর উচ্চ শিক্ষার প্রতিকূল যুক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তাহা হইলে, এযুক্তি ভারতবর্ষবাসী লোকের প্রতিকূলে তুল্যভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কতদূর পর্য্যন্ত জ্ঞানালোচনা রমণী বুদ্ধির আয়ত্তাধীন, কোথায় তাহা সে সীমা অতিক্রম করিয়া যায়, প্রকৃতি এরূপ কোন অনতিক্রমণীয় সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই, মনুষ্যের পক্ষে সে সীমা নিরূপণ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি এরূপ কোন সীমা থাকে, তাহা প্রকৃতিই নির্দ্দেশ করিবেন। সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও চেষ্টা সত্ত্বেও যদি রমণী জ্ঞানরাজ্যের কোন নির্দ্দিষ্টসীমা অতিক্রম করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহাকে প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট সীমা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট কালে, কোন নির্দ্দিষ্ট দেশের রমণীদের দ্বারা অনতিক্রান্ত সীমাকে রমণী বুদ্ধির অনতিক্রমণীয় সীমা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তার পর, পরিচালনে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় মস্তিষ্কেরও পরিপুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি যদি প্রকৃতই রমণীকে এইরূপে হীন করিয়া

রাখিয়া থাকেন,তাহা হইলে উচ্চশিক্ষা রমণীর বিশেষ ভাবে প্রয়োজন; তাহা হইলে জাতি পরম্পরাগত অনুশীলনে তিনি কালক্রমে জ্ঞানের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতে পারিবেন। শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মহামতি হক্স্লি এ বিষয়ে রমণীর হীনতা স্বীকার করিয়াও তাঁহাদিগের উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে বলিতেছেন—The possibility that the ideal of womanhood lies neither in the fair saint ; nor in the fair sinner : that the female type of character is neither better nor worse than the male, but only weaker, that women are meant neither to be man's guides nor their playthings but their comrades, their fellows and their equals as far as Nature puts no bar to that equality ; does not seem to have entered into the minds of those who have had the conduct of the education of girls.

What is the first step towards a better state of things ? we reply, Emancipate girls. Recognise the fact that they share the senses, perceptions, feelings, reasoning powers, emotions of boys, and that the mind of the average girl is less different from that of the average boy, than the mind of one boy is from that of another ; so that whatever argument justifies a given education for all boys justifies its application to girls as well. So far from imposing artificial restrictions upon the acquirement of knowledge by women, throw every facility in their way. Let us have sweet "girl graduates" by all means. They will none the less be sweet for a better wisdom ; and the "golden hair" will not curl less gracefully outside the head by reason of there being brains within. Nay, if obvious practical difficulties can be overcome, let those women who feel inclined to do so, descend into the gladiotorial arena of life, not merely in the guise of *retiariæ* as heretofore, but as bold *sicariæ* breasting the open fray. Let them, if they so please, become merchants, barristers, politicians. Let them have a fair field but let them understand as the necessary correlative, that they are to have no favour. Let nature alone set high above the lists, "rain influence and judge the prize." ... ... The duty of man to see that not a grain is piled upon the load beyond what nature imposes ; that injustice is not added to inequality.

যাঁহাদের মতামতের কিছুমাত্র মূল্য আছে, তাঁহারা সকলেই রমণীর উচ্চশিক্ষা সমর্থন

করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে বাদানুবাদের আর বিশেষ প্রয়োজন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের বিশেষ সমস্যা—সমাজ জীবনে রমণী কোন স্থান অধিকার করিবেন? তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র কোথায়? পুরুষের কার্য্য ক্ষেত্র হইতে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র স্বতন্ত্র—না একই ক্ষেত্রে সমান ভাবে উভয়েই কার্য্য করিবেন? রমণী কি পুরুষের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারই অভাব পূরণ করিবেন—না রমণীরও নিজের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে? তাঁহার নিজের একটা কার্য্য জীবন আছে? এই রূপ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পারিলে রমণীর শিক্ষা কোন আকার গ্রহণ করিবে, বলা যায় না। তাই আমরা সর্ব্বাগ্রে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

সমাজের মৌলিক অবস্থায়, শ্রেণী বিভাগ হইবার পূর্ব্বে মনুষ্যে মনুষ্যে বিশেষ কিছু তারতম্য ছিল না, সকলেরই অবস্থা এক প্রকার। এই সমাজের অগঠিতাবস্থা। যখন বহিঃশক্তির নিষ্পেষণে মনুষ্য প্রভুত্ব ও দাস্য সম্পর্ক বন্ধনের আবশ্যকতা অনুভব করিল, যখন সমাজ-গঠন আরম্ভ হইল, তখন শ্রেণীবিভাগ হইতে আরম্ভ হইল ও মনুষ্যের অবস্থার তারতম্য হইতে লাগিল। ইহার ফলে, সমস্ত লোক এক জন সর্ব্বময় রাজার অধীন হইয়া পড়িল, একশ্রেণী অন্যশ্রেণীর পদানত হইল। কাল সহকারে এ বৈষম্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল, ক্রমশঃ একশ্রেণী অন্যশ্রেণীর দাস হইয়া পড়িল। এক শ্রেণীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই অন্যশ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে ইহাই ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া গৃহীত হইল। প্রাথমিক উদ্দাম অবস্থায় এরূপ কঠোর বাহ্য শাসনের হয়ত প্রয়োজন ছিল। এরূপ কঠোর শাসনে থাকায় বর্ব্বরাবস্থার উদ্দাম ভাব সংযত হইয়া আসিল, কালক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে অন্তরে আত্মশাসনের ভাব ও ক্ষমতা জাগিয়া উঠিল। যাহারা এত দিন ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়ের পদানত ছিল, তাহারা এখন স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিল। ইহার ফল, জনসাধারণের অভ্যুত্থান। যে ঘোর বৈষম্য এত দিন জন সাধারণকে নিষ্পেষিত করিতেছিল, তাহা দিন দিন অন্তর্ধান হইতে লাগিল, সাম্যের বিজয়ভেরী বাজিয়া উঠিল। বর্ত্তমান সময়ে অনেক ঘোরতর বৈষম্য তিরোহিত হইয়াছে, এবং সে শুভ দিন বহুদূর নয় যখন নৈতিক ও সামাজিক অধিকার-বৈষম্য আর সুসভ্য সমাজকে কলঙ্কিত করিবে না।

নারীজাতির সামাজিক জীবনের ইতিবৃত্ত জন সাধারণের ইতিবৃত্তের অনুরূপ। সমাজের মৌলিক অবস্থা যতদূর অবগত হওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে অত্যন্ত আদিম অবস্থায়ও পুরুষ ও রমণীর কার্য্যের কথঞ্চিৎ পার্থক্য রহিয়াছে। মৃগয়া ও সংগ্রামে রমণীকে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু অন্যান্য সমস্ত কার্য্যে রমণী পুরুষের তুল্য। অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কার্য্যেও রমণীকে সমানভাবে পুরুষের সহিত কাজ করিতে দেখা যায়। সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সমতার ভাব বিনষ্ট হইল, পুরুষ ও রমণীর কার্য্যের স্বতন্ত্র সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল। সমাজে

নানা ভাবে ইহার ফলাফল দেখা দিল। পুরুষ রমণীর আপেক্ষিক সামাজিক পদ সকল সময়ে একরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। সমাজ বিবর্ত্তনে এমন এক অবস্থা দেখা যায়, যখন রমণীই পরিবারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদ পণ্ডিত রমণীর এই অবস্থাকে এক স্ত্রীর বহু স্বামী গ্রহণ প্রথার আনুষঙ্গিক বলিয়া মনে করেন। এই সময়ে সন্তানগণ মাতার নামেই পরিচিত হইত। যখন এই প্রকার বিবাহপ্রথা এক স্বামীর-বহু স্ত্রী গ্রহণ প্রথার দ্বারা অপসারিত হইল, তখন সমাজ-জীবনে এক নূতন ভাব দেখা দিল। রমণী এখন আর গৃহের কর্ত্রী নহেন, পুরুষই একমাত্র কর্ত্তা, রমণী তাহার দাসী। সকল দেশেই যে এই নিয়মে সমাজ বিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। তবে ইহা সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে সমাজ বিবর্ত্তনের এক অবস্থায় রমণী পুরুষের দাসীরূপে, ভারবাহী পশুরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছেন। যাহা কিছু শ্রমসাধ্য যাহা কিছু কষ্টসাধ্য কার্য্য তাহা রমণীই করিতেন, পুরুষ সে সময় আরাম করিয়া লইতেন। ক্রমশঃ সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রমণীর আদর হইতে লাগিল, তিনি গৃহ কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন, আর পুরুষ বাহিরের শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে লাগিলেন। সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধিতে যখন সমাজে ধনসঞ্চয় হইল, যখন এক সম্প্রদায় ধনীলোকের সৃষ্টি হইল, তখন এই শ্রেণীর পুরুষ রমণী সকল প্রকার শ্রমসাধ্য কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন, দাস দাসারাই সে সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিল। পুরুষেরা শস্ত্র বিদ্যায়, না হয় শাস্ত্র বিদ্যায় মনোনিবেশ করিলেন, অপর পক্ষে সৌন্দর্য্য-সার রমণীরা অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধনের চেষ্টায় রত হইলেন। সমাজ জীবনেই যে ইহার নানাবিধ ফল ফলিল তাহা নহে, পুরুষ রমণীর দৈহিক পরিবর্ত্তনও বিস্তর হইল। আদিমকালের নর-কপাল পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে পুরুষ রমণীর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের সুসভ্য ইউরোপীয় নরনারীর কপাল পরীক্ষা করিলে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। অতীত যুগের উন্নতির চরম ফল এই। এখন এক নূতন যুগের অভ্যুদয় হইয়াছে। রমণীরা এত দিন পুরুষের হস্তে পুষ্পস্তবক ছিলেন, সাধারণতঃ এখনও আছেন। পুষ্পস্তবকের ন্যায় তাঁহারও স্বাধীন অস্তিত্ব নাই, সংসারের বন্ধুর পথ পুরুষের পক্ষে সুগম করিবার জন্যই, পুরুষের পথ পুষ্পময় করিবার জন্যই রমণীর জীবন। ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া আশায় বুক বাঁধিয়া বলা যায়, এ দিন আর বেশী দিন স্থায়ী হইবে না, রমণী নিজের মর্য্যাদা বুঝিয়া আপনার সমস্ত অধিকার কাড়িয়া লইবেন।

রমণীর এ অধিকার কি? ইউরোপ ও আমেরিকার রমণী-সমাজ আজ কাল এই অধিকার পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, এবং কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। বিশ্ব বিদ্যালয়ে রমণীগণ পুরুষদিগের সহিত সমানভাবে নানা বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছেন এবং দর্শন, বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, সাহিত্য সকল বিষয়েই পুরুষদিগের সহিত

প্রতিযোগিতায় আপনার পদ রক্ষা করিতেছেন। এক ইংলণ্ডেই সাহিত্য জগতে জর্জ্জ এলিয়ট, হাম্‌ফ্রে ওয়ার্ড, এলিজাবেথ ব্রাউনিং. দর্শন শাস্ত্রে হ্যারিয়েট মার্টিনো ও মিস কব, অর্থ নীতিতে মিসেস্ ফসেট, সংস্কার কার্য্যে জোসেফাইন বাটলার রমণী কুলের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন। যেরূপ প্রতিকূল অবস্থায়, এত অল্প কালের মধ্যে রমণীগণ এরূপ উচ্চশ্রেণীর শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। আমাদের এই পতিত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশেওএই সৌভাগ্যের দুই একটি রশ্মি আসিয়া পতিত হইয়াছে। আমাদের রমণীদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-তম উপাধিও গ্রহণ করিতেছেন, সাহিত্য জগতের বিভিন্ন প্রদেশে তাঁহারাও আপনা-দের শক্তির পরিচয় দিতেছেন। ইহা দেখিলে কাহার প্রাণে না আশার সঞ্চার হয়? জীবনের অন্যান্য বিভাগেও আপনার অধিকার বুঝিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বর্ত্তমান্ যুগের একটি প্রধান সমস্যা—জীবন সংগ্রাম। দিন দিন এ সংগ্রাম তীব্রতর হইয়া আসিতেছে, অন্ততঃ আমরা তীব্ররূপে ইহা অনুভব করিতেছি। মানুষ খাটিয়া খাইতে চাহে। কিন্তু খাটিবার অবসর পায় না, কিম্বা খাটিয়া যাহা পায়, তাহাতে সুচারু রূপে জীবন ধারণ করিতে পারে না। ইহার ফলে নানা স্থানে ধর্ম্মঘট হইতেছে। এক দিন ফরাসীদেশের লোক খাটিয়াও পেট ভরিয়া আহার করিতে পায় নাই,—তাহার ফল ফরাসী-বিপ্লব। পুরুষদিগের মধ্যেই যে এই অন্নসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নহে,—রমণীরাও এই অন্নসঙ্কটের তীব্রতা অনুভব করিতেছেন। বরং বর্ত্তমান সময়ে পুরুষা-পেক্ষা রমণীরাই ইহার তীব্রতা বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছেন। খাটিয়া খাইতে হয় না, এরূপ রমণীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। আর যাঁহাদিগকে কোন প্রকার কায কর্ম্ম করিতে হয় না, তাঁহাদের অবস্থা যে সর্ব্বাংশেই কাঙ্ক্ষনীয় তাহা নহে। কায করা দুর্ভাগ্য নহে, ইহা মানবের একটি শ্রেষ্ঠ অধিকার।

প্রাণধারণের অধিকার কি পুরুষ, কি রমণী সকলেরই সমান এবং ইহা অতি পবিত্র অধিকার। জীবিকা অর্জ্জন ইহারই অন্তর্ভূত। কাহারও জীবিকা অর্জ্জনে অন্তরায় উপস্থিত করা ও তাহার জীবন ধারণে বিঘ্ন উপস্থিত করা একই কথা। রমণী আজও এ অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। আমাদের দেশের কথা দূরে থাক্, সুসভ্য ইউরোপেও অনেক ব্যবসায়, অনেক কর্ম্মক্ষেত্র রমণীর পক্ষে রুদ্ধ। বর্ত্তমান সময়ে ইহা লইয়া সুসভ্য জগতে মহা আন্দোলন চলিতেছে। যে সমস্ত কর্ম্মক্ষেত্রে রমণীরা প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন, সেখানেও ন্যায়ের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যেমন আমাদের দেশে একই কার্য্য করিয়া চর্ম্মের গুণে পুরস্কারের তারতম্য হইয়া থাকে, তেমনই সর্ব্বত্রই এমন কি সুসভ্য ইউরোপেও, এক কার্য্যের জন্য পুরুষ রমণী ভেদে পুরস্কারের তারতম্য হইয়া থাকে, ইহার ফল যে কি রূপ ভয়ানক হইতেছে, তাহা যাঁহারা এ বিষয়ে কিছুমাত্র খবর রাখেন, তাঁহারাই জানেন। রমণীরা অনেক সময় সমস্ত

দিন খাটিয়াও উপযুক্ত জীবিকা অর্জ্জন করিতে না পারিয়া নানা প্রকার অসদুপায় অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। এ রূপ ঘোর অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত যে সমাজবিধি, তাহা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না,—ইহার পতন অবশ্যম্ভাবী। ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় ইহা হইতে রক্তস্রোতে মেদিনী প্লাবিত না হইতে পারে কিন্তু ইহার ফলও যে অতীব ভয়ানক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রমণীদিগের এই অমূল্য অধিকারের জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। স্বীয় শারীরিক ও মানসিক শক্তি নিয়োগে নিজের জীবিকা উপায় দুর্ভাগ্যবশতঃ চিরদিনই হেয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে। আমাদের জাতীয় অধোগতির ইহা একটি প্রধান কারণ। এমন কি ইউরোপে আজিও এ ভাব তিরোহিত হয় নাই। সেখানে পুরুষেরা এখন আর জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কাজ করিতে হীনতা বোধ করেন না। কিন্তু রমণীদের অন্তর হইতে আজও এই কল্পিত সম্মানের ভাব অন্তর্হিত হয় নাই। তাঁহারা এই কল্পিত সম্মানে প্রতারিত হইয়া আপনাদের প্রকৃত মর্য্যাদা হারাইতেছেন। "ভাতের মার বড় মার" আমাদের দেশের একটি প্রাচীন প্রবাদ বচন। যাহার অন্নের ভার অন্যের হাতে, কথায় প্রকাশ হউক আর নাই হউক, সে তাহার পদানত। যতদিন রমণীরা অন্নে স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারিবেন, যতদিন তাঁহাদিগকে মুষ্টিমেয় উদরান্নের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষা হইয়া থাকিতে হইবে, ততদিন তাঁহাদিগকে স্বাধীন বলার তীব্র ব্যঙ্গোক্তি আর কি হইতে পারে? ক্ষমতাবান্ স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থে সুসজ্জিত হইয়া পুষ্পস্তবকের ন্যায় স্বামীর হস্তাবলম্বন করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হওয়া স্বাধীনতা নহে, ইহাতে রমণীর প্রকৃত গৌরব বর্দ্ধিত হয় না। এরূপ কল্পিত সম্মানে, এরূপ কল্পিত স্বাধীনতায় রমণীরা প্রতারিত হইবেন না।

শরীর মনের সমস্ত শক্তির উপযুক্তরূপ ব্যবহার করিয়া সমাজের আর্থিক ও মানসিক বলবিধান করা, সমাজের উভয়বিধ মূলধন বর্দ্ধন করার ন্যায় উচ্চ অধিকার মানবের পক্ষে আর কি? শূন্যে প্রয়োগ করিলে কিছু শক্তি বর্দ্ধিত হয় না, প্রকৃত কার্য্যে প্রয়োগ করা চাই। রমণীগণ সংসারের কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে থাকাতে তাঁহাদের প্রভূত শক্তি হইতে সমাজ বঞ্চিত হইতেছেন। অধিকাংশ রমণী এই ভাবে অলস জীবন যাপন করিয়া জীবনের গাম্ভীর্য্য লাভ করিতে পারিতেছেন না এবং নানা প্রকার অসারতায় গা ঢালিয়া দিতেছেন। ইহা তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নহে।

সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক অধিকার আমাদের উচ্চতম মানসিক শক্তি প্রয়োগের একটি প্রধান-ক্ষেত্র। শুদ্ধ তাহাই নহে; জীবনের সকল বিভাগেই রাজবিধির ফলাফল দেদীপ্যমান। আমাদের অন্যান্য অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, রাজনৈতিক অধিকার থাকাও একান্ত আবশ্যক। রমণীর নিজ জীবনে অধিকার স্বীকার করিলে, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার

রাজনৈতিক অধিকার থাকার যে আবশ্যক, একথা বুঝিতে তর্কশাস্ত্রের কূটতর্কের প্রয়োজন হয় না।

রমণীগণের এ প্রকার জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রতিকূলে কতকগুলি আপত্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। আপত্তি গুলি পুনঃ পুনঃ খণ্ডিত হইলেও অভ্যাসের কঠোর বন্ধন কিছুতেই শিথিল হয় না, কুসংস্কারের গাঢ় অন্ধকার কিছুতেই বিদূরিত হয় না। তাই এ আপত্তি গুলি পুনরায় খণ্ডন করা আবশ্যক।

রমণীগণের গৃহপ্রাঙ্গনের বাহিরে যাইয়া সংসারের ঘোর সমরক্ষেত্রে কার্য্য করার প্রতিকূলে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান আপত্তি—সন্তান প্রতিপালনের ব্যাঘাত। সুচারুরূপে সন্তান লালন পালন করা জনক জননীর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, শিশুর লালনপালনের বিশেষ ভার এ পর্য্যন্ত মাতার হস্তেই রহিয়াছে। সন্তান যখন বড় হইয়া জ্ঞান রাজ্যে বা সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশার্থী হইল তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার দায়ীত্বভার পিতার স্কন্ধে পতিত হইল। এবং এই সময় হইতেই সন্তানের প্রতি মাতার বিশেষ দায়ীত্ব এক প্রকার তিরোহিত হইতে লাগিল। পুরাকালীন গ্রীক্‌দিগের মধ্যে ও বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে পুত্র সন্তানের সহিত মাতার সম্বন্ধ এতদপেক্ষা ঘনিষ্টতর নহে। শিশু সন্তানের শারীরিক পরিচর্য্যা করা মাতার কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহার মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা পিতার কর্ত্তব্য। এতদুভয় দেশেই রমণীর অবস্থা একই রূপ, সুতরাং তাঁহার কর্ত্তব্যও একই রূপ নিরূপিত হইয়াছে। উভয় দেশেই রমণীরা জ্ঞানালোক হইতে বঞ্চিত, সুতরাং সন্তানের শিক্ষা বিধান করা তাঁহার ক্ষমতার অতীত এবং ক্ষমতার অতীত বলিয়াই তাঁহার অধিকার বহির্ভূত। কিন্তু অধুনাতন সুসভ্য ইউরোপ ও আমেরিকায় রমণীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কর্ত্তব্যেরও সীমা প্রসারিত হইয়াছে। শিশু সন্তানের লালন পালনই কেবল আর মাতার কর্ত্তব্য নহে, তিনি অল্পে অল্পে সন্তানের শিক্ষার ভারও লইতেছেন। সন্তান সম্বন্ধে পিতা মাতার কর্ত্তব্যের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা এখন আর থাকিতে পারিতেছে না, মাতা এখন আপনার পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া সন্তানের মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতেছেন। ইহার ফলাফল ক্রমশঃ বিবৃত হইবে। মাতা গৃহ প্রাঙ্গনের বাহিরের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সন্তান প্রতিপালন কে করিবে? শিশুর অসহায় অবস্থায় জননী ভিন্ন কে তাহার সমস্ত অভাব মোচন করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিবে? এ আপত্তিটি যে নিতান্ত গুরুতর, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেখা যাউক, এ আপত্তির কোন সদুত্তর আছে কি না। যত দিন পুরুষ ও রমণীর অধিকার-বৈষম্য থাকিবে, তত দিন ইহার কোন মীমাংসা সম্ভবপর নহে। কিন্তু যখন রমণী স্বীয় অধিকার সমূহ বুঝিয়া পাইবেন, তখন আর এ আপত্তি দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া বোধ না হইতে পারে। সন্তান প্রতিপালন

সম্বন্ধে মাতার বিশেষ দায়ীত্ব স্তন্য প্রদান; অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে পিতামাতার কার্য্যের তারতম্যের কোন যুক্তিযুক্ত ভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, অন্ততঃ মাতার দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে, পিতা দ্বারাও তাহা সহজে সম্পন্ন হইতে পারে। এখন এই কারণে যদি মাতার সংসারক্ষেত্রে কাজ করা গর্হিত হয়, তাহা হইলে পিতার পক্ষে তাহা কেন না গর্হিত হইবে? এ সাম্য ও ন্যায়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও, পিতা মাতার যুক্ত আয়ে আর্থিক স্বচ্ছলতা বর্দ্ধিত হইলে এক স্তন্য প্রদান ভিন্ন সন্তানের অন্যান্য সমস্ত শারীরিক সেবাশুশ্রূষা একজন ভৃত্য দ্বারা অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে। অবস্থাপন্ন লোকের গৃহে, বিশেষতঃ ইউরোপ ও আমেরিকাতে, ভৃত্যের হস্তেই সন্তানের পরিচর্য্যার ভার অর্পিত হইয়া থাকে। এমন কি, ইহার ব্যভিচারও লক্ষিত হয়। জনক জননী ভৃত্য-হস্তে সন্তানরক্ষার ভার দিয়া অনেক সময় ৭। ৮ ঘণ্টা কালও সামাজিক আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। ইহা নিতান্তই নিন্দনীয়। কিন্তু ইহাঁরাই রমণীর কর্ম্মের নামে শিহরিয়া উঠেন, তখনই তাঁহাদের সন্তান প্রতিপালনের মহা দায়ীত্বভার স্কন্ধে চাপিয়া পড়ে! জীবিকা অর্জ্জনের জন্য ৪। ৫ ঘণ্টা কাল সন্তান হইতে দূরে থাকিলে সন্তান প্রতিপালনের বিশেষ কিছু ব্যাঘাত হইতে পারে না। একথা অনেকে স্বীকার করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা হয়ত বলিবেন, ৪। ৫ ঘণ্টা কাল জীবিকা উপায়ের পক্ষে যথেষ্ট নহে। বর্ত্তমান সমাজ বিধানে যথেষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু ইহার ঊর্দ্ধকাল কাহারই জীবিকা অর্জ্জনের জন্য পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য নহে। এ জন্য সমাজবিধি পরিবর্ত্তিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইহার ঊর্দ্ধকাল জীবিকা উপায়ের জন্য খাটিতে হইলে, আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ কখনই সাধিত হইতে পারে না, এবং যে সমাজে মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ রুদ্ধ; তাহা ব্যাধিগ্রস্ত, অচিরে তাহার সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। বর্ত্তমান্ যুগের সমাজ সংস্কারকদিগের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং বিধিমতে তাহার চেষ্টাও হইতেছে। আশা করা যায়, ঐ কলঙ্ক বিদূরিত হইবে। কি উপায়ে এই অতীব বাঞ্ছনীয় সংস্কার সুসিদ্ধ হইতে পারে, তাহা স্বতন্ত্র স্থলে বিবেচ্য, এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ তাহার উপযুক্ত স্থান নহে। অপরপক্ষে মাতা যখন সংসারের কার্য্যক্ষেত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন, তখন তিনিও পিতার ন্যায় সন্তানের জীবনের প্রধান সহায় হইতে পারিবেন, মাতা পুত্রের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ট হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে রমণীদের পক্ষে জীবন সংগ্রাম অতীব ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। একে রমণীরা বাল্যকাল হইতে এমন শিক্ষা প্রাপ্ত হন না, যাহাতে তাঁহারা সুচারুরূপে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন, অপর পক্ষে জীবিকা উপায়ের অনেকগুলি দ্বারই তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আবার যে যে স্থলে তাঁহারা কার্য্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেখানেও তাঁহারা পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য

প্রাপ্ত হন্ না। তাহার ফলে এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে সমস্ত দিন খাটিয়াও অনেকে আপন অন্নাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে পারেন না। তারপর, এরূপ অবস্থায় যে হতভাগ্য রমণী শিশুসন্তানের মাতা হইয়াছে, তাহার দুর্দ্দশার পার নাই। নিজের অন্নাচ্ছাদন চলে না, তারপর সন্তানের ভরণপোষণ। সন্তানের পরিচর্য্যার ভারই বা লইবে কে? এইরূপ অবস্থাপন্ন রমণীদের শিশুসন্তানের পরিচর্য্যার জন্য এক প্রকার নূতন ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। মাসিক কিঞ্চিৎ অর্থগ্রহণ করিয়া কেহ কেহ এরূপ শিশুর এমন কি ৫০। ৬০ টির পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করে। পরিচর্য্যা যতদূর হয় সহজেই অনুমেয়। অহিফেণের কৃপায় অনেকেই অতি ত্বরায় কাল কবলে নিপতিত হয়। এই অমানুষিক ঘটনা দর্শন করিয়া অনেকে রমণীদের এরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেছেন। ইহাঁদের ব্যবস্থা শিরঃপীড়া নিবারণের নিমিত্ত শিরচ্ছেদের ব্যবস্থার ন্যায় অনুমিত হয়। এই সমস্ত রমণী পরিশ্রম দ্বারা আপনাপন উদরান্নের সংস্থান না করিলে কে ইহাদের ভরণপোষণের ভার লইবে? ইহারা কি তাহা হইলে সন্তানসহ শীঘ্রই জীবনলীলা শেষ করিবে না? এরোগের এচিকিৎসা নহে। এরোগ বিদূরিত করিতে হইলে রমণীর জীবিকা উপায়ের পথ সুগম করিয়া দিতে হইবে, সমাজ জীবনে ন্যায়ের সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, নরনারীকে অধিকতর সংযমী হইতে হইবে। সমাজ সংস্কারকেরা সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।

রমণী হৃদয় কমনীয়গুণের আধার। তাঁহার সুস্নিগ্ধ ব্যবহার, তাঁহার স্নেহ মমতা, তাঁহার সৌজন্য দ্বারা তিনি সমাজকে সুখের আলয় করিয়া রাখিয়াছেন, গৃহকে শান্তি ও আরামের আবাসভূমি করিয়া রাখিয়াছেন। রমণীগণ সংসারের ঘোর সংগ্রামের মধ্যে যাইয়া পড়িলে, তাঁহাদের এই সমস্ত কোমল গুণ হ্রাস হইয়া তাঁহারাও পুরুষের পরুষ গুণের অধিকারী হইয়া পড়িবেন। তখন সংসারের আতপতাপে ক্লিষ্ট হইয়া একটু জুড়াইবার স্থান কোথায় মিলিবে? সমাজ জীবনে তাহা হইলে ঘোর শুষ্কতা আসিয়া পড়িবে, সংসার প্রকৃতই মরুভূমি হইয়া উঠিবে। এ আপত্তিটির সারবত্তা যাহাই হউক সাধারণতঃ ইহার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়া থাকে। আমরাও হৃদয়ের কোমল গুণের পক্ষপাতী, দয়া, প্রেম, জগতের প্রতি সমসুখ-দুঃখতা, হৃদয়ের বিস্তৃতি প্রভৃতি গুণ আমাদেরও প্রিয় বটে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, সংসারের কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে এই সকল গুণের হ্রাস হয় না ইহার বৃদ্ধি হয়? একটি ঘৃণ্যগর্ভ বাক্যের প্রতি কাহারও দয়া, বা প্রেম, বা সহানুভূতি জন্মিতে পারে না। হৃদয়ের এই সমস্ত সদ্গুণের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে প্রকৃত জীবন্ত মানুষের সহিত মিশিতে হইবে, তাহাদের সমস্ত কার্য্যের মধ্যে যাইয়া, জীবন সংগ্রামে তাহাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে হইবে। তাহা হইলেই মানব জীবনের প্রকৃতত্বের ভাব অন্তরে জাগিয়া উঠিবে এবং দয়া, প্রেম, সহানুভূতি প্রভৃতিগুণের স্ফূর্ত্তি হইবে। ইতিহাস কি ইহার সাক্ষ্য প্রদান

করিতেছে না ? যে সমস্ত মানবপ্রেমিক সাধু মহাত্মারা জন্মগ্রহণ করিয়া মানবজীবনে স্বর্গের ছবি দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা রমণী, না পুরুষ ? রমণী হৃদয়ের নিন্দা করা আমার অভিপ্রায় নহে। অবস্থা চক্রে পড়িয়া যেরূপ ফল ফলিয়াছে, তাহাই প্রদর্শন করিতেছি। যাঁহারা আজীবন অন্তঃপুর বা আপন পরিবারের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ, তাঁহাদের হৃদয়ের বিস্তৃতির সম্ভাবনা কোথায় ? মানবজাতি তাঁহাদের নিকট একটি কথামাত্র; তাহার প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতির সম্ভাবনা কি ? অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট অন্তঃপুরবদ্ধ রমণী হৃদয়ের সংকার্ণতার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান যুগে রমণীর অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, রমণী সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন। এই সঙ্গে সঙ্গে আমরা রমণী হৃদয়েরও উৎকর্ষের পরিচয় পাইতেছি। এই স্ত্রী স্বাধীনতার দিনে, নারীজাতির অধিকারে"র দিনেই ফ্লোরেন্স নাইটিংগল, এলিজাবেথ ফ্রাই, জোসেফাইন বাটলার দেখা দিয়াছেন। শত-বর্ষ পূর্ব্বে এরূপ রমণী রত্নের কল্পনা করাও অসম্ভব হইত। এবিষয়টি একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে এ আপত্তির অসারতা সহজেই প্রতীত হইবে।

তবে রমণীগণ এভাবে সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের কতকগুলি গুণ বা অগুণের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। রমণীগণ স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ—অতি সহজেই তাঁহারা ভাবের আবেগে বিচলিত হইয়া উঠেন। ইউরোপীয় রমণীগণের কথায় কথায় মূর্চ্ছা প্রাপ্তি এই ভাবপ্রবণতার পরিচায়ক; কিন্তু ইহা কি হৃদয়ের গভীরতা বা বিস্তৃতির পরিচায়ক ? বোধ হয় কোন সুবিবেচক ব্যক্তি একথা বলিতে সাহসী হইবেন না। রমণীগণের ভীরুতা নির্ভরশীলতা চিরপ্রসিদ্ধ। রমণীর এই সমস্ত গুণ কি একটু অবজ্ঞার সহিত "রমণীজনোচিত" বলিয়া উল্লেখ করা হয় না ? অথচ এই সমস্ত ভাবের পরিপুষ্টির জন্যই সমাজ ব্যগ্র। এ বিষয়ে Huxley বলিতেছেন।—Naturally, not so firmly strung, nor so well balanced as boys, girls are in a great measure debarred from the sports and physical exercises which are justly thought absolutly necessary for the full development of the vigour of the more favoured sex. Women are, by nature more excitable than men—prone to be swept by tides of emotion, proceeding from hidden and inward, as well as from obvious and external causes; and female education does its best to weaken every physical counterpoise to this nervous mobility—tends in all ways to stimulate the emotional part of the mind and stunt the rest. We find girls naturally timid, inclined to dependence, born conservatives; and we teach them that independence is unlady-like; that blind faith is the right frame of mind; and that

whatever we may be permitted and, indeed, encouraged, to do to our brother, our sister is to be left to the tyranny of authority and tradition. রমণীগণ সংসারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাদের এই ভাবপ্রবণতা, এই ভীরুতা ও নির্ভরশীলতার ভাব যে তিরোহিত হইবে, এরূপ আশা করা যায়। যাঁহারা এই সমস্ত স্ত্রী সুলভ গুণের পক্ষপাতী, যাঁহারা দুর্ব্বলতাকেই রমণী চরিত্রের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা রমণীগণের এ অবস্থা পরিবর্ত্তন আশঙ্কার চক্ষে দেখিতে পারেন। কিন্তু আমরা যে এ সমস্ত গুণের পক্ষপাতী নহি, এ কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত হইব না, এ সমস্ত গুণ বা অগুণ রমণী-চরিত্রের শোভা ও গৌরব বৃদ্ধি করে না। আমাদের বিবেচনায় ইহা দ্বারা রমণী চরিত্রের গৌরব নষ্টই হইয়া থাকে। এবং যতশীঘ্র এ ভাব অতীতকালের বিষয়ীভূত হয়, ততই মঙ্গল।

পুরুষ ও রমণীর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হইতেই পরিবারের উৎপত্তি এবং পরিবার লইয়াই সমাজ গঠিত। পরিবারের দৃঢ়তা ও পবিত্রতার উপর সমাজের মঙ্গলামঙ্গল বিশেষ-ভাবে নির্ভর করিতেছে। যেস্থলে পুরুষ রমণী পরস্পরকে বিশেষ ভাবে জানিয়া শুনিয়া প্রকৃতিগত সমতাহেতু বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরিবার গঠন করিয়াছেন, সে গৃহ প্রস্তরের উপর নির্ম্মিত, তাহার বিনাশ নাই। কিন্তু যেস্থলে কেবল মাত্র বাহ্যিক ও সাময়িক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পুরুষ রমণী গৃহ স্থাপন করিলেন, তাহার স্থায়ীত্ব কোথায়? পারিবারিক ভিত্তি সুদৃঢ় না হইলে সে সমাজের স্থায়ীত্বেরই বা সম্ভাবনা কি? কি উপায়ে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর পরিবার প্রতিষ্ঠিত করা যায়, ইহাই সমাজকর্ত্তাদিগের বিশেষ সমস্যা। পুরুষ রমণীর সম্বন্ধ কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতভাবে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে উভয়ের চিন্তাগত ও হৃদয়ের ভাবগত সমতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। পরস্পর যদি পরস্পরকে জানিতে না পারিলেন, উভয়ের চিন্তা ও ভাব যদি ভিন্নমার্গাবলম্বী হইল, তাহা হইলে সত্য সম্বন্ধ কিরূপে স্থাপিত হইতে পারে? আর উভয়ে যদি বিভিন্ন জগতে বাস করিলেন, উভয়ের কার্য্যক্ষেত্র যদি বিভিন্ন হইল, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে এই চিন্তাগত ও ভাবগত সমতাই বা ঘটিবে কি রূপে?

Industrial and Social Position of Women নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে বর্ত্তমান্ সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। From what does friendship spring? From accordance of nature. From what does marriage spring? From a fascinating manner or a taking look! The present state of social intercourse renders it utterly impossible in the general case to realise any deeper bond, any truer affinity; and on the other hand, the same cause

prevents the timely dispelling of those first illusions of accordance, bred of fond fancy, and a kindly glance. Each sex unknown to the other, each incapable of conceiving the nature of the seven-eighths of the life of the other, how can the character or the mind be judged of, more specially when the forms of society so blindly circumscribe and impede their inter-communion? ....The unhappy state of society we speak of *cannot* be replaced till the education of the sexes be assimilated; till they have the means of attaining a real knowledge of each other, till they occupy themselves with the same or similar pursuits; till they live in a medium of common interest and combined activity; till they have a similar acquaintance with the business world, a like interest in public life, and both a knowledge of, and a share of influence on, the general movements of mankind. Till this be, there will remain an unnatural separation of the two prime elements of society, depriving society of its finer vitality and leaving the power of growth only to a money-getting spirit, and other rude springs of character.

পুরুষ রমণীর কার্য্যক্ষেত্র এরূপ ভাবে পৃথক থাকিলে, তাঁহাদের জীবন স্রোত এরূপ বিভিন্ন মুখী হইলে, শুদ্ধ যে গৃহের সুখ শান্তি সুচারুরূপে রক্ষিত হইবে না, তাহা নহে; এ অবস্থায় তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবনেরও উৎকর্ষ লাভ হইতে পারে না। পুরুষ রমণী চরিত্রের জন্য পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাযুক্ত হইলে হৃদয় যেমন বিশুদ্ধ হয়, পবিত্রতার উৎস যেমন স্বতঃই অন্তরে ফুটিয়া উঠে এমন আর কিছুতেই হয় না। এরূপ সর্ব্বপূতকারিণী পবিত্রসলিলা মন্দাকিনী এ জগতে আর নাই। প্রেমের মূলে এই শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই প্রেম এত পবিত্র, প্রেম স্বর্গ। এ শ্রদ্ধা কিসে উৎপন্ন হয়? ইচ্ছা পূর্ব্বক কেহ শ্রদ্ধার ভাব অন্তরে জাগাইতে পারে না। মহৎগুণের প্রকাশ দেখিলে হৃদয় স্বতঃই শ্রদ্ধাভরে অবনত হইয়া পড়ে, ইহা কাহাকেও শিখাইয়া দিতে হয় না! সুন্দর বস্তুকে আমরা ভালবাসিতে পারি, আদর করিতে পারি, কিন্তু তাহার প্রতি শ্রদ্ধা হওয়া অসম্ভব। স্বতন্ত্র জগতে তাহার উৎপত্তি। রমণী যত দিন হীনাবস্থাপন্ন থাকিবেন, যত দিন তিনি জীবনের কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে জ্ঞান বল ও নৈতিক বলের পরিচয় দিতে না পারিবেন, তত দিন তিনি কখনই নরহৃদয়ের প্রকৃত শ্রদ্ধা, প্রকৃত পূজা লাভ করিতে পারিবেন না। আর যেখানে এ শ্রদ্ধা, এ পূজা নাই, সেখানে পবিত্রতা জন্মলাভ করিতে পারে না। যে সমাজে রমণী পুরুষের শ্রদ্ধার উপহার প্রাপ্ত না হন, সে সমাজের নীতি নিশ্চয়ই কলুষিত।

ইতিহাস ইহার ভূরি ভূরি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পুরাতন গ্রীক দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও কলা বিদ্যা উন্নতির অত্যন্ত উচ্চসোপানে আরোহন করিয়াছিল বটে, কিন্তু গ্রীক্ রমণীর অবস্থা নিতান্ত হীন ছিল এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল, গ্রীকের নৈতিক আদর্শ কখনই বিশুদ্ধতা লাভ করিতে পারে নাই। রোমে রমণীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল, রোমের নৈতিক আদর্শও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হইয়াছিল। আসিয়াবাসী জাতিবর্গের মধ্যে রমণীর অবস্থা নিতান্তই হীন, তাহাদের নৈতিক অবস্থাও নিতান্ত শোচনীয়। জ্ঞানোদ্দৃপ্ত ভারতে ও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ভারত রমণী সমাজ জীবনে যখন যেস্থান অধিকার করিয়াছেন, ভারতের সামাজিক নৈতিক আদর্শও তাহার অনুরূপ হইয়াছে। ভারত-রমণী কোন দিনই নিজত্ব লাভ করিতে পারেন নাই, ভারতে বহুবিবাহ চিরদিনই প্রচলিত। যে সমাজে বহু বিবাহ আদরের বস্তু, তাহার নৈতিক দুর্গতি বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। যাহার অন্তরে নৈতিক জ্ঞান একটুও অঙ্কুরিত হইয়াছে, তিনিই ইহার অপবিত্রতা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। ভারত রমণীর বর্ত্তমান অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়, তাহার আনুষঙ্গিক, ভারতের সমাজদেহ নৈতিক মহাব্যাধিতে পচিয়া যাইতেছে। অপর পক্ষে ইউরোপীয় সমাজে রমণীগণ দিন দিন উচ্চতর স্থান অধিকার করিতেছেন, জীবনের উচ্চতম ক্ষেত্রে আপনাদের মানসিক ও নৈতিক বলের পরিচয় দিয়া পুরুষের হৃদ্‌গত শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতেছেন, এবং তাহার ফলে, সেই সমাজে সুনীতির আধিপত্য বৃদ্ধি পাইতেছে, পবিত্রতার আদর্শ দিন দিন নির্ম্মলতর হইতেছে। তবে সমাজ জীবনের যে আদর্শের কথা বলিতেছি, তাহা হইতে ইউরোপ আজও বহু দূরে অবস্থিত। সমাজ জীবনে রমণী আজও তাঁহার প্রকৃত স্থান প্রাপ্ত হন নাই। তিনি এখনও পুরুষের পদানত, তিনি এখনও অপেক্ষাকৃত হীন। যখন রমণীর স্বাধীন সত্বা পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি হইবে, যখন তিনি জ্ঞানে নীতিতে, ধর্ম্মে ও কার্য্যে পুরুষের সমকক্ষ হইয়া আপনার প্রকৃত মর্য্যাদা লাভ করিবেন, তখনই তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে পুরুষের শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। এবং তখনই কেবল সমাজ আমাদের এই বিশুদ্ধ আদর্শ লাভের উপযোগী হইবে। যে দিন পুরুষ রমণী সমান ভাবে হাত ধরাধরি করিয়া আদর্শ-জীবন লাভে অগ্রসর হইবেন, যে দিন তাঁহারা পাশা পাশি দাঁড়াইয়া সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে আপনাপন শক্তি নিয়োগ করিবেন, যে দিন পরস্পরের মনুষ্যত্বের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা পরিচালিত হৃদয়ে সম্ভ্রমে পরস্পরের করস্পর্শ করিবেন, সে সুখের দিন কল্পনা করিতেও প্রাণ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে!

স্ত্রীজাতির সামাজিক অবস্থার উপর যে পুরুষরমণীর সম্বন্ধের বিশুদ্ধতা কিরূপ নির্ভর করে পুরুষ রমণীর সকল প্রকার অধিকার-বৈষম্য তিরোহিত হইলে যে এই বিশুদ্ধ আদর্শ কি ভাবে আমাদের নৈতিক জীবনকে নিয়মিত করিবে, তদ্বিষয়ে মহামতি

Thomas Hill Green পুরাতন গ্রীক্ ও আধুনিক ইউরোপের অবস্থা তুলনা করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। *

---

* The moral judgment at its best in any age or country—i. e, in those persons who are as purely interested in the perfection of mankind and as keenly alive to the conditions of that perfection as in them possible—is limited in many ways by the degree of progress actually made towards the attainment of that perfection. It was thus the actual condition of woman the actual existence of slavery, the fact that as yet there had been no realisation, even the most elementary, of the idea of there being a single human family with equal rights throughout—it was this that rendered the Greek philosophers incapable of such an idea of chastity as any imbrutalised English citizen, whatever his practice, if he were honest with himself would acknowledge. To outrage the person of a fellow citizen, to violate the sanctity of his family rights, was for the Greek as well as for us a blamable intemperance. ··· ··· What they had still to learn was not that the duty of chastity like any other, was to be fulfilled from the heart and with a pure will, but the full extent of that duty.

And this they failed to appreciate because the practical realisation of the possiblities of mankind in society had not then reached a stage in which the proper and equal sacredness of all women, as self-determining and self-respecting persons, could be understood. Society was not in a state in which the principle that humanity in the person of every one is to be treated always as an end, and never merely as a means, could be apprehended in its full universality ; and it is this principle alone, however it may be stated, which affords a rational ground for the obligation to chastity as we understand it. The society of modern christendom, it is needless to say, is far enough from acting upon it, but in its conscience it recognises the principle as it was not recognised in the ancient world. *The legal investment of every one with personal rights makes it impossible for one whose mind is open to the claims of others to ignore the wrong of treating a woman as servant of his pleasures at the cost of her own degradation.* Though the wrong is still habitually done, it is done under a rebuke of conscience, to which a Greek of Aristotle's time, with most women about him in slavery and without even the capacity (to judge from the writings of philosophers) for an ideal of society in which this should be otherwise, could not have been sensible. The sensibility could only arise in sequence upon that change in the human person, as such, *without distinction of sex,* became the subject of *rights*. That

এদিকে যেমন সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, সমাজের ধনবল, জ্ঞানবল ও নৈতিক বল সঞ্চিত হইতেছে, তেমনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে মানবের জীবন সংগ্রাম তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। একদিকে যেমন এক শ্রেণীর লোক ঐশ্বর্য্যের উপর ঐশ্বর্য্য ঢালিয়া ভোগবিলাসের চরমসীমায় যাইয়া উপস্থিত হইতেছে, অন্যপক্ষে আর এক শ্রেণীর লোক অহর্নিশি পরিশ্রম করিয়াও অন্নাচ্ছাদন লাভ করিতে পারিতেছে না। সমাজের দ্বারদেশে এক মহা দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা দণ্ডায়মান রহিয়াছে; নিত্যই ইহার শোণিত-শোষিণী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সমাজের নেতাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে। এই বিষম ব্যাধির মূল কোথায়, কি রূপে এ রোগের উপশম হইবে, কেহই স্থির করিতে পারিতেছেন না। নানা মত প্রকাশিত হইতেছে, নানা উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে, কিন্তু এ রোগের জীবনীস্থান কেহই স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না। সুদূর ভবিষ্যতের মধ্যে কোন কালে ইহার প্রকৃত ঔষধ বাহির হইবে কি না, কে বলিতে পারে? এস্থলে এই মহাসমস্যা পূরণ করা আমার উদ্দেশ্য নহে, ক্ষমতারও অন্তর্ভূত নহে। ইহার দুই একটি অবান্তর ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করাই আমার অভিপ্রেত। এই জীবন সংগ্রামের দিনে রমণী আপন অন্নাচ্ছাদন লাভ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার অবস্থা আমি ইতিপূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। এখন বিবাহের উপর ইহার ফলাফল কি রূপ হইতেছে, একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। এ যাবৎ পুরুষই অর্থোপার্জ্জন করিতেন এবং স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের ভার তাঁহারই হস্তে ছিল, তিনিই যেমন করিয়া হয় তাহাদের সমস্ত অভাব সঙ্কুলান

---

change was itself, indeed the embodiment of a demand which forms the basis of our moral nature the demand on the part of the individual for a good which shall be at once his own and the good of others. But this demand needed to take effect in laws and institutions which give every one rights against every one, before the general conscience could prescribe such a rule of chastity, founded on the sacredness of the persons of women as we acknowledge. And just as it is through an actual change in the structure of society that our ideal in this matter has come to be more exacting than that of the Greek philosophers, so it is only through a further social change that we can expect a more general conformity to the ideal to be arrived at. Only as the negative equality before the law, which is already established in christendom, comes to be supplemented by a *more positive equality of conditions and a more real possibility for women to make their own career in life,* will the rule of chastity, which our consciences acknowledge, become generally enforced in practice through the more universal refusal of women to be parties to its violations.

করিতেন। কিন্তু এখন এক মহা পরিবর্ত্তনের দিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পুরাতন সমাজবিধি সমস্তই পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের প্রভাবে বুঝি এ প্রথাও আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক অবস্থার নিষ্পেষণে এ সমাজবিধির পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এই ঘোর জীবন সংগ্রামের দিনে অধিকাংশ পুরুষ আর এত উপার্জ্জন করিতে পারিতেছেন না যে তিনি নায়াসেই পরিবার প্রতিপালন করিতে পারেন। ইহার ফলে, ইউরোপীয় সমাজে বিবাহের সংখ্যা দিন দিনই হ্রাস হইতেছে, অনেকেরই পক্ষে "luxury of a wife" ক্ষমতার অতীত হইয়া পড়িতেছে। সমাজের পক্ষে ইহার ফল নিরতিশয় বিষময়। এখন পুরুষ ও রমণীর সংখ্যা দিন দিনই বাড়িতেছে যাহারা অন্তরে বিবাহের কামনা পোষণ করিতেছেন, অথচ অবস্থা-চক্রে পড়িয়া বিবাহ হইতেছে না। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ও তাঁহাদের অনেকে দেশহিতকর কার্য্যে আপনাদিগকে নিয়োজিত করিয়া জীবন কথঞ্চিৎ কার্য্যকরী করিতেছেন, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সেরূপ হইতেছে না। প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া তাহারা বিবাহ করিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া প্রবৃত্তিস্রোত রুদ্ধ হয় কই? প্রবৃত্তি সমাজবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করিতেছে এবং পাপের স্রোতে সমাজ ভাসিয়া যাইতেছে। অজ্ঞাতজনক শিশুর সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। সমাজের এই শোচনীয় অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে সুনীতি আর সমাজে তিষ্ঠিতে পারিবে না, সমাজ একেবারে অধঃপাতে যাইবে।

সর্ব্বতোভাবে বিবাহের পথ সুগম করিয়া দেওয়া একান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বিবাহার্থী পুরুষ রমণী যাহাতে অনায়াসেই বিবাহ করিতে পারেন ও পরিবার প্রতিপালন করিতে পারেন, তাহা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। যেরূপ দিন পড়িয়াছে তাহাতে একজনের আয়ে পরিবার প্রতিপালন অতি কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, ইহার বাঞ্ছনীয়তা স্বতন্ত্র কথা। পুরুষ রমণী যদি উভয়েই উপায়ক্ষম হন্, তাহা হইলে বিবাহের একটি প্রধান অন্তরায় সরিয়া যায়। আপনাপন গ্রাসাচ্ছাদন অর্জ্জন করিতে পারিলে যুবকযুবতী অনায়াসে বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইয়া গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিতে পারেন। যেমন কালক্রমে পরিবার বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, তাহারা আয়ও বৃদ্ধি করিতে পারেন। কিন্তু ইহা দ্বারা দারিদ্র্য যন্ত্রণা একেবারে উপশমিত হইতে পারে না, দুই এক পদ পশ্চাৎপদ হইল মাত্র। সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিতে হইলে নরনারীকে অধিকতর সংযমী হইতে হইবে। কিন্তু সংযম শিক্ষা দেওয়া বা বিধি দ্বারা সংযম নিয়মিত করা সমাজনীতির সাধ্যায়ত্ত নহে, ইহা ধর্ম্মনীতির অন্তর্ভূত। যাই হউক, পুরুষ রমণী উভয়েই উপায়ক্ষম হইয়া এ ভাবে বিবাহিত জীবন যাপন করিতে পারিলেও দ্বিবিধ উপায়ে দুর্নীতির পথ বন্ধ করিয়া ইহা সমাজে সুনীতির পরিপোষক হইবে। যাহারা বিবাহ-

সূত্রে বদ্ধ হইয়া বৈধ উপায়ে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে না পারিয়া সমাজবিধি উল্লঙ্ঘন করিতেছে, তাহারা এরূপ হইলে সন্মার্গাবলম্বী হইবে। এইরূপ প্রথার শুভ ফল শুদ্ধ এস্থলেই আবদ্ধ নহে। যতদিন পর্য্যন্ত যুবকযুবতী এরূপ সমাজবিধির অধীনেও বিবাহের উপযুক্ত হইতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের উপর ইহার ফল অতি শুভ হইবে। যশোলিপ্সা, স্বদেশবাসী লোকের নিন্দা প্রশংসা আমাদের কার্য্যকলাপকে অতি আশ্চর্য্যরূপে নিয়মিত করে। যে কার্য্য করিলে আমাদের প্রতিবেশীদের নিকট নিন্দনীয় হইতে হয়, সহজে সে কার্য্যে আমরা হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হই না। ইহা একটি সর্ব্ববাদী-সম্মত সত্য। প্রলোভনের তারতম্যানুসারে নিন্দা প্রশংসারও তারতম্য হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অনেক পুরুষ রমণী উপযুক্ত বয়সেও বিবাহ করিতে পারিতেছে না, বিবাহ হইবার আশাও অনেকের নাই। কাযেই অনেকে প্রবৃত্তিকে প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া নীতিমার্গ পরিত্যাগ করিতেছে। সমাজও তাহাদের অবস্থা বিচার করিয়া তাহাদের কার্য্যকে একটু কৃপার চক্ষে, একটু উপেক্ষার চক্ষে দর্শন করিতেছে। তাহার ফলে নীতির বন্ধন আরও শিথিল হইয়া যাইতেছে। কিন্তু বিবাহের সুখ সুলভ হইলে, প্রলোভনের শক্তি হ্রাস হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতির প্রতি উপেক্ষার ভাবও সরিয়া যাইবে, সমাজে নীতির ভাব দৃঢ় হইবে। এবং তাহার প্রভাবে ব্যক্তিগত কার্য্যকলাপও নিয়মিত হইবে। অপরপক্ষে মানুষের যতদিন আশা থাকে, ততদিন সে সহসা কোন অন্যায় কার্য্য করিতে সাহসী হয় না। যুবক যুবতীগণ যখন দেখিতে পাইবে যে অল্পকালের জন্য স্বীয় উচ্ছৃঙ্খল বাসনাকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিলে, সম্মানের সহিত অভীষ্ট লাভ হইবে, তখন কেন তাহারা সমাজবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া জনসমাজের হেয় হইবে? আশা অমূল্য জিনিস। আশার প্রভাবে মানুষ শত সহস্র বাধা ও প্রলোভন উল্লঙ্ঘন করিতে পারে। ইহা মানুষের স্বভাব। যতদিন তাহাদের এই অভীষ্ট লাভের আশা প্রাণে জাগরূক থাকিবে, ততদিন তাহারা সহজে জনসাধারণের ঘৃণা মস্তকে বহন করিতে অগ্রসর হইবে না। সুনীতির পক্ষে ইহার ফল অতীব শুভ। মানব প্রকৃতির এই নিগূঢ় রহস্য যখন সকলে বুঝিতে পারিবেন, তখন যুবক যুবতীর পরস্পরকে সুন্দররূপে জানিবার পক্ষে প্রতিকূল ব্যবস্থা গুলি তিরোহিত হইবে, নরনারীর সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর ও পবিত্রতর হইবে এবং বিবাহের দ্বার সকলের পক্ষে সুন্দরভাবে উন্মুক্ত হইবে। তখন যুবকযুবতীদিগকে একত্রিত হইতে দেখিলে আর কেহ শিহরিয়া উঠিবে না। সেই সমাজের স্বাস্থ্যের অবস্থা। যাঁহারা নরনারীকে পৃথক্ পৃথক্ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা মানব হৃদয়ের গূঢ়তত্ত্ব কিছু মাত্রই বুঝিতে সমর্থ হন নাই, তাঁহারাই মিত্রবেশে সুনীতির পরমশত্রু।

ইয়োরপে যে সমস্ত রমণীকে খাটিয়া খাইতে হয় না, তাঁহাদের একমাত্র কার্য্য বিবাহ। যৌবনে পদার্পণ করিয়া অবধি স্বামী শীকার করাই তাঁহাদের অন্তরের সর্ব্বপ্রধান স্থান

অধিকার করে। ইহাঁরা বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা লাভ করেন, তাহাও বাহ্যিক—তাহাতে জীবনের উচ্চলক্ষ্য তাঁহাদের অন্তরে প্রস্ফুটিত করিয়া দিতে পারে না। কাযেই নানা প্রকার অসারতাতেই তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত হয়। সময় ইহাঁদের নিকট ভারবহ বলিয়া বোধ হয়—কেবল সান্ধ্যসমিতি, বন্ধুবান্ধবদের গৃহ পরিদর্শন ও গল্প ও নভেল-পাঠই ইহাঁদের জীবনের একমাত্র কার্য্য। ইহার নৈতিক ফল বিষময়। মহাত্মা Theodore Parker এই শ্রেণীর রমণীদের অবস্থা এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :— Rich women do not engage in these (industrial) callings. For rich women there is no profession left except marriage. After school-time, women has nothing to do till she is married; I mean, alomst nothing that is adequate. Accordingly, she must choose between a husband and nothing—and sometimes, that is choosing between two nothings. There are spare energies which seek employment befor marriage and after marriage.

রমণী-জীবনের যাহা কিছু কার্য্য তাহা একমাত্র বিবাহের উপরই নির্ভর করে অনেক সময় বিবাহেই তাহা পর্য্যবসিত হয়। এই প্রকার কর্ম্ম কাজবিহীন লক্ষ্যহীন জীবন যে কি কষ্টকর, সমাজের পক্ষে কি অনিষ্টকর তাহা বলা যায় না। এ প্রকার জীবন এক প্রকার জুয়াখেলা। যদি সৌভাগ্যবশতঃ মনোমত স্বামী মিলিল, তবেই জীবনের সকল আশার পরিতৃপ্তি হইল এবং পরেও এক মহা-শূন্য পড়িয়া রহিল। যতদিন পর্য্যন্ত বিবাহের আশা থাকে, ততদিন সেই আশায় মত্ত হইয়া এক প্রকারে দিন কাটিয়া যায়। কিন্তু যখন সে আশা ফুরায়, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উৎসাহ, সমস্ত শরীর মনের ক্ষমতাও অন্তর্হিত হয়। জীবনকে একটি মহা নৈরাশ্যের ছায়া, একটি মহা শূন্যতার ছায়ায় গ্রাস করিয়া ফেলে। বিবাহই রমণী জীবনের লক্ষ্য হওয়াতে, বিবাহের বাজারে এক মহা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব আসিয়া পড়ে। প্রায় সকল অবিবাহিতা রমণীই স্বামীশীকারে ব্যস্ত, এবং পুরুষের মন ভুলাইবার জন্য নানাপ্রকার বিভ্রম চেষ্টা অবলম্বিত হইয়া থাকে। বাল্যকাল হইতে এই চিন্তা মনের উপর কার্য্য করাতে রমণী চরিত্র গঠিত হইতে পারে না। আত্মাদর একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া যায়, আপন ব্যক্তিত্ব ভাব একেবারে বিলোপ প্রাপ্ত হয়। মানব জীবনে এতদপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? যাঁহারা মানব প্রকৃতিকে প্রকৃত শ্রদ্ধা করেন, তাঁহাদের নিকট এরূপ দৃশ্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক। বিবাহ ভিন্ন যদি রমণী জীবনে অন্য কোন মহৎ লক্ষ্য থাকিত, তাহা হইলে এই শোচনীয় দৃশ্য কখনই আমাদের নয়নগোচর হইত না। রমণী যদি সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আপনার শরীর মনের সমুদয় শক্তির উপযুক্ত পরিচালনা করিতে পারি-

তেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবন লক্ষ্যবিহীন হইত না এবং তজ্জনিত নৈতিক অধোগতিও ঘটিত না। এবং তাঁহাদের অবরুদ্ধ শক্তি মুক্ত হইলে সমাজও উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিবে। নারী জাতির সকল প্রকৃত বন্ধুই সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

আমরা যে শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছি, সে দিন রমণীর যে পবিত্র শক্তি আজকাল কেবল গৃহ-প্রাঙ্গনে আবদ্ধ থাকিয়া গৃহের পবিত্রতা রক্ষা করিতেছে, তাহা সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকেও পবিত্র করিয়া তুলিবে। আজকাল জীবনের বাহ্য-প্রদেশেই রমণীর শক্তির কোন কার্য্য দেখিতে পাই না—কারণ সেখানে তাঁহার প্রবেশাধিকার নাই। আমরা দেখিতে পাই, সুসভ্য সমাজে একটি ভদ্র মহিলার সমক্ষে অতি উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিও সংযত হইয়া আইসে, বিশেষতঃ আপন আপন মাতা ভগিনীর নিকট সকলেরই হৃদয়ে পবিত্রতার প্রভা পতিত হয়। সংসারের কার্য্যক্ষেত্র হইতে রমণীগণ দূরে থাকাতে পুরুষের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি সংযত রাখিবার প্রধান শক্তির কোন কার্য্য হইতে পারে না। যদি পুরুষ সর্ব্বদা আপনাপন মাতা ভগিনীর সহিত সংসারক্ষেত্রে কার্য্য করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার চরিত্র আপনা হইতেই পবিত্র হইয়া উঠিবে। সমাজ মধ্যে এক অপূর্ব্ব পবিত্রতার ভাব সঞ্চারিত হইয়া ইহার সমস্ত পূতিগন্ধ বিনষ্ট করিবে। মানুষের বাসনা ও কার্য্য-সংযত হইয়া হৃদয়ের পবিত্রতা সম্পাদন করিবে। রমণী যখন জ্ঞানে ও কার্য্যে পুরুষের সমকক্ষ হইয়া সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবেন, তখন পুরুষ রমণী পরস্পরের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পবিত্রতার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিবেন। জীবনের উচ্চতর লক্ষ্য সাধনে পুরুষ রমণী পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতার আপনাপন অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশ করিতে পারিবেন এবং প্রকৃতির অপূর্ব্ব নিয়মে জীবনের কঠোর কার্য্যও মধুময় হইয়া উঠিবে, সংসারের সুখের স্রোত বর্দ্ধিত হইয়া যাইবে।

শ্রীসীতানাথ নন্দী।

আগরার পথে।

(২)

সাজাহানপুরে পৌছিয়া—যা কিছু আনন্দ উপভোগ—গৃহভিত্তির চতুঃসীমার মধ্যে। বাহিরে গেলেই সেই আনন্দটুকু কাটিয়া যায়—কেননা এখানে দেখিবার বিশেষ কিছুই নাই। না আছে শষ্যশ্যামলা প্রশস্ত প্রান্তর ক্ষেত্র—না আছে গগনস্পর্শী হরিত বর্ণ

বৃক্ষরাজিপূর্ণ-পর্ব্বত শৈল, বা শিল্পের চরমোৎকর্ষ প্রকাশক সুধা ধবলিত সৌধরাজি,—থাকিবার মধ্যে আছে কেবল নিস্তব্ধতা ও কেমন একটা ছায়াময়—প্রীতির বিঘ্নকারী ভাব।

আমরা যেথানে ছিলাম তাহাকে বাহাদুরগঞ্জ বলে। বাহাদুরগঞ্জ সহরের বাহিরের অংশ। থাকিবার মধ্যে কেবল সাহেবী বাঙ্গালা—রাজার কোতোয়ালি আর বাঙ্গালী বাবুদের বাড়ী। বাহাদুর গঞ্জ হইতে আধক্রোশ দূরে সাজাহানপুর সহর, তার পর চক্। এ ছাড়া আরও কতকগুলি বড় বড় বাড়ি আছে।

বাহাদুর গঞ্জটি ঐতিহাসিক স্থান। ইহার কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক বিবরণ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বাহাদুর গঞ্জের উৎপত্তি সাজাহানপুরের জন্মের সমকালীন। সুতরাং এতৎ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

সাজাহানপুরের উৎপত্তি। ১৬৪৭ খৃঅব্দে সাহজাহানের রাজত্বকালে এই নগর সংস্থাপিত হয়। দিলার খাঁ ও বাহাদুর খাঁ নামক দুইজন পাঠান সেনানী ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা। নগর নির্ম্মাণের মূলঘটনা এই, এক সময়ে উক্ত দুইজন পাঠান সেনানী দিল্লী হইতে কনোজে আসিতেছিলেন—পথিমধ্যে একদল দস্যু আসিয়া তাহাদের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। ইহাতে তাঁহাদের প্রায় পাঁচলক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। তখন তাহারা দস্যুদিগকে ধরিতে পারিলেন না—কিন্তু দুর্বৃত্তদিগকে যে উপায়ে হউক গ্রেপ্তার করিয়া দণ্ড দিতে তাঁহাদের বড়ই ইচ্ছা হইল। তাঁহারা এসম্বন্ধে বাদসাহের অনুমতি লইয়া সাজাহানপুরের কাছে (তখনও সাজাহানপুর নাম হয় নাই) "চিনার" নামক স্থানে "বাচ্ছাল" ও "গৌরঠাকুর" নামক দুইজন সর্দ্দারকে পরাভূত করেন। দস্যুদলের সহিত এই যুদ্ধে প্রায় তের হাজার হিন্দু স্ত্রীপুরুষ নিহত হয় এবং মুসলমানও প্রায় ইহাদের সমসংখ্যা নিহত হইয়াছিল। ইহাদের সম্মানার্থে যে গোর নির্ম্মিত হইয়াছিল আজও "ইদের" দিনে মুসলমানেরা তাহা দেখিয়া আসে।

সাহজানকে, দিলার খাঁ—এই যুদ্ধের জয় সংবাদ প্রদান করিলে বাদসাহ সন্তুষ্ট হইয়া দিলার খাঁকে চৌদ্দখানি গ্রাম ও একটি দুর্গ তৈয়ারি করিতে অনুমতি দেন—"নোনারক্কেয়া"য় অর্থাৎ "গারা" ও "খানত" নদীর সংযোগ স্থলে এই দুর্গ বিনির্ম্মিত হইল। দিলার খাঁ সহরের দুইটি "মহল্লা করিয়া একটির নাম 'দিলারগঞ্জ" ও অপর টির নাম "বাহাদুর গঞ্জ" রাখেন। বাহাদুর এই সময়ে বাদসাহের আজ্ঞাক্রমে সিন্ধুনদীর পরপারে পার্ব্বত্য জাতিদের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। দিলারখাঁ সংবাদ পাঠাইলেন "ভাই! তোমার নামে নূতন নগর প্রতিস্থাপিত করিয়াছি, যুদ্ধ শেষ হইলে সেখান হইতে নানাজাতীয় পাঠান ধরিয়া লইয়া আসিও, তাহাদিগকে নূতন নগরে বাস করাইতে হইবে।" বাহাদুর যুদ্ধাবসানে দিলারের অনুরোধে বায়ান্ন শ্রেণীর পাঠান লইয়া বাহাদুরগঞ্জে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহাদের মধ্যে ১৯টি দল আজও বর্ত্তমান।

এতদ্ব্যতীত মুসলমানের সাধারণ ধর্ম্ম অনুসারে অনেক হিন্দুকে বলপূর্ব্বক "বিশ্‌মোল্লা" শুনাইয়া এই পাঠান সম্প্রদায়ের বলপুষ্টি করা হইল।

"বাহাদুরগঞ্জ" ও "দিলারগঞ্জের" সমীকরণ হইয়া সাজাহান বাদসাহার স্মরণার্থে সাজাহানপুর নাম কল্পিত হয়। বাহাদুরের পিতা দরায় খাঁ এক সময়ে বিদ্রোহী খাঁ জাহানের দলভুক্ত হন। পুত্র সম্রাটের দলভুক্ত সেনানী—কিন্তু পিতা বিদ্রোহী। বাদসাহ বাহাদুরকে খাঁ জাহানের দমনের জন্য সৈন্য সমেত পাঠাইলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হইল। দরায় খাঁ সেই যুদ্ধে সাংঘাতিক আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। বাহাদুর পিতার শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহার সেই তীর বিদ্ধ রক্তাক্ত দেহের পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। মুমূর্ষু দরায় পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বাহাদুর আমি যদিও বাদসাহের বিদ্রোহী তত্রাচ আমার এই বিদ্রোহই তোমার উন্নতির কারণ হইবে। আমি ত এখনই মরিব কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার বিশেষ উপকার করিয়া যাইব। তোমার হাতের শীল অঙ্গুরী (signet ring) আমার মুখে প্রবেশ করাইয়া দাও। আমি একজন প্রধান বিদ্রোহী সুতরাং বাহাজাদের আদেশে আমার ছিন্ন মুণ্ড এখনই বর্ষার কলস হইয়া বাদসাহের নিকট উপঢৌকনরূপে প্রেরিত হইবে। বাদসাহ সকাশে উপস্থিত হইয়া তুমি আমার মুণ্ডের মূল্য প্রার্থনা করিবে। বাদসাহের নিমকের অপেক্ষা তুমি যে পিতার প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান কর—এই বিশ্বাসে বাদসাহ তোমায় পুরস্কৃত করিতে চাহিবেন—এবং তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণের আবশ্যক হইলে তুমি আমার শব মুণ্ড খুলিয়া অঙ্গুরীয়ক দেখাইও।" বলা বাহুল্য দরায়খাঁর প্রত্যেকবাক্য সম্পূর্ণ সত্যে পরিণত হইল। বাহাদুর বাদসাহের নিকট কথিত পুরস্কার পাইলেন এবং বিশেষ সম্মান চিহ্ন স্বরূপ "লোহিত পতাকা" রাখিবার অনুমতিও পাইলেন। এই সময় হইতে বাদসাহের নামে নব প্রতিষ্ঠিত নগরীর নাম "সাহজাহান পুর" হইল।

পরবর্ত্তী বিবরণ।—ইহার পর সাজাহান পুরের বিবরণ ঘোর তমসাবৃত। বাহাদুরের মৃত্যুর পর ইহা বুদাঁওএর শাসনকর্ত্তার হস্তে দিল্লীর বাদসাহদিগের অধীনে থাকে। ইহার পর মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন হইলে—নদির সাহ ভারত আক্রমণ করেন এবং ইহার পর দিল্লী সিংহাসনের সমস্ত ক্ষমতা লোপ হইলে মহম্মদপালের এক জন প্রধান সৈনিক দিল্লী সরকারের ক্ষমতার বিরুদ্ধে নিজাধিকৃত রাজ্যের সহিত সাজাহানপুরও দখল করিয়া লয়েন।

সাজাহানপুরে অযোধ্যার নবাবাধিকার। সাজাহানপুর অপেক্ষাকৃত শস্যশালিনী বলিয়া অযোধ্যার নবাব সফদারজঙ্গ বহুকাল হইতেই ইহার প্রতি লোলুপ নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। কিন্তু ইহার তদানীন্তন অধিপতি আলি মহম্মদের ভয়ে কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহার পর সফদার জঙ্গ বাদসাহের সহিত চক্রান্ত করিয়া আলি মহম্মদের অধিকৃত "বনগড় দুর্গ" আক্রমণ করেন।

আলি মহম্মদ এই যুদ্ধে বন্দীকৃত হন—কিন্তু বাদসাহ তাহার বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করতঃ সরছিন্দের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু আমেদ সা আবদালির আক্রমণের পর দিল্লীর দরবারের ক্ষমতা অল্প হইয়া পড়াতে আলিমহম্মদ পুনরায় ফিরিয়া ইহা দখল করেন। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়—এবং মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত সাজাহানপুর তাঁহার দখলে রাখেন।

ইহার পরবর্ত্তী ইতিহাস তত আবশ্যকীয় নহে। এতদিন পর্য্যন্ত সাজাহানপুর রোহিলাদের অধিকারভুক্ত ছিল—কিন্তু এদিকে কলিকাতায় যে সকল চক্রান্ত চলিতেছিল তাহাতেই রোহিলার রাজলক্ষী ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

অযোধ্যার সিংহাসনে সুজাউদ্দৌলা বসিয়াছেন আর কলিকাতার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্ষুদ্র অধিকারের একমাত্র কর্ত্তা হইয়া হেষ্টিংস সাহেব কলিকাতার বিরাজ করিতে ছিলেন। সুজাউদ্দৌলার মনে রোহিলগঞ্জ জয়ের বাসনা বিলক্ষণ বলবতী হইয়া উঠাতে তিনি অর্থ লোলুপ হেষ্টিংসের নিকট এই সম্বন্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজেরা সুজাউদ্দৌলার টাকা খাইয়া নির্দ্দোষা রোহিলাদের চিরপ্রিয় রোহিলখণ্ডে ঘোরতর সংগ্রামানল প্রজ্জ্বলিত করিল। এই যুদ্ধের চরম ফল রোহিলাদিগের অধিনায়ক হাফেজ মহম্মদের শোচনীয় মৃত্যু, সুজাউদ্দৌলার রোহিলখণ্ডাধিকার, রোহিলাদিগের স্বাধীনতা হরণ। শত সহস্র বিদ্রোহী পাঠানের তপ্ত শোণিতে—সুজাউদ্দৌলার জিগীষা বৃত্তি চরিতার্থ হইল। এই অন্যায় যুদ্ধের জন্য—হেষ্টিংস সাহেবকে পরিণামে কিরূপ যন্ত্রনা ভোগ করিতে হইয়াছিল ইতিহাস পাঠক মাত্রেই তাহা জানেন। শত সহস্র ক্রোশ দূরে বিস্তীর্ণ জলধি পারে সুপ্রশস্ত জনসমাকুল হর্ম্ম্য মধ্যে মহামতি বার্ক ও সেরিডনের জলন্ত ভাষাময়ী বজ্রনিনাদে—এক সময়ে যে হেষ্টিংসের এই কুকীর্ত্তি সম্যকরূপে বিঘোষিত হইয়াছিল—ও তাঁহার এই পাপকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

১৭৭৪ হইতে ১৮০১ পর্য্যন্ত সাহজাহানপুর বিভাগ অযোধ্যার নবাব সরকারের অধীনে থাকিয়া—পরে ১৮০১ খৃঃ অব্দের সান্ধতে লর্ড ওয়েলেস্‌লীর সময়ে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের কর কবলিত হয়। ইংরাজ শাসনে ইহার মধ্যে অনেক পথ ঘাট হইয়াছে—রেলওয়ে বিস্তৃতি হওয়াতে বানিজ্যের ও উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু অধিবাসীরা আজও শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। সাজাহানপুর পাঠানের দেশ; পাঠানের উষ্ণ মস্তিষ্কে যুদ্ধ বিগ্রহের কোলাহল ছাড়া বিদ্যার বিমল রশ্মি প্রতিভাত হইতে অনেক বিলম্ব লাগিবে।

সাহজাহানপুরে বাঙ্গালীর সংখ্যাও কম নহে। ভারতের অগম্য স্থানেও বাঙ্গালী প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এ অঞ্চলের লোকের কাছে বাঙ্গালীর খাতির কিছু বেশী। বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের উৎকৃষ্টতা দেখিয়াই হউক বা সাহেবদের সহিত তাহাদের বেশী

মিশামিশি ভাব দেখিয়াই হউক—ইহারা বাঙ্গালীদের বড় খাতির করে। এক দিন—চকে বেড়াইতে গিয়াছি—ইতি মধ্যে দেখি এক জন সুশ্রী গৌরবর্ণ পাঠান যুবক আমার কাছে হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপস্থিত,—তাহার সঙ্গে যেন কতকালের আলাপ এইরূপ ভাবে এক লম্বা সেলাম ঠুকিয়া বসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি প্রয়োজন?" তাঁহার খাঁটী উর্দ্দুর মধ্যে মোটামুটি বুঝিলাম—সেই ব্যক্তি বাজারে এক জনের নিকট—একটী হারমনি ফ্লুট কিনিবে আমাকে তাহার দর যাচাই করিয়া দিতে হইবে—জিনিস পরখ করিয়া দেখিতে হইবে। সেত কোন মতেই ছাড়ে না দেখিয়া অগত্যা তাহার সঙ্গে চলিলাম—গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—যন্ত্রটী বাহির করিয়াছে বটে—কিন্তু কেহই বাজাইতে পারিতেছে না। আমার হারমোনিয়মের বিদ্যার দৌড় বড় বেশী নয়—কিন্তু যাহা ছিল—তাহা দেখিয়াই তারা স্তম্ভিত হইয়া আমায় একটা মস্ত কালোয়াৎ ঠাওরাইল। রাস্তার ধারে লোকও জুটিয়াছিল কম নয়—আমি তাহার যা দর বলিয়া দিলাম—তাহাতেই চুক্তি হইল। ক্রেতাকে এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলিয়া বোধ হইল—সে ব্যক্তি তাহার বাড়ীতে যাইবার জন্য পর দিন আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল—এবং উপহার স্বরূপ খানিকটা আতর লাভ করিলাম।

সাজাহানপুরের কাছে—"রোজা ফ্যাক্‌টরি"। এটি মদেরও চিনির কারখানা। ব্যবসায়টী অবশ্য ইংরাজ সওদাগরদিগের দ্বারা পরিচালিত বুঝিতে হইবে। ইংরাজ এইখানকারই ক্ষেত্রোৎপন্ন ইক্ষুদণ্ড পেষণ করিয়া কত লক্ষ মুদ্রা দেশে চালান দিতেছেন—আর দেশের লোক চক্ষু থাকিতে অন্ধ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে।

সাজাহানপুরে থাকিয়া যে সকল লোকের সহিত পরিচয় হইয়াছিল—তাহাদের মধ্যে একজন গবর্ণমেণ্ট উকীলের নাম আমার স্মৃতি পথে চিরাঙ্কিত থাকিবে। উকীল মহাশয়ের নিকট হইতে সাজাহানপুরে মুসলমান অধিকারের ইতিহাসের জন্য আমি অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

প্রাচীন বিবরণ—সাজাহানপুরের প্রাচীন বিবরণ অনুসন্ধান করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। ইহা ঘোরতর অন্ধতমসাচ্ছন্ন। সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে যে অতি সূক্ষ্ম আলোক কণা পাওয়া যায় তাহারই সহায়ে যাহা কিছু অনুসন্ধান করা যায়। এ সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি তাহাই পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের নগর সংস্থান ধরিতে গেলে সাজাহানপুর বিভাগ—উত্তর ও দক্ষিণ পাঞ্চালের সীমা মধ্যবর্ত্তী হইয়া পড়ে। উত্তর পাঞ্চালের রাজধানীর পৌরানিক নাম "অহিচ্ছত্র" বা "অহিক্ষেত্র"। দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানীর নাম "কাম্পিল্য" অহিচ্ছত্রের আজও কোন কোন প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় তাহাই এক্ষণে প্রত্নতত্ত্ববিতের সম্পত্তির মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে।

মহাভারতীয় কালে সমগ্র পাঞ্চাল রাজ্য দ্রুপদবংশীয় রাজগণের অধীনে ছিল।

সেই সময়ে ইহার বিস্তৃতি হিমালয় পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে চম্বলনদীর পার্শ্বস্থ সমস্ত ভূভাগ লইয়াছিল। সমগ্র পাঞ্চাল রাজ্য পরে উত্তর ও দক্ষিণ দুই অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। উত্তর পাঞ্চাল কুরুসেনা-নায়ক দ্রোণাচার্য্যের শাসনাধীনে ছিল এবং দক্ষিণ পাঞ্চালে দ্রুপদ রাজা রাজত্ব করিতেন। উত্তর পাঞ্চাল কি উপায়ে দ্রুপদের হস্ত হইতে দ্রোণাচার্য্য কাড়িয়া লয়েন, মহাভারতের পাঠকগণের নিকট তাহা অবিদিত নাই।

উত্তর পাঞ্চালের রাজধানীর নাম "অহিচ্ছত্র"। আজকাল বর্ত্তমান "রামনগর" অহিচ্ছত্রের অতি সান্নিধ্যে অবস্থিত। বিশেষ চেষ্টা করিলে কিম্বদন্তী বা চলিত ইতিহাসের সহায়তায় ইহার প্রাচীন বিবরণ কতক সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বিখ্যাত চীন দেশীয় পরিব্রাজক যখন এই "অহিচ্ছত্র" দর্শন করিতে আসেন তখন তিনি তৎসাময়িক অবস্থা বর্ণনা করিয়াছিলেন। ইহার বিস্তৃতি তখন ১৭ বা ১৮ "লি" অর্থাৎ প্রায় তিন মাইল ছিল। চারিদিক প্রকৃতির বন্ধনে সুরক্ষিত, নগর মধ্যে ১০টী বৌদ্ধমঠ এবং এই সমস্ত মঠে প্রায় সহস্রাধিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিত। "হিয়াংসাং"এর সময়ে এই স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের এতাদৃশ বহুল বিস্তৃতি সত্ত্বেও এখানে ৮।৯টি শিবমন্দির ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের একমাত্র নিদর্শন স্বরূপ মরুভূমে আরব দ্বীপের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থান আরম্ভ হয়। পরবর্ত্তী হিন্দু মন্দিরের বর্দ্ধিত সংখ্যা হইতেই এই ঘটনার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। "অহিচ্ছত্রে" কত দিন ধরিয়া হিন্দু রাজত্ব ছিল তাহা নির্ণয় করা অতি দুরূহ। আনুমানিক বোধ হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত ইহা হিন্দু শাসনের অধীনস্থ ছিল। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলেন—গিয়াসউদ্দিনের ভয়ানক আক্রমণে (১২৬৬ খৃঃ অব্দ) অথবা ফিরোজসার লুণ্ঠনে (১১৭৯) হিন্দু শাসন কর্ত্তৃত্ব সম্যক রূপে উন্মূলিত হয়। অহিচ্ছত্রের সান্নিধ্যে এক জঙ্গল মধ্যে একখানি প্রস্তর ফলক পাওয়া গিয়াছে—তাহাতে ১০৬০ সম্বৎ (প্রায় ১০০৪ খৃঃ অব্দ) খোদিত আছে। এই খোদিত লিপি আমাদের পূর্ব্বোক্ত অনুমানের বিশেষ সমর্থন করিতেছে।

"অহিচ্ছত্রে" অর্থাৎ বর্ত্তমান রামনগরের সীমার মধ্যে আজও একটী ভগ্নাবশেষ দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন দ্রোণাচার্য্য এই দুর্গের সংস্থাপয়িতা। আবার অন্যমতে "আদি আহীর" এই দুর্গের সংস্থাপক। "আদি আহীর" সম্বন্ধে আমরা একটী কিম্বদন্তী শুনিয়াছি। একদিন দ্রোণাচার্য্য পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে দেখিলেন—একটী বালকের মাথায় এক কাল সর্প ফণা ধরিয়া আছে। দ্রোণাচার্য্য এই ঘটনা দেখিয়া বলিলেন কালে এই বালক রাজচ্ছত্রে বিভূষিত হইবে। তাঁহার বাক্য সফল হইল। "আদি আহীর" রাজা হইলেন। "আদি কোট" নামক

দুর্গ ও "আদি সাগর" নামক ৯৩ বিঘা ব্যাপৃত পুষ্করিণী আজও আদি আহীরের কীর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে। আদির মস্তকে অহিতে ছত্র ধরিয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ বলেন—এই স্থানের নাম, অহিচ্ছত্র হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হিয়াংসাং বলেন—"নগরের বাহিরে একটী "নাগ হ্রদ" ছিল। সেই স্থানে গৌতম সাত দিন ধরিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া—হ্রদস্থিত সর্প রাজকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। নাগরাজ নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া স্বীয় বিপুল ফণা বিস্তার করিয়া বুদ্ধদেবের মাথায় ছত্র ধরিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম "অহিচ্ছত্র" হইয়াছে।

প্রখ্যাত নামা "বৌদ্ধ সম্রাট" অশোক এই স্থানে একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করেন।

অহিচ্ছত্রের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আরও একটী প্রমাণ এই, সুবিখ্যাত টলেমি ইহাকে নিজ গ্রন্থে Adisadra বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যে অহিচ্ছত্র পূর্ব্বে হিন্দু ধর্ম্মের বিমল বিভায়, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রখর জ্যোতিতে ঝলসিত হইয়াছিল—সেই অহিচ্ছত্রে এক্ষণে প্রত্নতত্ত্ব-বিদের তৃপ্তিকর কয়েকটী অতীতস্মৃতি ভিন্ন সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জক আর কোন দর্শনীয় বস্তু নাই।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

কবির অ্যাল্‌বম্।

নিজে photo তুলিয়া নিজের album সাজান ভারি ঝকমারি। বিশেষ আমি এক প্রকার শিক্ষানবিশ; এখনও ছায়ালোক সম্পাতে ভাল করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করি নাই। সে যাহা হউক আমার একটি সুনিপুণ photographer-বন্ধুর তোলা photoগুলি European firmএর তোলা photoর অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। তিনি আমার চিত্রগুলির সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা অতিশয় মূল্যবান ও নিরপেক্ষ। তিনি বলিয়াছেন "দুইটি স্ত্রীলোককে একত্রে দাঁড় করাইয়া জোড়া photo টানা মহাভুল। 'সুমিত্রা-ভামিনী'ত সহজ মেয়ে নহে—সিংহ-রাশ-মেয়ে—"ইলা"র পার্শ্বে বসিয়া তাহার ত' আর চুপটি করিয়া থাকা, সম্ভব নহে—ক্রমাগত নড়িয়াছে ও গা দোলাইয়াছে, সুতরাং তাহার photo নেহাৎ dim হইয়া পড়িয়াছে। সে মহিমাময়ী নারীকে একবার solitary gloryতে তোলা কর্ত্তব্য। রোহিনীকে দাঁড় করাইয়া তোলা ভাল হয় নাই; তাহাকে এক easy chairএ বসাইয়া তোলা উচিত ছিল। আর Cleopatraকে state chairএ না বসান নেহাৎ অন্যায় কাজ হইয়াছে, প্রভাতের

তরুণালোকে যখন দাঁড়ে বসিয়া কাকাতুয়া গালি দিতে থাকে তখন Beatriceএর photo তুলিলে হুবহু ঠিক্ হইত। আর দুই একটা তুবড়ি ছুড়িয়া, রঙমশাল জালিয়া Rosalind তুলিলে অপূর্ব্ব হইত।"

এইত গেল মিত্রপক্ষে। এখন আবার অন্য পক্ষের কথা বলি। একজন critic বলিলেন "ইহা'ত photo নয়, এ যে কদর্য্য দিশি পট"। আর একজন গভীর বুদ্ধি সমালোচক গম্ভীরভাবে বলিলেন "ইহা photo তো নয়ই নয়, ইহা দিশি পটও নয়-ইহা SONNET"। আর আমার ছোট ভাই শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ (যিনি না শত্রু না মিত্র) ভায়া বি এ ক্লাসে পড়েন—বলিলেন "দাদা, এ'ত sonnet ও নয় ইহা'তে true Italian sonnets এর characteristics কই?—ইতি

শ্রী——শিক্ষানবিশ।

জুলিয়েট।

লাল, নীল, শ্বেত, পীত স্বর্ণবর্ণরাজী,
পুষ্পোপরি পুষ্প ঢালা, পরতে পরতে;
শিশির ও জ্যোৎস্না ঢালা সঙ্গীতের স্রোতে;
কি বিচিত্র সমাবেশ! একি ছায়াবাজী?
বসন্ত-উৎসব-দিনে, মালাকার সাজি,
কি গড়িলে এক চিত্তে অনঙ্গমোহিনী?
স্ফূর্ত্তিময়ী মূর্ত্তি এ যে! স্মর,সোহাগিনী
ক্লান্ত তুমি;—ঘুমাও, ঘুমাও, দেবি, আজি!
চুপি চুপি, ধীরে তথা, আসিয়ে মদন,
বিচিত্র সে পুষ্পমূর্ত্তি অবাক্ নেহারি!
মুগ্ধ স্মর, কর্ণে তার করি উচ্চারণ
অগ্নি মন্ত্র; "উঠ, উঠ" কহিলা ফুকারি—
বিস্ফারি যুগল নেত্র, মূরতি হাসিল,
"আমি জুলিয়েট" বলি, উঠি দাঁড়াইল!

মিরেণ্ডা।

দেখিনু অদ্ভুত স্বপ্ন। পূর্ণিমা শর্ব্বরী;
নিথর শান্তির রাজ্যে সুধাকর হাসে!
সহসা উঠিল ঝড়, তোলপাড় করি
স্বর্গ মর্ত্ত্য; ম্লান শশী কাঁপিল তরাসে।
ব্যোম-যাদুকর কিন্তু করিয়া ভ্রূকুটী,
থামাইল ভীম বাত্যা; মেঘ নাট্যশালে,
অদ্ভুত অপ্সর-বাদ্য বাজে তালে তালে!
কি অদ্ভুত! অন্তরীক্ষে নাচে নটনটী!
আমারো স্বপ্নের কায়া ব্যোম-যাদুকর
দিল কি বদলি? এ কি চমৎকার হেরি?
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল চন্দ্র কলেবর;
দেখা দিল রঙ্গভূমে, এ কোন্ কিন্নরী?
তুমি কি মিরণ্ডা? কিম্বা আকাশের শশি?
বুঝিব কি? দৃশ্যে আঁখি গেল যে ঝলসি!

বিএট্রীস্।

কল্পনার চিত্রশালা-নিরালায় বসি,
আঁকিতে এ ব্যাপিকারে তুলিনু তুলিকা!
হেরিলাম বিভীষিকা!—যেন অগ্নিশিখা
বায়ু-অঙ্গে রঙ্গভঙ্গে যাইতেছে মিশি,
কোথা হ'তে, ঝটপট, উড়ে এল নুরী;
সমৃণাল রক্তপদ্ম, বায়ু-স্রোতে ভাসি!
কোথা হ'তে ভৃঙ্গ এল, গুঞ্জরি গুঞ্জরি;
ঢালি দিল অঙ্গে মোর রোষ-বিষ-রাশি!
হেরি এ বিবশা দশা, হাসি উচ্চহাসি,
কে যেন রে নারীকণ্ঠে দিল টিটকারি!

"আ মরি কি চিত্রকর! যাই বলিহারি!"
দিয়া ঘন করতালি, কহিল সম্ভাষি।
ঘুরে গেল চিত্র আঁকা, হেরি বিভীষিকা;
উছলি পড়িল রঙ,—ভাঙিল তুলিকা!

রসেলিণ্ড।

বাল শরতের কোথা রজত-নীরদ,
আলোতে বায়ুতে যাহা মিলায় চকিতে?
কোথা সে বাসন্তী ঊষা, পদ-কোকনদ
হেরি যার, ভাসে কুঞ্জ স্বর লহরীতে?
কোথায় সে নির্ঝরিণী মুকুর-রূপিণী,
দেখায় যা স্থিরাকাশে নব তারাবলী?
আবার (সে নবরঙ্গে সতত রঙ্গিণী
রবি-কর মাখি অঙ্গে, নাচে হেলি ঢুলি!
হেলি ঢুলি, যেন সবে, করি গলাগলি);
এস এস, কবি চিত্তে, বোস আসি সবে;
চিনিতে কি পারিলে না? দেখ আঁখি মেলি
তোমাদেরি সখী হেথা বসেছে গৌরবে।
রসময়ী রসেলিণ্ড রঙ্গিণী সঙ্গিনী!—
হাস ঊষা, ভাস মেঘ, নাচ নির্ঝরিণী।

দ্রৌপদী।

(Tyndall, Huxley, Spencer, Darwin-
প্রভৃতি জড়বাদীদিগের গ্রন্থ পাঠান্তে)

হে প্রকৃতি! যত তোমা নেহারি নেহারি,
তত নব নব শোভা চর্ম্মচক্ষে ভায়!
হে দ্রৌপদি! যত তোমা উঘারি উঘারি,
নগ্ন করা দূরে থাক্, সাটী বেড়ে যায়!
অশোক, চম্পক, পদ্ম, অতসী, কাঞ্চন,
অনন্ত সাটীতে ঘেরা, অদ্ভুত ঘাঘরি!
প্রকৃতি সতীর আহা লজ্জা-নিবারণ,
অন্তরালে, চুপে চুপে, যোগান্ শ্রীহরি!
ক্ষম দেবি অপরাধ, বিশ্বের জননি;
মোরা সবে দুঃশাসন, দাম্ভিক অজ্ঞান;
সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত!—তপ্ত রক্ত পান
করুক্ নৈরাশ্য ভীম, করি জয়ধ্বনি
মোরা যত কুলাঙ্গার, নির্ব্বাক্, নীরবে,
সভামাঝে, অধোমুখে, বসে আছি সবে!

ডেসডিমনা।

ভৃঙ্গ এক, বসি ধীরে, অতসীর পাশে,
কহিল প্রাণের কাণে গুঞ্জরি গুঞ্জরি;—
"লো অতসি, বীর আমি, নবীন উল্লাসে,
কান্তারে কান্তারে ভ্রমি, আপনা পাশরি!
গোলাপ কেতকি পদ্ম দুর্গম আবাসে,
যথা তথা গতি, আমি ভুবন বিহারী!
ভাল কি বাসিবে মোরে?"—মৃদু মন্দ হাসে,
কহিল অতসী "দেব, আমি গো তোমারি!"
কাঁদি গেল প্রজাপতি বিচিত্র বরণ;
এ কেমন পূর্ব্বরাগ অতসী রূপসী?
যাদুকর ভৃঙ্গ আসি, করি গুঞ্জরণ,
সরল চিত্তের আঁখি দিল কি ঝলসি?
প্রেমরাজ্যে নহে ইহা অপূর্ব্ব কাহিনী;
সাক্ষী তার ডেস্‌ডিমোনা বিশ্ববিমোহিনী।

ইলা।

(রবীন্দ্র বাবুর "রাজা ও রাণী" পাঠ করিয়া)

কবিচিত্ত-নন্দনেতে, সুমিত্রা ভামিনী,
ফুল্ল মৃণালিনী যেন, রবির দুলালি!
হে ইলা, হে কুমারের চির সোহাগিনি,
তুই কি লো অতি মৃদু যূথিকা বৈকালী?
তুই কি বন-মালতী, কানন-বাসিনি?
তুই কি লো ক্ষুদ্র কুন্দ, মল্লিকার আলি?
না—না—ইলা—তুই চির আনন্দদায়িনী,

শরৎ মুকুট শোভা, সুন্দর সেফালি!
কঠিন কঠোর শাখে জনম লভিলি;
জোছনার আবছায়ে, মরম খুলিয়া,
শাদা প্রাণে, রাঙা ঠোঁটে, হাসিয়া, কাঁদিয়া,
নিশান্তে, অশ্রুর সাথে, ঝরিয়া পড়িলি?
আমি পান্থ, যেতেছিনু বনপথ দিয়া
মোরো প্রাণে অই বাস গেল জড়াইয়া!

ভ্রমর।

(বঙ্কিমবাবুর "কৃষ্ণকান্তের উইল" পাঠ করিয়া)

ফলফুলে ভরা সেই মালঞ্চ মধুর
স্থানে স্থানে চন্দ্রাতপ শ্যামল পল্লবে;
কোকিল কূজনে নাহি বিরহের সুর;
গরল মাখান নাই কুসুম-আসবে,
মধু পিয়ে প্রাণ কভু হয় না আতুর;
শিরে ব্যথা নাহি বাজে রবির কিরণে;
ভ্রমরের গুঞ্জরণে হর্ষ ভরপুর;
মলয়া ঝটিকা-স্বপ্ন হেরে না স্বপনে!
কে অই দাঁড়ায়ে হোথা শ্যামাঙ্গিনী ধনী
যেন রে অপরাজিতা সুনীল বসনে!
পুষ্পময়ী এ প্রহরী পুষ্পের উদ্যানে,
অনুপম অপরূপ মালঞ্চ মালিনী!
হে পান্থ, এ পুষ্প সেবা, দুচরণে দলি,
ত্যজি এ ভ্রমর-কুঞ্জ, গেলে কোথা চলি?

রোহিণী।

হেম শৃঙ্গ।—ইন্দ্রধনু বিচিত্র বরণে,
মেঘের কাঞ্চন দেহ করিছে রঞ্জিত!
আপনি বাজিয়া উঠে, বিচিত্র বাদনে,
তরু-দেহ, লতারাজি, বায়ু-আন্দোলিত!
সুখের আবেশে আর মোহের স্বপনে,
তরল পান্থের প্রাণ হইল মোহিত।
বাড়িল রূপের তৃষ্ণা, মধ্যাহ্ন জীবনে;
জল-অন্বেষণে পান্থ হইল ধাবিত!
উঠিল তুফান ঘোর!—পর্ব্বত বিদারি,
শৃঙ্গ হ'তে, শৃঙ্গান্তরে, নির্ঝরিণী ছোটে;
কুহকী অপ্সরী আসি, দুভুজ প্রসারি,
পথিকের ক্লান্ত দেহ ধরিল সাপটে!
পান্থ কহে "প্রাণ যায়, দাও মোরে জল"
রোহিণী অপ্সরী দিল ঘোর হলাহল!

ক্লিওপেট্রা।

কভু তুমি লোলজিহ্বা, বিকট সর্পিণী;
রাসলীলাময়ী কভু, মোহিনী অপ্সরী!
কভু সিংহিনীর বেশ, কভু বা হরিণী,
কি অদ্ভুত বহুরূপী, তুইলো মৈশিরি!
ক্রোধের আগ্নেয় গিরি, হাস্যতরঙ্গিনী,
চাহ এণ্টনির পানে যে মূরতি ধরি,
ঝলকে ঝলকে তব, হে বর-রঙ্গিনী,
অপাঙ্গে ঝরিয়া পড়ে অপূর্ব্ব মাধুরী
হেরিলা প্রকৃতি দেবী, বসি নীল নভে,
(পলকে বদলে যবে নব কাদম্বিনী)
ছড়ায়ে পুচ্ছের জ্যোতিঃ, বিকট উৎসবে,
চলিয়াছে ধূমকেতু—দেব-সম্মার্জ্জনী!
সাপটি সে পুচ্ছগুচ্ছ, কুহকী প্রকৃতি,
আঁকিল এ নারীচিত্র—অপূর্ব্ব মূরতি!

অফিলিয়া।

এযে সুকঠিন ধরা, উপল বন্ধুর;
ঝরিয়া পড়িলি হেথা, তুইরে শিশির!
অমরার গীতি তুই, মধুর-মধুর;
পড়িয়া চীৎকার রাজ্যে হইসি অস্থির!
লো কপোতি, ঝটিকার হিল্লোলে পড়িয়ে,
(চারিধারে অন্ধকার, দলকে দামিনী!)

দলাসলা ক্ষীণডানা, ঝালাপালা হয়ে,
চক্রে চক্রে বিঘূর্ণিত, হারাইলি প্রাণী !
প্রেমের সৌরভ ছিল হৃদয়-কোরকে,
পলকের তরে তবু তুইনা জানিলি ;
কামিনী কুসুম তুই যামিনী অলকে,
ভাল করে না ফুটিতে ঝরিয়া পড়িলি !
জীবনে কাটিল কীট, হইলি আতুর,
মরণে পাইলি শেষে "মধুর মধুর।" *

* "Sweets to the sweet, farewell" !
Ham.

মানুষের ধর্ম্ম কি ?

জগতের আরম্ভ হইতে একাল পর্য্যন্ত সকল দেশে ও সকল প্রকার লোকের মুখে দুইটি প্রশ্ন শুনা যায়—"আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি ?" "আর মৃত্যুর পরেই বা কোথায় যাইব ?" মানবজাতির আদি ও পর জীবনের রহস্য মানুষের কাছে অতি আগ্রহের বিষয়। সেই জন্য ঐ দুই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ পৃথিবীতে নানা ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহার উত্তরদান মানসে হিন্দুধর্ম্ম বলে—মানবজীবন স্বর্গীয় আত্মার এক এক অংশস্বরূপ ; সৃষ্টিকর্ত্তা চিরকাল নিজ আত্মা হইতে জীবাত্মার সৃজন করেন, আর মানুষের মৃত্যুর পর তাহা পুনরায় নিজেতে মিশাইয়া লন ; ঐ স্বর্গীয় ক্ষমতাই কেবল স্থায়ী, আর সমস্তই মায়া।

বৌদ্ধেরা বলেন—ভিন্ন ভিন্ন বিবর্ত্তন দ্বারা অসম্পূর্ণ জীবন সম্পূর্ণ হইলে উহার নির্ব্বাণ হয়, অর্থাৎ অনন্তে মিশিয়া যায়। সে জন্য সংসারের অশান্তি,জ্বালা যন্ত্রণা ও পাপপ্রলোভন হইতে পলাইয়া শরীর ও মনের সংযম দ্বারা জীবাত্মাকে সম্পূর্ণ করাই বৌদ্ধ জ্ঞানীদের প্রধান লক্ষ্য।

প্রাচীন হিব্রুধর্ম্ম অন্যদিকে পার্থিব আমোদ আহ্লাদকেই জীবাত্মার প্রধান সুখ বলিয়া ভাবিত। নানা দাসদাসী ও সুন্দরী নারীতে বেষ্টিত থাকিয়া সুখাদ্য দ্রব্য ও বিলাস ভোগ করাই প্রাচীন য়িহুদীর পরম ধর্ম্ম ছিল। ক্রমে মোসেস য়িহুদীদের মধ্যে একেশ্বরের পূজা প্রচলিত করেন, আর তাঁর সময় হইতেই য়িহুদীরা—নশ্বর জীবনের সুখ জীবাত্মার প্রধান ভোগ—এই ধারণা ত্যাগ করিয়া মৃত্যুর পর অনন্ত জীবনে বিশ্বাস স্থাপন করে। আত্মার ঐ পরজীবন ও অনশ্বরতায় বিশ্বাসই খৃষ্টান ধর্ম্মের মূল। যীশুখৃষ্টের কথা মতে—"মানবাত্মা জগতে পরীক্ষার নিমিত্ত কেবল অল্পদিনের জন্য এখানে আসে, মৃত্যুর পর উহা মাটীর শরীর হইতে মুক্ত হইয়া খৃষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরের পাশে যায় ও অনন্ত স্বর্গ সুখ ভোগ করে।

মুসলমান ধর্ম্ম উহার বিলাসী ও রিপুপরবশ ভক্তদের রুচি বুঝিয়া নিজেদের পার্থিব ও সাংসারিক সুখের আদর্শ স্বর্গীয় জীবনের অনন্ত ভোগ ও উল্লাসকে অতিরিক্ত রঙ দিয়া

আঁকিয়াছে, মৃত্যুর পর অনন্ত কাল স্বর্গীয় অপ্সরাদের মধ্যে থাকিয়া নাচগান ও ভোজন-আমোদে সুখভোগ করিতে পাওয়া যায়—ইহাই তাহাদের বিশ্বাস।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম দেশ, কাল, লোক ও অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ঐ প্রশ্নের উত্তর স্থির করিতে চেষ্টা পাইয়াছে, আর আপন আপন দেশীয় লোক ও সামাজিক প্রথানুসারে পরজীবনের স্বর্গ কল্পনা করিয়াছে। কিন্তু ঐ নানা জাতীয় বিভিন্ন ধর্ম্ম খুঁজিলে উহাদের মধ্যে একটী বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। কি অসভ্য বন্য জাতি, কি মার্জ্জিত সভ্য লোক, কি জ্ঞানী কি অজ্ঞ সকলেই এক সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। জীবনমৃত্যু যে তাঁরই ইচ্ছা বা আদেশে হয় এ জ্ঞান কোন না কোনরূপে যেন তাহাদের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে।

জন্মমৃত্যুর কথা ভাবিতে ভাবিতে মানুষ প্রথম অনন্তকালের জ্ঞান পায়, আর সেই অনন্তকালের সঙ্গে সঙ্গে এক অনন্ত অসীম ঈশ্বরের ধারণা মানব-মনে প্রথম উদয় হয়। ঐ অনন্তজ্ঞান ছোটবড় উঁচু নীচু প্রতিব্যক্তির অন্তরে বদ্ধ করিয়া দেওয়া ও পরজীবনের জন্য মানুষকে প্রস্তুত করাই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। তবে ভিন্ন ভিন্ন দেশকাল ভেদে ও ধর্ম্মস্থাপকদের ভিন্নপ্রকার উপদেশ অনুষ্ঠানের দ্বারা ধর্ম্মের নানা নাম হইয়াছে। সেইজন্যই সকল ধর্ম্ম মূলে প্রায় এক হইলেও বিভিন্ন আচারের দ্বারা লোকের কাছে শ্রদ্ধেয় বা ঘৃণিত হইয়া থাকে।

ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের আলোচনা কালে একটী কথা সর্ব্বদা আমাদের মনে উদয় হয়—যদি অনন্ত জ্ঞানের ধারণাই প্রত্যেক ধর্ম্মের মূল ও উহা শিক্ষা দেওয়াই সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য তবে প্রায় সব ধর্ম্মেতেই আমরা এত প্রকার কুসংস্কার ও সাকার দেবদেবী অথবা মানুষের পূজা দেখিতে পাই কেন? ইহার উত্তরস্বরূপ এই বলা যাইতে পারে, যে, ধর্ম্মের স্রোত নদীর জলের ন্যায়; নির্ঝরনির্গত স্বচ্ছ ও বিমল সলিল যেমন উঁচু নীচু ও বালিময় ভূমির ভেদ অনুসারে ভঙ্গিমতী ও সমল হইয়া সাগরের দিকে যায়, সেইরূপ ধর্ম্মও ভক্তদের জ্ঞানের ভেদ অনুসারে কমবেশী আড়ম্বরপূর্ণ ও কুসংস্কারময় হইয়া অনন্তের উদ্দেশে ছুটে।

সেই কারণে হিন্দু, বৌদ্ধ, য়িহুদী, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মেরই মূলে একেশ্বরের ধারণা থাকিলেও এ ধারণার অসীমতাও লোকের জ্ঞানভেদ বশত বর্ত্তমান কালে প্রায় সকল ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যেই ভ্রমময় বিশ্বাস ও কুসংস্কারপূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ড দেখা যায়। আর যে ধর্ম্ম পরমাত্মাকে যত পরিমাণে অনন্ত, অসীম ও অজ্ঞাত বলিয়া শিক্ষা দেয়, তার ভক্তেরা অজ্ঞান ও অশিক্ষিত হইলে তত পরিমাণে সাকার দেব দেবীর উপাসনায় রত হয়। আমাদের হিন্দু ধর্ম্ম উহার সর্ব্ব প্রধান প্রমাণ। বৈদিক ধর্ম্মের ন্যায় বিশুদ্ধ, বির্মল ও উন্নত ধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত আর কোন দেশে দেখা যায় নাই। কিন্তু ঐ ধর্ম্মের স্থাপক মুনিঋষিরা আপনাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শিক্ষা বলে উহার অনু-

সরণ করিয়া চলিলেও উহা সাধারণ লোকের ধারণার সাধ্যাতীত হইয়াছিল; তাই ঐ জ্ঞানী মুনিদের অন্তর্হিতের সঙ্গে সঙ্গে ঐ পবিত্র ধর্ম্মও লোপ পাইয়াছে; আর তাহার পরিবর্ত্তে হিন্দুদের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী এক অবনত ও কুসংস্কারময় ধর্ম্মের সৃজন হইয়াছে।

অন্যদিকে খৃষ্ট ও মহম্মদের শিষ্যেরা ঐ মহাত্মাদের অনন্তজ্ঞানের ধারণা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেও অশিক্ষিত ও অজ্ঞান লোকের পক্ষে উহা ধারণাতীত জানিয়া তাঁহাদিগকে "ঈশ্বরের পুত্র" ও "ঈশ্বরের দাস" নাম দিয়াছেন, আর ঐ পরমাত্মার পুত্র ও সেবকের আরাধনা করিলেই অনন্ত ঈশ্বরকে পাওয়া যায়—নিজ নিজ ভক্তদিগকে এইরূপ বুঝাইয়াছেন। সে জন্য অনন্ত ব্রহ্মের উদ্দেশে, সাধারণ হিন্দুরা নানা দেব দেবীর পূজা করেন; মুসলমান ও খৃষ্টানেরা এক এক মানুষ ও তাঁদের গুটিকতক চেলার পূজায় রত। ইহা হইলেও একটী বিষয়ে হিন্দুদের অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ দেখা যায়; পরমেশ্বরের ছায়া যে জলে, স্থলে, বৃক্ষে আকাশে সর্ব্বত্র ও সকল দেবতায় বিদ্যমান, এ ধারণা হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতি এরূপ প্রশস্তভাবে বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। আর হিন্দুরা যেমন—আপনাদের রাম, বিষ্ণুর মন্দির; জঙ্গলা জাতিদের শীতলা, মনসার ঢিপি; বৌদ্ধদের শাক্যমুনির স্তূপ; মুসলমানদের ওলাবিবির ঘর; জৈনদের শৈলেশ্বর পর্ব্বত; পার্সীদের সূর্য্যমন্দির; ও খৃষ্টানদের গির্জ্জা—একরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন, এরূপ আর কোন ধর্ম্মাবলম্বীরা পারে না।

সাধারণ লোকের সাকার জ্ঞান বিষয়ে আমাদের দেশের বৌদ্ধ, নানকপন্থী ও চৈতন্য ধর্ম্ম আর কয়েকটী উদাহরণ। মহাত্মা বুদ্ধ, নানক ও চৈতন্য হিন্দুধর্ম্মের গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মর্ম্ম বুঝিয়া অনন্ত পরমাত্মার উপাসনা প্রচার করেন, কিন্তু তাঁহাদের শিষ্যেরা সাধারণ লোকের জ্ঞানের সীমা জানিয়া বুদ্ধদেব, নানক ও চৈতন্যকে ঈশ্বরের এক এক অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। যে কুসংস্কার পূর্ণ সাকার পূজায় মনস্তাপ পাইয়া তাঁহারা নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের জ্ঞান প্রচার করেন, তাঁহাদের ভক্তেরা অশিক্ষা ও অজ্ঞানতাবশতঃ তাঁহাদিগকেও দেবতার মধ্যে ধরিয়াছেন, ও ভারতের অসংখ্য দেব দেবীর সংখ্যা আরো বাড়াইয়াছেন—ইহা জানিলে তাঁহারা যে অধিকতর মর্ম্মবেদনা পাইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে ধর্ম্মের এরূপ অপব্যবহার জগতের আজন্মকাল হইয়া আসিতেছে; আর যত দিন না মানুষ যথার্থরূপে শিক্ষিত, উন্নত ও নৈতিক জ্ঞান পূর্ণ হইবে ততদিন ঐরূপ ধর্ম্মের বিপর্য্যয় ও ভ্রম সংস্কার অনবরত ঘটিতে থাকিবে।

আর যে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা হিন্দুদিগকে সাকারবাদী ও পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা ও উপহাস করেন, তাঁহাদের এই "উনবিংশ শতাব্দীর" সভ্যতার অভিমানের মধ্যেও নিরাকার-জ্ঞান সাধারণ লোকেরা বুঝেনা বলিলেই হয়। গির্জ্জা তাহাদের পূজার

মন্দির, আর খৃষ্টের ক্রুসে বেঁধা প্রতিমূর্ত্তি তাহাদের দেবতা। এমন কি হিন্দুর কাছে নিমগাছের কাট যত না পূজ্য, খৃষ্টানের কাছে একটা পাথরের বা কাটের ক্রুস তার চেয়ে অধিক ভক্তির সামগ্রী। সাধারণ খৃষ্টানেরা গির্জ্জার বাহিরে বা যিশুখৃষ্ট ও তাঁর শিষ্যদিগকে ডিঙ্গাইয়া অনন্ত ব্রহ্মের জ্ঞানে নিতান্ত অপারগ। হিন্দুদের গণেশ জননীর ন্যায় খৃষ্টের জননী কুমারী মেরীও পুত্রকোলে পূজা পাইয়া থাকেন। আর ভূমিকম্প, বা ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাতের সময় অশিক্ষিত খৃষ্টানেরা ভয়াকুল হইয়া যীশুখৃষ্ট ও মেরী হইতে যত ধার্ম্মিক লোকের প্রতিমূর্ত্তির কাছে হাঁটু গাড়িয়া কিরূপে তাঁহাদের দয়া প্রার্থনা করে, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন।

অধিক কি, মানুষের দুর্ব্বলতা বশতঃ অতি শিক্ষিত ও মার্জ্জিত ধর্ম্মের মধ্যেও আড়ম্বর ও ভ্রমবিশ্বাস দেখা যায়। বর্ত্তমান কালের কোম্‌তের শিষ্যগণ তাহার উদাহরণ। অনেক জ্ঞান ও চিন্তার বলে কোম্‌ত আমাদের উন্নত বৈদিক ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিয়া মনুষ্যত্ব ধর্ম্মের (Religion of Humanity) প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মনীতি-ভাব এতদূর মার্জ্জিত ও উন্নত যে জগতের অতি অল্প লোকই—সমস্ত পৃথিবীতে দশ হাজার মাত্র—লোক উহার নিস্বার্থ উদ্দেশ্য ও মহৎ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তথাচ মনুষ্যত্ব ধর্ম্মের ঐ অল্প সংখ্যক সুশিক্ষিত ও সুমার্জ্জিত ভক্তদের মধ্যেও আড়ম্বর ও ভ্রম সংস্কার দেখা যায়। আর ঐ সব দেখিয়া এরূপ শঙ্কা হয়, যে সময়ে ঐ মহৎ ধর্ম্ম যখন অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত লোকদের মধ্যে প্রচলিত হইবে, তখন উহা মনুষ্যত্বের পূজা ছাড়িয়া মানুষ কোম্‌তের পূজায় আসিয়া দাঁড়াইবে।

আর ঐ সাকার বা কোন নির্দ্দিষ্ট লোকের পূজার অভাবেই আমাদের বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মের ইচ্ছানুরূপ প্রচলন হইতেছে না। গত লোক-সংখ্যায় ১৫ কোটী হিন্দুর মধ্যে এক হাজার মাত্র ব্রাহ্ম দেখিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। কিন্তু আমরা যখন সাধারণ ভারতবর্ষীয়দের রাশি রাশি অজ্ঞতা ও অশিক্ষার বিষয় আলোচনা করি তখন আর বিস্ময়ের কোন কারণ থাকে না। সমস্ত অধিবাসীর তুলনায় অতি অল্প লোকই শিক্ষা পায়, আর ঐ অল্প সংখ্যকের অল্পতর ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন; তার মধ্যে আবার অনেকে নাস্তিক বা সন্দেহবাদী; আর কতকগুলি গোপনে ব্রাহ্ম নামে হিন্দু, সুতরাং পঁচিশ কোটী ভারতবাসীর মধ্যে কেবল এক হাজার লোক যথার্থ উন্নত ও মার্জ্জিত ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণে পারগ, ইহা অসম্ভব বোধ হয় না।

অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুদের হাড়ে হাড়ে সাকার মূর্ত্তি বসিয়া গিয়াছে, ঐ সকল সাকার প্রতিমা ত্যাগ করিয়া নিরাকার পরব্রহ্মের ধ্যান বা ধারণা করা সাধারণ হিন্দুদের পক্ষে বর্ত্তমান কালে এক প্রকার সাধ্যাতীত। যতদিন না হিন্দুরা প্রকৃতরূপে শিক্ষিত ও নীতিজ্ঞানে আসক্ত হন, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি হইবার অধিক ভরসা নাই। ঐ সাকার জ্ঞান সম্বন্ধে আমার একটী প্রকৃত

ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে, তাহা পাঠক পাঠিকাদিগকে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমার একজন শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্ম বন্ধুর বাড়ীতে এক দিন ঈশ্বরের গান ও উপাসনার জন্য অনেক লোকের সমাগম হয়। তিনি পাড়ার মধ্যে একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি ছিলেন, সে জন্য পাড়ার কতকগুলি হিন্দু স্ত্রীলোকও ঐ উপলক্ষে তাঁর বাড়ীতে যান্। তাঁহারা জীবনে প্রথম ব্রহ্মসঙ্গীত ও শ্রুতিমধুর বাজনা শুনিয়া বড়ই খুসী হইলেন। কিন্তু একটী বিষয়ে তাঁহাদের যেন মন তৃপ্ত হইল না। তাঁরা এ ঘর ও ঘর খুঁজিলেন, তথাপি কোন বিগ্রহ বা প্রতিমার মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না, সুতরাং কোন্ ঠাকুরের উদ্দেশে যে ঐ সব গান গাওয়া হইতেছে তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। অবশেষে তাঁহারা বৈঠকখানার টানাপাখাটা দেখিয়া হয়ত দোল বা ঝুলনের কথা স্মরণ পূর্ব্বক গৃহকর্ত্তার পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওই কি গো ব্রেহ্ম ঠাকুর দুল্‌ছে ?"

ইহাতেই দেখা যায় সাধারণ অশিক্ষিত লোকের মনে সাকার জ্ঞান কতদূর প্রবল। কি হিন্দু, কি খৃষ্টান, কি মুসলমান—অজ্ঞ লোকদের মন হইতে ঐ সাকার জ্ঞান দূর কর, তারা সমস্ত সংসার একেবারে শূন্য দেখিবে, ও ভক্তি বিশ্বাস হারাইয়া আরো ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া যাইবে। সুতরাং সাকার ধর্ম্ম অশিক্ষা ও অজ্ঞতার স্বাভাবিক ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। মানুষ নিতান্ত অসভ্য অবস্থায় গাছপালা, পাথর পর্ব্বত প্রভৃতি যে কোন জড় পদার্থের সংস্রবে আসে, তাহাকেই দেবতা ভাবিয়া পূজা করে; কিন্তু জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে তাহাদের মনেও অনন্ত ধারণার সঞ্চার হয়। শিশুর কাছে যেমন পুতুলেরা জীবিত পদার্থ, অশিক্ষিত লোকের নিকটেও সেইরূপ সমস্ত স্বাভাবিক দ্রব্য বা ঘটনা চেতন বলিয়া গৃহীত হয়। সে কারণে সাকার ধর্ম্ম ভ্রম ও অজ্ঞানতার পরিচয় দিলেও উহাতে কিছুমাত্র পাপ নাই। পরমাত্মা ঘটে পটে, মাটী মন্দিরে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, সে নিমিত্ত যে-ব্যক্তি তাঁর অসীমতা ভাবিতে অসমর্থ হইয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে ঘট পট, প্রতিমার পূজা করেন তিনিও পরমেশ্বরের যেরূপ প্রিয়পাত্র, অনন্ত দেবের আরাধকও সেইরূপ।

অন্যদিকে, মানুষের মন নিরাকার ধারণার উপযুক্ত উন্নত ও প্রশস্ত হইবার পূর্ব্বে তাহাদের মন হইতে সাকার বিশ্বাস দূর করিলে যে মহা অপকার হয় তাহা আমরা বর্ত্তমান নব্য বাঙ্গালীদের হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। অল্প বিদ্যার দ্বারা হিন্দু যুবকদের কিছু চোক খুলিয়াছে ও সাকার দেবদেবীর প্রতি বিদ্বেষ জন্মিয়াছে; কিন্তু প্রকৃত উচ্চ নৈতিক শিক্ষার অভাবে তাঁহাদের মন অনন্ত জ্ঞান ধারণার উপযুক্ত প্রশস্ততা লাভ করে নাই, কাজে কাজেই তাহারা দিন দিন জ্ঞাননীতিহীন ও ভক্তি বিশ্বাস শূন্য এক অপরূপ জন্তুবিশেষ হইয়া দাঁড়াইতেছেন; আর অনেকে ভাণ ও কপটতা আশ্রয় করিয়া নীচতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। তাঁহাদের ঐরূপ সকল

বিষয়ে অনাস্থা জড়তা ও অবিশ্বাসবশতঃ প্রতি হিন্দু সংসারে যে কত শোচনীয় ঘটনা ঘটিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই রূপ অল্প শিক্ষার পরিবর্ত্তে তাহারা যদি একেবারে মূর্খ থাকিয়া সাকার ধর্ম্মে বিশ্বাস রাখিত, তাহা হইলেও তাহাদের চরিত্রে এত নীতিজ্ঞানের অভাব ঘটিত না।

অনন্ত জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় আমরা সকল ধর্ম্মের মূলে একরূপ নীতিজ্ঞানের উপদেশ দেখিতে পাই। কেন না, চিত্তসংযম, রিপুদমন, পরোপকার প্রভৃতির দ্বারা আপনাকে না ভুলিতে পারিলে অনন্তের ধ্যান করা এক প্রকার অসম্ভব। তা ছাড়া, আদর্শ ব্যবস্থার দ্বারা মানুষের চরিত্র গঠন করাও ধর্ম্মের আর এক প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু মানব প্রকৃতিতে পশুত্বের আধিক্য দেখিয়া প্রায় সকল ধর্ম্মই ঐ নীতিজ্ঞান পালনে উপেক্ষা করিয়া থাকে। কোন ধর্ম্ম যদি ভক্তদের মধ্য হইতে যত পাপী ও নীতি গুণহীন লোকদের বাদ দেয়, তাহা হইলে শতকরা ৯৯ জন উপাসকের সংখ্যা হ্রাস হয়। সুতরাং ধর্ম্ম স্থাপকেরা দান ধ্যান, ভক্তিবিশ্বাস ও অনুতাপ প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদির দ্বারা পাপীর মুক্তির উপায় স্থির করিয়াছেন। সে কারণে, সকল ধর্ম্মের সাধারণ লোকদের মধ্যে অনন্ত জ্ঞানের পরিবর্ত্তে যেমন সাকার পূজা দেখা যায়, সেইরূপ উন্নত নীতিগুণের বদলে ভক্তিবিশ্বাসের দ্বারা মুক্তির আশা দৃষ্ট হয়। হাজার দুরাচার হিন্দু যেমন দানধ্যান, গঙ্গাস্নান, তীর্থ দর্শন প্রভৃতির বলে মোক্ষ লাভের আশা করে; শত সহস্র নরাধম খৃষ্টান মুসলমানও সেইরূপ আরাধনা, ভক্তিবিশ্বাস, ও তীর্থপর্য্যটন ইত্যাদির দ্বারা পরলোকে মুক্তি লাভের বিশ্বাস করে। এই সব উদাহরণ দ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের মূল এক ও উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের মধ্যে পড়িয়া উহা এখন সাধারণ মানুষের সুবিধা ও খেয়ালের কাজ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান—এ সকল ধর্ম্মেই কুসংস্কার ও অনীতি প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু একটা বিষয়ে আমাদের আশা আছে। বিশ্ববিধানের গতি অনুসারে মানবজাতির নিরন্তর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ঐ পরিবর্ত্তন প্রভাবে মানবজাতি যখন প্রকৃতরূপে শিক্ষিত ও উন্নত হইবে, তখন মানুষ যত কুসংস্কার ও বৃথা আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া একমাত্র অনন্ত পরব্রহ্মের ধারণায় সক্ষম হইতে পারিবে।

কিন্তু এস্থলে লোকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "আচ্ছা! শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রভাবে লোকে নাস্তিক হয় কেন?" তার উত্তর, নাস্তিক বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বজগতের কেবল একদিকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। আর দিনরাত শুধু জড়পদার্থ ও উহার ঘাত প্রতিঘাতের ও কার্য্যকারণের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করাতে তাঁহাদের আত্মা অনন্ত পরমাত্মার জ্ঞানের ধারণা পক্ষে সংকীর্ণ হইয়া যায়, নতুবা উচ্চশিক্ষা বা বিজ্ঞানে এমন কোন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনার আবৃত্তি বিবর্ত্তন নাই, যাহা দ্বারা অনন্ত পরব্রহ্মের অসীম সৃষ্টির উপর অবিশ্বাস জন্মিতে পারে। বিশেষ, আমরা সচরাচর

দেখিতে পাই যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি একান্তচিত্তে পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ অথবা স্বভাবের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন, তিনি বিশ্বকর্ত্তার সৃষ্টির কৌশলে এরূপ মুগ্ধ হন যে তাঁহার অন্তরে অনন্ত পরমাত্মার জ্ঞান আরো উজ্জলরূপে প্রতিভাত হয়।

আবার, আদিমকালে সকল ধর্ম্মের ব্যবস্থা অতি উত্তম হইলেও এখন উহা শুধু বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে। একজন হিন্দু যেমন নিজে কিছু না ভাবিয়া বা বুঝিয়া ঠাকুর দেবতা ও পূজার বিশ্বাসের দ্বারা হিন্দু বলিয়া গণিত হন, একজন খৃষ্টান সেইরূপ খৃষ্ট ও বাইবলে বিশ্বাস, আর একজন মুসলমান মহম্মদ ও কোরাণে বিশ্বাস দেখাইলেই উহার ভক্ত বলিয়া পরিচিত হন। সে জন্য বিশ্বাসের বলে এক জাতির কাছে যাহা ধর্ম্ম, বিশ্বাসের অভাবে অন্যের কাছে তাহা অধর্ম্ম। দৃঢ় বিশ্বাসের বলে বাইবলের শত শত ভ্রম ঘটনা ও অসত্য বর্ণনাও সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যে খৃষ্টানের কাছে ধর্ম্ম, উহার অভাবে বেদের হাজার হাজার সত্য কথা ও উপদেশ শ্রবণ করা তার কাছে অধর্ম্ম স্বরূপ। কিন্তু আন্তরিক বিশ্বাস থাকিলে ঈশ্বরের কাছে সে সবই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের ভাণ বা কপটতাই বাস্তবিক অধর্ম্ম। আর নিজ নিজ আরাধ্য দেবতার প্রতি অটল বিশ্বাস রাখিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও নিস্বার্থ পরোপকারই এ সংসারে প্রকৃত ধর্ম্ম।

কোন ব্যক্তি অনন্ত জ্যোতিস্বরূপ পরব্রহ্মে দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা আত্ম ভুলিলেও তিনি যেমন পরমহংস ; সেইরূপ কোন লোক প্রতিমা বা গাছ পালার প্রতি ভক্তি করিয়া নিস্বার্থ পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করিলেও তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ; আবার একজন পণ্ডিত যদি বিজ্ঞানকে জগতের আদি অন্ত, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ ভাবিয়া উহার প্রতি একান্ত মনোনিবেশ পূর্ব্বক পৃথিবীর উপকার সাধনে কৃতসংকল্প হন, তবে তিনিও একজন মহাত্মা তার সন্দেহ নাই। কেননা, আত্মবিস্মৃতি, স্বার্থত্যাগ ও চিত্তসংযমই এ সংসারে মানুষের প্রধান ধর্ম্ম। ঐ মহা তপস্যার অনুষ্ঠান যিনি যেরূপেই করুন না কেন উহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত ; কারণ উহা দ্বারা জগতের মঙ্গল সাধন হয়। কোন লোক যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও প্রমাণে সন্দেহ করিয়াও নিজেকে সতত পবিত্র ও সৎকর্ম্মে রত রাখিতে পারেন, তবে তিনি নিজেই ঠকেন, অন্যকে ঠকান না ; বরং ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখে অগ্রাহ্য করিয়া এ দুঃখ যন্ত্রণাময় সংসারে স্থির ভাবে ধর্ম্মপথে চলায় তাঁর মনের দৃঢ়তা প্রকাশ পায় ও তাঁর মহৎ দৃষ্টান্তে লোকে সবল হয়। আর তিনি নিজে ঈশ্বরের করুণায় বিশ্বাস না করিলেও তাঁর কর্ম্মে পরমাত্মার দয়া প্রতিভাত হয়। অন্য দিকে, একজন নাস্তিক যদি নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়ে ব্রহ্মজ্ঞানের ভান করে, বা একজন ব্রাহ্ম সাকার দেবদেবীর প্রতি মৌখিক ভক্তি দেখায়, অথবা একজন সন্দেহপূর্ণ লোক নিস্বার্থের ছলনা করিয়া অন্যের কাছে ধর্ম্মের বড়াই করে ও কেহ যদি প্রশংসা লাভের আশায় কপটতা দ্বারা নিজ দোষ

ঢাকিবার প্রয়াস পায়—তাহা হইলে তাহারা সকলেই একপ্রকার পাপী, অধার্ম্মিক, শঠ ও প্রতারক। তাহাদের দ্বারা সংসারে অপকার ভিন্ন কোন মঙ্গল হইবার আশা নাই।

জগতের কাজের নিমিত্ত জীবাত্মার সৃষ্টি, সে কারণ পরমাত্মার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া প্রাণপণে যে যার কর্ত্তব্য করাই মানুষের ধর্ম্ম। প্রাণপণ যত্নে সন্তান পালন করা মাতার ধর্ম্ম; পরিবার পোষণ করা পিতার ধর্ম্ম। আর সাধ্যমত সমস্ত জগতের জন্য কিছু না কিছু কাজ করা ও আত্ম ভুলিয়া পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করাই মানব জাতির ধর্ম্ম। এ পৃথিবীতে এই নিস্বার্থ ধর্ম্মের অর্থ যিনি প্রকৃতরূপে বুঝিয়াছেন তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

জেনারল গর্ডন।

অনেকেই জেনারল গর্ডনের নাম শুনিয়াছেন, অনেকেই তাঁহার দেবোপম চরিত্র কাহিনী শুনিয়া মোহিত হইয়াছেন, অনেকেই তাঁহার শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাত হইয়া অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিয়াছেন; সুতরাং কি উদ্দেশ্যে আমরা তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহা বিস্তারিত করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। জেনারল গর্ডনের ন্যায় মহানুভব ব্যক্তির জীবন চরিত সমুদয় জগতের সম্পত্তি, সমুদয় জগৎ তাহা নিজের বলিয়া দাবি করিতে পারে, সমুদয় জগৎ তাহা মানব জীবনের আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারে।

লেফ্‌টনাণ্ট জেনারেল হেনরী গর্ডনের পুত্র বার্ণস গর্ডন ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জানুয়ারি তারিখে উলউইচ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে তিনি উলউইচ নগরের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ বিদ্যালয় রয়াল মিলিটারী আকাডেমিতে প্রবেশ করেন এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রয়াল এঞ্জিনীয়ারস নামক সেনাদলের দ্বিতীয় লেফ্‌টনাণ্টের পদ প্রাপ্ত হইবার কিছুকাল পরে ক্রাইমিয়া যুদ্ধের সময় কার্য্যদক্ষতা ও যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাইয়া তিনি তাঁহার উচ্চতর কর্ম্মচারীদিগের সম্মানার্হ হয়েন।

এঞ্জিনীয়ারি কার্য্যে দক্ষতা হেতু তিনি রুসিয়া ও টার্কির সীমা নির্দ্ধারক কমিসনে নিযুক্ত হইয়া এই কর্ম্মে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপৃত ছিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি চীনদেশে প্রেরিত হইয়া তথায় পিকিন আক্রমণে যোগ দেন।

এই সময়ে চীনদেশে টৈপিং বিদ্রোহ চলিতেছিল—ঐ বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য যে সৈন্যদল নিযুক্ত হয় চীন গবর্ণমেণ্ট ব্রাটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট সেই সৈন্যদলের নিমিত্ত একজন সেনাপতি চাহিয়া পাঠাইলেন। ব্রাটিশ গবর্ণমেণ্ট গর্ডনকে নিযুক্ত করিলেন—গর্ডনের বয়স তখন ত্রিশ বৎসর মাত্র। প্রথমতঃ তাঁহার অধীনে কেবল মাত্র চারি সহস্র সেনা ছিল আর তাহাদিগেরও অস্ত্র শস্ত্রাদি যৎসামান্য। কিন্তু গর্ডনের শ্রম ও অধ্যবসায় গুণে এই সেনাদলই কালক্রমে চিরবিজয়ী উপাধি প্রাপ্ত হইল; তাহারা সংখ্যায় অল্প হইয়াও সুশিক্ষার বলে অপর পক্ষের অধিক সংখ্যক সেনাদলদিগকেও পরাজিত করিতে লাগিল। গর্ডন তাঁহার সেনাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে লাগিলেন এবং বিদ্রোহীরা যে যে স্থানে আক্রমণ আশঙ্কা করে নাই সেই সেই স্থানে তিনি তাহাদিগকে সবলে আক্রমণ করিয়া বিদ্রোহীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন—এক স্থলের পর আর এক স্থল, এক সহরের পর আর এক সহর গর্ডনের হস্তগত হইল। অবশেষে বিদ্রোহ দমন হইল।

এই যুদ্ধের সময় গর্ডন যে কেবল দক্ষতার সহিত সেনাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন এমত নহে, তিনি স্বয়ং মহা বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি কোন প্রকার অস্ত্র শস্ত্র না লইয়া কেবল মাত্র একখানি ক্ষুদ্র বেত্র হস্তে করিয়া সমর-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেন এবং তথায় প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে প্রশান্তভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া আক্রম্য স্থলগুলি উক্ত বেত্র দ্বারা দেখাইয়া দিতেন। তাঁহার সেনাগণ এই বেত্রখণ্ডকে "গর্ডনের জয় দণ্ড" নাম প্রদান করিয়াছিল।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের শেষে তিনি চীন হইতে স্বদেশ গমন করেন এবং টেমস নদীর উপর দুর্গ নির্ম্মাণে নিযুক্ত থাকেন। গর্ডনের কথা মতে এই ছয় বৎসর কালই তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখের কাল। মহৎ লোকেরা পরকে সুখী করিতে পারিলেই নিজে সুখী বোধ করেন। গর্ডন এই সময় অনেক দীন দরিদ্রের দুঃখদূর করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার জীবনের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুখের কাল। তাঁহার পরিচিত একজন মহিলা তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—দুঃখের কথা শুনিলেই গর্ডনের মন গলিয়া যাইত—তিনি তখন আর গুণাগুণ খুঁজিতেন না। এই নিমিত্ত সময় সময় তিনি প্রতারিত হইতেন। কিন্তু তাঁহাকে প্রায়ই কেহ প্রবঞ্চনা করিতে পারিত না। তিনি সহজেই মানুষ চিনিতেন। Infirmary ও workhouseএ (ইনফারমারী ও ওয়ার্ক হাউসে) তিনি সর্ব্বদাই গমন করিতেন। অনেকে অন্তিমকালে পুরোহিতের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইত; এবং তিনিও রৌদ্র বৃষ্টি, দূর নিকট, সমস্ত উপেক্ষা করিয়া সকল সময়েই তাহাদের নিকট যাইতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি গরিবদের সভায় সর্ব্বদাই যাইতেন কিন্তু তিনি নিজের প্রশংসা সহ্য করিতে পারিতেন না।

ইহার পর কিছুদিন ডানিয়ুব নদীর মোহানায় কমিসনরের কর্ম্ম করিয়া তিনি ১৮৭৩ খৃঃ

অব্দে Sir Samuel Bakeএর পরিবর্ত্তে সুদনের শাসন কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি তথাকার দরিদ্রদিগের দুঃখে আন্তরিক মর্ম্মপীড়িত হন এবং দাস ব্যবসায় নিবারণ জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে ক্রটী করেন নাই।

ইহার তিন বৎসর পরে গর্ডন কয়েক সপ্তাহকাল ইংলণ্ডে যাইয়া অবস্থান করেন। কিন্তু ১৮৭৭ সালের প্রারম্ভেই আবার সুদনে আসিয়া আপন কর্ম্মে নিযুক্ত হন। খেদিব এই সময় সুদন, ডারাফার ও মধ্যপ্রদেশ এই তিনটীকে এক শাসনের মধ্যে আনয়ন করেন এবং গর্ডনের হস্তে উক্ত শাসনের ভার অর্পণ করেন। এই সম্বন্ধে তিনি এই রূপ লিখিয়া গিয়াছেন—আমার উপর এক বিস্তৃত প্রদেশের ভার রহিয়াছে। কিন্তু আমি জানি এবং সেই জন্য নিশ্চিন্ত আছি যে ঈশ্বরের ইহার উপর দৃষ্টি রহিয়াছে এ কার্য্য তাঁহারি, আমার নহে। যদি আমি অক্ষম হই তবে সে তাঁহারি ইচ্ছা, যদি সক্ষম হই সে তাঁহারি কার্য্য। তিনি আমাকে পার্থিব সুখের নিকৃষ্টতা এবং তাঁহাকে পাইবার, তাঁহার সহিত মিলিবার সুখ বুঝিবার, ক্ষমতা দিয়াছেন। তাঁহার মহিমা প্রদর্শন করিতে আমি যেন ধূলিসাৎ হইতে পারি! আমার পদের উচ্চতায় আমি দুঃখিত। তিনি কবে আমার পরিবর্ত্তে আর একজন নিযুক্ত করিবেন? কবে আমার ইচ্ছা সফল হইবে যে এ জীবন স্রোত ফুরাইবে? কিন্তু আমি জানি যে সকল সময়েই তিনি আমার সহায়।"

এইরূপ রাজ্যভার গ্রহণ ভিন্ন তিনি আবিসিনিয়ার রাজার সহিত খেদিবের কলহ দূরিকরণে, দাস ব্যবসায়ীদিগের বিদ্রোহ দমনে এবং অন্যান্য অনেক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ইজিপ্টের আইন ও দেশ শাসনে যথাসাধ্য পরিশ্রম করেন। এইরূপ কার্য্যে অনেক সময় তাঁহার আহার নিদ্রার সময় হইত না। তিনি বলিয়াছিলেন যে ঈশ্বরের সাহায্যে তিনি আর দুই তিন বৎসরের মধ্যে ইজিপ্টের সৈন্য, অর্থ ও বাণিজ্য বৃদ্ধি করিয়া এবং দাস ব্যবসায় নিবারণ করিয়া ইজিপ্টকে একটি সুশৃঙ্খল দেশে পরিণত করিতে পারিবেন। তাঁহার পত্র পড়িয়া জানা যায় যে ইজিপ্টে তাঁহার জীবন বড় সুখে অতিবাহিত হয় নাই।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে খেদিব ইস্মাইলের পরিবর্ত্তে টিউফিক পাসা রাজ্যাধিরোহণ করিলেন। টিউফিকের প্রতি গর্ডনের বিশ্বাস ছিল না। তিনি গর্ডনের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে গর্ডন বিরক্ত হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি লর্ড রিপণের প্রাইভেট সেক্রেটারি পদ গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত ভারতবর্ষে পুনরাগমন করেন কিন্তু বম্বে পহুঁছিবার কিছুদিন পরেই সে পদ পরিত্যাগ করিয়া সেখান হইতে চীনে গমন পূর্ব্বক চীন ও রুসিয়ার মধ্যে যুদ্ধ নিবারণে তৎপর হন। তাহার পর দশমাস তিনি মরিসসের রয়াল ইঞ্জিনিয়ারীর অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করিয়া তথা হইতে বাস্থলাণ্ডের গোলযোগ মিটাইবার জন্য কেপ কলনীতে গমন করেন কিন্তু

তথাকার গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পরামর্শ মত কার্য্য না করায় আবার ইংলণ্ড প্রত্যাগমন করেন।

ইহার পর তিনি জেরুজালেমে গিয়া বাইবেল সম্বন্ধীয় প্রত্ন-তত্ত্ব অনুশীলনে এবং জর্ডন* নদীর খাল নির্ম্মাণের উপায় চিন্তনে নিযুক্ত হইলেন। এক বৎসর পরে তিনি বেলজিয়াম রাজ কর্তৃক আহূত হইয়া তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপে কাঙ্গো যাইতে স্বীকৃত হন – কিন্তু এই সময় মাধির নামে চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল; গর্ডনও তাঁহার গম্য স্থানে না যাইয়া সুদন গমন করিলেন। গর্ডনের বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার কথায় অনেক ফল হইতে পারে এবং তাহা যে না হইয়াছিল এমনো নহে। তাঁহার আগমনে সেখানে আনন্দ পড়িয়া গেল তিনিও পৌঁছিবার পর দিনই বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া তাহাদের কর্জ্জ-পত্র প্রভৃতি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন এবং সৈন্যদিগকে লইয়া বার্ব্বার নামক স্থানে গমন করেন। মোট ২০০০ দুই হাজার সৈন্য লইয়া তিনি নয় মাসকাল দুর্দ্দম্য খার্টুন রক্ষা করেন এবং মাধির ক্ষমতায় ভীত সৈন্যদিগের মধ্যে সাহস ও বিশ্বাস আনয়ন করেন। গর্ডন যেরূপ অতুলনীয় সাহস ও অধ্যবসায় সহকারে খার্টুন রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কিন্তু গর্ডন আর বেশী দিন খার্টুন রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার পক্ষস্থ দুই জন পাসার বিশ্বাস-ঘাতকায় খার্টুন শত্রু হস্তগত হইল। এই পাসারা গর্ডনের অনুগ্রহেই উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়। গর্ডন তাহাদিগকে একদিনের নিমিত্ত অবিশ্বাস করেন নাই। এই পাসাদিগের মন্ত্রণায় মাধির সৈন্যগণ খার্টুনের অনতিদূরস্থ একটি নগর আক্রমণ করে এবং গর্ডনের অধিকাংশ সৈন্য নগর রক্ষার্থে গমন করিলে পাসারা সেই অবকাশে নগরের দ্বার উন্মোচন করিয়া বিপক্ষগণকে নগর প্রবেশ করিতে দেয়। গর্ডনের আবাস ভূমিই ইহাদিগের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সুতরাং গর্ডন তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে রক্ষা করিবার জন্য দ্বারে গমন করিবামাত্র তাঁহার বক্ষস্থানে অস্ত্রবিদ্ধ করিয়া প্রাণ সংহার করিল। গর্ডনের প্রাণে এ অমঙ্গলের ছায়া অনেক দিন হইতেই পড়িয়াছিল – তিনি ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বেই বলেন যে চীন যুদ্ধে ঘোর বিপদের সময়েও তাঁহার মনে হইত তিনি মরিবেন না কিন্তু এবার তাঁহার মনে হইতেছে যেন আর তাঁহাকে দেশে ফিরিতে হইবে না। এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া স্বদেশ-ত্যাগকালে স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ তিনি কয়েকটী উপহারও প্রদান করিয়া আসেন। তাঁহার সে দুঃস্বপ্ন আজ সত্যে পরিণত হইল, গর্ডন ইজিপ্টে প্রাণ হারাইলেন। ইংলণ্ডের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল, ইংলণ্ডের কেন সমস্ত পৃথিবীর বলিলেও অধিক বলা হয় না। শত্রু মিত্র স্বদেশী বিদেশী যে তাঁহার কথা একবার শুনিয়াছে সেই মোহিত হইয়াছে—যে তাঁহার দুই দিনের পরিচিত সেও কখন তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে না। গর্ডনের ঈশ্বরে আশ্চর্য্য নির্ভরতা ছিল—তিনি ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া যে কত দুঃসাহসিক কার্য্য করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। আমরা যদি তেমনি সরল নির্ভরের

ভাবে ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া একবার বলিতে পারিতাম "সকলই তোমার" তবে এ পাপ জীবনে কত সুখ লাভ করিতে পারিতাম !

গর্ডন মরিতে কাতর ছিলেন না—মৃত্যু তাঁহার কাম্য ধন। আমরাও তাঁহার এ মৃত্যুতে দুঃখিত নহি। তিনি স্বদেশের মান রাখিতে রাশি রাশি লোকের প্রাণ রাখিতে চেষ্টা করিয়াই প্রাণ হারাইয়াছেন—তাঁহার জীবনের উপযুক্ত মৃত্যুই হইয়াছে, তাঁহার প্রাণের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, আমরা কেন দুঃখ করিব !

গর্ডনের পত্রগুলি পাঠ করিলে অলক্ষিত ভাবে তাঁহার প্রতি আমাদিগের ভক্তি আসিয়া পড়ে—তিনি কখনও স্বার্থের নিমিত্ত ব্যস্ত ছিলেন না, বীরত্ব, মহত্ত্ব ও ঈশ্বরে নির্ভর তাঁহার চরিত্রের তিনটী প্রধান লক্ষণ ছিল। চীন দেশে যখন তিনি যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তিনি তাঁহার মাতাকে এইরূপ লিখিয়া পাঠান "আমি উচ্চপদে উন্নীত হইবার নিমিত্ত কিম্বা অন্য লোকে আমার সম্বন্ধে কি বলে তাহার বিষয়ে একবিন্দুও চিন্তা করি না; আমি জানি যে আমি চীন দেশে যে দরিদ্র ভাবে প্রবেশ করি সেই দরিদ্রভাবে আবার সেখান হইতে আমার প্রস্থান করিতে হইবে, কিন্তু আমি ইহাও জানিতে পারিব যে আমার ক্ষুদ্রবলে অশীতি সহস্র কি এক লক্ষ জীবন রক্ষা হইয়াছে। আমি ইহা ভিন্ন অন্য কোন সন্তোষ বাঞ্ছা করি না" বাস্তবিকও তিনি চীন পরিত্যাগ কালে ধন সঞ্চয় করিয়া আসেন নাই; এবং যখন চীন সম্রাট তাঁহাকে দশ সহস্র পাউণ্ড পাঠাইয়া দেন, তখন তিনি তাহা তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন।

শিশুর নির্ভরতা, রমণীর কোমলতা, সিংহের বীর্য্য গর্ডনের হৃদয়ে একত্রে রাজ্য করিত—এরূপ লোক কি আর শীঘ্র মিলিবে? বার্লিনের একটী সংবাদ পত্র বলেন যে "প্রাচীন ইংলণ্ডবাসীরা যে সকল গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন গর্ডন ভিন্ন সেরূপ গুণবান লোক এখন আর ইংলণ্ডে একটীও নাই।" গর্ডনও চলিয়া গেলেন—ইংলণ্ডের সে গর্ব্বের পাত্রও আর কেহ রহিল না।

মহাযজ্ঞ।

ষষ্ঠ বর্ষ।

উদ্বোধন।

বিগত বৎসর বোম্বাই নগরে নবভারতের জাতীয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানের পর দেখিতে দেখিতে একটী বৎসর কাল-সাগরে বিলীন হইল, স্বদেশ ভক্ত সন্তানগণ এতদিন উৎসুক হৃদয়ে ষষ্ঠ মহাযজ্ঞের পুনরায়োজনের দিন গণনায় নিযুক্ত ছিলেন। পবিত্র জন্মভূমির

পরিপর্য্যায় দিন যথাসময়ে নিকটবর্ত্তী হইল। গত বর্ষের বিধান অনুসারে এবার বঙ্গদেশে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান নিরূপিত হইয়াছিল, সুতরাং বঙ্গসন্তানগণ মহোৎসাহ সহকারে তদুপযোগী আয়োজনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাযজ্ঞের উপযুক্ত স্থান মনোনীত করিতে কিছুকাল বৃথা অতিবাহিত হইয়াছিল—অল্প সময়ের মধ্যে সহজে সুবিধা জনক স্থান সংগৃহীত হয় নাই। পরিশেষে কলিকাতা নিবাসী পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের বালিগঞ্জ স্থিত সুপ্রশস্ত উদ্যানের প্রতি (Tivoli Gardens) অনেকের চক্ষু নিপতিত হইল—তাঁহারা সকলেই ঐ স্থান জাতীয় মহাযজ্ঞের উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন। অনন্তর অভ্যর্থনা সমিতির কতিপয় সভ্য উক্ত স্থান সংগ্রহার্থে উহার বর্ত্তমান সত্বাধিকারিগণের নিকট প্রস্তাব করিবামাত্র যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র কুমার দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাদুর স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের সম্মতি অনুসারে বিনামূল্যে তিন মাসের জন্য উহার সম্পূর্ণ অধিকার সমিতির হস্তে প্রদান করিলেন। উক্ত সম্পত্তির আয় হইতে তাঁহাদের পারিবারিক দেব-সেবা সম্পাদিত হইয়া থাকে; দেব পূজার আয়ের ক্ষতি পূরণের ভার জ্যেষ্ঠ সহোদর কুমার দেবেন্দ্র নাথ স্বহস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক মাতৃপূজার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও আস্থা প্রদর্শন করিলেন। স্থান সংগৃহীত হইবামাত্র অনুষ্ঠাতৃগণ গভীর উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে কার্য্যক্ষেত্রে উপনীত হইলেন; মহাযজ্ঞের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর আয়োজনের জন্য উদ্যান-গৃহে অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্যালয় সংস্থাপিত হইল। সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত জানকী নাথ ঘোষাল তদীয় সহযোগীগণের সহিত দিবা-রজনী অকাতরে ঘোরতর পরিশ্রম সহকারে বিবিধ আয়োজনে মনোনিবেশ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যে জাতীয় মহোৎসবের উপযোগী বিরাট মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়া সগর্ব্বে মস্তকোত্তলন পূর্ব্বক আকাশ মণ্ডল ভেদ করিয়া সুবিশাল ভারতের একপ্রাণভূত বিভিন্ন জাতীয় গৌরবের পরিচয় দান করিতে লাগিল। গত বৎসর শীতকালে যে উদ্যান "সুইচ্‌ব্যাক্ রেলওয়ের শ্রুতি-কঠোর ঘর্ঘর শব্দ ও বাজী বাজনার বিষম আড়ম্বরে দিবা রজনী নিনাদিত হইত এবং সেখানে আমোদ উপভোগের জন্য কলিকাতা নগরীর তামাসাপ্রিয় সৌখীন লোক সকল দলে দলে সমবেত হইতেন সেই মনোহর উদ্যানে আজি মাতৃ পূজার জন্য এইরূপ বিপুল আয়োজন হইবে, কে তাহা ক্ষণকালের জন্য ভাবিয়াছিল? দীর্ঘে ২৫২ ফুট ও প্রস্থে ১২৫ ফুট এই প্রকাণ্ড মণ্ডপ অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুদৃঢ় ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে নির্ম্মিত ও সুসজ্জিত করিবার জন্য বাবু নীলমণি মিত্র বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু বাবু হরিচরণ পাল ঈশান বাবু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ারগণ যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত তত্ত্বাবধান গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অনেক সময় আপনারা স্বয়ং যে সকল কঠিন শ্রমসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তদবলোকনে অনেক কঠোর পরিশ্রমী যুবক তাঁহাদের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া লজ্জাবনত আননে তাঁহাদের কার্য্যদক্ষতার যথেষ্ট

প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। উদ্বোধনের দুই দিবস পূর্ব্বে অনেকের মনে এই সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে সময়ের অল্পতা প্রযুক্ত মণ্ডপের সমস্ত কার্য্য শেষ হইবে না—অসম্পূর্ণ ও অসজ্জিত অবস্থায় উহাতে মহাসমিতির অধিবেশন হইবে। কিন্তু ২৬শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে সে সন্দেহ আর কাহারও মনে স্থান পায় নাই—বিচক্ষণ শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র রায় বাহাদুরের কার্য্য-নিপুণতা প্রভাবে উহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে সুসজ্জিত ও সুশোভিত হইল। দীর্ঘায়তন বিশিষ্ট এরূপ প্রকাণ্ড মন্দির মহাসমিতির অধিবেশনার্থ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

আজি মহাযজ্ঞের উদ্বোধন—আজি মধ্যাহ্ন দুই ঘটিকার সময় নিদ্রা-মৃত ভারতের প্রাণগত শক্তির চৈতন্য সম্পাদিত হইয়া মাতৃ পরিচর্য্যার পবিত্র অভিষেক বিহিত হইবে। আজি নবভারতের জাতীয় শক্তির অধিবাস;—আজি এই অভিনব শক্তির স্ফুরণে কোটি কোটি ভারত সন্তানের হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা "স্বর্গাদপি গরিয়সী" পরমারাধ্যা জননীর পূজার মাঙ্গলিক বিধান হইবে। সেই জন্য একবর্ষ পরে আজি আবার শুভক্ষণে পূর্ব্বগগনে নবভানু অভিনব বিচিত্র রক্তিম ছটায় বিকশিত হইয়া দেশ-দেশান্তর আলোকিত করিয়াছে—ভারতের প্রতিগৃহে আজি উহার প্রত্যেক প্রতপ্ত রশ্মি জ্বলন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার তরঙ্গ বিস্তার করিয়া স্বদেশভক্ত অযুত নরনারীর হৃদয় অপূর্ব্ব অনুরাগে উদ্বেল ও আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। অরুণ রবির বিমল কিরণ সম্যক্‌রূপে প্রস্ফুটিত হইতে না হইতেই মলয়জ শীতল পবন মৃদুমন্দ গমনে আজি লক্ষ লক্ষ অসাড় হৃদয়ে সঞ্জীবনী সুধার লহরী ঢালিয়া লক্ষ লক্ষ প্রাণ নব তেজে উত্তেজিত, নব উৎসাহে উদ্দীপিত ও নব হর্ষে উন্মাদিত করিয়া তুলিয়াছে। আজি প্রভাতে ভারত গগনে কত শত বিহঙ্গম সুললিত তানে গান গাইয়া চারিদিকে অভিনব আনন্দ-ধারা বর্ষণ করিতেছে; শষ্য শ্যামলা প্রকৃতির বিশালবক্ষে কত শত ফুল সুচারু ভূষায় সুশোভিত হইয়া সমীর-চুম্বনে প্রফুল্ল আননে মধুর হাসি হাসিয়া বায়ুভরে হেলিয়া দুলিয়া ভারতের শুভ দিনের আগমন-বার্ত্তা পরিঘোষণ করিতেছে। জ্যোতির্ম্ময় দেব-লোকেও আজি আনন্দের প্রবাহ উথলিয়া উঠিতেছে—ভারতের পরমারাধ্য দেবতা-গণ আজি ভারত সন্তানবর্গের গভীর ত্যাগ স্বীকার ও প্রগাঢ় মাতৃভক্তির পরিচয়ে প্রীত হইয়া দিব্যধাম হইতে ভারত-ক্ষেত্রে মঙ্গল আশীষ বর্ষণ করিতেছেন। আজি অতি পবিত্র দিন—ধরাতলে বিশ্বপ্রেমিক মহাযোগী খৃষ্টের প্রকৃত মন্ত্র-শিষ্য-গণ তাঁহার পবিত্র জন্মতিথির উৎসবে উন্মত্ত। সুশিক্ষিত ও সহৃদয় ভারত সন্তানগণ ভারত-ভূমির প্রকৃত সুখশান্তির আশায় উন্মাদিত হইয়া আজি পুণ্যতীর্থে, জাতীয় মহা-যজ্ঞের উদ্বোধনে প্রাণে প্রাণে সম্মিলিত হইয়াছেন। ভারত-সীমন্তিনী-সমাজেও এই জাতীয়-মহোৎসবের জীবন্তভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে—সহৃদয়া ললনাগণ আজি বিলাসিতা ও আলস্য পরিহার পূর্ব্বক ফুল্লমনে বিশ্ববিধাতার নিকট জাতীয় অভ্যুদয়ের

কল্যাণ কামনা করিতেছেন। আজিকার প্রাণারাম পবিত্র দৃশ্যে কোন্ স্বদেশীয়ের হৃদয় মৃতবৎ অসাড়ভাবে অবস্থিতি করিবে? চারি বৎসর পূর্ব্বে এই সময় এই মহা-নগরে দ্বিতীয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল—সেই দিনও এই দিনে কতই প্রভেদ! তখন ভারত-গগন সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার-বিমুক্ত হয় নাই; পক্ষান্তরে ভারত-সন্তানের সম্মুখে কত বাধা ও বিঘ্ন বিদ্যমান ছিল। আজি ভারতাকাশ মেঘ-পরিশূন্য হইয়া সুবিমল কান্তি ধারণ করিয়াছে এবং বিঘ্ন-বাধার বিভীষিকা দূরে অন্তর্হিত হইয়াছে! ঐ দেখ, পুণ্য পুঞ্জময় মহাতীর্থে এক প্রাণে সম্মিলিত সহস্র সহস্র উৎসাহশীল সুসন্তান নির্ভয়ে মহোল্লাসে জাতীয় মহাযজ্ঞের বিজয় নিশান হস্তে লইয়া নবভারতের উদয়োন্মুখ অভ্যুদয়ের অনন্ত গৌরব বিস্তার করিতেছে! বাগ্দেবীর প্রিয় উপাসক, ক্ষণজন্মা মহাকবির অমৃতময়ী কল্পতুলিকা ভিন্ন অপর কাহারও দুর্ব্বল লেখনী এই অপরূপ মনোহর দৃশ্যের যথাযথ আলেখ্য প্রদর্শন করিতে সর্ব্বথা অসমর্থ! ভবিষ্য ঐতিহাসিকের কঠোর লেখনী একদিন সতেজে এই প্রাণারাম চিত্রের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।

আজি উষার অপরিস্ফুট আলোকে বঙ্গভূমির উৎসাহশীল সন্তানগণ স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যজ্ঞ ভূমিতে উপস্থিত হইয়া ভারতের বিভিন্ন বিভাগ ও প্রদেশ হইতে সমাগত বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত ও বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী শত শত প্রতিনিধি ও সহস্র সহস্র দর্শকবর্গের উপবেশনার্থে যথাযোগ্য আসন সংযোজন, যজ্ঞ-মঞ্চ, রচনা এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যক কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। সহৃদয় যুবকগণ সানন্দে অভ্যাগত অতিথি-গণের যথোচিত সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রায় চারি শত ভদ্র বংশীয় শিক্ষিত ছাত্র ভৃত্যের ন্যায় অভিমান পরিহার পূর্ব্বক অতিথিগণের আজ্ঞাবহন ও যজ্ঞ ভূমির শৃঙ্খলা বিধানে নিয়োজিত হইয়াছেন। বেলা দশ ঘটিকার পূর্ব্বে মণ্ডপের প্রত্যেক বিভাগ সহস্র সহস্র সুদৃশ্য আসনে শ্রেণীবদ্ধ রূপে সুসজ্জিত হইল। এগারটার পর হইতেই শতাধিক ভদ্র বংশীয় শিক্ষিত যুবক প্রহরীবেশে বিরাট মণ্ডপের প্রবেশ দ্বার রক্ষণ ও শৃঙ্খলাবর্দ্ধনে নিযুক্ত হইলেন। বিশাল মন্দিরের চারিদিকে শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। মধ্যাহ্ন দুই ঘটিকার সময় মহাযজ্ঞের উদ্বোধন জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। উহার অনেক পূর্ব্বে মণ্ডপের বহির্ভাগে বিস্তর লোকের সমাগম হইতে লাগিল—একটার পূর্ব্বে মণ্ডপের সম্মুখবর্ত্তী বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে জন-স্রোত প্রবলবেগে বাড়িতে লাগিল—সমাগত ব্যক্তিবর্গ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বিচিত্র শোভা সন্দর্শনে অতুল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। একটার সময় মণ্ডপের পৃথক পৃথক দ্বারগুলি উন্মুক্ত হইল—তখন চারিদিক হইতে সহস্র সহস্র লোক গভীর উৎসাহ সহকারে মণ্ডপ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথক পৃথক বিভাগে আসন গ্রহণ করিতে লাগিলেন। রোগী রোগ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, শোকার্ত্ত, শোকাশ্রু মুছিয়া, ব্যথিত, হৃদয় বেদনা ভুলিয়া, দুঃখী, হতাশার নিঃশ্বাস লুকাইয়া, বিপন্ন, বিপদের

বিভীষিকা বিস্মৃত হইয়া পুণ্যতীর্থে ছুটিয়া আসিলেন; সুখ ও ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে পরিপুষ্ট সৌভাগ্যশালী সন্তানগণ বিচিত্র বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া এবং উৎসাহশীল শ্রম-নিপুণ অনুষ্ঠাতৃগণ বিপুল উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া দলে দলে মন্দির মধ্যে আগমন পূর্ব্বক উহার শোভা সম্বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে বিশাল মন্দির জীবন্ত উদ্দীপনা ও জ্বলন্ত নিষ্ঠার পবিত্র নিকেতনে পরিণত হইল।

সমুচ্চ যজ্ঞ-মঞ্চের উপরিভাগে মহাযজ্ঞের প্রধানাচার্য্য, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সভ্যগণ এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান অনুষ্ঠাতৃবর্গ যথাযোগ্য বিবিধ নয়নরঞ্জন আসনে উপবিষ্ট। ইহাঁদের সম্মুখে পঞ্চনদভূমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, মধ্যভারত ও মান্দ্রাজের প্রতিনিধিগণ বিচিত্রবেশ ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে পৃথক পৃথক বিভাগে শ্রেণীবদ্ধভাবে উপবিষ্ট এবং এই সকল প্রতিনিধিগণের পশ্চাদ্ভাগে উচ্চতর-মঞ্চে সম্মানিত দর্শকগণের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট। এই মঞ্চে কতিপয় সহৃদয় ইংরেজ এবং অনেক গুলি উচ্চপদস্থ ভারতবাসী দর্শক স্বরূপে উপবিষ্ট হইয়াছেন এবং ইহাঁদের সহিত অনেক গুলি লাবণ্যময়ী গুণবতী ভারত-ললনা বিচিত্র বসন ও চারু অলঙ্কারে সুশোভিত হইয়া বিশাল মন্দিরের অতুল শোভা সম্পাদন করিতেছেন। পার্লেমেণ্টের মেম্বর শ্রীযুক্ত সোয়ান সাহেবের সুযোগ্যা পত্নী অপর কতিপয় মহিলার সহিত এই মঞ্চে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। যজ্ঞ-মঞ্চের দক্ষিণে বেহার, বঙ্গদেশ, আসাম ও উড়িষ্যার প্রতিনিধিগণ এবং বামে বোম্বাই ও দাক্ষিণাত্য বিভাগের প্রতিনিধিবর্গ পৃথক পৃথক আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন এবং ইহাঁদের পশ্চাদ্ভাগে সহস্র সহস্র পরিদর্শক বিভিন্ন বিভাগে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিয়াছেন। অভ্যর্থনা সমিতির পার্শ্বদেশে মহিলা পরিদর্শকগণের জন্য একটী পৃথক বিভাগ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, অনেকগুলি শিক্ষিত মহিলা এই স্থানে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। সকলেই উৎসাহপূর্ণ নেত্রে উদ্বোধনের সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন। চারিদিকে সমভাবে গভীর শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধিবর্গের সম্মুখবর্ত্তী নিম্নতর স্থানে বিবিধ সংবাদ-পত্র সম্পাদক ও সংবাদদাতাগণ গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; ইহাঁদের মধ্যে ভারতবন্ধু শ্রীযুক্ত ডিগ্‌বী সাহেবের সহযোগী শ্রীযুক্ত চক্ এবং "পেল্‌মেল্ গেজেট্," "রিভিউ অব্ রিভিউস্" এবং "গ্র্যাফিক্" সংবাদ পত্রের সংবাদদাতা শ্রীযুক্ত ডিলন্ ওফ্‌লিনের নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। শ্রীযুক্ত ডিলন্ ওফ্‌লিন্ উল্লিখিত তিনখানি সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকায় মহাযজ্ঞের বিবরণ প্রদান ভিন্ন ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট উক্ত বিবরণ সম্বন্ধীয় টেলিগ্রাম ও প্রবন্ধ প্রেরণের ভার প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই গম্ভীরভাবে আপন আপন মনোভাব লিপিবদ্ধ করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন।

গত বর্ষের বিধান অনুসারে এ বৎসর প্রতিনিধির সংখ্যা পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় অধিক হয় নাই; উক্ত সংখ্যা আনুমানিক সাত শতের অধিক হইবে না; ইহাঁদের মধ্যে চারি

জন মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন। পরিদর্শকগণের সংখ্যায় সমষ্টি পাঁচ সহস্রের ও অধিক হইবে।

দুই ঘটিকার অব্যবহিত পূর্ব্বে মহাযজ্ঞের প্রধান প্রধান নেতৃগণ দলে দলে মণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। জন্মভূমির প্রিয়সন্তান সুরেন্দ্রনাথ রোগশয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মাতার পবিত্র চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানার্থে অনেকের অগ্রে উপস্থিত হইয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন—তাঁহার জীবন রক্ষার্থে তদীয় শত শত বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তিগণ দিবা রজনী জগদীশ্বরের নিকট সকাতরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; তাঁহার কৃপায় তিনি রোগ-মুক্ত হইলেও এখনও সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ নহেন—তাঁহার শরীর শীর্ণ ও জীর্ণ; দুর্ব্বলতায় তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবসন্ন এবং মন নিস্তেজ হইয়াছে, তথাপি তাঁহার উৎসাহের বিরাম নাই—তিনি পরের হস্তে ভর দিয়া মন্দির মধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন—তাঁহার প্রশান্ত ও বিশুষ্ক মুখ হইতে উৎসাহের জ্বলন্ত অনল বিকীর্ণ হইতেছে। তিনি সমুচ্চ মঞ্চে উপস্থিত হইবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে মহোল্লাস-ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। যথা সময়ে জাতীয় মহাযজ্ঞের পিতৃস্থানীয় ভারতহিতৈষী মহাত্মা হিউম্ যজ্ঞমঞ্চে উপস্থিত হইলেন, অমনি চারিদিক হইতে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মহোল্লাসে তাঁহার জয়-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ইহার কিঞ্চিৎ পরেই অভ্যর্থনা সমিতির সুযোগ্য সভাপতি শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ এবং হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব সুদক্ষ ও স্বাধীনচেতা বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার রমেশচন্দ্র মিত্র যজ্ঞ-মঞ্চে উপস্থিত হইলেন; আবার চারি দিক হইতে আনন্দ ধ্বনি উথলিয়া উঠিল। ইহাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই পার্লামেণ্টের সুদক্ষ সভ্য, ভারত-বন্ধু শ্রীযুক্ত কেন্ এবং শ্রীযুক্ত সোয়ান্ মণ্ডপ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমুচ্চ মঞ্চে যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট হইলেন; ইহাঁদের শুভাগমন-জনিত আনন্দ কোলাহলে বিশাল মণ্ডপ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দুইটা বাজিবামাত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সম্পাদক এবং কতিপয় মাননীয় সভ্য প্রহরী-বেশধারী অনেকগুলি যুবক সমভিব্যাহারে জাতীয় মহাযজ্ঞের নির্ব্বাচিত প্রধান নেতা শ্রীযুক্ত ফেরোজ সা মেটাকে সমাদরে বরণ পূর্ব্বক যজ্ঞ মন্দিরে আনয়ন জন্য গমন করিলেন এবং অনতিবিলম্বে সকলে নিয়মিতরূপে শ্রেণী বদ্ধ হইয়া তাঁহাকে যজ্ঞ মঞ্চে আনয়ন করিলেন। তৎক্ষণাৎ সহস্র সহস্র প্রতিনিধি ও দর্শক দণ্ডায়মান হইয়া মুক্তকণ্ঠে গভীর আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন—সেই মহাধ্বনি প্রকাণ্ড মণ্ডপ ভেদ করিয়া আকাশ মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে মহাযজ্ঞের প্রধান উদ্যোগী, বঙ্গ-ভূমির প্রিয় সন্তান শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরম রমণীয় দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিতে পাইলেন না। গত বৎসর বোম্বাই নগরে অনুষ্ঠিত পঞ্চম মহাযজ্ঞের উপসংহার কালে তিনি সমবেত প্রতিনিধিবর্গকে ষষ্ঠ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য বঙ্গবাসিগণের মুখপাত্র স্বরূপে সানন্দে নিমন্ত্রণ করিয়া

ছিলেন; উক্ত নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে কত স্থান হইতে শতশত সুসন্তান মহাযজ্ঞে সম্মিলিত হইয়াছেন; তাঁহারা কিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করিবেন, তাহা তিনি স্বচক্ষে অবলোকন করিতে পারিলেন না। আজিকার শুভক্ষণে তিনি কঠিন পীড়ার নিষ্ঠুর আক্রমণে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত, কিন্তু তদবস্থাতেও তিনি প্রত্যেক অত্যাবশ্যক বিষয়ে উপদেশ দান করিতেছেন এবং প্রত্যেক আয়োজনের তত্ত্বানুসন্ধান লইতেছেন।

সমাগত সমস্ত প্রতিনিধি ও দর্শকমণ্ডলী স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হইলে পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, স্বদেশ প্রেমিক শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ ভারত ভূমির বিভিন্ন বিভাগ ও প্রদেশ হইতে সমাগত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সম্মানিত বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী শত শত প্রতিনিধিগণকে সাদর অভ্যর্থনা দানার্থে সমুচ্চ মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ সহস্র সহস্র ভারত সন্তানের উৎসাহ ও অনুরাগ উদ্দীপ্ত জ্যোতির্ম্ময় আনন-ভাতি অবলোকনে তাঁহার হৃদয় অনির্ব্বচনীয় ভাবে পরিপূর্ণ হইল; তিনি যেন ক্ষণকালের জন্য স্বীয় গুরুতর কার্য্যভারে ভীত ও সঙ্কুচিত হইলেন—ক্ষণ কালের জন্য তাঁহার বাক্যে অল্প পরিমাণে জড়তা উপস্থিত হইল—তিনি কম্পিত কণ্ঠে গম্ভীর ভাবে অভ্যর্থনা দানে প্রবৃত্ত হইলেন। নিমেষ মধ্যে তাঁহার কণ্ঠস্বর পরিস্ফুট ও স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল—তিনি মহোৎসাহে মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন;—

"জাতীয় মহাসমিতির প্রতিনিধিগণ, এই মহাসুযোগে আমি আপনাদিগকে আমাদিগের আন্তরিক অভ্যর্থনা দানের ভার প্রাপ্ত হইয়াছি। অভ্যর্থনা সমিতি আমাকে তাঁহাদিগের সভাপতি মনোনীত করিয়া তাঁহাদিগের নামে আপনাদিগকে অভ্যর্থনা দানের ভার প্রদানে আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য করা আমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। উক্ত সম্মান সর্ব্বাগ্রে বঙ্গসমাজের সুযোগ্য পাত্র, আমার মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সার রমেশচন্দ্র মিত্র ভিন্ন অপর কাহারও প্রতি প্রদত্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সমুচ্চ বিচারাসন হইতে তাঁহার বিদায় গ্রহণ জনিত এ প্রদেশের বিচার বিভাগে নিঃসন্দেহ বিশেষ ক্ষতি হইলেও ইহা আমাদের সকলেরই পক্ষে নিতান্ত আনন্দের বিষয় যে তিনি এক্ষণে এই মহৎ জাতীয় অনুষ্ঠানে স্বাধীনভাবে যোগদান এবং তদীয় সুমন্ত্রণা প্রভাবে আমাদিগকে পরিচালিত করিতে সক্ষম। যখন আমি অবগত হইলাম যে তিনি স্বাস্থ্য-ভঙ্গজনিত তাঁহার উপযুক্ত পদগ্রহণে অসমর্থ এবং তাঁহার একান্ত ইচ্ছা এই যে তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, যাহা আমার বিবেচনায় তিনি ভিন্ন আমাদের সমাজের অপর কেহই অধিকতর সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে অসমর্থ, তাহা মৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত হউক, তখন আমি এই বিবেচনা করিলাম যে আমার সহযোগীগণ আমার প্রতি যে ভার অর্পণ করিয়াছেন, আমি তৎসাধনে অক্ষম ও অযোগ্য হইলেও তাঁহাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করা আমার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত। আমার বিবেচনায় স্বদেশের সুখ-শান্তি বর্দ্ধন উদ্দেশে কোন কার্য্যে সহায়তা প্রদর্শন এবং স্বজাতির কল্যাণ-

কর কোন অনুষ্ঠানে অন্তরের সহিত যোগদান প্রত্যেক সুসভ্য মনুষ্যের জীবনের প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম। গতবার যখন আপনারা এই মহানগরে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, তখন কলিকাতার জনৈক সুবিখ্যাত অধিবাসী আপনাদিগকে অভ্যর্থনা দান করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সুদূর প্রসারিত সুযশ প্রভাবে তিনি নিঃসন্দেহ এতদঞ্চলের অধিবাসিগণের মুখপাত্র হইবার সর্ব্বথা উপযুক্ত। আমাদিগের পক্ষে ইহা অতীব দুঃখের বিষয় যে দীর্ঘকালব্যাপী অসুস্থতা নিবন্ধন আমাদিগের সেই সুপ্রসিদ্ধ বন্ধু রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র আজি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু একথা শুনিয়া আপনারা সকলে নিশ্চয়ই তৃপ্তিলাভ করিবেন যে যদিও তিনি রোগ-শয্যায় আবদ্ধ, এবং তজ্জন্য তিনি সমগ্র বঙ্গভূমির মুখপাত্র স্বরূপে আপনাদিগকে আর একবার সাদর অভ্যর্থনা দান করিতে অসমর্থ, তথাপি আমাদিগের সহিত তাঁহার হৃদয়ের সম্পূর্ণ যোগ রহিয়াছে এবং তিনি এখনও পূর্ব্বের ন্যায় এই মহান্ আন্দোলনের অচল পৃষ্ঠপোষক রহিয়াছেন। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান বর্ষে তাঁহাদের জনৈক প্রধানতম ক্ষমতাশালী ও উৎসাহশীল সহযোগী বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুতে বঙ্গভূমি, একজন যথার্থ স্বদেশানুরাগী এবং জাতীয় মহাসমিতি, জনৈক প্রকৃত সুদক্ষনেতা হারাইয়াছেন। ....
আমরা তাহার মৃত্যুজনিত শোক ভুলিতে না ভুলিতেই আপাততঃ কিছুকালের জন্য আমাদিগের দুইজন প্রধানতম উৎসাহ ও অধ্যবসায়শীল বন্ধুর বহুমূল্য সহায়তা ও সুকার্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি; বলিতে বড়ই ব্যথিত হইতেছি যে ইহাঁদের মধ্যে একজন দীর্ঘকাল ব্যাপী অসুস্থতানিবন্ধন এবং সাংসারিক শোকবশতঃ অদ্য এই মহাসমিতিতে উপস্থিত হইতে অসমর্থ—ইনি আমাদের সুপ্রসিদ্ধ মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অপর জন কিছুকাল কঠিন পীড়া ভোগ করিয়া সৌভাগ্যক্রমে আজি এই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন; কিন্তু তিনি এখনও এত দুর্ব্বল যে, তাঁহার অসাধারণ বাগ্মীতা প্রভাবে তিনি আমাদিগকে আনন্দিত করিতে একান্ত অক্ষম। ইনি আমাদের প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। চারি বৎসর হইল এই নগরে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল; উহার পরে আপনারা ক্রমান্বয়ে মান্দ্রাজ, এলাহাবাদ ও বোম্বাই নগরে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। উহার প্রত্যেক স্থানে আপনাদের প্রতি এরূপ সুন্দর অভ্যর্থনা প্রদত্ত হইয়াছিল যে, তাহার তুলনায় ১৮৮৬ খৃঃ অব্দের জাতীয় মহাসমিতির জন্য ভারতের প্রধানতম সমৃদ্ধিশালী বিভাগ বঙ্গদেশে আমরা যেরূপ আয়োজন করিয়াছিলাম—তাহা নিতান্তই সামান্য বোধ হয়। এ বৎসর যাঁহারা নানা স্থান হইতে এখানে সম্মিলিত হইয়াছেন, তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য আমাদিগের বিশেষ যত্ন ও উদ্যম সত্বেও আমাদিগের ব্যবস্থা-প্রণালী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই।"

সভাপতি এই কথা বলিবামাত্র বিদেশীয় প্রতিনিধিগণ একবাক্যে বলিতে লাগিলেন— "না, না,—আমাদের কিছুই অভাব নাই—আমরা সুখে আছি।" অনন্তর মহাসমিতি উহার বিপক্ষগণের নিকট কিরূপ কঠোর সমালোচনা ও তীব্র নিন্দাবাদ সহ্য করিয়াছে তাহা তিনি বিশেষরূপে উল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন যে, কোন বিষয়ের প্রকৃত স্বাধীন সমালোচনা দোষের বিষয় নহে—জাতীয় মহাসমিতির সমস্ত কার্য্য, সমস্ত বাদানুবাদ এবং সমস্ত মন্তব্য সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি; উহা সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক তন্ন তন্ন রূপে সমালোচিত ও পরীক্ষিত হইলে তদ্দ্বারা ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই। ন্যায়ানুমোদিত সমালোচনার পরিবর্ত্তে উহার প্রতি অযথা দোষ ও কলঙ্ক আরোপিত এবং উহার নেতৃগণ অন্যায়রূপে লাঞ্ছিত হইলে আমরা যতই ব্যথিত হই না কেন,আমরা যেন তাহাতে কখনই ভগ্নোৎসাহ ও নিরুদ্যম না হই; কারণ আজি পর্য্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে কোন মহৎ কার্য্যই প্রথমাবস্থায় কলঙ্কিত বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম না করিয়া সুসিদ্ধ হয় নাই। ····· এই সভাস্থলে এমন একজনও উপস্থিত নাই যিনি স্বীয় অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ইহা অনুভব না করিয়া থাকিতে পারেন যে এক্ষণে বৃটিশ শাসনে আমাদের ধন প্রাণ যেরূপ নিরাপদ, ভারত ইতিহাসের কোন সময়ে উহা সেরূপ ছিল না। বৃটিশ শাসন যদি এদেশে ইহা ব্যতীত আর কিছুই না করিয়া থাকে তথাপি শুদ্ধ উহারই জন্য আমরা ইংলণ্ডের নিকট একান্ত কৃতজ্ঞ; কারণ, ইহা সকলেই জানেন যে, দেশে শান্তি স্থাপন এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষণেই প্রজাবর্গের সুখ নির্ভর করে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এদেশের যে সকল কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, কেবল তজ্জন্যই যে আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা আমাদিগকে সুখশান্তি বর্দ্ধনোপযোগী যে কল্যাণকর সুশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্যও আমরা তাঁহাদের নিকট একান্ত ঋণী। প্রত্যেক জ্ঞানবান ভারতবাসী ইহা বিশেষরূপে জানেন যে, আজি যদি বৃটিশ শাসন হস্তান্তরে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে এদেশের দুর্গতির সীমা থাকিবে না। গত বৎসর বোম্বাই নগরে মহাসমিতির প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা দান উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ফেরোজসা মেটা যথার্থই বলিয়াছিলেন, "জাতীয় মহাসমিতি ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের উজ্জ্বলতম ফল।" তাঁহার বাক্যের সহিত আমিও ইহা বলিতে সাহসী যে, ইংলণ্ড এদেশ শাসন সম্বন্ধে যে উদার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, এই জাতীয় আন্দোলন তাহারই স্বভাবসিদ্ধ অনিবার্য্য ফল। ······ আজিকার এই জাতীয় মহান্দোলনের অর্থই এই যে, ইংলণ্ড আমাদিগের মঙ্গলের জন্য অনেক সদনুষ্ঠান করিলেও আমাদিগের হিতার্থে এখনও তাঁহার অনেক কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবশিষ্ট রহিয়াছে; অন্য কথায় উহা সংক্ষেপে ইহাই বুঝাইতেছে যে, ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন প্রণালী এখনও সম্পূর্ণরূপে সুসংস্কৃত হয় নাই—এখনও উহার অনেক উন্নতি ও সংস্কার সম্পাদিত হওয়া প্রার্থনীয়। গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলাচরণ অথবা তাঁহার কার্য্যে বিঘ্ন বাধা সংস্থাপন এই জাতীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্যের একান্ত

বহির্ভূত, পক্ষান্তরে ভারত শাসন বিষয়ে তাঁহাকে সহায়তা প্রদানই উহার প্রাণগত উদ্দেশ্য। ...... কোন একটী দেশের অধিবাসিগণের মতামত অগ্রাহ্য পূর্ব্বক এবং তাহাদের অভিপ্রায় ও অভাব উপেক্ষা করিয়া উক্ত দেশ শাসন করা একান্ত অসম্ভব; বিশেষতঃ কোন বিদেশীয় জাতির হস্তে উক্ত শাসন-ভার ন্যস্ত হইলে, যদি সুকার্য্য সাধনই তাঁহাদের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের অধীনস্থ প্রজাবর্গের অভিপ্রায়, অভাব ও স্বভাবজাত উচ্চাভিলাষের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন তাঁহাদের পক্ষে একান্ত অন্যায় বলিয়া পরিগণিত। ..... হোয়াইট হলের নিকটস্থ কোন কোন কর্ম্মচারী এবং এ দেশের কোন কোন শাসনকর্ত্তার মনে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস দৃঢ়রূপে বিদ্যমান যে, এ দেশের বিভিন্ন জাতীয় প্রজাবর্গের অনৈক্যের প্রতি ইংলণ্ডের প্রাধান্য নির্ভর করিতেছে, তাহাদের একতা সম্পাদনার্থে কোন সামান্যরূপ চেষ্টা বৃটিশ রাজ্যের পক্ষে বিপদ জনক। আমি ক্ষণকালের জন্যও ইহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি যে, কোন একজন যথার্থ রাজনীতিজ্ঞ ইংরেজ উক্ত বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত বিবেচনায় উহার প্রতি বিন্দুমাত্র আস্থা প্রদর্শন করিবেন। ...... কেহ কেহ এই প্রশ্নও উত্থাপিত করিয়াছেন, "জাতীয় মহাসমিতি কাহাদের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করে? যে সকল লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত লোক উহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একান্ত অনভিজ্ঞ, তাহাদের পক্ষে উহার কোন কথা বলিবার কি অধিকার আছে? তদুত্তরে আমি ইহাই বলিতে প্রস্তুত যে উহা ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখ স্বরূপ। আজি এই মহাসভায় যে সকল প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ঐ সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি; ঐ সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ হিতাহিত বিবেচনা করিতে শিখিয়াছেন এবং দিন দিন দ্রুত বেগে তাঁহাদের দল পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্য যে দেশের অশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ভাল মন্দ বিচারে অক্ষম কিন্তু সকল দেশেই শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অশিক্ষিতগণের পরিচালক—শিক্ষিতগণ কর্ত্তৃক অশিক্ষিতের অবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। আমরাও এ দেশের অশিক্ষিত অধিবাসিগণের অবস্থা উন্নত করিতে আশা করি এবং আমরা তাহাদের অবস্থার প্রতি কখনই ঔদাসীন্য প্রকাশ করি না। ..... কেহ কেহ জাতীয় মহা সমিতির প্রতি এই গুরুতর দোষারোপ করিয়া থাকেন যে উহা সমাজ সংস্কারের বিরোধী। উহা কখনই সমাজ সংস্কারের বিপক্ষ নহে। আমরা স্বয়ং দেশের শাসন বিষয়ে যে সকল সংস্কার সাধনে অসমর্থ, তাহাদেরই সুসিদ্ধির জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টের সহায়তা ভিক্ষা করি; যে সকল সামাজিক বিষয়ের সংস্কার বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হস্তে নির্ভর করিতেছে, তাঁহা উপযুক্ত সময়ে তাঁহাদেরই দ্বারা সম্পাদিত হইবে। পক্ষান্তরে এই জাতীয় মহাসমিতি নানা জাতীয় নানা ধর্ম্মাবলম্বী প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক পরিগঠিত—ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের, যুগ যুগান্তর ব্যাপী ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহার—এক-

সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহারের সহিত অপর সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার গত একত্বের অভাব—এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের চিরাগত প্রথা সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ, সুতরাং এরূপ স্থলে সামাজিক বিষয়ের কঠিন সমস্যা উপলক্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিনিধিগণের মতের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে না বলিয়াই জাতীয় মহাসমিতির ন্যায় রাজনৈতিক সমিতিতে সামাজিক তত্ত্বের আলোচনা আমাদের বর্ত্তমান ইচ্ছার একান্ত বহির্ভূত। কিন্তু তাই বলিয়া এই মহাসমিতি সমাজ সংস্কারে উদাসীন নহেন—যে সুশিক্ষার স্রোত বর্ত্তমান মহাসমিতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেই সুশিক্ষা প্রভাবে ইতিপূর্ব্বে ধীরে ধীরে অনেকগুলি সামাজিক সুসংস্কার সাধিত হইয়াছে। ......যে সকল ইংরেজ বন্ধু আমাদিগকে সমাজ সংস্কার বিষয়ে মিত্রভাবে সদুপদেশ দান করেন, আমরা তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু তাঁহাদের ইহা বিশেষ রূপে স্মরণ রাখা উচিত যে ভারতীয় সমাজঘটিত বিষয় সকল এতই জটিল যে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলির সংস্কার কিছুতেই সহজ-সাধ্য নহে, এবং বিদেশীয় সংস্কারপ্রিয় ব্যক্তিগণ ভারতের সামাজিক বিষয়ে যাঁহাদের জ্ঞান সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ, তাঁহারা কখনই উক্ত বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে পারেন না। ......কেহ কেহ ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, "জাতীয় মহাসমিতি আমাদিগকে কি সুফল প্রদান করিয়াছে?" হতাশ হৃদয়ে যাঁহারা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাদিগকে আমি একজন সুবিখ্যাত মানব হিতৈষী মহাত্মার বাক্যে উত্তর প্রদান করিব। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে বার্ম্মিংহাম নগরে একদা মহাত্মা জন্ ব্রাইটের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; আমি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিবার পূর্ব্বে তিনি বলিলেন, "দেশে যাইয়া তোমার স্বদেশবাসিগণকে বলিও তাঁহারা যেন অবিলম্বে কোন সুফল লাভের আশা না করেন, এবং তাঁহারা যা চাহেন তাহা না পাইলেও যেন ভগ্নোৎসাহ না হয়েন। ইংরেজ জাতি স্বয়ং দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলন ভিন্ন স্বজাতীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আশানুরূপ সংস্কার লাভে সহজে কৃতকার্য্য হয় নাই। কব্‌ডেন্ এবং আমি ৩০ বৎসর কাল অবিশ্রান্ত আন্দোলনের পর অবাধ বাণিজ্যের দ্বার প্রসারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আমার নিকট হইতে যাইয়া আমার কথা তোমার স্বদেশীয়গণকে বলিও যে যদি তাঁহারা দুই এক দিনের মধ্যেই সুফল পাইতে আশা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই কোন কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে সক্ষম হইবেন না।" আমি আশা করি ভারত বন্ধু ব্রাইট্ তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে যে মহৎ উপদেশ দান করিয়াছিলেন তাহার প্রভাবে আপনারা উৎসাহ পূর্ণ অন্তরে অধ্যবসায় সহকারে স্ব স্ব অবলম্বিত মহৎকার্য্য সাধনে রত থাকিবেন। যেন সকলেরই স্মৃতিপথে ইহা সর্ব্বক্ষণ সুস্পষ্টরূপে উদিত থাকে যে জাতীয় উন্নতির জন্য মহাসংগ্রামের এই প্রথমাবস্থা—বর্ষে বর্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই যে সকল জাতীয় সম্মিলন হইতেছে, উহার যত্নে উক্ত উন্নতি এক দিন অবশ্যই

পূর্ণ বিকশিত হইবে। উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে, আশার পথ চাহিয়া থাক, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে একদিন এই মহাসমিতির সমস্ত যত্ন ও উদ্যম শুভ ফল প্রদান করিবে।" পরিশেষে তিনি সমবেত প্রতিনিধিবর্গকে আর একবার অন্তরের সহিত অভিবাদন পূর্ব্বক অভ্যর্থনা দান করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। চারিদিক হইতে ক্ষণকালের জন্য গভীর আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

অনন্তর সার রমেশচন্দ্র মিত্র বোম্বাই হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ফেরোজসা মেটাকে সভাপতির পদে বরণ করিবার জন্য উচ্চ মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইলেন; তদ্দর্শনে সমস্ত প্রতিনিধি ও দর্শকবর্গ গভীর আনন্দধ্বনি পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। আনন্দ-কোলাহল নিস্তব্ধভাব ধারণ করিলে তিনি গম্ভীর ভাবে উৎসাহের সহিত বলিলেন,—"মহাসমিতির আজিকার কার্য্যে প্রথম প্রস্তাবের অবতারণায় আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছি। জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি নির্ব্বাচনই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এই কার্য্যভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহাকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ দান করিতেছি—বলিতে আনন্দ জন্মিতেছে, এই কার্য্য আমার পক্ষে বিনা পরিশ্রমে সুসিদ্ধ হইবে। মহাসমিতির এই কার্য্য যতই সামান্য হউক না কেন, উহা গ্রহণে আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছি। এই মহা সুযোগে আপনাদিগের নিকট মহাসমিতির নেতার পরিচয় দান আমার পক্ষে সম্মানের বিষয়—তিনি আপনাদের প্রত্যেক কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব বিধান করিবেন। আমি তাঁহার নাম উচ্চারণ করিবামাত্র উহা নিঃসন্দেহ আপনারা আনন্দের সহিত অনুমোদন করিবেন। শ্রীযুক্ত ফেরোজসা মেটা বোম্বাই হাইকোর্টে স্বীয় কার্য্যদক্ষতার যে উজ্জ্বল প্রমাণ দিয়াছেন, এবং অত্যাবশ্যক সাধারণ হিতকর কার্য্যের বাদানুবাদে যোগদান পূর্ব্বক তিনি যে ক্ষমতার পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাম পশ্চিম বিভাগে প্রত্যেকের নিকট নিশ্চয়ই সম্মানের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে; কেবল বোম্বাই বিভাগেই যে তিনি সকলের সম্মান লাভ করিয়া থাকেন, তাহা নহে, অন্যান্য সকল বিভাগ ও প্রদেশেও তিনি সমানভাবে সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। এক্ষণে আমার এই অনুরোধ যে, শ্রীযুক্ত ফেরোজসা মেটা সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।" এই বলিয়া তিনি উপবিষ্ট হইলেন, অমনি পুনরায় চতুর্দ্দিক হইতে আনন্দধ্বনি উথলিয়া উঠিল।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধি নবাব সামসুদ্দীন উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন এবং মান্দ্রাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত আনন্দ চার্লু ও লক্ষ্ণৌর প্রতিনিধি নবাব গোলাম রোবানি যথাক্রমে উহার সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতি অনুসারে উহা পরিগৃহীত হইল। অনন্তর সভাপতি শ্রীযুক্ত ফেরোজসা মেটা গভীর আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে সমুচ্চ মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া শ্রুতি-মধুর, স্নিগ্ধ, গম্ভীর স্বরে উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন;—

"মহাশয়গণ, আপনারা বর্ত্তমান বর্ষে আমাকে জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি-পদে বরণ করিয়া আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দান করিতেছি। সর্ব্ব সাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া এই গৌরবময় ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির সভাপতির পদে বরিত হওন অপেক্ষা অধিকতর সম্মান ভারতবাসীর পক্ষে আর কিছু হইতে পারে কি না, তাহা আমার বিবেচনার অতীত। অনেকে পারসীদিগকে বিদেশীয় বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন, এবং পারসীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ লোভ-পরতন্ত্র হইয়া আপনাদিগকে বিদেশীয় নামে পরিচয় দান করিয়া থাকেন। বার শত বৎসরে য়্যাংগ্লো স্যাকসন্, নরম্যান্ এবং ডেন্ জাতীয় বংশধরগণ যদি তাহাদিগকে ইংলণ্ডের অধিবাসী বলিয়া পরিচয় দানের অধিকারী হইতে পারে এবং তদপেক্ষা অল্প সময়েও ভারতীয় মুসলমানগণ যদি ভারতের অধিবাসী রূপে পরিগণিত হইতে পারে, তাহা হইলে আমরাও নিঃসন্দেহ এই দেশজাত সন্তান বলিয়া পরিচিত হইতে সর্ব্বথা সমর্থ; কারণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর অধিক সময় হইতে আমরা এদেশে বাস করিতেছি এবং এদেশে ইংরেজের আগমন কাল হইতে আমরা আমাদের হিন্দু ও মুসলমান প্রতিবাসিগণের সহিত একত্র এক উদ্দেশ্য, এক আশা ও একই স্বার্থের জন্য অবস্থিতি পূর্ব্বক এক সঙ্গে কার্য্য করিতেছি। আমার বিবেচনায় পারসীই হউন, আর মুসলমান বা হিন্দুই হউন, যিনি যত অধিক পরিমাণে স্ব স্ব জন্মভূমির প্রতি অনুরক্ত হইবেন, তিনি ততই ন্যায়ানুসারে প্রকৃত পারসী, প্রকৃত মুসলমান এবং প্রকৃত হিন্দু নামে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত পাত্র। যতই তাঁহারা জন্মভূমির সমস্ত সন্তান-গণের সহিত পরস্পর ভ্রাতৃভাব ও স্নেহ-মমতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন, ততই তাঁহারা দেশীয় সমস্ত সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃত্ব বিশেষরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন এবং এক শাসন প্রণালীর অধীনে এক উদ্দেশ্য ও এক আশার সংসিদ্ধির জন্য কোন্ অপরিবর্ত্তনীয় অমোঘ বন্ধনে তাঁহারা পরস্পরে একত্র সম্বদ্ধ, তাহাও তৎকালে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

পারসী বংশ-সম্ভূত, প্রকৃত পারসী, দাদাভাই নরোজী, যিনি আজীবন সন্তানের ন্যায় অকৃত্রিম ভক্তির সহিত সমগ্র ভারত ভূমির সেবায় দেহ-মন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাকে ভারত-সন্তান না বলিয়া আর কোন নামে গণ্য করা সম্ভব? পক্ষান্তরে, আমি যদি আর একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা উল্লেখ করি যে, সার সায়দ আমেদ খাঁ যৎকালে সাধারণতঃ সমস্ত ভারতবাসীর হিতার্থে স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা ও ক্ষমতা নিয়োগ করিতেন, এবং আজি যিনি চারিদিকে স্বার্থপরতা ও অনৈক্যের বীজ বপন করিতে-ছেন, তাঁহার তদানীন্তন জীবন বর্ত্তমান জীবন অপেক্ষা অধিকতর গৌরবময় ছিল, তাহা হইলে আমার বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে কে সন্দিহান হইবেন? ...... জাতীয় মহাসমিতি ভারতের ইতিহাসে ভারতীয় রাজনৈতিক উন্নতি সাধনে একটী মহান্

ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত। উহার প্রতি অবাধে কতই ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও নিন্দার বাণ বর্ষিত হইয়াছে, কিন্তু উহা তৎ সমস্ত হইতেই উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছে। আমরা অশান্তিপ্রিয় ও রাজদ্রোহী বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আমরা সে অভিযোগ হইতে মুক্ত হইয়াছি। আমরা নগণ্য (microscopic minority) জ্ঞানে উপেক্ষিত হইয়াছিলাম, আমরা সে উপেক্ষা হইতেও উত্তীর্ণ হইয়াছি। আমরা শিক্ষিত বলিয়াই দোষী বিবেচিত হইয়াছিলাম, এমন কি, আমরা সকলেই ছদ্মবেশধারী "বাবু" জ্ঞানে উপহসিত হইয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আমরা তৎসমস্ত দোষ ও উপহাস হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি! আমাদের রাজভক্তি বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। পার্লামেণ্ট মহাসভায় লর্ড ক্রশের ভারত-সংস্কার সম্বন্ধীয় আইনের পাণ্ডুলিপির বাদানুবাদ সময়ে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারলগণ একবাক্যে আমাদের শান্তিপ্রিয়তা ও রাজভক্তির বিশেষরূপে প্রশংসা করিয়াছেন। ইংলণ্ডের স্থিতিশীল দলের বিখ্যাত লর্ড র‍্যাণ্ডল্ফ চার্চ্চিল্ প্রকাশ্য ভাবে জাতীয় মহাসমিতির মঙ্গল কামনা করিয়াছেন। ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে ইতিহাস আমাদিগকে এমন কুশিক্ষা দান করে নাই যাহাতে শত শত বর্ষের যত্নে ইংলণ্ডে যে সকল পূর্ণ-বিকশিত প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক শাসন প্রণালীর উৎপত্তি হইয়াছে, তৎসমস্ত আমরা একদিনেই এ দেশে প্রবর্ত্তন করিতে অভিলাষী হইব। পাঁচ শত শতাব্দীর অনেক পূর্ব্বে, সাইমন্ ডি মণ্টফোর্ড্ ইংলণ্ডের শাসন প্রণালীতে যে প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন, তাহারও অগ্রে ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ যে ক্ষুদ্রাকার ব্যবস্থাপক প্রণালী উপভোগ করিতেন, আমরা সেরূপ ব্যবস্থাপক প্রণালীর জন্যও আবেদন করি নাই—আমরা যাহার জন্য প্রার্থনা করিয়াছি, তাহাতে শাসন সম্বন্ধীয় কোন ভারই আমাদের হস্তে অর্পণ করিবার প্রস্তাব নাই। আমাদের বিপক্ষগণ আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য বিফল করিবার জন্য যত প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তৎ সমস্তই বিফল হইয়াছে—আমরা তাঁহাদিগের নিকট পরাজিত হইবার পরিবর্ত্তে তাঁহারাই ন্যায়তঃ আমাদের নিকট পরাস্ত হইয়াছেন। ...... হিন্দু মুসলমানে চির বিবাদ ও চির শত্রুতা বিদ্যমান এই কথা লইয়া অনেকে আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্যে কলঙ্ক আরোপ ও আমাদের উদ্যম বিফল করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে নীচ চেষ্টাও বিফল হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমানে যে কোন বিষয়েই বিবাদ নাই, একথা আমি বলিতে প্রস্তুত নহি; কিন্তু নিন্দাকারিগণের বাক্য যে নিতান্তই অতিরঞ্জিত, তাহা আমি শতবার বলিব। হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর সদ্ভাবে এক মতাবলম্বী হইয়া কত অত্যাবশ্যক কার্য্যে যোগ দান করিয়া থাকেন, তাহাতে উভয় জাতীয় ধর্ম্ম বা সংস্কার সম্বন্ধীয় কোন বাধা বা অসুবিধা উপস্থিত হয় না। এই জাতীয় মহাসমিতিই উহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ—ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এক

উদ্দেশ্য ও এক আশার সফলতা লাভার্থে এক সঙ্গে কার্য্য করিতেছেন। ...... একটী ক্ষুদ্র বিষয়ে আমাদের যত্ন সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে—রৌপ্যের বাসনের প্রতি শুল্ক আমাদের আন্দোলনেই রহিত হইয়াছে। আবকারী বিভাগের সংস্কারের ভার উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে, তজ্জন্য আমাদের কোন চিন্তা নাই। ইহা আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে সুরাবৈরী শ্রীযুক্ত কেন্ সাহেব আজি এই মহাসভায় আমাদেরই জনৈক প্রতিনিধি স্বরূপে উপস্থিত আছেন। তিনি যখন প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তখন তিনি জাতীয় মহাসমিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন; স্বাধীন হৃদয় লইয়া ভারতের অবস্থা শিক্ষার্থে তিনি আলিগড়ে গমন করেন। শ্রীযুক্ত থিয়োডোর বেক্ এবং সার সায়দ আমেদকে ধন্যবাদ দান করা কর্ত্তব্য, কারণ তিনি তাঁহাদের সহিত বিবিধ বিষয়ের আলাপ করিয়া কেবল যে মহাসমিতির প্রধান প্রতিপোষক হইয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু লণ্ডনে ভারতীয় রাজনৈতিক কার্য্যালয়ের ও এক জন উৎসাহশীল সভ্য স্বরূপে তত্রত্য আন্দোলনের যথেষ্ট মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্র্যাড্‌ল সাহেব বিগত বার মাস ভারতের কল্যাণার্থে পার্লামেণ্ট মহাসভায় কতই পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে বিবিধ বিষয়ের আন্দোলন করিয়াছেন। তিনি ভারতবাসীর মঙ্গলার্থে যেরূপ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম অবিচলিত অধ্যবসায়, অতুলনীয় দক্ষতা এবং অপরিসীম যত্ন ও উৎসাহ সহকারে সর্ব্বক্ষণ কার্য্য করিয়াছেন, এবং ভারত সংক্রান্ত বিষয়ে যেরূপ সর্ব্বদা একান্ত সতর্কতাপূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন, তজ্জন্য সমগ্র ভারত ভূমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ, শুদ্ধ একথা বলিলে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানের অধিবাসিগণ যেরূপ গভীর ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সম্মান করিয়া থাকেন, তাহার পর্য্যাপ্ত পরিচয় দান করা হয় না। তিনি স্বকীয় সুকার্য্য প্রভাবে সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়ে স্বীয় স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতেছেন; উহা শত শত উপাধি ও সম্মান-চিহ্ন অপেক্ষা অধিকতর জ্যোতি বিকাশ করিবে এবং উহা ধাতু ও প্রস্তরময় স্মৃতি-চিহ্ন অপেক্ষাও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। এরূপ মহাবীরের সহানুভূতি লাভ আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়! অনন্তর মহাত্মা ব্র্যাডল ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা নিচয়ের সংস্কার এবং নির্ব্বাচন প্রথানুসারে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক প্রণালী প্রবর্ত্তন জন্য স্বয়ং একখানি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া উহা পার্লামেণ্ট মহাসভা কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে কিরূপ ঘোরতর পরিশ্রম করিয়াছেন এবং তাঁহারই প্রাণগত যত্নে লর্ড ক্রশের ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধীয় অসম্পূর্ণ আইনের পাণ্ডুলিপি কিরূপে বিফল হইয়াছে তাহা তিনি বিশেষরূপে উল্লেখ করিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন, "লর্ড ক্রশ যে পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্যবস্থাপক সভায় রাজ্যের বার্ষিক আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় বিবরণী (Budget) বিষয়ক বাদানুবাদ, প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অধিকার এবং মনোনয়ন

প্রথানুসারে উক্ত সভার আকার বর্দ্ধনের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছিল, কিন্তু উহাতে নির্ব্বাচন প্রথানুসারে সভ্য নিয়োগ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে দেশের যে মহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহার কোন ব্যবস্থাই প্রদত্ত হয় নাই। লর্ড সল্স্‌বেরী এই বলিয়া উক্ত পাণ্ডুলিপির অনুমোদন করিয়াছিলেন যে, পূর্ব্ব দেশীয় লোকের প্রকৃতি প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক প্রণালীর একান্ত বিরোধী! লর্ড সল্স্‌বেরী যে নিতান্ত ভ্রান্ত মতের পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই, কারণ পরলোকগত বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ শ্রীযুক্ত চিশ্‌হলম্‌ য়্যানষ্টি এবং সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানী সার হেন্‌রী মেন্‌ প্রভৃতি মহাশয়গণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে ভারতবর্ষ স্বায়ত্ত শাসন প্রণালীর সম্পূর্ণ উপযোগী—অতি প্রাচীন কালেও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র স্বায়ত্ত শাসনের উপযুক্ত সুন্দর সুন্দর প্রথা বিদ্যমান ছিল। ......লর্ড সল্স্‌বেরী এ দেশের ব্যবস্থাপক প্রণালীতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে যতই কেন ঘৃণাজনক বিপক্ষতা প্রদর্শন করুন না, আমরা যেন তাহাতে ভগ্নোৎসাহ না হই। তাঁহার ভূতপূর্ব্ব নেতা লর্ড বেকন্স্‌ফিল্ড্‌ কোন একটী স্মরণীয় দিনে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, তিনি যাহা বলেন, তাহার কোন্‌ কথা কি অর্থ প্রকাশ করে এবং কোন্‌ বাক্য কি ভাব বুঝায়, তাহা তিনি কখন বিবেচনা পূর্ব্বক বলেন না। পক্ষান্তরে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র লর্ড হিউ সিসিল্‌ ভারত শাসন সম্বন্ধে স্বাভিমত প্রকাশ উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসন প্রণালী যে কেবল উৎকৃষ্ট তাহা নহে, কিন্তু ভারতবাসিগণের উপযোগী যে কোন উত্তম শাসন প্রণালীর কল্পনা করা যাইতে পারে, উহা তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।" আমরা এই ঘোষণার মধ্যেও ভারতের শুভ আশার লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি; যৎকালে ইংলণ্ডের সংস্কার-আইন (Reform Bill) তত্রত্য সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অনুরাগ আকর্ষণে বিধি-বদ্ধ হইবার উপক্রম হইতে যাইতেছিল, ঠিক সেই সময় স্থিতিশীল দলের প্রধান নেতা, ডিউক্‌ অব্‌ ওয়েলিংটন্‌ বৃটিশ মহাসভায় লর্ডদিগের সমক্ষে এই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে তদনীন্তন হাউস্‌ অব্‌ কমন্সের অবস্থা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ছিল, এবং উহার উন্নতি জনক কোন প্রস্তাব মনুষ্য বুদ্ধির অগোচর। এই মহা ঘোষণায় উদার নৈতিক দল জয়ের পূর্ব্ব চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং এক বৎসর গত হইতে না হইতেই ইংলণ্ডের মহা সংস্কারের পাণ্ডুলিপি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ...... মহামতি ব্রাড্‌ল যেরূপ অবিচলিত উৎসাহ ও অবিশ্রান্ত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহাতে অচিরেই তিনি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলির সংস্কার সাধনে কৃতকার্য্য হইবেন। ...... লর্ড্‌ নর্থব্রুক্‌ এবং লর্ড রিপণ এই সংস্কারের একান্ত পক্ষপাতী—আমরা যাহা পাইতে আশা করি তাহা তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। রাজনীতি বিশারদ লর্ড ডাফ্‌রিণ ভারতবর্ষ পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই দেশের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী নির্ব্বাচন প্রথানুসারে ব্যবস্থাপক সভা

পরিগঠনের মন্ত্রণা দান করিয়াছিলেন; আমরা তাঁহার এই উদার মন্ত্রণার জন্য তাঁহার নিকট একান্ত কৃতজ্ঞ। এই ব্যবস্থার অনুমোদনে তিনি এ দেশীয়গণের প্রতি যে সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা চির দিন তাঁহার নাম ভক্তির সহিত স্মরণ করিব। এ বৎসর সেণ্ট্ য়্যাণ্ড্রুর স্মৃতি-ভোজ উপলক্ষে এ দেশের বর্ত্তমান লেপ্টনেণ্ট গভর্ণর শ্রীযুক্ত সার চার্লস্ ইলিয়ট্ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লর্ড ডফ্‌রিণের সুবিখ্যাত বক্তৃতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন; লর্ড ডফ্‌রিণ স্বইচ্ছায় আমাদিগের জন্য যে সকল সংস্কারের ব্যবস্থা দান করিয়াছিলেন, যদি তৎসমস্তই তাঁহার অনুমোদনীয় হয়, তাহা হইলে তিনিও নিঃসন্দেহ এই জাতীয় মহাসমিতির পরম বন্ধু, এবং তাহা হইলে বঙ্গবাসীগণের পরম সৌভাগ্য যে সার চার্লস্ ইলিয়টের ন্যায় উদার-হৃদয় শাসন কর্ত্তার হস্তে তাঁহাদের সুখ শান্তি বর্দ্ধনের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। ...... আমাদের বর্ত্তমান গভর্ণর জেনারল মহামতি লর্ড ল্যান্স্‌ডাউন্ মহৎ বংশসম্ভূত এবং মহান হৃদয়-সম্পন্ন উদার পিতার সন্তান, এবং স্বয়ং জনৈক বিচক্ষণ রাজনীতি-বিশারদ শাসনকর্ত্তা; তিনিও ব্যবস্থাপক সভার সংস্কারের পক্ষপাতী—আমাদের বিলক্ষণ আশা আছে যে তাঁহার সময় মধ্যে তাঁহার সহায়তায় আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

ব্যবস্থাপক সভার সংস্কারার্থে শ্রীযুক্ত ব্র্যাড্‌ল পার্লামেণ্ট মহাসভায় যে নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করিবেন, বর্ত্তমান সময়ের বৃটিশ পার্লামেণ্টের প্রধানতম নেতৃস্থানীয়, সচ্চরিত্র ও সুনীতির প্রতিমূর্ত্তি, ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ সাহেব তাহার পোষকতা করিতে প্রস্তুত আছেন। আপনারা সকলেই জানেন, অল্পদিন হইল শ্রীযুক্ত ব্র্যাড্‌ল সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন যে গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধীয় আইনের পাণ্ডুলিপিতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তন জন্য তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা মহাত্মা গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ সাহেবের সম্পূর্ণ অনুমোদনীয়, এমন কি তিনি উক্ত নির্ব্বাচন প্রথার সমর্থন জন্য মহাসভায় বক্তৃতা দান করিতেও প্রস্তুত আছেন।

মহাসমিতির উদ্দেশ্য নিচয় সংসাধন জন্য বর্ত্তমান বৎসরে আর একটী সুন্দর পথ অবলম্বিত হইয়াছে, উহা আমাদিগের কার্য্যে বিশেষ সহায়তা দান করিবে। আমাদের আন্দোলন-স্রোত শুদ্ধ ভারত-ক্ষেত্রে সংবদ্ধ থাকিলে আমরা সহজে অভিলষিত উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইব না, পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের অধিবাসিগণের সহায়তা ও সহানুভূতি ভিন্ন আমাদের আশার সফলতা লাভের সম্ভাবনা অতি অল্প, ইহা আমরা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়া এই বৎসর আমাদের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় বিষয়ক প্রস্তাব ইংলণ্ডে বিশেষরূপে আন্দোলনের জন্য আমরা শ্রীযুক্ত হিউম্, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আর্ড্‌লে নর্টন, শ্রীযুক্ত মধলকার এবং শ্রীযুক্ত যসিকে সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি স্বরূপ ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাঁহাদের অবিশ্রান্ত যত্ন ও পরিশ্রম এবং গভীর উদ্দীপনাপূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রভাবে তত্রত্য অনেক সহৃদয় নরনারী আমাদিগকে

প্রকৃত সহায়তা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সার উইলিয়ম ওয়েডারবারণ, দাদাভাই নারোজী, এবং ইংলণ্ডীয় রাজনৈতিক কার্য্যালয়ের সুদক্ষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত উইলিয়ম ডিগ্‌বীর প্রাণগত যত্নে আমাদের উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে। ...... ইতিহাস আমাদিগকে সুস্পষ্টরূপে এই শিক্ষা দিতেছে যে আন্দোলন বিনা পৃথিবীর কোন মহৎ কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় নাই; যুগযুগান্তর ব্যাপী আন্দোলন প্রভাবে ইংলণ্ডের অবস্থার এইরূপ অনির্ব্বচনীয় শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। জাতীয় মহাসমিতির পক্ষে ইহা নিতান্ত গৌরবের বিষয় যে, আজি এদেশের সমস্ত সুশিক্ষিত ও সুসংস্কৃত অধিবাসি-বর্গ ইংলণ্ডের প্রসাদ-লব্ধ সুশিক্ষা প্রভাবে সমগ্র ভারতভূমির রাজনৈতিক উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হইয়া ইংলণ্ডের নিকট কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন! আমি নির্ভয়ে বলিতে পারি যে উদার ইংলণ্ড একদিন অবশ্যই আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। ইংলণ্ডের সভ্যতার সর্ব্বহিতকর উদার নীতির প্রতি আমার অসীম বিশ্বাস আছে; ভারত প্রবাসী ইংরেজগণের প্রতিবাদ ও বিপক্ষতাবশতঃ আমাদের ভবিষ্য আশা সময়ে সময়ে অন্ধকারময় বোধ হইলেও আমার মনে এই ধ্রুব বিশ্বাস আছে যে, একদিন ইঁহারাও আমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য সহায়তা দানে অগ্রসর হইবেন। এই মহাসমিতির প্রার্থনা অতি ক্ষুদ্র এবং একান্ত সুসঙ্গত। আমি বিনীত ভাবে ইংলণ্ডের প্রকৃত সন্তানগণের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, মিত্র হউন অথবা শত্রু হউন, এই মহাসমিতি তাঁহাদের নিকট যে ন্যায়ানুমোদিত আবেদন করিতেছে, তাঁহারা যেন তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন না করেন। ইংলণ্ডের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ সার চার্লস ডিল্ক তৎপ্রণীত "Problems of Greater Britain" নামক পুস্তকে এই জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য নিচয়ের প্রতি যে সকল উদার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন সকলেই একবার ক্ষণকালের জন্য তাহা ধীর মনে পাঠ করেন। তাঁহারা যাহাই বিবেচনা করুন, আমাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সুস্পষ্টভাবে আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে; যদি আমরা অবিচলিত অধ্যবসায় ও উৎসাহের সহিত, নির্ভয়ে এবং ধীর ও বিনম্রভাবে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিপালনে কৃতসঙ্কল্প হই, তাহা হইলে একদিন আমাদের আশা অবশ্যই পূর্ণ হইবে।"

সভাপতির বক্তৃতা সমাপ্ত হইবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে গভীর আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। অনন্তর মহাসমিতির আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারণের জন্য ভারতবর্ষের প্রত্যেক বিভাগ ও প্রদেশ হইতে কতিপয় সুযোগ্য প্রতিনিধি লইয়া একটী সমিতি গঠিত হইলে পর সভাভঙ্গ হইল।

ক্রমশঃ।

কবিতামালা।

কা'র ?

(কা'র) নিরাশার দীর্ঘশ্বাস সমীরে ভাসিয়া আসে ?
জাগে কার আকুলতা বসন্ত সুরভি শ্বাসে !
মরমরি লতা পাতা ;
জানাইছে কা'র ব্যথা ?
(কা'র) মলিন নলিন আঁখি অশ্রুর সলিলে ভাসে ?
(কা'র) নিরাশার দীর্ঘশ্বাস সমীরে ভাসিয়া আসে ?

২

(আজ) বাসন্তী চাঁদিমা লোকে কা'র বাঁশী কোন্ দূরে,
গাহিছে খেদের গান করুণ মধুর সুরে ?
কা'র গাঁথা ফুল হার ;
বিন্দু বিন্দু অশ্রু কা'র,
প'ড়ে আছে লতাকুঞ্জে, শ্যামল তৃণের দলে ?
(কেহ) দেখেনি কি সেই অশ্রু, সে মালা পরেনি গলে !

৩

গিয়াছে ভাসিয়া কোথা নবীন হৃদয় কা'র ?
অযতনে, অনাদরে, অত্যাচারে, এ ধরার ?
দিয়ে স্নেহ, প্রতিদানে
পদাঘাত পেয়ে প্রাণে,
লাজে অবনত শির, ঝরিছে নয়ন-ধার !
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কোথা সরল হৃদয় কা'র ?

৪

কাহার বিলাপ ধ্বনি ঘিরে আছে চারিধার ?
বিষাদে বাসন্তী নিশি করে যেন হাহাকার !
স্বর্গের বালিকা তারা,
দুখে নিভ নিভ পারা,
ঢেলে দেয় শশধর কৌমুদী অমৃতাসার,
তবুও, তবুও, জ্বলে হায়রে হৃদয় কার ?

৫

জানিনা কাহিনী তার, দেখিনি সে ম্লান মুখ,
(শুধু) বিষাদের সুর শুনে কেঁদে কেঁদে ওঠে বুক!
শুনিতে তাহার কথা
বুঝিতে তাহার ব্যথা
সাধ যায়, মুছাইতে যাতনার অশ্রু ধার,
সমীরণে ভেসে আসে আকুল নিশ্বাস কার?

শ্রীবিনয়কুমারী বসু।

ফুলের কথা।

মধুর-প্রভাতে মেলিয়া নয়ন,
চাহিনু চারিটি পাশ,
আমারি মতন অযুত ফুলেরা
ফেলিছে সুরভি-শ্বাস।
কেহ বা ফুটেছে, অপর কেহ বা
একটু ফুটিতে বাকী—
মলয় বলিছে 'কুসুম বালিকা,
এখনো ফুটিবে না কি?
দেখিতে দেখিতে লোহিত-পূরবে
আসিল লোহিত ভানু,
হাসিয়া উঠিল ধরণী-হৃদয়ে
প্রতি-এক পরমাণু।
সেই খণ থেকে, আপনার মনে
হাসিয়া আকুল আমি—
একটি সুখের ভাবনা ভাবিয়া
কাটাই দিবস যামি।
এই ধরাতলে ক্ষণিক-জীবনে
আর কিবা কাজ আছে?
হাসিব, ভাবিব জীবন ভরিয়া,
আর কিবা সুখ আছে?
প্রভাত-জীবন অতীত হ'য়েছে
এখনো তেমনি হাসি,
বারেকের তরে বিরক্ত করেনি
একটি ঝটিকা আসি।
যে ক্ষণে আসিয়া অচেনা-প্রেমিক,
হৃদয়ের রাজা মোর,
মৃদুল-পরশে ভাঙিয়া দিবেন
ফুলের স্বপন-ঘোর,
বাসনার ধন নিকটে পাইয়া
হেথা না থাকিব আর,
তখনি আমার কুসুম-হৃদয়
মিশাব চরণে তাঁর।
জানি না, মানব, কেন তুমি ভাব
জীবন পরীক্ষা-ময়,
আমার মতন হাসিয়া হাসিয়া
ভাবিতে পারনা তাঁয়?

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

অশোক ফুল।

কাঁচা ঘুম ভাঙা কোথা ফুলকুলরাণী?
উষার অলক্ত কোথা জলদ পটলে?
মন্দারে মদির-আঁখি কোথায় ইন্দ্রাণী?
হোরীর নিশান কোথা গোপীর আঁচলে?
কোথা ব্রীড়া? চুম্বি রতি-বদন-কমলে,
অনঙ্গের চোর ওষ্ঠ আনে যাহা টানি!

কোথায় বা কমলার রাঙা পা দুখানি,
লাক্ষারক্ত লাল পদ্ম লাল শতদলে ?
সবার শ্রীপাদ-রজঃ ধরিয়া মাথায়,
রাজেরে অশোক ফুল কি মোহন সাজে !
আলো করি বনস্পতি রূপের ছটায়,
স্কন্দ তারকারি যেন তরু ফুলমাঝে !
চৈত্রের দুলাল তুই, বৈশাখী-সোহাগ,
হে অশোক, রূপে তোর হয়েছি অবাক্ !

কলির পুরোহিত।

উকিলি, মুন্সিফি, ক্রমে হৈল জজিয়তি ;
তবে কেন ঈর্ষ্যা-বহ্নি আজু তব জলে ?
হে বিচিত্র হোমকর্ত্তা, মরি কি কোশলে,
হোমানলে ঢালি দিলে দয়া ধর্ম্মপ্রীতি !
হে মহান, তব হৃদি-দিক-চক্রবালে,
জ্বলে না সরল সোম, উদার ভাস্কর ;
সূচিভেদ্য অন্ধকার ! তাই বুঝি জেলে
রেখেছ ও সর্ব্বগ্রাসী কাল বৈশ্বানর ?
হে কলির পুরোহিত, বিরাট আকৃতি !
আমি ক্ষুদ্র দীন দুঃখী—তুমি হে বিপুল ;
তোমার ও ভীম বহ্নি ; কবিচিত্ত ফুল
অতি ক্ষুদ্র, কোন্ প্রাণে দিব তা আহুতি ?
ক্ষমা কর—পূজা লাগি বিধবা মাতার,
রেখেছি ও অতি ক্ষুদ্র পুষ্পটি আমার !

"ভাই ফোঁটা"।

পাঁচ ভাই, তিন বোন্, ছিলাম আমরা ;
সুরপুরে গেছে চলি দুইটি ভগিনী ;
তিনে এক, একে তিন, তাই তুই এবে
মানময়ী, মানি, মানা, মেনা, সরোজিনী !
দাদা তোর ভোলা কবি ; যায় সে বিস্মরি
তুই আমাদের ভগ্নী, তার চিত্তে জাগে,
হস্তে দীপ আশা তুই ; তাই অনুরাগে,
তোরে ঘিরি, করি মোরা, ছায়া-ধরাধরি !
সুষুপ্তি ও জাগরণ মনুষ্য জীবন।
জাগরণে আশা তুই, স্বপনে ভগিনী ;
দিবি ফোঁটা ? করে দেরে ললাট মণ্ডন,
যশচন্দনের পাত্রে ডুবায়ে তর্জ্জনী !
পাঞ্চজন্য আচারেতে পুরুক্ সংসার ;
উৎপ্রেক্ষা সফল হোক্ গুহ দেবতার !

লক্ষ্ণৌর ফকিরের গান। *

তুই রাজা কি মুই রাজা,
তুই রাজা কি মুই রাজা,
বিশ্বযোড়া মুল্লুক মোর, সারা দুনিয়া প্রজা !
তুই রাজা কি মুই রাজা ?

---

* (জন-প্রসিদ্ধ এই যে লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজিদ্ আলি সাহ যখন লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিয়া যান, তখন নিতান্ত মনের দুঃখে এই ফকিরের গানটি রচনা করেন। লক্ষ্ণৌর ফকিরেরা পথে ঘাটে এই গানটা গাইয়া বেড়ায়। আমি যথাসাধ্য অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি ; কিন্তু মূলের সেই কাতরোক্তি—শোক সন্তপ্ত প্রাণ যেন গলিয়া পড়িতেছে—এবং সেইসহজ সুন্দর ফকিরি ভাব বজায় রাখিতে পারি নাই। গানটি অদ্ভুত ও কবিত্বপূর্ণ। বাস্তবিক ইহা একটি গীতরত্ন।) লেখক—

অন্য রাজার প্রজা যারা, কেঁদে কেঁদে হয় গো সারা;
খাজনা দিতে দিতে তাদের প্রাণটা ভাজা ভাজা;
মোর প্রজা থাকে সুখে, খাজনা দেয় হাস্যমুখে,
দুধে পুতে সম্পদেতে বুকটা তাদের তাজা ?
তুই রাজা কি মুই রাজা ?
মোর রাজত্বে মারি ভয়, ভয়ে আশু নাহি হয়;
দুর্ভিক্ষের গেছে হয়ে দ্বিপান্তরে সাজা!
তুই রাজা কি মুই রাজা ?
মাথে তাজ্ ঝক্‌মক্ করে, চক্ষু থাকে দেখে নেরে!
মোর জহুরির কারিগরি বোঝা নয়ক' সোজা!
তুই রাজা কি মুই রাজা ?
ওস্তাদজি ধ্রুপদ ভাঁজে; রোশন চৌকি ওইরে বাজে;
শোন্‌রে ওই রাত্রিদিবা বাজে নহবৎ-বাজা;
তুই রাজা কি মুই রাজা ?
কেল্লা মোর শূন্যে খাড়া; আসমানি পাথরে মোড়া;
গড়ের নীচে সিঁড়িগুলি মেঘে মেঘে ছাওয়া!
তুই রাজা কি মুই রাজা ?
আমার বজ্র-তোপের দাপে, দুস্‌মনেরা ভয়ে কাঁপে;
উড়িয়ে ফেলে বহুদূরে শিমুলে যেন হাওয়া।
তুই রাজা কি মুই রাজা ?
(আর) মজার মজা, বড়ই মজা, যিনি আস্‌মানের রাজা,
স্বয়ং তিনি তাদের প্রজা, যারা আমার প্রজা!
তুই রাজা কি মুই রাজা ?

রাধারাণী।

(একটি সত্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই কবিতাটি লেখা হইয়াছে।)

১

নয় বছরের মেয়ে, হয়েছে বিধবা আহা!
ম্লান মুখে বসে সে গো আছে;
আজি তার একাদশী! তাই গো জননী তার
জল খেতে বারণ করেছে।

২

মধ্যাহ্নে বালিকা কহে, জননীরে সম্বোধিয়ে
"দেরে মাগো জল একটুক্"
"নারে বাছা জল খেলে হবে তোর মহাপাপ'
—অমনি বালিকা হয় চুপ!

য়াছেন। তাঁহাদেরই দুই-একটী বচন যোগার অবলম্বন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজে বিবাহ, অপরিচিত ঘুমন্ত বালকবালিকার হঠাৎমিলন স্বরূপ হইলেও, তাহা যে কোন কোন স্থলে দেবপ্রতিম ও ঋষিপ্রতিম অভিভাবকদিগের যত্নে সাধিত হয় এবং তাহা হইতে মহত্তম উদ্দেশ্যও যে সাধিত হইতে পারে; আবার বিশুদ্ধ পরিণয় হইতেও অবনতি যে সম্ভাবিত, কিন্তু পুরুষের ঈশ্বরাসক্তি এবং ভার্য্যার ধর্ম্মানুরাগ, সতীত্ব ও ভর্ত্তার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতা হইতে ঈশ্বরপ্রসাদে সকল বিঘ্নবাধা কাটিয়া শেষে যে ভগবানের উপর একাগ্রতা জন্মান অসম্ভাবিত নহে; আরো এই রূপ একাগ্রতা হইতে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে যোগ—"চিত্তবৃত্তি নিরোধ"—আপনা-আপনি আসিয়া সুখ দুঃখের যে অতীত করিতে পারে, অতএব মুক্তি—"আত্যন্তিক দুঃখনাশ"—সম্ভাবিত;—সেইগুলি কথঞ্চিৎ চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সাধুগণের চিত্তরঞ্জনই ইহার উদ্দেশ্য; বিচার পাঠকদিগের হস্তে।"

লজ্জার সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে এই পুস্তকের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে নাই।

মৃত্যু সংবাদ।

ভারত বন্ধু মহাত্মা ব্রাড্‌লর অকাল মৃত্যু সমাচারে আমরা নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়াছি। তাঁহার সহিত আমাদের আশা ভরসা যেন চলিয়া গিয়াছে। তিনি ভারতবাসীর নিকটে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন ও তাঁহার ঋণ পরিশোধ করা আমাদের পক্ষে সাধ্যাতীত।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকট এবং ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি ও গুরুদাস বাবুর মেডিকেল লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

দীপনির্ব্বাণ (উপন্যাস) (দ্বিতীয় সংস্করণ)	১৲
বসন্তউৎসব (গিতী নাট্য)	।৵০
মালতী (উপন্যাস)	।০
গাথা (কাব্যোপন্যাস)	॥৵০
পৃথিবী	১৲
হুগলীর ইমামবাড়ী (উপন্যাস) ...	১।০
মিবার-রাজ (উপন্যাস,)	॥০
গল্প স্বল্প (স্কুল পাঠ্য) (দ্বিতীয় সংস্করণ)	॥০
বিদ্রোহ (নবপ্রকাশিত উপন্যাস)	১।০

ছিন্নমুকুল (দ্বিতীয় সংস্করণ) কেবল ২০১ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট মেডিক্যাল লাইব্রেরী শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

কাশিয়াবাগান, বাগান বাটী,
অপার সারক্যুলার রোড,
কলিকাতা।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
"ভারতী ও বালক" কার্য্যাধ্যক্ষ।

পঁচিশ টাকা

মূল্যের সাটী। নূতন প্রস্তুত করাইয়াছি। রেসমের পাড় ও পাছা, সুতার কাপড়, ফরাসডাঙ্গার কাঁচি বুনন। ১১ হাত লম্বা আড়াই হাতের কিছু অধিক বহর। আমার নিকট ৪ খানি আছে। এক এক খানির মূল্য ১২॥০। ডাক খরচা লাগিবে না। দুই পাড় (পাছা শূন্য) ঐরূপ সাটী এবং ধুতি তৈয়ারি হইতেছে। মূল্যও কিছু স্বল্প হইতে পারিবে। এতদব্যতীত নানাবিধ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ফরাসডাঙ্গার ধুতি সাটী ও উড়ানী এক দরে সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থ আমার নিকট আছে। মূল্যের সিকি অংশ অগ্রিম পাইলে ভেলুপেয়েবল ডাকে পাঠান যাইতে পারে।

৫ নং তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর,
কলিকাতা।

শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র।

প্রাচীন সংস্কৃত দৃশ্য কাব্য।

মৃচ্ছকটিক প্রকরণ। ১২৯৭ / ১৪৩।৯

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মৈত্রেয় বসন্তসেনার ব্যবহারে অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন—সেই বিরক্তি তাহার মুখেই প্রকটিত হইতেছিল—চারুদত্ত সেই জন্য তাহাকে দেখিয়াই প্রশ্ন করিলেন "বয়স্য! মঙ্গলত? সে কার্য্যের কি হইল?" মৈত্রেয় রুক্ষকণ্ঠে উত্তর করিলেন, সে কার্য্য নষ্ট হইয়াছে। "তবে কি বসন্তসেনা সেই রত্নহার অগ্রাহ্য করিয়াছেন?" চারুদত্ত সোৎসুকে পুনরায় এই প্রশ্ন করিলেন। মৈত্রেয় বলিলেন "আমার এমন কি ভাগ্য যে তিনি গ্রহণ করিবেন না? অভিনব কমলের ন্যায় কোমল অঞ্জলি মস্তকে বন্ধন পূর্ব্বক তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছেন!"

"তবে কেন বলিলে বিনষ্ট হইয়াছে?"

"কেনই বা বিনষ্ট হইল না—দেখুন, যাহা ভোগ করিলাম না—যাহা পান করিলাম না—যাহা চোরে হরণ করিল এবং যাহার মূল্য অতি অল্প, সেই সুবর্ণ ভাণ্ডের পরিবর্ত্তে চতুঃসমুদ্রের সারভূত রত্নাবলী অদ্য হারাইতে হইল!"

চারুদত্তের উদার হৃদয় এ কথায় ভুলিল না—তিনি বলিলেন—"বয়স্য! ও কথা বলিও না। বসন্তসেনা আমার প্রতি দৃঢ়তর বিশ্বাসেই সেই সুবর্ণ ভাণ্ড গচ্ছিত রাখিয়াছিল—মহামূল্য বিশ্বাসের মূল্যস্বরূপ সেই রত্নাবলী প্রত্যর্পণ করিয়াছি তাহাতে আক্ষেপের কারণ কি?"

মৈত্রেয়ের প্রধান উদ্দেশ্য যে যাহাতে চারুদত্ত বসন্তসেনার প্রতি বীতরাগ হন। কিন্তু এ সকল উপায়ে সফলকাম হইতে না পারিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন—"আর্য্য! আর একটী সন্তাপের কারণ এই বসন্তসেনা সখীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সঙ্কেত পূর্ব্বক মুখে বস্ত্র দিয়া আমার প্রতি উপহাস করিয়াছে। সখে! আমি ব্রাহ্মণ হইয়াও তোমার পদযুগল ধারণ করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি এই প্রত্যবায়ময় বেশ্যা সংসর্গ পরিত্যাগ কর। কেননা বেশ্যা পাদুকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট গুটিকার ন্যায় অতিকষ্টে বহির্গত হইয়া থাকে।"

মৈত্রেয় এই প্রকারে বসন্তসেনার বিরুদ্ধে নানাবিধ কুৎসা করিলেও চারুদত্তের মন কিছুতেই টলিল না। তাঁহারা উভয়ে বসিয়া আছেন এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে বসন্তসেনা স্বয়ং চারুদত্তের ভবনে সাক্ষাৎ প্রার্থনায় আসিতেছেন। মৈত্রেয় এই সংবাদ

শুনিয়া বলিলেন "ঐ দেখ মিত্র, আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা সত্য কিনা? বসন্তসেনা রত্নাবলী প্রাপ্তে সন্তুষ্টা না হইয়া আবার বোধ হয় কিছু লইতে আসিতেছে।"

বসন্তসেনা চারুদত্তের ভবন প্রবিষ্ট হইবামাত্রই মৈত্রেয় চারুদত্তের অনুরোধে তাঁহাকে অগ্রসর করিয়া আনিতে গেলেন। বসন্তসেনা মৈত্রেয়কে দেখিয়াই বলিলেন "আর্য্য, মৈত্রেয় তোমার সেই দ্যুতকর কোথায়?" চারুদত্তের প্রতি দ্যুতকর আখ্যা প্রযোজিত হইতে দেখিয়া মৈত্রেয় অতিশয় বিমর্ষভাবগ্রস্ত হইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চারুদত্তের নিকটস্থ হইলেন।

বসন্ত সেনা প্রবিষ্ট হইবামাত্র—চারুদত্তকে দেখিয়া তাঁহার গাত্রে পুষ্পক্ষেপ করিলেন। চারুদত্ত সাদরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "অয়ি! প্রিয়ে! প্রতিদিন সন্ধ্যাকাল জাগরণেই যাপিত হইত সমস্ত রাত্রি দীর্ঘ নিশ্বাসেই অতিবাহিত হইত। অয়ি! বিশাল নয়নে! বসন্তসেনে! অদ্য তোমার সহিত মিলিত হওয়ায় আমার সেই প্রদোষকাল দুঃখ নাশক হইল। আইস এই আসনে উপবিষ্টা হও।"

বর্ষাকালে প্রণয়ী যুগলের মিলন হইল। এ মিলন বিশেষ সুখের বটে—উভয়েই তাহাতে পরিতৃপ্ত ও চরিতার্থ হইলেন। বসন্তসেনার সমস্ত বস্ত্র বৃষ্টির জলে ভিজিয়া গিয়াছিল, আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ করিয়া তিনি শুষ্কবস্ত্র গ্রহণ করিলেন।

এই দুর্য্যোগময়ী ঝটিকা সঙ্কুল রজনীতে, বসন্তসেনা কি অভিসার উদ্দেশ্যে চারুদত্তের সমীপবর্ত্তিনী হইয়াছেন? বর্ষায় তাঁহার হৃদয়ের যে বিরহ ভাব দ্বিগুণিত করিয়াছে তিনি কি তাহাই প্রশমিত করিতে আসিয়াছেন? না তাঁহার মনে অন্য কোন অপ্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা আছে? মৈত্রেয় মনে মনে এই সমস্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে ভাবিলেন ইহাকে প্রকাশ্য জিজ্ঞাসা করাই ভাল। তিনি এসম্বন্ধে চারুদত্তের সম্মতি লইয়া বসন্তসেনাকে বলিলেন—এই দুর্যোগময়ী চন্দ্রমার অদর্শন বিধুরা ঘোরান্ধকারময় রাত্রিতে আপনার এখানে আসিবার কারণ কি?

এই দুর্য্যোগময়ী রাত্রিতে চারুদত্তের ভবন মধ্যবর্ত্তিনী হইবার দুইটী কারণ ছিল। বসন্তসেনার অন্তরে চারুদত্তের দর্শন তৃষা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল—তাহা চরিতার্থ করাই এই সাক্ষাতের মূল উদ্দেশ্য। তার পর এই সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোল্লিখিত চৌরাপহৃত সুবর্ণ ভাণ্ডনিহিত অলঙ্কারগুলি কৌশলে প্রত্যর্পণ করা ইহার অঙ্গীভূত দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। চারুদত্ত সুবর্ণ ভাণ্ডের অপহৃত দ্রব্যাদির বিনিময়ে বসন্তসেনাকে যে রত্নাবলী হার দিয়াছিলেন—তাঁহার দাসী এক্ষণে কৌশল ক্রমে মৈত্রেয়কে তাহার মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মৈত্রেয় এই সময়ে চারুদত্তকে ইঙ্গিত দ্বারা জানাইলেন "দেখুন! আমি যাহা বলিয়াছি তাহা সত্য কি না? রত্নাবলীর মূল্য অপেক্ষা সুবর্ণ ভাণ্ডের মূল্য অধিক এইজন্য বসন্তসেনা তাহাতে সন্তুষ্টা না হইয়া আরও কিছু লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন।"

এদিকে বসন্তসেনার সমভিব্যাহারিণী চেটী, ধীরে ধীরে বিদূষকের (মৈত্রেয়) সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিল "আপনারা যে রত্নাবলী আমাদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিয়াছেন তাহার মূল্য কত? আর্য্যা সেই রত্নাবলী নিজের মনে করিয়া দ্যূত ক্রীড়ায় হারিয়াছেন। সেই দ্যূতকর রাজার বার্ত্তাহারী, সে যে কোথায় পলাইয়াছে তাহা জানি না। সেই রত্নাবলীর বিনিময়ে আপনার এই সুবর্ণ ভাণ্ড প্রতিগ্রহণ করুন" এই বলিয়া সে পূর্ব্ব কথিত চৌরাপহৃত সুবর্ণভাণ্ড তাঁহাদের সম্মুখে রক্ষা করিল।

চারুদত্ত ও মৈত্রেয় তাহা দেখিয়াই অবাক্—একি! এই ভাণ্ডই না তাঁহাদের নিকট গচ্ছিত ছিল! ইহাই না গভীর নিশীথে চৌর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল!!! এ ভাণ্ড ইহাদের নিকট আসিল কিরূপে?? চারুদত্ত বিষম সমস্যায় পড়িলেন—হর্ষ বিষাদের সঙ্কটময় অবস্থায় আন্দোলিত হইতে লাগিলেন। হর্ষের কারণ, এই অপহৃত বস্তু পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বিষাদের কারণ এই, কি প্রকারে ইহা পাওয়া গেল—তৎ সম্বন্ধে অজ্ঞতা। বসন্তসেনার চেটী সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল—এই গভীর রহস্যের যবনিকা তুলিয়া দিল। চারুদত্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে নিজ অঙ্গুরীয় পুরস্কার দিলেন।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

বসন্তসেনা সেই রাত্রে তাঁহার প্রিয়তম, চারুদত্তের গৃহে রজনী অতিবাহিতা করিলেন। প্রভাত হইয়াছে—বালার্কের হিরণ্ময় জ্যোতি তাহার শয়ন কক্ষের গবাক্ষ ভেদ করিয়া চক্ষের উপর প্রতিহত হইতেছে দেখিয়া বসন্তসেনা সোৎসুকে বলিয়া উঠিলেন "কি! এত শীঘ্র রজনী প্রভাতা হইল! বস্তুত সুখের দিন অতি শীঘ্রই যায়। প্রাতে উঠিয়াই বসন্তসেনা জিজ্ঞাসা করিলেন "চারুদত্ত কোথায়?" তাঁহার দাসী উত্তর করিল তিনি "পুষ্পকরণ্ডক" নামক জীর্ণ উদ্যানে গমন করিয়াছেন। জীর্ণ—কেন না চারুদত্ত নিজেই দারিদ্রতার ভীষণ প্রহারে শীর্ণ। রাত্রে বসন্তসেনা চারুদত্তকে নয়ন ভরিয়া ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই, সুতরাং বলিলেন শকট আনয়ন কর, আমিও সেইখানে যাইব।

বসন্তসেনা প্রণয়োন্মাদিনী। হৃদয়ের আবেগে—অনুরাগের উন্মত্ততায়—তিনি চারুদত্তের বাড়ীতে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন—কিন্তু চারুদত্ত অবিবাহিত নহেন তাহার বিবাহিত পত্নী ধূতা দেবী হয়ত তাঁহার আগমনে বিরক্ত হইতে পারেন এই জন্য বসন্তসেনা তাঁহার দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"চেটি? আমার আগমনে চারুদত্তের পত্নী কি দুঃখিতা হইয়াছেন?"

চেটি। পূর্ব্বে দুঃখিতা হন নাই—কিন্তু হইবেন।

বস। কখন?

চেটি। আপনি যখন যাইবেন।

বস। আমি তবে আগে পরিতাপিতা হইব। চেটি! চারুদত্তের পত্নী—আমার ভগ্নী। তুমি এই রত্নাবলী লইয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া বলিবে—আমি যখন চারুদত্তের গুণবশীভুত দাসী হইয়াছি তখন তোমারও দাসী হইয়াছি। অতএব এই রত্নাবলী তাঁহারই কণ্ঠে ভূষিতা হউক।

ধুতা—চারুদত্তের পত্নী, সিংহের সিংহীনী, পতির ন্যায় আত্মসম্মান গৌরব দৃপ্তা—তিনি তৎক্ষণাৎ রত্নাবলী ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন "আর্য্যপুত্র—(চারুদত্ত) আপনাকে দিয়েছেন—সুতরাং আমার ইহা প্রতিগ্রহণ করা উচিত নহে। আপনি নিশ্চয় জানিবেন আর্য্যপুত্রই আমার অমূল্য অলঙ্কার।" সতীর উপযুক্ত কথাই বটে!

ইহার পর আর একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। ইহাতে বসন্তসেনার হৃদয়ের স্বাভাবিক উদারতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। চারুদত্তের বাটীর পার্শ্বে একঘর ধনী বাস করিতেন। তাহার এক বালকপুত্র হিরণ্যময় শকট লইয়া—রোহসেনের সহিত খেলিতে আসিত। সেই দিন বাল-বুদ্ধি ক্রমে, উক্ত প্রতিবেশী বালক, রোহসেনের নিকট হইতে সেই স্বর্ণ শকট লইয়া চলিয়া যায়। ইহাতে বালক রোহসেন অতিশয় কাঁদিতে লাগিল "সুবর্ণ শকট দাও" বলিয়া ভয়ানক আবদার আরম্ভ করিল। চারুদত্তের দাসী রদনিকা তাহাকে মৃত্তিকা নির্ম্মিত এক ক্রীড়নক শকট প্রস্তুত করিয়া দিয়া সান্তনা করিতে লাগিল—বালক কিছুতেই শান্ত হয় না—রদনিকা বলিল—"এস বাছা—আমরা এই শকট লইয়া খেলা করি।"

বালক। (কাঁদিতে কাঁদিতে) রদনিকে এই মৃত্তিকার শকটে প্রয়োজন কি? আমাকে সেই সোণার শকট দাও।

রদনিকা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) যাদু! আমরা সোণা কোথায় পাইব? পিতার পুনর্ব্বার সম্পত্তি হউক—তবে সোণার শকট লইয়া খেলা করিবে। রদনিকা ভাবিল নূতন লোক দেখিলে হয়ত বালক চুপ করিবে—এই ভাবিয়া তাহাকে বসন্তসেনার কাছে লইয়া গেল।

বসন্তসেনা জিজ্ঞাসিলেন—"রদনিকে! ভাল আছত? এ বালকটি কাহার? সুধাংশুবদন এই বালকটী অলঙ্কার শূন্য হইয়াও আমার অন্তঃকরণে অমৃত ধারা বর্ষণ করিতেছে।"

রদ। এই বালকটী আর্য্য চারুদত্তের। ইহার নাম রোহসেন।

বস। (হস্ত প্রসারণ করিয়া) এস বাছা! কোলে এস। আহা! ইহার পিতারও যেমন আকৃতি ইহারও তদ্রূপ।

রদ। কেবল আকারটী সমান, এরূপ নহে, অনুমান করি ইহার স্বভাবও পিতৃতুল্য। আর্য্য চারুদত্ত কেবল ইহাকে লইয়াই আত্মবিনোদন করেন।

বস। এটি কেন কাঁদিতেছে ?

রদ। এই বালক আমাদের প্রতিবাসী কোন গৃহপতির (?) বালকের স্বুবর্ণ নির্ম্মিত শকট লইয়া খেলা করিত—সেই বালক আপন শকট লইয়া গিয়াছে। তার পর সেই শকট লইবার জন্য বারংবার প্রার্থনা করায় আমি এই মৃত্তিকা শকট গড়িয়া দিয়াছি। ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিতেছে—রদনিকে, আমার মৃত্তিকার শকট প্রয়োজন নাই—সেই সোণার শকট দাও।

বস। হায়! হায়! এই বালকও পরের সম্পত্তি দেখিয়া সন্তাপ করিতেছে। ভগবন্! বিধাত! পদ্মপত্রে পতিত জল বিন্দুর ন্যায় অস্থির পুরুষের ভাগ্য লইয়া তুমিও ক্রীড়া করিতেছ ? (সজল নয়নে) বৎস! রোদন করিও না। তুমিও স্বুবর্ণ শকট লইয়া ক্রীড়া করিবে।

রোহসেন। রদনিকে ? এ কে ?

বস। আমি তোমার পিতার গুণ-বশীভূতা দাসী।

রদ। বৎস! ইনি তোমার মাতা হন।

রোহ। রদনিকে! তুমি মিথ্যা বলিতেছ। যদি ইনি আমার মাতা—তবে ইহাঁর গাত্রে এত অলঙ্কার কেন ?

বস। বৎস! মনোহর মুখে অতি করুণাকর কথা বলিতেছ। (অলঙ্কার খুলিয়া রোদন করিতে করিতে) আমি এখন তোমার মাতা হইলাম। তুমি এই অলঙ্কার লও, ইহার দ্বারা সোণার শকট গড়াইবে।

রোহ। তুমি যাও, আমি লইব না, তুমি কাঁদিতেছ কেন ?

বস। (চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া) না আমি কাঁদিব না, তুমি যাও, খেলা কর গে। (অলঙ্কার মৃৎ শকট পূর্ণ করিয়া) ইহার দ্বারা সোণার শকট গড়াইও।

পাঠক! একবার বসন্তসেনার—"চারুদত্তের গুণানুবর্ত্তিনী দাসীর" উদারতা দেখুন। এই ঘটনা হইতে গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। মৃৎ শকট রচিত এই ব্যাপার উপলক্ষ করিয়াই গ্রন্থের নাম মৃচ্ছকটিক হইয়াছে। ইহার পর হইতেই বসন্তসেনার দুঃখভোগ আরম্ভ হইল। তাঁহার জীবনে বর্ষা আরম্ভ হইল—সাধে বিষাদ ঘটিল—ঘটনাটী কি একবার শুনুন।

পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে চারুদত্তের দর্শনাভিলাষে যাইবার জন্য বসন্তসেনা অতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে বর্দ্ধমানক নামক একজন ভৃত্য শকট লইয়া পক্ষদ্বারে উপস্থিত হইল। বসন্তসেনার তখনও বেশভূষা করা হয় নাই—সুতরাং তাঁহার দাসী আসিয়া শকটচালককে বলিল "তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর—তিনি বেশভূষা করিতেছেন।" বর্দ্ধমানক তাড়াতাড়িতে শকটের আস্তরণখানি আনিতে ভুলিয়াছিল। বেশবিন্যাসে বিলম্ব হইবে ভাবিয়া সে শকট লইয়া আস্তরণ আনিতে

গেল। এদিকে, রাজার শ্যালক শকারের স্থাবরক নামক ভৃত্য ঘটনাক্রমে সেই পথে উপস্থিত। রাস্তার অনেকগুলি গাড়ি জমিয়া পথ বন্ধ হইয়াছে—স্থাবরকের শকট চালাইবার স্থান নাই। ইহাতে সে উগ্র প্রকৃতি ধারণ করিল। রাজশ্যালকের ভৃত্য তাহার প্রভুত্ব দেখে কে? সে আত্মগৌরবে অন্ধ হইয়া চারুদত্তের পক্ষদ্বারের সন্নিকটে শকট রাখিয়া রাজপথের গাড়োয়ানদিগের উপর জুলুম করিতে গেল। বর্দ্ধমানক তখনও ফিরে নাই। বসন্তসেনা তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার নিজের শকট মনে করিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। স্থাবরক ফিরিয়া আসিয়া গাড়ীর অভ্যন্তরে লোক প্রবেশ করিয়াছে ইহা জানিতে না পারিয়া গাড়ী চালাইয় দিল। বসন্তসেনা মনে করিলেন—তিনি পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে যাইতেছেন। কিন্তু তিনি যে বাগুরাবদ্ধ বিহঙ্গিণীর ন্যায় ব্যাধের কুটীরে নীতা হইতেছেন ইহা জানিতে পারিলেন না।

ক্রমশঃ।

একান্নবর্ত্তী পরিবার।

কোন সামাজিক প্রথার দোষগুণ বিচার করিতে যাওয়া কর্ম্ম দুঃসাহসের কার্য্য নহে। যে সামাজিক প্রথা শত শত বৎসর ধরিয়া জাতি বিশেষের মঙ্গলামঙ্গলের হেতুভূত হইয়াছে, যাহার ফলাফল শত শত বৎসর ব্যাপী, তাহার দোষগুণ বিচার করিতে যাওয়া অনেকেরই পক্ষে ধৃষ্টতা—এবং আমিও, নিজের অনুপযুক্ততা সম্বন্ধে উদাসীন্ নহি। তবে একান্নবর্ত্তি পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়া এবং সেই প্রথা প্রচলিত সমাজে লালিত পালিত হইয়া ইহার ফলাফল সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া এই গুরুতর বিষয়ে দুই একটি কথা বলিতে সাহসী হইলাম।

সেই প্রথাই সমাজের আদরের বস্তু যাহা মানবের লক্ষ্য সিদ্ধির পক্ষে সহায়তা করে। আর যাহা সেই লক্ষ্যের প্রতিকূল, তাহা বিষবৎ পরিত্যজ্য। কিন্তু মানব চরিত্র ও মানব সমাজ নিতান্ত জটিল বলিয়া এমন কোনও প্রথাই হইতে পারে না, যাহা একেবারে দোষশূন্য, বা যাহার পক্ষে দু চারিটি কথা বলা যায় না। একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথাও এই নিয়মের বশবর্ত্তী। ইহারও অনুকূলে ও প্রতিকূলে অনেক কথা বলিবার আছে। তবে যদি ইহার শুভকরী ফলের মাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশী হয়, তাহা হইলে ইহা সর্ব্ব প্রকারে রক্ষণীয়; অন্যথা ইহা যত শীঘ্র ভূতকালের বিষয় হয় ততই মঙ্গল।

মানব জীবনের লক্ষ্য ত্রিবিধ, শারীরিক (সাংসারিক), মানসিক ও নৈতিক। সাংসারিক অবস্থার উন্নতি করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা সাধারণতঃ জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। জ্ঞানালোচনার দ্বারা মানসিক শক্তি রাজির বিকাশ সাধন করা, মানবজীবন ও এই বিশ্বের নিগূঢ়তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করা" মানবের একটি মহোচ্চ অধিকার। পরিশেষে, সমস্ত স্বার্থ চিন্তা ভুলিয়া জীবের ক্ষুদ্র 'আমি'টাকে এই বিশ্বের মহাপ্রাণের সহিত মিশাইয়া জীবের কল্যাণ সাধন রূপ মহাব্রতে জীবন উৎসর্গ করাই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। এই সমস্ত লক্ষ্য সিদ্ধির মূলে ন্যায়ের অলঙ্ঘ্য বিধি। এই কয়েকটি কথা স্মরণ পথে রাখিয়া আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

পরিবারই সমাজের ভিত্তিভূমি। স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধই পরিবারের মূল। যখন সে গৃহে প্রভাতকুসুমের ন্যায় শিশুসন্তান জন্ম গ্রহণ করিল, তখনই পরিবারের সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হইয়া উঠিল। এ পর্য্যন্ত পরিবারের মৌলিক অবস্থা। যখন একই পিতামাতার বহুসন্তান বড় হইয়া সময় ক্রমে তাহারাই আবার নূতন নূতন পরিবারের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল এবং যখন এই সমস্ত মৌলিক পরিবার একত্রে একই গৃহে বংশপরম্পরা বাস করিতে লাগিল, তখনই একান্নবর্ত্তী পরিবারের সৃষ্টি হইল। একান্নবর্ত্তী পরিবারের সম্পত্তি সাধারণের—নিজস্ব বলিতে কিছু নাই। ইহাতে পরিবার ভুক্ত সকলেরই সমান অধিকার। ইহাই একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার বিশেষ ভাব।

আমাদের দেশ প্রচলিত প্রথানুসারে পুত্রগণই পিতার সম্পত্তির অধিকারী, তাহারাই একত্রে পিতৃ গৃহে বাস করে। কন্যাগণ শৈশবেই বিবাহিতা হইয়া শ্বশুর গৃহে প্রেরিতা হন্, পিতৃ গৃহের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ আর ঘনিষ্ট থাকে না। তাহারা অন্য পরিবারে গ্রথিত হইয়া সেই সেই পরিবারের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। ইহাতে কন্যাগণ পিতৃমাতৃ স্নেহ হইতে বঞ্চিত না হইলেও, পিতার বিষয় সম্পত্তি ও পিতৃগৃহের সুখ স্বচ্ছন্দতা হইতে বঞ্চিত হন্। এরূপ প্রথা একটি ঘোর অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের ন্যায় বুদ্ধি এরূপ প্রথাকে স্বতঃই নিন্দা করিয়া থাকে। ন্যায়বান্ লোক কখনই এ প্রথার অনুমোদন করিতে পারেন না। অন্য পক্ষে এই অন্যায় বিদূরিত করিয়া একান্নবর্ত্তী পরিবার গঠন যে এক প্রকার বাতুলের প্রলাপ, তাহা বোধ হয় কাহাকেও দেখাইয়া দিতে হইবে না। তাহা হইলে একটি সমস্ত সমাজকে এক পরিবার ভুক্ত করিতে হইবে।

ন্যায় অন্যায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়াও বর্ত্তমান প্রথার ফলাফল কিরূপ একবার বিচার করিয়া দেখা যাউক। এক পিতামাতার গড়ে দুটি করিয়া পুত্র সন্তান ধরিলেও অতি অল্পকাল মধ্যেই যে একান্নবর্ত্তী পরিবার অসম্ভব হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজ হউক, কাল হউক, বা দশ দিন পরেই হউক, একটি পরিবার ভাঙ্গিয়া

যে বহু পরিবারে বিভক্ত হইবে তাহা অবশ্যম্ভাবী। তবে এই অবশ্যম্ভাবী ফল কত দিন স্থগিত রাখা যায়, ইহাই এই প্রথার পক্ষপাতী লোকদিগের সমস্যা। কি প্রকারে এই বিশ্লেষণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা যাঁহারা দেশের অবস্থা অবগত আছেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। চির প্রচলিত প্রবাদ বাক্য— "ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই"—তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য অধিক দূর যাইবারও প্রয়োজন নাই। সাধারণতঃ লোকের ক্ষুদ্র হৃদয়ে আত্মসুখ কামনা এতই বলবতী যে একান্নবর্ত্তী পরিবারে বাস করা তাহাদের কার্য্য নহে। যাঁহারা আপনাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা অপেক্ষা অন্যের সুখ স্বচ্ছন্দতাকে অধিক আদর করেন, যাঁহারা অপরের ক্রটী মার্জ্জনা করিতে স্বতঃই প্রস্তুত, যাঁহাদের বুদ্ধি ও বিচার শক্তি কখনই মেঘাবৃত হয় না, যাঁহাদের প্রেম সমভাবে সকলের প্রতিই প্রবাহিত হয়, এক কথায় যাঁহারা মানবজীবনে দেবতা তাঁহারাই কেবল একান্নবর্ত্তী পরিবার গঠন করিতে পারেন। এরূপ লোক যে সংসারে নিতান্ত দুর্লভ তাহা বোধ হয় কাহাকেও স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না।

এমনও কেহ কেহ থাকিতে পারেন, যাঁহারা এ সমস্ত স্বীকার করিয়াও এই প্রথাকে অপেক্ষাকৃত বাঞ্ছনীয় মনে করেন। তাঁহারা বলেন, এ সমস্ত দোষ সত্ত্বেও ইহার অন্যান্য যে সমস্ত সুবিধা আছে তাহাতে ইহা থাকাই প্রার্থনীয়। এই শ্রেণীর লোকদিগকে ইহার স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি গুলি সচরাচর প্রয়োগ করিতে দেখা যায়।

প্রথমতঃ,—পিতামাতাকে সুখী করা সন্তানগণের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। যদি সন্তানগণ সদ্ভাবে থাকিয়া একত্রে সুখে বাস করেন, তাহা হইলে পিতামাতার মনে কত না আনন্দ! একান্নবর্ত্তী পরিবার ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে পিতামাতার এ সুখ সম্পাদন সম্ভবপর নহে। অন্ততঃ এই উপায়েই এ উদ্দেশ্য প্রকৃষ্টরূপে সংসিদ্ধ হইতে পারে।

স্বভাবতঃ প্রেম প্রবণ হৃদয় সংসারে দুর্লভ না হইলেও, তাহাদের সংখ্যা অধিক নহে। এমন অবস্থায় একত্র বাস সদ্ভাব বৃদ্ধির একটি প্রকৃষ্ট উপায়। সর্ব্বদা আমরা যাহাদের সহিত থাকি, তাহারা ক্রমশঃ আমাদের দৈনিক জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। ক্রমশঃ তাহাদের প্রতি আমাদের ভালবাসা স্বতঃই প্রবর্ত্তিত হয়। এই প্রকারে আমরা সততই দেখিতে পাই যে সামান্য ইতর জন্তু পর্য্যন্ত আমাদের ভালবাসার অংশীদার হইয়া উঠে। একত্র বাস যে প্রেম সাধনের একটি প্রধান উপায় সে বিষয়ে সংশয় নাই; এবং প্রেমই স্বার্থ বিসর্জ্জনের সোপান। যে হৃদয়ে প্রেম প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে আর স্বার্থ স্থান পাইতে পারে না। যে হৃদয় যে পরিমাণে প্রেমের বশীভূত, সে হৃদয় সেই পরিমাণেই স্বার্থ-বিরহিত, সেই পরিমাণেই মুক্ত, প্রেমই আমাদিগকে আপনা ভুলিয়া অন্যের জন্য খাটিতে শিখায় ও স্বর্গের পথে লইয়া যায়। একান্নবর্ত্তী পরিবার এই প্রেম সাধনের

সহায়তা করিয়া আমাদের চরম লক্ষ্য লাভের সহায় হয়। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে স্বাধীনতাই প্রেমের মূল—স্বাধীনতা ব্যতীত প্রেম অসম্ভব। এবং প্রেম রক্ত সম্বন্ধ দ্বারা নিয়মিত হয় না।

এ সংসারে যেমন অর্থ বলের প্রয়োজন, তেমনই জনবলেরও প্রয়োজন আছে। একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা এই উভয়বিধ বলের ভিত্তিভূমি। তৃণগুচ্ছ রজ্জুত্ব প্রাপ্ত হইলে মত্তমাতঙ্গকেও বদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা মনুষ্যকে একতা সূত্রে বদ্ধ করিয়া পরিবারকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলে। জীবন সংগ্রামে এরূপ বলের প্রয়োজন সমধিক। "দশের লড়ী একের বোঝা" একটি প্রাচীন বাক্য। যাহা এক জনের পক্ষে দুর্ব্বহ, বহুজনের সাহায্যে তাহা নিতান্ত লঘু বলিয়া অনুভূত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্র ভাবে সংসার স্থাপন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে যত ব্যয় পড়ে, বহুজন একত্রে বাস করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়েই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে। বিশেষতঃ আমাদের দেশের ন্যায় দরিদ্র দেশে যে এরূপ ব্যয় সংক্ষেপ কত প্রয়োজনীয়, তাহা বলিবার কথা নহে। সুতরাং আমাদের দেশের পক্ষে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার বিশেষ উপযোগীতা আছে। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন যেমন জীবন সংগ্রাম তীব্রতর হইয়া আসিতেছে অন্ন সঙ্কটও বিজ্ঞদিগের চিন্তাশক্তিকে অধিকার করিয়া ফেলিতেছে। দুর্ভিক্ষের শোণিত শোষণকারী বিভীষিকা আসিয়া সমাজের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। এই নিদারুণ দৈত্যকে দূর করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করা হইতেছে। একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা, বা তাদৃশী অন্য কোন নীতি কোন কোন অর্থ নীতিবিদ্ ও সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। অন্নের মধ্যে আমাদের দেশ প্রচলিত একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা যে অল্প ব্যয়ে সংসার নির্ব্বাহের সহায়তা করিতেছে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার পৃষ্ঠ পোষকেরা ইহার নৈতিক দিকেই বেশী জোর দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—একান্নবর্ত্তী পরিবারে একে আনে, দশজনে খায়, একের বোঝা অন্যে বয়,—এখানে নিজস্ব বলিতে কিছু নহে, যেখানে দশজনের সুখের জন্য একজন প্রাণপণ করিয়া খাটে। যেখানে দশজনকে সুখ শান্তি দিবার জন্য আপনার উচ্ছৃঙ্খল ইচ্ছাকে নিয়মিত করিতে হয়, মানবের চরম লক্ষ্য লাভের পক্ষে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শিক্ষা স্থল আর কোথায় মিলে? এরূপ প্রথার দুই একটা অবান্তর ফল অবাঞ্ছনীয় হইলেও ইহাকে আমাদের পরম আদরের বস্তু নহে? যে মানব এরূপ প্রথাতে সুখে থাকিতে না পারে, তাহারই আত্ম সংশোধন করা বিধি—এ প্রথা পরিবর্ত্তন করা যুক্তি যুক্ত নহে। কথাটা বড়ই সুন্দর, আপাততঃ এ যুক্তিটি অকাট্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু একটি কথা আছে। প্রথমতঃ, এই আত্মসুখানুরাগী, আলস্য প্রিয়, ভ্রান্তজ্ঞান বিশিষ্ট মানুষকে কোন বিশেষ প্রথার শাসনে রাখিয়া দেবতা করা যায় কি না। যে

প্রথা মানবের বর্ত্তমান অবস্থাকে বিস্মৃত হইয়া কেবল মাত্র আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে যায়, তাহা কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। পরন্তু বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে অনেক স্থলে সুধা উৎপন্ন না হইয়া গরল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ জন্য অনেক সময় আদর্শ বিধিও কার্য্যকারী হয় না, কিন্তু অবান্তর উপায়ে লক্ষ্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। আমাদিগকেও কোন প্রথার বিচার করিতে হইলে তাহার কার্য্য-কারীদিকে (Practical side) দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে।

দ্বিতীয় কথা, এ প্রথা জীবনের চরম লক্ষ্য লাভের প্রকৃত সহায় কি না। মানবের নৈতিক জীবনের মূলে ব্যক্তিত্ব ভাব। ব্যক্তিত্ব ভাবের স্ফূর্ত্তি না হইলে, আমাদের নৈতিক জীবনের কখনই স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না। যখন কোন ব্যক্তি আপনাকে একটি স্বতন্ত্র পুরুষ বলিয়া জানিয়া, জীবনের চরম লক্ষ্য সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপনার ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিতে চায় এবং আপনার জীবনের সমস্ত স্বার্থচিন্তা বিস্মৃত হইয়া মানব জাতির কল্যাণ সাধনে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আপন জীবন উৎসর্গ করে, তখনই তাহার প্রকৃত জীবন লাভ হইল। আত্মজীবন উৎসর্গ করিবার পূর্ব্বে আপনার জীবন হওয়া আবশ্যক, স্বাধীন ব্যক্তিত্ব ভাবের স্ফূর্ত্তি হওয়া আবশ্যক। স্বাধীনতাই ধর্ম্মনীতির প্রাণ। যেস্থলে স্বাধীনতা নাই—সেখানে প্রকৃত নীতিও নাই; নীতির বাহ্যানুষ্ঠান থাকিতে পারে কিন্তু তাহা প্রাণহীন। এখন বিবেচ্য একান্নবর্ত্তী পরিবারে এই নৈতিক আদর্শ লাভ হইতে পারে কি না? কলে ফেলিয়া স্বাধীন নৈতিক জীবন প্রস্তুত করা যায় না, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আদর্শ জীবনের পক্ষে একান্নবর্ত্তী পরিবারও এইরূপ একটি কল বিশেষ। এখানে স্বাধীনতা নাই, সুতরাং নৈতিক জীবনের অবশ্য প্রয়োজনীয় পূর্ব্বগামী অবস্থা (Precondition) টিও নাই। তার-পর, ইহাতে ব্যক্তিগত জীবনের নিতান্ত ক্ষুদ্র সীমাটিকে কথঞ্চিৎ অপসারিত করে বটে, কিন্তু সেই সীমাকে একটি ক্ষুদ্র পরিবারের সীমায় দৃঢ়তর রূপে আবদ্ধ করিয়া চরম লক্ষ্য লাভের অন্তরায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। যে মুহূর্ত্তে সমগ্র মানব সমাজ আসিয়া হৃদয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইল তখনই একান্নবর্ত্তী পরিবার অন্তর্হিত হইল, তাহার ক্ষুদ্র গণ্ডী ভাঙ্গিয়া গেল। যখন আমার একটি বন্ধু আমার ভ্রাতার সহিত সমভাবে আমার হৃদয়ের অংশীদার হইলেন, তখনই একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিশেষ ভাব বিদূরিত হইল। যখন হৃদয়ের সম্বন্ধ রক্ত সম্বন্ধ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর স্থান অধিকার করিবে, তখন একান্নবর্ত্তী পরিবার শুদ্ধ শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে।

সমাজ বিবর্ত্তন পর্য্যালোচনা করিলেও আমরা সমাজের মৌলিক অবস্থাতেই একান্নবর্ত্তি পরিবার প্রথা দেখিতে পাই। সমাজ বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিলোপ হইয়াছে। ইহাও এ প্রথার অনুকূল যুক্তি নহে। তবে বর্ত্তমান সময়ে যে Communism বা Socialismএর কথা শুনিতে পাই, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে একান্নবর্ত্তী পরিবার

প্রথা নহে, তাহাকে এ নাম দিলে ভাষা বিপর্য্যয় ঘটে মাত্র। এতদুভয় প্রথার মধ্যে সাদৃশ্য দূরের কথা, ইহারা বরং বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী।

অনেকেই কোন যুক্তি তর্কের ধার ধারেন না, যুক্তি তাহাদের নিকট দুষ্প্রাপ্য। তাহারা আবাল্য একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছেন। তাহারা অন্য-বিধ পরিবার গঠন প্রণালী অন্তরে স্থান দিতে পারেন না। এক পিতামাতার সন্তান সকলে একত্র বাস করিতেছেন, ইহা কেমন সুন্দর! ইহাই তাহাদের নিকট সর্ব্ব প্রধান ও একমাত্র যুক্তি।

একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার স্বপক্ষে যে সমস্ত কথা বলিবার আছে, তাহার বোধ হয় সকল গুলিই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এখন ইহার প্রতিকূলে কি কি বলিবার আছে একবার বিচার করিয়া দেখা যাউক। এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। মানুষ সাধারণতঃ আত্মসুখ প্রয়াসী। যাঁহারা স্বার্থ ভুলিয়া অন্যের সুখান্বেষণ করেন এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত বিরল। তৎপর প্রভুত্ব কামনা। যাঁহারা অন্যের সুখের জন্য আপনাদের আরাম বিরাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া খাটিয়া থাকেন, তাঁহারাও অধিকাংশ স্থলে আপনাদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহেন। এই ক্ষমতা প্রয়াস মানবের একটি স্বাভাবিক ইচ্ছা, অনেক স্থলে ইহাই মনোমালিন্যের হেতু হইয়া উঠে। একান্নবর্ত্তী পরিবারে যাঁহারা সমস্ত পরিবারের সুখ সচ্ছন্দের জন্য অহর্নিশি খাটেন, তাঁহারাই অন্যের নিকট কৃতজ্ঞতা ও আজ্ঞানুবর্ত্তিতা স্বতঃই প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। অনেক সময় তাঁহারা ভুলিয়া যান, আজ্ঞানুবর্ত্তিতার একটা সীমা আছে। এই সীমা অতিক্রম করিলেই অমিলন ঘটিয়া থাকে। স্বার্থপরতা ও প্রভুত্ব কামনা একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার দুটি বিশেষ শত্রু। ইহা দ্বারাই গৃহে গৃহে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন জ্ঞানের অভাবও অনেক সময় ন্যায়পথ পরিত্যাগের হেতুভূত হইয়া থাকে।

পিতা পুত্রের মধ্যে নানা কারণে অমিলন ঘটিয়া থাকে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশ একটি মহা পরিবর্ত্তনের অবস্থা। পুরাতন সমাজ বন্ধনের মধ্যে এক নূতন শক্তি প্রবেশ করিয়া সকলের মধ্যে মহা গোলমাল উপস্থিত করিয়া দিয়াছে। এই শক্তির প্রভাবে সমাজের আমূল সংস্কার অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা এ শক্তির প্রকৃতি না বুঝিয়া পুরাতন সমাজ নীতি রক্ষা করিতে চেষ্টিত হইতেছেন, নূতন পরিবর্ত্তনকে বিষজ্ঞানে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন, এবং যাঁহারা এই নূতন পরিবর্ত্তনের অনুষ্ঠাতা তাঁহা-দিগকে সমাজ ধ্বংসকারী বলিয়া মনে করিতেছেন, তাঁহারাই এই নূতন শক্তি প্রসূত শুভ ফলের প্রতিরোধ করিয়া কতকগুলি বিষময় ফলের হেতু হইয়া দাঁড়াইতেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকের অন্তর হইতে পুরাতন ধর্ম্মমত ও সমাজ নীতির বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছে। তিনি আর পূর্ব্বতন নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে পারিতেছেন না।

সাক্ষাৎ ভাবে মতভেদ প্রকাশ না পাইলেও, গুপ্তভাবে যে ইহার কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে সকল যুবক স্বাধীন ভাবে নিজের সংস্কৃত মত ব্যক্ত করিয়া তদনুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত পিতামাতার সাক্ষাৎ ভাবে অমিলন হইতেছে। কিন্তু যাঁহারা সে ভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত না করিয়া পূর্ব্বতন প্রথানুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহারা শুদ্ধ যে জ্ঞানের মহাদায়ীত্ব ভুলিয়া গিয়া কপটাচরণ শিক্ষা দিতেছেন তাহা নহে, পরন্তু তাঁহারা সুখী হইতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের অন্তরে নূতন ও পুরাতনে নিয়তই সংগ্রাম চলিতেছে; তাঁহাদের জীবনের শান্তি চির দিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। ইহাই বর্ত্তমান সময়ের পিতাপুত্রে অমিলনের একটি সর্ব্ব প্রধান কারণ।

আমরা উপরে যে যুক্তিটির উল্লেখ করিলাম, তাহা অনেক পরিমাণে সাময়িক। বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন কাল চলিয়া গেলে এ যুক্তিটির প্রযুজ্যতা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিবে, কিন্তু ইহা অসম্পূর্ণ তিরোহিত হইবে কি না বিশেষ সন্দেহের বিষয়। পিতা শৈশবাবস্থা হইতে পুত্রের উপর ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, বয়োবৃদ্ধি সহকারে যে সে ক্ষমতা লাঘব করিতে হইবে, ইহা ভুলিয়া যাওয়াতে অনেক সময় মনোমালিন্য উপস্থিত হয়; এবং যে পর্য্যন্ত না মানব প্রকৃতি আমূল সংস্কৃত হয়, ততদিন অমিলের এ কারণ বিদ্যমান থাকিবে।

পিতামাতার পুত্র বা পুত্রবধুগণের প্রতি স্নেহবৈষম্য গৃহ বিচ্ছেদের একটি স্থায়ী বিষম কারণ। সকলের স্বভাব কিছু সমান নহে, সুতরাং সকলের প্রতি সমান ব্যবহারও প্রত্যাশা করা যায় না। এজন্য বৃহৎ পরিবারে স্নেহ ও ব্যবহারের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায় ও ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল, পারিবারিক অশান্তি।

পিতাপুত্রে বিবাদ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু শাশুড়ী পুত্রবধূর কলহ চিরপ্রসিদ্ধ। এরূপ বিবাদে একান্নবর্ত্তী পরিবার যে কি অসুখ ও অশান্তির আলয় হয়, তাহা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। শাশুড়ী পুত্রবধূকে নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া মনে করেন ও তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে চাহেন; কিন্তু মানব প্রকৃতি সহজে অত্যাচার সহ্য করিতে চাহে না। তাই নানা প্রকার বিবাদের সূত্রপাত হয়। চির পূজিত দেশাচার শাশুড়ী পুত্রবধূর সম্বন্ধ পরিষ্কার দেখাইয়া দিতেছে। সৎপুত্র বিবাহ করিয়া আসিয়া মাতাকে বলেন যে তিনি তাঁহার জন্য দাসী লইয়া আসিয়াছেন। মাতাও মনে করেন, তাঁহার একটি দাসী হইল। বধূদিগের প্রতি শাশুড়ীর নির্য্যাতন দেশ প্রচলিত প্রবচন মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় ইংরাজি শিক্ষা যুবকদের অন্তরে প্রবেশ করাতে হিন্দুগৃহে নবোঢ়া বধূদিগের একটু আদর বাড়িয়াছে, স্থল বিশেষে স্থান বিনিময় হইতেও দেখা যায়। পিতাপুত্রে বা শাশুড়ী পুত্রবধূর বিবাদ কিছু চিরস্থায়ী হইতে পারে না। কালের

প্রভাবে একদল অন্যদলকে স্থান দিয়া তিরোহিত হইতে বাধ্য হন। কাযেই এবিবাদেরও শান্তি হয়। কিন্তু আবার নূতন বধূ আসিয়া সেস্থান পূরণ করেন—আবার নূতন বিবাদের সূত্রপাত হয়। একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিশেষ ভাব যেখানে বহুভ্রাতা পুত্র কলত্র লইয়া একত্র বাস করেন। সুতরাং আমরা এখন ভ্রাতায় ভ্রাতায় অমিলনের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে মতভেদ হওয়াতে যেমন পিতা পুত্রে অমিলন হইতে দেখা যায়, ভ্রাতায় ভ্রাতায় ও সেইরূপ দেখা গিয়া থাকে। যতদিন মানব মন শাস্ত্র ও দেশাচারের নিগড়ে আবদ্ধ ছিল, যতদিন দেশ মধ্যে স্বাধীন চিন্তার আদর ছিল না, ততদিন এরূপ মতভেদেরও কোন আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু যখন সুশিক্ষার গুণে মানবগণ স্বাধীন ভাবে সকল বিষয় বিচার করিতে শিখিয়াছে ও তাহার প্রভাবে শাস্ত্র ও দেশাচারের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে, তখন যে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে সকলের একমত হইবে এরূপ কখনই প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং মতবৈষম্য হেতু যে মনোমালিন্য তাহা এক প্রকার স্থায়ী। তবে যদি কখনও মানব-সাধারণ নিরপেক্ষ ভাবে অপরের স্বাধীন চিন্তার সম্মান করিতে পারে, তাহা হইলে এরূপ আশা করা যায় যে মতগত পার্থক্য একদিন অপ্রীতির হেতু হইবে না। কিন্তু সে দিন সুদূর পরাহত। কতদিনে যে লোকে স্বাধীন চিন্তার সমাদর করিবে, তাহা কল্পনারও অতীত!

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সংসারে দেবতার সংখ্যা নিতান্তই অল্প যদি দেবতাদের লইয়াই একান্নবর্ত্তী পরিবার গঠিত হইত, তাহা হইলে ইহার প্রতিকূল যুক্তি প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে এটি সম্পূর্ণ কল্পনার বিষয়, সাধারণ মানুষের প্রাণ স্বার্থবিজড়িত। আত্মসুখ ও ক্ষমতাপ্রিয়তা সাধারণ মনুষ্যের কার্য্য কলাপের অধিকাংশ স্থলেই নিয়ন্তা। পিতাপুত্রের মধ্যে স্বার্থ বিরোধ প্রায়ই উপস্থিত হয় না, কিন্তু ভ্রাতায় ভ্রাতায় এরূপ বিরোধ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা আমাদের সমাজের প্রকৃত অবস্থা জানেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন, স্বার্থ বিরোধজনিত ভ্রাতৃবিচ্ছেদ একটি প্রাত্যহিক ঘটনা। "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" ইহাই প্রমাণিত করিতেছে।

যেমন আত্ম সুখ প্রিয়তা পারিবারিক সুখের ব্যাঘাতক, ক্ষমতা প্রিয়তাও তদনুরূপ। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের উপর প্রায়ই প্রভুত্ব করিয়া থাকেন। এরূপ প্রভুত্ব অনেক সময়েই অশান্তি ও মনোমালিন্যের হেতু হয়। যে স্থলে কোন ভ্রাতা অপেক্ষাকৃত উপায়ক্ষম হন, পরিবারের উপর তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত। বিশেষতঃ তাঁহার পত্নীর প্রভুত্ব অধিকাংশ স্থলে নিতান্তই অসহনীয় ও অনেক গৃহবিচ্ছেদ ও ভ্রাতৃবিচ্ছেদের প্রধান কারণ। "স্বর্ণলতা"র প্রমদা কাল্পনিক চরিত্র নহে; প্রায় গ্রামেই দুই চারিটি করিয়া

জাবন্ত প্রমদা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে ভ্রাতায় ভ্রাতায় সদ্ভাব থাকিলেও পত্নী বিরোধে ভ্রাতৃ বিরোধ ঘটিয়া থাকে। এ বিষয়টি যুক্তিতর্ক দ্বারা বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহাদের সামাজিক বিষয়ের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা বিনা যুক্তিতেই ইহার সত্যতা স্বীকার করিবেন।

এরূপ পরিবারে যাহারা নিরীহ, তাঁহারাই প্রায় অত্যাচার প্রপীড়িত। তাহারা শত অত্যাচার সহিয়াও বিনা বাক্য ব্যয়ে দিন যাপন করে। যদি এরূপ স্ত্রীর স্বামী অক্ষম হন্, অথবা যদি তাহার নিজের শরীর অপটু হয়, তাহা হইলে ত অত্যাচারের অবধি থাকে না। এরূপ স্থলে স্বামীর কর্ত্তব্য স্থির করা দুরূহ নহে। বিবাহ কালে স্ত্রীকে সুখী করিবার দায়ীত্ব স্বামী নিজ মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন। যে স্থলে কোন স্ত্রী এরূপ অত্যাচার পীড়িতা, তাহাকে সেরূপ অশান্তি ও অত্যাচারের আলয় হইতে দূরে রাখা স্বামীর একান্ত কর্ত্তব্য। একান্নবর্ত্তী পরিবারে সুখে থাকার আশা অপেক্ষা, এরূপ স্থলে পৃথক হইয়া "সোয়াস্তি" লাভ করা বরং প্রার্থনীয়। ভ্রাতায় ভ্রাতায় যেমন একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, ভ্রাতৃবর্গের স্ত্রীদের মধ্যে সেরূপ কোন আকর্ষণের কারণ নাই, কাযেই তাহাদের মধ্যে যে সচরাচর বিবাদ বিসম্বাদ হইতে দেখা যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

সন্তানগণের সুশিক্ষা ও সুশাসনের পক্ষে একান্নবর্ত্তী পরিবার নিতান্ত অনুপযোগী। শিশুসন্তানগণের এক প্রকার শাসনে থাকাই বিধি। কিন্তু বৃহৎ পরিবারে তাহা কখনই সম্ভাবিত হয় না। বহুবিধ কর্ত্তৃত্বের অধীনে সুকুমার মতি বালক বালিকাদিগের নৈতিকদিক্ কখনই সুচারুরূপে পরিপুষ্ট হইতে পারে না। একজন হয়ত শাসন করিলেন, অপর আসিয়া আদর করিয়া তাহার সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন। শাসন মঙ্গলের হেতু না হইয়া ঘোর অমঙ্গলের সূত্রপাত করিল। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নরূপ শিক্ষা দিতে যাইয়া সকল সুশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া থাকেন। এরূপ বিবিধ প্রকার শক্তির প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া সুকুমার মতি শিশুগণের ভবিষ্যত অন্ধকার হইয়া যায়। অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ইহার বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

শিশুগণ নিতান্তই অনুকরণ প্রিয়। তাহারা যাহাকে যাহা করিতে দেখে, তাহাই করিতে শিক্ষা করে। অগঠিত চরিত্র বালক বালিকাদের পক্ষে ভিন্ন লোকের অনুকরণ মঙ্গল প্রসূ নহে। তদ্ভিন্ন, একান্নবর্ত্তি পরিবারে সর্ব্বদাই ঝগড়া বিবাদ হয়. শ্লেষোক্তির বিনিময় হয়। শিশুগণ এরূপ পরিবারে লালিত পালিত হইলে অতি শৈশবেই তাঁহাদের অন্তরে এই বিষ প্রবেশ করে এবং তাহাদের নৈতিক জীবনের মূলে কুঠারাঘাত হয়। এ ভিন্ন আরও একটি কথা আছে। যাঁহারা কল্পনা নির্ম্মিত সুনির্ম্মল গৃহে বাস করেন না, যাঁহারা মানুষের স্বার্থপর হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থা জানেন,

তাঁহারাই জানেন, মানবের দৈনন্দিন জীবনে স্বার্থান্বেষণ কি স্থান অধিকার করে। যেখানে স্বার্থে স্বার্থে ঘর্ষণ হইবার সুযোগ নাই, সেস্থলে ইহার অপ্রীতিকর আকৃতি দৃষ্টি পথে পতিত হয় না, সুতরাং সে স্থলে তাহা অন্যের নিকট কু-আদর্শের কার্য্য করিতে পারে না। কিন্তু যেখানে স্বার্থ বিরোধ রহিয়াছে, যেখানে মাতা নিজের সন্তানকে গোপনে ভাল খাবারটি খাইতে দিতেছেন, অন্যের সন্তানকে দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছেন না, সেস্থলে সুকুমারমতি বালক বালিকাদের উপর ইহার ফলাফল যে কি বিষময়, তাহা বলিবার নহে। সন্তানকে কু-আদর্শের পথ হইতে দূরে রাখিয়া সুশিক্ষা দেওয়া যদি পিতামাতার কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে কি এরূপ পরিবার হইতে দূরে থাকা পিতার কর্ত্তব্য হইবে না? অবশ্য আদর্শ চরিত্র বিশিষ্ট মনুষ্য লইয়া সমাজ বা পরিবার গঠিত হইলে এরূপ ঘটিবার কোন আশঙ্কা নাই—কিন্তু দুঃখের বিষয় মনুষ্য সাধারণ নিঃস্বার্থ নহে, তাহারা আপনাদের পতি পুত্র বা পত্নী পুত্রের প্রতি ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিয়াও অনেক সময় অন্যাপেক্ষা অধিকতর যত্ন দেখাইয়া থাকে। এবং অনেক সময় তাহা নীচতাতে পরিণত হয়। শিশুদের উপর ইহার ফলাফল সহজেই অনুমেয়।

প্রত্যেক পিতামাতা আপনাদের সন্তানের সুশিক্ষা ও সুচারু রূপে ভরণপোষণের জন্য স্বতন্ত্রভাবে দায়ী। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মহা দায়ীত্বের ভাব সাধারণ মানব মনে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক সময় বাহ্য অবস্থার পেষণে অনেকে কর্ত্তব্য পালন করিতে শিক্ষা করেন। বাহ্য অবস্থার চাপ সরিয়া গেলে, তাহাদের দায়ীত্ব বোধও অন্তর্হিত হয়। এরূপ বাহ্য চাপ রাখাই তাহাদের নৈতিক শিক্ষার একমাত্র উপায়। একান্নবর্ত্তি পরিবার প্রথা অনেকের পক্ষে এই বাহ্য অবস্থার চাপ সরাইয়া ফেলিয়া তাহাদের জীবনকে অধিকতর দায়ীত্ববিহীন করিয়া তুলে। এরূপ দায়ীত্ব বিহীন হইয়া তাহারা অনায়াসে বিবাহ করে ও সংসারে নূতন জীব আনয়নের হেতুভূত হয়। এরূপ স্থলে সমস্ত দায়ীত্ব দুই এক জনার স্কন্ধে চাপিয়া পড়ে। সুতরাং তাহাদের আপনাদের বিশেষ দায়ীত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না। সন্তানের প্রতি পিতামাতার বিশেষ দায়ীত্ব স্বীকার করিলে, একান্নবর্ত্তী পরিবার যে সে দায়ীত্ব প্রতিপালনের বিশেষ উপযোগী; এরূপ কথা বোধ হয় কেহ বলিবেন না।

সাধারণ ভাবে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা আরও কয়েকটি দোষের অবান্তর কারণ হইয়াছে। এই প্রথা আলস্যের প্রশ্রয় দিয়া জাতীয় হীন-জীবতা আনয়ন করিয়াছে। যাহারা নিজের ঘাড়ে চাপ পড়িলে খাটিত, অনেক প্রকার অভাব স্বীকার করিয়াও নিজের অবস্থার উন্নতি সাধনে যত্নশীল হইত, তাহারা অন্যের গলগ্রহ হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে বলিয়া আর খাটিতে চাহে না। যদি পাঁচটি ভ্রাতার মধ্যে একজনও ক্ষমতাশালী হন, তাহা হইলে অনেক স্থলে অপর চারিটি ভাই অনা-

য়াসে বিশিষ্টরূপে উদর যাত্রা ও জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এরূপ উদাহরণ নিতান্ত বিরল নহে। এ জন্য সমাজে কার্য্যকরী শক্তি উপযুক্ত রূপে নিয়োজিত না হওয়াতে জাতীয় বলক্ষয় ও অর্থনাশ হইতেছে। অবশ্য যেস্থলে সকল ক'জনই উপায়ক্ষম ও সকলে সদ্ভাবে একত্র বাস করেন, তাহারা একান্নভুক্ত থাকাতে ধন ও বল সঞ্চয় হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত! এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ও সকল পরিবারে এরূপ শুভ মিলন ঘটে না।

কাজ করা, বিশেষতঃ নিজের জীবনোপায়ের জন্য কাজ করা, চির দিনই সর্ব্বত্র হেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। নিজের হাত পা খাটাইয়া কাজ করা চিরকালই অপমান জনক বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য দেশে অবস্থা চক্রে পড়িয়া লোকে সে সমস্ত মানাপমানের কথা বিস্মৃত হইয়া আপনার অবস্থোন্নতি করিয়াছে এবং এইরূপে স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনের মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই দুইটি মহা নৈতিক বলের প্রভাবে অধুনাতন সুসভ্য জাতিমণ্ডলী জগতের অগ্রণী হইয়াছে। অপর পক্ষে আমাদের দেশে একান্নবর্ত্তি পরিবার প্রথা সেই অমূলক মানাপমানের ভাব অন্তরে জাগরূপ রাখিয়া আমাদিগকে অলস করিয়া ফেলিয়াছে, এবং প্রকৃত আত্মমর্য্যাদার ভাব আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল হইতে দেয় নাই। স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনের ভাব আমাদের অন্তরে প্রকৃষ্ট রূপে বিকসিত না হওয়াতে আমাদের জাতীয় জীবন নিতান্তই হীন রহিয়াছে। এক্ষতির তুলনায় অন্য ক্ষতিকে আর ক্ষতি বলিয়া বোধ হয় না।

এ প্রথার আর একটি অবান্তর ফল, বাল্যবিবাহের প্রশ্রয়। কিছু সংস্থান না করিয়া বিবাহ ইহার অন্যতম ফল। এমন কি, একান্নবর্ত্তিতা প্রচলিত না থাকিলে বাল্যবিবাহ একদিনও তিষ্ঠিতে পারে না। অপর পক্ষে বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিলে, একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রধান ভিত্তি সরিয়া যাইবে। একটি পূর্ণবয়স্কা যুবতীকে আনিয়া অন্য একটি পরিবারের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া বড় সহজ কার্য্য নহে, কিন্তু একটি অগঠিত চরিত্রা বালিকাকে সেরূপ করিয়া লওয়া তত দুঃসাধ্য নহে। বাল্যবিবাহ আমাদের দেশে বদ্ধমূল হইবার পক্ষে ইহা যে একটি প্রধান কারণ তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। যতদিন এ প্রথা আমাদের দেশে বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন যে বাল্যবিবাহের একটি সুদৃঢ় দুর্গ আমাদের দেশে বর্ত্তমান রহিল তদ্বিষয়ে কোন দ্বিধা নাই। নিজের অর্জ্জন করিবার ক্ষমতা জন্মিবার পূর্ব্বে পুরুষদের যে বিবাহ হয় তাহার প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথাই যে ইহার মূল তাহাতে কেহই সন্দেহ করিতে পারেন না। এ প্রথা উঠিয়া গেলে, এরূপ অসংস্থিত বিবাহ ও বাল্যবিবাহ যে উঠিয়া যাইবে, তাহা অবশ্যম্ভাবী।

একান্নবর্ত্তি পরিবার সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা এক প্রকার শেষ হইল।

আমরা যে মহা লক্ষ্য সিদ্ধির পক্ষে এই প্রথার আংশিক উপযোগিতার কথা বলিয়াছিলাম, কার্য্যে পরবর্ত্তী যুক্তিগুলি তাহার বিপরীত ফলই প্রদর্শন করিয়াছে। অনেক স্থলেই ইহা প্রেম সাধনের উপায় না হইয়া, ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধি না করাইয়া বরং বৈরীভাবই উৎপাদনের মূল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এরূপ বিপরীত ফল ফলিবার কারণও আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। আত্মসুখ-পরায়ণতাই মানুষের প্রধান শত্রু। এই কারণে একান্নবর্ত্তি-পরিবারের সুখ আকাশ কুসুমের ন্যায় হইয়াছে, দূর হইতে অতি মধুর ও নয়নানন্দকর, কিন্তু নিকটে গেলেই তাহা অন্তর্হিত হয়। তবে কি আমাদের এই চরম লক্ষ্যসিদ্ধির কোন উপায় হইবে না? মানুষ কি চিরদিনই আপন আপন ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ লইয়াই ঘুরিবে? অন্যের স্বার্থে আপনার স্বার্থ ডুবাইয়া দিয়া মহাপ্রাণতা লাভ করিতে পারিবে না? সুসভ্য মানব সমাজ কি এই মহান্ লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য কোন বিধি ব্যবস্থা করিবে না? সাক্ষাৎভাবে একান্নবর্ত্তি পরিবার প্রথার দ্বারা এ লক্ষ্য যে সিদ্ধি হইতে পারে না, তাহা এক প্রকার দেখান হইয়াছে। আমার বিবেচনায় একমাত্র অবান্তর উপায় দ্বারাই ইহা সংসাধিত হইবে। মানুষ স্বার্থান্বেষণ করে বটে, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থা উপস্থিত না হইলে স্বার্থ বিরোধের ভাব তাহার অন্তরে প্রকাশ্যভাবে কার্য্য করে না। তাহা দ্বারা এক প্রকার স্বার্থ বিস্মৃতিই ঘটিয়া থাকে। যেখানে মানুষের স্বার্থবিরোধ ঘটিবার সম্ভব নাই, এরূপ অবস্থা এরূপ স্বার্থ বিস্মৃতির বিশেষ অনুকূল; সুতরাং মানবের উচ্চ লক্ষ্য লাভেরও অনেক পরিমাণে অবান্তরভাবে সহায়তা করে। তার পর, শিক্ষা দ্বারা সহানুভূতি ও মানব প্রেম অন্তরে জাগরিত হইলে স্বার্থানুসরণ সত্ত্বেও মনুষ্য অনেক মহৎ কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত করিতে পারে। এবং যাঁহারা প্রকৃতি প্রদত্ত দেবভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ অপ্রতিকূল অবস্থায় যে সেই মহোচ্চ লক্ষ্য লাভে আরও সমর্থ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

তবে কি আমরা ইংরাজদিগের সমাজপ্রচলিত পরিবার গঠন-প্রণালী আমাদের দেশে আনয়ন করিব? এরূপ প্রণালীর প্রতিকূল যুক্তি কি নাই? আছে, আমরা স্বীকার করি। এরূপ প্রণালীতে একদিকে মনুষ্যের মধ্যে স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনের ভাব প্রবল করে বটে, কিন্তু অপর পক্ষে ইহাতে অনেক সময় মানবের ব্যক্তিত্ব ভাবের অতিরিক্ত বৃদ্ধি করিয়া সামাজিক ভাবের অভাব করিয়া তুলে। পুত্র বড় হইলেই তিনি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া নিজের জীবন পথ নিজে প্রস্তুত করিয়া লইতে চেষ্টিত হন, পিতাও তাহাতে আপত্তি করেন না। বিবাহের পর পিতাপুত্রে একত্র বাস ত এক প্রকার অসম্ভব, পুত্র নব বিবাহিতা পত্নীকে লইয়া স্বতন্ত্র বাস করিতে থাকেন। ভ্রাতায় ভ্রাতায় একত্র বাসের কথা ত এরূপ অবস্থায় উঠিতেই পারে না। এরূপ অবস্থায় মানবের স্বাভাবিক রক্ত মাংসের সম্বন্ধ, প্রকৃত পারিবারিক সম্বন্ধ শিথিল হইয়া

যায়। ইহার ফলে পিতাপুত্রের মধ্যে, ভ্রাতা ভ্রাতার মধ্যে সম সুখ-দুঃখতার ভাব তিরোহিত হইবার খুব সম্ভাবনা। একদিকে যেমন একান্নবর্ত্তি পরিবারে স্বার্থ-বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে অনেক স্থলে বিবাদ বিসম্বাদ হয় তেমনই অন্য পক্ষে এ প্রথা দ্বারা স্বার্থ বিভিন্ন হওয়াতে স্বার্থ বন্ধন জনিত যে একতার ভাব তাহা তিরোহিত হয়। এত-দুভয় পক্ষের কোন পক্ষ দোষ-বিরহিত নহে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত অল্প দোষাবহ যাহা তাহাই গ্রহণীয়। মানবের মধ্যে যদি দেবভাবাপন্ন লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক হইত, তাহা হইলে একান্নবর্ত্তি পরিবারের পক্ষীয় যুক্তির প্রাবল্য হইলেও হইতে পারিত, কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ লোকই স্বার্থপরায়ণ, আত্মসুখপ্রিয়; তাই আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার অনুকূলে মত দিতে সমর্থ নহি। স্বতন্ত্র-পরিবার প্রথার দোষগুলি একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার দোষ অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসেই বিদূরিত হইতে পারে। মানুষের স্বার্থপরতা একেবারে বিদূরিত না হইলে শেষোক্ত দোষ গুলি বিদূরিত হইবে না। কিন্তু প্রথমোক্তটি সেরূপ নহে। বাল্যকাল হইতে যদি পিতামাতা, ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি বিশেষ দায়ীত্বের ভাব শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে একান্নবর্ত্তি পরিবারেও যেমন একে অন্যের সাহায্য করিতে পারে, স্বতন্ত্র পরিবার প্রথাতেও সেরূপ সম্ভব। এ প্রথার মধ্যেও একটু সংশোধন আবশ্যক। যে বন্ধনের মূলে স্বাধীন ইচ্ছা নাই, তাহা যেমন দূষনীয়, তেমনই যে প্রথা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষকে পৃথক করিয়া দেয়, তাহাও তুল্যরূপ দোষাবহ।' পিতাপুত্রে ভ্রাতায় ভ্রাতায় যে কেবল পরস্পর অন্যের অভাবে সাহায্য করিবেন এবং এরূপ সাহায্য করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিবেন, তাহা নহে, কিন্তু ইচ্ছা করিলে তাঁহারা একত্র বাসও করিতে পারিবেন। যেস্থলে প্রকৃত প্রেমের সম্বন্ধ বর্ত্তমান, সেস্থলে যে এরূপ একত্রবাসের বাসনা হইবে, তাহাত অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে প্রেমের ভাব গভীর নহে, সেস্থলে এরূপ একত্র বাস কোনও পক্ষেরই নিরাপদ নহে। সেরূপ স্থলে প্রথম হইতেই স্বতন্ত্র থাকা বিধি। এজন্য কাহারই স্বতন্ত্র ভাবে পরিবার প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা না জন্মিলে বিবাহ করা উচিত নহে। যাঁহারা একত্র বাস করিবেন, তাঁহাদেরও উচিত মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইবামাত্র স্বতন্ত্র ভাবে বাস করেন। তাহা হইলে অনেক ভাবী অমঙ্গলের হাত হইতে রক্ষা পাইবেন। এক দিকে যেমন প্রেম থাকিলে ভ্রাতায় ভ্রাতায় একত্র থাকিতে পারেন, তেমনই যাঁহাদের সহিত রক্তমাংসের কোন সংশ্রব নাই কিন্তু প্রেমে হৃদয়ে হৃদয় গ্রথিত হইয়াছে, তাঁহাদের সহিতও একান্নবর্ত্তী পরিবার গঠন সম্ভব। কিন্তু যেখানেই একান্নবর্ত্তি পরিবার গঠন করিতে হইবে, সেখানে একটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। পরস্পরের চরিত্রের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও পরস্পরের হৃদয়ের সততার উপর অচল বিশ্বাসই এরূপ বন্ধনের মূল ভিত্তি। যেস্থলে এ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নাই, সেস্থলে একান্নবর্ত্তি পরিবার গঠন করিতে

যাওয়া ঘোর বিড়ম্বনা। যে পরিবারে ইহার কোনটিরও অভাব আছে, তাহার ভিত্তি বালুকার উপর প্রতিষ্ঠিত, সামান্য কারণেই তাহা ভূমিসাৎ হইবে। যেখানে অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাসের ছায়ামাত্র দেখা দিল, সেখানে একত্রাবস্থান আর শুভকর নহে, এরূপ স্থলে স্বতন্ত্র হইলে সকল দিক রক্ষা পাইবে। লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইলে, সকল অবস্থাতেই মানুষ মহত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। দুর্ব্বলের জন্যই সমাজ বিধি, সাধুজন স্বয়ং রক্ষিত।

শ্রীসীতানাথ নন্দী।

তিনটি।

বিজয়া।

(আজ বাঙ্গালির ঘরে, ঘরে, এই কাহিনী। বি এ পাশ করা পুত্রের পিতা a pound of flesh এর জন্য লালায়িত। আর কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, পৌরাণিক শ্যেনকপোতের ন্যায়, বিনা দ্বিরুক্তিতে বক্ষ পাতিয়া দেন। আমার অনুরোধ এই যে, সর্ব্বস্বান্ত পিতা কন্যার ঘর-বসতের সময়ে যেন এই কবিতাটি কন্যাকে সম্বোধন করিয়া পাঠ করেন।)

সপ্তমীতে সাজাইনু, আপাদ মস্তক তোর,
 মোর গৃহে ধূম হইল ভারি।
মোর বেয়াইর করে, ঘর বাড়ি দিয়ে বলি
 অষ্টমীতে হইনু ভিখারী।
নবমীতে সর্ব্বস্বান্ত, তবুও সুখের অন্ত
 নাহি মোর, ও মুখ নেহারি ;
সাক্ষাৎ মা ভগবতী! তোর ওইদৃষ্টি-সুধা
 পান করি, যন্ত্রণা বিসারি।
উৎসব ফুরায়ে গেছে, বিজয়া যে আসিয়াছে;
 ঘাটে ওই নৌকা সারি সারি।
মাগো তুই চলে যাবি? ধনে প্রাণে ম'জে মাগো
 আজ আমি যথার্থ ভিখারী।

বিধবার আরসী।

বিধবার আর্সিখানি, পড়ে আছে একপাশে ;—
কালি ঝুল মাখিয়া শরীরে।
মনে পেয়ে ঘোর ব্যথা, চুপে চুপে কহে কথা,
মনোদুঃখে গুমরে গুমরে ;—
"সধবা আছিল যবে, এমুখ নেহারি মোর
কতই সে পাইত গো সুখ,
আমার এ সরসীতে, ফুটিত গো অরবিন্দ,
তার সেই টুক্ টুকে মুখ।
গিয়াছে সোহাগ জানা, বোঝা গেছে ভালবাসা,
এধরায় কেহ কারো নয় ;
ছ'মাস চলিয়ে গেল, একবার নাহি এল ;
দেহ মোর কালি ঝুলময়।
ভুল—ভুল—সখী নয়, সে মোর সতীন হয়,
সব কথা বুঝিয়াছি আমি ;
যামিনী হয়েছে ভোর, ভেঙেছে স্বপন ঘোর ;
এক দিনে, দুসতীনে, হারায়েছি স্বামী।"

হার-জিৎ।

১

তার হাসি রাশি, মোর নয়ন-লোর ;
তার বেলফুল, মোর সুতার ডোর ;
ওগো নিশি নিশি, (হয়) এ ব্যাপার ;
জানি না কার জিৎ কার হার।

২

তার ছল্ কথা, এ আঁখি ছল্ ছল্ ;
তার কোশাকুশি, মোর বিল্বদল ;
ওগো নিশি নিশি, (হয়) এ ব্যাপার ;
জানিনা কার জিত, কার হার।

৩

তার রাঙা চোক্ মোর দীর্ঘশ্বাস ;
রক্ত চন্দন, আর ধূপবাস ;

ওগো নিশি নিশি, (এই) সমাচার ;
জানি না কার জিৎ, কার হার।

৪

তার তিরস্কার, মোর সোহাগ বাক ;
তার বলিদান, মোর প্রেমযাগ ;
ওগো নিশি নিশি (হয়) এ ব্যাপার ;
জানি না কার জিৎ কার হার।

(কেমন ? কবিতাটা মিষ্ট লাগিল ? এইস্থলে আমি টীকার স্বরূপ দুইটা কথা কহিতে চাহি। কবিতা ফাঁদিবার আরম্ভেই বলিতাম, কিন্তু রস ভঙ্গ হইবার আশঙ্কায় এই স্থলে বলিতে বাধ্য হইলাম। বঙ্গের নবীন কবিদিগের যিনি শিরোমণি ও নেতা তাঁহার লেখার অনুকরণে এই কবিতাটি লিখিয়াছি। কিন্তু অনেকের দশা যাহা হইয়াছে আমার ও তাহাই হইল। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি আমার কবিতাটিতে অর্থের নাম গন্ধ নাই। মাথাল ফল ; শূন্য কলসি।

শুনিয়াছি যে, যে পারিজাত পুষ্প দেবতার গলে উঠিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে তাহাই আবার দৈত্যের গলে আরোহণ করিয়া ভুজঙ্গমের আকার ধারণ করে। তাই আমি মনে করিয়াছি যে bicycle ও tricycle এ উঠিবার চেষ্টা করিব না। আমার পক্ষে ঐ চারপেয়ে ঘোড়ার গাড়িই ভাল। গাড়োয়ান, গাড়ি হাঁকাও—বড়া বাজার যাঙ্গে। সোমপানিকে দোকানকে সামনে খাড়া করনা। সম্‌ঝা ?—

শ্রী Robin good fellow.

পরমহংস শিবনারায়ণ দেবের জীবন চরিত।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

শিবনারায়ণ মণ্ডুরির সকল অবস্থা দেখিয়া সেখান হইতে পাহাড়ে পাহাড়ে পুনরায় জ্বালামুখী তীর্থে আগমন করিলেন। সেখানে দেখিলেন যে মন্দিরের মধ্যে একটা কুণ্ড খুলিয়া রাখিয়াছে, তাহার ভিতরে ছয়.সাতটা অগ্নির জ্যোতি জ্বলিতেছে। দেওয়ালের চারিদিকে যেরূপ গ্যাস জ্বলে সেইরূপ সেই মন্দিরে জ্যোতি জ্বলিতেছে। কোনটার শিখা অতিশয় প্রজ্জ্বলিত কোনটার বা তদপেক্ষা কম। এবং মধ্যে কুণ্ডের ভিতর যে অগ্নিজ্যোতি জ্বলিতেছে সেই জ্যোতিতে চারিদিক হইতে আহুতি প্রদত্ত হইতেছে।

জ্যোতি মন্দিরের ভিতরের ভিতরেও আছে এবং মন্দিরের বাহিরে ও দেওয়ালের নিকটে কোন কোন স্থানে অল্প পরিমাণে জ্বলিতেছে। যাত্রিরা কোন প্রকার মিষ্টান্ন লইয়া গিয়া ভিতরে দেওয়ালের জ্যোতিতে টিপিয়া দেয়। অধিকাংশই পড়িয়া যায় এবং অল্প যাহা লাগিয়া থাকে তাহা অগ্নিতে পুড়িয়া যায়। ইহাতে অবোধ লোকেরা কল্পনা করেন যে, হস্তে অথবা কোন পাত্রে কোন দ্রব্য ধরিলে অগ্নির শিখা সেই পাত্রের উপর পতিত হইয়া আহুতি ভক্ষণ করেন। কেবল এখানে কেন, চরাচর সর্ব্বত্র হইতেই অগ্নি-ব্রহ্ম আহুতি গ্রহণ করিতেছেন—ইনিই সূর্য্যনারায়ণ মূর্ত্তিতে আকাশে দিবারাত্র রূপে প্রকাশমান আছেন। সূর্য্যনারায়ণ যৎকিঞ্চিৎ তেজ প্রকাশ করিলে দেশে দেশে হাহাকার হয়, পৃথিবী জ্বলিতে থাকে। এবং যখন সমুদ্র হইতে তেজের দ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীর উপর বর্ষণ করেন তখন পৃথিবী ও জীব জন্তু প্রভৃতি শীতল হন।

শিবনারায়ণ একজন পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কুণ্ড কে খনন করিয়াছেন এবং এই মন্দির কে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই মন্দির যে সোণার গিল্টির পাত দিয়া ঢাকা আছে তাহাই বা কে করিয়াছেন। এই জ্যোতি কি পূর্ব্বকালাবধি জ্বলিতেছে না তোমরা কোন কৌশল করিয়া যেরূপ গ্যাস জলে সেইরূপ জ্বালিয়া রাখিয়াছ—আমাকে সত্য বল।" ঐ পাণ্ডা বড় ধীর ও শান্ত স্বভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি হাত জুড়িয়া শিবনারায়ণকে বলিলেন, "মহাশয় ইহার অনেক বৃত্তান্ত আছে। পূর্ব্বে অনেক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। আগে আওরংজীব প্রভৃতি মুসলমান বাদসাহগণ ও মহম্মদ ফকির ইত্যাদি অনেকেই অধিকাংশ হিন্দু তীর্থের দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। শাস্ত্র বেদ প্রভৃতি লইয়া অগ্নিতে পুড়াইয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞোপবীত কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে মুসলমান করিয়া লইতেন। সেই মুসলমান বাদসাহরা কাশীতে যাইয়া বিশ্বনাথের মন্দিরস্থিত বিশ্বনাথমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া চারি খণ্ড করিয়া এক খণ্ড সেইখানকার কূপে ফেলিয়া দেন অপর তিন খণ্ড দিল্লিতে লইয়া গিয়া একটা মসজিদের সিঁড়িতে অপর একটা আপনার সিংহাসনের সিঁড়িতে আর একটা মক্কা কি মদিনার মসজিদের সিঁড়িতে লাগাইয়া দেন, অভিপ্রায় এই, তাহার উপরে সকলে জুতা রাখিবে। উহারা বলিত যে হিন্দুদিগের প্রত্যক্ষ দেবতা নাই। এ সকল মিথ্যা। ইহারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে। ইহাদের দেবতাদের কোন শক্তি নাই। তাহাদের মধ্যে একজন মুসলমান বলিল—যে ইহাদের মধ্যে কেবল মাত্র একটা প্রজ্জলিত অগ্নিদেবতা জ্বালামুখিতে আছেন। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া বলিল যে চল সেখানে গিয়া দেখি এটা সত্য কি মিথ্যা। জ্বালামুখিতে তাহারা আসিয়া দেখিল যে অগ্নিজ্যোতি যথার্থ পৃথিবী হইতে ঊর্দ্ধমুখে জ্বলিতেছে। দেখিয়া উহারা বলিল—যে পাণ্ডারা তো কোন কৌশলের দ্বারা জ্বালাইয়া রাখে নাই। আমরা

মাটি খোঁড়াইয়া দেখি যে ইহা কিরূপে জ্বলিতেছে। ভিতরে কোন কৌশল আছে কি না। এই বলিয়া মাটি খুঁড়িয়া দেখিল তত্রাচ তাহার ভিতর হইতে জ্বলিতে লাগিল— তাহারা এইরূপ জ্যোতি দেখিয়া লোহার তাওয়া লইয়া সেই জ্যোতির উপর ঢাকা দিয়া বন্ধ করিয়া দিল—কিন্তু এইরূপে সাতটি লোহার তাওয়া উপরি উপরি রাখিয়াও তাহারা অগ্নিজ্যোতি বন্ধ করিতে পারিল না, পাত্র ভেদ করিয়া অগ্নির জ্যোতি উর্দ্ধমুখে উঠিতে লাগিল। তখন মুসলমান বাদশাহ বলিলেন যে হিন্দু দেবতার মধ্যে এক অগ্নি দেবতাই কেবল সকল দেশে প্রজ্বলিত দেখা যাইতেছে, ইহাকে মান্য করা উচিত। এই বলিয়া বাদসাহ আজ্ঞা দিলেন যে এই ছোট মন্দির ভগ্ন করিয়া বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দাও। মন্দির প্রস্তুত হইল এবং স্বর্ণের দ্বারা সেই মন্দির মোড়াই করিয়া দিল। কেবল যে পর্য্যন্ত মনুষ্যের হাত যায় সেই পর্য্যন্ত প্রস্তর ফাঁক র[illegible]য়াছে।" পাঠকগণ কোন আশ্চর্য্য বোধ করিয়া যেন জ্বালামুখী তীর্থে যাইয়া অগ্নিজ্যোতিকে দর্শন না করেন, কেন না সেই অগ্নিজ্যোতি তো সকল স্থানে দর্শন হইয়া থাকে। তোমরাও তো নিজ নিজ ঘরে সেই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া থাক, সেই অগ্নি তো তোমাদের প্রত্যেকের শরীর মধ্যে আছেন। যে প্রত্যক্ষ পরম জ্যোতি সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমাতে দিবারাত্র জ্বলিতেছেন ও যাঁহার তেজ তৈল ঘৃত সংযোগ ব্যতীত স্বয়ং প্রজ্বলিত, সূর্য্যনারায়ণ এবং চন্দ্রমা জ্যোতিতে তাঁহাকে দর্শন করিলে তিনি তোমাদের সকল দুঃখ পাপ মোচন করিয়া আনন্দ স্বরূপ রাখিবেন। শিবনারায়ণ মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন, যে সকল তীর্থের তো একই রূপ ভাব, তবে আর বদ্রিনারায়ণ যাইবার প্রয়োজন কি, সেখানেও তো এইরূপ প্রস্তর ও বরফে আবৃত পাহাড়,—এই ভাবিয়া অনর্থক বদ্রিনারায়ণ না গিয়া জ্বালামুখী হইতে বরাবর দিল্লী চলিয়া আসিলেন। দিল্লী হইতে মাড়ওয়ারে পুষ্কররাজ মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তথায় একটি পুষ্করণী আছে। সেই পুষ্করণীতে সকলে স্নানাদি পুণ্যকার্য্য করে। পুষ্করিণীর পশ্চিমদিকে দুইটা পাহাড় সেই পাহাড়ের উপর দুইটা মন্দির আছে। সেই মন্দিরের মধ্যে একটাতে সাবিত্রী মাতা ও একটাতে গায়িত্রী মাতা স্থাপিত। সাধারণের বিশ্বাস এই যে ইহাঁরা সকল দুঃখ পাপ হইতে মোচন করেন।

সাবিত্রী এবং গায়িত্রী মাতা শাস্ত্রাদিতে যে বর্ণিত আছেন তাহার সার অর্থ এইরূপ; সাকার ব্রহ্ম অর্থে জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ। তাঁহারই সাবিত্রী ব্রহ্ম নাম কল্পনা করা হইয়াছে এবং চন্দ্রমা জ্যোতি ব্রহ্মের গায়িত্রী নাম কল্পনা করা হইয়াছে। এই জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর জীবকে সকল দুঃখ পাপ হইতে মুক্ত করেন। ইহাঁকে না চিনিয়া রাজা প্রজা সকলে কল্পিত স্থানে যাইয়া ভ্রমেতে পতিত হন।

অনন্তর সেখান হইতে শিবনারায়ণ আজমেড় আসিলেন। আজমেড় সহরের মধ্যে এক মুসলমান খাজা সাহেবের কবর স্থান ও তাহার এক পার্শ্বে একটি মসজিদ আছে।

কবরঘর ঝাড় লণ্ঠন ইত্যাদির দ্বারা উত্তম রূপে সুসজ্জিত। সেই কবর দর্শন করিবার জন্য হিন্দু মুসলমান অনেকেই এখানে আসেন। খাজা সাহেবের স্থানের ফকিররা সেই দেশের চারিদিকের রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকে, এবং পুষ্করতীর্থ দর্শনে যে সকল হিন্দু যাত্রীরা যান তাহাদিগকে ডাকিয়া আনে আর বলে, "আমাদের এই তীর্থ দর্শন করিলে তোমরা সকল ফল প্রাপ্ত হইবে।"

খাজা সাহেবের কাছে যে যাহা প্রার্থনা করিবেন তিনি সেই ফলই প্রদান করিবেন শুনিয়া যাত্রিরা খাজা সাহেবের কবর স্থানে আইসে। কৌশল করিয়া সেই কবরের মধ্যে একজন মুসলমান বসিয়া থাকে, এবং অপর এক জন বৃদ্ধ মুসলমান ফকির যাত্রিদিগকে বলে যে, তোমরা ইহার ভিতরে এক এক জন করিয়া হাত দাও, এবং ধন অথবা পুত্র যাহা ইচ্ছা চাও খোদা তোমাদিগকে তাহাই দিবেন। এ দিকে কবরের মধ্যে যে ফকির লুকাইয়া বসিয়া থাকে, উক্ত কোন যাত্রী তাহার মধ্যে হাত দিবা মাত্র সেই ব্যক্তি তাহার হাত ধরিয়া ভিতরের দিকে টানে এবং যাত্রীটি উপর দিকে টানে। যাত্রী যদি স্ত্রীলোক হয় ত বৃদ্ধ ফকির সেই দুর্ব্বলা স্ত্রীলোককে বলিয়া দেয় যে তুমি হাত টানিও না খোদা খোদ তোমার হাত ধরিয়াছেন, তোমার ভাগ্য ভাল, তুমি যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। এখন তুমি শীঘ্র দান পুণ্য কর। ১।০ শিকা হাত ধরাই এবং ১।০ শিকা হাত ছাড়াই এই ২॥০ টাকা তুমি এখানে দিয়া দাও। খোদা শীঘ্র তোমার হাত ছাড়িয়া দিবেন। যাত্রী বলেন, যে আমার কাছে ২॥০ টাকা নাই। এই ১।০ শিকা দিতেছি হাত ছাড়াইয়া দাও। তখন সেই বৃদ্ধ মুসলমান ফকির বলেন, যে খোদ্ খোদা হাত ধরিয়াছেন, ১।০ শিকাতে হইবে না। যাত্রী কি করে কষ্ট পাইতেছে অতএব ২ টাকা দিয়া হাত ছাড়াইয়া লয়। শিবনারায়ণ তাহাদের এই ব্যবহার দেখিয়া বলিলেন, যে তোমরা যাত্রিদিগকে কেন অনর্থক কষ্ট দিতেছ, যাহা উহারা শ্রদ্ধা করিয়া দেয় তাহাই সন্তোষ পূর্ব্বক গ্রহণ কর। ইহা শুনিয়া সেই বৃদ্ধ মুসলমান ফকির শিবনারায়ণকে বলিল, যে তুমি ফকির মানুষ, তোমার এ সকল কথায় প্রয়োজন কি? তুমি দর্শন করিয়া চলিয়া যাও। এই বলিয়া শিবনারায়ণের গলায় এক ছড়া ফুলের মালা ও হাতে কতকগুলি ফুল দিয়া বলিল আপনি এস্থান হইতে যান।

শিবনারায়ণ মনে মনে বলিলেন মুসলমান ও হিন্দুদিগকে ধিক্ যে আপনার সনাতন ধর্ম্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল মৃত কবরস্থানে বিশ্বাস করিয়া পড়িয়া আছে ও তাহাতে তেজোহীন, বলহীন, শক্তিহীন, পরাধীন হইয়া রসাতলে যাইতেছে।

শিবনারায়ণ কবরস্থান হইতে বাহির হইয়া দুই এক জন ভদ্র মুসলমানের নিকটে এই সকল কথা বলিলেন, যে এই সকল বড় অন্যায়। সেই ভদ্র জ্ঞানবান মুসলমানেরা

শুনিয়া বলিল যে মহাশয়, আমরা ইহা তদন্ত করিয়া দেখিব যদি ইহা যথার্থ হয় তাহা হইলে বড় লজ্জার কথা এবং তাহা হইলে আমরা গোপনে এই প্রপঞ্চ তুলিয়া দিব। আপনি কাহারও নিকট এ কথা প্রকাশ করিবেন না।

সেখান হইতে শিবনারায়ণ গুজরাটী অহমদাবাদ সহর হইয়া কাঠিওয়ার দেশে সুরথ নগর দেখিয়া বোম্বাই সহরে সমুদ্রের ধারে বালকেশর নামক গ্রামে যাইলেন। ঐ গ্রামের শ্মশানে যেখানে চিতার উপরে মৃত ব্যক্তির নামখোদিত প্রস্তর আছে শিবনারায়ণ সেই স্থানে সর্ব্বশরীর কাপড়ে আচ্ছাদিত করিয়া একটা প্রস্তরের উপর তিন দিবস পড়িয়া রহিলেন। তিন দিবসাবধি কেহই তাঁহার তত্ব লইল না। যাহারা মৃত দেহ পুড়াইতে আসিত তাহারা বলিত যে কোন পাগল পড়িয়া আছে। এই বলিয়া শিবনারায়ণকে কোন কথা তাহারা জিজ্ঞাসা না করিয়া চলিয়া যাইত। শ্মশানের অনতিদুরে মাড়োয়ারিদের প্রতিষ্ঠিত একটা ঠাকুর বাটি আছে। সেখানে শ্রীবৈষ্ণব বৈরাগী সাধুরা বাস করিত। তাহারা প্রতিদিন শিব-নারায়ণকে দেখিতে পাইত কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসা করিত না এবং তাঁহাকে মুর্দ্দফরাস জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিকটেও আসিত না। ঠাকুরবাটী দুইতলা, যাহারা ঠাকুর স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদের অভিপ্রায় ছিল এই, যে অভ্যাগত সাধু মহাত্মা সেই বাটীতে বিশ্রাম করিবেন। যে মাড়ওয়ারিরা সেই বাটী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন তাঁহা-দের একজনের নাম জুয়াহরমল্ আর একজনের নাম শিবনারায়ণ এবং অপরের নাম যমুনা দাস। সেই ঠাকুর বাটীর তত্বাবধানের জন্য এক জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। সেই পণ্ডিতের একটী কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল এই যে অযাচক অভ্যাগত মহাত্মা সাধুগণ কোন প্রকারে অন্ন বস্ত্রের কষ্ট না পান। এইরূপ মহাত্মাদিগকে তিনি অনুসন্ধান করিয়া ঠাকুর বাটীতে আনিয়া তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। সেই পণ্ডিতের নাম জালিরাম পণ্ডিত। জালিরাম পণ্ডিত এক দিবস শিবনারায়ণকে দেখিতে পাইয়া একখানি মাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া শিবনারায়ণের নিকটে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। শিবনারায়ণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন? তুমি কাহাকে নমস্কার করিলে?

জালিরাম বলিলেন, আপনাকে নমস্কার করিলাম। শিবনারায়ণ বলিলেন, আপনি কে যে আমাকে নমস্কার করিলেন?

জালিরাম উত্তর করিলেন, হে মহারাজ, আমরা নরাধম, আমরা বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া সর্ব্বদা কাতর হইয়া আছি, আপনাকে জানিতে পারি নাই এবং পরমাত্মাকেও জানিতে অপারক। আপনি কে আমি কেমন করিয়া চিনিব কিন্তু এই জানিতে পারিতেছি যে আপনি মহাত্মা এবং ত্যাগিপুরুষ, পরমাত্মার জানিত লোক এবং আপনি পরমাত্মা এইরূপ জানিয়া আমি নমস্কার করিলাম।

শিবনারায়ণ বলিলেন, আমি যে তুমিও তো সেই ব্যক্তি তোমার চিন্তা কি ?

জালিরাম বলিলেন, যে শাস্ত্রেতে এইরূপ লেখা আছে বটে কিন্তু আপনার মতন অভ্যাস করিয়া যদি স্বরূপে নিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে জীব কৃতকার্য্য হয়।

শিবনারায়ণ বলিলেন, যদ্যপি তোমার স্বরূপে নিষ্ঠা না হইয়া থাকে তাহা হইলেও স্বরূপেতে তুমিই আছ তোমার ভাবিত হইবার কোন কারণ নাই।

জালিরাম পণ্ডিত শিবনারায়ণকে উত্তর করিলেন, মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া বলুন আপনি কত দিন এইখানে আসিয়াছেন এবং আপনার আহারের কিরূপ হইতেছে। আপনাকে কেহ দেখিয়াছে কি ?

তাহা শুনিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, আমি তিন দিবস আসিয়াছি। আমাকে অনেকে দেখিয়াছে। কিন্তু কেহই আহারের জন্য জিজ্ঞাসা করে নাই। জালিরাম পণ্ডিত বলিলেন, কি আহার করিবেন আমাকে আজ্ঞা করুন তাহা এইখানে আনিয়া দিই। না হয় ঠাকুরবাড়ীতে চলুন, সেইখানে আপনাদের জন্য বৃহৎ বাটী আছে। আপনার যতদিন ইচ্ছা হয় দোতালায় থাকিবেন। আহারাদির ব্যবস্থা সেইখানেই হইবেক এবং বড় বড় জ্ঞানী ধনীলোক আপনার চরণ দর্শন করিতে আমার সঙ্গে আসিবেন।

শিবনারায়ণ বলিলেন, যে আমার ধনীলোকের সহিত কোন প্রয়োজন নাই এবং আমার বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিবারও প্রয়োজন নাই। যদ্যপি তোমার শ্রদ্ধা হইয়া থাকে তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অন্ন এই স্থানে পাঠাইয়া দিতে পার।

জালিরাম পণ্ডিত বলিলেন আমি পাঠাইয়া দিতে পারি এবং নিজেও আনিয়া দিতে পারি। কিন্তু আপনি যে স্থানে আছেন, সেখানে শবদাহ হয়। লোকে এইখানে আসিতে ঘৃণা করে। আপনি কৃপা করিয়া গা তুলিয়া একবার আমার সহিত ঠাকুর বাটীতে আসুন।

তাহার প্রার্থনামত শিবনারায়ণ সেই স্থান হইতে ঠাকুর বাটীতে আসিয়া আহার করিয়া বিশ্রাম করিলেন। সেই সময় জালিরাম পণ্ডিতের সহিত তাঁহার বন্ধু মহাজনেরা আসিয়া শিবনারায়ণকে দর্শন করিলেন, এবং যাইবার সময় তাঁহাকে বলিলেন, মহাশয়, আপনি কৃপা করিয়া আমাদের সঙ্গে চলুন এবং আমাদের বাটী পবিত্র করিয়া দিন।

শিবনারায়ণ বলিলেন যে তোমাদের বাটীতো সর্ব্বদাই পবিত্র আছে, এইটী কেবল মনের ভ্রম।

তাঁহারা কোন মতে শিবনারায়ণকে না ছাড়িয়া ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

সেই সময় তদ্দেশীয় জয়কিষণ নামক একজন প্রধান পণ্ডিতের কোন শিষ্য শিবনারায়ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল। তাহার প্রার্থনা মত তিনি জয়কিষণ পণ্ডিতের

নিকটে যাইতে সম্মত হইলেন। জয়কিষণ পণ্ডিত অতিশয় ধীর ও বিজ্ঞ, এবং নম্র প্রকৃতির লোক এবং নিত্য যোগবাশিষ্ঠ পুরাণ ও গীতাদি ধর্ম্ম পুস্তক সকল পাঠ করিতেন। শিবনারায়ণকে দেখিয়া তিনি অতিশয় আহ্লাদিত চিত্তে বিধি পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন, এবং তাঁহার সমস্ত ভাব লক্ষণ দেখিয়া ও তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক শিষ্যকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, প্রকৃত মহাত্মাকে আমার নিকটে আনিয়াছ।

তৎকালে সেইস্থানে, অনেক অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন জ্ঞানী মাড়ওয়ারি কয়েকটী অতি উত্তম সর্ব্বলোক হিতকর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

প্রথম প্রশ্ন।

জয়কিষণ পণ্ডিতকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ জগতের মধ্যে ত্যাগী ব্যক্তি কে?

জয়কিষণ পণ্ডিত উত্তর করিলেন, যখন সম্মুখে মহাত্মা বসিয়া আছেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর আমি আর কি বলিব, আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে যাঁহার অন্তর হইতে ত্যাগ হইয়াছে সেই ব্যক্তিই ত্যাগী।

তত্রস্থ অপর একজন পণ্ডিত বলিলেন যে সাধু মহাত্মারাই ত্যাগী ব্যক্তি।

শিবনারায়ণ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন যে, সাধু মহাত্মাগণ ত্যাগী বটে। কিন্তু এখানে গম্ভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হয় যে মহাত্মাগণ কোন্ বিষয়ে ত্যাগী; ত্যাগীর মধ্যে তো গৃহস্থেরাই প্রধান ত্যাগী, কেন না সাধু মহাত্মাগণ এই দৃশ্যমান মায়াময় জগতকে স্বপ্নবৎ অসৎ পদার্থ জ্ঞান করিয়া মিথ্যা বোধে ত্যাগী হন এবং তাহার মধ্যে কেহ কেহ অহঙ্কার প্রযুক্ত মনে করেন যে আমি বড় ত্যাগী এবং অপর লোকও মনে করেন যে এই সাধু মহাত্মা বড়ই ত্যাগী কেন না ইনি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মিথ্যা বস্তুকে ত্যাগ করিয়া অহংকার করিয়া থাকেন। কিন্তু গৃহস্থ ব্যক্তিগণ সৎ বস্তুকে ত্যাগ করিয়া অসৎ পদার্থে আসক্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ সৎস্বরূপ যিনি পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু মাতা পিতা যাঁহার দ্বারা যাবতীয় বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহাকেই ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ ধর্ম্ম পালন করিতেছেন অতএব এরূপ স্থলে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে এই উভয়ের মধ্যে কাহারা প্রকৃত ত্যাগী? বস্তুতঃ সকলেরই বিচার করিয়া বুঝিয়া দেখা উচিত যে, আমার কি বস্তু ছিল যে আমি ত্যাগ করিয়াছি ও এমন কি বস্তু আছে যে আমি গ্রহণ করিব? যখন আমার একটী তৃণ ঘাস পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা নাই, তখন আমার কি আছে যে আমি অহংকার প্রযুক্ত বলিয়া থাকি যে আমি ত্যাগ করিয়াছি ও আমি গ্রহণ করিয়াছি? অতএব আমার

ত্যাগ ও গ্রহণের কিছুমাত্র সাধ্য নাই; কারণ যাবতীয় পদার্থ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপের এবং আমিও তাঁহারই অংশ মাত্র অর্থাৎ যখন পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরিপূর্ণরূপে প্রকাশমান আছেন, যখন তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই নাই তখন কি ত্যাগ করিব ও কি গ্রহণ করিব? এবং যিনি সকলেতেই সমভাবে আছেন সেই ব্যক্তিই যথার্থ ত্যাগী, তিনিই যথার্থ ত্যাগ ও গ্রহণের ভাব বুঝেন। তিনি গৃহস্থ ধর্ম্মেই থাকুন অথবা সন্ন্যাস ধর্ম্মেই থাকুন—যে কোন ধর্ম্মেই থাকুন—তাঁহার পক্ষে সকলই সমান।

দ্বিতীয় প্রশ্ন।

পুনরায় ঐ মাড়ওয়ারী জয়কিষণ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ ওঁকার, ব্রহ্মগায়িত্রী যজ্ঞাহুতি ও বেদ অধ্যয়ন ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ কার্য্যে শূদ্র এবং স্ত্রীলোকদিগের কি কারণে অধিকার নাই? তাহাতে পণ্ডিত বলিলেন, কোন কোন শাস্ত্রে কোন কোন স্থানে লেখা আছে যে উহাদের অধিকার নাই, কেন যে অধিকার নাই তাহা সম্মুখস্থিত মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর।" তাহা শুনিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, অধিকার ও অনধিকার সকলের মধ্যে আছে। আমি স্থূলতঃ বুঝাইয়া দিতেছি তোমরা সূক্ষ্ম করিয়া ভাব গ্রহণ কর। যেমন যাহার জলের পিপাসা হইয়াছে তাহাকে অন্ন দিলে সে কখনই তাহাতে প্রীত হইবেক না, অতএব সে অন্নের অনধিকারী। এবং যে ব্যক্তির অন্নের ক্ষুধা লাগিয়াছে তাহাকে জল দিলে তাহার ক্ষুধার শান্তি হইবেক না, অতএব সে জলের অনধিকারী। সেইরূপ যে ব্যক্তির কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মিথ্যা অসৎ পদার্থে অত্যন্ত আসক্তি প্রযুক্ত ভোগ করিবার ইচ্ছা আছে, সত্য যে সৎপদার্থ তাহাতে কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই সেই ব্যক্তিকে সৎপদার্থ অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মার কথা গ্রহণ করিতে বলিলে তাহা তাহার প্রিয় হইবে না। অতএব সে তখন শ্রেষ্ঠ কার্য্যে অনধিকারী। শূদ্র কিম্বা স্ত্রী অথবা ব্রাহ্মণ যে কুলেই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন, এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিমাত্রই অনধিকারী এবং যে ব্যক্তির অসৎ পদার্থে ইচ্ছা নাই, এবং অসৎ পদার্থে লিপ্ত থাকিয়াও সৎপদার্থের প্রতি একান্ত ইচ্ছা আছে অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাতে যাহার অভেদ হইতে একান্ত ইচ্ছা আছে অথবা প্রেম ও ভক্তি সহকারে তাঁহাকে জানিবার জন্য যাহার একান্ত ইচ্ছা আছে সেই ব্যক্তি অসৎ পদার্থে অনধিকারী। এবং সৎপদার্থে অধিকারী। অর্থাৎ ওঁকার, ব্রহ্মগায়িত্রী যজ্ঞাহুতি ও বেদাদি শাস্ত্র এবং ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ কার্য্যে তিনি অধিকারী হইবেন। শ্রেষ্ঠ কার্য্য সকল করিলে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হইবে। স্ত্রী হউক অথবা পুরুষ হউক শূদ্র হউক অথবা ব্রাহ্মণ হউক—যে কুলেই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন, শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিলেই শ্রেষ্ঠফল প্রাপ্ত হইবেক। তোমাদের মানব ধর্ম্মশাস্ত্রেও তো লেখা আছে যে -

শূদ্রঃ ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াঃ জাতমেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাস্তথৈবচ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শূদ্র ও বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় যে কেহ শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবে সেই ব্রাহ্মণ হইবে। এবং ব্রাহ্মাণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি নিকৃষ্ট কার্য্য করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি শূদ্র হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায় যথা—

বিপ্রা দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিত মনো বচনে হিতার্থ প্রাণং পুনাতি সকুলং নতু ভূরিমানঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবৎ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিপ্র যে ব্রাহ্মণ তিনি যদি জ্ঞান, সত্য, দম, শাস্ত্র জ্ঞান, অমাৎসর্য্য, লজ্জা, ক্ষমা, ক্রোধ শূন্যতা, যজ্ঞ দান, ধৈর্য্য, শম—এই বার গুণ সম্পন্ন হইয়াও বিষ্ণু ভগবানে অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে নিষ্ঠা ভক্তিযুক্ত না হন তাহা হইলে তিনি চণ্ডাল হইতেও অধম। পৃথিবীও তাঁহার ভার সহ্য করিতে অক্ষম এবং যদি চণ্ডাল হইয়া আপনার তনু, মন, ও ধন ইত্যাদি বিষ্ণু ভগবানেতে অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে প্রেম ভক্তি সহকারে অর্পণ করেন সেই ব্যক্তিই যথার্থ ব্রাহ্মণ ও তিনিই শ্রেষ্ঠ।

নিরবলম্ব উপনিষদেও লেখা আছে যে—

কো ব্রাহ্মণঃ।
যো ব্রহ্মবিদ্ সএব ব্রাহ্মণঃ॥

যে ব্যক্তির সমদৃষ্টি হইয়াছে, পরিপূর্ণ ব্রহ্মময় দেখিতেছেন সেই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ শব্দে কথিত হয়। ইহাতে দেখা যায় যে শাস্ত্রোক্ত গুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণ কোটীর মধ্যে এক আধ্ জন যথার্থ ব্রাহ্মণ পাইবার সম্ভব। এবং যজুর্ব্বেদে লেখা আছে—

যথেমাং বাচং কল্যাণি মাবদানি জনেভ্যঃ।

ব্রহ্ম ইত্যাদি॥

ইহার অর্থ, ভগবান্ বলিতেছেন। কল্যাণি মা বদানি জনেভ্য ব্রহ্ম অর্থাৎ আমি যে এই কল্যাণকর বাক্য কহিতেছি ইহা সকলেই গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ সকলেই বেদ পাঠ করিয়া বেদের সার ভাবকে গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং শূদ্র হইতেও অতি শূদ্র, চণ্ডাল প্রভৃতি স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই বেদ ও শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া তাহার সার ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া ব্যবহারিক অথবা পারমার্থিক ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন ইহাতে কোন বাধা নাই। এবং ওঁকার মন্ত্র জপ এবং ব্রহ্ম গায়িত্রী অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুকে উপাসনা অর্থাৎ তাঁহাকে জানিবার জন্য যে জ্ঞান উপার্জ্জন করা তাহাকেই বেদ পাঠ বলে অর্থাৎ জ্ঞানের নামই বেদ। যে শাস্ত্রেতে সত্য বাক্য আছে ও যিনি

সত্য বলেন তাহাকেই বেদ জানিবে; সেই এক অদ্বিতীয় জ্ঞান তোমাদের ভিতর বাহিরে জ্যোতিঃস্বরূপে পরিপূর্ণ আছেন এইরূপ সর্ব্ব বিষয়ে বুঝিয়া লইবে।

এই উপদেশ শুনিয়া মাড়ওয়ারী ব্যক্তি বলিলেন, মহারাজ শাস্ত্রেতে ইহাও তো লেখা আছে যে—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাৎভবেদ্ বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

অর্থাৎ জীব যখন জন্ম গ্রহণ করেন তখন তাহার আত্মা পরমাত্মার স্বরূপেতে কোন বোধ থাকে না সেই অবস্থাকেই শূদ্র বলে। এবং যখন সেই জীবের সংস্কার জন্মে তখন তাহাকে দ্বিজ সংজ্ঞা বলা হয়। এবং সেই জীব যখন বেদ পাঠ করেন তখন তাহাকে বিপ্র বলা হয়, অর্থাৎ যখন জ্ঞান উপার্জ্জন করেন তখন বিপ্র শব্দে কথিত হয়। এবং যখন জীব ব্রহ্মকে জানেন তখন তাহাকে ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা বলা হয়, এবং জীবের যখন পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মা গুরুর উপাসনায় অদ্বৈত জ্ঞান উদয় দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মায় অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাতে অভেদ হইয়া যান, তখন ঐ অবস্থাপন্ন জীবকে ব্রহ্ম বলা হয়।

পালিতা।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

এ সংসারে সুখের দাস সকলেই—এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত। না চাহিতে না ডাকিতে সুখের জীবন মৃত্যু অধিকার করে, কিন্তু দুঃখে কষ্টে পড়িয়া মৃত্যুকে আকুল আহ্বান করিয়া কে কবে মৃত্যুর দর্শন পায়?

স্নেহলতাও বাঁচিয়া আছে, যাঁহারা তাহার আনন্দ তাহার জীবন, তাঁহাদের না দেখিয়াও বাঁচিয়া আছে।

"কেনই বা আর তাঁহারা তাহাকে মনে করিবেন? সে তাঁহাদের না বলিয়া কহিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাঁহাদের অসীম ভালবাসার প্রতিদানে সে এক বার দেখা পর্য্যন্ত না করিয়া চলিয়া আসিয়াছে—এ অপরাধের মার্জ্জনা কোথায়? আবার দেখাশুনা? এ জন্মে নহে, এ জন্মে নহে!"

আকুল আবেগে অধৈর্য্য নিরাশায় স্নেহের দিনের পর দিন কাটিয়া যায়, তবুও কেহ আসে না, কাহারো একখানি চিঠি একটি হাতের অক্ষর পর্য্যন্ত তাহার চোখে পড়ে না,—সেখানকার চাকর দাসী পর্য্যন্ত তাহাকে ভুলিয়া গেছে! কিন্তু এ যন্ত্রণা

নীরবে সহিয়া আর সে পারে না, লজ্জা মান অভিমান ইহাতে আর কত দিন থাকে? সমস্ত সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়া একদিন সে কিশোরীর নিকট গিয়া কহিল—"ঠাকুর পো, অনেক দিন তাঁদের খবর পাইনি আমি আজ একবার দেখা করিতে যাব।"

কিশোরী তখন অন্তঃপুরে দালানে ভাত খাইতে বসিয়াছিল, তাহার স্ত্রী কমলা সম্মুখে বসিয়াছিলেন। স্নেহলতার কথায় কিশোরী ঈষৎ ক্রুদ্ধ ভাবে ঘাড় তুলিয়া বলিল—"জীবনদার সঙ্গে এখন আমার মকদ্দমা চলছে, এখন তাঁর শ্বশুর বাড়ী তোমাকে কি করে পাঠাব? আমার তাতে অপমান।"

স্নেহলতার চোখ ছল ছল করিয়া আসিল, কষ্টে সংযত হইয়া আবার কহিল, "মেশমশায়রা আমার মা বাপ, জীবন ঠাকুরপোর সঙ্গে তোমার মকদ্দামা হচ্ছে ব'লে, আমি তাঁদের কাছে যাব না! সে হবে না ঠাকুর পো, অনেক দিন তাঁদের খোঁজ খবর পাইনি আমি না গিয়ে থাকতে পারব না।"

কিশোরী বলিল—"অমনি একটা ছেলে মানষি কথা বল্লেই কি হয়? এই মকদ্দমাটা আগে চুকুক তাপর যেয়ো। খোঁজ খবর পেতে চাও, আমি এনে দেব এখন।" বলিতে বলিতে সে তাড়াতাড়ি আচমন করিতে উঠিল, এই অনুরোধ হইতে পলাইতে পারিলেই এখন সে বাঁচে?

স্নেহলতা বলিল, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে করুণ স্বরে কহিল—"ঠাকুরপো, নিদেন দু এক দিনের জন্যও আমাকে যেতে দাও, না হয় আমি তাপর আর বরঞ্চ যাব না।

কিশোরী। একদিন গেলেও যা—দশ দিন গেলেও তা, অপমানটা ত তাতে সমানই"।

কমলা আর থাকিতে পারিল না, সে নিতান্ত সরল প্রাণ, অন্যায় কথা শুনিলে সে কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না, তাই বঙ্গবধূ হইয়াও সে মুখরা। সে বলিল, "এতদিন যে দিদি তাদের ওখানে ছিল, সে অপমান তবে সয়েছিলে কি করে? তারা দিদির মা বাপ, তুমি কি চাও, তাদের না দেখে এখানে কষ্টে ও মরুক!

কিশোরী তাহাকে একটা ধমক দিয়া কহিল—"যাও যাও তোমার আর উপদেশ ঝাড়তে হবে না—সবই কি না তুমি বোঝ!" বলিয়া সে পান হাতে লইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল, স্নেহলতা দেখিল—সে নিতান্ত অসহায় নিরুপায় বন্দী।

কিন্তু সংসারে নিতান্ত অসহায় কেহ নাই, মেঘান্ধ নিশীথেও বিদ্যুৎ পথ দেখায় অকূল সমুদ্রে তৃণও কাণ্ডারী। স্নেহলতা বাল্যকাল হইতে নিরাশ্রয় জন্ম দুঃখী, অথচ তাঁহার জীবনাকাশে কেহ না কেহ ধ্রুবতারারূপে উদয় হইয়া তাহার অন্ধকার অদৃষ্ট উজ্জল করিয়াছে। এখানেও সে নিরাশ্রয় নহে, কমলা তাহার ধ্রুবতারা, প্রাণের বন্ধু। স্নেহের অশ্রুমুখ তাহার প্রাণে সহে না। কিশোরী চলিয়া গেলে, সে কাতরস্বরে কহিল, "দিদি— কাঁদিস নে ভাই, যাবি বই কি, 'এর' যেমন কথা, আমি রাতে ভাল

করে বুঝিয়ে বলব এখন?" এই স্নেহবাক্য স্নেহলতার হৃদয় স্পর্শ করিল, তাহার নয়নের অশ্রুর মধ্য দিয়া কৃতজ্ঞতার আলোক বিভাসিত হইল।

তাহার পর দিন সকালে স্নেহলতা পান সাজিতেছে, কমলা বিষণ্ণ ম্লান মুখে ছেলে কোলে করিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। স্নেহ বুঝিল কমলার প্রার্থনা কিশোরী অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহার আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও ভরসা হইল না। সেই নৈরাশ্য প্রকটিত দুঃখ কাতর ম্লান মুখ দেখিয়া কমলার চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহারও মুখে কথা ফুটিল না, সে প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর খোকা জোথিমা জোথিমা করিয়া যখন ঝাঁপাইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিল, তখন তাহাকে মাটীতে নামাইয়া দিয়া স্নেহের নিকটে আসিয়া বসিল।

খোকা নামিয়া স্নেহের পিঠের দিকে আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল 'জোথিমা' এলাচ দে—এবং স্নেহলতা তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া কয়েকটি এলাচের দানা হাতে দিবা মাত্র সে তাহা মুখে পূরিয়া দিল। কিন্তু পূরিয়াই তাহার হুঁস হইল কাজটা ভাল হয় নাই, নহিলে জোথিমার ম্লানমুখ কেন? সে আপনার অসৌজন্য ব্যবহারটা দুরস্ত করিবার অভিপ্রায়ে দুইটি দানা মুখ হইতে বাহির করিয়া জ্যেঠিমার মুখে পূরিয়া বলিল "তু খাবি?" স্নেহলতা অশ্রু মুছিয়া সহাস্য অধরে তাহাকে চুম্বন করিল, বালক তখন সহর্ষে তাহার ক্রোড়ে আসিয়া বসিল। স্নেহ সস্নেহে তাহার মাথায় চুম্বন করিয়া, ভাবিতে লাগিল—কেন আর এ মায়া বাড়ান! সকল গিয়াছে এক দিন ইহাও যাইবে। ভালবাসা? তাহার অদৃষ্টে তাহা স্থায়ী হইবার নহে! সে তাহাকে বুকে আঁটিয়া ধরিল, রুদ্ধ অশ্রু অজস্রধারায় বাহিয়া পড়িল। কমলা নিকটে আসিয়া পানের থালা লইয়া পান করিতে করিতে বলিল—"দিদি খোকা আমার চেয়ে তোকে ভাল বাসে, তুইই ওর মা"—

তাহার কথার মর্ম্ম স্নেহ বুঝিল, তাহার স্নেহ তাহার ভালবাসা তাহার প্রাণে পৌঁছিল, কাহারো করুণা কাহারো সামান্য স্নেহও তাহার উপেক্ষণীয় নহে, ভালবাসার অভাবে জীবনে সে এত কষ্ট পাইয়াছে—যে ইহার মর্য্যাদা তাহার নিকট অসীম। এই সময় কিশোরী আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'বৌ দিদি একটা খবর দিতে এলুম; শুনেছ চারুর আবার বিয়ে? এই রবিবারে"—

স্নেহের অশ্রু স্তম্ভিত হইয়া গেল, হৃদয়ের রক্ত প্রবাহ যেন বন্ধ হইয়া পড়িল।

কিন্তু কেন? সে যাহা চাহিয়াছিল, যাহার জন্য তাহার সুখের গৃহ ছাড়িয়াছে, যে জন্য সে এই অকুল পাথার সার করিয়াছে, তাহাইত হইল, তাহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ত পূরিল, চারু ত তাহাকে ভুলিয়াছে, সে ত নূতন বিবাহ করিয়া সুখী হইবে—তবে কেন? কিসের দুঃখ কষ্ট! আজত তাহার সুখের দিন!

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

আমাদের দেশের একটি মেয়েলি কথা আছে "আশার বাড়া দুঃখ নেই নিরাশার বাড়া সুখ নাই।" কথাটি শুনিতে একটু অদ্ভুত, কিন্তু তলাইয়া দেখিলে হিন্দুদার্শনিকের নিষ্কাম ধর্ম্মের সার মর্ম্ম এই কথার মধ্যে নিহিত। বস্তুতঃ যেখানেই আশা, সেখানেই কামনা—যেখানেই কামনা সেইখানেই চাঞ্চল্য অশান্তি, সুতরাং আশাহীন হইতে পারিলেই শান্তি লাভ করা যায়, এবং এই শান্তির অবস্থাই সংসারে প্রকৃত সুখের অবস্থা।

যিশু খৃষ্টও বলিয়াছেন Blessed are they that never expect for they shall never be disappointed।"

স্নেহলতা যখন দেখিল—তাহার আর আশা নাই, তাহার সহস্র অনুনয় পত্রেও জগৎবাবু নিরুত্তর; (কিন্তু প্রকৃত পক্ষে একখানি চিঠিও জগৎ বাবুর নিকট পৌঁছে নাই) যখন সে বুঝিল, সে বাড়ীর সহিত সম্পর্ক তাহার একেবারেই মিটিয়া গিয়াছে—কাঁদিয়া বুক ফাটিলেও আর জগৎবাবু তাহাকে আশ্রয় দিবেন না,—যখন সে বুঝিল, এই দুঃখই তাহার স্থায়ী আশ্রয়—এই যন্ত্রণাই তাহার নিজস্ব ধন; সুখের আশা, তাঁহাদিগকে দেখিবার আশা, তাহার অনধিকার কল্পনামাত্র—তখন এই দুঃখের অবস্থাও তাহার অভ্যাস হইয়া আসিতে লাগিল; তখন ক্রমে স্থির নিরাশার বলে বলী হইয়া, ঈশ্বরে অটল নির্ভর করিয়া কমলা এবং তাহার সন্তানদিগকে আপনার করিয়া অল্পে অল্পে তাহার হৃদয় প্রশান্ত হইয়া আসিতে লাগিল।

এখন যে আর জগৎবাবু বা চারুকে তাহার দেখিতে ইচ্ছা করে না তাহা নহে--কিন্তু এখন সে বুঝিয়াছে, শিশুর চাঁদ ধরিতে ইচ্ছার ন্যায় তাহা তাহার দুরাশা, সুতরাং এ ইচ্ছার আকুলতা এখন আর অধিকক্ষণ তাহার মনে স্থান পায় না। কেবল তাহাই নহে, মাঝে মাঝে তীব্র বাসনার অশান্তিতেও যখন সে নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠে, জগৎ বাবুর নিকট একবার মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিতে চারুর নব জীবনের আনন্দপূর্ণ মুখকান্তি একবার দেখিতে সমস্ত হৃদয় যখন বাহির হইয়া উঠিতে চায়—তখনো,—এই বাসনার কষ্টের মধ্যেও একটা নূতনতর সান্ত্বনা, একটা প্রশান্ত সন্তোষ গুপ্তভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। সে যে আত্মদমনে সমর্থ হইয়া চারুকে সুখী করিতে পারিয়াছে, জগৎবাবুর সংসার শান্তিময় করিতে পারিয়াছে; ইহা মনে আসিয়া তাহার একটি অ পূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়, চারু বিবাহ করিয়াছে বলিয়া কষ্টের পরিবর্ত্তে এখন সে যথার্থই সুখ অনুভব করে, সুতরাং তাহার বাসনার অশান্তি এই আনন্দের মধ্যে ক্রমে শমিত হইয়া আসে।

কিন্তু এইরূপ প্রশান্ত সন্তোষের অবস্থা তাহার অধিক দিন স্থায়ী হইল না, ক্রমে

তাহার মুমূর্ষ জীবন যখন অভ্যাসে শান্ত, কর্ত্তব্য পালনে সন্তুষ্ট ও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর ভাবে ক্রমে সতেজ হইয়া উঠিতেছে—তখন সহসা আবার এক নূতন কারণে পূর্ব্বের ন্যায় তাহা ম্রিয়মান হইয়া পড়িল।

দুইচার দিন হইতে আবার স্নেহলতার মুখ এক ঘোর অশান্তির ভাবে শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে, সর্ব্বদাই যেন সে বিমনা, যেন কোন দুশ্চিন্তা মগ্ন। থাকিয়া থাকিয়া তাহার চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া উঠে—কমলার আকুল জিজ্ঞাসায় সে যেন সহসা কি বলিতে মুখ খোলে কিন্তু না বলিয়া থামিয়া পড়ে—সে কথা ছাড়িয়া অন্য অদ্ভুত প্রশ্ন তোলে, জিজ্ঞাসা করে, আত্মহত্যা করা সত্যই কি মহাপাপ? কেন রাজপুত রমণীগণ সতীত্ব রক্ষার জন্য অগ্নিদগ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করিতেন, তাহা ত পুণ্য বলিয়াই প্রসিদ্ধি—সুতরাং সকল অবস্থাতে আত্মহত্যা কখনই পাপ নহে?

কমলা এখন সূতিকা গৃহে, প্রায়ই স্নেহলতা তাহার অন্য দুইটি ছেলেকে লইয়া সূতিকার দ্বারদেশে বসিয়া থাকে, উদ্বিগ্ন বেদনা ভরা হৃদয়ে ম্লান মুখে কথা কয়। নানা কারণে কমলারও মনের অবস্থা খারাপ—তাহার উপর স্নেহলতার ভাবগতিক দেখিয়া তাহার বড়ই কষ্ট হয় সে ভাবে জগৎবাবুদের দেখিবার ইচ্ছাতেই স্নেহলতা আবার অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। স্নেহলতা আজ কাল কিশোরীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে—তাহাতে কমলার এই বিশ্বাস আরো দৃঢ়। সে আজকাল কিশোরীকে দেখিলেই অন্যত্র চলিয়া যায়, কিশোরী কথা কহিতে আসিলে, বিশেষ কোন উত্তর না দিয়া বিরক্ত ভাবে সরিয়া পড়ে, ভাত খাইবার সময় কিম্বা কমলাকে দেখিতে বাড়ীভিতর আসিয়া স্নেহলতাকে না দেখিলে অনেক সময় কিশোরী তাহাকে ডাকিয়া পাঠায়, কিন্তু উত্তর আসে—"এখন সময় নাই"। কমলা ভাবে, কিশোরী স্নেহলতাকে জগৎবাবুর বাড়ী পাঠান নাই বলিয়াই কিশোরীর প্রতি সে এইরূপ মর্ম্মান্তিক চটিয়াছে। সে ইহার প্রতিকার চেষ্টায় স্নেহলতাকে নানারূপে সান্ত্বনা দেয় ও তাহার হইয়া স্বামীর সহিত নিষ্ফল ঝগড়া করে।

এইরূপে দুইচারি দিন কাটিয়াছে,—এক দিন নিস্তব্ধ রাত্রি, বাড়ীর সকলেই নিদ্রিত, খোকা মায়ের কাছে যাইব বলিয়া কিছু পূর্ব্বে মহা বায়না ধরিয়াছিল, সেও কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, স্নেহলতা তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া দাসীর কাছে রাখিয়া সবে মাত্র আপনার শয়ন কক্ষে আসিয়াছে,—কমলার বড়মেয়ে প্রমীলা তাহার খাটে গভীর নিদ্রাভিভূত, তাহার ঘুমন্ত মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া স্নেহলতা প্রতি রাত্রের মত একবার জানালা খুলিয়া আকাশের দিকে চাহিল। সুন্দর নক্ষত্রখচিত রাত্রি, তাহার দিকে চাহিয়া তাহার পুরাতন কথা মনে পড়িতে লাগিল। একটা অতৃপ্ত বাসনায় সে যেন নক্ষত্রের সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, ভাবিতে ভাবিতে সে গুণগুণ করিয়া গান ধরিল—

হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা,
নিবারিতে পারে তা কি সংসারের বিন্দু ভালবাসা ?
চাহি মান চাহি ধন, চাহি প্রিয় পরিজন
যত পাই আরো চাই—কেবলি দুরাশা !
কিছুতে মেলেনা শান্তি, বাসনার বাড়ে ভ্রান্তি,
অতৃপ্তির মরীচিকা মোহ সর্ব্বনাশা !
সখা গো প্রেমের সিন্ধু, সে বুঝি তোমারে চাহে,
বুঝিয়া বুঝিতে নারি, ডুবিয়া অজ্ঞানমোহে।
এস, নাথ এস প্রাণে আত্মার মিলন দানে
পূর্ণ কর এ অভাব—এ অনন্ত তৃষা।

গাহিতে গাহিতে কিছুক্ষণ পরে জানালা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল; দ্বার বন্ধ করিয়া এইবার বিছানায় যাইবে। কিন্তু সহসা সে যেন অস্পর্শ্যকীটস্পর্শে কুঞ্চিত, শিহরিত হইয়া উঠিল—ফিরিয়াই দেখিল কিশোরী নীরবে দণ্ডায়মান। সে শশব্যস্তে গৃহ হইতে চলিয়া যাইবার ইচ্ছায় দ্বারাভিমুখী হইল কিন্তু কিশোরী তাহার অভিপ্রায় ব্যর্থ করিবার উদ্দেশে তাহার পূর্ব্বেই দ্বার সম্মুখীন হইয়া তাহার গতিরোধ করিয়া বলিল—"কোথায় যাও ? আমি কি সাপ, যে আমার কাছথেকে সরে পড়লেই বাঁচ। আমি তোমার কি করেছি বৌদিদি, যেয়ো না—আমার একটি কথা শোন, আমি তোমাকে কিরূপ ভালবাসি বলতে দাও।"

স্নেহ বলিল—"ঠাকুরপো, সর বল্‌ছি, তুমি যদি আমার কথা না শোন তাহলে, আমি—আমি—"

কিশোরী হাসিয়া বলিল—"তাহলে কি করবে বৌদিদি !

আপাদ মস্তক ক্রোধ-প্রজ্জ্বলিত হইয়া সে বলিল—"তাহলে আমি এখনি চেঁচিয়ে উঠব।"

কিশোরী। তাতে আমার কি ক্ষতি, তোমারি কলঙ্ক হবে ! বৌদিদি শোন, এ ঘর দোর টাকা কড়ি সমস্ত তোমার—

স্নেহ কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"ঠাকুরপো, আমি আর শুনতে পারিনে, সর'বলছি,—আমাকে যেতে দাও—"

কিশোরী। একটু ভেবে দেখ বৌদিদি, তোমার অন্য কোথাও আশ্রয় নেই, (কিশোরী জানিত স্নেহলতা মনে করে জগৎবাবু আর তাহাকে আশ্রয় দিবেন না, কেন না তাহার কোন পত্রেরই তিনি উত্তর দেন নাই।) আমার যা কিছু সমস্ত তোমার, আমার হৃদয়রাজ্যে তুমি এক মাত্র রাণী, আমাকে তাড়িও না, তোমার রাঙ্গা পায়ে—"

কিশোরী তাহার চরণ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইল সে দ্রুতবেগে সরিয়া ক্রোধে

কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আর না, আমি তোমার আশ্রয় চাইনে; আমি পথে দাঁড়াব সে ও স্বীকার, তবু তোমার মুখ দেখব না"—

বলিতে বলিতে স্নেহলতা নক্ষত্র বেগে খাটের পাশে আসিয়া তাহার ঘর ও ছেলেদের ঘরের মাঝের বন্ধ দরজার হুড়কা খুলিয়া (সচরাচর এ দ্বার বন্ধ থাকে সুতরাং এ দ্বারের কথা প্রথম স্নেহলতার মনেই পড়ে নাই) অন্য গৃহে প্রবেশ করিল, কিশোরী হতাশ্বাস হইয়া নিষ্ফল-ক্রোধে দগ্ধ হইতে হইতে বলিল "আচ্ছা যাও, কোথায় দাঁড়াবে দেখব।"

স্নেহলতা তাহা শুনিতে পাইয়া মনে মনে ভাবিল "যেখানেই দাঁড়াই, এখানে আর না।" স্নেহলতা সেরাত্রে ছেলেদের বিছানায় শুইয়া রহিল; পরদিন উঠিয়াই জীবনের মাকে এখানে আসিবার জন্য একখানি অনুনয় পত্র লিখিয়া লুকাইয়া দাসীর হাত দিয়া পাঠাইয়া দিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রাতঃকাল। সূতিকা গৃহের এক পার্শ্বে মৃত্তিকাপাত্রে গণগণে আগুন, ধাত্রী, তৈলসিক্ত অনাবৃত দেহ নবশিশুকে ক্রোড়ে লইয়া তাহাকে তাপ দিতেছে। নিকটে তক্তাপোষে প্রসূতি শয়ান, গৃহের চৌকাটের বাহিরে, ভূমিতলে স্নেহলতা খোকাকে কোলে লইয়া বসিয়া। স্নেহলতার মুখকান্তি নিতান্ত বিষাদ-মলিন, তাহার মনের চিন্তাভাব তাহাতে প্রকাশিত, কিন্তু কমলাও আজ আপনার মনের কষ্টে এরূপ জ্বালাতন হইয়া আছেন, যে স্নেহলতার বিমুগ্ধতা তাঁহাকে মৌণ রাখিতে পারে নাই, তিনি কাতরচিত্তে কহিতেছিলেন "দিদি, কদিন দিনের বেলা তবু একটু বাড়ীর-ভিতরমুখো হচ্ছেল আমি ভাবলুম বুঝি বা মতিগতি ভগবান ফেরালেন; কিন্তু আবার শুনছি—রাত্তিরে নাকি আর বাড়ী আসে না। আমার জীবনে ঈশ্বর বুঝি আর তাঁকে সুমতি দেবেন না। এদিকে বিষয়আশয়ও ত যায় যায়, জমীদারীত কটা বাঁধা পড়েছে, তা ভাল কাজে খরচ করে তাহলেও না হয় বুঝি, তাতে এক পয়সা বার হয় না। জ্যেঠাইমার হাতে যা টাকাকড়ি ছিল—ধার বলে তাত সব নিয়ে গিয়েছে,—এখন চাইলে দেবার নামগন্ধ নেই। সে দিন তিনি বোনঝিকে তত্ব করার জন্য টাকা চাইলেন—দিলে না, শেষে আমি নিজের থেকে দিলুম। আবার তিনি ব্রত ব্রত করছেন, সেদিকে কাণও নেই—আর এদিকে তাঁর বকুনিতে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত, হাতে টাকা নেই যে দেব, যা ছিল ঐরকম করে সব খুইয়েছি। বাঁচতে আর একতিলও ইচ্ছা করে না।"

স্নেহলতার মনে যতই কষ্ট থাক, কমলার দুঃখে সে পাথর থাকিতে পারিল না,

সমদুঃখভরে বলিল—"তুমি একটু ভাল করে বুঝিয়ে বলে দেখো দেখি, তাঁর নিজের স্বার্থটাও তিনি বুঝবেন না কি ?"

বৌ। আমি আবার বলিনে, বলি বলেইত কাছে এগোতে চায় না। বল্লে কি কিছু হয়, নিজের সুমতি না হলে কারো কথায় কিছু হয় না।

এই সময় জ্যেঠাইমা হরিনামের মালা হাতে, আলগোছে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চৌকাটের চার হাত তফাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "সব সাহেবিআনা, ছোঁয়া-ছোয়ি ! আর আচার বিচের কিছু রইল না ! বলি ঝালটা খেয়েছিসত ? দাই বৌ ! সেঁক হচ্চে নাকি ? কি আগুণেরই ছিরি ! আমাদের কালে তাপ দিতে দেখেছি, কাঠের আগুণ অমনি দপদপ করে জ্বলেছে, পোয়াতীকে তার কাছে দাইরা ঠেলে ধরেছে, গায়ে ফোস্কা পড়লে তবে তাপ হয়েছে—এখন কি আর কেউ কথা শোনে !

কমলার কষ্টে কষ্টে শরীর জ্বালাতন, শাশুড়ির কথাও সে এ সময় চুপ করিয়া সহিতে না পারিয়া আস্তে আস্তে বলিল "তখন ছিল সত্যযুগ—অগ্নি পরীক্ষা সইত, এখন কলিযুগে কি তা সয়।"

জ্যেঠাইমার কাণে দুএকটা কথা পৌঁছিল, তিনি বলিলেন, আজকালকার মেয়েদের সঙ্গে কথায় পারা ভার, ঘাট হয়েছে গো ঘাট হয়েছে। তা আমার বত্তোর টাকা দিচ্ছিসনে কেন বলদেখি ? আমি কি মাগনা চাচ্ছি নাকি ?

বৌ। তিনি এখনো দেননি ! আবার বলব এখন।"

কর্ত্রী যদিও নিজে ছেলের নামে বৌয়ের কাছে নালিস করিলেন, কিন্তু বৌ তাঁহার হইয়া ছেলের কাছে যে দরবার করিবে সেটাও তাঁহার গায়ে সহিল না ; মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন—"বলব এখন ! উনি বলবেন তবে হবে ! বাপের বাড়ীর ধন কি না ! যে অবধি বৌ এসেছে ছেলের এমনি মতি হয়েছে ! আগে জ্যেঠাইমা বলতে ছেলে অস্থির, আবাগীর বেটিরা সব ডাইনি !"

বৌ বলিল "বাছা আমাকে যা ইচ্ছা বল, আমার বাপ মা নিয়ে টান কেন !"

জ্যেঠাইমা মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন "ইস ! কথা দেখ ! ওঁর ভয়ে আমি কথা কব না, বাপ ত বাপ চোদ্দপুরুষের 'খোর' তুলব, কি করবি কর দেখি—"

কমলা কাঁদিয়া বলিল "বিধাতা মরণ দেবে না, আর ত পারি না—"

জ্যেঠাইমা উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি হইয়া বলিলেন "আমাকে গালাগাল, আমি মরব—বটে ! তুমি মর, তোমার চৌদ্দপুরুষ মরুক, ছেলের আমি আবার বিয়ে দিই।"

জ্যেঠাইমা আঙ্গুল মটকাইতে লাগিলেন।

স্নেহ আর পারিল না, তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে বলিল "জ্যেঠাইমা তোমাকে বলেনি—নিজের কথা বলছে—"

জ্যেঠাইমা। “বেয়’ পোড়ার মুখী, তুই এসেই ত ও রকম হয়েছে, ও ত আমার লক্ষ্মী বৌ ছিল, সাত চড়ে রা বেরত না,—আমাকে বলেনি ত কি ?

স্নেহ। না জ্যেঠাইমা তোমাকে বলেনি। আর ও ত ঠাকুরপোকে দেখা হলেই তোমার টাকার কথা বলে, তা তিনি দেন না ও কি করবে ?”

জ্যেঠাইমা। ও কি করবে ! সোয়াগ কাড়ান দেখ! আমার ছেলের উপর মন ভাঙ্গান ! ছেলে দেয় মা, ওনারা দেন ! আস্পর্দ্ধা দেখ ! তুই এসেই সব ঘর ভাঙ্গছে, তুই যাবি—কি আমি যাব—দেকি কি হয়” বলিয়া জ্যেঠাইমা উচ্চ কণ্ঠে স্নেহলতার পূর্ব্ব পুরুষদিগকে যথাবিধি সম্ভাষণ করিতে করিতে কিশোরীর তল্লাসে বাহিরবাটী ও ভিতরবাটীর সন্ধিস্থলে আসিয়া মাটীতে দুম দুম করিয়া মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন—“কিশোরী রে—একবার দেখ্‌সে বাবা—আবাগীর বেটী আমার কি দশা করলে।”

বাড়ীর চাকর দাসী সমস্ত হাঁ হাঁ করিয়া সেইখানে আসিয়া পড়িল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

কিশোরী সেদিন বেলা দুই প্রহরের পর বাড়ী ফিরিল। সমস্ত সকালটা সে উকীলের পরামর্শ লইতেই ব্যস্ত ছিল। বাড়ী আসিয়াই শুনিল, কি হেঙ্গাম। কিন্তু ইহাতে সে সন্তুষ্ট ছাড়া অসন্তুষ্ট হইল না। এতদিন স্নেহলতাকে বাড়ীতে রাখিবার তাহার যে উদ্দেশ্য ছিল, এখন তাহা নাই। দিন কতক হইতে সে শুনিয়াছে শ্বশুর বর্ত্তমানে স্বামী মরিলে বিধবা স্ত্রীর শ্বশুরের বিষয়ে কোন দাবী দাওয়া থাকে না—এমন্‌ কি খোরাক পোষাকে পর্য্যন্ত সে তখন অধিকারী নহে।* কিন্তু ইহা শুনিয়াও অন্য অভিপ্রায় বশতঃ স্নেহলতাকে এতদিন ঘরে রাখিতেই তাহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু গত রাত্র হইতে স্নেহলতা এখন নিতান্তই তাহার বোঝা। এখন তাহাকে দূর করিতে পারিলেই সে বাঁচে, তাহা হইলে তাহার গায়ের জ্বালাও কমে—আর অনাবশ্যক খরচও বাঁচে। সুতরাং জ্যেঠাইমার প্রস্তাবের সহিত সে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে তাঁহার আপদ স্বরূপ স্নেহলতাকে গৃহ বহিষ্কৃত করিতে সম্মত হইল। দম্ভে আর জ্যেঠাইমার পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়া জ্ঞান রহিল না।

আহারান্তে কিশোরী কমলার গৃহ দ্বারে আসিয়া দেখিল স্নেহলতা ও জীবনের মা সূতিকা গৃহের সম্মুখে চৌকাটের বাহিরে এক খানি মাদুরের উপর বসিয়া আছেন। আর ঘরের ভিতর তক্তাপোষে বসিয়া প্রসূতি শিশুকে স্তনপান করাইতে করাইতে

* সম্প্রতি মান্যবর জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই অন্যায় প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া এইরূপ স্থলে বিধবা পুত্রবধূকে খোরাক পোষাক দানের বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

তাঁহাদের সহিত কথা কহিতেছে। স্নেহলতার অনুরোধ ঠেলিতে না পারিয়াই আরকি জীবনের মা আজ আসিয়াছেন।

কিশোরীকে আসিতে দেখিয়া স্নেহ ছুতা করিয়া উঠিয়া গেল, পথে কিশোরীর তীব্র দৃষ্টি তাহার নত মুখের দিকে যে ন্যস্ত হইল সে তাহা দেখিতেও পাইল না। কিশোরী আসিতে বৌ একটু মাথার কাপড় টানিয়া দিলেন, জীবনের মা বলিলেন, "ভাল আছ বাবা!

কিশোরী—'এই যে জ্যেঠাইমা,' বলিয়া নমস্কার করিল।

জীবনের মা বলিলেন—"বৌমা দেখছি বড় কাহিল হয়ে পড়েছেন, ডাক্তাররা কি বলে?

কিশোরী। ডাক্তাররা কি বলবে? বার মাস অসুখ যার, ডাক্তার তার কি করবে? ডাক্তার ত শরীর বদলাতে পারে না, চিকিৎসারও ত কিছু কসুর নেই।

জীবনের মা। চিকিৎসাতে কি শুধু হয়? বাছার মনের কষ্ট। তুমি ওকে আদর যত্ন কর না এতে কি শরীর সারে!

কিশোরী। জ্যেঠাইমা যে আজ 'সেন্টিমেনট্যাল' হয়ে উঠলে, চিরকাল কি কোর্টসিপ করতে হবে নাকি! (বৌয়ের প্রতি) আবার কি ঝগড়া ঝাঁটি করেছ! তোমাদের ঝগড়া ঝাঁটির জ্বালায় ত আর তিষ্টবার যো নেই! সাধে কি আমি ভিতরমুখো হইনে?

বৌ ঘোমটার মধ্য হইতে আস্তে আস্তে বলিল—"সে দোষটা কার! তুমিই ত জ্যেঠাইমাকে টাকা দেও না, আর আমাদের সে জন্য দশ কথা শুনতে হয়?

কিশোরী। বুড় মানুষ যদি দু কথা বলেন, তাই বলে কি তাঁকে তোমরা বলবে! বৌদিদি তাঁকে কি বলেছে তিনি ত কেঁদে কেটে অস্থির—"

বৌ বলিল—"জ্যেঠাইমাকে কি আর কারো কিছু বলতে হয় নাকি? তিনি ত সারাদিনই বকছেন—"

কিশোরী। কই আগে ত এমনতর হোত না, আমি দেখ্ছি বৌ এসে পর্য্যন্ত যত গোল চলছে!

কমলা রাগিয়া গেল—বলিল—"ওকি কথা! দিদির মুখে কেউ কখনো কোন কথা শুনেছে? আগে যে কথা শুনতে পেতে না তখন আমার হাতে টাকা ছিল দিয়েছি, এখন দিতে পারিনে কাজেই গোল হয়, সেকি আর দিদির দোষ নাকি?

কিশোরী। সে যারি দোষ হোক, দেখতে ত পাচ্ছি ঝগড়া ঝাঁটির বিরাম নেই, জ্যেঠাইমাকে ত আর আমরা ফেলতে পারব না, তার চেয়ে বৌ বরঞ্চ অন্য জায়গায় যান—"

বৌ। দাসীর মত খাটিয়ে চাট্টি ভাত দিচ্ছ তার জন্য এত কথা। ওর পোড়া

কপাল তাই এ সংসারে এসেছে। তা, ও ত আপনা হতেই যেতে চেয়েছিল—তখন যেতে দিলে না কেন ? কিন্তু ও যাবেই বা কেন ? ওরও ত স্বামীর ভাগ আছে, ওর কি জোর নেই যে তুমি ওকে বেড়াল কুকুরের মতন তাড়াবে ?”

কিশোরী যখন স্নেহলতাকে বাড়ীতে রাখে তখন তাহারো এইরূপ ধারণা ছিল, আজ সে নিস্পরোয়া ভাবে কহিল—এই সব বুঝি বৌ দিদির কথা ! আমাকে বুঝি ভয় দেখান হচ্ছে ? তা বেশত, পারেন ত নিন না।”

বৌ। সে কেন বলবে, হক্ কথা যা আমি বলছি। তাকে জগৎবাবুর বাড়ী তখন যেতে দাও নি—এখন কোন লজ্জায় যাবার কথা বল। যদি পাঠাও ত খোর পোষ দিয়ে পাঠাও, আপনার লোককে পরের করতে লজ্জাও করে না !”

জীবনের মা বলিলেন—“কেন বাছা খোরপোষ কেন, ওর স্বামীর বিষয় ত ও অর্দ্ধেক পেতে পারে, ওরওত তাতে অধিকার আছে।”

কিশোরী। আপনাকে কি ও তরফা থেকে কৌন্সালি দিয়েছে নাকি ? তা পারেন নিন আমার আপত্তি নেই, কিন্তু এ কথার পর আমি আর ওঁকে বাড়ী রাখতে পারিনে।”

জ্যেঠাইমা এই সময় এই দিকে আসিতেছিলেন, কতক কতক কথা তাঁহার কাণে গিয়াছিল, তিনি তাহা শুনিয়া হাঁকিতে হাঁকিতে আসিলেন—“কি হয়েছে ? বেটী ভাগ চায় ! দূর করে দে এক্ষণি”

কিশোরী সহসা ভাল মানুষ হইয়া বলিলেন—“আমার তা ইচ্ছা নয় আপনার লোককে বিদায় করি—কিন্তু কি করব, তাঁর ইচ্ছা হয়েছে—ভাগ নেবেন, একবার চেষ্টা করুন, তবে এ বাড়ীতে আর যেন তাঁকে না দেখতে পাই ?

এই কথা বলিয়া কিশোরী দম্ভভরে পা ফেলিয়া পশ্চাৎ মুখ হইল, বৌ দেখিল, সর্ব্বনাশ ! স্নেহকে সত্যই বুঝি এ বাড়ী ছাড়িতে হয় ! সে কাঁদিয়া কহিল—ওগো, শোন ! দিদি যাবে কোথা ! ওকথা বলো না’ ’

কিশোরী সে কথায় ভ্রুক্ষেপ না করিয়া জ্যেঠাইমার দিকে চাহিয়া আর একবার বলিল—“পাল্কি আনিয়ে দিচ্ছি বৌকে বল যেখানে ইচ্ছা যান, এখানে আমি আর তাঁকে রাখতে পারব না।

জ্যেঠাইমা উত্তর স্বরূপ বলিলেন—“সে ভয় নেই, এখনি বিদায় করব। মকদ্দমা ক’রে বিষয় নেবে ! পোড়ার মুখ দেখাতে লজ্জাও করে না !”

স্নেহ গোলমাল শুনিয়া এদিকে আসিয়া কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল। কিশোরী ও জ্যেঠাইমা চলিয়া গেলে পুনরায় এইখানে আসিয়া জীবনের মাকে বলিল “জ্যেঠাইমা আমাকে নিয়ে চল, তোমার ঘরে ত দাসী আছে, আমিও তোমাদের একটা দাসীর মতন থাকব। আমি আর পারিনে জ্যেঠাইমা, এই জন্যেই তোমাকে ডেকেছি।”

জীবনের মা দয়ার্দ্র হৃদয়, তিনি জানিতেন স্নেহলতাকে বাড়ীতে স্থান দিলে টগর বড় সন্তুষ্ট হইবে না, কিন্তু এ সময় তাঁহার সে সব চিন্তা করিয়া কাজ করিবার সময় নহে, তিনি বলিলেন "আচ্ছা চল বাছা,—আমি তোমাকে নিয়ে যাই।" কৃতজ্ঞতায় স্নেহের হৃদয় যেন দ্রব হইয়া অশ্রুরূপে পরিণত হইল। বৌ কাঁদিয়া কহিল "যাও দিদি যাও, এ বাড়ী ভদ্রের যোগ্য স্থান নয়,—আমিও যেন তোমার পর এখান থেকে বিদায় নিতে পারি।

... ...

সেই রাত্র হইতে কমলার মূর্চ্ছা আরম্ভ হইল।

মহাযজ্ঞ।

আহুতি।

শনিবার, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৯০।

মহোৎসাহে ও মহাসমারোহে মহাযজ্ঞের মঙ্গলময় উদ্বোধন শেষ হইয়াছে; আজি উহার প্রথম আহুতি। আজি অপরাহ্ণ একঘটিকার সময় যথাবিধি জননীর পূজা আরম্ভ হইবে; দশটার সময় হইতেই মাতৃবৎসল সন্তানগণ পূজার আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন। ১১টা বাজিতে না বাজিতেই যজ্ঞভূমি জনতায় পূর্ণ হইতে লাগিল। পূর্ব্ব দিন যে সকল দূর দেশবাসী প্রতিনিধি উদ্বোধনে যোগদান করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আজি প্রাতঃকালে উপস্থিত হইয়া উৎসাহপূর্ণ অন্তরে বন্ধুগণের মুখ হইতে এবং সংবাদ পত্রস্তম্ভে তদ্বিবরণ শ্রবণ ও পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ১২টা বাজিবামাত্র পূজার মন্দির জনস্রোতে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। বিভিন্ন বিভাগ ও প্রদেশস্থ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করিতে লাগিলেন; একটা বাজিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই জনস্রোত সুসংযত হইল—প্রতিনিধি দর্শকবর্গ পৃথক পৃথক চিহ্নিত বিভাগে উপবিষ্ট হইয়া আহুতির সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বদিনে অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী মহাসভায় আগমন করিয়াছিলেন, আজি "গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণের জাতীয় মহাযজ্ঞে যোগদান একান্ত নিষিদ্ধ, 'এমন কি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় সম্বন্ধীয় কোন কর্ম্মচারী দর্শকস্বরূপেও উহাতে উপস্থিত হইতে পারিবেন না," এই মর্ম্মে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কঠোর আজ্ঞা কতিপয় প্রধান প্রধান

স্থানীয় সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; সুতরাং গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ স্বস্ব অদৃষ্টবিধাতৃবর্গের বিরাগভাজন হইবার আশঙ্কায় যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইতে বিরত হইয়াছিলেন। প্রতিনিধিগণের সংখ্যা পূর্ব্বদিন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক লক্ষিত হইয়াছিল, দর্শকবর্গের সংখ্যা পূর্ব্বদিন হইতে কিয়ৎ পরিমাণে অল্প হইলেও পূজার মন্দিরে উদ্দীপনা ও আনন্দের উচ্ছ্বাস কিছুতেই হ্রাস হয় নাই; বরং পূর্ব্বদিন অপেক্ষা অনেক অংশে অধিক অনুমিত হইয়াছিল। একটা বাজিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই মহাত্মা হিউম্, কেন, সোয়ান্, শ্রীযুক্ত ফেরোজসা মেটা, জর্জ ইয়ুল, সার রমেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রতিনিধিগণ একে একে মণ্ডপমধ্যে উপনীত হইতে লাগিলেন, অমনি চারিদিক হইতে সকলে গভীর আনন্দ ধ্বনি সহকারে তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদন দান করিতে লাগিলেন। নিমেষ-মধ্যে বিশাল মন্দির জ্বলন্ত উদ্দীপনার পবিত্র নিকেতন স্বরূপে বিরাজিত হইতে লাগিল।

একটা বাজিবামাত্র সভাপতি শ্রীযুক্ত মেটা সমুচ্চ মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া প্রত্যেক প্রস্তাবকর্ত্তা এবং প্রস্তাবের অনুমোদন ও সমর্থনকারীর জন্য যথাক্রমে দশ এবং পাঁচ মিনিট কাল বলিবার সময় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আজিকার প্রধান আলোচ্য শ্রীযুক্ত ব্র্যাড্ল প্রণীত ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাবের অবতারণার জন্য সুবক্তা শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষকে বক্তৃতা দান করিতে অনুরোধ করিয়া স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর বক্তা সকলের আনন্দধ্বনির মধ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবের অবতারণার জন্য প্রফুল্ল আননে উচ্চ বেদীর উপর দণ্ডায়মান হইলেন।

প্রথম প্রস্তাব—"অল্পদিন হইল শ্রীযুক্ত ব্র্যাড্ল সাহেব কর্ত্তৃক ১৮৬১ সালের ভারত-বর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার সম্বন্ধীয় যে আইনের পাণ্ডুলিপি প্রণীত ও পার্লেমেণ্ট মহাসভায় উপস্থাপিত হইয়াছে, এই জাতীয় মহাসমিতি তাহা সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা পূর্ব্বক সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার অনুমোদন করিতেছেন—উহা বিধিবদ্ধ হইলে ভারতীয় শাসন প্রণালীর স্থায়ী উৎকর্ষ সাধিত হইবে—ভারতশাসনে উক্ত সংস্কার প্রবর্ত্তন জন্য মহাসমিতি এতদিন অবিশ্রান্ত আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন, এবং এক্ষণে বিনীত ভাবে এই প্রার্থনা করিতেছেন যে উক্ত পাণ্ডুলিপি বৃটিশ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক বিধি বদ্ধ হউক। মহাসমিতির সভাপতি সমগ্র সমিতির পক্ষে উল্লিখিত মর্ম্মে একখানি আবে-দন প্রস্তুত করিয়া উহাতে স্বাক্ষর পূর্ব্বক যথা সময়ে পার্লেমেণ্টের 'হাউস্ অব কমন্স' সভায় প্রেরণ জন্য উহা শ্রীযুক্ত চার্লস্ ব্র্যাড্ল সাহেবের নিকট পাঠাইবার ভার প্রাপ্ত হউন।"

তিনি এই বলিয়া উক্ত প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন;—"এক্ষণে ইহা আমার নিকট প্রতীয়মান হইতেছে যে এই নূতন সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে আমাদের সর্ব্ববাদী-সম্মত

মূলনীতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমার বিবেচনায় এই নূতন পাণ্ডুলিপি ব্রাড্‌ল-প্রণীত পূর্ব্বকার পাণ্ডুলিপি অপেক্ষা পার্লামেণ্টের অনুরাগ আকর্ষণে বিধিবদ্ধ হইবার অধিকতর সম্ভাবনা আছে। উক্ত পাণ্ডুলিপিতে এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহাতে আমার স্বদেশীয় সুশিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মতে সম্পূর্ণ একত্ব লক্ষিত হইতেছে। আমরা সকলেই একবাক্যে এই একই বিষয় প্রার্থনা করি যে গবর্ণর জেনারলের এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির বর্ত্তমান আকার পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হউক। সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে গবর্ণর জেনারলের সভার সভ্য সংখ্যা ৪০ হইতে ৬০ এবং বিভিন্ন দেশস্থ লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরগণের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য সংখ্যা ৩৬ হইতে ৪৮ জন করিবার জন্য ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। উল্লিখিত প্রস্তাব এমনই সুসঙ্গত ও ন্যায়ানুমোদিত যে, কোন সহৃদয় সমালোচক আমাদিগকে কখনই এই বলিয়া নিন্দা করিতে সাহসী হইবেন না যে আমরা সহসা বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী। পক্ষান্তরে আমাদের মধ্যে যদি কেহ এরূপ বিবেচনা করেন যে উহা আশানুরূপ আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের অনুপযুক্ত, তাহা হইলে আমি বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে ইহা স্মরণ করিতে বলিব যে ধীরভাবে অগ্রসর হইলে ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। প্রস্তাবিত সংস্কার এবং পরিবর্ত্তনগুলি যতই ধীরতা ও সতর্কতার সহিত প্রবর্ত্তিত হয় ততই তাহাদের স্থায়ী সুফল লাভের অধিকতর সম্ভাবনা। তৎপরে আর একটী বিষয়েও আমাদের সকলের ঐকমত্য বিদ্যমান আছে; ব্যবস্থাপক সভা নিচয়ে সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধিগণের সভ্য স্বরূপে নিয়োগ একান্ত প্রার্থনীয় এবং নির্ব্বাচন প্রথানুসারে এই সকল প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন কর্ত্তব্য। সাধারণের নির্ব্বাচন অনুসারে যে সকল লোক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত, এরূপ কোন কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান মনোনয়ন প্রথানুসারে ব্যবস্থাপক সভায় নিযুক্ত হইলেও আমি সর্ব্বদাই এই বিশ্বাস পরিপোষণ করিয়াছি যে সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ ব্যক্তিগণ দেশের প্রজা সাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশাধিকার লাভ করিলে তাঁহাদের পদ-গৌরব যে পরিমাণে বর্দ্ধিত এবং তাঁহাদের ক্ষমতা যে পরিমাণে বিকশিত হইতে পারে, গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ ও প্রসাদ বলে যাঁহারা উক্ত সভায় নিয়োজিত হইয়া থাকেন তাঁহাদের পদমর্য্যাদা সেরূপ পরিবর্দ্ধিত ও ক্ষমতা তেমন পরিস্ফুট হইতে পারে না। সভাপতি মহাশয়, দশ বৎসর অতীত ১৮৮০ সালে উদারনৈতিক দলের জয়লাভের অব্যবহিত পরেই আমরা বহুসংখ্যক ভারতবাসী এবং ইংরাজ তদানীন্তন ভারত সচিব লর্ড হার্টিংটনের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলাম তাহা হইতে আমি, আপনার অনুমতিক্রমে কিয়দংশ পাঠ করিতে ইচ্ছা করি,—"যদিও এই সকল মনোনীত সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রকৃত সুকার্য্যের সহায়তা দান করিয়াছেন, তথাপি ইহা সুস্পষ্ট রূপে

উপলব্ধি করা যাইতে পারে যে, ইহাঁরা যতই সতর্কতা ও বিবেচনার সহিত নিয়োজিত হউন না কেন, ইহাঁরা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন, সুতরাং ইহাঁদের আশানুরূপ স্বাধীনতা থাকার সম্ভাবনা নাই; এবং সাধারণ প্রজাবর্গের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের ন্যায় ইহাঁদের বাক্যে ও অভিমতে বিশেষ গুরুত্ব ও প্রভাব লক্ষিত হইবার কিছুমাত্র আশা নাই।" মহাশয়গণ, আমার বিশ্বাস এই যে উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বাক্য সমবেত সমস্ত ব্যক্তিবর্গের অভিমত সমানভাবে ব্যক্ত করিতেছে এবং উক্ত মূলনীতি সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ আছে কি না তাহা আমার বিবেচনার অতীত। কিন্তু নির্ব্বাচন প্রণালী অত্যন্ত গুরুতর ও জটিল বিষয়—উহাতে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন স্বার্থের সম্বন্ধজনিত উহার সমাধান সহজসাধ্য না হইলেও সকল শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি সমানভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এরূপ গুরুতর বিষয়ের মীমাংসায় ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বনে বাদানুবাদ উপলক্ষে মত বিভিন্নতা অসম্ভব ও দোষণীয় নহে। আমাদের সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত যে এরূপ গুরুতর বিষয়ে আমাদিগকে অল্লাধিক পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার জন্য প্রস্তুত না করিলে কখনই অভিলষিত বিষয় সুসিদ্ধ হইবে না। ... ... আমি নিঃসন্দেহে সরল অন্তঃকরণে সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপিতে নির্ব্বাচন প্রথা সম্বন্ধীয় যে সকল ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে তৎ সমস্তই পূর্ব্বতন পাণ্ডুলিপির ব্যবস্থা হইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। ... ... বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হইলে প্রথমতঃ ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচন প্রণালী স্থিরীকৃত হইবে এবং পরিশেষে বৃটিশ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক উহা সংশোধিত ও বিধিবদ্ধ হইবে। " গবর্ণমেণ্ট বিশেষরূপে বিবেচনা পূর্ব্বক সকল শ্রেণীর লোকদিগের স্বার্থের প্রতি সমান ভাবে দৃষ্টি রাখিতে সমর্থ হইবেন। হিন্দুদিগের এ সময় কিয়ৎ পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করা একান্ত কর্ত্তব্য—তাঁহাদের সংখ্যা মুসলমান, পার্সি ও ইয়ুরোপীয় অধিবাসিগণের অপেক্ষা অনেক অধিক; সুতরাং তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে অধিক পরিমাণে নম্রতা অবলম্বন করিতে হইবে। আমাদের মধ্যে সকলেরই সর্ব্বতোভাবে সহিষ্ণুতা ও নম্রভাব অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। মতভেদজনিত কাহাকেও তীব্র ভর্ৎসনা ও গালি বর্ষণ ভদ্রোচিত ব্যবহার নহে। যদি আমরা এইরূপ ধীর ও সহিষ্ণুভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকি, তাহা হইলে এই জাতীয় মহাসমিতির সুমহৎ উদ্দেশ্য নিচয় একদিন অবশ্যই জয় লাভ করিবে; কিছুতেই তাহা বিফল করিতে পারিবে না। আমি চতুর্দ্দিকেই শুভলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। এই বিরাট মণ্ডপতলে এই বিশাল ভারতভূমির সকল জাতীয় সকল সম্প্রদায়স্থ এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বী অধিবাসিগণের প্রতিনিধিবর্গ একত্র সম্মিলিত হইয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে মহা দৃশ্য কেহ স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই, আজি তাহা প্রত্যক্ষ ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। সমুদ্রের পরপারে ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ আমাদিগকে সহায়তা

দান ও আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন জন্য দক্ষিণ হস্ত বিস্তারে অগ্রসর হইয়াছেন। মহারাণীর ঘোষণা অনুসারে আমাদিগকে সভ্য জাতির অধিকার ও রাজনৈতিক সম্পদ প্রদানার্থে তাঁহারা ক্রমশঃ প্রস্তুত হইতেছেন—অল্পদিন হইল তাঁহারা আমাদের প্রতি তাঁহাদের প্রাণগত সহানুভূতি ও সহায়তার সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের পার্লামেণ্ট মহা সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য তাঁহারা এ দেশীয় কোন কোন লোককে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে, বিংশতি বর্ষ কেন, দশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ইংরেজের নিকট এরূপ উদারতা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন ? এই সকল বিষয় দর্শনে কাহার প্রাণ পুলকে পূর্ণ ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত না হইয়া থাকিতে পারে ? আমরা যে মহান্ সংস্কার ব্রতে ব্রতী হইয়াছি যদি তাহারই উদ্দেশে অবিচলিত উৎসাহ, অবিশ্রান্তে উদ্যম এবং ধীরতা ও সত্যতার সহিত অবলম্বিত পথে অগ্রসর হইতে থাকি তাহা হইলে আমরা পরিশেষে অবশ্যই ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ এবং বৃটিশ পার্লামেণ্টের সভ্যবর্গকে ইহা বুঝাইতে সক্ষম হইব যে আমরা যে সংস্কারের প্রত্যাশা করিতেছি তাহা পরিমিত ও একান্ত ন্যায়ানুমোদিত এবং তাহা প্রদত্ত হইলে এ দেশের শাসন প্রণালী সমুন্নত, আমাদের সুখ শান্তি পরিবর্দ্ধিত এবং ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজ্য দৃঢ়তম ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইবে। সংস্কার কার্য্যই আমাদের উদ্দেশ্য, রাজকীয় শক্তির গতিরোধ ও শাসন প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন আমাদের উদ্দেশের একান্ত বহির্ভূত ; বৃটিশ জাতির সদাশয়তা ও উদারতা সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তদনুসারে আমার মনে এই বিশ্বাস আছে যে শ্রীযুক্ত ব্র্যাড্‌ল প্রণীত পাণ্ডুলিপির ন্যায় একটী ক্ষুদ্র বিধান—যাহাতে আমাদের দেশের শাসন কার্য্য ভার কিঞ্চিৎ পরিমাণে আমাদের হস্তে অর্পণের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, যাহাতে আমাদের দেশের শাসন প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের বাক্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে গ্রহণের আবশ্যকতা এবং আমাদের দেশের ব্যবস্থাপক সভা নিচয়ে সামান্যাকারে নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তনের উপযোগিতা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা কখনই ইংরেজ জাতির অনুরাগ আকর্ষণে অকৃতকার্য্য হইবে না।" তাঁহার বক্তৃতাবসানে চতুর্দ্দিক হইতে আনন্দ ধ্বনি উথলিয়া উঠিতে লাগিল।

অনন্তর মান্দ্রাজের প্রতিনিধি সুপ্রসিদ্ধ রাও বাহাদুর আনন্দ চার্লু সমুচ্চ মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া উৎসাহের সহিত সুযুক্তি পূর্ণ বক্তৃতায় উল্লিখিত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তিনি বলিলেন, "কথিত আছে যে কবির মনে সর্ব্বপ্রথমে যে ভাব উদিত হয় তাহাই তাঁহার হৃদয়ের সর্ব্বপ্রধান ভাব ; জাতীয় মহাসমিতির পক্ষেও সেই কথা সর্ব্বথা প্রযুজ্য হইতে পারে। প্রথম কন্‌গ্রেসেই আমরা ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার এবং উহাতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তনের জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলাম।

অনন্তর তিনি নির্ব্বাচন প্রথার উপযোগিতা বিশেষ রূপে প্রদর্শন পূর্ব্বক ব্র্যাড্‌ল

সাহেবের পূর্ব্বতন পাণ্ডুলিপি এবং লর্ড ক্রশের পাণ্ডুলিপির সমালোচন এবং ব্যাড্‌ল প্রণীত নূতন পাণ্ডুলিপির সমর্থন করিয়া উপসংহারে এই আশা প্রকাশ করিলেন,

"১৮৮১ খৃঃ অব্দে লর্ড রিপণের স্বায়ত্বশাসন আইন এদেশে প্রচলিত হইয়াছে; উহার একবৎসর পূর্ব্বে মহীসুর প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল। গতবৎসর উক্ত সভার সংস্কার সাধিত হইয়াছে; আমি ও ভরসা করি যে বিগত বর্ষে মহীসুরবাসিগণ যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, এ বৎসর আমরাও সেই অধিকার পাইব।"

তিনি উপবিষ্ট হইলে মধ্য ভারতের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত সি, বি, নাইডু বেদীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী সহকারে আশ্চর্য্য রহস্য ব্যঞ্জক বক্তৃতায় উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তৎপরে বোম্বাইর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত দাজী আবাজী খাঁড়ে, এলাহাবাদের প্রতিনিধি সুবক্তা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, লক্ষৌর প্রতিনিধি পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ধার, পঞ্চনদ ভূমির প্রতিনিধি লালা হুকুম চাঁদ, বেহারের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত সরিফুদ্দীন প্রভৃতি বক্তাগণ একে একে বেদীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া সারগর্ভ বক্তৃতার সহিত উল্লিখিত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তদনন্তর বঙ্গদেশের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন—"শ্রীযুক্ত ব্র্যাড্‌ল প্রণীত নূতন বিল আজিও আমরা অনেকেই দেখি নাই, অতএব এই প্রস্তাব আজি পরিগৃহীত না হইয়া উহার আলোচনা আগামী সোমবার পর্য্যন্ত স্থগিত হউক।....." কিন্তু সমবেত প্রতিনিধি বর্গ তাঁহার বাক্যের প্রতিবাদ উপলক্ষে বলিলেন যে অনেক দিন হইল ব্র্যাড্‌ল সাহেবের বিল প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাঁহারা সকলেই তাহা পাঠ করিয়াছেন; সুতরাং উক্ত অত্যাবশ্যক প্রস্তাব স্থগিত না রাখিয়া উহার আলোচনা সেই দিনেই শেষ করা কর্ত্তব্য। সকলের অভিমত অনুসারে উক্ত প্রস্তাব পরিসমাপ্ত ও পরিগৃহীত হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব ঃ—

বিগত কয়েক বৎসর মহাসমিতিতে নিম্নলিখিত যে সকল বিষয়ের প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছিল, বর্ত্তমান মহাসমিতি এতদ্বারা তৎসমুদায়ের পুনরনুমোদন ও নির্দ্ধারণ করিতেছেনঃ—

(ক) শাসন-বিভাগ হইতে বিচার-বিভাগ সম্পূর্ণরূপে পৃথককরণ একান্ত প্রার্থনীয়; এই দুই বিভাগের কার্য্য-ভার কোন ক্রমেই একজন কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত হওয়া উচিত নহে।

(খ) দেশের যে সকল স্থানে এক্ষণে জুরির বিচার-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তথায় উহার প্রচলন হওয়া কর্ত্তব্য।

(গ) ১৮৭২ সালে সর্ব্ব প্রথমে জুরির বিচার দ্বারা অপরাধিগণের নিষ্কৃতি রহিত করিবার যে ক্ষমতা হাইকোর্টের উপর প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার অপনয়ন হওয়া উচিত।

(ঘ) ওয়ারেণ্ট মকর্দ্দামার আসামীর ইচ্ছানুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট্ কর্ত্তৃক বিচারের পরিবর্ত্তে সেশন আদালতে উক্ত মকর্দ্দামার বিচার জন্য ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন আবশ্যক।

(ঙ) পুলিস বিভাগের বর্ত্তমান অসন্তোষ জনক অবস্থার অপনয়ন এবং উহার আমূল সুসংস্কার সাধন আবশ্যক।

(চ) ভারতবাসিগণ ভারতীয় সৈনিক বিভাগে প্রবিষ্ট হইবার উদ্দেশ্যে কোন স্থানে যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা লাভ করিতে পারে, ভারতবর্ষে তদুপযোগী সামরিক বিদ্যালয় সংস্থাপন, এবং কোন বিপদের সময় ভারতবাসিগণ যাহাতে গবর্ণমেণ্টকে সহায়তা দানে সমর্থ হয়, উপযুক্ত নিয়ম ও নিষেধের সহিত তদনুসারে তাহাদিগকে ভলণ্টিয়ার সৈন্য দলে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা প্রণয়ন।

(ছ) "ইন্‌কম ট্যাকস্" (আয়-কর) বিভাগের বিশেষতঃ একহাজার টাকার ন্যূন আয় সম্বন্ধে উহার কার্য্য প্রণালীর বর্ত্তমান একান্ত অসন্তোষ জনক অবস্থার পরিবর্ত্তন এবং যাহাদের একহাজার টাকার অনধিক বার্ষিক আয়, তাহাদিগকে উক্ত করভার হইতে মুক্ত করিয়া একহাজার টাকার অধিক আয়বান ব্যক্তির উপর উক্ত কর স্থাপনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন প্রয়োজনীয়।

(জ) বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার জন্য ব্যয় সংকোচের পরিবর্ত্তে উহা বৃদ্ধির একান্ত আবশ্যকতা, এবং উহার একটী অত্যাবশ্যক বিভাগ শিল্প শিক্ষার উন্নতি সাধন এবং দেশীয় শ্রমজীবী ব্যক্তিগণের বর্ত্তমান অবস্থার উৎকর্ষ সাধনোদ্দেশে সরকারী ও বে সরকারী লোক লইয়া একটী অনুসন্ধান সমিতি সংগঠন আবশ্যক।

(ঝ) দেশের রাজস্বের অপেক্ষাকৃত উন্নতির অবস্থার সময় লবণ কর সমান পরিমাণে প্রচলিত রাখা অন্যায় ও অসঙ্গত, সুতরাং উক্ত করের উপযুক্ত পরিমাণে ন্যূনতা সাধন একান্ত প্রার্থনীয়।

(ঞ) যুদ্ধ বিভাগের ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবার পরিবর্ত্তে হ্রাস করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

(ট) এক্ষণে সিভিল্ সার্ভিস্ প্রভৃতি যে সকল মহোচ্চ পরীক্ষা কেবল মাত্র ইংলণ্ডে পরিগৃহীত হইয়া থাকে, ভারতবাসীর প্রতি ন্যায় বিচার প্রদর্শন জন্য ঐ সকল পরীক্ষা অতঃপর ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে উভয় স্থানেই গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন আবশ্যক।

(ঠ) ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে প্রচলিত ১১ আইন অর্থাৎ অস্ত্র আইনের সমস্ত ধারা গুলি ভারত ভ্রমণকারী অথবা ভারতবাসী সকল শ্রেণীর লোকের প্রতি সমান ভাবে

প্রয়োগ করা উচিত। যেখানে বন্য জন্তু সকল মনুষ্য, গৃহ-পালিত পশু এবং শস্য নাশ করে, সেই স্থানে অকুণ্ঠিত ভাবে অস্ত্র ব্যবহারের লাইসেন্স দেওয়া কর্ত্তব্য, উহা অপব্যবহারের কথা বিশেষ রূপে প্রমাণিত না হইলে উক্ত ক্ষমতা প্রত্যাহার করা উচিত্ নহে। বৎসরান্তে অথবা ছয়মাসান্তর নূতন লাইসেন্স গ্রহণের নিয়ম রহিত করা আবশ্যক এবং অস্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধীয় লাইসেন্স দানের ব্যবস্থা কেবল মাত্র জেলাতে নয় কিন্তু সমস্ত প্রদেশে বিদ্যমান রাখা একান্ত প্রার্থনীয়।

(ঙ) ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতি গবর্ণমেণ্টের আর একবার মনোযোগ প্রদান করা আবশ্যক; ভূমি সম্বন্ধীয় খাজানার চিরস্থায়ী কর নির্দ্ধারণ জন্য বিশেষতঃ যে সকল প্রদেশে অধিবাসীর সংখ্যা অত্যধিক এবং যে সকল স্থানের ভূমি সমধিক উর্ব্বর তথায় অচিরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রণয়ন একান্ত আবশ্যক।

বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ সুমধুর বক্তা শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুললিত ভাষায় সুন্দরযুক্তি ও তেজস্বী বাগ্মীতার সহিত উল্লিখিত একত্র-গ্রথিত প্রস্তাব নিচয়ের অবতারণা করিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমেই হাস্যরসাত্মক বাক্যে এইরূপে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আমি আপনাদের অমনিবস্ গাড়ীর পুরাতন পরিচালক; এ গাড়ীতে কত লোকের স্থান হইবে তাহা নির্দ্ধারণের জন্য বোধ হয় শীঘ্রই একখানি আইন প্রণয়ন করিতে হইবে। গাড়ীর যাত্রীদিগের টিকেট পরীক্ষার জন্য বিলম্ব অনাবশ্যক, কারণ তাহারা সকলেই আপনাদের নিকট সুপরিচিত। শাসন-বিভাগ হইতে বিচার-বিভাগ পৃথককরণ প্রভৃতি ত্রয়োদশটী যাত্রী আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিবার জন্য আমি নিযুক্ত হইয়াছি। ঐ সকল প্রস্তাব গত কয়েক বর্ষের মহাসমিতিতে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছিল, আজি সেই গুলির পুনরায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। আমি ক্রমে তাহাদিগকে আপনাদের সম্মুখে আনয়ন করিতেছি ...... " এই বলিয়া তিনি দক্ষতার সহিত অকাট্য যুক্তি প্রভাবে প্রস্তাব গুলির একে একে অবতারণা ও সমর্থন করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার মোহিনী শক্তি ও সুশৃঙ্খলা প্রভাবে সমবেত প্রতিনিধি-বর্গ যার পর নাই পরিতৃপ্ত হইলেন এবং বক্তৃতার উপসংহার কালে যখন তিনি প্রফুল্ল আননে "আমার গাড়ী উহার গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং চালকের কার্য্যও শেষ হইল" এই কথা বলিয়া বেদী হইতে অবতরণ করিলেন, তখন ক্ষণকালের জন্য চতুর্দ্দিক হইতে গভীর আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মান্দ্রাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ আয়ার উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন জন্য মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইলেন, এবং সুযুক্তি পূর্ণ বক্তৃতায় উহার পোষকতা করিয়া বলিলেন যে মান্দ্রাজের বিচক্ষণ গবর্ণর শাসন কার্য্য ও বিচার কার্য্য একজন কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত রাখা অন্যায় বিবেচনায় উক্ত কার্য্যভার পৃথক পৃথক ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।

তিনি উপবিষ্ট হইলে পর বোম্বাইর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত জি,এস, খাপর্দ্দি হাস্যরসোদ্দীপক সুযুক্তি পূর্ণ বক্তৃতায় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। তদনন্তর পঞ্চনদ ভূমির প্রতিনিধি লালা ধরমদাস, এলাহাবাদের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত মুন্সি সদরুদ্দীন এবং হুগলীর প্রতিনিধি বাবু বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় একাদিক্রমে উল্লিখিত প্রস্তাবের সমর্থন করিলে উহা সর্ব্বসম্মতি ক্রমে পরিগৃহীত হইল

তৃতীয় প্রস্তাব ঃ—

এই মহাসমিতি সম্মান পুরঃসর এই আশা প্রকাশ করিতেছেন যে, পূর্ব্বে ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সংক্রান্ত বিবরণ পার্লামেণ্টে উপস্থিত করিবার জন্য সভাপতির আসন পরিত্যাগের পূর্ব্বে ভারতবাসীর অভাবের বিষয় আলোচিত হইবার যে নিয়ম বিদ্যমান ছিল, ভারতবাসিগণের মঙ্গলের জন্য হাউস্ অব্ কমন্স অচিরে সেই নিয়ম পুনরায় প্রচলিত করিবেন এবং উক্ত সমিতি উৎসাহ পূর্ণ অন্তরে এই বিশ্বাস পরিপোষণ করেন যে, ভবিষ্যতে উক্ত সভা এমন সময়ে ভারতীয় বার্ষিক আয় ব্যয়ের বিবরণ আলোচনার্থে গ্রহণ করিবেন যাহাতে তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ রূপে যথারীতি বাদানুবাদ হইতে পারে। মহা সমিতির সভাপতি এই প্রস্তাবের মর্ম্মানুসারে একখানি আবেদন প্রস্তুত করিয়া মহাসমিতির পক্ষে স্বাক্ষর পূর্ব্বক হাউস্ অব্ কমন্স সভায় প্রেরণের ভার প্রাপ্ত হউন।

পার্লামেণ্টের সভ্য, সুপ্রসিদ্ধ সুরাবৈরী শ্রীযুক্ত কেন্ সাহেব উক্ত প্রস্তাবের অবতারণা করিতে সমুচ্চ মঞ্চে দণ্ডায়মান হইবা মাত্র সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শক বর্গ গভীর আনন্দের সহিত তাঁহাকে অভিবাদন দান করিলেন। তিনি উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন;—"এই প্রস্তাব গত কয়েক বৎসরের মহাসমিতিতে গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু আশানুরূপ ফল লাভ হয় নাই—বোম্বাই নগরের মহাসমিতি হইতে তৎসম্বন্ধে যে আবেদন প্রেরিত হইয়াছিল, পার্লামেণ্ট তাহাতে কিছু মাত্র আস্থা প্রদর্শন করেন নাই। অতএব উক্ত প্রস্তাব পুনর্গৃহীত হওয়া একান্ত আবশ্যক। পার্লামেণ্ট মহাসভার প্রতিষ্ঠাকাল হইতে উহার সভ্যগণ যে অধিকার ভোগ করিয়া আসিয়াছেন তাহা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন। আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় বিষয় উত্থাপনের অধিকার মহাসভার সভ্যগণ সহজে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। ভারতবাসীর অনুযোগের নিঃসন্দেহ যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান আছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বার্ষিক সমস্ত রাজস্ব সম্বন্ধীয় আয় ব্যয়ের হিসাব গ্রীষ্মকালের এমন সময় আলোচনার জন্য উপস্থাপিত করা হয় যে সময় পার্লামেণ্টের অনেক সভ্য গ্রীষ্মাধিক্য বশতঃ সহর পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীতল বায়ু সেবনার্থে সুবিধাজনক স্থানে গমন করেন। ভারতবাসীর প্রতি এই অন্যায় ব্যবহার অনেকদিন হইতে অবাধে চলিয়া আসিতেছে। আয় ব্যয়ের

বিবরণ ভিন্ন পার্লামেণ্টে ভারতবর্ষের অপর কোন বিষয়ের আলোচনা এক প্রকার অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মহাসভার সভ্যগণ স্বদেশের বিষয় লইয়া এতই ব্যস্ত যে ভারত সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনায় তাঁহাদের কিছুমাত্র অবসর ও আস্থা দেখা যায় না। স্থূর্ত্তি খেলার নিয়ম অনুসারে যে বিষয়ের প্রস্তাব প্রথম উঠে তাহাই সর্ব্বাগ্রে আলোচিত হইয়া থাকে। মঙ্গলবার ও শুক্রবার প্রায় দুই শত সভ্য মহাসভায় আপন আপন অভিমত বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত থাকেন, তৎকালে ভারতীয় বিষয়ের আলোচনা নিতান্ত অসম্ভব। বর্ত্তমান পার্লমেণ্টে ব্র্যাড্‌ল সাহেব প্রণীত পাণ্ডুলিপি সবিশেষ আলোচিত হইবার সম্ভাবনা অতিঅল্প—স্থূর্ত্তি খেলা অনুসারে এই বিষয় অগ্রে না আসিলে উহার আলোচনা হইবে না—স্থূর্ত্তিখেলায় ব্রাডল সাহেবের কপাল বড়ই মন্দ। ১৮৮৮ খৃঃঅব্দের পূর্ব্বে বার্ষিক আয় ব্যয় বিষয়ক বিবরণ আলোচিত হইবার পূর্ব্বে সভ্যগণ ভারতবর্ষের অভাব সম্বন্ধীয় বিষয়ের আলোচনা করিতে পারিতেন। গত পাঁচ বৎসর হইতে সভাগণের মধ্যে অনেকেই বিশেষতঃ উদার নৈতিক দলের মধ্যে অনেক রাজনীতি বিশারদ ব্যক্তিগণ ভারতীয় বিষয়ে বিশেষতঃ জাতীয় মহাসমিতির কল্যাণার্থে অধিক পরিমাণে অনুরাগ ও আস্থা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। সভ্যগণের দায়ীত্ব দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে সত্য, কিন্তু তাঁহাদের ভারতবাসীর দুরবস্থা বিমোচনের ক্ষমতা কমিতেছে ভিন্ন বাড়িতেছে না। এবৎসর যদি এতশীঘ্র পার্লমেণ্টের অধিবেশন না হইত তাহা হইলে উহার ত্রিশ চল্লিশ জন সভ্য ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক স্বচক্ষে ভারতবাসীর অবস্থা দর্শন ও ভারতীয় বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতেন। বড়ই সুখের বিষয় এই যে পার্লামেণ্টের একজন সভ্য আজি দর্শক স্বরূপে মহাসমিতিতে উপস্থিত আছেন। জাতীয় মহাসমিতি এবং হাউস্ অব কমন্স ভিন্ন ভারতের অভাব ও দুরবস্থা আলোচনার উপায় আর নাই। পার্লামেণ্টের কোন সভ্য এদেশে আগমন করিলে এদেশের অধিবাসিগণ সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে সকল সভ্য এদেশে আগমন করেন তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের প্রীতি লাভে অসমর্থ হন; তাঁহারা এদেশে সুশাসন বিস্তার এবং এদেশের অধিবাসিবর্গের সুখশান্তি বর্দ্ধনের জন্য সাধ্যানুসারে সহায়তা দানে অগ্রসর হন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সদুদ্দেশ্য ও সৎকার্য্য বুঝিতে পারেন না। দুই বৎসর পূর্ব্বে পার্লামেণ্টের সভ্যগণ ভারতীয় গবর্ণমেণ্টকে আবকারী বিভাগ সম্বন্ধে যে সদুপদেশ দান করিয়াছিলেন এক্ষণে তৎপালনের চেষ্টা হইতেছে। একটী উপায় অবলম্বন করিলে গবর্ণমেণ্ট এই সকল ভারত পর্য্যটক সভ্যগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন—তাঁহারা নিজের দেশের ভাবনায় এত ব্যস্ত যে ভারতের অবস্থা ঘটিত বিষয়ে তাঁহাদের মনোনিবেশের অবসর অতি অল্প—জাতীয় মহাসমিতি যাঁহাদের মুখপাত্র তাঁহারা যতদিন স্বদেশ শাসনে ক্ষমতা না পাইবেন পার্লামেণ্টের সভ্যগণ ততদিন ভারত গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতি

হস্তার্পণ করিতে বাধ্য হইবেন। অদ্যকার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে ভারত ভ্রমণকারী সভ্যগণের কার্য্য শেষ হইয়া আসিবে, গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। ভারতবাসিগণ যখন স্বদেশের শাসন কার্য্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অধিকার পাইবে তখন ভারত পরিভ্রমণকারী সভ্যগণের সহায়তা আর আবশ্যক হইবে না— তখন ভারতবাসী স্বয়ং স্বকীয় বিষয় সহজেই সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে।" সহৃদয় কেন্ সাহেবের এই সুযুক্তি পূর্ণ তেজস্বী বক্তৃতায় সকলেই যার পর নাই পরিতৃপ্ত হইয়া গভীর আনন্দের সহিত তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে পরে কলিকাতা নিবাসী পার্সিবণিক শ্রীযুক্ত আর, ডি, মেটা এবং চতুর্থ মহাসমিতির সহৃদয় ও সুযোগ্য সভাপতি শ্রীযুক্ত জর্জ ইয়ুল একে একে বেদীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া সুযুক্তি পূর্ণ বক্তৃতায় উল্লিখিত প্রস্তাবের অনুমোদন ও সমর্থন করিলেন। পরিশেষে উহা সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল।

চতুর্থ প্রস্তাব ঃ—

এই মহাসমিতির আবেদন অনুসারে ভারত সচিব এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট আবকারী বিভাগের যে সকল সংস্কার সাধন করিয়াছেন, বিশেষতঃ বিদেশীয় ও দেশীয় সুরার মাসুল বৃদ্ধি, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খোলাভাটির উচ্ছেদ এবং মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১৮৮৯—৯০ খৃঃ অব্দে ৭ হাজার মদের দোকানের অস্তিত্ব লোপ প্রভৃতি সৎ-কার্য্যের জন্য মহাসমিতির বিশেষ আনন্দ জন্মিলেও ১৮৯০ সালের ১লা মার্চ্চ তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ১০৩, ১০৪ ও ১০৫ প্রকরণ অনুসারে কার্য্য না হওয়ায় বিশেষতঃ মদের দোকান স্থাপন ও রহিত করণ সম্বন্ধে স্থানীয় অধিবাসিগণের মত গ্রহণ পূর্ব্বক তৎপ্রতি যথা সম্ভব আস্থা প্রদর্শন বিষয়ে উক্ত পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল এ পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যে পরিণত না হওয়া নিবন্ধন এই মহাসমিতি নিতান্ত দুঃখের সহিত ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহে যাহাতে উক্ত পত্রের মর্ম্মানুসারে সম্পূর্ণ রূপে কার্য্য সাধিত হয় তাহার বিহিত চেষ্টা হউক।

বোম্বাইর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত ডি, ই, ওয়াচা এই প্রস্তাবের অবতারণার জন্য বেদীর উপরে দণ্ডায়মান হইয়া উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন;—এই তৃতীয়বার আমি মহাসমিতিতে আবকারী সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি। এই প্রস্তাব সর্ব্ব-প্রথমে এলাহাবাদে চতুর্থ মহাসমিতিতে উত্থাপিত হয়—তখন মদ্য পানের প্রাদুর্ভাব দর্শনে আমরা আবগারী বিভাগের কার্য্য তদন্তের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট একটী কমিসন নিয়োগের প্রার্থনা করি। উক্ত প্রস্তাব হইতে এই এক সুফল জন্মিয়াছিল যে অবিচলিত অধ্যবসায়শালী শ্রীযুক্ত কেন্ পার্লামেণ্টে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে ঘোরতর আন্দো-

লন আরম্ভ করেন। তাঁহার ও তৎসহযোগী শ্রীযুক্ত শ্যামুয়েল স্মিথের অবিশ্রান্ত যত্নে ১৮৮৯ সালের ৩০ শে এপ্রিল তারিখের বিখ্যাত প্রস্তাব পার্লামেণ্টে গৃহীত হয়। ইতি-মধ্যে মহাসমিতির দুইটী প্রস্তাব পার্লামেণ্ট কর্তৃক গ্রাহ্য হইয়াছে—একটী আবকারী এবং অপরটী রৌপ্যের বাসন সম্বন্ধীয় প্রস্তাব।"

অনন্তর ভারত গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট নিচয়ের যত্নে এ পর্য্যন্ত আবকারী বিভাগে কি কি সংস্কার সাধিত হইয়াছে এবং বোম্বাই গর্ণমেণ্ট উহার প্রতি কিরূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমস্ত বিশেষ রূপে উল্লেখ করিলেন। বোম্বাই গবর্ণ-মেণ্টের অর্থ লাভই প্রধানতম লক্ষ্য, সুতরাং তথায় সুরাপান অধিকতর পরিমাণে প্রশ্রয় পাইয়াছে, ইহা তিনি দুঃখের সহিত উল্লেখ করিলেন।

তিনি উপবিষ্ট হইলে পর দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত কাশীনাথ নাথু সারগর্ভ বক্তৃতায় উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন এবং পঞ্জাবের প্রতিনিধি লালা মুরলীধর অদ্ভুতহাস্য রসোদ্দীপক বক্তৃতায় উহার সমর্থন করিলেন, তদনন্তর অমৃতসরের প্রতিনিধি বাবা প্রতাপসিংহ তেজস্বী উর্দ্দু ভাষায় জ্বলন্ত উদ্দীপনার সহিত উহার পোষকতা করিলে পরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব পরিগৃহীত হইল। তখন বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং সেদিনকার জন্য মহাসমিতির কার্য্য বন্ধ হইল; প্রতিনিধি ও দর্শকগণ আনন্দের সহিত দলে দলে মণ্ডপের বহির্ভাগে আগমন করিয়া বিশাল উদ্যানের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ।

মালা।

কমলা।

(আমাদের কমলা—দশবছরের মেয়ে, কমলা এজগতে নাই। আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া সে চলিয়া গিয়াছে? বঙ্গের হরিমৈতিগণ ও পুরোহিত * চূড়ামণিগণ জীবিত থাকুন, আমাদের কমলা কোন্ রোগে মরিল জানাইবার আবশ্যক করে না। হে বঙ্গের নব্য চূড়ামণিগণ! তোমরা শুনিয়া সুখী হইবে যে কমলার আর একটি ছোট বোন আছে। তোমরা তীক্ষ্ণ ছুরিকা শানাইয়া রাখ; দেখিও যেন Age of consent Bill পাশ না হয়।)

১

খুড়ি জেঠি মাসি পিসি, কমলারে দিল ঠেলি,
কমলা ভিতরে গেল চলি;

---

* বলা বাহুল্য যে চূড়ামণি শব্দ ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই। লেখক।

মাসি পিসি হেসে হেসে, দুয়ার করিয়া বন্ধ,
　　লাগাইল লোহার শিকলি,

২

কিছুই জানিনা আমি, হায় সেই কাল রাত্রে
　　কেন হ'ল হাহাকর ধ্বনি ?
আর্য্যামিতে আর্য্যমন্ত, ন্যায়শাস্ত্রে ন্যায়বন্ত
　　সব জানে ওই চূড়ামণি।

৩ ও ৪

আমি শুধু এই জানি, উঠানের এক পাশে
　　সুখে ছিল কুসুম কলিকা ;
এখনো বালিকা আহা, অতি মৃদু বাস ঝরে ;
　　কিন্তু এক ক্রুর পিপীলিকা
উঠি ক্ষুদ্র চারা গাছে, কুসুমের মর্ম্মে পশি,
　　দংশিল সে কচি কলিকায়,
জর্জ্জর হইল তনু, লাবণ্য ঝরিয়া গেল,
　　পুষ্পটি উবিয়া গেল হায় !

৫

শনৈশ্চর হাসি কহে, "আজি হ'তে বঙ্গ ঘরে
　　আমিই প্রধান সেনাপতি"
ভালের সিন্দুর মুছি, বঙ্গ লক্ষ্মী কাঁদি কহে
　　"আজি মোর ফুরাল এয়োতি"

৬

আহা ! আহা ! মাসি পিসি, তোমরা গো কাঁদ কেন ?
　　চূড়ামণি বেঁচে থাক্ খালি !
কমলার বোন্‌টিরে, পিঁপিড়ার করে দিয়ে,
　　আবার করিও ঘটকালি !

যমুনা।

("যমুনা" একটি হিন্দুস্থানি বিধবা। সম্প্রতি সে পাগল হইয়া গিয়াছে। কেন জান ? সে আপনার মৃত স্বামীর খড়াঁউ (খড়ম) যত্নের সহিত তুলিয়া রাখিয়াছিল। তাহার এক পাষণ্ড দেবর আছে, সে ঐ পাদুকাযোড়াটি কাড়িয়া লয়। দেখ, আমি লোকটা নিরীহ ভাল মানুষ, সহজে রাগি না ; কিন্তু আমি যখন শুনিলাম যমুনা পাগল

হইয়া গিয়াছে তখন ইচ্ছা হইল, সেই অসুর-প্রকৃতি দেবর মহাবীর ওঝাকে আচ্ছ করিয়া প্রহার করি। স্বয়ং ভগবানই সে কাজ করিয়াছেন। মহাবীর ওঝার দুর্দ্দশা সীমা নাই)

১

"বাদল্ গরজত্, বিজুলি তড়পত্
সঁইয়া বিনু ধড়কত্ ছতি—য়া"
পিসিতে পিসিতে জাঁতা, শ্রাবণে কজরি গায়
দূরে, ওঝা-পাঁড়েজির প্রিয়া!
সেই সঙ্গে মহাহাস্যে, পাগল যমুনা গায়
"খড়াঁউ হমার গয়া,
খড়াঁউ হমার গয়া,
খো-গয়া, খো-গয়া রে"

২

মহাবীর ওঝা হায়, ভাবিয়ে হইল সারা
কোন্ চোর পশিয়াছে ঘরে!
টাকা কড়ি নোট বস্ত্র, তৈজস ও অলঙ্কার,
একে একে সব পড়ে স'রে!
মকোদ্দমা হবে কাল, দলিল ও দস্তাবেজ
অকস্মাৎ গেল রে উড়িয়া!
ওঝা করে "হায় হায়" পাগল যমুনা গায়
"খড়াঁউ হমার গয়া,
খড়াঁউ হমার গয়া,
খো-গয়া খো-গয়া রে!"

স্বর্ণলতা।

(সারাদিন বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমিও তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার সময়ে সেই সপ্তবর্ষীয়া ক্ষুদ্র স্বর্ণলতা—প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্ণলতা—প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তাহার হাতে দুটি পয়সা ছিল; তাহার মাতাল পিতা আসিয়া মদ খাইবার জন্য সেই পয়সা দুটি চাহিল। কন্যা দিল না; মাতাল পিতা সক্রোধে, সজোরে, তাহার বক্ষে পদাঘাত করিল। কন্যা রক্ত বমন করিয়া মরিয়া গেল, কিন্তু "বাবা মারিয়াছে" একথা প্রকাশ করে নাই। হে বঙ্গের মাতাল! ইংরাজের খোলাভাটি ও তোমার কীর্ত্তি অক্ষয় থাকুক্ আমার এই ক্ষুদ্র লেখনীর প্রতি যদি দেবতার অভিশাপ না থাকে, তাহা

হইলে আজ তোমার ঐ বীরাঙ্গনা কন্যা স্বর্ণলতার নাম বাঙালির ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে, প্রতি নর নারীর মুখে উচ্চারিত হইবে। আর তুমি—তোমাকে সৎপরামর্শ দিতেছি, পবিত্র জাহ্নবীর জলে গিয়া হস্ত প্রক্ষালন কর। শুনিয়াছি, ভাগীরথীর অপার মাহাত্ম্য; তাঁহার স্পর্শে শিশুহন্তারও গতিমুক্তি হয়। কিন্তু আমার ভয় হইতেছে, তুমি, আজ যে পাপ করিয়াছ, তোমার হস্তে ঐ রক্তের দাগ সমস্ত বঙ্গসাগরের জল দিয়া ধৌত করিলেও যাইবার নহে।)

১

ছোট ভাই বলে তার "দিদি গো কাঁদিস কেন ?
ভেঙে বুঝি গিয়েছে খেলনা ?"
ধবল অধরে আহা, হাসিয়ে মলিন হাসি,
বালা কহে "কিছু না কিছু না"

২

হেরিয়ে সে শাক মূর্ত্তি, রাহুগ্রস্ত শশি যেন,
মাতা কহে "একি মা! একি মা!"
ধরিয়ে মায়ের গলা, ফেলি দুটি অশ্রুবিন্দু,
কন্যা কহে "কিছু না কিছু না"

৩

লোকে হ'ল লোকারণ্য, ডাক্তার কহিছে ধীরে
"কি হয়েছে বল মা বল মা"
হলকে হলকে আহা বুক দিয়া রক্ত ছোটে !
বালা কহে "কিছু না কিছু না"

৪

অবিরল বৃষ্টি পড়ে, গুরু গুরু গরজন,
থেকে থেকে চমকে চপলা !
শাল তাল তরু চয়, সত্রাসে দাঁড়ায়ে রয় ;
একি ঘোর বিদ্যুতের খেলা !

৫

কি বিকটী কি আওয়াজ ! পড়িল পড়িল বাজ
কোন্ উচ্চে ? কোন তরুশিরে ?
চারিধারে অন্ধকার, উজ্জ্বল দেবের রোষ
পড়ে গিয়া গৃহস্থের ঘরে !

৬

মাঠে ছিল শাল তরু——দেব ক্রোধ সংহারিল
উঠানের ক্ষুদ্র সহকারে !
সেই সঙ্গে সুকুমার সোণার লতিকা আহা
ভস্ম হ'ল অশনি প্রহারে !

এই নাও।

(তোমরাও চক্ষের জল ফেল। আমার চোখ ভিজিয়া আসিতেছে। ঐ শোন, অর্দ্ধ ক্লিপ্ত বঙ্গের বিধবা মৃত স্বামীর চরণ বক্ষে জড়াইয়া কি বলিতেছে।)

সকলি'ত হইল স্বপন!
তোমার সহিত নাথ, ইহ জনমের সাধ
চিতায় করিল আরোহণ!
এই নাও—
অভাগীর রূপ নাও, সিন্দুরের কৌটা নাও,
নাও নাও বসন ভূষণ।
এই নাও—
অন্ধকার একরাশ, নিবিড় এ কেশপাশ
করিত যা চরণ চুম্বন।
এই নাও—
কটাক্ষে চাহনি নাও, অধরের মৃদুহাসি,
নাও নাও ললিত গমন।
এই নাও—
তোমার সহিত নাথ, গান গেয়ে সারা রাত
বাসন্তী পূর্ণিমা জাগরণ!
এই নাও—
সোহাগে কথার ছল, মানের নেশার ঝোঁকে
তব বক্ষে মস্তক স্থাপন!
এই নাও—
দুবেলার অন্ন নাও, শুষ্ক পিপাসার বারি.
এয়োতের ব্রত উদ্যাপন!
সকলি সহজে নিলে; প্রাণনাথ, প্রাণধন,
বল, বল, ধরি দুচরণ,
কেবলি কি সারহীন, অতি তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ,
হায় এই দাসীর জীবন?
স্বপনেও কভু হেলা কর নি দাসীর কথা;
প্রাণনাথ, তবে কি কারণ
চরণে ঠেলিয়া দাও দাসীর জীবন?

(তোমরা চক্ষের জল মুছিয়া ফেল। দিন কতকের পর বিধবাও স্বামীর পদানুসরণ করিবে। তখন "এইনাও" বলিয়া স্বর্গের দিব্যাঙ্গনারা বিধবার কণ্ঠে জয়মাল্য অর্পণ করিবে। তোমরাও পুষ্পবৃষ্টি করিতে ভুলিও না।)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

নবযুগ।

আজকাল বিশ্বজনীন আত্মীয়তা অর্থহীন একটি রহস্যবাক্য, কিন্তু এই বাক্যের যখনি জন্ম হইয়াছে তখনি ইহার প্রকৃত ভাব যে অঙ্কুররূপে মানব মনে দেখা দিয়াছে, এবং কালে সংসারের উন্নতির গতির নিয়মে এই মহাভাব যে দেশধর্ম্ম জাতি অতিক্রম করিয়া সমগ্র মনুষ্য জাতির মধ্যে এক নবযুগ আনয়ন করিবে—তাহা আকাশ কুসুমের মত অলীক কল্পনা মাত্র নহে।

মানবজাতির আদিম অবস্থা হইতে ক্রমে সভ্যাবস্থায় আসিবার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে কি পাওয়া যায়? বর্ব্বরতার প্রথম অবস্থায় মানুষ কেবল আপনাকে লইয়া আপনার স্বার্থ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত ছিল, আপনা হইতে ক্রমে পরিবার, দল, সমাজ, ধর্ম্ম, দেশ এই সকল সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া আমরা বর্ত্তমান সভ্যতায় আসিয়াছি। এখন দেখা যায় উক্ত সমস্ত বন্ধন-পরম্পরা উল্লঙ্ঘন করিয়া কেবলমাত্র ভাবের মিলে যে একটি স্বতঃ আত্মীয়তা সম্পর্ক জন্মে—তাহা আরো সূক্ষ্মতর ও দৃঢ়তর হৃদ্যতা। বিদেশীয় কাব্য সাহিত্য পাঠ করিতে করিতে এই কথার সত্যতা আমরা হৃদয়ঙ্গম অনুভব করি। টেনিসনের সহিত আমাদের দেশগত জাতিগত বা ধর্ম্মগত কোন সম্পর্ক নাই কিন্তু তাঁহার কবিতার মধ্যে যখন আমরা আমাদের মনের কোন ভাবের প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই তখন কি তাঁহাকে আমাদের অন্তরতম বন্ধু বলিয়া মনে হয় না। ইহা ব্যক্তি বিশেষের সহিত ব্যক্তি বিশেষের ভাবের মিলে আত্মীয়তা। ইহা অপেক্ষা প্রশস্ততর, অর্থাৎ ভাবের মিলে দেশগত আত্মীয়তার দৃষ্টান্ত কন্‌গ্রেস। ভারতবর্ষ চির কাল শতাধিক জাতিতে, সম্প্রদায়ে, ধর্ম্মে, বিচ্ছিন্ন—কেহ কাহারও সহিত আচার ব্যবহার করে না কাহারও সহিত কাহারও কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু আজ এক ইংরাজ শাসনের অধীনে আসিয়া এক রাজনৈতিক ভাবের মিলে সমস্ত ভারতবর্ষ এক। আর জাতি ধর্ম্ম দেশ সমস্ত ছাড়িয়া কেবল মানুষ বলিয়া নিস্বার্থ আত্মীয়তার একটী ফল দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ। উইলবারফোর্স যখন দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদ করিতে যত্নবান হইলেন তখন তাঁহার মনে কি ভাব ছিল? বর্ব্বর আমেরিকাবাসীর সহিত তাঁহার কিম্বা যাঁহাদের সাহায্যে তিনি এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত করিতে সক্ষম হইলেন তাহাদের কোন প্রকার মনের মিল পর্য্যন্ত ছিল না কেবল তাহারাও মানুষ এই বিস্তৃক ভাবের আকর্ষণে তাঁহারা কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একপক্ষে যেমন ইহাঁরা কোন বন্ধন না থাকা সত্বেও তাহাদের কষ্ট অনুভব করিয়াছেন, অপর পক্ষে আর একটী চিত্র দেখ। আমেরিকাবাসীর মধ্যেই দুটী দল হইয়া এক দল দাসত্ব প্রথা উঠাইয়া দিতে এক দল রাখিতে ইচ্ছুক হইয়া আত্মীয়ে আত্মীয়ে পরস্পর সংগ্রাম-প্রবৃত্ত হইল। যাহারা দাসত্ব প্রথার

বিপক্ষ, তাহাদের মনে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব জাগ্রত হইয়া তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র রক্ত বা দেশ সম্বন্ধীয় সঙ্কীর্ণ ভ্রাতৃভাব ডুবিয়া গেল। ক্রমে আমরা আরও যত উন্নতির পথে অগ্রসর হইব এই ভাব যে আমাদের মনে ততই বিকসিত হইয়া উঠিবে, সমুদয় মানব-জাতিকে আমরা মানুষ বলিয়া জ্ঞান করিতে শিখিব, ইহা কি এতই আশ্চর্য্যের বিষয়! প্রকৃত পক্ষে আমাদের অজ্ঞাতসারে আমরা এই ভাবের দিকে অগ্রসর হইতেছি। এই ভাবই আমাদের লক্ষ্য, এই কারণেই যে দুই এক জন ক্ষণজন্মা ব্যক্তি এই ভাবকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া মনুষ্যত্বের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন তাহাদিগকে আমরা পূজা করি, সেই জন্যই যীশুখ্রীষ্ট ও বুদ্ধদেব প্রভৃতি মহাত্মাগণের আমাদের নিকট এত সম্মান, আর সেইজন্যই কোন কোন দিব্যদর্শী কবির ভবিষ্যৎবাণী শুনিয়া আশ্বাস জন্মিতেছে, সে সে যুগ বহুদূরবর্ত্তী নহে, যে দিন সকলেই এই জাতিধর্ম্ম দেশাতীত বিশ্বজনীন ভ্রাতৃ-ভাবের অধিকারী হইবেন।

আমেরিকান কবি হুইটমান কাব্য সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রকাশ করিতে গিয়া কহিয়া-ছেন—

That there is some unborn poetry different from anything formulated in any verse, but what it will be and how no one knows:—one thing, it must run through entire humanity (this new word and meaning solidarity has arisen to us moderns) twining all lands like a divine thread, stringing all beads, pebbles or gold, from God and the soul, and like God's dynamics and sunshine illustrating all and having reference to all.

ইহার ভাবার্থ এই, এপর্য্যন্ত কবিতার রাজ্যে যে সকল ভাব রাজত্ব করিয়াছে, তৎ ব্যতীত আরো একটি ভাব আছে যাহা এখনো দেখা দেয় নাই। কিন্তু ইহা কি এবং কি প্রকারেই বা প্রকাশ পাইবে কেহ জানে না, তবে এ সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে—যে এই ভাব সমস্ত মানব জাতির মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া মুক্তা-স্বর্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত অলঙ্কারের ন্যায়—ঈশ্বর দেবতা এবং আত্মা হইতে সমস্ত সংসারকে দৈব্য সূত্রের ন্যায় একত্র গ্রথিত করিবে, ঈশ্বরের গতির নিয়ম এবং সূর্য্য কিরণের ন্যায় সকলকেই প্রতি ফলিত করিবে—এবং সকলের সহিত সম্পর্ক রাখিবে।

বোল্‌তা।

আমি বোল্‌তা—আপনার ক্ষুদ্র বিজন চাকটির মধ্যে জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ সমাহিত করিয়া নিরিবিলি কাল যাপন করি। আমার চাকের বাহিরে তোমাদের বিপুল সংসার—জীবন-সংগ্রাম, প্রবল উদ্যম, বৃহৎ অনুষ্ঠান। আমার এ সকল তেমন পোষায় না, সুতরাং চাকের মধ্যে বসিয়া বিরলে এই কনক-লাবণ্যের নশ্বরতায় কোনও প্রকারে ডুবিয়া থাকি। তোমাদের কাজকর্ম্ম আছে, তোমরা হাস খেল, আপন বিবশ আনন্দে অধীর হইয়া উঠ, নিভৃত চাকপ্রান্ত হইতে একবার উঁকি মারিয়াই আমি সরিয়া যাই। আমার এ জীবনে ত আর সংসারের কোনও উপকার নাই। কিন্তু জীবনসংগ্রাম আমাকেও ছাড়ে না—আমাকেও চাক ছাড়িয়া এক একবার বাহির হইতে হয়। তোমাদের সাসীবদ্ধ হাস্যালাপের বাহিরে তৃণভূমি হইতে আমি রস সংগ্রহ করিতে আসি, এক একবার সাসীর নিকটে আসিয়া হৃদয়ের বিজন বেদনা জানাইয়া তোমাদের ঐ চির-আনন্দের মধ্যে একটুকু স্থান প্রার্থনা করি, কিন্তু আমার বেদনা কেহ বুঝে না, আমার কথা কেহ শুনে না, আমি আবার যেমন তেমনি ম্লানমুখে আপনার চাকে ফিরিয়া যাই। তোমরা কেবল আমার বাহিরের কনক-কান্তি দেখিয়া মুগ্ধ হও, অন্তরের গভীর জ্বালা বুঝ না। তাই আপনার দারুণ অন্তর-জ্বালা লইয়া একা একা চাকের মধ্যেই আমি থাকি ভাল। এ সজন সংসার আমার জন্য নহে।

এ সংসারে আমি কেবল উপমা খাটাইতেই আসিয়াছি। ক্ষীণমধ্যার তনু-সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করিতে হইলে আমার গঠন লইয়া টানাটানি পড়ে, গৌরাঙ্গী আমার বর্ণের আভা লইয়া আপনার রূপ বিস্তার করেন, আর আমার হুলের সহিত কোন্ রমণী-রসনার না উপমা খাটে? কিন্তু ঢেঁকির স্বর্গেও সুখ নাই। এত করিয়াও মহিলা সমাজে আমার প্রতিপত্তির মধ্যে অঞ্চল-তাড়না। এক বুঝিতাম, ভ্রমরের মত বসন্তের কাব্যকুঞ্জে আমারও একটু স্থান হইবে, তাহা হইলে না হয় মরমের অশ্রু মরমে রুধিয়া নীরবে এ বেদনা সহিয়া যাইতাম। আমাকে নহিলে চলিবে না, তাই আমার প্রতি বুঝি এই ব্যবহার! এবার অবধি তবে রূপসীরা ভ্রমরের সহিত তাঁহাদের রূপের উপমা দিবেন। আমি চাকের মধ্যে নিরুপদ্রবে বাস করিব, আর বড় বাহির হইবার সাধ নাই।

এ পোড়া অদৃষ্টে বাহির হইলে লাঞ্ছনা বৈ আর ত কিছু মিলে না। তোমাদের মধ্যে আমার হুলের দংশন-জ্বালার কথাই শুনিতে পাই—যেন দংশন ভিন্ন ধরণীতে হুলের আর কাজ নাই—কিন্তু এই হুলের দংশন-জ্বালায় অন্তরের কি দারুণ জ্বালা ব্যক্ত হয়

জান কি ? যখন এই বিজন মরু-জীবনে কাহারও স্নেহ অনুভব করিতে পারি না, একা একা বড়ই শূন্য মনে হয়, তোমাদের সজল হৃদয়ের আনন্দ-স্পর্শের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠি। তখন এই উন্মাদাবস্থায় এক একবার আর থাকিতে না পারিয়া কোমল হৃদয়ে কঠিন হুল বিঁধাইয়া দি—হুল বিঁধাইয়া আমার প্রেম জানাই, তোমাদের প্রেম চাহি। কিন্তু আমার হুলের দংশন বোধ করি এ সংসারে সকলে বড় মধুর অনুভব করে না। তাই তোমাদের নিকটে যাইলে তোমরা সরিয়া যাও, নয় তাড়াইয়া দাও। ভ্রমরের সুখ-দংশনেই তোমাদের বড় আনন্দ। সে গুণ্‌গুণ্ করিয়া ভুলাইয়া রাখিতে পারে কি না। তাই তাহার কাল-রূপে, হে কবি, তুমিও মজিয়াছ। কিন্তু ক্ষুদ্র বোল্‌তার এই কথাটি মনে রাখিও, ঐ কাল-হুল যেদিন তোমার হৃদয়ে বিঁধিবে সে দিন হইতে ওখানে আর কাব্য-রস উথলিবে না।

আমার এত সৌন্দর্য্য কি তবে ব্যর্থ? কাল রূপ লইয়া ভ্রমর জগতে অমর হইয়া থাকিবে, আর আমি আপনার জ্বালায় অন্তরে অন্তরে চিরদিন জ্বলিয়া মরিব ? সেই ভাল—তাহাই হোক্। বিধাতা যাহাকে কাল রূপ দিয়াও মনোমোহন করিয়া গড়িয়াছেন, সে কেন না আমার সৌন্দর্য্যকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইবে ? আমি জগতে বাহির হইয়া এ লজ্জায়-রাঙ্গা মুখ আর দেখাইব না। ভ্রমর পদ্মে পদ্মে বিচরণ করে, ফুলে ফুলে মধু লুটিয়া বেড়ায়, মলয় তাহার প্রিয়-বারতা বহিয়া আনে, তাহাকে তাড়াইতে হইলেও লীলাকমল চাহি, তাহার কথা স্বতন্ত্র। আমার ত এত আয়োজন নাই, প্রয়োজনও নাই, কেবল এক নীরব কনক-রূপেই আমার যথাসর্ব্বস্ব। সে সৌন্দর্য্য যে বুঝে সেই বুঝে, যে না বুঝে নাই বা বুঝিল।

আমি চাকের জীব—চাকেই থাকিব। বিজন হৃদয়েই আমার সুখ—চিরদিন ত এই হৃদয়ে আপনার মনে গান গাহিয়াই আসিয়াছি। এখন তোমাদের নিকট কিসের সহানুভূতি পাইব বল ? যাচিয়া অনুগ্রহ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাপেক্ষা আজীবন নিগ্রহ ভাল। তোমরা আমার প্রতি বড় একটা নজর না রাখিলেই যথেষ্ট। কেবল আমার চাকটি ভাঙ্গিয়া দিও না এই নিবেদন। দুর্দ্দিনে বিপদে ইহাই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল। এই আশ্রয়ের মধ্যে আমি যেন কাহার প্রিয় সঙ্গ লাভ করি—তাহার জন্যই বুঝি এতদিন ধরিয়া নীরবে চাক বাঁধিয়া আসিতেছি।

কিন্তু সারাদিন চাকের মধ্যে বসিয়া করিব কি ? কর্ম্মস্রোতে গা ঢালিয়া না দিলেও মন তৃপ্তি মানে না। অভিমানভরে যাহাই বলি না কেন, বিজন সুখে হৃদয়ের সাধ কিছুতেই মিটে না মিটে না। কিন্তু কি লইয়া এ প্রবল কর্ম্মস্রোতে ভাসিয়া চলিব ? কাজ করিবার মত গুণ আমার নাই, আমি গান গাহিতে জানি না, প্রেম বিলাইতেও পারি না, শুধু এক রূপের কনক-গৌরব লইয়া অকূল সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে সাহস হয় না। সৌন্দর্য্যেও কাজ হয় বৈকি। নহিলে, প্রজাপতির দশা কি হইত ? সেও

ত মুখ খুলে না, গান গাহে না। কিন্তু সে যে আপনার সৌন্দর্য্যে নীরবে প্রাণ দেয়—প্রাণ দিয়া তোমাদের সাধ মিটায়। আমি হুল লইয়া জন্মিয়াছি, আমি ত তোমাদের এ নিষ্ঠুর ভালবাসা এমন নীরবে সহিতে পারি না। প্রজাপতির সৌন্দর্য্য প্রেমে মধুর। আমার সৌন্দর্য্য তীব্র—আমার হুলেরই মত তাহা মর্ম্মবেধী। আমার প্রেম জ্বালাময়—শুধু জ্বলিতে এবং জ্বালাইতে আসিয়াছে।

আমারও হৃদয় কিন্তু ভালবাসা চাহে, ভালবাসিয়া সুখী হয়। কিন্তু এ হুলবিদ্ধ দারুণ প্রেম সহিবে কে? ইহাতে মধু নাই, অমৃত নাই, আছে শুধু এক তীব্র জ্বালা আর তাহারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন কঠিন হৃদয়ের নিষ্ঠুর অনুরাগ। বিধাতা আমাকে এত সৌন্দর্য্য দিলে, কেবল এক হুল দিয়াই এ সৌন্দর্য্য অর্দ্ধেক ব্যর্থ। হুল না বিঁধিয়া ত আমি ভালবাসিতে পারি না। নহিলে, আমার প্রেম কাহাপেক্ষাও হীন নহে। ভ্রমর লঘুহৃদয়, তাই গুণ্‌গুণ্ করিয়া মন রাখে। আমার প্রেম বাহিরে নিস্তরঙ্গ, কিন্তু অন্তরে গভীর। তাই আমি যাহাকে ভালবাসি তাহার অন্তরে নিরবচ্ছিন্ন হুল বিঁধাইয়া। আমাকে হুল দিয়া হইয়াছে ভাল—হুলেই আমার সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ।

কিন্তু আপনার সৌন্দর্য্যে যে মন উঠে না। আপনাকে ত আর তেমন করিয়া উপভোগ করিতে পারি না। নহিলে, এই তপ্তকাঞ্চন রূপে যদি মজিয়া থাকিতে পারিতাম, এই সুন্দর গঠন, এই উজ্জ্বল বর্ণের মধ্যে গাঢ় ঘনীভূত হইয়া আপনাতে আপনি ভোর হইয়া রহিতাম, তাহা হইলে কি আর বাহির হইতে হইত? ক্ষীণকম্পিত সরসী-হৃদয়ের উপর দিয়া যখন বায়ুহিল্লোলে বহিয়া যাই, আপনার গঠন দেখিয়া আপনি মুগ্ধ হইয়া থাকি। সাধ হয়, ঐ চঞ্চল ছায়ার সহিত আজীবন কনক-বন্ধনে আবদ্ধ হই। এত রূপ নহিলে কি আমার রূপে রূপসীর রূপ বুঝান হয়? তাহা হইলে ভ্রমরের জ্বালায় বোল্‌তা এ জগতে তিষ্ঠিতে পারিত না। ইহাতেই রক্ষা নাই।

আর এই দারুণ হুল—ইহাকে লইয়া আপন অন্তরে কি কেহ নিশিদিন রুদ্ধ থাকিতে পারে? শূন্য হৃদয়ে হুল বিঁধাইয়া আশ মিটিবে কেন? তবুও আপনার অন্তরে হুল বিঁধাইয়া পড়িয়া থাকি—হৃদয়ে যতই জ্বালা ধরে, আপনাকে আপন গাঢ় আলিঙ্গনে অনুভব করিয়া সহিয়া যাই। কিন্তু আমাকে বাহির হইতে হয়। আমার চাকের বাহির দিয়া যখন চিরচঞ্চল সৌন্দর্য্যস্রোত বহিয়া যায়, মন আপনার মধ্যেই চঞ্চল হইয়া উঠে। সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া আমি স্থির থাকিতে পারি না—এই অগাধ সৌন্দর্য্যে তীব্র হুল ফুটাইয়া ইহাকে ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু যেখানেই হুল বিঁধি, জ্বালা সংগ্রহ করি, সৌন্দর্য্যকে ধরিয়া রাখিতে পারি না। তাই নশ্বর জগতের পরে এক একবার অভিমান করিয়া চাকের মধ্যে মুখ ফিরাইয়া বসি। তাহাও, অধিক ক্ষণ নয়, দুই দণ্ড পরেই আবার সৌন্দর্য্যের জন্য মন পাগল হইয়া উঠে।

বাহিরে বসন্ত আসে, আমি চাক হইতে প্রকৃতির মুক্তক্ষেত্রে বাহির হইয়া ধরণীর

ফুল্ল ফুল-যৌবন উপভোগ করি। রবিকিরণপ্লাবিত প্রকৃতির আনন্দে মগ্ন হইয়া আপনাকে ভুলিতে চাহি, এ কনক-জ্বালার অবসান কামনা করি। কিন্তু বাসনা পূরে না। অবশেষে বাহির হইতে কেবল জ্বালা লইয়া চাকে ফিরি। অন্তরে চিরদিন জ্বলিব না কেন?

আমি অন্তরে জ্বলিতেছি, তাই তোমাদিগকে জ্বালাইয়া সুখ পাই। মানবের হৃদয় ভিন্ন আমার হৃদয় আর কে বুঝিবে? কিন্তু আমার হুলের জ্বালায় তোমরা এত কাতর এবং বিরক্ত কেন? শুনিয়াছি, কোকিলের কুহুস্বরে অন্তরের স্তরে স্তরে তোমরা জ্বালা অনুভব কর, কোকিলের প্রতি কাহারও ত কৈ তেমন বিরক্তি দেখি না। বরং জ্বালার জন্যই তাহার প্রতি তোমাদের সমধিক অনুরাগ। ভ্রমরের দংশনের কথা দূরে থাক্, গুঞ্জনেও নাকি অন্তরে জ্বালা ধরে। তবে আমার হুল কি দোষ করিল? আমার হুলের জ্বালা কি ইহাদের অপেক্ষা কম? এক বলিতে পার, কোকিল ভ্রমর বসন্তের সঙ্গে আসে। আমিও কি বসন্তের সঙ্গেই আসি না? জানি না, ইহারা তোমাদের কি হৃদয়ের কথা জানে। কিন্তু যদি বলিয়া দাও, আমিও এবার অবধি সেই কথা গাহিতে পারি। সুকণ্ঠ আমি নহি বটে, কিন্তু ইহারা কণ্ঠে যাহা করে আমি হুলে তাহাই করিব। শুধু তোমাদের হৃদয়ের কথা আমাকে একবার বলিয়া দাও।

থাক্। আমি বোল্‌তা—চাক বাঁধি, উপমা খাটাই, হুল বিঁধাই। তোমাদের হৃদয় জানিয়া কি করিব? আমি নীরবে আমার কাজ করিয়া যাই। কোকিল গান গাহে, ভ্রমর গুঞ্জরে, আমি সৌন্দর্য্য ফুটাই। সৌন্দর্য্যেই আমার আনন্দ। আমার মত সুন্দর চাক বাঁধিতে কেহ পারে? আমার চাঁকের মর্য্যাদা কেবল সৌন্দর্য্যে। অল্পের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আমি সব গুছাইয়া বসিয়াছি—এই চাকের মধ্যে আমার যাহা কিছু আবশ্যক সকলই আছে। আমার চাকটি যথার্থই পরম উপভোগ্য। তোমাদের পক্ষে ইহা উপভোগ্য কি না জানি না; কিন্তু তোমরাও বল, আমার চাক-রচনায় নৈপুণ্য আছে। এই চাকেই আমার প্রতিষ্ঠা।

তবুও জীবন-সংগ্রামে এক একবার বাহির হইতে হয়। তখনই তোমাদের সংস্পর্শে আমাকে আসিতেই হয়। কিন্তু আসিলেও নিস্তার নাই। এই হুল লইয়া যে কত বিভ্রাট ঘটে কিরূপে বলিব? হয়ত আপন ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে অসংযত মুহূর্ত্তে অজ্ঞাতসারে কাহাকেও হুল বিঁধাইয়া বসি, পরে অনুতাপ করিতে হয়। তোমরা ত আর তাহা জানিতে পাও না, কেবলি আমার হুলময় কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া মনে কর, বোল্‌তা হুল বিঁধাইয়া বড় সুখে আছে। কিন্তু বোল্‌তা গাহে শুধু বিলাপ। এই তপ্তকাঞ্চন বাহিরের ঔজ্জ্বল্যে বেদনা কল্পনা করিতে পার না, তাই মনে কর, আমি যেন সর্ব্বদাই হাস্যপ্রফুল্ল; আমার অন্তরে হয়ত তখন দারুণ মর্ম্মদহন হইতেছে। তোমাদের অশ্রু ঝরিয়া হৃদয়ভার লঘু হয়, আমার হৃদয় ঝরে না, নীরবে অন্তরে অন্তরে শুকাইয়া আসে।

তাই বাহিরে আমি হাসি—প্রবল অন্তর্দ্দাহে না-হাসিয়া থাকিতে পারি না, অন্তরে চিরদিন জ্বলিয়া জ্বলিয়া কাঁদি।

কিন্তু কাঁদি কেন? তাই যদি জানিব, তবে বৃথা এ ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি তুলিব কেন? কে জানে, আমি আপনাকে আপনি বুঝিতে পারি না। সেই জন্যই ত ধরণীর এই বিজন প্রান্তে চাক বাঁধিয়া নিরিবিলি থাকিতে চাহি যে, আমার কথা কেহ না জিজ্ঞাসা করে, আমাকে কেহ কিছু না বলে। কিন্তু তাহা ত থাকিবার যো নাই। জীবন-সংগ্রাম আমাকেও যে ছাড়ে না। আর বাহিরে অগাধ সৌন্দর্য্য—একবার এ সৌন্দর্য্যে বাহির হইলে চাকের মধ্যে হৃদয় পরিতৃপ্তি মানে কাহার? এই নশ্বর জীবনে সৌন্দর্য্য-রহস্যে ফুল ফুটাইয়া যেরূপ আনন্দ এমন ত আর কিছুতে নয়। তাই এক একবার মনে হয়, এত যদি দিলে, হে বিধি, আমার মধ্যে সমস্ত সৌন্দর্য্য কেন্দ্রীভূত করিলে না কেন? এই ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর মধ্যে তুমি মনে করিলে কি জগতের সৌন্দর্য্য বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেনা? আমাকে যেমন করিয়া জগতের সৌন্দর্য্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছ, তেমনি করিয়া যদি জগৎকে আমার সৌন্দর্য্যে বাঁধিতে! না হয় ক্ষুদ্রই হইলাম, সুন্দর ত বটে। সৌন্দর্য্য যে ক্ষুদ্রকে বৃহৎ অপেক্ষা মহত্ত্ব প্রদান করে।

কিন্তু আর না। এ বয়সে আর চাহিতে চাহি না। আমার চাহিবার প্রয়োজনও নাই। তুমি আমাকে যতই দাও, আমার ভাগ্যে সেই ফুলাপবাদ, সেই অঞ্চল তাড়না। তাই ঠাহরাইয়াছি, আর বাহির হইব না। আমাকে বাদ দিয়াও ত বেশ চলিতে পারে। আমার চাকে মধু নাই, প্রেমে গুঞ্জন নাই, ফুলে তোমরা যাহা চাও তাহা নাই; তোমাদের ভ্রমর আছে, এ আছে, সে আছে, রূপের উপমা অনেক মিলিবে; আমার অভাবে তোমাদের দুঃখ কিসের? আমাকে লইয়া কাব্য রচিত হয় না, সুতরাং কবিকে আমার জন্য বিলাপ গাহিতে হইবে না; বিজ্ঞেরা সৌন্দর্য্যে নারাজ, আমি সরিয়া গেলে তাঁহারা সুখী বৈ দুঃখিত হইবেন না; আমার জন্য কাহারও অশ্রু ঝরিবে না। তবে আমি ধীরে ধীরে সরিয়া যাই। হে ভ্রমর, কাল রূপ লইয়া তুমি জগতে চিরদিন অমর হইয়া থাক।

বোলতা।

পরমহংস শিবনারায়ণ দেবের জীবন চরিত।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

ইহা শুনিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, একথা সত্য এবং জয়কিষণ পণ্ডিতও বলিলেন যে এইরূপ অবস্থা হইলে সৌভাগ্য। ইহাতে তথায় উপস্থিত একজন স্বার্থপরায়ণ

পণ্ডিত যিনি সব ভাবকে বুঝিয়াও বুঝেন না এবং কথিত বিষয়ের ভাব গ্রহণ করিয়াও বুঝিলেন না, তিনি বলিলেন শূদ্র কখনই শ্রেষ্ঠ কার্য্যে অধিকারী হইতে পারে না।

তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, তোমরা কাহাকে শূদ্র বল, শূদ্র বস্তুটা কি? নিকৃষ্ট কার্য্য ও গুণের নাম শূদ্র, কিম্বা জীবের স্থূল শরীরের নাম শূদ্র অথবা জীবের সূক্ষ্ম শরীর স্বরূপের নাম শূদ্র। যদ্যপি জীবের সূক্ষ্ম শরীর স্বরূপের নাম শূদ্র বলা হয়, তাহা হইলে জীব একই ঈশ্বরের অংশ, সমান ভাবে সকল জীবই তুল্য। জীব যদি স্বরূপে শূদ্র হয়, তাহা হইলে সকল জীব শূদ্র। যদি জীবের স্থূল শরীরকে শূদ্র বলা হয় তাহা হইলে একই ধাতু হইতে হাড়, মাংস, রক্ত ইত্যাদি স্থূলশরীর নির্ম্মিত হওয়া প্রযুক্ত সকল জীবই শূদ্র। বস্তুতঃ জীবের স্বরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইত্যাদি সংজ্ঞা কখনই হইতে পারে না, ও হইবার সম্ভাবনাই নাই। কেবল অবস্থাভেদে গুণ ক্রিয়ার তারতম্য অনুসারে সামাজিক নিয়ম মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র ইত্যাদি সংজ্ঞা বলা হয় কিন্তু স্বরূপ পক্ষে ইহার কিছুই নাই, অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ কার্য্য করেন এবং যে ব্যক্তিতে উত্তম গুণ বর্ত্তায় সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ ও যে ব্যক্তি নিকৃষ্ট কার্য্য করে ও যাহাতে নিকৃষ্ট গুণ প্রকাশ পায় সেই শূদ্র জানিও। এবং প্রত্যক্ষ দেখিতেছ যে হিন্দুসমাজ হইতে কোন ব্রাহ্মণ, মুসলমান কিম্বা খ্রিষ্টীয়ান হইলে তখন তাহাকে হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়া কেহই গ্রহণ করে না তাহাকে অতি ঘৃণা করে ও তাহার গাত্রস্পর্শ করিতেও সকলে ইচ্ছা করে না, বলে অমুক ব্যক্তি এখন খ্রিষ্টীয়ান অথবা মুসলমান হইয়াছে, উহার জাতি নাই। ইহা কেবল সেই ব্যক্তি আপনার সমাজজাত গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া অপরের সমাজ-অনুযায়ী গুণ ও ক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছে তজ্জন্য গুণ ও ক্রিয়া ভেদে তাহাকে মুসলমান অথবা খ্রিষ্টীয়ান শব্দে বলা হয়। নতুবা সে ব্যক্তি যখন হিন্দু ধর্ম্মে ছিল তখন সে যাহা ছিল, মুসলমান অথবা খ্রিষ্টীয়ান ধর্ম্ম মধ্যে আসিয়া তাহাই আছে; উহার শারীরিক বা ইন্দ্রিয় ঘটিত কোন রূপান্তর হয় নাই। কেবল গুণ ও ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। ঈশ্বর শরীর গঠন করিয়া যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কার্য্য হইবে ও যে গুণ যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকাশ পাইবে নিয়ম করিয়াছেন, সেই সকল ঈশ্বরাধীন কার্য্যে কাহারও কিছুমাত্র তারতম্য করিবার ক্ষমতা নাই। নেত্রের যে গুণ তাহা নেত্রে থাকিবে, কর্ণের যে গুণ তাহা কর্ণে থাকিবে, এবং হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়গণের যাহার যে গুণ তাহা অবশ্যই ঘটিবে এবং যে ব্যক্তি জীব শব্দ বাচ্য সে যেখানেই যাউক স্বরূপে যাহা আছে সে স্বরূপে তাহাই থাকিবে, স্বরূপে খ্রিষ্টীয়ান ও মুসলমান হইবে না। অর্থাৎ তাহার কিছুমাত্র তারতম্য হইবে না, কেবল নাম পরিবর্ত্তন মাত্র হইবে—ইহা না বুঝিয়া লোকে নানা প্রকার মিথ্যা ভ্রমে পড়িয়া থাকে।

তৃতীয় প্রশ্ন।

তখন পূর্ব্বোক্ত মাড়ওয়ারি পুনরায় স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! আমাদের হিন্দু সমাজ হইতে যদি কেহ খ্রিষ্টীয়ান কিম্বা মুসলমান হয় এবং যদি পুনরায় তাহারা হিন্দু সমাজে আসিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে উহাদিগকে আমরা হিন্দু ধর্ম্মে লইতে পারি কি না? তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলান যে, হে শ্রোতাগণ, তোমরা গম্ভীর ও শান্তরূপে বিচার করিয়া দেখ যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে আপন উত্তম গুণ প্রদান করিয়া আপনার স্বরূপে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পদে লয়েন। প্রমাণ—যেরূপ স্থূল পদার্থ মধ্যে শ্রেষ্ঠবস্তু অগ্নি যত নিকৃষ্ট স্থূল পদার্থকে দগ্ধ করিয়া আপনার স্বরূপ করিয়া লয়েন অর্থাৎ চন্দন ও বিষ্ঠা উভয়কে সমানরূপে ভস্ম করিয়া আপন স্বরূপে এক করিয়া লয়েন এবং অগ্নি স্বয়ং শ্রেষ্ঠ পদে শুদ্ধরূপে থাকেন। এবং পৃথিবীস্থ যাবতীয় নদীর জল সমুদ্রে গিয়া পড়ে ও সমুদ্র সেই সমুদায় জল নিজের সহিত মিশ্রিত করিয়া একই ভাবে পরিপূর্ণ থাকেন। এইরূপ যখন হিন্দুসমাজ শ্রেষ্ঠ ছিল, হিন্দুগণ শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিতেন ও করাইতেন, যখন হিন্দুর ন্যায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ গুণ অর্থাৎ তেজ, বল, বুদ্ধি, ইত্যাদি কোন সমাজে ছিল না তখন তাঁহারা সকলকেই সমভাবে লইয়া চলিতেন। এক্ষণে তোমাদের হিন্দু সমাজ মধ্যে যদ্যপি কোন তেজীয়ান ও জ্ঞানবান অগ্নি ও সমুদ্রবৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি থাকেন তাহা হইলে তিনি খ্রিষ্টীয়ান ও মুসলমান হইতে কেহ হিন্দু সমাজে আসিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে ওঁকার অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মের নাম একবার অথবা দশবার শুনাইয়া অনায়াসে আপন ধর্ম্মে লইতে পারেন, তাহাতে কোন ভয় ও সংশয় নাই। তবে তিনি যদ্যপি তেজ ও বলহীন হন তাহা হইলে তাহাদের লইতে সাহস হইবে না এবং মনোমধ্যে ভয় গ্লানি উপস্থিত হইবে।

চতুর্থ দিবস।

পুনরায় সেই মাড়ওয়ারী ব্যক্তি পূর্ব্ববৎ জয়কিষন পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিল যে, মহারাজ, ওঁকার সকলেই বলে; কিন্তু ওঁকার কি বস্তু,ওঁকারের স্বরূপ কি,এবং ওঁকার কোথায় থাকেন, এবং নিরাকার না সাকার? যদি নিরাকার হন তাহা হইলে অদৃশ্য, দেখা যাইবে না, মন বাণীর অতীত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর; আর যদি সাকার হন তাহা হইলে প্রত্যক্ষ দেখা যাইবে।

তাহাতে পণ্ডিত বলিলেন, আমাকে কেন মিছা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সাক্ষাতে স্বয়ং মহাত্মা বসিয়া আছেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে ঈশ্বরের নাম ওঁকার এবং অকার, উকার, মকার যুক্ত হইয়া ওঁকার হয়। তখন মাড়ওয়ারি বলিল, মহারাজ, যদি অকার, উকার, মকার এই তিন শব্দ ওঁকার হইতেছে তাহা হইলে তাঁহার স্বরূপও আকার যুক্ত সাকার পদার্থ হইবে, নিরাকারে ত অকার

উকার মকার হইতে পারে না—ইহা তো সৃষ্টি প্রকরণ হইল। নিরাকারে ত একই ব্রহ্ম পরিপূর্ণ ভাবে আছেন কিন্তু সাকার হইলে সাকার ব্রহ্মের নাম অ, উ, ম অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ ও বর্ণ আছে, শুক্ল রক্ত কৃষ্ণবর্ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই ত্রিগুণাত্মার নাম হইতে পারে। তাহাতে পণ্ডিত বলিলেন যে মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর তাহা হইলে সকল সংশয় নিবারণ হইবে। তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন, হে শ্রোতাগণ, ঋষি, মুনি ও পণ্ডিতগণের যাহার অন্তর হইতে যেরূপ ভাব প্রকাশ হইয়াছে অর্থাৎ অন্তর্য্যামি যেরূপে যাঁহাকে অন্তর হইতে দেখাইয়াছেন, তিনি সেইরূপ ওঁকারের শব্দার্থ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমি তোমাদিগকে স্থূল করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিতেছি ও বুঝাইয়া দিতেছি, তোমরা সূক্ষ্মভাবে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিও। নিরাকার পরব্রহ্মের ওঁকার নাম কল্পনা হয় নাই, যখন তিনি নিরাকার হইতে জগৎস্বরূপে বিস্তার হন, তখন সেই সাকাররূপ চরাচরকে লইয়া বিরাট সমষ্টি ঈশ্বরের শরীরকে, মুনি, ঋষি, মহাত্মা ইত্যাদি ভক্তগণ ওঁকার নামে কল্পিত করেন। এবং এই ওঁকার নাম জপ করিলে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা হইয়া থাকে। এবং যখন নিরাকার হইতে সাকার হন, তখন অকার, উকার মকার, অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই তিনগুণ উৎপন্ন হয়। এই তিন গুণ হইতে ব্যবহারিক ও পরমার্থিক উভয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে ও হইবে। রজোগুণ হইতে ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করেন তখন তাঁহাকে ব্রহ্মা নাম বলিয়া উক্ত করা হয়। যখন সত্ত্বগুণ হইতে এই জগৎ চরাচরকে পালন করেন, তখন তাঁহার নাম বিষ্ণু ভগবান প্রয়োগ করা হয়। এবং যখন তমোগুণে এই সৃষ্টিকে সংহার অর্থাৎ লয় করিয়া আপনার স্বরূপে স্থিতি করেন তখন তাহাকে বিশ্বনাথ কল্পনা করা হইয়াছে। এই তিনের নাম অকার, উকার ও মকার। প্রত্যক্ষ তেজ সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ দিবারাত্র প্রকাশমান আছেন। এবং সেই ওঁকার প্রণব ব্রহ্ম অকার উকার মকার এই তিনভাগ হইতে সাতভাগ হইয়া প্রত্যক্ষ সাকার স্বরূপে বিরাজমান আছে। এই সাত ভাগের নাম কোন শাস্ত্রে সাত দ্রব্য বলে, কোন শাস্ত্রে সাত বস্তু বলে এবং সেই সাতকে সাত ঋষিও বলে এবং জীবকে লইয়া অষ্টম, প্রকৃতিও বলে এবং গায়ত্রীর সপ্ত ব্যাহৃতীও বলে এবং তাঁহাকে সাবিত্রীও বলে অর্থাৎ এই ব্রহ্মেরই নাম যথা, ওঁ ভূঃ ওঁভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ইত্যাদি এবং ব্যাকরণে ইহাকে সাত বিভক্তি বলে। এই সাতের নাম প্রত্যক্ষ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ এবং জীবসংজ্ঞা লইয়া অষ্টম, প্রকৃতি শব্দ বলা হয়। এই সাত ভাগ ওঁকার প্রণব ব্রহ্ম হইতে এই সকল চরাচর স্ত্রী ও পুরুষের স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের গঠন হইয়াছে। ওঁ ভূঃ যে পৃথিবী-ওঁকার তাহা হইতে স্ত্রী ও পুরুষের হাড়মাংস গঠন হইয়াছে, ও জল-ওঁকার হইতে রক্ত হইয়াছে, এবং অগ্নি-ওঁকার হইতে অন্ন পরিপাক

হইতেছে, ও বায়ু-ওঁকার হইতে শ্বাস প্রশ্বাস সমষ্টি শরীরের মধ্যে চলিতেছে, ও আকাশ ওঁকার হইতে স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদি কর্ণ দ্বারে শব্দ শুনিতেছে, এবং ওঁজন শব্দে চন্দ্রমা জ্যোতিঃ হইতে কণ্ঠ ভাগে সকলেই কথা বলিতেছেন, ও সূর্য্যনারায়ণ ওঁকার হইতে নেত্র দ্বারে সর্ব্বরূপ দৃষ্টি করিতেছেন এবং সেই জ্যোতিঃ দ্বারা সকল বেদ বেদান্ত বাইবেল, কোরান ইত্যাদি শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন। এবং সেই জ্যোতির সঙ্গ করিয়া জীব কারণ-পরব্রহ্মে স্থিতি করেন এবং সেই জ্যোতিঃ স্বরূপের সঙ্গ করিয়া ব্যবহারিক ও পরমার্থিক উভয় কার্য্যই সিদ্ধ হয়। ব্যাকরণে যে সপ্ত বিভক্তি আছে, তাহার মধ্যে প্রথমা বিভক্তিতে যে বিসর্গ (ঃ) আছে ইহার মানে এই যে নিরাকার হইতে যখন পরব্রহ্ম সাকার স্বরূপে বিস্তারিত হন তখন প্রকৃতি ও পুরুষ জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ বিসর্গ (ঃ) শব্দে কথিত হন এবং তিনিই চরাচরের নেত্র।

এইরূপে ওঁকার প্রণব ব্রহ্মকে সমুদায় বিভক্তি অর্থাৎ শব্দার্থ ভাবে বুঝিয়া লইতে হয়—স্ত্রী পুরুষ সকলেই ওঁকার স্বরূপ। অতএব স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই ওঁকার জপিবার অধিকার আছে তাহাতে কোন সংশয় করা কর্ত্তব্য নহে। প্রত্যক্ষ ওঁকার-কেই, দেবীমাতা, শক্তি স্বরূপা বলিয়া আবাহন করা হয়, যথা—ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ইত্যাদি মন্ত্র। ওঁকার মন্ত্রই, দেবী স্বরূপ এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই ওঁকার দেবী স্বরূপ; অর্থাৎ সকলই পরব্রহ্মের স্বরূপ!

তখন মাড়ওয়ারী বলিলেন, মহাশয়, আপনি ওঁকার প্রণবের কথায় যে বলিলেন, ওঁকার সাত ভাগ হইয়া চরাচর বিরাট পরব্রহ্মের শরীর গঠন করিয়াছে, সে কিরূপ আমি বুঝিতে পারিলাম না। ইহা পৃথক পৃথক হইয়া সাতটা হইয়াছে, না, একই ব্যক্তি আছেন? এবং কিরূপে তাঁহাকে ধ্যান ধারণা করিব?

তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন, তুমি একাগ্রচিত্তে গম্ভীরভাবে শ্রবণ কর; তিনি সাতটা নহেন, একই পুরুষ বিরাজমান আছেন কিন্তু বহির্ম্মুখে পৃথক পৃথক বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমার শরীরের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক পৃথক রূপে বোধ হইতেছে—যাহাকে পৃথক পৃথক ধাতু ও দ্রব্য বলে। নেত্রে দেখিতেছ, কর্ণে শুনিতেছ, নাসিকায় দুর্গন্ধ ও সুগন্ধ লইতেছ, মুখ দ্বারা বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। কর্ণ দ্বারা শুনিতে পাইতেছ কিন্তু দেখিতে পাইতেছ না, এইরূপে বহির্ম্মুখে একই শরীর পৃথক পৃথক ভাবে দেখা যাইতেছে ও পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়েরও পৃথক পৃথক গুণ ঘটিতেছে এবং বোধ হইতেছে। কিন্তু এই শরীরের বোধকর্ত্তা তুমি, একই পুরুষ বিরাজমান আছ এবং সকল ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির দ্বারা অন্তর হইতে সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছ। এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর তোমারই এবং, তুমিই শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির স্বামী। এইরূপ এই আকাশের মধ্যে পৃথক পৃথক যে সাতটা বোধ হইতেছে, যেমন পৃথিবী জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ—ইহা বহির্ম্মুখে

এই সাত প্রকার বোধ হইতেছে, কিন্তু এই জগৎ চরাচরকে লইয়া বিরাট স্বরূপ একই পুরুষ একই ভাবে স্থিতি করিতেছেন। তাঁহার এক এক অঙ্গ দ্বারা এক এক কর্ম্ম করিতেছেন ও করাইতেছেন ও এক এক গুণ এক এক অঙ্গের দ্বারা গ্রহণ করিতেছেন। যেমন তুমি তোমার সমস্ত শরীরের মধ্যে চেতন, তোমার ক্ষুদ্র শরীরের মধ্যে কোন সুখ বা দুঃখ হইলে তুমি বোধ করিতে পার, মনের কোন প্রকার বিকৃতি ঘটিলে মনের ভাব বুঝিতে পার অথবা অঙ্গের কোন স্থানে পিপীলিকা কামড়াইলে বা অন্যরূপ বেদনা হইলে তাহা তুমি বোধ করিতে পার—যেরূপ তুমি তোমার ক্ষুদ্র শরীরের ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এবং অন্তরের ও বাহিরের ভাব বুঝিতে পার—সেইরূপ সমষ্টি জগৎ চরাচররূপ প্রত্যঙ্গাদি বিরাট শরীরের অন্তর হইতে অন্তর্যামী ভগবান বুঝেন ও সকল জীবের অন্তর হইতে প্রেরণা করিয়া বুঝাইয়া দেন। তুমি যেমন তোমার স্থূল শরীরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, চরাচর বিরাট সমষ্টি শরীরের মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপ তেজোময় সেইরূপ। তোমরা সেই জ্যোতিঃস্বরূপকে একমাত্র জগৎপিতা ও জগৎমাতা এবং জগৎগুরু জ্ঞানে প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে আন্তরিক নম্রভাবে তাঁহার চক্ষু স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণকে পূর্ণরূপে নমস্কার প্রণাম করিবে এবং সর্ব্বদা ওঁকার মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিয়া তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন ও তোমাদের অন্তর হইতে জ্ঞান প্রদান করিয়া আপনার জ্যোতিঃস্বরূপে অভেদ করিয়া লইবেন। এবং তুমি নির্গুণ নিরাকার পরব্রহ্মে স্থিতি করিয়া সদা পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবে। কোন সুবোধ পুত্র কন্যা তাহার পিতা মাতার নেত্রের সম্মুখে করযোড়ে নম্রভাবে প্রণাম করিলে তাঁহারা দেখিয়া অন্তরে বুঝেন যে আমার ছেলে আমাকে প্রণাম করিতেছে এবং তাহাতে তাঁহারা যেমন অন্তরে আনন্দিত হইয়া সন্তানকে স্নেহ করেন এবং যাহাতে সন্তান সুখে থাকে তাহারি চেষ্টা করেন সেইরূপ চরাচর রাজা ও প্রজা ইত্যাদি তাঁহার পুত্র ও কন্যা এবং বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ তোমাদের পিতা ও মাতা শব্দে জানিবে। তাঁহার জ্যোতিঃনেত্রের সম্মুখে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে নমস্কার ও প্রণাম করিলে তিনি তোমাদের অন্তরের সকল ভাব বুঝিতে পারিবেন, এবং অন্তর হইতে তোমাদিগকে সৎ বুদ্ধি প্রদান করিয়া যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পার তাহাই করিবেন।

পঞ্চম প্রশ্ন।

সেই মাড়ওয়ারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ বেদ শ্রুতি ও শাস্ত্র পুরাণাদিতে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব বিভেদের স্থলে, আমরা রাজা প্রজা, ও পণ্ডিতগণ, কোন মতকে স্থির বলিয়া গ্রহণ করিব? কোনো মতকেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

এই কথা শুনিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন যে, হে শ্রোতাগণ তোমরা বস্তুর বিচার কর, তাহা হইলে তোমাদের সমস্ত ভ্রম নিবারণ হইবে। তোমরা বিচার করিয়া দেখ যে এই আকাশের মধ্যে কোন বস্তুই বা সত্য এবং কোন্ বস্তুই বা অসত্য আছে। এইরূপ সৎ অসতের বিচার করিয়া সত্যেতে নিষ্ঠা রাখ অর্থাৎ সৎস্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ যিনি নিরাকার ও সাকার স্বরূপে প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন তাঁহাতে নিষ্ঠা থাকিলে কোন ভ্রমই থাকে না। তোমরা গম্ভীর ও শান্ত স্বরূপে বিচার করিয়া তাহাতে তোমাদের দেখ যে, পরব্রহ্ম তিনি যাহা তাহাই আছেন অর্থাৎ পরিপূর্ণ ভাবে নিরাকার ও সাকার রূপে প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন। সহস্র লোকে সহস্র মত প্রচলিত করুন তাহাতে তাঁহাকে কম বেশি বা রূপান্তর করিতে পারিবেন না, তিনি যাহা আছেন তাহাই থাকিবেন। দেখ, কত প্রকারে কত মত এই পৃথিবীর উপর প্রকাশ হইতেছে ও লয় হইয়া যাইতেছে। কোন মতে কি একটি তৃণ ঘাস মাত্রও উৎপন্ন করিয়া গিয়াছে না করিতে পারিবে? এ পর্য্যন্ত কেহ কখন করিতে পারেন নাই ও পারিবেনও না; অনাদিকাল হইতে পরব্রহ্ম একই ভাবে চলিয়া আসিতেছেন। দেখ নিরাকার ব্রহ্ম যেমন তেমনি আছেন, এবং সাকার ব্রহ্ম যেমন তেমনি জ্যোতিঃরূপে বিরাট স্বরূপে প্রত্যক্ষ প্রকাশিত আছেন। যথা সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপে,আকাশ বায়ু স্বরূপে, অগ্নি জল স্বরূপে ও তোমরা চরাচর ইত্যাদি যেমন তেমনিই এই আকাশের মধ্যে প্রকাশমান আছ। ইহার মধ্যে তিল মাত্র কেহ কমাইতে ও বাড়াইতে পারেন নাই ও পারিবেন না। ঋষি, মুনি, পির পায়গম্বর যিশুখ্রিষ্ট ইত্যাদি অবতারগণ এবং পণ্ডিত বাবু, রাজা, প্রজা, হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ, ও অপর অপর মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ কেহই তিলমাত্র প্রভেদ করিতে পারেন নাই অর্থাৎ নিরাকারকে সাকারও করিতে পারেন নাই ও সাকারকেও নিরাকার করিতে পারেন নাই, এবং পারিবেনও না। মুখে এবং শাস্ত্রে যিনি যত মতই প্রকাশ করুন না কেন, এককে দুই করিবার কাহারও সাধ্য নাই, এবং দুইকেও এক করিবার সাধ্য নাই। অতএব রাজা প্রজা ইত্যাদি ব্যক্তিগণের বিচার পূর্ব্বক গম্ভীর ও শান্ত স্বরূপে সৎ বস্তুতে নিষ্ঠা রাখিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য নিষ্পন্ন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সকল দুঃখ মোচন হইবে। অর্থাৎ সৎবস্তু যিনি পূর্ণ যিনি পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার সাকাররূপে পরিপূর্ণ আছেন কেবল মাত্র তাঁহাকে ধারণ করিলে সমস্ত ভ্রম ও সংশয় নিবারণ হয়। অতএব ব্যক্তিগণের নানা মতে যাওয়া উচিত নহে। ভাবিয়া বুঝিতে গেলে সকল মতই এক, কারণ প্রত্যক্ষ স্থূল ভাবে দেখ যখন সকল মতের ব্যক্তি, একই পৃথিবী আধারে রহিয়াছেন এবং একই জল দ্বারা সকলেই কার্য্য করিতেছেন এবং একই অগ্নি দ্বারা সকল মতের ব্যক্তিরই কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে এবং একই বায়ুদ্বারা সকলেরই নাসিকা দ্বারে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে এবং একই আকাশ দ্বারা সকলেই কর্ণদ্বারে শব্দ শুনিতেছেন এবং একই সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ হইলে সকল মতের

লোকেরাই তাঁহাকে নেত্রদ্বারে দেখিয়া সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন তখন ঈশ্বর, গড্, আল্লা, খোদা, পরমেশ্বর অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ কি নানা মনে নানা মতে নানা প্রকারের ভিন্ন ভিন্নরূপে হাজারটা আছেন। তোমরা কেন অনর্থক মিছা ভ্রমে পতিত্ব হইতেছ? আপন আপন অহঙ্কার, মান অপমান, জয়, পরাজয় ইত্যাদি পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্তস্বরূপে বিচার পূর্ব্বক সত্যকে ধারণ কর তাহা হইলে সকল মতের ভ্রম মিটিয়া যাইবে।

তাহাতে সেই স্থানের শ্রোতা ব্যক্তিগণ বলিলেন যে মহারাজ আপনি ইহা যথার্থ বলিয়াছেন আমাদের ইহা সত্য বোধে ধারণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, এবং অন্তর্যামী গুরু যদি কৃপা করেন তবেই ধারণা ও নিষ্ঠা হয়।

ষষ্ঠ প্রশ্ন।

ঐ মাড়ওয়ারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ, স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাভ্যাস করান ভাল কি মন্দ? কেহ কেহ বলেন যে স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করান অতি আবশ্যক এবং কেহ কেহ বলেন যে ইহাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করান নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বিদ্যা শিক্ষা দিলে স্ত্রীলোকদিগের স্পর্দ্ধা হয় এবং কুপ্রবৃত্তি জন্মায়।

তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন, হে শ্রোতাগণ,তোমরা শান্তস্বরূপে গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া দেখ বিদ্যাভ্যাসে যে স্ত্রীলোকদিগের স্পর্দ্ধা ও কুপ্রবৃত্তি জন্মায় ইহা বলা ভুল। যদ্যপি স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার দ্বারা স্পর্দ্ধা ও কুপ্রবৃত্তি জন্মায় তাহা হইলে বিদ্যাভ্যাসে পুরুষদিগেরও অহংকার এবং কুপ্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে। তাহা হইলে পুরুষদিগকেও বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে! প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছ যে পুরুষদিগের মধ্যেও কত কুপ্রবৃত্তির লোক আছে তাহার সীমা নাই। অতএব তাহা বিদ্যা শিক্ষার দোষ নহে, সে কেবল তাহাদের স্বভাবজনিত দোষেই ঘটিয়া থাকে। স্ত্রী হউক অথবা পুরুষ হউক বিদ্যা শিক্ষা করুক অথবা নাই করুক তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ গুণের দ্বারা ঐ সকল দোষ ঘটিয়া থাকে। বরং বিদ্যাভ্যাসে জ্ঞান লাভের দ্বারা হিতাহিত বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মায়। তদ্দ্বারা গম্ভীরতা শান্তি ও ধৈর্য্য গুণ প্রকাশ পায় এবং ক্রমে ক্রমে কুপ্রবৃত্তি সকল বিলুপ্ত হয়। এই হেতু স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া রাজা প্রজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ স্ত্রীলোক যদ্যপি বিদ্যা শিক্ষা করেন তাহা হইলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ কার্য্যই বুঝিয়া উত্তমরূপে নিষ্পন্ন করিতে পারেন এবং পুত্র কন্যাদিগকে শিক্ষা দিবার পক্ষেও সুবিধা হয়। স্বামী যদি কোন কারণ বশতঃ বিদেশ গমন করেন কিম্বা রোগগ্রস্ত হন অথবা অন্ধ ও বধীর ও উদাসীন কিম্বা বিনষ্ট হন তাহা হইলে সেই বিদ্যা শক্তি দ্বারা কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহার্থে বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া শিশু সন্তানদিগের সহিত জীবন যাপন করিতে পারেন। আর যদি

স্ত্রীগণ বিদ্যা শিক্ষা না করেন তাহা হইলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য উত্তমরূপে বুঝিতে পারের না এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ পতিহীনা হইলে আপনার ও শিশুসন্তানদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। অতএব অন্য উপায় অবলম্বন দ্বারা অর্থাৎ দাসী-বৃত্তি নতুবা ভিক্ষা দ্বারা কিম্বা মূর্খতা হেতু ব্যভিচার দোষে দূষিত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হন। এবং নিজ সন্তানগণের পক্ষে ও পারমার্থিক সাধন সম্বন্ধে তাঁহাদের সর্ব্ব প্রকারেই বিঘ্ন হইয়া থাকে। এইরূপ নানা কারণ বশতঃ রাজা, প্রজা ইত্যাদি পাঠকগণের পুত্র ও কন্যাদিগকে বিচার পূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষা করান অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে কোন বিধি নিষেধ নাই এবং ইহাতে কোন সংশয়ও করিবেন না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখা যাইতেছে যে ইংরাজ স্ত্রীগণ বিধবা হইলে বিদ্যাবলে নানা প্রকার উপায় ও কৌশলে এবং শিল্পকর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া উত্তমরূপে আপন আপন শিশু সন্তানদিগকে লইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। এবং তোমরা যদি স্ত্রী-লোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা না করাও তাহা হইলে কোন স্থানে চাকুরি করিতে গেলে তাহাদের মূর্খতা হেতু বেতন অল্প হইবে, তাহাতে তাহারা কি প্রকারে শিশু সন্তান-দিগকে লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে ? এই সমস্ত শুনিয়া সকলে বলিলেন, হাঁ মহা-রাজ ইহা আমাদের করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি সকলে একমত হইয়া বুঝিয়া করে তাহা হইলেই অতি উত্তম হয় এবং জগতেরও বড়ই মঙ্গল হয়। কেননা স্ত্রী পুরুষ উভয়ে মিলিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয়।

সপ্তম প্রশ্ন।

পুনরায় উপরোক্ত পণ্ডিত শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহারাজ, পুত্র কন্যাদিগের বাল্যাবস্থায় বিবাহ দেওয়া উচিত, না, উহাদিগের পরিপক্ক যুবাবস্থায় বিবাহ দেওয়া উচিত ? শিবনারায়ণ বলিলেন যে হে শ্রোতাগণ, বিচার পূর্ব্বক গম্ভীর ও শান্ত স্বরূপে দেখ যে, যেরূপে ঈশ্বরের স্বভাব ও নিয়ম চরাচরে বর্ত্তমান আছে সেইরূপে তাঁহার আজ্ঞা পালন করা উচিত। যেরূপ আম্র কাঁচা অবস্থায় পাড়িলে ঈশ্বরের নিয়মের অন্যথাচরণ করা হয়, সেই কাঁচা আম্র অম্ল হয় এবং তাহা ভক্ষণে শারীরিক পীড়া জন্মায়, সেই কাঁচা আম্রের বীজে কোন বৃক্ষ হয় না আর যদিও হয় তাহা হইলে ভাল পুষ্ট হয় না, এবং উহাতে সুন্দর আশানুরূপ ফল ধরে না। কিন্তু ঈশ্বরের নিয়-মানুসারে আম্রকে পক্কাবস্থায় পাড়িয়া ভক্ষণ করিলে উহা সুমধুর ও তৃপ্তিজনক হয়। এবং উহার বীজে উত্তম বৃক্ষ হয় ও উহাতে আশানুযায়ী সুন্দর ফল জন্মায়। আর তাহা হইলে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করা হয়। সেইরূপ যদ্যপি পুত্র কন্যাদিগের বাল্যাবস্থায় বিবাহ হয় এবং সন্তান সন্ততি জন্মায় তাহা হইলে সেই সন্তান রুগ্ন, বলহীন, বুদ্ধিহীন, তেজহীন ও অল্পায়ু হয়। আর যদ্যপি বিচার পূর্ব্বক উহাদিগকে ঈশ্বরের

নিয়মানুসারে পরিপক্ক অবস্থায় অর্থাৎ যুবাবস্থার প্রারম্ভে বিবাহিত করা যায় তাহা হইলে তাহাদিগের যে সকল সন্তান সন্ততি হয় তাহারা তেজ, বল, বুদ্ধি মেধা শক্তি সম্পন্ন হয় এবং দীর্ঘকাল জীবিত থাকে—রুগ্ন হয় না। এবং এইরূপ হইলেই ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা হয়। অতএব পাঁচ বৎসর হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত উঁহাদিগকে উত্তমরূপে বিদ্যা, সৎকার্য্য ইত্যাদি সৎশিক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এবং পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ দিলে উঁহাদিগের বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত হয়। বাল্যাবস্থায় সন্তান সন্ততিদিগকে উত্তমরূপে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া এবং উঁহাদিগকে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু মাতা পিতাতে ভক্তি নিষ্ঠা এবং মাতা পিতা এবং গুরু জনকে সম্মান এবং সৎব্যক্তির আজ্ঞাপালন প্রভৃতি সৎশিক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য—যাহাতে ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক উভয় কার্য্য বুঝিয়া আনন্দরূপে কালযাপন করিতে পারে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া সকলের উচিত এবং অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই সকল উপদেশ পূর্ণ সারগর্ভ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া তৎস্থানস্থিত শ্রোতাগণ কহিলেন, হে মহারাজ, যাহা আপনি আজ্ঞা করিলেন ইহা সত্য বাক্য, আমাদিগের সকলের বিচার পূর্ব্বক ইহার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

সখ্য।

সখ্যরসে আমাদের বৈষ্ণব প্রেমচরিত্রের আলোচনা সম্পূর্ণ। বৈষ্ণব সাহিত্যে বাৎসল্যের নীচেই সখ্যের স্থান। সখ্যের সহিত বাৎসল্যের সম্বন্ধও ঘনিষ্ঠ। অন্য কারণে বলিতেছি না, কৃষ্ণের সখাগণকে নানা অবস্থায় অল্পবিস্তর যশোদার সংস্পর্শে আসিতেই হয়, তিনিও তাহাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, সুতরাং কৃষ্ণের সহিত যেমন যশোদার সহিতও সেইরূপ সখাগণের একরূপ সম্পর্ক দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কেই সখ্য বাৎসল্যে ঘনিষ্ঠতা। মধুর রসে রাধার প্রেমে যখন বৈষ্ণব কবি ভোর, তখন ত আর বড় যশোদারও নাম শুনা যায় না, সখাগণের কথাও কেহ বলে না। তখন মধ্যে মধ্যে কেবল অনামিকা এবং সনামিকা সহচরী, বৃন্দা দূতী, বাহিরে সহস্র গোপিনী, আর গৃহে মুখরা ননদিনী এই বৈ ত নয়। রাধার প্রণয়-ব্যাপারের সহিত জননীর স্নেহ অথবা বন্ধুর প্রীতির সম্বন্ধ থাকিবে কেন? বয়স হিসাবে বিচার করিলেও প্রণয় সখ্য বাৎসল্য হইতে দূরে পড়ে। প্রণয়ের আরম্ভ যৌবনে, সখ্য বাল্যেই, আর বাৎসল্যের ত কথাই নাই—সন্তান জন্মিতে না জন্মিতে জননীহৃদয়ে স্নেহ। বৈষ্ণব সাহিত্যেও তাহাই। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাবধি যশোদার স্নেহে লালিত পালিত,

বয়োবৃদ্ধির সহিত শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি সখাগণের আবির্ভাব, পরে যৌবনসঞ্চারে রাধার সহিত প্রণয় এবং গোপিনীদের হৃদয়হরণ। এখন মাতৃস্নেহে শৈশবের সে সরল নির্ভর আর নাই, আপনার মধ্যে আশ্রয়দানের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইয়াছে, স্বভাবতই একটু স্বাতন্ত্র্য আসিয়া পড়ে। আর রূপসীর প্রেমে মজিয়া সখার জন্য কাহার মন উদ্বিগ্ন হয়? সুতরাং মধুর রস বাৎসল্য এবং সখ্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থিতি না করিয়াও নিশ্চিন্তে থাকে। সখ্যের বাৎসল্যের সহিত বিশেষ আত্মীয়তা। এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে অনেক সময়ে এ আত্মীয়তা অনিবার্য্য।

বৈষ্ণব কাব্যে এই জন্য অনেক স্থলে একই কবিতায় সখ্য এবং বাৎসল্যরসের বিকাশ অনুভব হয়। সখারা আসিয়া কৃষ্ণকে মাঠে লইয়া যাইতে চাহে, নন্দরাণী অনেক মাথার দিব্য দিয়া তবে ছাড়িয়া দেন; তিনি কৃষ্ণকে সাজাইতে বসিলে সখারা আসিয়া সহায়তা করে; কৃষ্ণকে না দেখিলে নন্দরাণীও ব্যাকুল, সখারাও অধীর, সকলে মিলিয়া চারিদিকে খুঁজিতে বাহির হয়। এইরূপে সখ্যরস বাৎসল্যের সহিত মিলিয়া মিশিয়া স্ফূর্ত্তিও পায়। বোধ করি, স্বাতন্ত্র্যাবলম্বনে ইহার এমন সুন্দর বিকাশ হইত না। বাৎসল্যের মধ্যে একটি আশ্রয়ের ভাব আছে—শৈশবে জননীর স্নেহে সন্তানের কি একান্ত নির্ভর! এই জন্যই রমণীর পূর্ণতা মাতৃরূপে। এবং এই ভাবেই কেবল রমণীর স্থান দেবতার উর্দ্ধে। এই পরিপূর্ণ মাতৃস্নেহের প্রশান্ত অন্তরে বিকশিত হইয়াছে বলিয়াই বৈষ্ণব সাহিত্যে সখ্যের যেরূপ মধুরতা এমন আর অন্যত্র দেখা যায় না। সবশুদ্ধ, বৈষ্ণব সখ্যে এমন একটি পারিবারিক ভাব, সুকুমার সরল অনুরাগ ব্যক্ত হয়। এ প্রেমের মূলে কোথাও কোনও প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য নাই—বৈষ্ণব প্রেম চিরদিনই উদ্দেশ্যের অপেক্ষা রাখে না। অনিবার্য্য বলিয়াই তাহার আবির্ভাব। সখারা কৃষ্ণকে সকলহৃদয়ে ভালবাসে, যশোদার স্নেহে তাহারা কৃষ্ণের সহিত এক পরিবার ভুক্ত। এই খানেই সখ্যের চরম উৎকর্ষ। উদ্দেশ্যগত ঐক্য-নিবন্ধন সখ্য এরূপ সরল সুন্দর নির্ব্যবধান হৃদয়মিলন নহে। বিশেষত্ব বাদ দিলে মাধুর্য্যের সহিত ইহার বেশ সাদৃশ্য আছে। তবে সখ্যে অবশ্য আশ্রয়-ভাব তেমন নাই। মধুর রসে রমণীকে আশ্রয় দিয়া পুরুষ-হৃদয় পরিতৃপ্ত। এই জন্য পুরুষের পূর্ণতা প্রেমে। সখ্যে মানবজীবনের সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভের দিকে সেরূপ বিকাশ অনুভব হয় না। আমার বোধ হয়, যে সম্বন্ধেই হোক্, স্ত্রী এবং পুরুষপ্রকৃতির সম্মিলনে মানসিক পূর্ণতার যেরূপ সহায়তা করে, কেবলমাত্র একজাতীয় প্রকৃতির বহুসংখ্যক একত্র সন্নিবেশে তাদৃশ সম্ভব নয়।

কিন্তু সখ্যরস যে আমাদের হৃদয়বিকাশে সহায়তা না করে এমন নহে। তাহা হইলে সখ্যের জন্য হৃদয় ব্যাকুল কেন? আমরা জননীর স্নেহ চাহি, রমণীর প্রেম চাহি, তথাপি হৃদয়ের সম্যক্ পরিতৃপ্তি জন্মে না—সখার প্রেম নহিলে আমাদের

হৃদয়ের এক অংশ শূন্য রহিয়া যায়। তবে, যে ভাবমূলক অনুরাগের উপরে সখ্যের প্রতিষ্ঠা, পারিবারিক বিবিধ বন্ধনে তাহার অল্পবিস্তর পরিতৃপ্তি আছে। এই কারণে এ অভাব বোধ করি সকল সময়ে তাদৃশ গুরুতর নহে। তথাপি জীবনের সহধর্ম্মী সহচর লোকে যাচিয়া পায় না। শ্রীকৃষ্ণের কপালে কিন্তু সখাগুলি মিলিয়াছে ভাল। পরস্পরের প্রতি এমন গাঢ় অনুরাগ—দেখিলে হৃদয় জুড়াইয়া যায়। কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে বনে বনে ধেনু চরাইয়া বেড়ান, ছুটাছুটি খেলা করেন, যশোদাকে ঘিরিয়া আনন্দে করতালি দিয়া নৃত্য করিতে থাকেন। বৈষ্ণব কাব্যে শৈশবের এই সরল ভালবাসা সুন্দর সরল বর্ণনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক, বাঙ্গালার কবি ভিন্ন প্রেমের সৌন্দর্য্য কি অপরে এমন করিয়া অনুভব করিতে পারে? সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি না, এই প্রখর পাশ্চাত্য প্রভাবের দিনে এ কথা বলিয়া হয়ত উপহাসাস্পদ হইব, কিন্তু বাঙ্গালী জাতির মত ভালবাসায় গঠিত পৃথিবীতে আর কোনও জাতি আছে বিশ্বাস হয় না। এই কোমলা প্রকৃতির শ্যামল স্নেহে বর্দ্ধিত না হইলে এমন করিয়া ভালবাসিবে কিরূপে? কেবল ভালবাসি বলিয়াই সকলে মিলিয়া এক জায়গায় জড়সড় হইয়া আমরা কোনও প্রকারে টিঁকিয়া আছি—কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া দিতে চাহি না, পাছে আর ফিরিয়া না আসে, পাছে আর দেখা নাহি হয়।

আমাদের প্রেমে হারাইবার ভয় বিশেষ প্রবল। প্রেমের ধর্ম্মই বুঝি এই। তাই ভায়ের কপালে ফোঁটা দিয়া প্রাণাধিকা ভগিনী যমের দুয়ারে কাঁটা অর্পণ করেন। উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হয় স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু হৃদয়ের ভাব ত প্রকাশ পায়। কৃষ্ণের সখাগণ সম্পূর্ণ বাঙ্গালা। মৃদু কোমল প্রকৃতি, ঔদ্ধত্য আদবেই নাই, কেবল সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসিতে পারে আর ভালবাসা পাইলে সুখী হয়। তাহাদের প্রেমেও এই ভয়ের ভাব দেখা যায়। বোধ করি, এদেশের প্রকৃতির সহিত ইহার বিশেষ যোগ আছে। সেই জন্যই হয়ত আমাদের কাব্যে এত বিরহকাতরতা, বিচ্ছেদে এত ভয়। সখ্য-সম্বন্ধে মধুর রসের সে দারুণ বিরহ না থাক্‌, কিন্তু সখাগণ কৃষ্ণের বিরহ যেরূপ অনুভব করে তাহাও বড় কম নয়। কৃষ্ণকে ছাড়িয়া তাহাদের খেলাধুলা বন্ধ। ভয় হয়, কৃষ্ণ যদি আর না আসে, যদি তাহার কোনও অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। বৈষ্ণব কবি সখ্যরসে ঋতুর প্রভাবে দেখান' আবশ্যক বোধ করেন নাই, নহিলে, সখাগণকেও হয়ত আমরা বর্ষার দিনে রুদ্ধগৃহে উৎকণ্ঠিতহৃদয় দেখিতাম। সখার জন্য শৈশবের এত ব্যাকুলতা আর কোথায় দেখা যায়? প্রেমের উপরেই বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং বৈষ্ণব কবির রাখাল বালকেরা স্বভাবতই প্রেমে গঠিত। তাহাদের বালসুলভ ক্রীড়াশীলতার মধ্যে এমন একটি মধুর ভাব। হইবারই কথা। অনুকূল প্রকৃতি এবং অবস্থার মধ্যে অল্প বয়স হইতেই তাহাদের প্রেমবৃত্তির অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে। তরুচ্ছায়ে, গোচারণে, বংশীধ্বনিতে মনের কোমলা বৃত্তিগুলির

স্ফূর্ত্তির বোধ করি বিশেষ সহায়তা করে। নহিলে, অন্যান্য দেশেও ত সখ্যরসের আলোচনা দেখা যায়। কিন্তু এমনটি হয় না কেন ?

খৃষ্টীয় সাহিত্যে আর্থরের নাইট্‌দলের কাহিনীতে এই সখ্যভাবেরই আলোচনা। আর্থর রাজা—তাঁহার অধীনে নাইটেরা একসূত্রে বদ্ধ। কিন্তু বৈষ্ণব সখাদলের মত ইহাঁরা বাস্তবিক প্রেমসূত্রে তেমন একীকৃত নহেন। সম্মুখে একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে, এই প্রবল উদ্দেশ্য-মত্ততায় য়ুরোপের অশ্রান্ত উদ্যম বাইবেলের প্রেম অবলম্বনে একবার এক জায়গায় জড় হইয়া গাঝাড়া দিল মাত্র। আমাদের গৃহস্থ প্রকৃতি উদ্দেশ্যের ধার ধারে না—শৈশবের সরল ভালবাসায় সখ্যের পরিবার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পরিতৃপ্তি। সেই জন্য য়ুরোপীয় সখ্যে বলের আবশ্যক—বৃহৎ উদ্দেশ্য লইয়া কারবার, বল নহিলে চলিবে কেন ? আমাদের সখ্যে ত আর বিস্তৃত উদ্দেশ্য নাই, ভাল না বাসিয়া আমরা থাকিতে পারি না বলিয়াই ভালবাসি। আমাদের স্বভাবই প্রেম—উদ্দেশ্যের আবশ্যক করে না। য়ুরোপে উদ্দেশ্য মুখ্য, প্রেম গৌণ। সুতরাং আবশ্যক বলিয়া ভালবাসিতে হয়। রাজা আর্থর দুর্জ্জয় বাহুবলে প্রবলপরাক্রম—প্রেমের উপরে সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে বলিয়া সশস্ত্র নাইট্‌দলে সর্ব্বদা পরিবৃত। আমাদের সখারা রাখালবালক। কৃষ্ণ এই সখাদলের রাজা। বৈষ্ণব কবির বর্ণনা হইতে যতদূর বুঝা যায়, দৈহিক পশুবলে কৃষ্ণকে সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় না। তবে বালকেরা সকলেই কৃষ্ণকে ভালবাসে। আর বোধ করি, কৃষ্ণের কতকটা কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতাও আছে। তাঁহার মৃদু মোহন ভাবে সকল বালকই মুগ্ধ। তাহারা প্রেমে কৃষ্ণকে রাজা করে, প্রেমে কৃষ্ণকে ঘিরিয়া রাখে, প্রেম বিনা বৈষ্ণব জগতে আর কিছুই নাই। বৈষ্ণব কাব্যে বলের জয় করে ? বল কেবলমাত্র রাজদণ্ড ধারণ করে, প্রেম জয় করে, পালন করে, শাসন করে, অভয় দেয়। আর প্রেমের মত বল কোথায় ? প্রেম যে অসঙ্কোচে নিঃশব্দে চিরদিন সহিয়া যায়।

বৈষ্ণব কবির সখ্য বাল্যে। এই ত সখ্যের সময়। বিবিধ বন্ধনে মন এখনও বিভক্ত হইয়া পড়ে নাই। সরল হৃদয়ে রাখালবালকেরা পরস্পরকে ভালবাসে মাত্র। বৈষ্ণব কবি একটুকু দূরে দাঁড়াইয়া আপন অন্তরে সেই সরল অকপট অনুরাগ অনুভব করেন। যশোদার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বালকেরা দল বাঁধিয়া ধেনু চরাইতে চাহির হইল। ধবলি সাঙলি পিউলি আগে আগে ধূলি উড়াইয়া চলিয়াছে। পশ্চাতে রাখালবালকেরা বিবিধ বেশভূষায় ভূষিত—কাহারও গলে বনমালা, কাহারও পায়ে মঞ্জীর রুণুঝুণু রুণুঝুণু। শ্যামকে যশোদা সাজাইয়া দিয়াছেন—মাথায় মোহনচূড়া, করে স্বর্ণবলয়, অঙ্গে আভরণ, চরণে নূপুর। এইরূপ সাজসজ্জা করিয়া ব্রজবালকেরা মাঠে যায়। সেখানে যমুনাতীরে তরুতলে তাহাদের খেলিবার স্থান। গোধন ছাড়িয়া দিয়া সখারা খেলায় মত্ত হয়। কতরকম খেলা—কখনও দুই দলে কপাটী, কখনও এ উহার কাঁধে চড়ে, সে তাহাকে তুলিয়া লইয়া ছুটে; বালসুলভ চপলতার কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। বৈষ্ণব কবি বৃন্দা-

সুবাল হইতে খেলা দেখিতে থাকেন। বোধ করি, তাঁহারও একএকবার মন চঞ্চল হইয়া উঠে। অন্ততঃ তাঁহার বর্ণনা পড়িয়া আমাদেরও একএকবার এমন ইচ্ছা হয় যে, শ্যামসুন্দরের সখার দলে গিয়া ভিড়ি। প্রখর মধ্যাহ্নতাপে সখাদের অঙ্গ বাহিয়া শ্রম জলধারা ঝরিতেছে। শ্যামচন্দ্র আর চলিতে পারেন না। তরুতলে ছায়ায় বসিয়া সখারা বিশ্রাম লাভ করে। সঙ্গে "ভোজন সম্ভার ছিল ভারে ভার"। বনপাত পাড়িয়া সখারা মণ্ডল করিয়া বসিল। পাতে পাতে ভাত, সিঙ্গা বেণু ভরিয়া জল। আহারটা বেশ তৃপ্তির সহিতই হয়।

আহারান্তে শিথিল তনু ছড়াইয়া দিয়া কৃষ্ণ শ্রীদামের কোলে শুইয়া পড়িলেন, সুবলের কোলে মাথা রাখিয়া বলরামের চক্ষু আলসে অর্দ্ধনিমীলিত। আর আর সখারা কেহ শুইয়া, কেহ বসিয়া, নানা ভাবে বিশ্রামসুখে মগ্ন। বৈষ্ণব কবি এই সখ্যরসেই মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছেন। রাখাল বালকেরা ছায়ায় বসিয়া বাঁশী বাজায়, বৈষ্ণব কবির হৃদয়ে বাঁশীর স্বরে অলস মধ্যাহ্ন বহিয়া যায়। রাখাল বালক হৃদয়ের আবেগে আকুল-কণ্ঠে গাহিয়া উঠে, বৈষ্ণব কবির অঙ্গ শিথিল হইয়া আসে, চরণ চলে না, হৃদয় উদাস। রাধার নামে কখনও কখনও মধ্যাহ্নে বাঁশী বাজিয়াছে বটে, কিন্তু সখ্যরসে বৈষ্ণব কাব্যে মধ্যাহ্নের যেরূপ বিকাশ হইয়াছে মধুর রসে তেমন হয় নাই। সখাগণের খেলাধূলা সকলই মধ্যাহ্নে। যশোদা বেলা থাকিতে ঘরে ফিরিতে বলিয়া দিয়াছেন। গোধূলির পরে সখারা আর মাঠে থাকে না।

কিন্তু আজ ধেনু সব কোথায়? বেলা পড়িয়া আসিল, খেলায় ভুলিয়া বালকেরা গৃহে ফিরিতে পারে নাই। ধেনু লইয়া গৃহে ফিরিতে সন্ধ্যা হয় বুঝি বা। রাখালেরা ভাবিয়া আকুল, যশোদা কি বলিবেন। কৃষ্ণ বাঁশী বাজাইয়া ধেনুদিগকে আহ্বান করিলেন।

"সব ধেনু নাম কৈয়া, অধরে মুরলী লৈয়া ডাকিয়া পূরিল উচ্চস্বরে।
শুনিয়া বেণুর রব, ধায় ধেনুবৎস সব, পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে।
ধেনু সব সারি সারি, হাম্বা হাম্বা রব করি, দাঁড়াইলা কৃষ্ণের নিকটে।
দুগ্ধ স্রাবি পড়ে বাঁটে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে, স্নেহে গাভী শ্যাম-অঙ্গ চাটে।
দেখি সব সখাগণ, আবা আবা ঘন ঘন, কানুরে করিল আলিঙ্গন।"

সখারা কৃষ্ণকে মধ্যে লইয়া গৃহাভিমুখে ফিরিল। গোক্ষুররেণুতে আকাশ আচ্ছন্ন।

এদিকে যশোদা ভাবিয়া সারা। তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন,

"সকালে আসিহ গোপাল ধেনুগণ লৈয়া।
অভাগিনী রৈল তোমার চাঁদমুখ চাইয়া।"

গোপাল ত এখনও ফিরিল না। ধেনুর পাছে পাছে সে যদি কোনও দুর্গম বনে প্রবেশ করিয়া থাকে। যশোদা ঘর আর বাহির করিতেছেন—যত বেলা যায় ততই

মন ব্যাকুল হয়। পদশব্দ শুনিলে তিনি চমকিয়া উঠেন, কৃষ্ণ আসিতেছে বুঝি। বাতাসে দীপশিখা কাঁপিলে তাঁহার মনে হয়, গোপাল এখান দিয়া ছুটিয়া গেল বা। কিন্তু গোপাল কোথায়? গোপাল এখনও আসে নাই। যশোদার ভয় ক্রমেই গাঢ় হইতেছে।

এমন সময়ে সখাগণসঙ্গে কৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত। যশোদার "গদগদ কণ্ঠ না নিকসয়ে বাণী"। তিনি কৃষ্ণের মুখ মুছিয়া দিলেন। সে বদনকমলে শত লক্ষ চুম্বন করিয়াও তাঁহার হৃদয়ের আশ কিছুতেই মিটে না। জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কোন্ বনে গিয়াছিলে ওরে রাম কানু।
আজি কেন চান্দমুখের শুনি নাই বেণু।
ক্ষীর সর ননী দিলাম আঁচলে বান্ধিয়া।
বুঝি কিছু খাও নাই শুকাঞাছে হিয়া।"

কৃষ্ণকে ক্ষীর সর ননী দিয়া যশোদা ঘুম পাড়াইলেন। সখারাও আপন আপন ক্ষীর সরের ভাগ লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

পাশ্চাত্য সখ্যে প্রেমের এরূপ কোমলতা কোথায় মিলিবে? পাশ্চাত্য প্রকৃতি স্বভাবতই কিছু কঠিন—মনের কোমল বৃত্তির অনুশীলন তাহার ধর্ম্ম নহে। তবে খৃষ্টধর্ম্মের প্রাচ্য সংস্পর্শে বাহিরে যাহা কিছু কোমলতা আসিয়াছে। তথাপি, য়ুরোপীয় রমণীর প্রকৃতিও আমাদের চক্ষে সময় সময় কেমন কঠিন বলিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্য সখ্য, আমার বোধ হয়, মুষ্টিযোগের উপর যেমন নির্ব্বিবাদে এবং স্বচ্ছন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, কোমলতার উপরে তেমন নিশ্চিন্তে নির্ভর করিতে পারে না। তাই বলিয়া সেখানে যে বন্ধু বন্ধুকে ভালবাসে না, মানবের হৃদয় কেবল মাত্র পাষাণ জড়, তাহা অবশ্য নহে। তবে আমাদের সহিত পাশ্চাত্য ভালবাসার প্রকৃতি যেন কিছু স্বতন্ত্র।

কিন্তু শুনিতে পাই, বাঙ্গালী হৃদয়প্রধান জাতি নহে। বাঙ্গালা দেশে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা—এক প্রকার শাণিত তীক্ষ্ণ কূটবুদ্ধির জন্যই আমাদের যাহা কিছু গৌরব। এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলা যায় না। বাঙ্গালার পণ্ডিতেরা নৈয়ায়িক বলিয়াই ভারতবর্ষে সমাদৃত এবং বাঙ্গালী উকীলেরা তনু দেহযষ্টি অবলম্বনে এখনও এ জাতীয় মর্য্যাদা কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে সমর্থ। তবে আর আমাদের হৃদয়ের প্রাধান্য কোথায়? কিন্তু এই ন্যায়শাস্ত্রের কেন্দ্রস্থল হইতেই ত প্রেমের চৈতন্যের আবির্ভাব। এবং এই প্রেমের ধর্ম্মেই ত তিনি সমগ্র বঙ্গদেশকে একাকার করিয়া তুলিয়াছিলেন। অন্তরের কথা না বলিলে সহজে কেহ গলে না। ভালবাসা আমাদের প্রকৃতি না হইলে প্রেমের ধর্ম্মে হৃদয় উথলিয়া উঠিত না। নৈয়ায়িকী বুদ্ধি আমাদের থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে না। আমরা ভালবাসা চাহি—প্রেমের অভাব আমাদের নিকট যেমন দারুণ এমন আর কিছুই নয়।

বৈষ্ণব সাহিত্যে আমাদের এই প্রেম-বৃত্তির সম্যক্ বিকাশ হইয়াছে। এবং বোধ করি আমাদের নৈয়ায়িকী বিশ্লেষণ-বুদ্ধিরও এখানে অল্পবিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু যেমন করিয়াই হৌক্, কাব্যের প্রাধান্যে বৈষ্ণব সাহিত্যে হৃদয়েরই বিশেষ বিকাশ স্বীকার করিতে হয়। আর সখ্যরসে আমাদের হৃদয়ের বিস্তৃতির পরিচয়। পশুজগতে অবধি আমাদের প্রেম ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমাদের গৃহস্থ প্রকৃতিও এইখানেই সম্পূর্ণ ব্যক্ত। সখ্যে সামাজিকতার বিকাশ—সামাজিকতার মধ্যেও আমাদের গার্হস্থ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য সখ্যে গার্হস্থ্য বড় প্রবল নহে। সেই জন্যই বোধ করি আমাদের সখ্য কোমলতর। আমরা পরিবারপরায়ণ জাতি—আমাদের মজ্জায় মজ্জায় পরিবার পরায়ণতা। য়ুরোপ আমাদের তুলনায় সমাজপরায়ণ। সুতরাং কোমলতা এবং মধুরতা অপেক্ষা কঠিন বল তাহার আবশ্যক।

পরিবারপরায়ণ বলিয়াই আমাদের প্রকৃতি তাদৃশ জাঁকজমকপ্রিয় নহে। বাঙ্গালা দেশে বসনভূষণ আদবকায়দার তেমন বাহুল্য নাই। পরিবারপরায়ণতার ত আর এ সকল বড় আবশ্যক করে না। পৃথিবীর বিস্তৃত সমাজে বাহির হইলে এই জন্য অনেক সময় আমাদিগকে একটু সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু আমাদের বসন ভূষণে আদবকায়দায় জমকালো ভাব বড় না থাকিলেও শোভন সৌন্দর্য্যের অভাব স্বীকার করা যায় না। সৌন্দর্য্যজ্ঞান আমাদের মর্ম্মস্থলে প্রচ্ছন্ন, তবে কর্ষণাভাবে তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। সখ্যরসে আমাদের এই জাতীয় বিশেষত্ব অনেকাংশে ব্যক্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সখ্য জমকালো ব্যাপার—কায়দাকরণ, আইনকানুন, অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই। আমাদের সখ্য সরল এবং সুন্দর। য়ুরোপীয় প্রেমচর্চ্চায় দেখাইবার ইচ্ছা বোধ করি বিশেষ বলবতী। সেই জন্য তাহার মধ্যে তেমন শান্তি অনুভব করা যায় না। আমাদের প্রেম প্রশান্তভাবে উপভোগ করিবার।

বৈষ্ণব কাব্যে কোন কোন স্থলে সখ্যের সহিত দাস্যরসও যুক্ত হইয়াছে। আমার বিবেচনায় তাহাকে ঠিক দাস্য বলা যায় না। কারণ, তাহার মধ্যে খেলার ভাবই প্রবল—যথার্থ দাস্য নাই বলিলেই চলে। কিন্তু বৈষ্ণব কবি সখ্যদাস্যরস বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। যমুনাপুলিনে সখারা মিলিয়া কৃষ্ণকে রাজা করিল। কদম্বতরুতলে ফুলের সিংহাসন, সিংহাসনে আসীন রাজা কৃষ্ণ। গলে ফুলের মালা, শিরে ফুলের মুকুট; করে পদ্ম-রাজদণ্ড। মদনের ফুলশরে তবু একটু তীব্রতা আছে। সখারা কৃষ্ণের পাত্র মিত্র সভাসদ্। যেমন রাজদণ্ড তেমনি রাজশাসন। কঠোরতা কিছুমাত্র নাই। প্রেমে কৃষ্ণ এই সখা প্রজাদলের হৃদয় এবং নয়নরঞ্জন। খেলা বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশ হইলে খেলার মধ্যে যে রাজার প্রবল প্রতাপ জাহির হইত না সাহসপূর্ব্বক একথা বলা যায় না। প্রবল ক্ষমতাই পাশ্চাত্য রাজগুণ; আমাদের রাজা রঞ্জনে। সেই জন্যই ত সখারা কৃষ্ণকে রাজা করে।

কিন্তু কৃষ্ণের কি কোনও ক্ষমতা নাই? কেবলই একটুকু রমণীয় কোমলতা? তাহা নহে। সখারা শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছে। কিন্তু ক্ষমতা কেবলমাত্র পাষাণ বলে নহে। শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমতার বিকাশ প্রেমভাবের মধ্য দিয়া। সেই জন্যই বৈষ্ণব সাহিত্যে দাস্য সখ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় না। প্রেমের রাজ্যে বিরোধ স্থান পাইবে কিরূপে? কৃষ্ণও ত বৈষ্ণব কাব্যেরই চরিত্র। স্বভাবতই উদ্ধত ভাব তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সখারা কৃষ্ণকে যেমন ভালবাসে, কৃষ্ণও সখাদলের প্রতি সেইরূপ অনুরক্ত। প্রেমই প্রেম আকর্ষণ করে। তাই বৈষ্ণব সাহিত্যে কোমলতার আশ্রয়ে দুর্ব্বল বল পাইয়াছে, সভয় নির্ভয় হইয়াছে, উচ্ছৃঙ্খলা অশান্তি মধুর সখ্যে শাসিত।

এই কোমল বৈষ্ণব সখ্য আমাদের মধ্যে চিরদিন জয়যুক্ত হৌক্। আমরা পরস্পরকে ভালবাসিয়া ভয় হইতে রোগ হইতে শোক হইতে মুক্ত হই।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পালিতা।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

আমরা জানিতাম, বিবাহই মানুষের জীবনের—অন্তত বঙ্গবাসীর জীবনের, চরম প্রার্থনীয়, চরম বর্ণনীয়, চরম জ্ঞাতব্য, চরম শ্রোতব্য বিষয়; কেবল চরম সুখের বলিতে পারিলাম না, কেন না এইখানেই তাহার জীবনের শেষ নহে; ইহার পর ভবিষ্যতের গদ্যময় জীবন লইয়াও তাহাকে কারবার করিতে হয়। কিন্তু উপন্যাস লেখকের সে স্বাধীনতা টুক আছে, তিনি সহজেই এই স্থলে 'ইতি' দিয়া সংসারকে সংসার-দুর্লভ সেই চরম সুখের আস্বাদ দান করিতে পারেন। অন্য কোন অভিপ্রায়ে নহে, এই হিতকর ভাব-প্রণোদিত হইয়াই আমরা জীবনের বিবাহের পর-জীবনের যবনিকা এতক্ষণ ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু ইহাতে কৌতূহল-উদ্দীপ্তা পাঠিকা সুন্দরীর অপাঙ্গ-প্রান্তে যে ক্রোধ বহ্নি জ্বলিয়াছে তাহা নির্ব্বাপিত না করিলে দ্বিতীয়বার বুঝি বা বিশ্ব ভস্ম হইয়া যায়। সুন্দরীর ক্রোধ সংহৃত হউক, আমরা যবনিকা উত্তোলন করিতেছি। তবে তাহার আগেই একটি কথা বলিয়া রাখি, এ দৃশ্যে নূতন কিছু না পাইলে তিনি আবার যেন আমাদের দোষী না করেন। আমাদের ত বিশ্বাস এতখানি রাগ না করিয়া তিনি যদি কেবল প্রশান্তভাবে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে (তাঁহার গৃহটি অবশ্য ইহার অন্তর্গত নহে) দৃষ্টিপাত করিতেন তাহা হইলে তাঁহার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইত না। কেননা, আমরা যতদূর জানি তাহাতে বঙ্গযুবকের জীবন এ অবস্থায় সাধারণতঃ প্রায় সমানই

এক ঘেয়ে দৈনিক আহার বিহার, শুষ্ক কর্ম্ম-তালিকার সমষ্টি। পরস্পরের সহিত যাহা কিছু পার্থক্য আছে, সে যেন থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া, বড়ি, থোড়। যতদিন পর্য্যন্ত ইহাঁদের না বিবাহ হয়, ততদিন কেবল ইহাঁরা ফুট কড়াইয়ের মত ফুটিয়া নিজেদের একটা স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়া থাকেন, সমাজ সংস্কার, ধর্ম্ম সংস্কার, আশা, কল্পনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তাঁহাদের হৃদয় সতেজ উত্তপ্ত, বরঞ্চ অনেক সময় অতিরিক্ত মাত্রায় উষ্ণ থাকে; কিন্তু খোলাটি হইতে নামিবা মাত্র বিবাহের ঠাণ্ডা বাতাস যেমন তাঁহাদের গায়ে লাগে অমনি তাঁহারা এমন মিয়াইয়া যান, যে সহস্র চেষ্টায় আর তাঁহাদের পূর্ব্বের মতটি করা যায় না। তবে যাঁহারা লোহার কড়াই, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, সমাজ-যাঁতা কিছুতেই তাঁহাদের আয়ত্তে আনিয়া বাগ মানাইতে পারে না। যাঁতা ঘুরপাক দিয়া যতই তাঁহাদিগকে পিশিবার চেষ্টা করে—তাঁহারা ততই তাহার গ্রাস হইতে পিছলাইয়া অদম্য মূর্ত্তিতে পুনর্ব্বার বাহিরে দণ্ডায়মান হন।

কিন্তু সুখের বা দুঃখের বিষয় জানিনা, আমাদের দেশে এরূপ লোহার কড়ায়ের সংখ্যা বড়ই বিরল, তাই উপন্যাসের নায়ক পাওয়া দায়। অন্ততঃ জীবন সে শ্রেণীভুক্ত নহে, সাধারণ বঙ্গ যুবকের ন্যায় বিবাহের বেড়ি পরিয়া সেও নিতান্ত নিস্তেজ অবসন্ন,—তাই তাহার সম্বন্ধে নূতন খবরের বড়ই টানাটানি। সে এখন উকিল, খায় দায়, অন্নের চেষ্টায় আদালতে যায়, তাহার পর দিনান্তে বাড়ী ফেরে। গৃহে আসিয়া প্রতিদিনই কোন না কোন হেঙ্গাম! আজ বড় খোকা সারাদিন জলে ভিজিয়া জ্বর করিয়া বসিয়াছে, কাল খুকী কালী মাখিয়া ভূত সাজিয়া মা'র নিকট দুমদুম করিয়া কিল খাইতেছে আর কাঁদিতেছে, পরশু কোলের খোকা পড়িয়া মাথা ফাটাইয়াছে; শাশুড়ি বুঝি সেই জন্য টগরকে দুএক কথা কি বলিয়াছিলেন, তাহাতে সে রাগ করিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যাইতে উদ্যত। জীবনের মা কাঁদিয়া কাটিয়া তখন তাহাকে বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অবশেষে এই উভয়ের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া জীবনের প্রাণ ওষ্ঠাগত। প্রতিদিন এই রূপ কোন না কোন ব্যাপার। জীবন যদি কোন দিন এসম্বন্ধে টগরকে কোন কথা কহেন ত টগর সমস্ত দোষ শাশুড়ির ঘাড়ে ফেলে। "তিনিই ত আদর দিয়া ছেলেগুলাকে নেহাৎ বিগড়াইয়াছেন, তাঁহার জন্য উহাদের ইহকাল পরকাল খাওয়া গেল! তার আপন ছেলে পর হইল! ইহার উপর আবার কথায় কথায় বকুনি! একবার ছেলেদের দেখতে বল্লে সাত কথা শোনানো! আদর দেবার বেলা তিনি, আর 'কন্নাৎ' করবার বেলা ও বকুনি খাবার বেলা টগর!"

ইহা শুনিয়া যদি জীবন শান্তভাবে চুপ করিয়া থাকে ত সব গোলমাল সেদিনকার মত চুকিয়া যায়—নহিলে জীবন মায়ের পক্ষ লইলেই সর্ব্বনাশ! তাহাদের কথাবার্ত্তা তখন ঝগড়া ঝাঁটিতে পরিণত হইবার পর, টগর হয় রাগ করিয়া গৃহ হইতে চলিয়া যায়

বা কাঁদিতে বসে,—জীবন বাহিরে আসিয়া পাঠনিমগ্ন হয়। পাঠই এখন তাহার জীবনের প্রকৃত সুখশান্তি। তাহার পূর্ব্বজীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কল্পনা প্রভৃতি যাহার সফলতায় একদিন সে সুখী হইবে আশা করিয়াছিল, সে সকল এখন তাহার পক্ষে একরূপ আকাশ-কুসুম. তবে তাহার মনোরাজ্য হইতে তাহাদের অস্তিত্ব যে একেবারে মিলাইয়া পড়িয়াছে তাহাও নহে। এখনো সে মাঝে মাঝে ভাবে—টাকা হইলে বিলাত যাইবে, একাকী নহে ছেলেদের লইয়া যাইবে,নিজের জীবনের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা তাহাদের দ্বারা পুর্ণ করিবে। তবে আগেকার মত এ সকল কল্পনা তাহার মনে জ্বলন্ত সত্যের আকার ধারণ করে না, সে আর পূর্ব্বের মত আশাপ্রবণ নাই, অভিজ্ঞতা তাহাকে শিখাইয়াছে, যাহা আশা করা যায় তাহাই কিছু সিদ্ধ হয় না। সংসার নৈরাশ্যের রাজ্য।

কিন্তু অভিজ্ঞতা মনুষ্যের বুদ্ধিকে পরিচালিত করে বলিয়া স্বভাবকে একেবারে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। কেননা বুদ্ধিই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব নহে, হৃদয় বলিয়া তাহার স্বতন্ত্র আর একটি যে পদার্থ আছে—তাহার প্রভাব মনুষ্যের উপর কোন অংশে কম নহে, বরঞ্চ অধিক। সুতরাং জীবনের দুঃখ কষ্ট নৈরাশ্য তাহাকে যে অভিজ্ঞতা প্রদান করিয়াছে তাহাতে তাহার স্বভাবের মূল ভাব পরিবর্ত্তিত হয় নাই। বুদ্ধিতে সে নৈরাশ্য-প্রবণ কিন্তু হৃদয়ের অন্তর প্রদেশ এখনো তাহার আশা বিশ্বাস পূর্ণ, অন্য কথায় তাহার অবিশ্বাস মৌখিক, বিশ্বাসই স্বাভাবিক। সে মনে করিতে চায়, এক অন্ধ মহাবল গতিচক্রই সংসারকে নিষ্পীড়ন করিয়া চলিয়াছে, দয়া করুণা সহানুভূতি পরবৎসলতা এখানে অর্থহীন, অথচ এই চিন্তা স্বত্বেও ছেলেবেলা সে যেরূপ আগ্রহে তাহাদের গুপ্তসভার কার্য্য করিত, এখনো সেইরূপ আগ্রহে সে কনগ্রেসের কাজ করে। জীবন উপার্জ্জন করে মন্দ নহে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কখনো তাহার টাকার স্বচ্ছলতা হইল না। টাকার অভাবে তাহার ইংলণ্ড যাওয়া হয় না, কিন্তু তাহার বন্ধু নবীন এখন ইংলণ্ডে; মাঝে মাঝে তাহার আবশ্যক হইলে তাহাকে সাহায্য করিতে·বা গরীব ছাত্রদিগকে অর্থদান করিতে জীবনের কখনো অর্থাভাব হয় না।

স্নেহলতা জীবনের বাড়ী আসিয়া অবধি জীবনের বুদ্ধিগত এই অবিশ্বাসও ক্রমে দূর হইয়া আসিতেছে। স্নেহলতার প্রতি জীবনের পূর্ব্ব প্রেম এখন একটি প্রশান্ত বন্ধুত্বে পরিণত, তাহার সহিত কথাবার্ত্তায় তাহার সরল বিশ্বাসে জীবন যেন একটি নূতন যুক্তি রাজ্য দেখিতে পাইয়াছে। যে নৈরাশ্য তাহার হৃদয়ের অন্তর প্রদেশকে কীটের ন্যায় অল্পে অল্পে ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছিল, স্নেহলতার আনন্দজনক-স্নেহে, তাহার বিশ্বাস-পূর্ণ কথাবার্ত্তায় তাহা দূর হইয়া সহসা জীবনের হৃদয় আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়াছে। স্নেহলতা আসিবার পর নবীনকে সে যে পত্র লিখিয়াছে, আমরা এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠক ইহা হইতে তাহার এখনকার মনের অবস্থা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

জীবনের পত্রাংশ।

না, ভাই তুমি আমাকে হার মানাইয়াছ! কিছু দিন পূর্ব্বে আমি ভাবিতাম আমার মত নৈরাশ্যপ্রবণ, সন্দেহঅন্ধ লোক বুঝি আর দুনিয়ায় নাই, এখন দেখিতেছি হাজার হউক ভারতবর্ষ সূর্য্য প্রধান দেশ, কোন রূপ অন্ধকার-মালিন্য এখানে বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে না,—কিন্তু আলোক-উত্তাপবিহীন, প্রচণ্ড শীত-ইংলণ্ড প্রদেশে বাস করিয়া দিন দিন তোমার মনটি যেরূপ বরফ শিলার মত কঠিন Materialistic হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে সহজে তোমার প্রকৃতিস্থ হইবার বড় সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

আচ্ছা ভাবিয়া দেখ, সংসার সত্য সত্য একটা ফাঁকির উপর, একটা ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহা কি তিষ্টিতে পারিত?

যখন আমরা সংসারের অস্তিত্ব মানিতেছি, অমনি সঙ্গে সঙ্গে কি ইহার একটা উদ্দেশ্য, একটা সত্যভিত্তি, অন্য কথায় সৃষ্টি ও স্রষ্টার অবিভেদী সম্বন্ধ মানিয়া লইতেছি না? নহিলে সংসার বা সৃষ্টির অস্তিত্ব কোথায়?

আমাদের জীবনে আমরা যে ভ্রান্তি রহস্য দেখিতে পাই, আমাদের ইচ্ছা ও ঘটনার মধ্যে অনবরত যে দ্বন্দ্ব ভাব প্রত্যক্ষ করি, যেমন আমরা ইচ্ছা করি এক হইয়া বসে আর, চাহি ভাল হইয়া যায় মন্দ, করিতে যাই মঙ্গল ঘটে অমঙ্গল'; আমাদের বুদ্ধির অগম্য এই যে সকল প্রহেলিকা যাহাকে আমরা অন্ধকার অদৃষ্ট বলি, তুমি বলিবে সংসার যে ভুলের দ্বারা চালিত ইহাই তাহার প্রমাণ। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহার মূলেই কি এক জ্ঞানময় মহাশক্তির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না? যে মহাশক্তি জীবের ইচ্ছাকে আপন ইচ্ছা শক্তির অন্তর্গত করিয়া তাহাকে কেবল যন্ত্র-স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে মাত্র।

বহির্জগতের ক্ষুদ্র একটি অণুকনা, সামান্য পতঙ্গ দেহ, আর বিশাল সৌর জগৎ-প্রণালীর মধ্যে যখন এক মহা সাম্যময়, উদ্দেশ্য-পূর্ণ সম্পূর্ণ কলকৌশল দেখা যাইতেছে, তখন মনোরাজ্যও যে এক পূর্ণ উদ্দেশ্যময় প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত সে বিষয়ে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? তবে সে প্রণালী, সে উদ্দেশ্য এখনো আমাদের অনায়ত্ত। তাই আমাদের নিকট তাহা প্রহেলিকা, তাহা ভ্রান্তিময়; তাই তাহার একটি ঘটনার সহিত অন্যটির গূঢ় সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে আমরা অক্ষম। আমাদের জীবনের ঘটনা আমাদিগের জ্ঞানকে, আমাদের ইচ্ছাকে যে অনবরত অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, সে কেবল সেই অনতিক্রম্য পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণালীর অনুসরণ করিয়া। আমরা বিশ্বের এক একটি অংশ মাত্র, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রত্যেক অংশের গতিতেই সমগ্র বিশ্বের সাম্য, মঙ্গল রক্ষা হইতেছে, সুতরাং বিশ্বের মঙ্গলেই আমাদের প্রকৃত মঙ্গল, যন্ত্রচালক

যিনি, তাঁহার নিকটেই সেই মহা মঙ্গলের পথ জ্ঞাত। আমরা সীমা চক্ষু দিয়া মঙ্গল অমঙ্গল নির্দ্দিষ্ট করিতে গিয়াই কেবল ভ্রমে পড়ি। আমি কে? ইচ্ছা বা কার্য্য কাহার? সমস্তই সেই বিশ্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমানের প্রভাব মাত্র। এই বুঝিয়া তাঁহার মঙ্গল নিয়মে একান্ত বিশ্বাস এবং তাঁহাতে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া চলিলেই আমরা নিরাপদে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিব। এই সত্য একবার উপলব্ধি করিতে পারিলে আর নৈরাশ্য আমাদিগকে কোন মতে অভিভূত করিতে পারে না। কিন্তু তোমার মত রঙ্গিন চষমা পরিয়া যদি সংসারের দিকে চাহা যায়, তাহা হইলে অবশ্য সত্যও মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়, জীবন একটি উদ্দেশ্যহীন বিশৃঙ্খল মহাশূন্য-স্বরূপে প্রতীত হয়, সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য, এমন কি স্নেহ প্রেমের বন্ধন পর্য্যন্তও তাহা হইলে শিথিল হইয়া পড়ে; এবং তখনি প্রকৃতপক্ষে আমাদের জ্ঞান অজ্ঞানে, অস্তিত্ব নাস্তিত্বে পরিণত হয়।

ভালবাসা সম্বন্ধে তুমি যে রহস্য করিয়াছ তাহা পড়িয়া আমার মনে হইল তোমার প্রকৃত "তুমি" তোমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তুমি এখন মৃত। আমার মনে হইতেছে সেই জন্যই অর্থাৎ ভালবাসার উপর অবিশ্বাস জন্মিয়াছে বলিয়াই তোমার সমস্ত জগৎ সংসারের উপর অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, কেন না ইহার উপরেই কি না আমাদের প্রকৃত জীবনের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। সংসারে আর যাহাই ভুল হউক, ভালবাসা কখনই ভুল নহে। এই বন্ধনেই সৃষ্টি ও স্রষ্টার একত্ব। খৃষ্ট ধর্ম্মের পিতা, পুত্র, আত্মা, আর হিন্দু দর্শনের ঈশ্বর, প্রকৃতি, পুরুষ অর্থাৎ সৃষ্টি স্রষ্টা ও এই উভয়ের মধ্যে যে অবিভেদ্য সম্পর্ক-বন্ধন সূত্র, জড় জগতে তাহা আকর্ষণ—চেতন জগতে তাহা প্রেম-রূপে বিরাজিত। এই তিনে এক একে তিন, ইহাই জগৎ। সংসারের ছোট ছোট ভালবাসা ইহারই প্রতিরূপ। সুতরাং আর যাহাই ভুল হৌক ভালবাসা ভুল নহে, এমন কি আমরা সংসারে যাহাকে রক্ত সম্পর্কে আত্মীয় বলি—তাহারা ত ঘটনা চক্রের accidents মাত্র; ভালবাসাতেই প্রকৃত আত্মপর, ভালবাসাই মনুষ্যের প্রকৃত জীবন। যেমন শরীর পুষ্টির জন্য খাদ্যের, তেমনি অন্তরাত্মার পুষ্টির জন্য ভালবাসার প্রয়োজন। আমি স্বীকার করি শারীরিক মানব প্রকৃত নিঃস্বার্থ হইতে পারে না, পরের ব্যয়ে নিজেকে তাহার কিছু না কিছু পরিমাণে পোষণ করিতেই হয়, তুমি না থাকিলে আর একজন তোমার স্থল অধিকার করিতে পারিত, যে অন্নমুষ্টি তোমার গ্রাসস্থ হইতেছে—তুমি না খাইলে তাহা অন্যের জন্য থাকিত, সুতরাং শরীর রক্ষার জন্য সংসারে জীবন সংগ্রাম অনিবার্য্য। কিন্তু মানুষের শরীরই কি সর্ব্বস্ব? মানুষ এক অপূর্ব্ব জীব। শরীরের জন্য স্বার্থ নহিলে সে যেমন বাঁচিতে পারে না—তেমনি তাহার আত্মার জীবনের জন্য অন্যকে না ভালবাসিয়া অর্থাৎ আত্মদান না করিয়া সে থাকিতে পারে না। যে মনুষ্যে যত মনুষ্যত্ব অধিক—তাহার প্রেমও তত সুগভীর, সুবিস্তৃত, তাহার সমগ্র প্রকৃতি তত প্রেমময়, অর্থাৎ পরের সুখের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিয়া সে তত সুখী।

তুমি বলিবে লোকে কি আত্মদান করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তাহার কি বিনিময় চাহে না? প্রেমমাত্রেই যে প্রতিদান চাহে তাহা যদিও নহে,—যিশুখৃষ্ট, চৈতন্য ইঁহারা ভাল বাসিয়া কি প্রতিদান চাহিয়াছিলেন? দুঃখীর প্রতি যে স্বতঃকরুণা, মহৎভাবের প্রতি যে অনুরাগ, যন্ত্রণার প্রতি যে সহানুভূতি তাহার মধ্যে কি প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা আছে?

কিন্তু আমি বলি যে প্রেমে আমরা প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা করি, প্রতিদানের উপর যাহার পরিপূর্ণ বিকাশ, পরিপূর্ণ আনন্দ নির্ভর করে, তাহাও নিকৃষ্ট প্রেম নহে? তাহাও স্বার্থপর ভাব হইতেই উৎপন্ন নহে। আমরা ভালবাসিয়া প্রতিদান চাহি কেন? জানি ভালবাসিয়া কি আনন্দ, তাই, আমি যাহাকে ভালবাসি—আমা হইতে সে সেইরূপ আনন্দ লাভ করুক এই আকাঙ্ক্ষা হইতেই প্রধানতঃ আমরা ভালবাসা চাহি। বস্তুতঃ ভালবাসা দানে গ্রহণে সমান আনন্দ, ভালবাসার স্বভাবই এই, যে যত ভালবাসা গ্রহণ করিতে পারে—সে তত ভালবাসিতে পারে। ভগবানই এ সম্বন্ধে আদর্শ প্রেমিক। তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রেম গ্রহণ করিতেছেন, এবং তাহাদের প্রেমে মগ্ন আছেন। এই জন্য প্রেমাকাঙ্ক্ষা, মিলন স্পৃহা আমাদের উচ্চ অনুভাব। Blessed are they that expect nothing—এ কথা সত্য বটে, কিন্তু আমার মতে অনিয়মিত, অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাই এই উপদেশের লক্ষ্য।—আকাঙ্ক্ষা মাত্রেই যে মনুষ্যের কষ্টের কারণ বা প্রেমে বিকৃতি আনয়ন করে—তাহা নহে। তাহা হইলে ঈশ্বর-প্রেমে মিলনের আকাঙ্ক্ষা জন্মিত না।

প্রকৃত পক্ষে প্রেমের যে আকাঙ্ক্ষা তাহা অসম্পূর্ণ প্রকৃতির সম্পূর্ণ হইবার অভিলাষ, সান্তের অনন্তাভিমুখী গতি। মানুষের মধ্যে আমরা যখন দেবভাব অনুভব করি—তখনই আমরা ভালবাসি—এবং তাহার আত্মার নৈকট্য অনুভব করিতে চাই। আকর্ষণের নিয়মই উভয়তঃ। সুতরাং যে মানুষ ভালবাসা না চায় হয় সে জীবনমুক্ত, নয় সে পাষাণ, অর্থাৎ ভালবাসার ক্ষমতা তাহার নাই।

এই দেখ এইরূপে দেখিলে বাসনা আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত অর্থহীন নহে, তাহা না থাকিলে মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষা হইত না, সৃষ্টি লোপ হইত। সুতরাং সংসারে ভুল কিছুই নহে, ঠিক দিক দিয়া দেখিলে সমস্তই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কনগ্রেসের মহিমা আমার নিকট এত অধিক কারণ—তাহাতে আমাদের মধ্যে এক সুবিস্তৃত মহাপ্রেম জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি বলিয়া নহে, পূর্ব্ব পশ্চিমকে জেতৃ বিজেতৃকে এক প্রেমসূত্রে বাঁধিয়া কনগ্রেস তাহাদের মধ্যে যে আত্মীয়তা সঞ্চার করিতেছে, তাহাতেই কনগ্রেসের গৌরব। এই মহামিলনেই কনগ্রেসের জয়। আমাদের পলিটিক্যাল উন্নতি বা সামাজিক উন্নতি ইহার আনুষঙ্গিক ফল মাত্র।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

আর সকলকে এড়ান যায়, অদৃষ্টকে এড়ান যায় না, সে সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। সৌভাগ্যশালী ছাইমুষ্টি ধরিলে তাহা স্বর্ণ মুষ্টি হইয়া তাঁহার হাতে উঠে, আর দুর্ভাগার এক গাঁ মাগিলেও যা, সাত গাঁ মাগিলেও তাই। স্নেহলতাও তাহার সমস্ত দুঃখ কষ্ট কিশোরীর বাড়ী ফেলিয়া আসিতে পারে নাই, এখানে জীবন ও জীবনের মা তাহাকে একদিকে যেমন স্নেহ করেন, অন্য দিকে টগরের সে অপ্রিয়ভাজন, সুতরাং তাহার জীবনের বৈশিষ্ট্য এখানেও বজায় আছে।

তবে স্নেহের পক্ষে এ কষ্ট কষ্টই নয়, এতদিন কিশোরীর বাড়ীতে সে যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে তাহার তুলনায় ইহা সমুদ্রে শিশিরের ন্যায়। বিশেষ জীবন ও তাহার মাতার অকৃত্রিম স্নেহে সে এতদূর কৃতজ্ঞ, এত পরিতৃপ্ত যে ওরূপ সামান্য দুঃখ কষ্ট সহজেই সে উপেক্ষা করিতে পারে। কিন্তু এই নূতন সুখ-শান্তিময় জীবন লাভ করিয়া সে কি তাহার পুরাতন বন্ধুদিগকে ভুলিয়া গিয়াছে? না। কমলাকে, কমলার সন্তানদিগকে মাঝে মাঝে দেখিতে তাহার বড়ই ইচ্ছা করে,—আর?—সেই জন্যই কি তাহার অন্তর প্রদেশ হইতে মাঝে মাঝে এক একটি আকুল দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে,—না তাহা আর কাহারো জন্য?

স্নেহলতা আসিয়া টগর যে নিতান্ত অসন্তুষ্ট তাহাও নহে, এখন তাহার আর ঘর-সংসার ছেলেপিলে কিছুই দেখিতে হয় না, স্নেহলতা দাসীর মত খাটে, সে নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া বসিয়া কাটায়, ইচ্ছামত যখন-তখন বাপের বাড়ী যাইতে পারে, আর কোন কিছুতে একটুখানি ত্রুটি পাইলে ঝাল ঝাড়িবার পাত্রও সম্মুখে পায়, টগরের মত অলস, 'বাবু লোকের' এ কম সুখের বিষয় নহে। তবে স্নেহলতা যে শাশুড়ির প্রিয়, স্বামী যে তাহার সহিত গল্প স্বল্প করিতে ভালবাসেন, তাহাকে মান্য ভক্তি করেন এইটা তাহার ভাল লাগে না। কিন্তু এ অসুবিধার মধ্যেও তাহার একটু সুবিধা আছে; ছেলেদের অযত্ন হইতেছে বলিয়া আজকাল তাহাকে আর জীবনের কাছে বকুনি খাইতে হয় না; কেবল তাহাই নহে, আগের অপেক্ষা টগরের নিকট তিনি সকল রকমেই নরম, টগর বরঞ্চ তাঁহাকে হাতে পাইয়া মাঝে মাঝে আরামে বেশ দুচার কথা শুনাইয়া পরিতৃপ্ত।

আসল কথা, টগর সূর্য্যমুখীও নহে, কুন্দনন্দিনীও নহে, সে যে স্বামীর ভালবাসার জন্য মরে বাঁচে তাহা নহে, তাহাকে হাতে রাখা লইয়া তাহার বিষয়। নির্ব্বিবাদে সংসার চলিলে, স্বামী তাহাকে না বকেন, আর সে যদি স্বামীকে বকিতে ঝকিতে অধিকার পায় তাহা হইলেই সে বেশ খুসীতে থাকে। বিশেষ জীবনের স্বভাব চরিত্র সে জানে, তাহাকে অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই, সে জানে স্নেহলতার প্রতি তাঁহার

স্নেহ—দুর্ভাগ্যের প্রতি করুণা মাত্র। সুতরাং ইহাতে ক্ষতি কিছুই নাই, বরঞ্চ ইহাতেই জীবনকে সে আয়ত্তে পাইয়াছে। এই সকল কারণে স্নেহলতার প্রতি সে যতই অপ্রসন্ন হউক, তাহাকে সে ছাড়িতে চাহে না। এমন কি পাছে স্নেহলতা এখানে আছে জানিলে জগৎ বাবু তাহাকে লইয়া যান, এজন্য তাঁহাকেও ইহা জানিতে দেয় নাই। স্নেহলতা সেখানকার কথা উঠাইলেও সে এরূপ ভাবে কথা কহে যাহাতে তাহার মনে সেখানে আশ্রয় পাইবার আশা আর না জন্মায়। চারু তাহার জন্য মৃত্যুমুখে পড়িয়াছিল, বারবার ভৎর্সনা ভাবে সেই কথা তাহাকে শোনায়, শুনাইয়া বলে সেই জন্য স্নেহের নাম পর্য্যন্ত তাহার বাড়ীর কেহ আর সহিতে পারেন না।

স্নেহ প্রায়ই কমলাকে দেখিতে যাইতে চাহে, কিন্তু সে তাহাতেও রাজি নহে, ক্রমাগতই সে আজ নয় কাল বলিয়া তাহার যাওয়া বন্ধ রাখে। আসল কথা; স্নেহ এক দিনের জন্যও কোথায় গেলে তাহার ছেলেদের অযত্ন হইবে। কিন্তু একদিন ইহা লইয়া বড় গোল বাধিল, কমলার দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া স্নেহকে বলিল "বৌ মা একবার শীঘ্র চল গো, দেরী হলে আর দেখতে পাবে না গো—মা তোমাকে দেখতে চেয়েছে—" ইহা শুনিয়া স্নেহ একেবারে জীবনের মার নিকট আসিয়া কহিল— "মা আমি যাই, ছোটবৌএর বড় অসুখ—" জীবনের মা সম্মত হইলেন, স্নেহ দাসীকে পাল্কি আনিতে বলিয়া টগরকে বলিতে গেল—সে রাত্রে হয়ত তাহার আসা হইবে না, টগর ছেলেদের লইয়া যেন শোয়।"

তাহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া স্নেহ চলিয়া যাইতেছে শুনিয়া টগর ভারী রাগিয়া গেল,— মুখ ভার করিয়া বলিল—"আমার শরীর ভাল নেই, কোথায় ভাবছি বাপের বাড়ী যাব, তা তুমি গেলে কি করে হবে? আজকের দিনটা থাক, কাল না হয় যেও।"

স্নেহ বলিল—"ছোটবৌয়ের বড় অসুখ আজ আমার না গেলেই নয়।"

টগর স্থির করিয়াছে বাপের বাড়ী হইতে আজ রাত্রে থিয়েটার যাইবে, সুতরাং ও কথায় সে নিরস্ত হইবার নহে! সে বলিল—"বৌয়ের অসুখ ত অনেক দিন চলছে, ও ত পুরোন রোগ, ওতে একদিনে ত আর সে মরছে না। আমার মায়ের অসুখ, আজ আমি এখানে কোন মতেই থাকতে পারব না।"

এই সময় দাসী খবর দিল—"বৌদিদি পালকী এসেছে গো এস।"

স্নেহ বলিল—"টগর, আজ তুই থাক, বৌয়ের বড় বেড়েছে, কি হয় কিছুই বলা যায় না, আমি যাই। নিতান্ত তোর যেতে হয় পরে বরঞ্চ মাকে বলে যাস; তিনি রাতে ছেলেদের নিয়ে থাকবেন।

টগর বলিল, "তাই বই কি? সে তুই যা করতে হয় করিস, আমি এখন চল্লুম" বলিয়া সে দুম দুম করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া স্নেহলতার জন্য আনীত পালকীতে গিয়া উঠিল, দাসী অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। স্নেহলতা নীরবে অশ্রুপাত করিতে করিতে জীবনের

মার নিকট গিয়া কহিল—"টগর চলে গেল, কিন্তু আজ আর আমি থাকতে পারব না—বৌয়ের বড় অসুখ।" জীবনের মা বলিলেন "তুমি যাও আমি ছেলেদের দেখব এখন।"

আবার পাল্কি ডাকাইয়া স্নেহলতা চলিয়া গেল।

... ...

রুগ্ন কক্ষ, রোগী অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে প্রলাপ বকিতেছে, মাঝে মাঝে চোখ চাহিয়া জল চাহিতেছে আর কহিতেছে, "দিদি এলে গো" ? দাসীগণ কাঁদিতে কাঁদিতে শুশ্রূষা করিতেছে আর জ্যেঠাইমা দূরে দাঁড়াইয়া ভীষণ মূর্ত্তিতে চীৎকার করিতেছেন—"বলি এখনো ডাক্তার এলোনা ? কে ডাকতে গেছে বল দেখি।"

স্নেহলতা কম্পমান হৃদয়ে এই আসন্ন মৃত্যু-দৃশ্যের মধ্যে আসিয়া সাশ্রু নয়নে ধীরে ধীরে কমলার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। কমলা একবার চোখ চাহিয়া বলিল—"দিদি বুঝি" ? তাহার কষ্ট পীড়িত শীর্ণ মুখ একটি প্রশান্ত প্রফুল্লভাবে পরিপ্লুত হইল. স্নেহের বুক ফাটিয়া অশ্রু উথলিয়া উঠিল, কমলা আবার বলিল—"এতদিনে এলি—দিদি," স্নেহ কাঁদিতে কাঁদিতে আকুলহৃদয়ে তাহার হাতখানি আপনার হাতের মধ্যে ধরিয়া তাহার নিকটে বসিয়া পড়িল, কমলা তাহার হাতখানি সস্নেহে টিপিয়া বলিল—"দিদি—আমি চল্লুম, মাপ করিস্,—আমাকে না তাঁকে, তোকে বড় কষ্ট দিয়াছে, মাপ—করিলি ভাই ?" স্নেহ কাঁদিয়া কহিল, "দিদি আমার, তুই কোথা যাস—আমাকে নিয়ে চল।"

কমলা মৌন, ওষ্ঠাধর স্তম্ভিত, শূন্য দৃষ্টি উর্দ্ধে স্থাপিত; মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার এই বিংশতি বৎসর-প্রবাহিত জীবন-গতি রুদ্ধ, নিস্তব্ধ ! স্নেহলতাকে দেখিবার জন্যই এতক্ষণ সে যেন মৃত্যুকে ধরিয়া রাখিয়াছিল !

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

টগর পরদিন বাড়ী আসিয়া দেখিল, মহা গোলযোগ ! খোকার জ্বর হইয়াছে, রাত্রে কাঁদিয়া কাটিয়া সে নিজেও ঘুমায় নাই, কাহাকেও ঘুমাইতে দেয় নাই। টগর রাত্রে বাড়ী না থাকায় জীবন রাগিয়া টং হইয়া আছেন। অনেক দিন পরে তাহাকে আজ ঐ জন্য তিরস্কার সহ্য করিতে হইল। এই দুর্ঘটনায় স্নেহলতার উপর, টগর রাগিয়া গেল তাহার মনে হইল সে না চলিয়া গেলে ত এরূপ ঘটিত না। স্নেহলতা সেদিন শোকতপ্ত হৃদয়ে যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল, সে কথাটি না কহিয়া মুখ ফিরাইয়া তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল।

জীবন সন্ধ্যাকালে বাড়ী আসিয়া স্নেহলতাকে খোকার কাছে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৌদিদি এখনো আসেন নাই ?"

টগর মুখভার করিয়া চিবাইয়া কহিল—"এয়েছে"

জীবন। কোথায়?

টগর। দেখনা কোথায়? তুমি এসেছ জানলে এদিকে আসবে এখন, নইলে সে এই ব্যাম স্বামর কাছে এগোচ্ছে!"

জীবন তাহাকে সকালে বকিয়াছিলেন সে এখন তাহার প্রতিশোধ লইতে চাহে।

জীবন এই কথায় রাগিয়া বলিলেন—"তুমি কি রকম! তিনি ত সারাদিনই ছেলেদের নিয়ে থাকেন, আজ তাঁর মনে বিশেষ কষ্ট আছে বলে হয়ত একা আছেন। তোমাকে তিনি এত ভালবাসেন, তোমার ছেলেদের জন্য এত করেন, আর তোমার মুখে এরূপ কথা শুনলে তাঁর মনে কত দুঃখ হবে বল দেখি?"

টগর। দুঃখ যত তারি, আর ত কেউ দুঃখ পায় না!

জীবন। তাঁর মত দুঃখ পেলে তোমার যে কি দশা হোত তাত বুঝতে পারিনে।

টগর। আমার অদৃষ্টে ভগবান সুখ দিয়েছেন সে জন্য তোমার দুঃখ করলে ত কিছু হবে না; তাতে ত আর আমার ভাগ্য সে পাবে না। যে যেমন কর্ম্ম করে তার তেমনি ভোগ, ওর যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! ওকি সুখে ছিল না! সুখে থাকতে ভূতে কিলোলে লোকে কি করবে?

জীবন। ঐ রকম ভ্রূকুটি করে চিবিয়ে কথা কওয়া ছাড় দেখি; আমি তাহলে আর সব সহ্য করব। বৌদিদির গত জন্মের কর্ম্মফল কি তা ভগবান জানেন, তবে এ জন্মে যা দেখা যাচ্ছে, তাতে কর্ম্মফলে যদি সুখ দুঃখ হয় তবে তাঁর মত সুখের অধিকারী তুমি আমি কেউ নই।

টগর। তাই ত! দাদাকে যে পাগল করেছিল—তার ভোগ ভুগতে হবে না?

জীবন। তোমার দাদা যে বৌদিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল—সে কি বৌদিদির দোষ!

টগর। মরে যাই আর কি! বিয়ে করতে চেয়েছিল! মেয়েমানুষ 'নাই' না দিলে পুরুষরা কি না এগোতে পারে? যা হয়েছে তা আমিই জানি, তোমার বৌদিদি সতীসাবিত্রী কি না!

জীবন। কি জান;—কি?

টগর। তবে শুনবে, এত দিন লজ্জায় বলিনি, এই চক্ষে দেখেছি—দাদা তাকে চুমো খাচ্ছে, এর পর আর কি চাও?

জীবন একটু স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন—তাহার পর বলিলেন—"এ কি তোমাদের বাড়ীর আর কেউ জানে?"

টগর। তাহলে কি রক্ষে থাকত! অমনি সন্দেহ করেইত মা দিদিকে তাড়ালে। না আমি কাউকে বলিনি, আজ এই তোমাকে বল্লুম; তবু তুমি বল দিদির উপর আমার দরদ নেই, আমি চিবিয়ে চিবিয়ে কথা কই!

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

মানুষ নিতান্ত অদূরদর্শী, সামান্য বুদ্ধি, অসম্পূর্ণ জীব। সে ফল-মানসে কার্য্য করিতে গিয়া প্রায়ই এক ফল চাহিয়া অন্য ফল পায়, তাহার সমস্ত পরিশ্রম বৃথা হয়; দুরভিসন্ধিময় কার্য্যের পরিণাম পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আমরা এই শিক্ষা প্রাপ্ত হই। এইখানেই অসীম ন্যায় মঙ্গলের পরিচয়। বিশ্বের বুদ্ধি যে আমাদের বুদ্ধি বিবেচনাকে অতিক্রম করিয়া চলে, ইহাই তাহার প্রমাণ। আর এজন্যই জ্ঞানীগণ ভাল কাজও নিষ্কাম ভাবে করিতে বলেন।

টগর ভাবিল আজ সে স্নেহলতার সম্বন্ধে যে কথা জীবনকে বলিয়াছে, তাহাতে স্নেহলতার দফারফা, ইহার পর জীবনের তাহার উপর কিছুমাত্র শ্রদ্ধাভক্তি থাকিবে না। কিন্তু উল্টা হইল। এ কথা শুনিয়া তিনি কেবল চারুর প্রতি মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেলেন, ভাবিলেন, এতদূর অগ্রসর হইয়া চারু স্নেহকে বিবাহ করিল না—সে কি পাষণ্ড! তাহার দুর্ব্বলতার জন্য স্বার্থপরতার জন্যই স্নেহের এই কষ্ট, সে আশ্রয়হীন হইয়া পথে পথে ভাসিয়া বেড়াইতেছে! স্নেহের প্রতি তাঁহার করুণা ভক্তিশ্রদ্ধা আগে হইতেই প্রগাঢ়—সুতরাং তাহার আর বাড়িবার স্থান নাই; কিন্তু ইহার পর হইতে তাহাকে যত্ন করিবার সুখী করিবার ইচ্ছা তাঁহার আরো প্রবল হইল।

দুই চারি দিন স্নেহের সহিত তাঁহার দেখা হয় নাই, একদিন তিনি টগরকে কহিলেন "বৌ দিদি দেখছি আজ কাল বড় একা একা থাকেন, তুমি তাঁকে ডেকেডুকে কাছে আননা কেন? কথায় বার্ত্তায় তিনি তাহলে অনেকটা কষ্ট ভুলে থাকতে পারেন।

টগর বলিল "এত কি কষ্ট তাত বুঝতে পারিনে, স্বামী মরছে ছেলে মরছে—তা লোকের সইছে, ওনার এতেই বাড়াবাড়ি দেখে আর বাঁচিনে!"

জীবন। বৌদিদির ত আর স্বামী ছেলে নেই, কাজেই সাধারণের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না।

টগর। উঃ দেখ'! গায়ে ফোস্কা পড়লো নাকি!

জীবন। তোমার কথায় যদি গায়ে ফোস্কা পড়ত, তাহলে এতদিন আর বাঁচতে হোত না।

টগর। বটে? তা কাজ কি বাবু আমার কথা শুনে! বড়খোকা, তোর জ্যেঠাই মাকে ডাক ত!

খোকা চলিয়া গেল, জীবন দেখিল স্নেহলতাকে লইয়া তাঁহাদের ঝগড়াঝাঁটি হওয়া ভাল নহে, ইহার ফলে সহ্য করিতে হইবে স্নেহের। জীবন হাসি মুখে বলিল, "আবার মান! মানভঞ্জনের সুখটা অনেক দিন পাওয়া যায় নি বটে? তা কি বলব, দেহি পদ পল্লব মুদারম্, না পদপল্লবে মল পরিয়ে দিতে হবে? জান আজ তোমার নতুন মল স্যাকরা আমাকে দিয়ে গেছে?"

টগরের মুখ প্রফুল্ল হইল, বলিল—"সত্যি নাকি, তা এতক্ষণ দিতে হয় ?"

জীবন। বাইরের টেবিলে ভুলে ফেলে এসেছি কাউকে আনতে বল।"

এই সময় জ্যোতিন্ ওরফে বড়খোকা স্নেহলতার হাত ধরিয়া গৃহে উপস্থিত হইল, টগর তাহাকে মল আনিতে পাঠাইল।

জীবন স্নেহলতাকে বলিলেন—"বৌদিদি বস।"

গৃহে ভূমিতলে প্রশস্ত শয্যা, তাহার এক দিকে টগর ও জীবন বসিয়াছিলেন অন্য-দিকে স্নেহ উপবিষ্ট হইল।

জীবন বলিলেন—"শুনেছ বৌদিদি মকদ্দামায় আমি জিতেছি।"

টগর বলিল—"বাড়ীর সবাই জানে দিদি আর জানে না !"

স্নেহ। শুনেছি ঠাকুর পো। কিন্তু এতদিনকার হিসাব পর্য্যন্ত দিতে গেলে ঠাকুর পোর (কিশোরীর) ছেলেদের আর এক পয়সা থাকবে না।

টগর। বেশ হয়েছে। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল ? আগে ভালয় ভালয় ভাগ দিলেত' এত সব কিছু হোত না। এই যে খোকা মল এনেছে, দেখি দেখি !

খোকার হাত হইতে মল লইয়া মহানন্দে দেখিতে দেখিতে উঠিয়া টগর শাশুড়িকে তাহা দেখাইতে গেল।

স্নেহ বলিল—"ঠাকুরপো, তোমার ভাইপোরা নিতান্ত অনাথা হোল। তাদের আর দাঁড়াবারও স্থান রহিল না।"

জীবন বলিলেন—"না বৌদিদি আমি বাড়ী নেব না, আমাদের এখন ত নিজের বাড়ী হয়েছে, তাছাড়া বিষয় সমস্ত পেলে তখন অর্দ্ধেক কিশোরীর ছেলেদের নামে করে দেব।"

স্নেহের বিষণ্ণ-মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—বলিল—"ঠাকুর পো, এ তাদের প্রতি দয়া করা নয়—আমার মনে হচ্ছে তুমি যেন আমার প্রতিই দয়া করলে। আমি জানি ঠাকুরপো, জানি, তুমি দয়ার সাগর। তুমি তাদের নিরাশ্রয় করবে এ হতেই পারে না।"

জীবন সলজ্জে বলিলেন—"বৌদিদি, কিশোরীর ছেলেদের এখন কে দেখে শোন ?

স্নেহ। তারা মামার বাড়ী। আহা ! মাতৃহীন হয়ে তাদের কত কষ্ট ! সংসারে যাদের জীবনের মূল্য আছে তারা চলে যায়, আর আমাদের মত হত-ভাগোরা সংসারের দুঃখ বাড়াতে এখানে পড়ে থাকে ! ভগবান তুমিই জান, কেন রেখেছ ?

জীবন। যারা অযথা দুঃখ পায় তাদের দুঃখ দূর করতেই তোমরা আছ বৌদিদি, তোমরা কষ্ট পাও আর অন্যকে আনন্দ দান কর, তবে কেন বল তোমাদের জীবনের মূল্য নেই ?

স্নেহ। আমি যদি জানতুম আমার জন্য একজনেরো জীবন আনন্দময় হয়েছে

তাহা হলে আমি সুখী হতুম, তার বাড়া লোকে আর কি সুখ আকাঙ্ক্ষা করতে পারে?

জীবন। তোমরা দেবী আমরা রাক্ষস। তোমাদের মত পূজার সামগ্রীকে আমরা প্রতিপদে অবমাননা করি। তোমরা আত্মত্যাগ করে আমাদের আনন্দ দান করছ, তাহার পরিবর্ত্তে আমরা তোমাদের পদাঘাত করচি—আমাদের মত পাষণ্ড কোন জাতি? এই পাপেই আমাদের এত দুর্দ্দশা। আমাদের আবার জাতীয় গর্ব্ব!

স্নেহ বলিল—"ও আবার কি কথা! আমরা তোমাদের পূজার সামগ্রী না তোমরা আমাদের পূজার সামগ্রী। জ্ঞান বল, বুদ্ধি বল, হৃদয় বল, আমরা কোন্ বিষয়েই তোমাদের সমযোগ্য নই। বাস্তবিক আমি যখন ভেবে দেখি—আমি কোন মতেই বুঝে উঠতে পারি নে, পুরুষরা স্ত্রীলোকদের ভালবাসে কেন? তাদের ত এমন কোন গুণই নেই যাতে তারা তোমাদের আকর্ষণ করতে পারে, তবুও যে তোমরা আমাদের ভালবাস সে কেবল তোমাদের ঔদার্য্য, মহত্ত্ব গুণে। অক্ষম, দুর্ব্বল, হীনের প্রতি মহতের, সবলের যে করুণার আকর্ষণ, আমাদের ভালবেসে তোমরা সেই মহত্ত্বের পরিচয় দাও।

জীবন হাসিয়া বলিল "তোমরা দেখছি বুদ্বুদকে ফাঁপিয়ে আকাশে তুলতে পার। জ্ঞান, বুদ্ধির বিকাশ শিক্ষায়, সুতরাং এখানে স্ত্রীপুরুষের তুলনা এখনো ঠিক দাঁড়াতে পারে না, কেন না সেকাল থেকে একাল পর্য্যন্ত উভয়ের শিক্ষা সমান হয় নাই। কিন্তু স্বাভাবিক মহত্ত্বের শ্রেষ্ঠতার প্রকৃত পরিচয় কোথায়? স্বভাবে, অর্থাৎ হৃদয়ে। তোমাদের সহৃদয়, নিঃস্বার্থ স্বভাবের সঙ্গে কি পুরুষের তুলনাও হতে পারে?

স্নেহ। কি বল ঠাকুরপো! এরূপ কথা শুনলে মনে হয় যেন ঠাট্টা করছ। স্বভাবে যে মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে উঁচু এ কোথায় পেলে? পৃথিবীতে যত দুঃখ কষ্ট তার কারণ স্ত্রীলোক, পৃথিবীতে যত ভয়ানক কাজ ঘটে, তাহার মূলে ত স্ত্রীদের দেখতে পাওয়া যায়। তারা ছোটখাট খুঁটি নাটি স্বার্থ নিয়ে ত রাত দিন ঝগড়া করছে। তোমাদের মত আমাদের হৃদয় হলে আমাদের ভাবনা ছিল কি? তোমাদের সঙ্গে তুলনায় আমাদের ত মানুষ বলেই মনে হয় না। যখন মেয়ে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ঝগড়া উঠতে শুনি আমার হাসি পায়, যদি পুরুষ শ্রেষ্ঠ না হয় ত যিশুখৃষ্ট, বুদ্ধ পুরুষ হতেন না।

জীবন। কথাটা ভুল, অধিকাংশ সময় পুরুষই মন্দ কাজের মূলে, স্ত্রীলোক নয়। তবে পুরুষেরা শঠ অধিক, সুতরাং উত্তেজিত করে দিয়ে তারা সরে দাঁড়ায়, স্ত্রীলোক ধরা পড়ে। তা ছাড়া ভাল জিনিষ খারাপ হলে আমাদের বেশী খারাপ লাগে। পচা দই খাওয়া যায়, দুধ পচলে খাওয়া চলে না; পরিষ্কার দেয়ালে এক ফোটা কালী পড়লেও নজরে পড়ে।

মেয়েরা যে সব কাজ করলে আমরা মন্দ বলি—পুরুষরা তার চেয়ে সহস্রগুণ জঘন্য কাজ করলেও আমরা তা ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনিনে। এই জন্যই মেয়েদের নামে অধিক অপবাদ। যীশুখৃষ্ট বুদ্ধদেব প্রভৃতির কথা যে বলছ—সাধারণের সঙ্গে তাঁদের ঠিক তুলনা চলেনা, তাঁহারা অবতার, দেবতার মধ্যে। তবুও আমার মনে হয় আমাদের অন্তঃপুরে চেয়ে দেখলে প্রতি ঘরে ছোট খাট পরিমাণে সেইরূপ আত্ম বিসর্জ্জন চলেছে,—যিশুখৃষ্ট সুবিস্তৃত পরিসরের মধ্যে তাঁর হৃদয় প্রকাশ করে তাঁর করুণা বিতরণ করে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, তোমরা তোমাদের ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে করুণা বিতরণ করে অকৃতজ্ঞতা অপমান জর্জ্জর হয়ে নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করছ। তোমাদের হৃদয়, তোমাদের মহত্ব বোঝবারও আমাদের ক্ষমতা নেই।

স্নেহ। তা নয়, ঠাকুরপো, আমরাই তোমাদের হৃদয়ের গভীরতা বুঝতে অক্ষম। ভালবাসা আমাদের সর্ব্বস্ব বটে, কিন্তু আমাদের ভালবাসা তোমাদের মত গভীর নয়, আমাদের হৃদয়ের পরিসর তোমাদের চেয়ে ছোট, কাজেই ভালবাসার পরিসরও অল্প, তাই আমরা অল্প দুঃখ কষ্টেই কাতর হয়ে পড়ি, তোমরা ভাব এতে আমাদের হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ পাচ্ছে। আমরা যদি তোমাদের পায়ের কাছেও দাঁড়াতে পারতুম!

স্নেহ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল। চারুর কাতরক্রন্দন তাহার মনে পড়িল, তাহার ভালবাসার প্রতি সে যে অন্যায় করিয়াছে এই স্মৃতি চিরদিন তাহার মর্ম্মে আঘাত প্রদান করে। জীবনেরও তাহার কথায় চারুকে মনে পড়িল—তাহার ব্যবহার মনে পড়িল, সে আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া হাসিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল—"আমাদের পায়ের কাছে? আমরাটা কে শুনি? আমি, চারু এই সব নাকি? সংসারে আদর্শ-হৃদয় পুরুষও অনেক আছে অস্বীকার করি না—কিন্তু তাঁহাদের সংসর্গে এরূপ নাম একত্র উচ্চারিত করলেও তাদের অবমাননা করা হয়"।

স্নেহ এই বিদ্রূপে একটু রাগিয়া বলিল—"ঠাকুরপো আমিত বলিনি কে আমার আদর্শ, আর যদিই আমি মনে করি তোমরা আদর্শ-হৃদয় তাতে ঠাট্টার কি আছে?

জীবন। কে ঠাট্টা করছে? নিজের প্রশংসায় কে অসন্তুষ্ট! তবে তোমার মতটা যদি টগরকে বিশ্বাস করাতে পার ত বেঁচে যাই।"

স্নেহ একটু হাসিল, তাহার পর গম্ভীর হইয়া বলিল "সত্যি ঠাকুরপো তুমি কেন যে হাসছ আমি একটুও বুঝতে পারিনে। টগর যদি তোমাকে না বোঝে ত সে তার মন্দ ভাগ্য। মেয়েরা যে পুরুষের হৃদয়ের গভীরতা বুঝতে পারে না এটা ত তারি প্রমাণ।

জীবন। তাহলে দেখছি, বৌদিদি তুমিই আমাকে আবিষ্কার করে ফেলেছ। সত্যি কথা যদি বলতে হয়, টগর আমাকে সমস্ত প্রাণে ভালবাসে, তার তুলনায় আমার ভালবাসার অভাব আমি প্রতিপদে অনুভব করি। তোমার আদর্শ-হৃদয়

পুরুষ তাহলে সকলেই বোধ হয় এই রকম। তুমি হয়ত যার জন্য জীবন, সুখ সর্ব্বস্ব পণ করেছ—তার দ্বারা প্রতারিত হয়েও—

স্নেহ আর নীরবে ধীরভাবে শুনিতে পারিল না, বুঝিল জীবন একথা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে, সে আত্ম বিস্মৃত হইয়া বলিল—"ঠাকুরপো, আমাকে কেহ প্রতারণা করে নাই! আমার জন্য তাঁহাকে এ অপবাদ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইল! আমি তাঁহার স্বভাবে কলঙ্ক পর্য্যন্ত আনিলাম! যদি কেহ প্রতারণা করিয়া থাকে আমিই প্রতারণা করিয়াছি, আমাকে বিবাহের জন্য তিনি সমস্ত ত্যাগ করিতে স্বীকার ছিলেন, আমার জন্য তিনি কি না করিয়াছেন? সেই অসীম ভালবাসার প্রতিদানে তাঁহাকে না বলিয়া পর্য্যন্ত আমি চলিয়া আসিয়াছি। আমার মত কৃতঘ্ন আর নাই, আমার জন্য তিনি মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচিয়াছেন। ঈশ্বর করুণাময় তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন—কিন্তু মনুষ্যের নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারি না।

স্নেহের কথা রুদ্ধ হইয়া গেল, স্নেহ নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

টগর আসিয়া দেখিল—তাহার অশ্রুসিক্ত মুখের প্রতি জীবনের অপার করুণা-দৃষ্টি স্থাপিত, সেই করুণায় যেন তাহার হৃদয় দ্রব হইয়া উথলিত।

টগরের এ করুণা সহ্য হইল না, সে বলিল "মরণ নেই তোমার, আবার এখানেও চোকের জল ফেলে ভোলাবার চেষ্টা। তুই তবে এখানে থাক আমি বাপের বাড়ী যাই।" টগর রাগিয়া চলিয়া গেল।

সমারভিল হল।

যাঁহারা বিলাতের ইউনিভার্সিটি গুলির কোন প্রকার খোঁজ খবর রাখেন তাঁহারা জানেন যে কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডের মধ্যে প্রত্যেক বিষয়ে কি ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কেম্ব্রিজের মহিলাকলেজ ও তৎপ্রসূত সুফল দেখিয়া ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডেও 'সমারভিল' এবং 'লেডী মার্গারেট হল' নামক দুইটী কলেজ সংস্থাপিত হইয়াছে। ভারতীর পাঠকবর্গকে কেম্ব্রিজের অন্তর্গত নিউন্হ্যাম কলেজের ইতিবৃত্ত আমরা পূর্ব্বেই উপহার দিয়াছি এবার অক্সফোর্ডের অন্তর্গত সমারভিল হলের কাহিনী সংক্ষেপে উপহার দিব।

অক্সফোর্ড ট্রিনিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট মাননীয় জে পার্সিভাল সাহেব ও নীতি শাস্ত্রের অধ্যাপক টি, এইচ, গ্রীন সাহেব এবং সমিতির অপরাপর দুই চারি জন প্রধান ব্যক্তির বিশেষ উদ্যোগে সমারভিল হল সংস্থাপিত হয়? দূরস্থান হইতে আগতা

মহিলাগণ যাহাতে অক্সফোর্ডে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিতে সক্ষম হয়েন ইহাই সমারভিল হল স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহাদের শিক্ষা প্রদানার্থে সর্ব্ব প্রথমে এখানে একটী সমিতি গঠিত ও সমিতি হইতে মহিলাগণের উপযোগী লেকচারের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল, এতভিন্ন তাঁহারা ইউনিভার্সিটী হইতেও অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। ছাত্রীগণের জীবন যাহাতে সাধারণ ইংরাজ গৃহের পারিবারিক-ব্যবস্থানুযায়ী চালিত হয় এবং ছাত্রীগণের ধর্ম্ম মতের বিভিন্নতা বশতঃ তাহাদের প্রতি ব্যবহারের কোনরূপ বিভিন্নতা না করা হয় তদ্বিষয়ে হলের প্রতিষ্ঠাতাদিগের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ইঁহারা প্রথমতঃ মিশ্‌'স, লেফেভারকে অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিয়া অক্সফোর্ডের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও স্বাস্থ্যজনকস্থানে একটী বহুকালের নির্ম্মিত অট্টালিকা ও তৎসংলগ্নস্থ ভূমির পত্তনী গ্রহণ করেন। বাটীটী ধূসরবর্ণ-প্রস্তর নির্ম্মিত এবং নানা প্রকার লতা পুষ্পে আচ্ছাদিত। বাটীর নিকটেই সেণ্টগাইল্স নামক গির্জ্জাঘর এবং এই গির্জ্জাঘর ও বাটীর মধ্যে বৃক্ষাচ্ছাদিত একটী ক্ষুদ্র পথ আছে। পথের পার্শ্বে কতিপয় ক্ষুদ্র গৃহে (কটেজ) একজন শিক্ষয়িত্রী ও কয়েকটী ছাত্রীর আবাস। এই গৃহগুলি ও কলেজের অশ্বশালা উত্তীর্ণ হইলে কলেজের উদ্যানে আসিয়া পৌছান যায়। কয়েকটী প্রাচীন ও বৃহৎ বৃক্ষ শোভিত হইয়া এই উদ্যানটী অক্সফোর্ড কলেজের প্রসিদ্ধ প্রাচীন কালের দুই চারিটী উদ্যানের ন্যায় এক মহান গম্ভীর সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে।

সৌভাগ্য ক্রমে এই কলেজ প্রতিষ্ঠা হইবার দুই বৎসর পরেই কমিটী এই বাটী ও তৎসংলগ্নস্থ ভুমি ক্রয় করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিনিয়াই ইঁহারা ইহার এক অংশে আর ১২জন ছাত্রীর থাকিবার উপযুক্ত নূতন গৃহ প্রস্তুত করাইতে আরম্ভ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এই গৃহ রচনা কার্য্য সমাধা হয়। ইহার পরে ছাত্রী সংখ্যা আরও অধিক হওয়ায় আবার ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে উদ্যানের অপর একদিকে আর একটী নূতন বাটী প্রস্তুত করা হয়। নূতন বাটীতে একটী, বড় খাবার ঘর—বসিবারঘর (ড্রইংরুম), লাইব্রেরী—পাঠাগার ও তদ্ভিন্ন ২০ জন ছাত্রীর বাসোপযুক্ত গৃহ আছে। এই নূতন বাটীর নাম পশ্চিম হল। পশ্চিম হলের সংলগ্নস্থ ভূমিতে কয়েকটী টেনিস ও হকি খেলিবার স্থান আছে। ইহা ভিন্ন মিশ কষ্টারের অনুগ্রহে কলেজে এই বৎসর একটি সুন্দর ব্যয়ামশালা নির্ম্মিত হইয়াছে, আর একজন শিক্ষক ছাত্রীগণের ব্যায়ামের জন্য একখানি ছয় দাঁড় বিশিষ্ট বোট প্রদান করিয়াছেন। সমার ভিল হলে যে সকল ভারতবর্ষীয় ছাত্রী আছেন তাঁহাদের সন্তোষ ও সম্মানার্থে বোটখানির নাম "উর্ম্মিলা" দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক দাঁড়ে ইংরাজী ও গুজরাটি অক্ষর মিলিত কথায় উক্ত নাম লেখা হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সর্ব্ব প্রথমে ছাত্রীগণ মহিলোপযোগী বিশেষ বিশেষ বক্তৃতার স্থলে মাত্র উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু এখন দিন দিন তাহাদের অধিকার ও সুবিধা বৃদ্ধি

হইতেছে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে একটি দুইটি করিয়া ক্রমে ক্রমে এখন মহিলারা দুই একটি মাত্র লেকচারে ভিন্ন কলেজের অধ্যাপক ও শিক্ষকদের প্রায় সমুদায় লেকচারেই উপস্থিত থাকিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ২৯এ এপ্রিল তারিখ হইতে মহিলাগণকেও পুরুষদিগের ন্যায় পরীক্ষা দানের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই দিনটী অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অন্তর্গতস্থ মহিলা-কলেজের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।

দূর নগর অথবা পল্লিগ্রাম হইতে আগত ছাত্রীগণ এখানে আসিয়া অক্সফোর্ডের শিক্ষিত বায়ুর শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিবা মাত্র যেন সূক্ষ্মতর সুমার্জ্জিত জীবন লাভ করেন। পণ্ডিত প্রবর অধ্যাপকগণের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা, মধুর ও সুভাবময় সঙ্গীতাদি কলা বিদ্যা, গম্ভীর রাজকীয় শোভাশালী অট্টালিকা, এ সকলি এক সঙ্গে তাহাদিগের, জ্ঞান বুদ্ধি, রুচি, সৌন্দর্য্য রসজ্ঞান, এবং পুরাতনের প্রতি অনুরাগ উদ্রিক্ত করে।

এতাবৎকাল হইতে গত বৎসর পর্য্যন্ত মহিলাগণ সাহিত্য গণিত ইতিহাস বিজ্ঞান পরীক্ষা দিবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন কিন্তু গতবৎসর হইতে তাঁহারা ব্যবস্থাশাস্ত্র এবং সঙ্গীত শাস্ত্রেরও পরীক্ষা প্রদানের অধিকার লাভ করিয়াছেন। দরিদ্রা ছাত্রীগণের সুবিধার জন্য অনেক ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়াগণ এই কলেজে বাৎসরিক বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। বস্ত্র ব্যবসায়ী মহাজনগণের সভা এই কলেজে ৫০ পাউণ্ড আয়ের একটি স্থায়ী বৃত্তি এবং মোক্ষমুলারের জামাতা মিষ্টার কনিবেয়ার তাঁহার মৃতপত্নীর (মোক্ষমূলরের কন্যা) স্মরণার্থে একটি স্থায়ী বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি স্থায়ী বৃত্তি আছে তাহার মধ্যে একটী বৃত্তি কলেজের একজন ভূতপূর্ব্বা ছাত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত। এই স্থায়ী বৃত্তিগুলি ভিন্ন বাৎসরিক বৃত্তিও অনেকগুলি প্রতি বৎসরে প্রদত্ত হইয়া থাকে। ছাত্রীরা পরীক্ষান্তে যেরূপ সম্মানসূচক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের বন্ধুবর্গের উৎসাহও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা ৪৫ জন মহিলার মধ্যে অধিকাংশই প্রথম শ্রেণীতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মিশ স, লেফেভার কর্ম্ম ত্যাগ করেন এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে মিশ মেটল্যাণ্ড কলেজের অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করেন। হলের ছাত্রীসংখ্যা এক্ষণে ৩৫ জনেরও অধিক, তথাপি সাধারণতঃ ইহার কাজ কর্ম্ম এরূপ নিস্তব্ধভাবে চলে যে রবিবার ব্যতীত অন্য কোন দিনে হঠাৎ কেহ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে ইহা যে এতগুলি অল্পবয়স্কা চঞ্চলা বালিকার বাসস্থান তাহা তাঁহার মনে উদয় মাত্র হয় না। প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় উপাসনা আরম্ভ হয় এবং সকলেই উপাসনায় যোগ দেন কারণ উপাসনা এরূপ ভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরই তাহাতে যোগদানে আপত্তি থাকিতে পারে না। উপাসনার পর ছাত্রীরা পত্রাদি পাঠ করিয়া প্রাতর্ভোজন করেন। প্রাতঃকালে ছাত্রীদের লেকচার শুনিতে যাওয়া

ইত্যাদি নানা প্রকার কার্য্য থাকাবশতঃ তাঁহারা শাস্ত্র শীঘ্র ভোজন কার্য্য সমাধা করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে গমন করেন। তখন চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া পড়ে। প্রত্যেক ছাত্রীগণ শয়ন ও উপবেশনার্থে একটী করিয়া স্বতন্ত্র গৃহ পাইয়া থাকেন। কলেজের গৃহগুলি বড় নয় কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর রূপে সজ্জিত। ঘরের দেয়ালগুলি উজ্জ্বল বর্ণের কাগজে মণ্ডিত এবং দরজা প্রভৃতির তক্তাগুলি শ্বেতবর্ণে চিত্রিত এবং বড় বড় বাতায়ন থাকাপ্রযুক্ত গৃহ মুক্তবায়ুপ্রবাহিত ও আলোকময়। প্রত্যেক ছাত্রীকে কলেজ হইতে একটী খাট একটী আলমারি একটী পুস্তকাধার, দুইখানি চৌকী, দুইটী টেবিল, একটী হেলান দেওয়ার চৌকী ও একখানি ক্ষুদ্র আয়না দেওয়া হয়। দিনের বেলায় খাটটীকে ভারতবর্ষীয় ছিট বা কোন প্রকার শিল্প-বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া কৌচে পরিণত করা হয়। ইহা ভিন্ন ছাত্রীরা নিজে নিজে তাঁহাদের আত্মীয়বর্গের ফটোগ্রাফ ও নানা প্রকার সুন্দর ছবি দ্বারা এখানকার প্রবাসভাব কতকপরিমাণে দূর করিয়া গৃহটীকে ইচ্ছামত সজ্জিত করিয়া লয়েন। প্রাতে ভোজনান্তে তিন চারি ঘণ্টা কার্য্য করিবার পর বেলা ১টার সময় ছাত্রীরা মধ্যাহ্ন ভোজনে আগমন করেন। টেবিলের উপর এক প্রকার গরম মাংস ও কোন এক প্রকার মিষ্টান্ন থাকে—ইচ্ছামত যিনি যাহা পারেন আহার করিয়া ক্রীড়ার্থে গমন করেন। যাঁহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি আছে তাঁহারা আর দুই ঘণ্টার মধ্যে কোন কার্য্য করেন না। এই সময় তাঁহারা কেহ টেনিস কেহ হকি কেহ ক্রিকেট খেলা করেন কেহ পদচারণা কেহ বা অশ্বারোহণ করেন। যাঁহারা সাঁতার জানেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া নৌকা চালনা বা অন্যান্য রূপ ব্যায়াম চর্চ্চা করেন। কেহ কেহ এই সময় পিয়ানো ও বেহালা অভ্যাস করেন। এই সময় উদ্যানটী জীবন্তভাবে পূর্ণ হয়। ৮॥ ঘটিকার সময় ছাত্রীরা দলে দলে চা পান করিতে গমন করেন। ড্রইংরুমে (সাধারণের বসিবার ঘর) চায়ের বন্দোবস্ত। চায়ের পর সকলে আবার নিজ নিজ কার্য্যে গমন করিলে—চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া পড়ে। ৭টার সময় ছাত্রীরা মুখ হাত ধুইয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিবার পর ডিনার বা সায়াহ্ন ভোজন। পশ্চিম বাটীতে ডিনার। গৃহটীতে ৫০ জন ছাত্রীর আহারোপযোগী স্থান আছে এবং এই গৃহে বৎসরে একবার করিয়া ছাত্রীদের নৃত্যোৎসব হইয়া থাকে সেই জন্য গৃহতলে কার্পেট দেওয়া হয় নাই। এই নৃত্যোৎসবে হলের কমিটির সভ্যগণ ব্যতিরেকে অন্য কোন পুরুষ উপস্থিত থাকিতে পারেন না। ডিনারে চারি প্রকার খাবার থাকে। সুপ, দুই প্রকার মাংস ও এক প্রকার মিষ্টান্ন। পরিষ্কার বস্ত্রপরিধৃত দুইজন পরিচারিকা খাদ্য পরিবেশন করে। ভোজনান্তে ১৫ মিনিট কাল ড্রইংরুমে, চা পান ও গল্পস্বল্পে কাটিয়া থাকে। তাহার পর ৮ ঘটিকার সময় সকলে নিজ নিজ গৃহে গমন করিয়া ১০টা অবধি কার্য্য করেন। এই সময় বন্ধুরা পরস্পর পরস্পরের গৃহে যাইয়া গল্পস্বল্প করেন; মধ্যে

মধ্যে পার্টী ও দেওয়া হয়। এই পার্টীতে কোকো ও কেক বিতরিত হয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা গৃহতলে বসিয়া থাকেন কারণ নিমন্ত্রণকারিণীর গৃহে তিনখানি ব্যতীত চৌকী নাই। ১০॥ টার সময় পার্টী ভঙ্গ হইয়া ছাত্রীরা নিজ নিজ গৃহে গমন করিয়া ১১টার মধ্যে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সকলে নিদ্রায় বিশ্রাম লাভ করেন। আবার চারিদিক নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করে।

ছাত্রীরা সপ্তাহে কেবল একদিন মাত্র কর্ত্রীর অনুমতি লইয়া বাহিরে নিমন্ত্রণ ইত্যাদিতে যাইতে পারেন। যে দিন সন্ধ্যাবেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণের নিমিত্ত বক্তৃতা দেওয়া হয়, ছাত্রীরা কলেজ কর্ত্রীর কিম্বা অপর কোনও শিক্ষয়িত্রীর সমভিব্যাহারে তথায় গমন করেন। সপ্তাহের মধ্যে কোন কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যাবেলায় ছাত্রীদের কয়েকটি ক্ষুদ্র সম্মিলনী হয়। ইহার কোনটিতে ঐতিহাসিক কঠিন কঠিন বিষয় আলোচিত কোনটিতে ছাত্রীদের প্রিয় কবি ব্রাউনিং অথবা অপর কোনও কবির কবিতা পঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত একটি সভা আছে তাহার প্রতি সভ্যকে সভাপতির আজ্ঞানুসারে তিন মিনিট কাল উপস্থিত বিষয়ে বক্তৃতা করিতে হয়—ইহাতে ছাত্রীদের প্রত্যুৎপন্ন-বাক্‌শক্তিত্ব জন্মে; লেডী মারগারেট হল ও সমারভিল হলের পাক্ষিক সম্মিলনীতে দুই হলের ছাত্রীরা পরস্পর বিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক যখন বক্তৃতা করেন তখন উক্ত অভ্যাস বিশেষ কার্য্য প্রদ হয়, কেন না এ সময় যে মতের পক্ষে অধিক সভ্য বক্তৃতা করিতে পারেন সেই পক্ষেরই জয়।

অক্সফোর্ডের রবিবারের আনন্দময় স্মৃতি অনেক কাল পর্য্যন্ত ছাত্রীদের মনে জাগরূক থাকে। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিনী ছাত্রীগণ স্ব স্ব ধর্ম্ম মন্দিরে উপাসনা করিতে যান। আর অন্য সকলে প্রাতে সেন্টমেরির মন্দিরে ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে কিম্বা কেথিড্রালে উপাসনা করিতে যান, বিকালে কোন না কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গির্জ্জায় গমন করেন। সঙ্গীতের উৎকৃষ্টতাবশত ম্যাগডালিন ও নিউকলেজই ছাত্রীদের প্রিয়। তদ্ভিন্ন যেদিন বেলিয়ল কলেজের শিক্ষক ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন সেদিন ছাত্রীরা বিশেষ আগ্রহ সহকারে তাহা শুনিতে তথায় উপস্থিত হন। সমারভিলহলের ছাত্রীবর্গের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রায় নূতন অদ্ভুত মত লক্ষিত হয় না। রবিবার রাত্রে আহারের পর কলেজের সকলে একত্র হইয়া উপাসনা করেন এবং তৎপরে ধর্ম্ম সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে। যে ঘরে উপাসনাদি হয় সেই ঘরেই কলেজের মহার্ঘ্য বস্তুগুলি রক্ষিত হইয়া থাকে। এই দ্রব্যগুলির মধ্যে কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ মিস স, লেফেভারের একখানি তৈলাঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তি এবং জন রসকিন কর্ত্তৃক প্রদত্ত সুপ্রসিদ্ধ ইটালিয়ান চিত্রকরাঙ্কিত কয়েকখানি আলেখ্য শোভা সম্পাদন করে। লণ্ডনের নিকটস্থ একটি বাগানে গ্রীষ্মের ছুটীর মধ্যে একদিন কলেজের নূতন এবং পুরাতন ছাত্রীরা একত্র সম্মিলিত হন। সেদিন এখানে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের

মহিলা বিদ্যালয় গুলির মধ্যে "লন টেনিশ" খেলা চলে। অক্সফোর্ডের মহিলা কলেজ লেডী মারগারেট ও সমারভিল হল এবং কেমব্রিজের মহিলা কলেজ গার্টেন এবং নিউনহ্যাম এই চারি কলেজের চারিজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়া নিপুণ ছাত্রীতে দুই দল বাঁধিয়া দ্বন্দযুদ্ধ চলে। উভয় পক্ষের শুভাকাঙ্ক্ষীরা পরিদর্শক স্বরূপ সেই স্থানে উপস্থিত থাকেন।

কলেজ জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা উৎসুক্যের কাল শেষ পরীক্ষার সপ্তাহকাল। পরীক্ষার কোন শ্রেণীতে কে উত্তীর্ণ হইতে পারেন তাহার উপরই তখন ছাত্রদিগের সমস্ত প্রাণ পড়িয়া থাকে। বিশেষতঃ এখানকার ছাত্রীদের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক সংখ্যক মহিলা ভবিষ্যতে স্কুল অথবা কালেজের শিক্ষয়িত্রী হইবার অভিলাষী। অনেক ভূত পূর্ব্ব শিক্ষয়িত্রীও ভবিষ্যতের অধিক বেতন লাভের আশায় এখানে শিক্ষা লাভ করিতে আসেন। যে সকল ছাত্রী কালেজের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বে শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ছাত্রীদের বয়স ১৭ হইতে ৩৫ বৎসর। ইহাতে একটি সুবিধা এই, যে বয়স্কাদের সমভিব্যাহারে তরুণ বয়স্কারা নগরে অথবা কলেজে অসঙ্কোচে গমন করিতে পারেন। এবং যেখানে পুরুষ ছাত্রদের সহিত তাঁহাদের একত্রে শিক্ষা লইতে হয় সে সকল স্থানেও ছাত্রীদের সঙ্গে একজন বয়স্কা মহিলা রক্ষকরূপে থাকেন।

এখানে ভারতবর্ষীয় একটি মহিলাকে ২৫ পৌণ্ড বার্ষিক মূল্যের একটি বৃত্তি প্রদান করা হইয়াছে। মিশ কর্ণেলিয়া সোরাপজি বি, এ, যিনি ১৮৮৭ অব্দে বিএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া গুজরাটের পুরুষ কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি ইংলণ্ডে শিক্ষার বাসনা প্রকাশ করায় স্ত্রীশিক্ষোৎসাহী কয়েকজন ইংরাজ বন্ধু তাঁহাকে এই সাহায্য দান করিতেন। 'অনেক রাণী প্রভৃতি ভদ্র মহিলাগণ আইন ব্যবসায়ীর সমক্ষে আসিতে না পারায় তাহাদের কার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হয়—দেশের স্ত্রীলোকদিগের এই অসুবিধা নিরাকরণার্থে তিনি ইংলণ্ডে আইন শিক্ষা করিতেছেন৷ মহারাজা দলিপ সিংহের দুটি কন্যা কিছুকাল হইতে সমারভিলহলে বাস করিতেছেন, আর আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা এখন গার্টেনে আছেন। এই কলেজ গুলির বিস্ময়কর উন্নতি দেখিয়া বন্ধুরা উৎসাহিত এবং শত্রু পক্ষ অপদস্থ হইয়াছেন। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় গুলি স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী—তাহারা সমভাবে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই পরীক্ষা লইয়া উভয়কেই ডিগ্রি দিতেছেন। আশা করি ইংলণ্ড ভারতের ন্যায় স্ত্রীদিগকে ডিগ্রি দিবেন এবং ভারতও ইংলণ্ডের ন্যায় সুশিক্ষাজনক স্ত্রী কলেজের প্রতিষ্ঠা করিবেন।

মহাযজ্ঞ।

আহুতি—তৃতীয় দিন। ২৯ ডিসেম্বর সোমবার।

আজি ১১ ঘটিকার সময় জননীর পূজা আরম্ভ হইবে। স্বদেশ ভক্ত সন্তানগণ যথা সময়ে পূজার মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছেন, বিরাট মণ্ডপের যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর সমবেত প্রতিনিধি ও পরিদর্শকবর্গের প্রফুল্ল আনন ও অপার উদ্দীপনা-পূর্ণ নয়ন জ্যোতি অবলোকনে প্রাণ পুলকিত হয়। দেখিতে দেখিতে আহুতির সময় উপস্থিত হইল, অমনি সভাপতি দণ্ডায়মান হইয়া মুজঃফরপুরের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত প্রিঙ্গল্ কেনিডি সাহেবকে লবণ-কর সম্বন্ধীয় পঞ্চম প্রস্তাবের অবতারণা করিতে অনুরোধ করিলেন।

পঞ্চম প্রস্তাবঃ—ভারতবর্ষের রাজস্বের বর্ত্তমান অবস্থা সমধিক উন্নতি জনক, বিশেষতঃ যে কারণ বশতঃ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক লবণকর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল এক্ষণে সে কারণ আর বিদ্যমান নাই, সুতরাং এই মহা সমিতির বিবেচনায় অচিরে লবণের মাস্থল হ্রাস করা একান্ত কর্ত্তব্য; মহাসমিতির সভাপতি লবণ-কর হ্রাস করিবার উদ্দেশে মহাসমিতির নামে উক্ত মর্ম্মে গবর্ণর জেনারলের নিকট একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হউন।

জাতীয় মহা সমিতির প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত কেনিডি প্রফুল্ল আননে মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া হৃদয়গ্রাহী তেজস্বী বক্তৃতায় উল্লিখিত প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন। নিম্নে তাঁহার বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদত্ত হইলঃ—

"ভারতবর্ষের প্রত্যেক অধিবাসী আবকারী রাজস্ব দান করে না, যাহাদের নিকট হইতে উক্ত রাজস্ব গৃহীত হয়, শ্রীযুক্ত কেন সাহেবের উদ্যম জয়লাভ করিলে পরে তাহাদেরও সংখ্যা একবারেই হ্রাস হইবে। ভারতে সমস্ত লোক এমন সৌভাগ্যশালী নহে যে, তাহাদের প্রত্যেকের বার্ষিক আয় ৫০০ পাঁচশত টাকা হইবে; সুতরাং তাহাদিগকে 'ইন্‌কম্ ট্যাক্স্' প্রদান করিতে হয় না। কিন্তু ভারতের প্রত্যেক পুরুষ, রমণী ও শিশু সন্তানকেই লবণ ভক্ষণ করিতে হয়, সুতরাং তাহাদের মধ্যে কেহই লবণ-কর হইতে বিমুক্ত নহে। অতি দীন হীন লোকের নিকট হইতেও এই কর গৃহীত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যত অধিক পরিমাণে দরিদ্র, এই করের পীড়ন তাহার প্রতি তত গুরুতর। ইংলণ্ডে যে সকল শ্রমজীবী মদ ও চা পান অথবা তামাক সেবন করে না তাহারা গবর্ণমেণ্টকে কিছুই কর দান করে না। ভারতবর্ষে অতি দীনহীন কৃষক, অতি দরিদ্র কুলি এমন কি অনাথা পথের ভিখারীকেও লবণ কর দান করিতে হয়! কোন অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত এরূপ কর কখনই সমর্থন করা যায়

না। অনেকে এই বলিয়া উক্ত কর সমর্থন করেন, (১ম) বহুদিন হইতে উহা প্রচলিত আছে (২য়) উহা সহজেই আদায় করা যায়, (৩য়) লোকে বিনা আপত্তিতে উহা প্রদান করিয়া থাকে; (৪র্থ) এই করভার অতি লঘু; (৫ম) রাজস্বের অনাটন নিবন্ধন উক্ত কর অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

প্রথমযুক্তি সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে মনুষ্যের দুষ্কৃতি ও দুঃখ লবণ কর অপেক্ষাও অধিকতর প্রাচীন, তাই বলিয়া কি তাহাদিগকেও সমর্থন করিতে হইবে? এই কর আদায় সহজ-সাধ্য; এই যুক্তি সমর্থন করিতে হইলে যে সকল লাল পাগড়ীওয়ালাগণের হস্তে ভারতবর্ষের প্রত্যেক রাজস্ব বিভাগের কার্য্যভার ন্যস্ত রহিয়াছে—যাহাদের লুণ্ঠন ও পরস্ব অপহরণ বাসনা অত্যন্ত প্রবল—তাহাদের অপকার্য্যে প্রশ্রয় দান করা হইবে। লোকে বিনা বাক্যব্যয়ে এই কর প্রদান করিয়া থাকে, আমার বিবেচনায় এই যুক্তির একমাত্র অর্থ এই যে তাহারা অভিযোগ করিবার উপযুক্ত বাক-শক্তি হইতে বঞ্চিত। লোকে বলে বাইন্ মাছের ছাল ছাড়াইয়া লইলে তাহার কিছুই কষ্ট হয় না, সে কষ্ট অভ্যাস বশতঃ তাহার সহ্য হইয়া গিয়াছে। সেই রূপ এদেশের লোকদিগের ও সকল যাতনা সহ্য হইয়া গিয়াছে। যখন আমি লবণ-করের বিষয় চিন্তা করি তখন প্রাচীন ফ্রান্সের কথা আমার মনে উদিত হয়ঃ তত্রত্য শাসন কর্ত্তৃগণ বলিতেন যে তদানীন্তন ফরাশিসগণের লবণ কর প্রদানে কিছুই কষ্ট হইত না, কিন্তু যাহাদের বিশেষ কষ্ট বোধ হইত তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ উৎপীড়নকারীগণকে গুলি করিতে সঙ্কোচ করিত না, পরিশেষে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ফাঁসি কাষ্টে বিলম্বিত ও নিহত হইয়া সকল যন্ত্রণা ও উৎপীড়ন হইতে বিমুক্ত হইত। কিন্তু ঈশ্বরের শাসন-চক্র ধীরে ধীরে ঘুরিলেও উহা অত্যাচারীকে চূর্ণ করিতে ছাড়ে না। এই অত্যাচারেরও পরিণাম উপস্থিত হইয়াছিল; কিরূপ পরিণাম তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। অতঃপর আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিব, এই করভারে দরিদ্রগণ কিরূপ প্রপীড়িত। ভারতেশ্বরীর কারাগার সমূহের কয়েদিগণের জন্য যে লবণ প্রদত্ত হয় তৎবিবরণী হইতে জানা যায় যে প্রত্যেক কয়েদীর জন্য অল্প মাত্রায় লবণ দান করিলেও মাসে ৯।১০ ছটাক, অর্থাৎ বৎসরে প্রত্যেকের জন্য /৭ সের পরিমাণে লবণের আবশ্যক। সমগ্র ভারতবর্ষে ২৫কোটির অধিক লোকের বাস, শিশুসন্তানদিগকে বাদ দিলে অনূ্যন ২০কোটি লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে ঐ পরিমাণে লবণের প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সংক্রান্ত বিবরণী হইতে দেখা যায় যে গত বৎসর শুদ্ধ লবণ-কর হইতে গবর্ণমেণ্টের ৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে প্রতিজনের নিকট হইতে ছয় আনা পরিমাণ রাজস্ব গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে প্রতিজনে বৎসরে ছয় সেরের অধিক লবণ খাইতে পায় নাই। কিন্তু অনূ্যন সাত সেরের

কম লবণে কথনই স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। অনেকে গোপনেও লবণ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে ; পক্ষান্তরে কেবল মাত্র মনুষ্যের ব্যবহারের জন্যই যে লবণের প্রয়োজন তাহা নহে, তদ্ভিন্ন অনেকে আবার সাতসেরেরও অধিক পরিমাণে লবণ খাইয়া থাকে। এক্ষণে নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রত্যেকের যে পরিমাণে লবণ আবশ্যক অনেকে তাহা পায় না। আমি ইহাও বিশেষ রূপে জানি যে অনেকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহারীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিতে পায় না; কিন্তু তাহার মূল্য গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক কৃত্রিম উপায়ে পরিবর্দ্ধিত হয় না। অন্যদিক হইতে বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক ; কয়েক মাস গত হইল "পায়োনিয়র" সংবাদ পত্রের একটী প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল যে মান্দ্রাজের কোন রাজকর্ম্মচারী হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন কর্ণাল জেলার প্রত্যেক কৃষকের বারআনার অধিক আয় নহে ; আমিও দ্বারভাঙ্গা এবং মজঃফরপুরের কৃষকদিগের অবস্থা যতদূর অবগত আছি তাহাতে তাহাদেরও প্রত্যেকের উহার অধিক আয় বলিয়া বোধ হয় না ! কয়েক বৎসর হইল গবর্ণমেণ্ট গেজেটিয়ারে জনৈক সঙ্গতিপন্ন কৃষকের ব্যয়ের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছিল, আমার বোধ হয় তাহার মাসিক আয় ১১ টাকার অধিক হইবে না। কিন্তু তাহার পরিবারে সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটী লোক। যে দরিদ্র পরিবারে পাঁচজন লোক তাহার মাসিক ব্যয় ৫ টাকা ; এই পাঁচ জনের জন্য যদি বৎসরে ২৪ সের লবণ আবশ্যক হয় তাহা হইলে উক্ত পরিবারের বার্ষিক ৬৪ টাকা আয় হইতে শুদ্ধ লবণ করের জন্য ১।।০ দেড় টাকা দিতে হইবে, সুতরাং উহাকে মাসে প্রতি টাকায় প্রায় পাঁচ পাই হিসাবে কর দিতে হইবে। যাহাদের বার্ষিক আয় ৫০০ শত টাকার অধিক নয়, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দাও, যাহাদের বার্ষিক আয় ৬০ টাকা মাত্র তাহারাও এই কর দিতেছে ! ......মহাশয়গণ, আপনারা এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে ব্যক্তির বার্ষিক আয় ৫০০ টাকা সে 'ইন্‌কম্ ট্যাক্স হিসাবে টাকা প্রতি চারিপাই প্রদান করিতে বিরক্তি প্রকাশ করে, কিন্তু যাহার বৎসরে ৬০ টাকার অধিক আয় নাই তাহার নিকট হইতেও মাসে প্রতি টাকায় পাঁচ পাই আদায় করা হইতেছে ! আপনাদের মধ্যে যাঁহাদের বার্ষিক দুই হাজার টাকা আয় অথচ মাসে ফি টাকায় পাঁচ পাই ইনকম্ ট্যাক্স দান করিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তাঁহারাও একবার এই বিষয় চিন্তা করিয়া দেখুন ! এক্ষণে টাকায় দশ সের লবণ বিক্রয় হইতেছে; কিন্তু লবণ-কর দুই টাকা কমাইলে উহা টাকায় তের সের পাওয়া যাইবে। আজি যদি দৈবানুগ্রহে লবণ-কর রহিত হয়, তাহা হইলে টাকায় চল্লিশ সের লবণ বিক্রয় হইবে। কিন্তু হায় এ দেশের ভাগ্যে তেমন দিন আসিবে না ! টাকাতেই গবর্ণমেণ্টের জীবন ; আমরা লবণ-কর একবারেই উঠাইয়া দিতে বলি না। শ্রীযুক্ত কেন্ সাহেব আবকারী রাজস্ব উঠাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন, এবং অন্যান্য সকলে ইন্‌কম্ ট্যাক্স রহিত করিতে যত্ন পাইতেছেন ! আমরা

বলি, এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের অবস্থা অনেক পরিমাণে উন্নত, সুতরাং লবণ-করের কিয়দংশ এক্ষণে হ্রাস করা যাইতে পারে। পরিমিত ব্যয়ে সৈনিক বিভাগের খরচ এবং বিলাতের খরচ (Home charge) কিঞ্চিৎ কম করিলে উক্ত কর সহজেই কিছু পরিমাণে হ্রাস হইতে পারে। যখন আপনারা প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভা প্রাপ্ত হইবেন, তখন নিশ্চয়ই গবর্ণমেণ্ট আপনাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন, তৎকালে আপনারা স্বয়ং কর স্থাপনের ব্যবস্থা দানে সমর্থ হইবেন। তখনও যদি এই করভার দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের পক্ষে একান্ত দুর্ব্বহ বোধ হয়, তাহা হইলে তখন উহার কতক পরিমাণ ভার আপনারা স্বয়ং বহন করিয়া তাহাদের ক্লেশ হ্রাস করিবেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা জন্ ব্রাইট্ যখন মর্ম্মান্তিক শোকে অভিভূত ও হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহযোগী সহৃদয় কব্‌ডেন্ আসিয়া তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দান করিয়াছিলেন ; "আপনার শোক নিঃসন্দেহ গুরুতর, কিন্তু আপনি মনে করিয়া দেখুন আজি ইংলণ্ডের লক্ষ লক্ষ বিধবা এবং বিধবার সন্তানগণ খাদ্য দ্রব্যের দুর্মূল্যবশতঃ অনাহারে ভীষণতম যন্ত্রণায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।" আজি এই মহাদেশে কোটি কোটি নরনারীর উপযুক্ত পরিমাণ লবণ অভাবে জীবন হ্রাস হইয়া আসিতেছে, দেহ খর্ব্বাকার ধারণ করিতেছে এবং শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনোবৃত্তি নিচয় নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। আমি এ দেশের ধনশালী মহাত্মাগণের নিকট বিনীতভাবে বলিতেছি, তাঁহারা জীবন ধারণের পক্ষে এই অত্যাবশ্যক পদার্থের মূল্য হ্রাস করিতে কি যথাসাধ্য যত্ন পাইবেন না? প্রতিনিধি ভ্রাতৃগণ, আপনারা কি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিবেন না যে আপনাদের বিপক্ষ দল আপনাদের প্রতি এই এই বৃথা দোষ আরোপ করিয়া থাকেন যে আপনারা সর্ব্বদা কেবল স্ব স্ব সুখ শান্তি বৰ্দ্ধনের চিন্তায় নিমগ্ন? ......আমাদিগের উপর করস্থাপন কর, ধনশালীর প্রতি কর স্থাপন কর, কিন্তু দরিদ্রকে কর-ভারে প্রপীড়িত করিও না। আমি এই মহা সমিতির প্রত্যেকের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা সকলে কার্য্যতঃ জগতের নিকট এই পরিচয় দান করুন যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে আপনারা দীনহীন ভ্রাতৃগণ এবং দেশের কোটি নির্ব্বাক অধিবাসিবর্গের দুঃখে সহানুভূতি ও বদান্য প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত আছেন, যে সহানুভূতি এবং বদান্য অভাবে পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান নিতান্ত অসার ও অকিঞ্চিৎ কর!" এই বলিয়া তিনি নিরস্ত ও স্বস্থানে উপবিষ্ট হইলেন। সকলে তাঁহার বক্তৃতায় পরম পরিতৃপ্ত হইয়া আনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বোম্বাইর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত ডি. ই. ওয়াচা সুযুক্তি পূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতায় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন এবং তৎপরে শ্রীযুক্ত জি, কে, গোকেন, শ্রীযুক্ত জমিং-রাম নানাভাই হরিদাস, এবং জব্বলপুরের বারিষ্টার শ্রীযুক্ত এ, নন্দী একে একে সার

গর্ভ্ব বক্তৃতায় উহার অনুমোদন করিলেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত দেব প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এই মর্ম্মে একটি সংশোধন প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন যে ভারতগবর্ণমেণ্টের রাজস্বের বর্ত্তমান অবস্থা কিঞ্চিৎ উন্নতি জনক এবং যে সকল কারণে লবণ-কর স্থাপিত হইয়াছিল তাহা কতক পরিমাণে দূর হইয়াছে, অতএব গৃহ পালিত পশুজাতির আহারের জন্য এবং শিল্পজাত দ্রব্যের নিমিত্ত যে লবণের প্রয়োজন, স্থান বিশেষে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক তাহার মাস্থল হ্রাস করাই প্রার্থনীয়।

শ্রীযুক্ত আর, ডি, মেটা উক্ত সংশোধন প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন চট্টোপাধ্যায় দেব বাবুর প্রস্তাবের প্রতিবাদ পূর্ব্বক মূল প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন এবং তিনি উপবিষ্ট হইলে মান্দ্রাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত জম্বুলিঙ্গম্ মুদলিয়ার এবং পরিব্রাজক আলারাম স্বামী লবণের মাস্থল হ্রাস করিবার উদ্দেশে তেজস্বী বক্তৃতায় মূল প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন; অনন্তর সকলের অভিমত অনুসারে দেব বাবুর সংশোধন-প্রস্তাব পরিত্যক্ত ও মূল প্রস্তাব পরিগৃহীত হইল।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

১৮৬২ খৃঃঅব্দে ভারত সচিব ভারতবর্ষের যে সকল স্থানে ভূমির রাজস্বের চির-স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই সেই সকল স্থানে অবস্থা বিশেষে উক্ত চির-স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তন করিবার জন্য যে মন্ত্রণা দান করিয়াছিলেন, এবং তৎপরে ১৮৬৫ সনে উক্ত অভিমত পুনরায় ঘোষণা করিলে সমস্ত দেশের অধিবাসিগণের অন্তরে যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল—তদনুসারে এবং দেশের অনেক স্থানে উক্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্ত্তনের উপযুক্ত অবস্থা দীর্ঘকাল হইতে উপস্থিত থাকা প্রযুক্ত এই মহাসমিতি সম্মান সহকারে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রার্থনা করি-তেছেন যে ২৫ বৎসরের অধিককাল পূর্ব্বে ভারতভূমির রাজস্বের চিরস্থায়ীত্ব রক্ষার জন্য ভারত সচিব যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট অচিরে প্রয়োজন অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভূমির রাজস্ব নির্দ্ধা-রণ পূর্ব্বক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তনে স্বীয় ঘোষণা বাক্যের গৌরব রক্ষা করুন।

শ্রীযুক্ত আর, এম, মুধলকার তেজস্বী ও সুযুক্তি পূর্ণ বক্তৃতা-সহকারে উল্লিখিত প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন; তিনি বলিলেন "পূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্তাবের উদ্দেশ্য সফল হইলে যেমন দুঃখী প্রজাগণের মঙ্গল হইবে, ভূমির রাজস্ব চিরস্থায়ী হইলে তেমনই প্রজাসাধারণের কল্যাণ সাধিত হইবে। লবণ করের ন্যায় ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়ক প্রস্তাবও ভারতের কোটি কোটি অধিবাসীর স্বার্থের সহিত বিশেষরূপে সম্বন্ধ। ভারতভূমি কৃষি প্রধানদেশ—অনেক স্থলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভাবে কৃষি-কার্য্যে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিতেছে, এবং শ্রম-জাত শিল্প কার্য্যেরও অবনতি ঘটিতেছে।

পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর কৃষির জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভূমি পাওয়া যাইতেছে না— পূর্ব্বে যে সকল জমি পতিত অবস্থায় বন জঙ্গলে পূর্ণ থাকিত তাহা এক্ষণে সমুর্ব্বর শষ্যক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে—গোচারণের মাঠ ও শষ্যক্ষেত্র স্বরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, সুতরাং পশুবর্গের ঘোরতর দুরবস্থা উপস্থিত হইতেছে। সার উইলিয়ম্ হণ্টার সাহেবের বিবেচনায় একজন লোকের তিন বিঘা ভূমির প্রয়োজন, কিন্তু এত অধিক ভূমি দুষ্প্রাপ্য; এরূপ স্থলে উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষ সাধন ব্যতিরেকে প্রজাবর্গের শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। ভূমির রাজস্বের চিরস্থায়ীত্ব রক্ষিত হইলে প্রজাগণের সহজেই উৎপন্ন দ্রব্যের উন্নতি বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মিবে, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের সমস্ত কৃষিপ্রধান প্রদেশে ভূমির রাজস্ব নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তাহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিধান করা একান্ত কর্ত্তব্য। অনন্তর তিনি এই বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিলেন যে তাঁহার বিবেচনায় ষষ্ঠ প্রস্তাব একান্ত ন্যায়ানুমোদিত ও সুসঙ্গত, কিন্তু এদেশের লোকদিগের এমনই দুর্ভাগ্য যে যৎকালে একহস্ত তাহাদিগকে একটী অধিকার প্রদান করে তখন অপর হস্ত তাহাদিগের নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া লইবার জন্য প্রসারিত হয়!

মান্দ্রাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত রত্ন সভাপতি পিলে সুন্দর যুক্তি পূর্ণ বক্তৃতায় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন এবং বহরমপুরের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন, উড়িষ্যার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু, পঞ্জাবের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত লালা যশীরাম, বেরারের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত দেবরাও বিনায়ক, পুনার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত কারন্দিকার, পঞ্জাবের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বাবা নারায়ণ সিংহ, লক্ষ্ণৌর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত হামিদ আলি, আলিগড়ের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত আবদার রহিম এবং লক্ষ্ণৌর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত সজ্জাৎ হোসেন একে একে দণ্ডায়মান হইয়া সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ বক্তৃতা সহকারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার উপযোগীতা প্রদর্শন পূর্ব্বক উল্লিখিত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। পরিশেষে উহা সর্ব্বসম্মতি ক্রমে পরিগৃহীত হইল।

সপ্তম প্রস্তাব।

"এই মহাসমিতি কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদ পত্র সমূহে একটী বিজ্ঞাপন পাঠে একান্ত বিস্মিত হইয়াছেন। বিজ্ঞাপনটির মর্ম্ম এই:—"কলিকাতাস্থ অনেক রাজকর্ম্মচারীকে মহাসমিতিতে দর্শক স্বরূপে উপস্থিত হইবার জন্য টিকেট পাঠান হইয়াছে, এই সংবাদ অবগত হইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নিজের সেক্রেটারীগণের এবং গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ কার্য্য বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারিগণের নিকট এই মর্ম্মে ঘোষণ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিবর্গের দর্শক

স্বরূপে মহাসমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হওয়া পরামর্শ-বিরুদ্ধ এবং তাঁহাদের পক্ষে উক্ত সভার কোন কার্য্যে যোগদান একান্ত নিষিদ্ধ।"

এবং মাননীয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাসমিতির অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদককে যে একখানি পত্রলিখিয়াছেন, মহাসমিতি তাহাও বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়াছেন। পত্র খানির মর্ম্ম এইঃ—

বেলভেডিয়ার, ২৬ শে ডিসেম্বর, ১৮৯০।

"প্রিয় মহাশয়,

কল্য অপরাহ্ণে কংগ্রেসে দর্শক স্বরূপে উপস্থিত হইবার জন্য আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার নিকট যে সাতখানি টিকেট পাঠাইয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া দিতেছি, এবং ইহা জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি যে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এবং তাঁহার পরিবার বর্গের মধ্যে কেহ এই সকল টিকেট ব্যবহার করিতে অসমর্থ, কারণ ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে এইরূপ সভাস্থলে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণের উপস্থিতি স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ।

আপনার বিশ্বস্ত, পি, সি, লায়ন, প্রাইভেট সেক্রেটারী।

উল্লিখিত বিজ্ঞাপন ও পত্র পাঠে এই মহাসমিতি উহার মর্ম্ম ভারত গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবার জন্য এবং বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট, ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশ ও অভিপ্রায়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুরূপ কার্য্য করিয়াছেন কি না, তাহাও নির্দ্ধারণ করিবার উদ্দেশে সভাপতি শ্রীযুক্ত ফেরোজসা মেটা গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের নিকট মহাসমিতির স্বপক্ষে একখানি আবেদন পত্র প্রেরণের ভার প্রাপ্ত হউন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ উল্লিখিত প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন। তিনি গভীর উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন, "আপনারা স্থানীয় সংবাদপত্র নিচয়ে একটী আশ্চর্য্যজনক বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া থাকিবেন; উহাতে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট তদীয় কর্ম্মচারিগণকে মহাসমিতিতে দর্শক স্বরূপে উপস্থিত হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

(চতুর্দ্দিক হইতে, "লজ্জার কথা," "লজ্জার কথা" বলিয়া সকলে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন।) আপনাদের এইরূপ মনের ভাব প্রকাশে আমি বিস্মিত নহি; বলিতে কি, আমি স্বয়ং উক্ত মন্তব্য পাঠে যার পর নাই দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছি; আপনারাও যে ঠিক সেইরূপ হইবেন তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমার বিবেচনায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এতদপেক্ষা অদূরদর্শিতার কাম আর কিছুই হইতে পারে না। আমার মনে হয় উহা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে। কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট তদীয় কর্ম্মচারিগণকে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে নিষেধ করিবার অধিকারী হইলেও উহাতে, আমার বিবেচনায় গবর্ণমেণ্টের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এস্থলে গবর্ণমেণ্ট আরও অধিক দূরে অগ্রসর হইতে চাহিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট

তদীয় কর্ম্মচারিগণকে রাজনৈতিক সভার কার্য্যে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়া নিরস্ত নহেন, তাঁহাদিগকে উহাতে দর্শক-স্বরূপে উপস্থিত হইতেও নিষেধ করিতেছেন; ইহাতে গবর্ণমেণ্ট আত্ম দুর্ব্বলতার পরিচয় দান করিতেছেন মাত্র। গবর্ণমেণ্টের এরূপ কার্য্যে আমরা দুঃখ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহাতে বুঝায় যে হয়ত গবর্ণমেণ্ট স্বীয় কর্ম্মচারিবর্গের প্রতি এমন বিশ্বাস করিতে পারেন না যে জাতীয় মহাসমিতির আলোচ্য বিষয়ের আন্দোলনে তাহারা অকলুষিত রহিবে, অন্যথা গবর্ণমেণ্ট এই ন্যায়ানুমোদিত রাজনৈতিক আন্দোলনের শত্রু! এ দেশের গবর্ণমেণ্ট দৃঢ়তর ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, তাঁহার এরূপ শোচনীয় দুর্ব্বলতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এ দেশের অধিবাসিগণ গবর্ণমেণ্টের ভয়ে সঙ্কুচিত অথবা এ দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক সকলের মধ্যে অনৈক্য ও বিবাদ বিসম্বাদ প্রবল, এই জন্যই যে এ দেশের গবর্ণমেণ্ট মহাশক্তিশালী, তাহা নহে; কিন্তু এ দেশের কোটি কোটি লোকের অবিচলিত রাজভক্তিই গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়তার প্রকৃত কারণ। আমরা এখনও নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারি নাই বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের উল্লিখিত আদেশ ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত কি না; পক্ষান্তরে সংবাদ পত্রের বিজ্ঞান এবং লেফ্‌টনেণ্ট গবর্ণরের প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর পত্র এতদুভয়ের মধ্যেও অনেক বিভিন্নতা আছে। গবর্ণমেণ্টের আদেশের প্রকৃত মর্ম্ম কি, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্যই আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাব পরিগ্রহণ করিয়াছি। যে পর্য্যন্ত আমরা গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত অভিপ্রায় অবধারণ করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত আমরা উল্লিখিত বিষয়ে কোন উপায় অবলম্বন করিতে একান্ত অসমর্থ। অতএব আমাদের বিবেচনায় তদ্বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য অবগত হইবার জন্য তৎসমীপে সম্মানের সহিত আবেদন করা একান্ত প্রার্থনীয়। এই সকল কারণ বশতঃ আমি আপনাদিগের নিকট বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি।

অনন্তর ভারত-বন্ধু শ্রীযুক্ত জর্জ্জ ইয়ুল উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিতে গম্ভীর আননে মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি মহাতেজ ও মহোৎসাহ সহকারে বলিতে লাগিলেন;—"বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট তদীয় কর্ম্মচারিগণকে যে উপদেশ দান করিয়াছেন, এবং সার চার্লস্ ইলিয়টের সেক্রেটারীর নিকট হইতে যে পত্র আসিয়াছে, তাহা আমি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি; আমি উক্ত আদেশ ও পত্রের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝিতে অসমর্থ। আমরা জাতীয় মহাসমিতির পৃষ্ঠপোষক, ইহাই যদি তাঁহাদের আপত্তির কারণ হয়, তাহা হইলে আমি জানিতে ইচ্ছা করি, জাতীয় মহাসমিতি কি উপাদানে গঠিত। উহা অনিশ্চিত সংখ্যা বিশিষ্ট অনেকগুলি লোকের সম্মিলনস্থল। যদি তাহাই হয়, তবে আমি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, সেণ্ট্ য়্যাণ্ড্রুর স্মৃতি-ভোজ কি একটী সম্মিলন স্থল নহে? উহাকেও কি মহাসমিতি বলা যায় না?

উহাতে কি রাজনৈতিক বিষয় আলোচিত হয় না ? গত কয়েক বৎসর হইতে উহাতে বিবিধ রাজনৈতিক বিষয় আলোচিত হইতেছে। উহাতে রাজকর্ম্মচারিগণ কেবল মাত্র উপস্থিত থাকেন, তাহা নহে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারিবর্গ রাজনৈতিক বিষয়ে বক্তৃতা দান করিয়া থাকেন! এই জন্যই আমার মনে হইতেছে যাঁহারা এরূপ আদেশ দান করিয়াছেন, তাঁহারা মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন—উহা কোন দায়িত্ব-জ্ঞান শূন্য অল্প ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারীর কার্য্য। যদি কোন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর অভিমত অনুসারে উক্ত আদেশ প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি নিঃসন্দেহ বলিতে পারি যে তিনি অতি গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে যদি উহা সর্ব্বোচ্চ রাজশক্তির অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং উল্লিখিত বিজ্ঞাপন ও পত্র সর্ব্বপ্রধান শাসন কর্ত্তার অভিপ্রায় অনুসারে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিও বিশেষ বিবেচনার পর এই কথা বলিতে প্রস্তুত আছি যে, যে সকল সুশিক্ষিত লোকের প্রবল রাজভক্তি ও স্বদেশের যথার্থ পরিচর্য্যাই স্বভাবসিদ্ধগুণ, উহা দ্বারা সেই সকল সজ্জন মণ্ডলীর প্রতি নিতান্ত গর্ব্বপরিপূর্ণ তীব্র ঘৃণা প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল লোক সাধুতা ও সদুদ্দেশ্য বিষয়ে দেশের কোন রাজকর্ম্মচারীর অপেক্ষা হীন নহেন। উক্ত আদেশের মর্ম্ম হইতে ইহাই অনুভব করা যায় যে, আমরা এমনই অপদার্থ যে আমাদের সমিতি তাঁহাদের দর্শনেরও অযোগ্য ; এরূপ ভাব নিতান্ত অপমানের বিষয়, এই জন্য আমিও গর্ব্বের সহিত বলিতেছি যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের গুণের তুলনায় আমরা রাজকর্ম্মচারিগণের অপেক্ষায় কোন অংশে হীন নহি। আমি বিবেচনা করি গবর্ণমেণ্টের কোন নিম্নতন রাজকর্ম্মচারীর ভ্রমবশতঃই এইরূপ অন্যায় কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে ; এই বিবেচনাতেই আমি বর্ত্তমান প্রস্তাবের সমর্থন করিতেছি।” জর্জ্জ ইয়ুল সাহেবের তেজ গর্ব্ব পূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার পর সকলে গভীর আনন্দের সহিত উল্লিখিত প্রস্তাব পরিগ্রহণ করিলেন।

ইয়ুল্ সাহেবের তেজস্বিনী বক্তৃতার পর দিবা অবসান হইয়াছিল, তখন অপর প্রস্তাবের আলোচনার সময়াভাব প্রযুক্ত সভাপতি মহাশয় কর্তৃক সভা ভঙ্গ হইল ; প্রতিনিধি ও দর্শকবর্গ উৎসাহ ও আনন্দ পরিপূর্ণ অন্তরে মহোল্লাসে মহাসভাস্থল হইতে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

তিনটি।

উমাশশী।

দুই বছরের মেয়ে, উমাশশী নাম তার,
"রাণী" তার আদরের নাম ;

এমনি আস্পর্দ্ধা তার, ঠাকুমার করে সে গো
পদে পদে শত অপমান!

"উঠানে খেলিতেছিল, রাণী ছিল এইখানে,
দেখ্ দেখ্ রাণী গেল কোথা"
পড়ে গেল হুলস্থূল! কোথা গেল? কোথাগেল?
খোঁজ্ খোঁজ্ রাণী গেল কোথা!
ঠাকুমার সর্ব্ব অঙ্গ, কেঁপে উঠে থর থর!
কাকা'রা খুঁজিয়া হ'ল সারা!
কুয়ায় ডুবিল নাকি? ধরিয়ে কি লয়ে গেল
লক্ষ্ণৌর ক্রূর ছেলেধরা?
কতক্ষণে ক্রোড়ে করে, ফণিমামা নিয়ে এল
গৃহস্থের হারাণো রতন!
কুস্বপন ভেঙে গেল; আবার নিশ্বাস ছাড়ি,
সবে মোরা মুছিনু নয়ন!
করিয়ে বিদ্রূপ সবে, তোমরা হেস না হাসি,
গরীবের নীরস কথায়;
মরে যায়, ডুবে যায়, প্রাণে সব সহ্য হয়!
ছেলে হারা সওয়া নাহি যায়!

রাণীর ঠাকুমা তবে, দাসীরে ডাকিয়ে কন,
"এই বুঝি রাণীরে খেলাস্?
আজ যদি মেয়ে মোর, হারাইয়ে যেত, বাঁদি,
গলায় পড়িত তোর ফাঁশ!
এইনে মহিমা তোর"—এত বলি গৃহকর্ত্রী
দাসীরে দিলেন তাড়াইয়া!
সদিয়ার মাতা হায়, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়;
রাণী উচ্চে উঠিল কাঁদিয়া!
আকুল করুণ ডাকে, "দাই, দাই" বলে হাঁকে;
ঠাকুমাতা হইলা অস্থির;
কিজানি কিভেবে চিন্তে, দাসীরে ডাকিয়া নিলা,
রাণী উঠে ক্রোড়েতে দাসীর!
দুই বছরের মেয়ে, উমাশশী নাম তার,
"রাণী" তার আদরের নাম;
এমনি আস্পাদ্ধা তার! ঠাকুমার করে সেগো,
পদে পদে শত অপমান!

দাও দাও।

(তোমরা গোল করিও না। বঙ্গের বিধবা মৃত স্বামীর চরণ ধরিয়া কি যাচ্ঞা করিতেছে, চিত্তের কর্ণ স্থির করিয়া শোন)।

দাও, দাও, চরণের ধূলা—
ঐ চরণের রজঃ মাখি মাখি সর্ব্বদেহে,
ঢাকিব এ শ্যামল যৌবন!
দাও, দাও, হিয়ার ভকতি—
ঐ ভক্তি হৃদে রাখি, করিব গো অহোরাত্রি,
শাশুড়ির চরণ-বন্দন!
দাও তব অনুপম স্নেহ—
ঐ স্নেহ চিত্তে মাখি, দেবর ননদবর্গে,
বুক পূরে করিব যতন!

দাও দাও আত্মত্যাগ তব—
করিয়া পরার্থ যাগ,　　ভুলিব সোহাগ রাগ,
সুখতৃষ্ণা অসার ক্রন্দন !
দাও, দাও, সহিষ্ণুতা তব—
অই বারি পান করি, বৈশাখের তীব্র তৃষা
অনায়াসে করিব বারণ !
দাও, দাও, স্মৃতিটি তোমার—
ওই স্মৃতি বুকে লয়ে,　　সারাদিন সারাক্ষণ,
করিব ও মূরতি স্মরণ !
হে নাথ কিছু না চাই,　　এই ভিক্ষা তব ঠাঁঞি,
দাও, দাও, অল্পভোগী তোমার জীবন !

সিন্দূর ।

(বাড়ির সধবা ননদেরা বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে তিরস্কার করিলেন। অপরাধের মধ্যে সে আপনার সিন্দুরের কৌটা বাক্সর মধ্যে পূরিয়া রাখিয়াছিল। আমি বেশ জানি বিধবার আঙ্গুলের দাগ পর্য্যন্ত সেই কৌটার সিন্দুরে ছিল।)

১

কেন আহা নিতে চাও কৌটার সিন্দূর ?
সেই আঙ্গুলের দাগ　　কৌটা মাঝে লেগে থাক্,
অধরে লাগিয়ে থাক চুম্বন মধুর ;
কেন আহা নিতে চাও কৌটার সিন্দূর ?
রঙে রঙে ঘেঁসাঘেঁসি,　　রাগে রাগে মেশামিশি,
থাক্ থাক্, নিও না ও কৌটার সিন্দূর!
ও রাগ মিলায়ে যাবে, কৌটা বড় দুঃখ পাবে !
মিলন-মধুর হবে বিরহ-বিধুর !
কেন আহা নিতে চাও কৌটার সিন্দূর ?

২

রেখে দে যতন করে;—দেখিস্ তখন
দুঃখিনীর হবে যবে অন্তিম-শয়ন।
অবাক্ হইয়া যাবি,　　মনে কত ভয় পাবি,
সিন্দূরের কৌটা খোলে আপনা আপনি !
তাম্বুলের বাটা খোলে আপনা আপনি !

অধরে তাম্বুল রাগ, ললাটে সিন্দূর দাগ,
চলে যাবে উচ্চ কণ্ঠে গাহিয়ে রাগিণী,
তুহাদেরি মাঝ দিয়া বিধবা ভামিনী !
তোরা সবে এয়ো মিলে, কৌটা খুলে নিস্ ঢেলে ;
ললাটে সিন্দূর ফোঁটা দিস্ ভরপুর ;
আহা এবে থাক পড়ে কৌটার সিন্দূর !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

বিশেষ্য ও বিশেষণ।

ব্যাকরণে পড়িয়াছি, বিশেষণ বিশেষ্যের গুণবাচক ; কিন্তু তখনকার ব্যাকরণ এক-রকম ছিল, এখন দেখিতেছি আর এক রকম। আগে জানিতাম চন্দ্র বিশেষ্য, সূর্য্য বিশেষ্য, সমুদ্র বিশেষ্য, পর্ব্বত বিশেষ্য— এখন দেখিতেছি সব ভুল—বিশেষণকে বিশেষ্য বলিয়া বুঝিয়া গিয়াছি। জগতের ভিতর বিশেষ্য খুঁজিতে খুঁজিতে হয়রান্ হইলাম—যাহার কাছে যাই সেই বলে আমি বিশেষ্য কে বলিল ? আমি যে বিশেষণ। সমগ্র ভূমণ্ডলের ভিতর যখন একটি বিশেষ্যও মিলাইতে পারিলাম না, তখন সহসা মনে হইল হয়ত এমন কেহ থাকিতে পারে সমগ্র জগৎ যাহার গুণবাচক। প্রাণ মাতালের মত মত্ত হইয়া উঠিল, হৃদয় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "ধরিয়াছি বিশেষ্য ধরিয়াছি তোমায়—এতগুলি বিশেষণ-মুড়ি দিয়া বসিয়া রহিয়াছ—আমি এত খুঁজিলাম একবার সাড়াও দিলে না—তবু দেখ তোমাকে বাহির করিয়াছি।" তখন বুঝিলাম, জগতে যদি বিশেষ্য পদ থাকে তবে সেই একটি, যাহার বিশেষণ চন্দ্র সূর্য্য, যাহার বিশেষণ তরু লতা, যাহার বিশেষণ তরঙ্গাকুলিত মহাসমুদ্র, যাহার বিশেষণ আমার স্নেহময়ী জননী, যাহার বিশেষণ আমার হৃদয়ার্দ্ধ স্ত্রী, যাহার বিশেষণ আমার ভ্রাতা, আমার ভগ্নী, জগতের প্রত্যেক পরমাণু হইতে অনন্ত মহান্ পর্য্যন্ত যাহার গুণবাচক। মত্ত না হইলে বিশেষ্য বাহির করা যায় না।

এতগুলি বিশেষণ চাঁপা দিয়া, জলস্থল মরু ব্যোমের মধ্যভাগে, অনন্ত সমুদ্রের চাদর গায়ে, নক্ষত্র রত্ন খচিত অসীম নীল গগণের পার্শ্বাড়ি পরিয়া, স্নেহময়ী জননীর আড়ালে, প্রিয়তম পত্নীর আড়ালে, প্রেমাস্পদ ভাইএর আড়ালে কতক্ষণ লুকাইয়া থাকিবে ? বিশেষ্য। এই দেখ, তোমায় ধরিয়াছি ? বুঝিয়াছি, মহা বিশেষণ রাজ্যে তুমিই এক-মাত্র বিশেষ্য ! তুমিই একমাত্র লক্ষ্য, তুমিই একমাত্র উপাস্য। এত বিশেষণ সে কেবল তোমাকে দেখাইয়া দিবে বলিয়া। হে মহা বিশেষ্য তোমাকে বন্দনা করি, তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

রৌপ্য।

রৌপ্য অতি পুরাতন কাল হইতে জনসমাজে প্রচলিত হইয়াছে; ইহার উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ সর্ব্বজন-বিদিত, আর পুরাতন ভাষা সমূহে ইহার যে সকল নাম পাওয়া যায় সে সমুদয়ই ইহার এই চাকচিক্য গুণ প্রকাশক। ইয়োরোপে আল্কেমিষ্টগণ চন্দ্রের সহিত ইহার তুলনা করিতেন, এবং তাঁহাদিগের গ্রন্থ সমূহে অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন দ্বারা ইহাকে ব্যক্ত করিতেন।

রৌপ্য সাধারণতঃ খনিজ পদার্থ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া লইতে হয়। কিন্তু কখন কখন উহা প্রকৃতিতে ধাতু-অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া থাকে; নরওয়ে প্রদেশে একবার একখণ্ড রৌপ্য পাওয়া যায়, তাহার ওজন এক টন্ বা আটাইশ মণ। আবার দক্ষিণ পেরু প্রদেশেও রৌপ্যের বড় বড় খণ্ড পাওয়া গিয়াছে। রৌপ্যের যে সকল যৌগিক খণি হইতে সংগ্রহ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে উহার সল্‌ফাইড সমধিক প্রসিদ্ধ; ইহাতে প্রত্যেক ৩২ ভাগ গন্ধকের সহিত ২১৬ ভাগ রৌপ্য যুক্ত আছে—এতদ্ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ ইহাতে নাই। রৌপ্যের ইহা ছাড়া আর কতকগুলি যৌগিকও প্রকৃতি হইতে পাওয়া যায়; তাহাদিগের মধ্যে আমরা কেবল দুইটীর উল্লেখ করিব। একটীতে রৌপ্য, আণ্টিমনি, ও গন্ধক আছে; আর একটীতে কেবলমাত্র রৌপ্য ও ক্লোরিণ দেখা যায়। সমুদ্র জলে রৌপ্য বিদ্যমান আছে; এবিষয়টী ১৭৮৭ অব্দ হইতে বৈজ্ঞানিকদিগের গোচরে আসিয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাউক রৌপ্যের যৌগিক হইতে কি প্রকারে ধাতু সংগৃহীত হইয়া থাকে। রৌপ্য প্রস্তুত করিবার যে সমুদয় পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহাদিগকে সংক্ষেপে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। (১) প্রথমতঃ রৌপ্যকে সীসকের সহিত সংযুক্ত করিয়া উহাকে খনিজ দ্রব্য হইতে নিষ্কাষিত করা হয়, আর পরে উক্ত রৌপ্য ও সীসকের মিশ্রণকে বায়ুতে উত্তপ্ত করিলে সীসক পৃথক্ হইয়া যায় এবং উজ্জ্বল রৌপ্য অবশিষ্ট থাকে। (২) রৌপ্য পারদের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়—আর পরে উত্তাপ দ্বারা পারদ দূরীভূত করা হয়। আর (৩) রৌপ্য এক প্রকার লবণে পরিণত করিয়া উহা জলে দ্রবীকৃত হয়, এবং তাহার পর জলীয় মিশ্রণ হইতে তাম্রের দ্বারা রৌপ্য পৃথক্ করা হয়। এই তিন প্রকার পদ্ধতির মধ্যে প্রথমোক্তটিই পুরাকালে ইয়োরোপে প্রচলিত ছিল। খনিজ পদার্থ হইতে কিপ্রকারে রৌপ্য এই প্রণালী দ্বারা বর্ত্তমানকালে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে তাহা বর্ণনা করা যাইতেছে। সর্ব্বপ্রথমে খনিজবস্তুতে সীসক যোগ কর ও উত্তাপ দাও। সীসক গলিয়া রৌপ্যের সহিত যুক্ত হইবে ও উভয়ে মিশ্রধাতুরূপে বাহির হইয়া আসিবে। পরে এই মিশ্রণকে এক বিশেষ প্রকৃতির চুল্লিতে উত্তপ্ত করিতে হইবে ও উহার উপর নলদ্বারা বায়ুস্রোত প্রবাহিত করিতে হইবে। বায়ুস্রোতে সীসক অকসিজেনের সহিত

যুক্ত হয় আর উত্তাপে ঐ যৌগিক দ্রব হইয়া চুল্লির পার্শ্বস্থিত নালাদ্বারা বাহির হইয়া আইসে। এইরূপে সমুদয় সীসক বাহির হইয়া যাইলে শুভ্রবর্ণ রৌপ্য অবশিষ্ট থাকে। পূর্ব্বে যে তিন প্রকার রৌপ্য প্রস্তুত-প্রণালীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারের বৃত্তান্ত এখন দেওয়া যাইতেছে। পারদে রৌপ্য ও সুবর্ণ গলিয়া থাকে ইহা পূর্ব্বতন কালের লোকগণ জানিতেন, কিন্তু তাঁহারা কখনও পারদের এই গুণ দ্বারা রৌপ্য প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করেন নাই বোধ হয়। এইরূপ চেষ্টা সর্ব্বপ্রথমে ১৫৫৭ অব্দে মেক্সিকো প্রদেশে বার্থোলোমেও ডে মেডিনা নামে এক ব্যক্তি করেন এবং ১৫৬৬ অব্দে তাঁহার উদ্ভাবিত প্রণালী ব্যবহৃত হয়। পরে ১৫৭৪ অব্দে পেরু প্রদেশে পোটোসি নামে এক ব্যক্তি ঐ প্রণালী অবলম্বন করেন। অদ্যাবধি মেক্সিকো, পেরু ও দক্ষিণ চাইল এই তিন প্রদেশে ঐ একই প্রণালী চলিত আছে। যে সকল স্থানে কাষ্ঠ দুর্ম্মূল্য, সে সকল স্থানের পক্ষে এই প্রণালী অতি সুবিধাকর। প্রথমতঃ খনিজ দ্রব্যকে অশ্ব কিম্বা অশ্বতর চালিত কলের সাহায্যে জলের সহিত অতি সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করা হয়; এইরূপে খনিজ পদার্থ একরূপ কর্দ্দমের ন্যায় দেখিতে হয়। তখন উহা ভূমিতে বিস্তৃত করিয়া উহার উপর শতকরা ৩ হইতে ৫ ভাগ পর্য্যন্ত লবণ মিশ্রিত করা হইয়া থাকে ও তাহার পর অশ্বতর দ্বারা মিশ্রণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে হয়। অর্থাৎ অশ্বতর উক্ত পদার্থের উপর বারম্বার ঘুরিয়া বেড়াইলে উহার পদাঘাতে মিশ্রণ সংঘটিত হয়। অতঃপর এক দিবস গত হইলে উক্ত মিশ্রণে পারদ এবং তুঁতে ও লৌহের একপ্রকার লবণ ঢালিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর পুনরায় পারদ ঢালা হয়, এবং পরিশেষে পনর হইতে পঁয়তাল্লিশ দিবস ধরিয়া কতকগুলি অশ্বতর দ্বারা পদার্থ সমূহের মিশ্রণ সাধিত হয়। এইরূপে রৌপ্য ও পারদে মিশ্রণ প্রাপ্ত হয়, ইহাকে জল দিয়া ধুইতে হয় এবং কাপড়ের ব্যাগে পুরিয়া চাপ দিতে হয়। তদ্দ্বারা মিশ্রণ বাহির হইয়া আইসে আর অবিশুদ্ধ অংশ ব্যাগে থাকিয়া যায়। পরে মিশ্রণে উত্তাপ দিলে পারদ উড়িয়া যায় আর রৌপ্য অবশিষ্ট থাকে। এই রৌপ্যকে গলাইয়া দণ্ডাকারে পরিণত করা হয়।

১৭৮০ অব্দে ইয়োরোপে পারদ দ্বারা রৌপ্য নিষ্কাশণ প্রণালী প্রথম অবলম্বিত হয়। ইহা উল্লিখিত প্রণালী হইতে অনেক বিষয়ে বিভিন্ন; ইহাতে রৌপ্যকে উত্তাপ সাহায্যে লবণ দ্বারা ক্লোরাইডে পরিণত করা হইত, পরে জল, পারদ ও লৌহটুকরা ঐ ক্লোরাইডে মিশ্রিত করিয়া সমুদয়কে যথেষ্টরূপে ঝাঁকান হইত। এইরূপে পারদ ও রৌপ্য মিশ্রণ জন্মিত, পরে উল্লিখিত প্রকারে রৌপ্য সংগ্রহ করা হইত। এই প্রণালী এক্ষণে আর ইয়োরোপে চলিত নাই।

উপরে যে তৃতীয় প্রকারের প্রণালী উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার স্থূল বৃত্তান্ত এই যে খনিজ পদার্থ হইতে রৌপ্যের এরূপ একটি যৌগিক প্রস্তুত করা হয় যাহা জলে

মিশ্রিত হয়; পরে এই মিশ্রণ হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ধাতব রৌপ্য পৃথক করা হয়। যেমন রৌপ্যকে সল্‌ফেটে পরিণত করিয়া উহা জলে মিশাও পরে তাম্র সংযোগ করিলে ধাতব রৌপ্য বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবে।

এই সকল প্রকারে যে রৌপ্য পাওয়া যায় তাহা বিশুদ্ধ নহে; রৌপ্যে স্বর্ণ তাম্রাদি অন্যান্য ধাতু দেখিতে পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ রৌপ্য প্রস্তুত করণের অনেক উপায় আছে; তন্মধ্যে একটি এইঃ—রৌপ্যকে নাইট্রিক আসিডে দ্রব করিয়া উহাতে লবণ মিশাইলে এক প্রকার সাদা বস্তু থিতাইয়া পড়িবে, ইহা রৌপ্যের ক্লোরাইড। এই ক্লোরাইড জল দ্বারা ধুইয়া কষ্টিক পটাশ ও দুগ্ধজাত শর্করার সহিত উত্তপ্ত করিলে রৌপ্য পৃথক হইয়া পড়ে। পরে এই রৌপ্য কার্ব্বনেট অব সোডার সহিত গলাইলে সুন্দর রৌপ্য খণ্ড প্রস্তুত হইবে।

এক্ষণে রৌপ্যের গুণ সমূহ ব্যক্ত করিতেছি। অন্যান্য সমুদয় ধাতু অপেক্ষা রৌপ্য তড়িত ও উত্তাপের অধিকতর সঞ্চালক; দেড়গ্রেণ রৌপ্য টানিয়া ১৮০ গজেরও অধিক লম্বা তার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। রৌপ্য পিটাইয়া অতি সূক্ষ্মপাত গড়ান হইতে পারে। এই পাতের বেধ এক মিলিমিটারের এক লক্ষ ভাগের পঁচিশ ভাগমাত্র দেখা যায়। (এক মিলিমিটার এক গজের সহস্র ভাগের একভাগ অপেক্ষাও কম।) রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা রৌপ্য অতিসূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে; তখন উহা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু উত্তাপ দ্বারা গলাইলে উহা সহজেই শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আমোনিয়া মিশ্রিত জলে রৌপ্য দ্রব করিয়া ঐ মিশ্রণ শর্করা কিম্বা টার্টারিক অম্লযোগ করিলে তদ্দ্বারা কাচের উপর রৌপ্যের জমাট বাঁধা যাইতে পারে; আর তখন কাচ উজ্জ্বল দর্পণে পরিণত হয়। রৌপ্যের স্তর যদি সূক্ষ্ম হয়, তবে ঐ কাচ দ্বারা সূর্য্যালোক দেখিলে নীলবর্ণ দেখাইবে। রৌপ্যের দানা অনুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে অনেক সময় ঝোপের ন্যায় দেখায়। ১০৪০° উষ্ণতায় রৌপ্য দ্রব হয়; দ্রব রৌপ্য অক্‌সিজেন গ্যাস চুষিয়া লয়, পরে শীতল হইলে ঐ গ্যাস আবার বাহির হইয়া আইসে, তখন অনেক খানি রৌপ্য ছড়াইয়া পড়ে। রৌপ্যের এই গুণকে উহার "থুতুফেলা" কহে। রৌপ্য জল অপেক্ষা সাড়ে দশ গুণ ভারী।

রৌপ্যে অন্য কোন ধাতু (যেমন টিন্ ও দস্তা) বর্ত্তমান থাকিলে উহা সাধারণতঃ ভঙ্গুরত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু রৌপ্যে কিয়ৎ পরিমাণে তাম্র মিশাইলে উহার ভার সহিবার ক্ষমতা এবং নমনীয়তা বৃদ্ধি পায়। টাকা কিম্বা অলঙ্কার প্রস্তুত করিবার পক্ষে বিশুদ্ধ রৌপ্য উপযোগী নহে; উহাতে কিঞ্চিৎ তাম্র মিলাইয়া উহার কঠিণত্ব প্রথমতঃ বৃদ্ধি করিয়া লওয়া আবশ্যক। ইংলণ্ড দেশে টাকা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে রৌপ্য ব্যবহৃত হয় তাহাতে হাজার ভাগে ৭৫ ভাগ তাম্র থাকে; ফ্রান্স দেশে ১০০ভাগ, আর জার্ম্মনি ও অষ্ট্রিয়া দেশেও ১০০ ভাগ।

রৌপ্য নাইট্রিক অম্লে সহজেই দ্রব হয়; সলফিউরিক অম্লে উত্তাপ যোগে দ্রব হয় আর হাইড্রোক্লোরিক অম্লে দ্রব হয় না। দুইখণ্ড রৌপ্য যুড়িতে ছয় ভাগ পিত্তল পাঁচ ভাগ রৌপ্য ও দুইভাগ দস্তা এই তিনের মিশ্রণ জাত "ঝাল" ব্যবহার করা হয়।

রৌপ্যের অণু হাইড্রোজেনের অণু অপেক্ষা প্রায় ১০৮ (১০৭·৭) গুণ ভারী। রৌপ্যের যৌগিক সমূহ কৃষ্ণ, শ্বেত, হরিদ্রা, ও লোহিত বর্ণের দেখা যায়। ইহার কতকগুলি যৌগিক ফটোগ্রাফিতে ব্যবহৃত হয়; রৌপ্যের পাত্রে মরিচা ধরে না ইহা সকলেই জানেন; ইহা ছাড়া রৌপ্যের আর একটি বিশেষ গুণ এই যে ইহা পটাশ নামক ক্ষার সংস্পর্শে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

সন্ধ্যা বায়ু।

কোথা হ'তে এল সন্ধ্যা-বায়, ধীরে ধীরে উপবন মাঝে,
গৃহহারা হৃদিখানি ল'য়ে, আশ্রয় লইতে কার ও) কাছে!
লাজময়ী মালতী কলিকা, প্রদোষের স্তিমিত আলোকে,
চেয়েছিল সরমে সভয়ে, আধ খোলা সকরুণ চোকে।
শূন্য মনে ফিরিছে সমীর, ক্লান্তি-মাখা নিশ্বাস ফেলিয়া,
বিষাদের অস্ফুট সঙ্গীত, মৃদুতানে গাহিয়া গাহিয়া।
লুকাইয়া পাতার আড়ালে, শুনে সেই দুখময় গান,
করুণায় মালতী বালার, গ'লে গেল কোমল পরাণ!
প্রণয়ের পরিমল ভরা, মধুমাখা নিরালা হিয়ায়,
মনে হ'লো তুলে নিয়ে তারে সযতনে অভাব ঘুচায়।
কিন্তু সেই মন ভাব তার, ভাষা নাই বুঝাবে কেমনে,
চেয়ে চেয়ে জানাইতেছিল, দূর হ'তে আকুল নয়নে!
দেখিল না সমীরণ তাহা, কেঁদে কেঁদে কানন ঘুরিয়া,
চলে গেল, যাবার সময় মালতীকে ঈষদ ছুঁইয়া;
মায়াময় সে মৃদু পরশে, ভেসে গেল লাজ বাঁধ তার,
খুলিয়া গোপন হৃদিখানি, ঢেলে দিল প্রেম-সুধা-ধার!
বুঝিল না, জানিল না বায়ু, ফিরে তাই এলনাক আর,
অজানিতে বাসটুকু শুধু, মিশে গেল হৃদয়ে তাহার!
ধীরে ধীরে আসিয়া যামিনী, ঢাকিয়া ফেলিল মালতীরে
আশার সে ছায়ালোক হতে, নিরাশার গভীর তিমিরে!
সারানিশি শিশির অশ্রুতে, ভিজে শেষে মরিতে উষায়,
ফুটাইয়া মালতীর হৃদি, সন্ধ্যা বায়ু গেল গো কোথায়!

শ্রীবিনয়কুমারী বসু।

যোগেন্দ্রলালপাত্র কোম্পানি

অলঙ্কারের দোকান।

(সংস্থাপিত ১২৮৫ সালে।)

১৬নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদিগের উল্লিখিত দোকানে স্বর্ণ, রৌপ্য ও জহরতের অলঙ্কার, চেন, অঙ্গুরী ও রূপার বাসন প্রভৃতি সকল প্রকার জিনিস নমুনায় তৈয়ারি ও মেরামত হয় এবং বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। আমাদিগের দোকানের কারিকরদিগের মধ্যে অনেকেই কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ইংরাজ জুয়েলার হ্যামিল্টন্ কোম্পানি প্রভৃতির দোকানে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। এবং ইংরাজদিগের দোকান অপেক্ষা অনেক কম মজুরিতে আমরাও তাহাদিগের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকি।

বিবাহার্থী কন্যার কম দামের আধুনিক পসন্দানুযায়িক ডায়মনকাটা অলঙ্কার পাওয়া যায়।

অর্ডারের সহিত কিঞ্চিৎ অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে যথা সময়ে মফঃস্বলে সকল প্রকার অলঙ্কারাদি ভ্যালুপেবল (Value payable) ডাকে পাঠাইয়া দেওয়া যায়। আমাদিগের দোকানের বিক্রীত জিনিসের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে আমরা দায়িক থাকি। অন্যান্য বিষয় আমাদিগকে পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

বি, ঘোষের মালসা।

এই মহৌষধ কেবল গাছগাছড়ায় প্রস্তুত। ইহাতে পারার ঘা, দৌর্ব্বল্য, বাত, চক্ষু গলা ও নাকের ভিতর ঘা, কিম্বা রক্ত দূষিত হইয়া, যে কোন প্রকার পীড়া হউক না কেন, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবেক। ইহা সকল সময়ে সেবন করা যায়। স্নানাহারের কোন কঠিন নিয়ম নাই (স্বাভাবিক।) মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা ডাকমাশুল ।০ আনা। ডজন ১০৷৷০ টাকা। সকল প্রকার ঘায়ের মলম। মূল্য ৷৷০ আনা প্যাকিং ৵০ আনা।

হাঁপানির মহৌষধ।

এই সিদ্ধ ফলপ্রদ ঔষধ তিন দিবস ব্যবহারে হাঁপানির কষ্ট, টান, কাশি এবং উহার সহিত কফ-উঠা নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ৩৲ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা, ডাঃ মাঃ ।০ আনা।

অম্লরোগের মহৌষধ।

ইহাতে শীঘ্র এবং সম্পূর্ণ রূপে অম্লরোগ ও তৎসহিত পাকাশয়ের পীড়া, বুক-জ্বালা এবং অজীর্ণ আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা, ডাঃমাঃ ।০ আনা।

বাধক বেদনার মহৌষধ।

ইহাতে বাধক বেদনা, শ্বেত বা রক্ত-প্রদর ও বন্ধ্যা দোষ সমূলে বিনষ্ট করিয়া, গর্ভোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে। মূল্য ৫৲ টাকা, ডাঃ মাঃ ৷৷০ আনা।

হিষ্টিরিয়া ড্রপ্‌স।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকট এবং ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি ও গুরুদাস বাবুর মেডিকেল লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

দীপনির্ব্বাণ (উপন্যাস) (দ্বিতীয় সংস্করণ) ... ... ১৲

বসন্তউৎসব (গীতি নাট্য) ... .. ।৵০

মালতী (উপন্যাস) ... ... ।০

গাথা (কাব্যোপন্যাস) ... ... ।৵০

পৃথিবী ১

হুগলীর ইমামবাড়ী (উপন্যাস) ... ১।০

মিবার-রাজ (উপন্যাস,) ... ... ।০

গল্প স্বল্প (স্কুল পাঠ্য) (দ্বিতীয় সংস্করণ) ... ... ॥০

বিদ্রোহ (নবপ্রকাশিত উপন্যাস) ... ... ১।০

ছিন্নমুকুল (দ্বিতীয় সংস্করণ) কেবল ২০১ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট মেডিক্যাল লাইব্রেরী শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

কাশিয়াবাগান, বাগান বাটী,
অপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
"ভারতী ও বালক" কার্য্যাধ্যক্ষ।

পঁচিশ টাকা

মূল্যের সাটী। নূতন প্রস্তুত করাইয়াছি। রেসমের পাড় ও পাছা, সুতার কাপড়, ফরাসডাঙ্গার কাঁচি বুনন। ১১ হাত লম্বা আড়াই হাতের কিছু অধিক বহর। আমার নিকট ৪ খানি আছে। এক এক খানির মূল্য ১২॥০। ডাক খরচা লাগিবে না। দুই পাড় পাছা শূন্য) ঐরূপ সাটী এবং ধুতি তৈয়ারি হইতেছে। মূল্যও কিছু স্বল্প হইতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত নানাবিধ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ফরাসডাঙ্গার ধুতি সাটী ও উড়ানী এক দরে সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থ আমার নিকট আছে। মূল্যের সিকি অংশ অগ্রিম পাইলে ভেলুপেয়েবল ডাকে পাঠান যাইতে পারে।

৫ নং তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর,
কলিকাতা।

শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র।